



দ্বিজেন্দ্র
রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



PB8395

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

সমগ্র রচনাবলী
দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রথম খণ্ড

ۛۛۛۛ

প্রকাশকের নিবেদন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আপন সৃজনপ্রতিভায় স্বতন্ত্র এবং ভাস্বর। মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের জীবদ্দশার মধ্যে বাঙলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তি অপ্রতুলও নহে।

দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি, নাট্যকার, সমালোচক এবং সাহিত্যিক। স্বদেশী ভাবধারায় তিনি উদ্ভূত। দ্বিজেন্দ্র জন্মশতবর্ষে (১৯৫৫) দ্বিজেন্দ্র-চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে এবং ভরসা করি, ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিবে। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরেজি কবিতার বই Lyrics of Ind ব্যতীত আরো বহুশিষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্র-চর্চার সহায়তাকল্পে আমরা তাঁহার সমগ্র রচনাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার যে রচনাবলী বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাও যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া দুইটি খণ্ডেই সম্মিলিত করা হইতেছে। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডটি যথাসম্ভব সত্ত্বর প্রকাশিত হইবে।

রচনাবলীর খণ্ড দুইটি সম্পাদনার জন্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হস্তলিপিটি পাওয়া গিয়াছে।

পাঠক-সাধারণের নিকট আমাদের এই প্রচেষ্টা সমাদর লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

২রা জানুয়ারি, ১৯৫২

দ্বিতীয় মদ্রণ

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠক-সাধারণের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্য-সাধনা' অংশে কিছু নতুন আলোচনা সংযোজন করিয়াছেন।



ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সংগীতে-কাব্যে-নাটকে-প্রহসনে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে বহুস্থানে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তির জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভা পুনর্বিচারের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় বলেছিলেন : "ইহা নতুনতায় বলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপলক্ষণকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

'সাহিত্য সংসদ' দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনাকে দু'খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছেন। দু'টি খণ্ডই তিনটি করে বিভাগ থাকবে : (১) নাটক ও প্রহসন, (২) কবিতা ও গান এবং (৩) গদ্যরচনা। যতদূর সম্ভব এখানে কালগত পারস্পর্য রক্ষা করা হয়েছে। বানান বিষয়ে যথাসম্ভব মূলের বানানই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ঐ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলীর আলোচনা থাকবে। তাছাড়া উক্ত ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ ও কাব্যরীতি, দ্বিজেন্দ্রসংগীত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গুণগ্রাহী কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর একখানি তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন। আর একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন নবকৃষ্ণ ঘোষ। উপাদান সম্পর্কে দু'টি গ্রন্থই মূল্যবান। এই দু'টি গ্রন্থ থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান লেখকের 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটিও ভূমিকা রচনায় সাহায্য করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে অনেক প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহিত করেছেন আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়। গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনা সংগ্রহ করার ও পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। কারণ তাঁর অনেক রচনাই এখন দুর্প্রাপ্য। সাহিত্য সংসদের পক্ষে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান করেছেন। বর্তমান সংস্করণকে সৃষ্টি রূপদানের জন্য তাঁর এই আন্তরিকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সাহিত্য সংসদের শ্রীযুক্ত গোালোকেন্দ্র ঘোষের সহানুভূতি ও আন্তরিকতাও আমাকে উৎসাহিত করেছে। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত ও প্রীতিভাজন শ্রীমান সনৎকুমার মিত্রের সাহায্য ব্যতীত এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তথ্য ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জীবন-কথা

.. ...

নয়

সাহিত্য-সাধনা

.. ...

কুড়ি

নাটক

পাষণী

...

১— ৩৯

তরুবাই

...

৪১— ৯০

রাণা প্রতাপসিংহ

..

৯১—১৬০

দুর্গাদাস

...

১৬১—২০৪

সাজাহান

..

..

২০৫—২৯০

মেবার-পতন

..

..

..

...

২৯৫—৩৫০

প্রহসন

সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার

...

৩৫১—৩৯০

বিরহ

..

৩৯৫—৪০২

প্রায়শ্চিত্ত

..

...

৪০৩—৪৬১

কবিতা ও গান

আর্যগাথা (১ম)

..

...

৪৬৩—৪৮৭

আর্যগাথা (২য়)

...

...

...

...

৪৮৯—৫২৬

আষাঢ়ে

...

...

...

...

৫২৭—৫৬৬

হাসির গান

..

...

..

...

৫৬৭—৬০১

গদ্য-রচনা

একঘরে

...

...

...

...

৬০৩—৬১১

কালিদাস ও ভবভূতি

...

..

...

৬১৩—৬৮৯

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী

...

...

৬৯১—৭১২

প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনে তখনকার কালের জ্ঞানী গুণীরা সমবেত হতেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুন্দরনী'কাব্যে জলাঙ্গী নদীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্;
সুদলিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনিয়ে উজানবাহিনী।

কার্তিকেয়চন্দ্র বাংলা, ফারসি ও ইংরেজি সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' নামে তিনি কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের আত্মচারিত রচনার আদিপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থই তৎকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' প্রসঙ্গে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' যথার্থই লিখেছিলেন :

With the glorious exception of Babu Rajendra Lal Mittra, the writers of our day have not up to this time turned their attention in this direction... We hail Babu Karticeya Chundra Roy as a pioneer in this unexplored but interesting field. It is very gratifying to find that he has made the best use of the opportunities with his long connection with one of the most ancient and distinguished families of Bengal afforded. The Chronicles of the Rajahs of Nuddea form an important contribution to the history of Bengal and on some particular periods of their history they throw a flood of light. (Hindoo Patriot, October, 4, 1875)

১৮২৫ সালে তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামক একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনচরিত'-এ বলেছেন :

প্রথমে আমি কেবল ভালবাসার গীত রচনা করিয়াছিলাম, পরে আত্মীয় বিশেষের প্রীত্যর্থ রামচরিত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া মাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য-প্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি কয়েক বিষয়ে কতিপয় গীত রচনা করি। তাহার পর ঋতু-বিশেষে গাইবার জন্য বসন্ত, বর্ষা, হোরির ও শ্রুতকর্মোপলক্ষে গাইবার নির্মিত্ত বিবাহ, পুত্রলাভ, জন্ম-তিথি বিষয়ের কতকগুলি গীত হিন্দী-গানের আদর্শে প্রস্তুত করি। (আত্মজীবন-চরিত, নতুন সং (১৩০)), পৃ: ১৮৮-৮৯)

চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, বিদ্যানুরাগ, সংগীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। পিতার চরিত্রের আদর্শেই দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস চরিত্রটি রচনা করেন। 'দুর্গাদাস' নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন : "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতামহকুল শান্তিপুত্রের অশ্বৈত্যাচার্যের বংশ। তাঁর মায়ের নাম ছিল প্রসন্নময়ী দেবী। তিনি ছিলেন অশ্বৈত প্রভুর অধস্তন নবম বা দশম পুরুষের কন্যা। স্বামী-পুত্র-পরিজন ও আশ্রিত-অভাগতদের সেবা করে তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহিণীর জীবনযাপন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত অবস্থান কালেই তাঁর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটে।

বাল্যকাল ও ছাত্র-জীবন : দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকাল কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হয়। শৈশবে ও বাল্যকালে তিনি একাধিকবার মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। একবার শৈশবে ধাত্রীর কোল থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকরূপে আহত হন, আর একবার ঢেঁকির উপর

এগার

থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেন। বাল্যকালে দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে মাতুলালয় গিয়েছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যভাবে সেবার তিনি রক্ষা পান। স্বরচিত জীবনচরিতের মধ্যে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

পারিবারিক পরিবেশ দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের সাত পুত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজেরা সকলেই ছিলেন কৃতিবিদ্যা। তাঁর তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্-এ, বি-এল্ এবং ষষ্ঠ অগ্রজ হরেন্দ্রলাল রায় বি-এল্ সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল এক সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন, তাঁর সম্পাদিত 'পতাকা' পত্রিকাও এক সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতের পত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এক সময়ে 'নবপ্রভা' নামক একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বড়দা' রাজেন্দ্রলাল রায় মেহেরপুর আদালতের পেশকার ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ছিল অসামান্য অধিকার। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

তিনি এই অতি অল্পকালের মধ্যে আমাকে এমন আশ্চর্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন যে, সেই গোড়ার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে, নিতান্ত অসুস্থ শবীর লইয়া এবং তেমন মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে পারিয়াও, পরে এম্-এ পরীক্ষায় তব্দু যা হোক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

(দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৭০)

হরেন্দ্রলালের স্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙাবোদি' মোহিনী দেবীও বিদূষী ও সুলোচিকা ছিলেন। বলাবাহুল্য, পারিবারিক জীবনের এই বিদগ্ধ পরিবেশ ও কৃতিবিদ্যা অগ্রজদের উৎসাহবাক্য ও সন্মহ আনন্দকূল্য দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন রচনায় সহায়ক হয়েছিল।

সেকালে কৃষ্ণনগরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের অন্যতম কেন্দ্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। কার্তিকেয়চন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এই পরিবেশের বর্ণনা করেছেন। মার্গসংগীতের অনন্দকূল পরিবেশের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন গড়ে উঠেছিল। সেকালের কৃষ্ণনগরের এই সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : “.. দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের মূখে অনেক গান শুনোছি। তিনি ছিলেন অতি সুকণ্ঠ ও সংগীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাংলা হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা করেছিলেন। আরও দু-চারজনের মূখে অতি মিষ্টি গান শুনোছি, তাঁদের নামও মনে আছে।”—(আত্মকথা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ : প্রমথ চৌধুরী, পৃ. ৩০)

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণশীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেছেন :

তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। সে বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের 'টেস্ট' (Test) বা 'বাছাই' পরীক্ষায় বিখ্যাত অধ্যাপক রো সাহেব ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যথাকালে পরীক্ষার্থীগণের কাগজগুলি দেখা শেষ হইলে, রো সাহেব জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—“এ ক্লাশে দ্বিজেন্দ্রলাল কোন ছাত্রটির নাম, আমাকে একবার দেখাইয়া দিন।” জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিলে, রো সাহেব দ্বিজেন্দ্রলালের সমক্ষেই

বলিলেন,—“আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে জানাইতেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এবার যে রূপ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা যে-কোনও ইংরাজ ছাত্রের পক্ষেও পরমগৌরবের বিষয়বস্তু হইত।

—(দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ. ৬১)

ছাত্র-জীবনে তিনি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন, তাই বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্-এ ও হুগলী কলেজ থেকে তিনি বি-এ পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম্-এ পরীক্ষার বছর তিনি আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘর যান। সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন :

এই সময়ে পূজ্যপাদ রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ!...আমিই সেখানে দ্বিজেন্দ্রকে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাহার পর তিনি সতত দ্বিজেন্দ্র কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত স্নানাহারের কথা মনে থাকিত না।...দ্বিজেন্দ্র প্রিয়দর্শন ও গৌরবর্ণ ছিল, গানে সুকণ্ঠ এবং সেই গান আবার নিজেই রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণবাবু তাহার নিজগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমরা তখন দুই ভাই-বোনে মিলিয়া একসঙ্গে বসিয়া ইংরাজি কবিতা পড়িতাম, আর শেলী, বায়রন, কীটস হইতে অনুবাদ করিতাম।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭০-৭৪)

পাঠ্যাবস্থাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আর্যগাথা’ [প্রথম ভাগ] প্রকাশিত হয় (১৮৮২)।

বিলাত-প্রবাস : এম্-এ পাশ করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ু পরিবর্তনের জন্য ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ মুরখার্জি সেমিনারীতে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ অগ্রজ নরেন্দ্রলাল রায় সেখানে হেডমাস্টারের কাজ করতেন। দু’মাস পরে গভর্নমেন্ট তাঁকে জানালেন যে, তিনি যদি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যেতে ইচ্ছুক হন তো, সরকার তাঁকে নিজ ব্যয়ে বিলাত পাঠাতে রাজি আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা-মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিলাত-যাত্রা করেন (এপ্রিল, ১৮৮৪)। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি ‘বিলাতের পত্র’ স্বজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘পতাকা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই পত্রাবলীতে দ্বিজেন্দ্রলালের মননশীলতা, বিশ্লেষণশক্তি, পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও স্বাজাত্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুভাগ্য ছিল। বিলাত-প্রবাসের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিচারপতি সার্ আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরবর্তীকালে লর্ড সিংহ), জেলা-জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, পরবর্তী কালের বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠতা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসকালের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, বিলিতি সংগীত শিক্ষা, দ্বিতীয়টি, ইংরেজি কাব্যের প্রকাশ। সিসিটার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহাধ্যায়ী বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেছেন :

তারপর সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম,—দ্বিজেন্দ্র একজন Embryo (কোরক) কবি—ইতিপূর্বে ‘আর্যগাথা’ বচিয়া স্বদেশের কবিজগতে প্রবেশ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। গীতবাদ্যেও যে তাহার বিশেষ অনুরাগ তাহাও শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। একদিন কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি বলিলেন—যাঁহার কাছে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ত্তে রমণীটি তাহার নাকি সুরের সংস্কার ও ভরাট গলার চর্চা করার জন্য তাহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কি ফল ফলিয়াছিল, আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৮)

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'Lyrics of Ind' নামক ইংরেজি কাব্যের প্রকাশ। এই কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন :

- বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুর্তি চাই এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুর্তি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।

(আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, প্রাৰণ ১০১৭)

বিলাত প্রবাসকালে তিনি সেখানকার বিখ্যাত রঙালয়ে প্রায়ই অভিনয় দর্শন করতেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে, রঙালয় ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়। উত্তরকালে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে লেগেছিল।

কর্মজীবন ও সামাজিক উৎপীড়ন : দীর্ঘ তিনবছর পর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে পিতৃদেব তাঁকে সামাজিক অসুবিধার কথা বলেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর বাইরে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কার্যত সামাজিক অনুর্তানাদিতে স্বজনবন্দ সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আহত হলেন। কেউ কেউ নাকি তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য দ্বিজেন্দ্রলাল ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সামাজিক উৎপীড়ন ও নির্মম আচরণ দ্বিজেন্দ্রলালের সংবেদনশীল তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ রূপে 'একঘরে' পুস্তিকায় (১৮৮৯) আত্মপ্রকাশ করেছে। তৎকালীন 'সমাজ-সংরক্ষক'দের প্রতি অব্যর্থ-লক্ষ্য বিষয়টি বর্ণিত হলেও খণ্ডকালের সামাজিক উত্তেজনার মধ্যেই এর আবেদন সীমাবদ্ধ। সাময়িক উত্তেজনায় ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি ভাষা ও ভাবগত সংযম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন : "ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যান্যকৃষ্ণ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গের ক্রুদ্ধদংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।"—(একঘরে)

দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারী কার্যে যোগদান করেন (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৬)। ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন, তাতে সাহেব খুশী হতে পারেন নি। ফলে ভাল চাকরি তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। জরিপ-জমাবন্দীর কাজ শেখার জন্য প্রায় তিনমাস তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ছিলেন। চাকরি-জীবনে উপরওয়ালাদের সঙ্গে একাধিকবার তাঁকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে উপস্থিত হতে হয়। একবার বর্ধমান-রাজের সুজামাটা পরগণায় তাঁকে সেটেলমেন্ট অফিসার করে পাঠানো হয়। উক্ত পরগণার প্রজারা সরকারী লোকদের হাতে নানাভাবে উৎপীড়িত হচ্ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যাচারিত প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য বর্ধমান মহারাজার কর্মচারী ছোটলাট সাহেবের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তাঁর উপরওয়ালা ডিরেক্টর সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বপক্ষেই মত দেন। কিন্তু ছোটলাট তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নানাভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন :

এই সময় স্যার চার্লস এলিএট্ বঙ্গদেশের লেপ্টেন্যান্ট-গবর্নর ছিলেন। তিনি উত্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয়ে তদন্ত করিতে স্বয়ং মেদিনীপুরে আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে অযথা ভৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেন্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই।...এই উত্তর শুনিয়া ছোটলাট আমার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেলমেন্ট অফিসারদিগের কর্তব্য

চৌদ্দ

বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন এবং তাহাই আইনে ('সেটেল্‌মেন্ট ম্যানুয়েলে'র নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।

(স্মরণীয় জীবনী : জন্মভূমি, কার্তিক, ১৩০৪)

দ্বিজেন্দ্রলালের কর্মজীবন কোনোদিনই সুখের হয় নি। উপরওয়ালাদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় তাঁর বহু রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি এক সময়ে চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। দাস্যবৃত্তি ও তোষামোদকে তিনি অন্তরের সঙ্গে খৃণা করতেন। তাই কর্মজীবনে তাঁর পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে প্রায় ৭।৮ বৎসর তিনি আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শকের কাজ করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে প্রায় আড়াই বছর তিনি "ল্যান্ড রেকর্ডস ও এগ্রিকালচারে"র সহকারী ডিরেক্টরের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন : স্ত্রী-বিয়োগ : ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭)

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। সুরবালা দেবী দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ-প্রসঙ্গেও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন :

কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়া-ছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণনগরের কোন এক প্রবল পক্ষ, যাহারা এ বিবাহে যোগ দিবেন তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা সহসা চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজেন্দ্র ও নবোঢ়া বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।

(নব্যভারত : প্রাৰণ, ১৩২০)

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখেই কেটেছিল। রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রীর স্পর্শে তাঁর সাংসারিক জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'সুর-ধাম' নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী দিলীপকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কন্যা মায়াদেবী। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয় (২৭ মার্চ, ১৯১৬)। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের উপর তাঁর পত্নীর প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক :

সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে তিনি যেমন 'একঘরে' নক্শার ভিতর দিয়ে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি অন্যাদিকে নব-পরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস গীতি-কবিতার স্ফটিক-পাত্রে স্বর্ণ-মদিরার মত বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-জীবনে এই দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবিচিন্তা, আর একদিকে সামাজিক অসংগতিতে ক্ষুধা সামাজিক মানুষ। কখনও-কখনও এই দুটি বিরুদ্ধ ধারা একত্রিত হয়ে কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই দুটি ধারাই কবির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। পত্নী সুরবালার প্রেম ও দাম্পত্য-রস ও অপর কোটিতে সামাজিক নির্যাতন—এই দুটি ব্যাপার একত্রিত হয়ে কবিমানসের এই স্বরূপ-ধর্মকে তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করেছে।...দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্ষ-গাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের সহজ ও অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমস্বপ্ন ও সুখ-মাধুর্যময় দাম্পত্য-জীবনকেই কাব্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

(দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ১৫)

ষোল বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান, কাব্যনাট্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বাসিত। সৃষ্টিসাফল্যের এই চরম মূহুর্তেই এলো নিদারুণ আঘাত। একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করে সুবাবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর, ১৯০৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সরকারী কাজের জন্য মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। তারযোগে সংবাদ পেলেন যে স্ত্রী মরণাপন্ন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁকে জীবিত দেখতে পারেন নি। স্ত্রীবিয়োগের এই মর্মান্তিক আঘাত থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মলাভ করেছে। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আন্তরিক ও গভীর মর্মবেদনায় কবিতাগুলি হৃদয়স্পর্শী :

এই ত ছিল দেবীমূর্তি; আলাপ, বিলাপ, হাস্য, রোদন,
কিছিল ত কাছে,
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি! দাবী কিছ',
বল কোথায় আছে?
এই যে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ?
আমি পার্লাম না ক; তবে তুমি করে দাও হে প্রভু
এ রহস্য-ভেদ।

(অষ্টাদশ চিত্র, -আলেখ্য)

পূর্ণিমা-মিলন ও ইভনিং ক্লাব : দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও মজলিশী মানুষ ছিলেন। অনেক জ্ঞানী, গুণী, সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় দুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে জানিয়েছেন :

এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।.. আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক-একবার প্রতি 'পূর্ণিমা' উপলক্ষে 'মিলন' কবা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অব্যাহতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যেমন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছুর জলযোগ—এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও!) ব্যবস্থা থাকিবে।

(দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪১০-১১)

দ্বিজেন্দ্রলালের ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে (১৩১১ খ্রীস্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সায়াহ্নে) 'পূর্ণিমা-মিলন'-এর প্রথম অধিবেশন বসে। 'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় দু'বছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর এই অধিবেশন ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালির একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। 'পূর্ণিমা-মিলন'কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আরো অনেকের বাড়িতে পূর্ণিমা-মিলনের অধিবেশন হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্য-বন্ধু ললিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র), ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'রসরাজ'-অমৃতলাল বসু, সারদাচরণ মিত্র, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালক ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্গব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ণিমা-মিলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মগ্ন করেন। লালিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ‘পুরাতন ভৃত্য’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে পূর্ণিমা-মিলনের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল ‘এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ’ গানটি রচনা করেন। ঐ অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্য থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি আবৃত্তি করে শোনান। ষষ্ঠ অধিবেশনে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মগ্ন করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল “সাথে কি বাবা বলি” গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরচিত ইংরেজি হাসির গান গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের “শুভ্রকেশ লালে লাল” হয়ে উঠেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল ‘ইভনিং ক্লাব’-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ‘কলিকাতা ইভনিং ক্লাব’-এর দু’জন উৎসাহী সভ্য—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের বিশেষ অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল এই সংস্থার সভাপতি হতে রাজি হলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সভাপতিত্বে ইভনিং ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘নন্দকুমার’, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটক এই ক্লাবের সভ্যরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা ‘কলিকাতা সংগীত-সমাজের’ সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে ‘কমলাকান্তের জবানবন্দী’ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতা’ নাট্যকাব্যের ‘কিয়দংশ দক্ষতার সঙ্গে’ অভিনয় করেছিলেন। ‘সীতা’ নাটকের অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বাঙ্গালীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

ইভনিং ক্লাব আগে ছিল কন’ওয়ালিশ স্ট্রীটে, ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের নবনির্মিত গৃহ ‘সুরধাম’-এর নিচের তলায় স্থানান্তরিত হল। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ থেকে ‘বঙ্গনারী’ পর্যন্ত তাঁর শেষদিকের নাটক-গদ্য এইখানে বসেই লেখা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ‘ইভনিং ক্লাব’ উঠে যায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও দেশাত্মবোধ : শৈশব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ‘আর্থগাথা’ [প্রথম ভাগের] কবিতাগুলির একটি অংশ দেশপ্রেম-সম্পর্কিত কবিতা। পরবর্তী কালের রচনায় এই ভাব আরো পরিষ্ফুট হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর দেশপ্রেমের দীপ্ত শতশিখায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা দেবকুমার রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন :

সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন,—বাঙ্গালীর সেই চিরস্মরণীয় ‘অরন্ধন’ ও ‘বাখী-বন্ধনে’র পূর্ণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায়—৯।।০ কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে—“কুন্তলীনের” হেমমোহন বসু (এইচ্ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া ‘বাস্ত-সমস্ত’-ভাবে তাঁহাকে বলিলেন—‘আজ সকালে গোল দীঘতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই—ছাপতে হবে।’ বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল তন্দ্রাভেদেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনাধিক দশ-পোনের মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্যরকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান—ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইহা ‘কুন্তলীন’ প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ন কালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া, বাগবাজার পশুপতি বাবুর সুবিশাল গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন; এবং সেই সম্মিলিত, প্রমত্ত জন-সমূহের মধ্যে স্বরচিত সংগীতসুধার সঞ্জীবনী স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন।

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৯)

স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তপ্ত মূহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সংগীত ও ঐতিহাসিক নাটক জাতীয় জীবনের অবরুদ্ধ বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই ভাব নবচেতনার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল :

Some of the dramas of Dwijendra Lal Roy reflected the national spirit in a most imposing manner and there was hardly any important town or village in Bengal in which one or other of his works was not staged. When presented on the stage these dramas led to popular excitement, so much so, that the Government thought it fit to suppress some of them. The national songs composed during the period by Dwijendra Lal Roy, Rabindranath Tagore, Sarala Devi Choudhurani, Mr. A. P. Sen and the late Rajani Kanto Sen smote on the heart of the people as a giant's harp, awakening out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom.

(Life and Times of C. R. Das—The story of Bengal's self expression : Prithwis Chandra Roy. pp 41-42)

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল : দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বিতর্ক ও মতানৈক্য এই শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন : “দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মতান্তর তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-সংক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ মনোবৃত্তি রুচিবোধের ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে।” (রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রবিরোধী একটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রবিরোধী দলের প্রধান পত্রিকা ছিল দুটি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ ও সাপ্তাহিক ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বেই রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

অথচ এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন, তখন তাঁকে বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আর্যগাথা’ (দ্বিতীয় ভাগ) ‘আষাঢ়ে’ ও ‘মন্দ্র’ কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর ‘বিরহ’ প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন : “সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই একান্ত পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।” (দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ২৬২)। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয়নি (রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮২)।

কিন্তু দুটিভঙ্গির পার্থক্যই রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের মূল কারণ। “রবীন্দ্রনাথের আত্মভাব-মুগ্ধ কম্পচারণা, সংকেত-ব্যঙ্গনার আলোছায়া ও সুগভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের সমর্থন পায় নি; কারণ কবিমানসের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন মার্গের পথিক।” ১৩১১ সালে প্রকাশিত ‘বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, তাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তীব্রতর আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ছিল দুটি : প্রথমত, রবীন্দ্রকাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের মতে অস্পষ্ট, দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন। বছর দুই-দুই কবির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের ‘গেছার’ এক সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশ করেন (বাণী, কার্তিক ১৩১৭)। তাতে অনেকেই এই বিরোধ অবসানের আশা করেছিলেন। অবশ্য সমর্থকদের মধ্যে তখনও মসীযুদ্ধ চলছিল। ঘটনাটি

আঠার

চরমে উঠল দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডি রচনার পর থেকে। এই প্যারডিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অশোভনভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে কশাঘাত করার স্বপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল যতই যুক্তি দেখান না কেন, রঙ্গালয়ের দর্শকেরা কেউ সেদিন এই ব্যক্তিগত আক্রমণকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকায় যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল : "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বাঙ্কমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" (সূচনা : ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০)। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু : ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁকুড়ায় বদলি হন। সেখানে তিন মাস কাজ করার পর তিনি বদলি হন মুম্বইয়ে। বাঁকুড়া থেকে মুম্বইয়ের যাত্রাকালে কলকাতায় এসে তিনি সন্ধ্যাস রোগে আক্রান্ত হন। মোডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যালভার্টের চিকিৎসাধীন হয়ে তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য এক বছর ছুটি নিতে বাধ্য হন। চাকুরির উপর তিনি কোনো দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাছাড়া দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরির জীবন সুখের হয়নি, স্ত্রীবিয়োগের পরে এই বেদনা চরমে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষজীবনের মানসিক অবস্থা একখানি চিঠিতে ফুটে উঠেছে :

জীবনপথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারদিক থেকে শূন্য ঔদাস্য ও অবসাদ যেন আমার ঘিরে ফেলছে। 'সংসার অসার' আগে বিচাবে ও অনুমানে বৃদ্ধতাম,—এখন প্রতি পদে হাড়ে হাড়েই বৃদ্ধি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগালিপ্সার এখন আর তিলার্থ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি?

(গয়া থেকে দেবকুমারকে লিখিত চিঠি, ১৩ জানুয়ারি, ১৯০৭)

অবসর গ্রহণ করার কিছুকাল আগে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশ করার ভার নিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে সহায়তা করার জন্য সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যার জন্য (আষাঢ়, ১৩২০) 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, তাছাড়া ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের পূর্বেই তিনি সন্ধ্যাস রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, শনিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা)। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা পরে "শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায়" "সুরধামে" তাঁর মৃত্যু হয়।

সেদিন শনিবার—পূর্ব হইতেই কথা ছিল যে, সেদিন দ্বিজেন্দ্র ও প্রসাদদাসবাবু, রায়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যাইবেন।...প্রসাদদাসবাবুকে বাটতে গিয়া রায়ে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পাঠাইলেন। প্রসাদদাসবাবুকে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্র তাঁহার 'সিংহলবিজয়' নাটকের পান্ডুলিপি সংশোধন করিতে লাগিলেন; সেদিন বেলা দুইটা হইতে দ্বিজেন্দ্র ঐ পান্ডুলিপিখানি দেখিতেছিলেন। সেই পান্ডুলিপি দেখিতে দেখিতে দ্বিজেন্দ্র যেমন ঢালা বিছানায় তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই, দুই হাত মস্তকের উপর সোজা করিয়া দিয়া তাকিয়ার শূন্য তিনি আলস্য ভাঙিলেন। তাঁহার বাটতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ক্লাবের দুইজন সভ্য যুবক ঠিক সেই সময় আশ্রয়, পার্শ্বের কক্ষে বিলিয়াড খেলিতে আসিলে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিলেন। কয়েক মিনিট পরেই তাঁহারা শূন্যতে পাইলেন, দ্বিজেন্দ্র ডগ্ন ও জড়িতস্বরে 'boy' বলিয়া ডাকিলেন। সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহারা স্বরিতপদে আসিয়া দেখেন, দ্বিজেন্দ্র অচেতন হইয়া গিয়াছেন।

উনিশ

চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্রমে দ্বিজেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, তাহার শব্দর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সপত্র (ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার) আসিলেন। চিকিৎসার চেষ্টা হইল না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের আর জ্ঞান হইল না। তিনি একবার মাত্র 'মন্টু' বলিয়া জড়িতস্বরে তাহার প্রাণাধিক পত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে ডাকিয়া-ছিলেন—সেই তাহার ইহজীবনের শেষ কথা; তাহার বিলুপ্ত সংজ্ঞাও আর ফিরিয়া আইসে নাই।
(দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ. ৩৬১)

মৃত্যুর পরে : দ্বিজেন্দ্রলালের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২০) তার বিপুল জনসমাবেশ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

পরিষদের কার্যবিবরণী (১৩২০) থেকে জানা যায় : “অপরাত্নে ৩টা হইতেই লোক-সমাগম আরম্ভ হয়। প্রায় ৪টার সময় পরিষদের বিরাট সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বিভিন্ন তলের তিনটি পৃথক অধিবেশনেও বিরাট জনসংঘের স্থান-সংকুলান অসম্ভব হওয়ায় নিকটস্থ পরেশনাথের বাগানে সভা করিবার প্রস্তাব হইল।...কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরেশনাথের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। তিন সহস্রেরও উপর লোকসমাগম হইয়াছিল। পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষেও এত লোকসমাগম হয় নাই।” একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় : “সেই জনতার বন্যা দেখিয়া স্বর্গীয় সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের সম্পাদক) বন্ধুদের আমাকে বলিয়াছিলেন,—‘আর সভার দরকার কি? এই ত হয়ে গেল! আর কি চান?’ সত্যই সেই বিপুল জনসংঘ দর্শন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গুণগ্রাহীদের মন, সেই বিষাদ বেদনার সময়েও এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।” (দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ. ৩৬৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ১৩২০ সালের ৯ই শ্রাবণ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে আর একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমসাময়িক বহু পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভা ও ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতাও প্রকাশিত হয়। টাউন হলের স্মৃতিসভায় ললিতচন্দ্র মিত্র-রচিত যে গান গাওয়া হয়, তা ‘গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা’ হলেও সকলকে মুগ্ধ করে :

যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ তোমারি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর।
আমরা পূর্জিব প্রতিমা তোমার—মানুষ আমরা নহিত মেঘ,
জ্যোতি তোমার, ধর্ম তোমার, সাধনা তোমার ব্যাপিবে দেশ।

(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০)

PKR/16/20

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : সাহিত্য-সাধনা

নাটক ও প্রহসন

ভূমিকা : দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও গীতিকার হিসাবেই সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা অসামান্য। বাংলা নাটকের মধ্যে তিনি উন্নত রূচির একটি পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন :

...দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোদ্যম-সুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা রঙ্গমণ্ডের নাট্যাদর্শ—তাহার একদিকের দুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্যের স্রোত এবং অপর দিকে সেই জীবনাবেগবর্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহ্বলতা ও পাপপুণ্য-সংস্কারের তামসিক আদর্শ—সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যাঙ্গনের আদর্শ উন্নত ও রূচি মার্জিত করিয়া এবং নাটক রচনার কাব্যসংগত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত-সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেকে পৌরুষ ও মনুষ্যসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।

(সাহিত্য-বিতান : দ্বিতীয় সং, ১৩৫৬ পৃ. ৯০)

নাট্যসাহিত্য ও অভিনয় সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই উল্লেখ করেছেন :

বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক শোখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর *Cato* এবং Shakespeare-এর *Julius Caesar*-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আঁসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমণ্ডে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমণ্ডসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।

(আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে প্রহসনের মাধ্যমে। তাঁর সর্বপ্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালকে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন রচনার কাল বলা যায়। এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরূচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি-অবতার'—একখানি প্রহসন গদ্য-পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি। তৎপরে উক্তরূপে 'গ্রন্থস্পর্শ' রচনা করি এবং উহাও স্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

(আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭)

সমাজ-বিদ্রাট ও কল্কি-অবতার (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) : দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি-অবতার'। নাট্যকার নামটির সঙ্গে 'সমাজ-বিদ্রাট' যুক্ত করে বর্ণিত বিষয়কে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'একঘরে' নকশায় বর্ণিত সমাজবিদ্রূপের তীব্রতা এখানেও আছে। নকশাটিতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তীব্রতর, ক্ষেত্রও সংকীর্ণ, কিন্তু প্রহসনটির ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত। 'একঘরে' নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু 'কল্কি-অবতার' অভিনন্দিতই হয়েছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (পৃ. ৬৮) লিখেছেন : "একঘরে পাঠ করিয়া কবির হিন্দুসমাজভূক্ত

আত্মীয়রাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'কাল্কি-অবতার' পাঠ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের নেতা 'বঙ্গবাসী'ও লিখিয়াছিলেন—“এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।”

প্রহসনখানিতে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, পণ্ডিত ও বিলাত-ফেরত—এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষিত হয়েছে। যখন এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, তখন ব্রাহ্মের অনুরোধে বিষ্ণু কাল্কিরূপে অবতীর্ণ হলেন। কাল্কির এই মধ্যস্থতায় বিক্ৰমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন স্থাপিত হল। কাল্কিদেব তাঁদের দিলেন বিশ্বাস, প্রেম ও মনুষ্যত্বের মন্ত্র :

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টিংকে থাকে
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজটাকে রাখে।

'কাল্কি-অবতার' স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতা ও মানুষ—প্রভূতি আপাতবিরোধী বিচিত্র উপকরণে রচিত হয়েছে। দেবলোক ও মানবলোক এখানে একই সমাজভক্ত। বিদ্রূপাত্মক রচনার এই পদ্ধতি অবশ্য নতুন নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের ভূমিকায় অবশ্য এর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন :

স্থানে স্থানে দেব-দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিদ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবী বিষয়ক একটু একটু কথার অবতারণা অপরিহার্য। কারণ, হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বস্তুমবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর লেখনীপ্ৰসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন “ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না” এরূপ রহস্য আবাল-বৃন্দ-বর্গিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা।' অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন, অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

এই কৈফিয়ৎ ছাড়া নাট্যকার আরো বলেছেন যে, তিনি এখানে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করেন নি—সমাজের সর্বশ্রেণীর দোষত্রুটিকেই তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। লেখকের এ কৈফিয়ৎ মিথ্যা নয়। কারণ বিদ্রূপের তীব্রতা যতই থাক না কেন, বিদ্রূপের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়ার জন্য উপভোগ্য হয়েছে। চরিত্রগুলি পূর্ণতর নয় 'স্ক্বেচ'ধর্মী। রাজার কুলপুরুষোচিত বিদ্যানিধির পরিকল্পনাটি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। এই 'সূর্যসিক' পণ্ডিতটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কাল্কি-অবতার' প্রহসন হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়। সংলাপ দুর্বল, চরিত্রও সব সময় অনিবার্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মত 'কাল্কি-অবতার'-এরও প্রধান ঐশ্বর্য এর হাসির গানগুলি। সংগীতাংশ বাদ দিলে প্রহসনটি নিতান্ত বিশেষত্ববির্জিত। হাসির গান রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালেরই আর একদিক তাঁর প্রহসন। সংলাপধৈচর্য, চরিত্র ও ঘটনার উদ্ভট সমাবেশ থেকে তাঁর হাস্যরস উদ্ভূত হয় নি—স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গানই তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রাধান্য প্রাপ্ত করেছে। প্রথম অভিনয়, দ্বিতীয় অভিনয়—প্রকৃতপক্ষে দুটি অঙ্কের স্থান অধিকার করেছে। আলোচ্য প্রহসনে সত্যিকারের কোনো অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। অবশ্য প্রহসনের কাহিনীভাগ অকিঞ্চিৎকরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি বাঁধন থাকা উচিত। 'কাল্কি-অবতার'-কে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলা যায়, চিত্রগুলি ঘনবন্ধ হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিবেগের সৃষ্টি করেনি। ফলে প্রহসনটির গতিবেগ (action) মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়েছে। সরব ও উচ্চকণ্ঠ হাসি খন্ড-খন্ড দৃশ্যের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তা বিচ্ছিন্ন চিত্র হিসাবেই উপভোগ্য হয়েছে। সুতরাং 'কাল্কি-অবতার'-কে পূর্ণাঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন কতকগুলি প্রহসন না বলে কতকগুলি কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলাই অধিকতর সঙ্গত। 'কাল্কি-অবতার'-এর সর্বশেষ সমবেত সংগীতটির মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনদর্শনই উদ্ঘাটিত হয়েছে :

বাইশ

ছেড়ে দলাদলি' কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

'কল্কি-অবতার' প্রহসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত বিধি অতিক্রম করে ছন্দের ক্ষেত্রে যে অভিনবত্ব তিনি আনতে চেয়েছিলেন, তার সর্বপ্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় 'কল্কি-অবতার' প্রহসনটির প্রস্তাবনায়। এখানে লেখকের বক্তব্য ও বক্তব্যের রীতি দুই-ই লক্ষণীয় :

গদ্য কি পদ্যই আগে বেশ চৌন্দয়
চেনা যেত, কি প্রকাবে হোল আবার অদ্য এ ?
বোল্লিকামি, বেয়াদাবি, বেআক্কোলি সদ্য এ ;
'এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কানের উপর বিশ্বাস ?'
হয়ত বলতে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিঃসন্দা ;
থাকলেই বা একটুখানি বোল্লিকামির গন্ধ।

বলাবাহুল্য, নিতান্ত কৌতুকহলে প্রহসন রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এক অভিনব কাব্যরীতি আবিষ্কার করেছেন। পরবর্তী কালের রচনায় এই রীতির পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়।

বিরহ (১৮৯৭) : দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ'। এই প্রহসনটি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গপত্রে তিনি হাস্যরস ও প্রহসনের স্বরূপধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন :

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহোদয় করকমলেষু।

বন্ধুবর !

আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়ের দুটি দিক আছে।—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিরহবেদনাপ্লুত বিরহের কবুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—“মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী” হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুইপ্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক, সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক, প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন এক, কোন ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু অধিকমাত্রায় দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি অপ্রাকৃত—অপরটি প্রাকৃত বৈষম্য। স্নায়ু বিশেষের উত্তেজনার দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিহ্নটি কাটিয়া করুণরসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর! হাঃ হাঃ হাঃ বা মূখভঙ্গী করিয়া হাসানের নাম ভাঁড়ামি, এবং ওগো মাগো বলিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্বেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গান-মাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থানবিশেষে উভয়ই উচ্চ সূকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অপায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যরস অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমার শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমর্তিবিস্তরেণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'কল্কি-অবতার' প্রহসনে সামাজিক বিদ্বেষের সূত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'বিরহ' 'বিশুদ্ধ প্রহসন'—এর মূল রস বিদ্রুপ (Satire) নয়, কৌতুক (Fun)। আখ্যায়িকাভিন্যাসকে এখানে ঘোরালো ও জটিল করে তোলা হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে একটি উপকাহিনী যোগ করে

তেইশ

লেখক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটি জটিলাবর্তের সৃষ্টি করেছেন। প্রহসনটি হাস্যরস সংলাপ ও চরিত্র থেকে উৎসারিত হয় নি, ঘটনার ঘোরপ্যাঁচ ও উদ্ভটত্বই হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। প্রোট গৌবিন্দ-মুখোপাধ্যায় ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের কুরূপা স্ত্রী নির্মলার কৌতুককর দাম্পত্য কলহ দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত করা হয়েছে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিরহের জ্বালায় গৌবিন্দর খাওয়া বেড়ে গেল, ক্রমশ তিনি স্থূলকায় হতে লাগলেন। রূপসী শালিকার জন্য ফটো তোলার আগ্রহের মধ্যে স্থূলবৃদ্ধি গৌবিন্দ-চরিত্রের কৌতুককর অসংগতি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ইন্দুভূষণ ও চপলার ষড়্‌যন্ত্রই কাহিনীর মধ্যে গতিসঞ্চার করেছে। ইন্দুভূষণ-প্রেরিত ফটোতে নির্মলার চেয়ারের ঠিক পিছনে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে স্ত্রীর বন্ধু শরৎ হালদার-বেশী গোলাপীর ছবি গৌবিন্দকে সন্দেহ করে তুলেছে। ভৃত্য রামকান্তকে নিজের পুনর্বিবাহের মিথ্যা খবর দিয়ে গৌবিন্দ সুকৌশলে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থূলবৃদ্ধি রামকান্ত ভাগীরথীর ঘাটে গোলাপীর কাছে প্রণয়নিবেদন করতে গিয়ে মূর্খবের কৌশলের কথা সব বলে দিয়েছে। গোলাপীর কাছে চপলা ব্যাপারটা জানতে পেরে, পুরুষবেশ ধরে সে গৌবিন্দকে এমন করেই ঠকিয়েছে যে, এক প্রকল হাস্যবেগের মধ্যে কাহিনীর মিলন-মধুর উপসংহার ঘটেছে।

নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন যে তিনি এখানে 'বিরহের হাস্যকর অংশটুকু' দেখাবেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। নাটকের প্রথম দিকে দু-তিনটি দৃশ্যে বিরহের হাস্যকর অসঙ্গতির কথা থাকলেও সমগ্র প্রহসনের পক্ষে উক্ত অংশ নিতান্তই গোঁগ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে গৌবিন্দের মনে অমূলক সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে হৃদয়নাথ চৌধুরী-বেশে চপলার আবির্ভাব পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে বিরহের কোনো হাস্যজনক অংশ দেখানো হয় নি। জটিল ঘটনাবৃত্ত রচনা করতেই প্রহসনরচয়িতার যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে— তাঁর আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়েছে। দ্বিতীয়ত, রামকান্ত-গোলাপীর কাহিনী প্রয়োজনানুসারে রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে, ফলে নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্য অনেকখানি চাপা পড়েছে। নাট্যকারের অভিপ্রায়কে গোঁগ করে প্রহসনের শেষদিকে উপকাহিনীর বৈচিত্র্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইদিক থেকে বিচার করলে 'বিরহ' নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। গোলাপী চরিত্রটির মধ্যেও অসঙ্গতি আছে—চাষার মেয়ে বলে তাকে চেনা যায় না। বোকামিতে-চালাকিতে মেশানো রামকান্তের চরিত্রটি ভালো ফুটেছে। প্রহসনটির দৃশ্যসংস্থানের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—কৃষ্ণনগরে গৌবিন্দের বাড়ি, হাঁসখালিতে চূর্ণী নদীর একটি নিভৃত ঘাট, হুগলীর একটি ঘাটের সমীপবর্তী পানের দোকান, হুগলীর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির অন্তঃপুর প্রভৃতি চারটি দৃশ্যান্তর আছে। প্লটকে জটিল করার জন্যই দৃশ্যবৈচিত্র্যের অবতারণা করা হয়েছে। অন্তঃপুরিকাদের তাস খেলা দৃশ্যটি সম্ভবত 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুরূপ দৃশ্যটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রহসনটিতে গানগুলিই কৌতুকরস জমিয়ে তুলেছে। 'এস এস বন্ধু এস'-র মত কীর্তনের প্যারডি রচনা করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিরহ' প্রহসনটি 'রোমান্টিক কমেডি'র লক্ষণাক্রান্ত।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯ জানুয়ারি, ১৯০২) : 'প্রায়শ্চিত্ত' 'বহুং আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। আলোচ্য প্রহসনটি সমাজবিদ্‌মূলক। তিনি প্রহসনটি উৎসর্গ করেছেন বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন : "বিলাতফের্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে—তাহা তোমাকে স্পর্শ করে নাই।" বিলাতফেরত সমাজের 'অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা'র চিত্র আঁকাই প্রহসনটির উদ্দেশ্য। প্রহসনটির মধ্যে তিনটি কাহিনী গ্রথিত হয়েছে : সম্মতিক নব্যহিন্দুদের কাহিনী, ইন্দুমতী সরোজনী ও বিনোদবিহারীর কাহিনী ও চম্পটি সাহেবের কাহিনী। বিলাতফেরত সম্প্রদায়ের আচার আচরণের আতিশয্য, নব্যহিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার উৎকট প্রচেষ্টা ও শিক্ষিতা মহিলাদের শিক্ষার নামে কুশিক্ষাকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বিলাতফেরত চম্পি ও নব্যহিন্দুদের উৎকট সাহেবিয়ানার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ-ব্যাপারটিকে যত্ন করে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থালিস্, হীনচরিত্র ও ব্যর্থ ব্যারিস্টার চম্পিটিকে ও ধনী বিধবা ইন্দুমতীর উৎকট রোমান্সগ্রন্থতাকে সমভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিনোদবিহারী ও সরোজিনীর ষড়্‌যন্ত্রই চম্পিটিকে ও ইন্দুমতীকে শিক্ষা দিয়েছে। একদিকে যেমন উগ্র সাহেবিয়ানার পরিণাম দেখানো হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নব্যহিন্দুদের ও তাঁদের স্ত্রীদের মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যে, চম্পিটিকে একেবারে খাঁটি হিন্দুতে পরিণত হয়েছে—তার হাতে এক হুকো। তর্কপণ্ডানন তাকে গোময় ভক্ষণ করে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। নাটকের শেষদিকে পরিবর্তিত চম্পিটের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন : “দেখাচ্ছি যে বিলাতি চালের চেয়ে বাঙালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙালীর বাঙালীয়ানাই বহুৎ আচ্ছা।” কিন্তু চম্পিটের এই পরিবর্তনকে নিতান্ত আকস্মিক মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে চম্পিট যখন ইন্দুমতীকে পরিত্যাগ করেছে, তখন তার কথার মধ্যে আর যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, মনেপ্রাণে বাঙালী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় নি। চম্পিটের এই পরিবর্তনকে কার্যকারণসম্মত করে তুললে উপসংহার আরো সঙ্গত হত। দ্বিতীয়ত, প্রেম ও বিবাহসম্পর্কিত মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সকে কটাক্ষ করা হয়েছে। চম্পিট বলেছে : “আমি দু’বার বিয়ে করেছি—একবার প্রেমের জন্যে, আর একবার টাকার জন্যে, দু’বার ঠকেছি। Logically দাঁড়াচ্ছে যে বিয়ে করাটাই mistake.” রোমান্সরোগগ্রন্থতা নায়িকা ইন্দুমতীর উৎকট প্রেমোন্মাদনাকেও পরিহাস করা হয়েছে। ইন্দুমতীর উৎকট আচরণ ও উক্তি প্রবল হাস্যবেগ সঞ্চার করে : “চম্পিট! চম্পিট! চম্পিট! [মুখ ঢাকিয়া]—আহা কি মধুর নাম। চেহারার উপযুক্ত নামই বটে।...আর গলার আওয়াজ ঠিক যেন—একেবারে চিটি জুতো। আর নাক। আঃ কি নাক।—চম্পিট হে, তোমার পোষাক ভালো, নাম ভালো, গলার স্বর ভালো—কিন্তু সবচেয়ে ভালো তোমার নাকটা।”

শিক্ষিতা রোমান্সগ্রন্থতা নায়িকা চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি বর্ণনা বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম জ্যোতির্নন্দনাথের প্রহসনেই লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতির্নন্দনাথ তাঁর ‘অলীকবাবু’ (১৮৭৭) প্রহসনের হেমাঙ্গিনী চরিত্রে সর্বপ্রথম এইজাতীয় চরিত্র একেইছিলেন। পরবর্তী কালে অমৃতলাল বসু তাঁর একাধিক প্রহসনে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ও চরিত্র একেইছেন। তবে অমৃতলালের প্রহসনে বিদ্রুপের ঝাঁজ অনেক বেশি। দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে “ইন্দুমতীর গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান”—নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ ঠিক তার আগেই সে চম্পিটের কাছ থেকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এ সময় তার পক্ষে গান গাওয়ার মত মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়।

‘প্রায়শ্চিত্ত’ প্রহসনের ভূমিকা পড়ে মনে হয়, নিজের এই সৃষ্টি সম্পর্কে নাট্যকারের একটি উচ্চধারণা ছিল। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের ‘ভূমিকা’য় লিখেছেন :

প্রায়শ্চিত্ত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ক্লাসিক থিয়েটারের কতৃপক্ষগণ পুস্তকখানিকে অভিনয়ের পক্ষে অতি দীর্ঘ বিবেচনা করিয়া অভিনয়কালে প্রথম সংস্করণের কতক অংশ বর্জন করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমিও উক্ত অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। একটি নূতন গীতও এই নূতন সংস্করণে প্রকটিত হইল। তাহা অভিনয়কালে গীত হয় না।

অনেকে এই পুস্তকখানিকে প্রহসনরূপে অভিহিত করেন। আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রম। হাস্যবহুল নাটক মাত্রই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে Moliere-এর Comedies গুলিও প্রহসন। আমি এই গ্রন্থে বিলাতফেরতা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটি ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা অতিরঞ্জিত নহে। সেই ছবির backgroundটি অতিরঞ্জিত বটে। কিন্তু মূলকেন্দ্রীয় ছবিটি ব্যক্তিগত না হইলেও প্রকৃত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এ পুস্তকখানি বিশ্বজনসমাজে সমাধিক আদর পাইয়াছে। তাহার নিমিত্ত আমি উক্ত সমাজের নিকট কৃতজ্ঞ।

লেখকের এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তাঁর মতে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ প্রহসন নয়, কমেডি। শুধু তাই নয়, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা মোলিয়ারের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। কিন্তু

মোলিয়েরের প্রহসনগুলিকে 'হাস্যবহুল নাটক' বললে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচারই করা হবে। তাঁর 'জীবনবোধের সার্বভৌম গভীরতা' রচনাগুলিকে তথাকথিত লঘুরসের প্রহসনেই পরিণত করেনি, উচ্চাঙ্গের কমেডিতে পরিণত করেছে। মোলিয়েরের কমেডি সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে :

It is comparatively easy to attain those broad farcical effects which fill the groundlings with hilarity. But true comedy is a difficult business, harder even than tragedy, because, in art as in life, laughter is so perilously akin to tears... The author must seize and fix the universal and eternal truth which lies at the root of human conduct. This Moliere achieved. He does more than reflect life; he interprets its hidden significance. It is just because he extracted this rare essence from his own soul and from his experience of the world about him, that his great comedies are immortal.

[*Moliere's Comedies* (Everyman's Library) Edited by F. C. Gren, Vol. I, Introduction, Pages XII-XIII]

বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে এ বিচার প্রযোজ্য নয়। মোলিয়েরের আদর্শে উদ্ভুদ্ধ হলেও, আসলে এটি উচ্চতর কমেডি নয়, প্রহসনই। অবশ্য হাসির গানগুলির আবেদন যথার্থই উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত'-ই সবচেয়ে নাট্যগুণ-সমৃদ্ধ।

পাষণী (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০) : প্রহসন বাদ দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম নাটক 'পাষণী'। তিনি নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন :

যে কারণে আমি প্রহসন লিখতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনূরূপ কারণে আমি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙালা ভাষায় নাট্যসাহিত্যের স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তুগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, প্রাচীন, ১০১৭)

'পাষণী'-কে নাট্যকার 'গীতি-নাটিকা' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু 'পাষণী'কে গীতিনাট্য না বলে কাব্যনাট্য আখ্যা দিলে অধিকতর সঙ্গত হত। নাটকখানি উৎসর্গ করেছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস-কে। পুরাণকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে তিনখানি নাটক লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গিরিশচন্দ্র-অনুসৃত ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতাকে অনুসরণ করেন নি। যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি পুরাণ-কাহিনীকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এর অলৌকিক আবরণ উন্মোচিত করেছেন। তাই তাঁর পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলিতে দেবদেবীর অলৌকিক জীবনাচরণের কথা নেই, আছে নরনারীর বাস্তবজীবনের মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী ও সংস্কারমুগ্ধ 'পুরাণের নব-রূপায়ণ' পদ্ধতিটি চরম রূপ লাভ করেছিল।

বলাবাহুল্য পুরাণকে বিকৃত করার অপরাধে নীতিবাগীশ মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষণী' ও 'সীতা' নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তিনি বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের প্রতি এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

...কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষণী" নাটকের সমালোচনার কাহিনীছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যেহেতু, অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যাভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গোতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাহার বাস্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা

ছান্দশ

হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাস্মীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ তাহা জানিবার জন্য কোতূহলপরবশ হইয়া (“দেবরাজকুতূহলাৎ”) কামরতা হইয়াছিলেন।...আমি শুদ্ধ আধুনিক দায়িত্বশূন্য সমালোচনার উদাহরণস্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

নাট্যকার তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও তিনি যে রামায়ণ-কাহিনী সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নাটকে গোতম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন প্রবাস-যাত্রা করেছেন সেই সময় অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। নাটকে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করেছে। নাটকের শেষাংশে নাট্যকার নিজস্ব কল্পনার উপরেই বেশি নির্ভর করেছেন। গোতমের অভিসম্পাত বিবরণটি নাট্যকার মোটেই গ্রহণ করেননি। রামায়ণে বর্ণিত আছে, যে, গোতম ইন্দ্র ও অহল্যার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁদের দুজনকেই অভিসম্পাত দিলেন। ঋষিশাপে ইন্দ্র ‘বিফল’ হলেন এবং অহল্যা ‘নিরাহারা’ ও ‘ভস্মশায়িনী’ হলেন (রামায়ণ। বালকান্ড, অষ্টচত্বারিংশ সর্গ : ২৭-৩০ সংখ্যক শ্লোক)। পরে রামলক্ষ্মণ মিথিলাগমনকালে যখন গোতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন অহল্যার মৃত্তি ঘটল। রামলক্ষ্মণ অহল্যার পাদবন্দনা করলেন, অহল্যাও ‘সমাহিতচিত্তে তাঁদের সংবর্ধনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আতিথ্য করলেন।’ গোতম অহল্যার সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাহিনীটিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবধর্মী ও মনস্তত্ত্বসম্মত করার চেষ্টা করেছেন। অভিশাপ বৃত্তান্তটি তিনি পুরাণানুযায়ী বর্ণনা করেন নি—সম্ভবত; তাঁর কাছে এই ব্যাপারটি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকে গোতমের আশ্রম প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়েই ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বতের নিজর্ন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যার সুখ-সন্তোষ, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাটা পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে গোতম ও চিরঞ্জীবের শূশ্রূষা, পতি-পুত্র-বিরহিত আশ্রমে মনোবিকারগ্রস্তা অহল্যার প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ অনুমোদিত নয়।

‘পাষণী’ নাটক রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রামায়ণ-কাহিনীর যে পরিবর্তন করেছিলেন, তাতে তাঁর মনোজীবন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক অপরাধ ও পাপ সম্পর্কে তিনি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অহল্যার ব্যভিচারকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু নৈতিক প্রতিবিধানের মধ্য দিয়ে শাস্ত্র-সংস্কারকেও তিনি প্রাধান্য দেননি। অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকে তিনি তাঁর মনোজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-জর্জরিত অর্ধোন্মাদনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। গোতমের পবিত্র ভালবাসা ও ইন্দ্রের কামলদুষ্খতা—এই দুয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই দেখা দেয় নি। এমনকি, ইন্দ্রের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের পরেও স্বামী প্রেম তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় নি, তার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যানজনিত নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাখ্যাতা অহল্যার হৃদয়বন্দনের মধ্যে গোতমের প্রতি আকর্ষণটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে নাটকীয় উদ্দেশ্য সার্থকতর হয়ে উঠতে পারত।

গোতম-অহল্যা-ইন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে নাট্যকারের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই জয়যুক্ত হয়েছে। নাট্যকার অহল্যার যৌবনবেদনার ছবিটিকে সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। তাঁর অতৃপ্ত যৌবন-বেদনার একটি সঙ্গত কারণ দেখানো হয়েছে। বৃদ্ধ গোতমের জ্ঞানপিপাসু আত্মমগ্ন চিত্ত অহল্যার মনকে কোর্নাদিন পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। মাধুরীর কাছে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণয়নযোগ্য :

তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
ধার্মিক। মাধুরী! কিন্তু রমণীহৃদয়
তাঁর প্রার্থী নহেঁ সখি। থাক কাজ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বৃদ্ধিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুভূতাপে? [সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস]

অহল্যার পদস্থলনকে নাট্যকার কোন আকস্মিক ব্যাপার করে তোলেন নি, অহল্যার অতৃপ্ত

স্বৈকনবেদনা ও তাঁর ভোগকামস্বপ্ন একটি মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে ইন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকারেই অহল্যা বলেছেন : “আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর।” এখানে অহল্যার মনে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত মূহুর্তের জন্যও উদ্ভিত হয় নি। মদন ও রত্নের আবির্ভাব ঘটিয়ে অহল্যার মনে তাদের প্রভাবকে দেখালেও, এই অংশটি আকস্মিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

অহল্যাকে নাট্যকার প্রণয়মুগ্ধা নারী হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। যুগযুগান্তরের সংস্কারকে অতিক্রম করে তিনি নারী-পুরুষের বিষমতময় স্বেচছিন্ন প্রেমকেই চূড়ান্ত করে তুলেছেন। নাট্যকারের সংস্কারমুগ্ধ নিষ্ঠুর দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি অহল্যাকে ‘দেবী’ বা ‘তপস্বিনী’ করতে চান নি—তিনি নারী, এইটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইন্দ্রের কাছে পরিচয়দানকালে অহল্যা বলেছেন :

মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শূন্য নারী,
কোন নাম নাহি মোর।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকে তাঁর বাধাবন্ধনহীন রোমাঞ্চিক কবিস্বপ্নই জয়যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য পুরাণের প্রচলিত নীতি-নির্দেশ অস্বীকার করার জন্য এ নাটকের অনেক বিবৃদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। এমনকি কবির জীবিতকালে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয় নি :

একবার ষ্টার থিয়েটারে নাটকখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারে তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটকটি অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতবাবু কথামত নাটকটির পাত্রপাত্রীদের নাম বদলাইয়া দিতে সম্মত হইলেন নাই। কবির জীবিতকালে ঐ নাটকখানি কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। কেবল একবার রাণাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের উদ্যোগে স্থানীয় Happy Club কর্তৃক উহা অভিনীত হয়। রাণাঘাটে অভিনয়স্থলে দ্বিজেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

(দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ. ১০০)

‘পাষণী’র কোন কোন অংশে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় থাকলেও, নাটক হিসাবে এর দুর্বলতা অস্বীকার করা যায় না। গভীর নিশীথে সদ্যোজাগ্রত পুত্র শতানন্দকে কামমোহিতা জননী নিষ্ঠুর হত্যা-প্রচেষ্টা, আত্মগ্নানিতে বন্ধে ছুরিকাঘাতের সংকল্প, ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা—প্রভৃতি উত্তেজক দৃশ্যগুলি নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী ও আকস্মিক। কিন্তু চিরঞ্জীব-মাধুরীর উপকাহিনী যুক্ত হয়ে নাটকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। দস্যু চিরঞ্জীব মহর্ষি গোতমের প্রভাবে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, মিথিলার বারাঙ্গনা মাধুরীও গোতমের সান্নিধ্যে এসে পরিবর্তিত হয়েছে। নিষ্কাম প্রেমসাধনা, পাতিত্রত্যা ও সেবারতই মাধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। চিরঞ্জীব চরিত্রের আপাত-রসিকতার অন্তরালে একটি গভীর দিক আছে। “এই নাটকে পৌরাণিক ভাবাদর্শ নেই সত্য, কিন্তু নাট্যকারের সামাজিক আদর্শ পরিষ্ফুট হয়েছে। পরপুরুষাসক্তা ব্যভিচারিণী নারীও ক্ষমার অযোগ্য নয়, এমন কি বারাস্কনাকেও সমাজ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলে তার মধ্যে আদর্শ পত্নীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় সামাজিক ভাবাদর্শ ‘পাষণী’ নাটকের মূল বক্তব্য। সুতরাং রামায়ণ-কাহিনীর ছায়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব সমাজচিন্তাই পরিবেশন করেছেন।”

তারাবাই (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) : দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক ‘তারাবাই’। এই নাটকখানি তিনি “মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের করকমলে” উৎসর্গ করেন। নাট্যকার ভূমিকায় লিখেছেন :

এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বরীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণকবি দ্বারা রাজপুত্রদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে।
“when they assemble at the feast after a day’s sport, or in a sultry evening

spread the carpet in the terrace to inhale the leaf or take a cup of Kusumla, the tale of Prithwi recited by the bards in the highest treat they can enjoy.”

আশ্চর্যের কথা এই যে, এ মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।

আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত “রাজস্থান” হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ নাটক ইতিহাস নহে। কোন কোন সমালোচক এইরূপ অনৈক্য লইয়া অনেক কাল ও কাগজ খরচ করেন দেখিয়া এ কথাটি বলা দরকার হইল।

গ্রন্থখানি ছাপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম যে, লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য মূদ্রিত পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য বাদ দিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করায় বর্তমান নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ যে, তাহারা যেন উক্ত দৃশ্যটি (এবং চতুর্থ দৃশ্যে ‘তা বটেই ত’) গীতিটি পুস্তক হইতে বাদ দেন।

নাট্যরচনার কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পরীতি আছে। ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করতে হলে তাই কোনো কোনো স্থলে কিছু কল্পনার সাহায্যও নিতে হয়। কিন্তু নাট্যকারের এই উদ্ভাবনী শক্তি যদি মাত্রাতিরিক্তরূপে সুলভ রোমান্স ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা ক্ষমতার অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘তারাবাই’ নাটকের আখ্যায়িকাভিন্যাস শিথিল। টড্ বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ঘটনাকে (*Annals of Mewar (Chapter VIII) : Annals and Antiquities of Rajasthan (Vol I)*) পঞ্চমাঙ্ক নাটকে রূপ দিতে গিয়ে বহু অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও অবান্তর চরিত্রের সংযোজন করতে হয়েছে। তার ফলে পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের কাহিনী কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীই এই নাটক রচনায় নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু নাটকে পৃথ্বীরাজ কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন নি—বিশেষ একটি চরিত্রের একাধিনায়কত্বের অভাবে নাটকটি কেন্দ্রশূন্য ও বিক্ষিপ্ত-কলেবর। শুধু “সঙ্গ-সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য”—ই নয়, একাধিক সঙ্গীতিহীন দৃশ্য সংযোজিত হয়ে শুধু নাটকের কলেবরবৃদ্ধি করেছে।

পৃথ্বীরাজের চরিত্রের উপর লক্ষ্য রেখেই নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু এই চরিত্র কোথায়ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। পৃথ্বীরাজের কতকগুলি রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ ও দৃঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা আছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কোনো চরিত্র বিকশিত হয়নি। পৃথ্বীরাজের চেয়ে তারাবাইয়ের চরিত্র ভালো ফুটেছে। তার চরিত্রে রাজপুত্রমণীসুলভ যে শৌর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় আছে, তা স্বজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণিত অনুরূপ চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষবেশে তারাবাইয়ের শিকারযাত্রা তার ব্যক্তিত্বভাস্বর চরিত্রটিকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তারার প্রেমের মধ্যেও সেই বলিষ্ঠতাই আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ইতিহাসানুমোদিত। তারাবাইয়ের কোনো কোনো উক্তিও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উক্তির ছায়াপাত ঘটেছে :

আমি নহি বিদ্যাং কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত

আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

তারার প্রতি পৃথ্বীরাজের অমূলক সন্দেহ, ভাগিনীপতি প্রভুরাওকে অপমান করা, প্রভুরাওয়ের ষড়যন্ত্রের সাফল্য, পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও তারাবাইয়ের আত্মহত্যা প্রভৃতি কাহিনী কোনো নাটকীয় গতিধর্মের অনিবার্য পরিণতি নয়। কাহিনীটির মধ্যে নিয়তির নিষ্ঠুর সংকেতই প্রধান্য লাভ করেছে।

‘তারাবাই’ নাটকের মধ্যে সূর্যমল ও তাঁর পত্নী তমসার চরিত্রটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্যমল চরিত্রটির মধ্যে রাজ্যালিপ্সার সঙ্গে বাৎল্য ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক তীব্র ম্বন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ সূর্যমল যদিও ভ্রাতৃপুত্রদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তবু মেবারের রাণা

উর্নবিংশ

হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে দ্রাতৃস্পন্দ্রদের বিরুদ্ধে সত্রধারণ করতে বিচলিত করেনি। তাঁর চরিত্রে সদগুণের অভাব ছিল না। তবু তাঁর মনের গহনে ছিল এক সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পত্নী তমসার প্ররোচনা সূর্যমলের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছে। সূর্যমল-তমসা-কাহিনী শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অনূকরণে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী অনূকরণ ছাড়া নাট্যকার কোনো বিষয়েই শেক্সপীয়রের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। ম্যাকবেথ বা লেডী ম্যাকবেথ, কোনো চরিত্রেরই সম্মতি বা ঐশ্বর্য রক্ষা করা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সূর্যমল দুর্বলচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত, তমসার পরিবর্তন আকস্মিক ও অতিনাটকীয়। তার ব্যভিচার-কাহিনী পরিবর্তনায় নাটকের কোনো গৌরববৃদ্ধি হয়নি, বরং সুদৃঢ় চমক সৃষ্টি করেছে। শূরতানের আলস্যপ্রিয় চরিত্র ও সপার্বদ প্রভুরাওয়ার নিম্নশ্রেণীর বিলাস ও কৌতুকের চিত্র নিতান্ত বিশেষত্বহীন। যমুনা রক্তমাংসের মানবী নয়।

‘তারাবাই’ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হলেও, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যে ভাবগাম্ভীর্য, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মহিমার ছবি পাওয়া যায়, ‘তারাবাই’ নাটকে তা অনুপস্থিত। কিন্তু ‘তারাবাই’ নাট্যকারের অপরিণত রচনা হলেও, এই নাটকেই তিনি সর্বপ্রথম রাজপুতনার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই নাটকেই তাঁর টডরসিকতার দীক্ষা ঘটেছে।

‘তারাবাই’ নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দকে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

প্রথমে Shakespeare-এর অনূকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। ‘তারাবাই’ প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দামাধুরী ইহাতে নাই,—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না।

(আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্য-মন্দির, প্রাণ, ১০১৭)

রাণা প্রতাপসিংহ (৮ মে, ১৯০৫) : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপরেই নির্ভরশীল। অবশ্য ‘তারাবাই’ নাট্যকাব্যটির মধ্যেই সর্বপ্রথম তাঁর ঐতিহাসিক নাটকরচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তখনো তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলী আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবু টডের কাহিনী তাঁকে এমন এক জগতের সম্মান দিয়েছিল, যা তাঁর মনোজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনূকূল হয়েছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি কাব্যসংলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করে কাব্যধর্মী গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূলে যুগজীবনের প্রভাবও অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় বাঙালী চিত্তের যে অভিনব জাগরণ হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে তিনি যুগজীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন ধরনের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে যখন নাট্যকার নাটক রচনা করেন, তখন ইতিহাসকে শুধু তথ্যপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ না করে, তাকে মানব-জীবনরহস্যে মন্ডিত করে তোলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। উর্নবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে থেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের ভাবাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ স্পষ্টতর রূপ লাভ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণীয়। বাংলা নাটকে

দীর্ঘকাল শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা চলেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্ববর্তী নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুশীলন করেছেন। গিরিশচন্দ্রও শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই পাশ্চাত্য রীতি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছে। নাটকীয় গতিবেগ, চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি রূপায়ণ, ট্রাজিক রস-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শেষ-জীবনের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি শেক্সপীয়রের অধিকতর সমীপবর্তী হয়েছিলেন। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটক থেকেই এই যুগের সূত্রপাত ঘটেছে।

‘প্রতাপসিংহ’ উৎসর্গ করেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। নাট্যকার উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : “বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গনাট্য-সাহিত্যের গুরু, রসিক, উদার ও ভাবুক চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের স্মৃতিস্মরণার্থে এই প্রীতিমাল্য সর্ভিক্ত সন্মানে অর্পিত হইল।” ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকের আখ্যায়িকাও দ্বিজেন্দ্রলাল টড থেকে নিয়েছেন। নাটকের মূল কাঠামোটিতে ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির অভাব নেই। রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সংকল্প থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটক প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অশ্রুমতী’ (১৮৭৯) নাটকের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন :

এই প্রতাপচরিত্র লইয়াই বঙ্গবাণীর অক্লান্ত সেবক সাহিত্যরথী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর “অশ্রুমতী” নাটক রচনা করেন। নটকুলেশ্বর অর্ধেন্দ্রশেখর মুস্তফীর ভাষায় আমরা বলিতে পারি, অশ্রুমতী নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু প্রতাপ চরিত্র “জ্বালাইয়া” দিয়া গিয়াছেন, তাহাব পরে অপর কাহারও সেই চরিত্র লইয়া নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা সেই পরিচিত চরিত্রকেও নতুন করিয়া আঁকিয়াছে। (দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ. ১৪০)

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকখানির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কোনো তুলনাই হয় না। প্রথমত, ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকের পটভূমিকা বিস্তৃততর; দ্বিতীয়ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার স্থান অনেক বেশি; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়ত, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের দিক থেকেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানি সমৃদ্ধতর। তবে একথাও সত্য যে, প্রতাপসিংহ চরিত্র তেমন পরিষ্কৃষ্ট হতে পারেনি। দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের আতিশয্য চরিত্রটির মানবসত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ঐতিহাসিক প্রতাপসিংহের অন্তরালে মানুষ প্রতাপসিংহের ব্যক্তিত্বের নাটকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

শক্তিসিংহের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রবণতা দেখিয়েছেন। শক্তিসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও নাট্যকার নিজস্ব দৃষ্টির সাহায্যে চরিত্রটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তিনি যুক্তিবাদী, এমনকি যুক্তির দ্বারা তিনি দেশের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যকেও অস্বীকার করতে চান : “জন্মভূমি? আমি তার কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি বলেই তার প্রতি আমার কর্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পারতাম! (১।১) শক্তিসিংহ উন্নতহৃদয় বীর, নিভীক, স্পষ্টবাদী ও উদ্ভত; তিনি বিদ্বান ও দার্শনিক। তাঁর দর্শন নাস্তিকতার দর্শন। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের শাসনকে তিনি অস্বীকার করেছেন, এমনকি প্রেমের মত সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকেও তিনি যুক্তিবাদী মনের দ্বারা বিশ্লেষণ করতে ছাড়েন নি—নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণাও সংশয়বাদী দার্শনিকের ধারণা : “এই ত নারী। নেহাৎ অসার! নেহাৎ কদাচার! আমরা লালসায় মাত্র তাকে সুন্দর দেখি। শূন্য নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার” (৪।১)। দৌলতউল্লাহসার প্রেম ও প্রতাপসিংহের দেশপ্রেমের আদর্শ শক্তিসিংহের জীবনে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁর জীবন ও মৃত্যু দুয়ের মধ্যেই বৈচিত্র্য আছে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মত তাঁর জীবনানুযায়ী আকস্মিক মৃত্যুদশ্যও পরিকল্পিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে নিয়ে নাট্যকার তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তাকেই রূপ দিয়েছেন।

একত্রিশ

শক্তিসিংহের চরিত্র ছাড়াও আরো একাধিক চরিত্রে নাট্যকার সমাজ, ধর্ম, প্রেম, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ইরা, মেহেরউল্লিসা ও দৌলতউল্লিসা—এই তিনটি কাল্পনিক নারী-চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মতবাদের বাহন। ইরা রক্তমাংসের নারী-চরিত্র নয়, নাট্যকারের এক বিশিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতীক। ইহার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মনুষ্যত্ব, পরোপকারবৃত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে: “না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ করবে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতি নিখিলময় ছাড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।” ইরা চরিত্রটি পরবর্তী নাটক ‘মেবার-পতন’-এর মানসী চরিত্রের পূর্বাভাস। দৌলতউল্লিসা চরিত্রের মধ্যে প্রেমের বিশ্ববিজয়িনী মহিমা উদ্ভাসিত হয়েছে। মেহেরউল্লিসাকে প্রথম দৃষ্টিতে চঞ্চলা ও প্রগল্ভা মনে হতে পারে, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্য দিয়েও নাট্যকার তাঁর নিজের কথাই বলেছেন। শক্তিসিংহ ও দৌলতউল্লিসার বিবাহ ব্যাপারকে সে তার সংকীর্ণচিত্ত পিতাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ধর্ম ও সমাজের চেয়ে যে মানুষ বড়, এই হল তার বক্তব্য: “ধর্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহংকারে, লালসায়, বিম্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে তারা ভিন্ন ভিন্ন নয়।” মানসিংহ চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করলেও তার মূখ দিয়ে নাট্যকার হিন্দু-সমাজের অনুদারতা ও সংকীর্ণতার কথা বলেছেন।

যোশী চরিত্রের মধ্যে রাজপুত্র রমণীর আভিজাত্যবোধ, তেজস্বিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজের বিলাসপ্রিয় কবিচিত্তকে যোশীই তার সংকল্প-কঠোর চরিত্রের দ্বারা উদ্বেষিত করেছে। যোশী নামটিই শুধু কাল্পনিক, কিন্তু তার চরিত্ররূপ ও বেদনাময় পরিণতি সম্পূর্ণরূপেই টড্ থেকে গৃহীত। শক্তিসিংহের বিবাহ ব্যাপারটিকে আকবরের মত প্রতাপসিংহও সুনজরে দেখতে পারেন নি। প্রতাপসিংহের মত দেশপ্রেমিকও যে বংশমর্যাদার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, নাট্যকার তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। আকবর গুণগ্রাহী, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের ভূমিকায় আকবর চরিত্র সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন: “অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায়রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বর্ণিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুও ঐরূপই বর্ণিয়াছিলেন।” টডের কাহিনীতেও আকবরের ইন্দ্রিয়লালসার কাহিনী আছে—যোশীর বেদনাময় পরিণতির জন্য আকবরের ইন্দ্রিয়লালসাই দায়ী। দ্বিজেন্দ্রলালের আকবর প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু “রিপূর অধীন হইলে তিনি জঘন্য কার্য করিতে পারিতেন।”

‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে কয়েকটি গুরুত্বের অসঙ্গতি আছে। মেহেরউল্লিসা ও দৌলতউল্লিসা চরিত্রদ্বয়ে এই অসঙ্গতি সবচেয়ে উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। হল্দিঘাটের যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে মোগল বাদশাহের অন্তঃপূরিকার পক্ষে শক্তিসিংহের শিবিরে প্রবেশ করে অবিবাহিত প্রৌঢ় পুরুষের কাছে অবাধে প্রেম নিবেদন করা যেমন অবাস্তব, তেমনি অসঙ্গত। কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য সুলভ লঘু কৌতুক ও রোমান্সের সঙ্গে এই আদর্শদীপ্ত নাটকখানির কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। মেহেরউল্লিসার সঙ্গে আকবরের কথোপকথন যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তাতে তাকে পিতাপুত্রীর সংলাপ বলে মনে হয় না। পিতার সঙ্গে কন্যার এই জাতীয় কথোপকথন নিতান্ত অসঙ্গত ও রুচিবিগর্হিত। পিতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ও প্রতাপসিংহের গিরিগুহায় আশ্রয় অনুসন্ধান অর্থহীন ও উৎকট। সম্ভবত, নাট্যকার মেহেরউল্লিসার প্রেমের ভিতর দিয়ে ‘নিষ্কাম ভালবাসার’ নিগূঢ় তত্ত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাটকে কোথায়ও তা ফুটে উঠতে পারে নি। ইরা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি—নাটকীয় চরিত্র হিসাবে তার অনেক চরিত্র আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাটকের মত ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে অতিনাটকীয়তা থাকলেও দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব বেশি উৎকট হয়ে ওঠে নি। নাটকখানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘসংলাপযুক্ত ও

বার্শ

বিবর্তনধর্মী হয়েছে। নাটকীয় অন্তর্দৃষ্টি ও গতিধর্মের তেমন তীব্রতা নেই। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি নতুন পথ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তখনো তিনি ঐতিহাসিকে জীবনরহস্যে মগ্নিত করতে পারেন নি।

দুর্গাদাস (৫ নভেম্বর, ১৯০৬) : 'প্রতাপসিংহ' নাটকের পরেই টডের 'রাজস্থান' কাহিনীর 'মারবাড়ের ইতিহাস' অবলম্বন করে 'দুর্গাদাস' নাটক রচিত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় এই নাটকে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা অনেক কম। অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে ও অনাবশ্যিক দৃশ্য-সংযোজনে নাটকখানির কেন্দ্রীয় ঐক্য বহুধা-বিচ্ছিন্ন। তার ফলে নাটকের মূল অভিপ্রায়টি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধাগ্রস্ত ও গোঁণ হয়ে পড়েছে। নাটকটির মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অজিত সিংহের জন্ম থেকে (১৬৭৯) ঔরঞ্জীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) এবং তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার বিস্তৃতি। ঔরঞ্জীবের রাজত্বকালের শেষার্ধ্বে নানাকারণে ভারত ইতিহাসের এক সংঘাত-জটিল অধ্যায়। এই ঘটনাপ্রধান ঐতিহাসিক কালকে নাট্যকার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক যুগকে কোনো একখানি নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। নাট্যকার মোগল, মেবার, মারবাড়, মারাঠা—এই চারটি কেন্দ্রের উপরেই সমভাবে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে কেন্দ্রগত ঐক্য রক্ষিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মূখ্য-গোঁণ ঘটনা-নির্বাচনে নাটকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আকবরের কাহিনীকে, জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতীর ঘটনাকে, শম্ভুজীর আখ্যায়িকাকে নাটকে প্রয়োজনানু-রিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, রানা জয়সিংহের পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বা নাটকের বিন্দুমাত্র সংযোগ পর্যন্ত নেই। প্রতাপসিংহ নাটকে নাট্যকার একটি বিশেষ কেন্দ্রই তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টি সপ্তদশ শতাব্দীর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ভারত ইতিহাসের প্রবল বাতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

নাট্যকার দুর্গাদাস চরিত্রকে নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোথাও তিনি তেমন পরিষ্কৃত হন নি। এর কারণ দুটি : প্রথমত, অতিরিক্ত ঘটনা ও অনাবশ্যিক চরিত্রের ভিড়; দ্বিতীয়ত দুর্গাদাস চরিত্রে আদর্শবাদের আতিশয্য। অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্য-বোধ, প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য, কর্তব্যবোধ, সুমহান দেশপ্রেম প্রভৃতির দ্বারা তিনি এই রাঠোর বীরের চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। এই সর্বগুণান্বিত চরিত্রটির মধ্যে মর্ত্যের মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন : "দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধু মনস্বী 'লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস মহাশয় বলেন যে, দুর্গাদাস চরিত্র "Bundle of qualities" হইয়াছে, যদি গুণের সঙ্গে weakness-এর উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র আরও ফর্টিত।" (দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৩-১৫৪)। নাটকখানি নাট্যকার তাঁর পিতাকে উৎসর্গ করে লিখেছেন : "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব 'কার্তিকেশ্বর চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।" নাট্যকার 'ভূমিকা'য় নাটকটিকে ট্রাজেডি বলতে চেয়েছেন : "ইহার 'ট্রাজেডি'য় চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্রাজেডি'য় ঐ এক কথায়—'ব্যর্থ হয়েছে—পারলাম না এ জাতিতে টেনে তুলতে।' কিন্তু দুর্গাদাসের মত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পক্ষে ট্রাজেডি ঘটা সম্ভব নয়। 'Perfectly blameless hero'-কে এরিস্টটল ট্রাজেডির নায়কের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। ট্রাজেডির নায়কচরিত্রে একটি 'particular fault' থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দুর্গাদাস চরিত্রের মধ্যে তেমন কোনো অন্তর্দৃষ্টির অবকাশ নেই—তাঁর জীবনের পরিণতি বাইরের ঘটনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—এ পরিণতি কোনো গভীর

অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণাম নয়। তৃতীয়ত, 'চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতা,' 'আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতা', কিংবা 'প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়'—এর কোনোটিই দুর্গাদাস চরিত্রে পরিস্ফুট হয় নি। একমাত্র শেষদৃশ্যে দুর্গাদাসের ভাবনার অবকাশ এসেছে, কিন্তু তা ট্রাজেডির সমুচ্চতা লাভ করে নি।

ঔরঞ্জীব পরধর্মস্বেষী, ইসলামধর্মের সংরক্ষক; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিরও তাঁর অভাব ছিল না। 'তবে পরবর্তী কালে 'সাজাহান' নাটকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ঔরঞ্জীবের চরিত্র আঁকা হয়েছে। ঔরঞ্জীব সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন : "ঔরঞ্জীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যে রূপ টড্ ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সরল ধার্মিক মুসলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্পপ্রসূত।" ঔরঞ্জীবের শেষজীবনের বিষাদময় পরিস্থিতি নাট্যকার খানিকটা ফর্টিয়ে তুলেছেন। নিজের কতকগুলি ভ্রান্ত নীতির জন্য বিশাল সাম্রাজ্যের চারদিকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। পুত্র আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মেবার ও মারবাড়ের সম্মিলিত শক্তির কাছে তিনি পর্যুদস্ত ও শক্তিমান দুর্গাদাস ও দিলীর খাঁর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছেন। মারাঠা শক্তিও সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। নাটকে ঔরঞ্জীব ক্ষমতাপ্রিয়। গুলনেয়ারের হাতের একটি ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন।

নাট্যকার গুলনেয়ার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গুলনেয়ার ঐতিহাসিক নাম নয়। গুলনেয়ার সম্ভবত কামবক্সমাতা উর্দিপুর্নীমহল। উর্দিপুর্নী সম্পর্কে মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন 'A low animal type of partner.' তিনি উর্দিপুর্নী সম্পর্কে আরো বলেছেন : "She retained her charms and influence over the Emperor till his death, and was the darling of his old age." (*A Short History of Aurungzeb*, page 14) যশোবন্ত সিংহের বিধবা রানীর পূর্বকৃত এক অপরাধের জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণে অসমর্থ হয়ে কারাগারে দুর্গাদাসের প্রতি প্রণয় নিবেদন যেমন অনৈতিহাসিক তেমনি অসঙ্গত। দুর্গাদাসকে দর্শনমাত্রেই তাঁর প্রেমে পড়া মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রণয়ীকে প্রেম নিবেদন করতে এসে এই কামাতুরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গী হয়েছে কামবক্স, যে তাঁরই গর্ভজাত পুত্র। পিতামহী গুলনেয়ার ও পৌত্রী রাজিয়া পরস্পরের ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা নিতান্তই দৃষ্টিকটু হয়েছে। রাজিয়া চরিত্রের কোনো নাটকীয় সার্থকতা নেই। কাহিনীর গঠনশৈথিল্য অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্র-সংযোজন নাটকের স্বাভাবিক গতিধর্মকে ব্যাহত করেছে।

'দুর্গাদাস' নাটকেও নাট্যকারের নিজস্ব চিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণীকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রভুভক্ত কাশেম ও দিলীর খাঁ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তাঁর এই তত্ত্বটিকে রূপ দিয়েছেন। দিলীর খাঁ বলেছেন : "হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিস্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই।" বলাবাহুল্য এ কথা মোগল-সেনাপতি দিলীর খাঁয়ের নয়, এ কথা স্বদেশী আন্দোলনের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর একটি উদার আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর নাট্যকারের ভাগ্যে নিন্দা ও প্রশংসা দুইই জুটেছিল। 'নব্যভারত' (চৈত্র, ১৩১৩) লিখেছিলেন :

...সর্বত্রই রুচিমার্জিত, ভাববিশুদ্ধ, লিপিতুর্ষ সূন্দর, কবিত্ব অসাধারণ—পিড়বার সময় মনে হয় যেন ধর্মগ্রন্থ পড়িতেছি; মনে হয় যেন আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি; মনে হয় যেন স্বদেশভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি।...পুস্তকখানির কি কবিত্ব, কি স্বদেশপ্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই তাহা পাইয়াছি। বাস্তবিক বলিতেছি—শ্বজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরহ লাভ করিয়াছেন।

জনৈক সমালোচক, এই নাটকে মুসলমানদের খবর করে হিন্দুদের বড় করা হয়েছে, এই অভিযোগও করেছেন। নাট্যকার ভূমিকায় এর জবাব দিয়েছেন।

মেবার-পতন (২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৮) : 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যার সূত্রপাত, 'মেবার-পতন' নাটকে তারই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঘটনার দিক থেকে 'মেবার-পতন'-কে 'প্রতাপসিংহ' নাটকের পরিশিষ্ট বলা যায়। কিন্তু দু'খানি নাটকের আশ্বাদন স্বতন্ত্র। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে চরিত্র-গুণের মাধ্যমে নাট্যকারের আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করে নি। অপরপক্ষে 'মেবার-পতন' নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারধর্মিতাই মূখ্যস্থান অধিকার করেছে। নাট্যকার গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন মধুসূদনকে : "যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন; যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কনে দীনা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন; যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মনীষায় বঙ্গসন্তানের মূখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন; সেই অমিতপ্রভাব, অক্ষয়কীর্তি অমর—মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবিবর উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।"

নাট্যকার নাটকের ভূমিকায় এর মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন :

মদ্রুচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রানা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষচরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও নূরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য-চিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তন্মিহ্ন সে নাটকগুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই—নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক।

'মেবার-পতন'-এর পটভূমিকা এক সূর্যকরোজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত জীবনের অপরাহ্নিক বেদনার ছায়ায় ভরে উঠেছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যে ঐতিহাসিক যুগজীবনের চিত্র স্পষ্টোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এখানে তা অনেকখানি বর্ণবিবরল। মেবারপতনের দুর্ঘোষণা পটভূমিকা, অস্তগমনোন্মুখ স্বাধীনতাসূর্যের শেষ রশ্মি নাট্যকার নিজের ভাবসত্যের দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। প্রতাপসিংহের কীর্তিভাস্বর জীবনের সংগ্রামশীল অধ্যায়ের মধ্যে জাতীয় জীবনে যে দুর্বীর প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, অমর সিংহের সময় তা ভাটায় পরিণত হয়েছে। রণক্লান্ত জাতি দীর্ঘ সতেরো বছরের যুদ্ধবিমুখ জীবন অতিবাহিত করার পর নিশ্চিন্ত আলস্যে তার সেই দুর্জয় প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মোগল আক্রমণে রাজস্থানের ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, স্বয়ং রানা যুদ্ধবিমুখ। গোবিন্দসিংহের উৎসাহব্যঞ্জক বাণী, চারণীরতধারিণী সত্যবতীর অতীত মহিমার গান, অজয়সিংহের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ঘটনা সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে। পতনোন্মুখ মেবারের অন্তিম অধ্যায়টিকে নাট্যকার হৃদয়বেদনার গাঢ় রসে অভিষিক্ত করেছেন। গোবিন্দসিংহ বলেছেন : "আমার এই ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্বকে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে। আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষরশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্লিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শূন্যে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্র, বাসরোধের অপেক্ষায় মগ্ন আছে।"

কিন্তু ঐতিহাসিক অংশটি ছাড়াও নাটকের আর একটি দিক আছে। বিশ্বমৈত্রীর মহামন্ত্র নাটকটির বিষাদমন্ত্র পরিণতিকে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার মন্ত্রে স্পন্দিত করে তুলেছে। মহাবৎ

পর্যালোচনা

খায়ের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পতন, অজয়সিংহের মৃত্যু, পরিবর্তিতচিত্ত সগরসিংহের মৃত্যুবরণ, পুত্রশোকে অর্ধোন্মাদ গোবিন্দসিংহের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি ঘটনা নাটকের মধ্যে এক মৃত্যু-পান্ডুর ছায়া সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু নাট্যকারের আদর্শবাদ এই পতনের মধ্যেও নতুন করে বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেছে। নাটকের শেষে মানসীর উক্তি ও চারণীদের গানের মধ্যে নাট্যকারের জীবনদর্শনই ঘোষিত হয়েছে :

কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুস হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুস হ' ॥

কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী—এই তিনটি চরিত্রকে নাট্যকার তিনটি নীতির প্রতীক হিসাবে রূপ দিয়েছেন। বিশিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতীক হওয়ার জন্য তিনটি নারীচরিত্রের কোনো চরিত্রেই পূর্ণতর মানবী সত্তা প্রকাশিত হয় নি। তিনটি চরিত্রের মধ্যে মানসী চরিত্রই সবচেয়ে অবাস্তব। অজয়সিংহের সঙ্গে তার সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। এই একটিমাত্র সম্পর্কের সূত্র ধরেই মানসী চরিত্র খটনকটা বাস্তব হয়ে উঠতে পারত। একমাত্র পঞ্চমাঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে মানসীর স্বগতোক্তি থেকে অজয় সম্পর্কে মানসীর প্রেমচেতনার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় : “নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলিনি। যখন সেদিন আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হয়ে আমার মুখপানে দীন নয়নে চেয়েছিল—আমার শুদ্ধ একটি সক্রমণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে মরে যাচ্ছিল, তবু আমার মুখ ফোটেনি। তাই আমার অজয় অভিমান করে চলে গিয়েছে। আমার সেই গর্ব চূর্ণ করে, পদতলে দলিত করে চলে গিয়েছে। অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে।”—অজয় জীবিত থাকতে মানসীর কণ্ঠে আদর্শবাদ ও প্লেটোনিক প্রেমের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। মাত্র একটি সংলাপেই মানসী মানবীতে পরিণত হয়েছে। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকের ইরা চরিত্রে নাট্যকার যে তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, মানসী চরিত্রে তারই পূর্ণতর রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গান ও ঐতিহাসিক নাটক স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনাকে শিল্পরূপ দিলেও এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত গুণটি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই উচ্ছ্বাসসর্বস্ব সংকীর্ণ দেশপ্রেমকে তিনি মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন নি। ২৮ মে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাঁদি থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেন :

আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি,—যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের নগণ্য ও হয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন—আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুস হব।...আমি ‘দেশ’ চিনি না, বিশ্বেষ মানি না; আমি চাই শুদ্ধ বীর্যবল—ব্রহ্মচর্য; চাই শুদ্ধ সত্যনিষ্ঠা; চাই শুদ্ধ আসল, খাঁটি, ধুব ও নিটোল ধর্মবল, আর ঐ এক কথায় মনুষ্যত্ব।

তাই জাতীয়তার চেয়ে তিনি মনুষ্যত্বকে অনেক বড় করে দেখেছেন। কল্যাণীর দাম্পত্যপ্রেম ও সত্যবতীর দেশপ্রেম মানসীর বিশ্বপ্রেমের মন্ড্রে দীক্ষিত হয়েছে। মানসী কল্যাণীকে বলেছে :

“তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সাম্বন্ধনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করেই সুখী।” মানসী সত্যবতীকেও বলেছে : “যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়,

মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক! দেশের স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুস হোক।” মানসী চরিত্রটির উপর নবীনচন্দ্রের ‘কুরুক্ষেত্র’ কাব্যের সুভদ্রা চরিত্রের প্রভাব আছে। মানসী চরিত্র পরিকল্পনায় স্কুটারির হাসপাতালে আত্মসেবাপরায়ণা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের প্রভাব থাকারও বিচিত্র নয়। নারী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র রুক্মিণীর চরিত্রই বাস্তবসম্মত। রুক্মিণীর চরিত্রে স্বামী-কন্যা নিয়ে বিরত বাঙালী গৃহিণীর চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সঙ্গে নাট্যবর্ণিত আদর্শবাদের কোনো যোগ নেই। তাই তার এই স্বল্পায়ত ভূমিকাটিতে একটি আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

অমরসিংহের চরিত্রের মধ্যে উদ্যম ও দৃঢ়তার অভাব আছে, প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ

করে তিনি দেশের শাস্তি নষ্ট করতে চান না। তাঁর চরিত্রে পূর্বাপর একটি বিষণ্ণতা ও নিশ্চেষ্টতা লক্ষণীয়। আসন্ন সংকটকালে দেশের দুঃখ-দুর্ভাগ্য চোখের সম্মুখে দেখেও তাঁর মনে কোনো তীব্র প্রতিকারবাসনা জাগে না—যেন তিনি ভাগ্যচক্র ও বিরুদ্ধ পরিবেশের কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে নিয়েছেন। রানার চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে টডের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে নাটকীয় রসমণ্ডিত করতে পারেননি। ‘মেবার-পতন’ নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে মহাবৎ খাঁ ও গোবিন্দসিংহ চরিত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মহাবৎ খাঁ চরিত্রের মধ্যেও নাট্যকারের সমাজচিন্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে। মহাবৎ খাঁর স্বদেশদ্রোহিতাকে মেবার-পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হলেও এর আর একটি দিককেও অস্বীকার করা যায় না। মহাবৎ হিন্দু সমাজের অন্দারতা ও সংকীর্ণচিত্ততার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত ‘একঘরে’ স্বিজেন্দ্রলালের মানসিক প্রবণতাগুলিই এখানে তত্ত্বরূপ ধারণ করেছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে গোবিন্দসিংহ সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোবিন্দসিংহ হলদিঘাটের বীর, প্রতাপসিংহের প্রিয়তম সহচর, মেবারের বীরযুগ ও কুলগৌরবের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কুল-গৌরব ও দেশপ্রেমিকতার জন্য তিনি পুত্রকন্যাকেও পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি—গোবিন্দসিংহ যথার্থই Last of the Romans. অমরসিংহ চরিত্রটি নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্যে গোবিন্দসিংহ চরিত্রটি সবচেয়ে লক্ষণীয়। পুত্র-হারা গোবিন্দসিংহের উন্মাদনা শাজাহান চরিত্রের পূর্বাভাস বলে মনে হয়। ছবিওয়ালীর দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের ও কল্যাণীর উদ্ধার দৃশ্যটিতে ‘আনন্দমঠ’-এর প্রভাব আছে।

‘মেবার-পতন’ নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্য প্রবল হয়ে নাট্যাঙ্গকে দুর্বল করেছে। নাটকটির গতিধর্ম কোথাও তেমন সক্রিয় নয়, নাটকের কাহিনী-বিন্যাসও তেমন ঘনবদ্ধ নয়। চরিত্রগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে নাট্যকারের প্রচারপ্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্রের উক্তিতে অনেক গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু সে জিজ্ঞাসা চরিত্রটিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মতামতের কোনো স্বতন্ত্র আস্তিত্ব নেই। কিন্তু মেবার-পতন নাটকের চরিত্রগুলিকে নাট্যকারের নিজস্ব মতামত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে। এই নাটকে প্রকৃতপক্ষে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। অমরসিংহ কর্মকুণ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ইতিহাস অংশের নায়ক হলেও তাঁর কোনো সচেতন কর্মপ্রয়াস নেই। দার্শনিক অংশের নায়িকা মানসী মানবী নন, অশরীরী আইডিয়া। ‘মেবার-পতন’ নাটকের সংগীত-সংস্থাপন-কৌশল প্রশংসনীয়। ‘মেবার-পাহাড়’, ‘ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর’ প্রভৃতি সংগীত নাটকটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

‘মেবার-পতন’ নাটকে মেবারের পতন আখ্যায়িকাটি কেন্দ্রীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। নাট্যকার পতনোন্মুখ মেবারের মহিমোজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছেন। কিন্তু এইটাই নাটকের শেষ কথা নয়। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকে দেশপ্রেমের যে আদর্শ রূপায়িত হয়েছে, তা বৃহত্তর ভাবাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত হয় নি। শক্তসিংহের বিবাহ-ব্যাপারে প্রতাপসিংহের অন্দারতা থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। ‘মেবার-পতন’ নাটকে দেশপ্রেম, বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজিত মূহূর্তে বাংলাদেশে দেশপ্রেমের বন্যা এসেছিল। কিন্তু সেই দেশপ্রেমের প্রবল ও প্রচণ্ড আবেগ অনেক সময় বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। স্বিজেন্দ্রলাল এই আত্মঘাতী ও সংকীর্ণ দেশপ্রেম থেকে যে কতখানি সরে এসেছিলেন, তার সর্বোত্তম প্রমাণ ‘মেবার-পতন’ নাটক। এই নাটকে তাঁর মানস পরিবর্তনের সূত্র পরিষ্ফুট হয়েছে। এ সম্পর্কে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

He was my father. So naturally I followed intimately the psychic changes in his life with deep sympathy and reverence. I began to revere his patriotism, too, the first fire of which had made him famous in the Swadeshi days when he wrote patriotic dramas one after another. He was a poet and a man of outstanding nobility of character. But he was, as an artist, highly sensitive to his circumambient atmosphere. It was

then the heyday of Bengali Patriotism and he caught its contagion, a contagion we should avoid today. But in those days we took militant patriotism at its face value and so persuaded ourselves that it was the panacea for all the evils our flesh was heir to. We know better now. But in the first flush of our patriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism (which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven) and had burned with hatred of everything foreign. How easy, alas, to glare at others as the respository of iniquity forgetting our blackest sins!

It was at this point that Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote *Fall of Mevar*. And it was only then that we, his deep admirers, discovered that patriotism was a false guide.

[Translator's Note, page VIII-IX : *Fall of Mevar*]

স্বজেন্দ্রলালের মনোজীবনের পরিবর্তনের দিক থেকে নাটকটি মূল্যবান। নাটকটিতে নাটকের চেয়ে তত্ত্ব বড় হয়ে উঠেছে। 'মেবার-পতন' নাটক সম্পর্কে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

এই কাব্যের 'মেবার পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে পাকে এমন অপরূপ আলোক, মধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটি সুমার্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাহার এই যুগের সর্বগুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়। (বঙ্গবাণী, পৃ: ১৫১)

সাজাহান (৮ আগস্ট, ১৯০৯) : স্বজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্ববাদিসম্মত। মণ্ডসফল্য ও জনপ্রিয়তার দিক থেকেও বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নাটকটি অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে। নাটকখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়েছে। মোগল যুগকে অবলম্বন করে স্বজেন্দ্রলাল যে পাঁচখানি নাটক (প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান) রচনা করেন, তাতে ভারত-ইতিহাসের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে। এই পাঁচখানি নাটককেও প্রকৃতিধর্মের দিক থেকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনখানি নাটকে আদর্শবাদের প্রাধান্য—তাতে রাজপুত্র ইতিহাসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পরের দু'খানি নাটকে মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর, ও সাজাহানের রাজত্বকালের ঘটনার উপর জোর দিয়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনের জটিলতাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। এই ধারা লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তিনি 'ক্লিনিক্যাল নাটক' থেকে ধীরে ধীরে 'ঐতিহাসিক ট্রাজেডি'র গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রথম তিনখানি নাটকে যেমন তিনি আদর্শবাদের জ্যোতির্লোকে প্রবেশ করেছেন, তেমনি শেষ দু'খানি নাটকে প্রবেশ করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল জটিল জীবনের মর্মমূলে। 'নূরজাহান' নাটকের ট্রাজেডির মধ্যে তীব্রতা ও জটিলতা অনেক বেশি। অপরপক্ষে 'সাজাহান' নাটকে ট্রাজেডির ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লক্ষণীয়।

'সাজাহান' নাটকে নাট্যকার ইতিহাসকে অধিকতর বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। সাজাহান নাটকের আরম্ভ হয়েছে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। দৈহিক অসুস্থতার জন্য তার কিছুদিন আগে সাজাহান দিল্লী থেকে আগ্রা আসেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সাজাহান অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থাও নাটকে যথাযথভাবে বিবৃত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম দৃশ্যই তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকা ইতিহাসসম্মতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের প্রথমেই দারা সাজাহানকে বলেছেন :

আর্টিকল

“সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ গুজরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরঞ্জীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।” এ সম্পর্কে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন :

By the middle of November Shah Jahan had recovered sufficiently to be told of important matters which had hitherto been kept from him. . . . Soon afterwards equally alarming news arrived from Gujrat. There Murad had crowned himself on 5th December, and formed an alliance with Aurangzeb. [*A Short History of Aurangzeb* 2nd edn. P. 54]

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সমস্ত ঘটনা ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তার একটি জীবন্ত চিত্র এই নাটকে পাওয়া যায়। সুজার বিরুদ্ধে জয়সিংহ ও সোলেমানের যুদ্ধ ও ঔরঞ্জীব-মোরাদের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁর যুদ্ধ এবং তার ফলাফল সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসসম্মত। দারা, সুজা ও মোরাদের শোচনীয় পরিণতিও ইতিহাস-অনুমোদিত। নাটকের পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দিলদার কাঙ্ক্ষনিক চরিত্র হলেও একেবারে সত্যবর্জিত এ কথা বলা যায় না। দারার মৃত্যুর পূর্বে ঔরঞ্জীব যে গোপন বৈঠক করেছিলেন তাতে দানেশমন্দ খাঁ দারার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল :

That evening Aurangzeb held a private consultation with his ministers about Dara's fate. Danishmand Khan (Bernier's patron) pleaded for his life, but Shaista Khan, Muhammad Amin Khan, Bahadur Khan, and the princess Raushanara from the harem demanded his death for the good of Church and State. [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৮-৭৯]

নাটকের শেষ দৃশ্যে সাজাহান ঔরঞ্জীবকে ক্ষমা করেছেন—এ ঘটনা অনৈতিহাসিক নয় : “During the last days of Shah Jahan, her entreaties had conquered his just resentment and he had at last signed, after many previous refusals, a pardon to Aurangzeb for the wrongs he had done to his father. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৩—১১৪)। নারীচরিত্রের মধ্যে মহামায়া ও পিয়ারা কাঙ্ক্ষিত চরিত্র হলেও সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরোধী বলা যায় না। মহামায়া চরিত্রে রাজপুত্রমণীসুলভ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও শৌর্ষ্যের দীপ্ত প্রকাশিত হয়েছে। সুজার নৃত্যগীতপ্রবণ লঘু চরিত্রটি সম্মুখে রেখেই তিনি সংগীতপ্রিয়া সুরসিক পিয়ারা চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছেন। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, পরিবেশ-রচনা ও নাটকীয় ফলশ্রুতি—সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে ‘সাজাহান’ নাটকের ঐতিহাসিক যথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না।

তবু নাটক ও ইতিহাস এক বস্তু নয়। ইতিহাসের তথ্যরূপকে নাট্যকার মানবীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে জীবন্ত করে তোলেন। শেক্সপীয়র প্লটাকের সুবিখ্যাত ‘জীবনী’ গ্রন্থ অথবা হালিনসেডের ‘কাহিনীমালা’-কে নতুন করে প্রাণরসসমৃদ্ধ করেছিলেন। সাজাহানের রাজত্বের শেষদিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপার নিয়ে তাঁর পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে যে বিরোধ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে নাট্যকার একাধিক চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীভূত করে তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশে চরিত্রগুলি বিদ্যুতের মত স্ফুটোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ‘সাজাহান’ নাটকে শ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও মানব-জীবনকে সমন্বয় করেছেন। ‘রাজসিংহ’ আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

সাধারণ ইতিহাসের একটা গোরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা নূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার পথে মর্মান্তিক আতর্ধ্বনিও, রথের চূড়া যে-গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্শ করিতেছে সেই গগন-পথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

[রাজসিংহ, আধুনিক সাহিত্য]

উনচাল্লিশ

‘সাজাহান’ নাটকের নামকরণের ষাথার্থ্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নাটকটি যে একখানি ট্রাজেডি এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ নেই, কিন্তু কার ট্রাজেডি এবং কি জাতীয় ট্রাজেডি—প্রধানত এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ‘প্রধান চরিত্র’, ‘কেন্দ্রীয় চরিত্র’ ও ‘নায়ক’—এই তিনটি শব্দকে স্থূল ও সাধারণভাবে প্রয়োগ করার ফলেই নানা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার যে চরিত্র অবলম্বন করে তাঁর মূল অভিপ্রায়টি রূপায়িত করার চেষ্টা করেন, তিনিই হচ্ছেন নায়ক। নাট্যকারের অভিপ্রায় ও নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হয়ে থাকে, তিনি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বটেন। সুতরাং নাটকের নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রায় একার্থবোধক। কিন্তু নাটকের মধ্যে এমন এক বা একাধিক চরিত্র থাকতে পারে, যিনি বা যারা ঔজ্জ্বল্যে ও চারিত্রিক বিশিষ্টতায় নায়কচরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু ‘উজ্জ্বলতম চরিত্র’ই যে নাটকের নায়ক চরিত্র হবে এর কোনো সংগত কারণ নেই। এইজন্য ‘প্রধান চরিত্র’, ‘উজ্জ্বলতম চরিত্র’ ও সর্বাপেক্ষা ‘ক্রিয়াশীল চরিত্র’ নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র নাও হতে পারেন।

‘সাজাহান’ নাটকের ‘নায়ক চরিত্র সম্পর্কে’ একাধিক মত প্রচলিত আছে। নাটকটির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে এই মতবাদগুলির সতর্ক আলোচনার প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীলেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ দারার মৃত্যুর উপরেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন :

দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্রাজেডি—চূড়ান্ত ঘটনা। দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত ছিল। সাজাহান বিদ্রোহের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন দুইই হারাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়ের উপরেই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত এবং তাঁহার মৃত্যু-ঘটনায় মন এরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে, নাট্যকারের প্রভূত গুণপনা সত্ত্বেও পরবর্তী দৃশ্য-গুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য থাকে না। [সাহিত্য, মাঘ, চৈত্র ১৩১৭]

সমালোচকের মতে দারার ভাগ্যবিপর্যয়ই ‘সাজাহান’ নাটকের চরম ট্রাজেডি।’ কিন্তু ‘সাজাহান আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন।’ এই মন্তব্য যেমন অসংগত তেমনি অনৈতিহাসিক। সাজাহানের বন্দিত্ব সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন :

On the departure of Muhammad Sultan, the eunuch Mutamad became all in all and treated Shah Jahan with great harshness and neglect. "He sometimes allowed it to be seen that he treated Shah Jahan as a miserable slave."...

The correspondence between Shah Jahan and his son became intolerably bitter. At last the old monarch bowed to the inevitable and like a child that cries itself to sleep, he ceased to complain.

[A Short History of Aurangzeb, Pp: 110-111]

নাটকের পূর্বাপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাগ্যবিপর্যয় আসলে সাজাহানের। রোগগ্রস্ত স্থাবিরপ্রায় সাজাহানের শেষজীবনে ভাগ্যবিপর্যয়ের যে নির্মম ঘটনাবলী ইতিহাস-পাঠককে বেদনায় অভিভূত করে, দারার ভাগ্যবিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণতি তার মধ্যে অন্যতম। নাট্যকার দারার ভাগ্যবিপর্যয় ও তাঁর মৃত্যুদৃশ্যকে চূড়ান্তরূপে শোকাবহ করে তুলেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দারার দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ সাজাহানের ট্রাজেডিকেই গভীরতর ও বিস্তৃততর করে তুলেছে। দারার পরিণতির মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বসম্ভূত বেদনা নেই—তাঁর চরিত্রে ট্রাজেডির নায়কোচিত কোনো ঘাত-প্রতিঘাত নেই।

“সমালোচক দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের যবনিকাপতন প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু দারার মৃত্যু হয়েছে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। তারপরেও আর একটি অঙ্ক আছে। প্রধানত দারার মৃত্যু স্নেহপ্রবণ ভাগ্যহত সাজাহানকে অর্ধোন্মাদ করে তুলেছে। পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে দারার মৃত্যুসংবাদ শুনে সাজাহানের চিত্তবিকারের একটি চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে। দারার মৃত্যু পর্যন্তও সাজাহানের মানসিক অবস্থা তেমনভাবে বিপর্যস্ত হয়নি—কিন্তু দারার মৃত্যুর

পর সাজাহান তাঁর মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছেন। দারার মৃত্যুর পরেও এই জাতীয় দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল।...পঞ্চমাঙ্কের যে দুটি দৃশ্যে সাজাহানের ভূমিকা আছে (৫।৩, ৫।৬) তাদের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাজাহানের অন্তর্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এই দুটি দৃশ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ট্রাজেডি সাজাহানেরই, দারার মর্মান্তিক পরিণাম তাকে স্ফুটতর করেছে মাত্র। দারার পরিণাম ‘প্যাথ্যাটিক’, কিন্তু ‘ট্রাজিক’ নয়”।

“ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও ‘সাজাহান’ নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন ও জাহানারা নামকরণের পক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন :

সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ট্রাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের খুব সার্থকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। জাহানারা সর্বাপেক্ষা স্ফুট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০) পৃ. ৩৯০।]

ডাঃ সেনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়, তবু তাঁর মূল অভিপ্রায়টি অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না। ‘স্ফুট’ ও ‘বলিষ্ঠ’ ভূমিকা হিসাবেই তিনি ‘জাহানারা’ নামটি সমর্থন করেছেন। ‘সাজাহান’ নাটকে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায়, নির্ভীকতায়, সেবাপরায়ণতায় জাহানারা চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু জাহানারা কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়িকা নন। তা ছাড়া নাটকটি জাহানারার সুখ-দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়নি।...শুধু ‘স্ফুট’ ও ‘বলিষ্ঠ’ চরিত্র হিসাবেই জাহানারার দাবি স্বীকার করা সঙ্গত নয়।”

অধ্যাপক অর্জিতকুমার ঘোষ মহাশয় সাজাহান চরিত্র সম্পর্কিত ডাঃ সেনের মন্তব্যকে সমর্থন করে, ঔরঞ্জীবকে সাজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়কের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন :

সাজাহানের নামে নামকরণ হইলেও, সাজাহান এই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রভাবশালী চরিত্র নহেন।...প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ঔরঞ্জীব।

[বাংলা নাটকের ইতিহাস, তৃতীয় সং, পৃ. ২৭৩]

ডক্টর ঘোষের মতে সাজাহান চরিত্রটি ‘চলমান ঘটনার নিরুপায় দৃষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন।’ তাঁর মতে ঔরঞ্জীবই সবচেয়ে ক্রিয়াশীল চরিত্র এবং তিনিই সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়—‘সাজাহান’ নাটকে নাট্যকারের অভিপ্রায়টি ঔরঞ্জীব কতখানি পূরণ করেছেন? নাটকটি যে ট্রাজেডি এ বিষয় কোনো মতানৈক্য নেই। নাটকটিকে যদি ট্রাজেডি আখ্যায় চিহ্নিত করা যায়, তা হলে সমালোচকের মতানুযায়ী ঔরঞ্জীবকে সেই ট্রাজেডিরসের মূলাধার বলতে হয়। সমালোচক তাঁর স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দিয়েছেন :

সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ—এতগুলি লোকের করুণ ট্রাজেডি কেবল একটিমাত্র লোকের জন্য ঘটয়াছে। অথচ নাট্যকার তাঁহাকে একেবারে নিম্বন্ধ হৃদয়হীন পিশাচ করিয়াও অঙ্কন করেন নাই।...ঔরঞ্জীবের সুকুমার শাণিত বুদ্ধি বারবার জয়লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ জয় হইয়াছে হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদনে, এই বিষয়টি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ ২৭৩-৪]

“ঔরঞ্জীব চরিত্রে কোনো করুণরসাত্মক আবেদন নেই, যতটুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেকবুদ্ধির সংগ্রাম আছে, তা ট্রাজেডির নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঔরঞ্জীবের শাঠ্য ও হীন রাজনৈতিক চক্রান্তজালের মধ্যেও নাট্যকার বিবেকের দংশন দেখিয়েছেন। কিন্তু এই চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। হত্যাকে বিচার নাম দিয়ে ঔরঞ্জীব নিজের দোষ ক্ষালন করার চেষ্টা করেছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দৃশ্যের পূর্বে ঔরঞ্জীবের এই জাতীয় স্বপ্নের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। মোটকথা, ঔরঞ্জীব চরিত্রে স্বপ্ন আছে বটে, কিন্তু সে স্বপ্ন এতই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী যে তা ট্রাজেডির নায়কের উপযুক্ত নয়। এমন কি দারার মৃত্যুও যে তাঁর মনে খুব গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, এ কথাও বলা যায় না। সর্বশেষ দৃশ্যে ঔরঞ্জীবের অনুশোচনার চিত্র আছে বটে, কিন্তু তা ঔরঞ্জীবের সংলাপের

একচল্লিশ

চেয়ে, সাজাহানের স্নেহদুর্ভল উত্তর মাধ্যমেই প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং ঔরঞ্জীব চরিত্রের “হৃদয়বৃত্তির করুণ আবেদন” যেমন তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম নয়, তেমনি যতটুকু আছে, তাও সাজাহানেরই পুত্রস্নেহদুর্ভল মনের অনিবার্য প্রতিফলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া, কাহিনীর মধ্যে প্রথম গতিসঞ্চার করেছেন সাজাহান, ঔরঞ্জীব নয়। নিরুপায় হয়েই অগত্যা সাজাহান তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে যে চাণ্ডালের সৃষ্টি হল, ঔরঞ্জীব তাঁর কার্যক্রমের দ্বারা তাকেই আরো দ্রুত করে তুলেছেন। নাটকের প্রথমেই সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের ঐক্যসত্তা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এই দুটি সত্তাই নির্মমভাবে আহত হয়েছে এবং যিনি আঘাত হেনেছেন, তিনি তারই পুত্র ঔরঞ্জীব। সাজাহানের এই অসহায়চিত্তের বেদনাময় অভিব্যক্তিকে অবলম্বন করেই নাটকখানি রচিত হয়েছে। সুতরাং ট্রাজেডির নায়ক ঔরঞ্জীব নয়, সাজাহান।”

[রথীন্দ্রনাথ রায়ের ‘স্বজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার’ গ্রন্থের ৩১৭—৩২০ থেকে উদ্ধৃত]

কিন্তু সাজাহানের ট্রাজেডি সম্পর্কেও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন থাকে : প্রথমত, সাজাহান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ‘নিষ্ক্রিয় সাক্ষী’, তাঁর চরিত্রে ক্রিয়াশীলতার অভাব। দ্বিতীয়ত, ট্রাজেডির নায়কের পতনের জন্য দায়ী তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। সাজাহান তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য কতখানি দায়ী, এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তৃতীয়ত, নাটকের শেষে পরম স্নেহে সাজাহান তাঁর অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং সাজাহানের ট্রাজেডি কোথায়? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করতে হলে সাজাহানের ট্রাজেডির দু-একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়।

ট্রাজেডির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিন্যাস আছে। শেক্সপীয়রের চারখানি শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি (হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লীয়র, ম্যাকবেথ) মধ্যেও রূপগত তথা স্বরূপগত পার্থক্য কম নয়। উচ্চতর ট্রাজেডির মধ্যে জীবনেরই পরম রহস্য উদ্ভাসিত হয়। তাই বহুবিচিত্র জীবনের মত ট্রাজেডিও বিচিত্র হতে বাধ্য। প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্রাডলে শেক্সপীয়রের ‘কিং লীয়র’ নাটকের সমালোচনার প্রথমেই স্বরূপবৈচিত্র্য প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন :

The reader of Hamlet, Othello or Macbeth is in no danger of forgetting, when the catastrophe is reached, the part played by the hero in bringing it on. His fatal weakness, error, wrong-doing continues almost to the end. It is otherwise with King Lear. When the conclusion arrives, the old King has for a long while been passive. We have long regarded him not only as “a man more sinned against than sinning”, but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent.

[*Shakespearean Tragedy* (1941), Page 280]

ম্যাকবেথ, হ্যামলেট জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে লীয়র চরিত্রের পার্থক্য আছে। তাঁর পরিণামের জন্য নিজের বার্ষক্য ও ভ্রান্তিমূলক কার্যকলাপ দায়ী হলেও, আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিষ্ক্রিয়—একটান পর একটা দুঃখভোগ তিনি করেই চলেছেন। ‘কিং লীয়র’ নাটকের সঙ্গে ‘সাজাহান’ নাটকের অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু ট্রাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে স্বজেন্দ্রলাল এই নাটকে শেক্সপীয়র-প্রদর্শিত রাজা লীয়রের ট্রাজেডি পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সাজাহানকে ‘tragedy of suffering’ বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সাজাহান passive চরিত্র, কিন্তু বাহ্য নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও সাজাহান চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব নেই—তা ছাড়া, দুর্বলতা তাঁর ট্রাজেডিকে সক্রিয় করে তুলেছে। কারণ—

No mere suffering or misfortune, no suffering that does not spring in great part from human agency, and in some degree from the agency of sufferer, is tragic, however pitiful or dreadful it may be.

[*Oxford Lectures on Poetry* (1923) Page 81, A. C. Bradley.]

নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সাজাহান চরিত্রের ঐক্যসত্তা প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে পিতা

সাজাহানের স্নেহদৌর্বল্য, অন্যদিকে সম্রাট সাজাহানের কর্তব্যনিষ্ঠা—এই দুয়ের সংঘাত সাজাহানের চিত্রে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, তাই দিয়েই নাটকের সূত্রপাত হয়েছে। স্নেহাধিক্য সত্ত্বেও সন্তান অবাধ্য ও দুর্বির্নীত। জাহানারার বিক্ষুব্ধ উত্তিতে ও দারার সময়োচিত অনুরোধে পিতা সাজাহানের মধ্যে সম্রাট সাজাহান জেগে উঠেছেন : “তবে তাই হোক! তারা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট।” সাজাহান একই সঙ্গে পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যেই ছিল এক মারাত্মক ত্রুটি। সাজাহান স্নেহ দিয়ে তার ‘উন্মত্ত বিজয়ী পুত্র’কে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা দুইই ঔরঞ্জীবের কাছ থেকে নির্মম আঘাত পেয়েছে। আগ্রাদুর্গের পতনের জন্য ‘human agency’ ঔরঞ্জীব যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী ‘agency of the sufferer’ অর্থাৎ সাজাহান। সাজাহান নিজেই স্বীকার করেছেন : “সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরঞ্জীব পত্রে যা চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি।”

সাজাহানের এই ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর অপরিমেয় স্নেহই বৃন্দ্রশ্রংগের কারণ হয়েছে। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে বন্দী সাজাহান একাটির পর একটি আঘাতে, জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর অন্তর্জীবনের অসহায় আতর্ধর্নি নাটকখানির আবহাওয়াকে অশ্রুগম্ভীর করে তুলেছে। সাজাহান চরিত্র বাইরের দিক থেকে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু চরিত্রের অন্তঃস্থলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব নেই। নাটকের শেষে সাজাহান ঔরঞ্জীবকে মার্জনা করেছেন। এই নাটকের শেষে সাজাহানের মৃত্যু হয়নি, এমন কি স্পষ্টত কোনো বিপত্তিজনক সমাধান হয় নি। কিন্তু তার জন্য সাজাহান চরিত্রের ট্রাজিক-ব্যঞ্জনা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। একদিকে দারা, সুজা ও মোরাদের পিতা সাজাহান পুত্রবিয়োগের বেদনায় অধীর, অন্যদিকে সেই পুত্রঘাতী ঔরঞ্জীবের প্রতি তাঁর পিতৃহৃদয়ের অপার মমতা। ঔরঞ্জীবও যে তাঁর পুত্র! সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে এই ভেদ সৃষ্টি করে নাট্যকার সাজাহানের দ্বিধা-বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী চিত্র এঁকেছেন। শেষ দৃশ্যে ঔরঞ্জীবকে মার্জনা করার সময় সাজাহানের এই বিভক্ত বাৎসল্য-বৃত্তির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি লক্ষণীয় : “না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমস্তুর মুকুট তোমার।—আর মার্জনা! ঔরঞ্জীব—ঔরঞ্জীব! না, সে সব মনে করব না! ঔরঞ্জীব!—তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।”—এই দৃশ্যে ঔরঞ্জীবের প্রতি কোনো সহানুভূতি জাগে না। কিন্তু ‘ঔরঞ্জীবকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে পিতা সাজাহানের ট্রাজেডিই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। সাজাহানের এই স্বল্পায়ত উক্তিটি তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্যকেই উন্মোচিত করেছে।

ঔরঞ্জীব চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের এক অসামান্য সৃষ্টি। আপাতবিরোধী ভাববৃত্তির সমন্বয়ে চরিত্রটি জটিল হয়ে উঠেছে। সিংহাসনের জন্য যে কোনো প্রকার দুষ্কর্ম করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু প্রয়োজন হলে বা বেগতিক দেখলে মক্কা বা খোদার দোহাই দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এমন কি জাহানার তীব্র আক্রমণে যখন সমস্ত পরিবেশ ঔরঞ্জীবের বিরুদ্ধে, তখনো তিনি বাক্‌চাতুর্য, উপস্থিতবৃন্দ্র ও কপট অভিনয়ের দ্বারা এই সংকটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করেছেন। ঔরঞ্জীব রাজনৈতিক কূটকৌশলে সিদ্ধ, যে কোনো বিরুদ্ধ পরিবেশকে আয়ত্তে আনার জন্য বৃন্দ্র তাঁর অভাব হত না। নাট্যকার ঔরঞ্জীব চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সঞ্চার করেছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার সময় তাঁর চরিত্রদ্বন্দ্ব পরিষ্ফুট হয়েছে। পঞ্চমাঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে ঔরঞ্জীবের পাপাচরণ প্রতিক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ছবি আছে—“দারার ছিন্ন শির,” “সুজার রক্তাক্ত দেহ” ও “মোরাদের কবন্ধ” ঔরঞ্জীবের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠেছে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াধর্মী উত্তম চিন্তার আলোড়ন বিস্তৃতিতে ও গভীরতায় ট্রাজেডির নায়ক-সুদলভ মর্যাদা পায়নি। এই দৃশ্যটি ম্যাকবেথের ছায়াছবি, বা ব্যাণ্ডেকার প্রেতাঙ্গাদর্শন কিংবা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাঙ্গাদর্শন দৃশ্যের মত গভীরার্থদ্যোতক নয়।

সাজাহানের চার পুত্রের চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। দারা

তেতাল্লশ

অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে। দারা পিতৃভক্ত সন্তান, সন্তানবৎসল পিতা ও পত্নী-প্রেমিক স্বামী। দর্শন-উপনিষদে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকলেও জীবনযুদ্ধে তিনি তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুদৃশ্য বেদনার সঞ্চার করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু শোকাবহ ও করুণরসাত্মক হলেও ট্রাজিক হয়ে উঠতে পারেনি, তবে সেই করুণ সংবেদন সাজাহানের ট্রাজেডিকে বিশদ করায় সাহায্য করেছে। ‘সাজাহান’ নাটকে জাহানারার চরিত্রটি অগ্নিরেখায় অঙ্কিত। সাজাহানের অতিরিক্ত স্নেহদৌর্বল্যের পাশে জাহানারা যেন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা একটি ভারসাম্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন : “পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহেরই অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে।” জাহানারাই সাজাহানের কর্তব্য-পরায়ণ সন্মতসত্তাকে উদ্বেষিত করেছেন। বন্দী পিতার মৃত্তির জন্য তিনি ঔরঞ্জীবকে অনুনয় করেন নি, তিনি প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে শ্লেষতীক্ষ্ম বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন। জাহানারা বীরাজনা—প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গো ও তাঁর সম্পর্ক আছে কিন্তু এর জন্য তাঁর নারীসুলভ স্নেহমমতা বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় নি। রুগ্ন পিতার রোগশয্যায় তিনি কল্যাণময়ী মাতার মতই তাঁকে সেবা করেছেন, মাঝে মাঝে দুর্বলচিত্ত পিতাকে স্নেহশাসনও করেছেন।

‘সাজাহান’ নাটকের দিলদার আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। দিলদার প্রথমে ছিলেন মোরাদের বিদূষক। পরবর্তী কালে তিনি ঔরঞ্জীবের সভাসদের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। নাটকের শেষদিকে দিলদার ঔরঞ্জীবকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী মিজা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ হাজী। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি ‘পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে’ জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজা বাদশাহের অপদার্থ সভাসদ, ভাঁড়জাতীয় চরিত্রের স্থূল রসিকতার দ্বারা হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এই বিশেষত্ববির্জিত চরিত্রগুলিও যাত্রার বিদূষক শ্রেণীর চরিত্রেরই এক একটি উন্নত সংস্করণমাত্র। দিলদার চরিত্রটি এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

দিলদারকে একটি ‘সিরিয়ো-কমিক’ চরিত্র বলা যায়। ‘এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী’ বিদূষকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। দিলদারের ব্যঙ্গের আড়ালে আছে এক গভীর সত্যদৃষ্টি। দিলদারের হাস্যরসাত্মক সংলাপের মধ্যে আছে বাক্‌চাতুর্য (wit), সুকঠিন শ্লেষবাক্য (pun) ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাঙ্গ (satire) স্থূল হাস্যরস ও অতিরঞ্জিত ভাঁড়ামি দিলদার চরিত্রে অনুপস্থিত। দিলদার তাঁর নানা উক্তি মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার আভাসে ইঙ্গিতে তৎকালীন আবর্তসংকুল রাজনৈতিক জীবনেরই বিচিত্র ভাষ্য রচনা করেছেন। নির্বোধ মোরাদকে তিনি নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মূর্খ মোরাদ কোনোদিনই তা বুঝতে পারে নি। দিলদার বলেছেন : “আমি মূর্খে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্যপরিহাস করতে যাই, সে ব্যঙ্গের ধূম হয়ে ওঠে। মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে হাসে।” ঔরঞ্জীবের সভাসদ হয়েও দিলদার ঔরঞ্জীবকেও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তি ও সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। দারার মৃত্যুদৃশ্যে দিলদারের ছদ্ম-আবরণ অপসারিত হয়েছে—এক মূহূর্তে ‘এক করুণাকাতর মৃত্যুভয়হীন অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি’ আত্মপ্রকাশ করেছে। পাপী ঔরঞ্জীবের বিবেক জাগিয়ে দিয়েছেন দিলদার—বিদায়-মূহূর্তে ভারত-ঈশ্বর ঔরঞ্জীবের ঐশ্বর্যকে পদাঘাত করতেও তাঁর বাধে নি। ‘সাজাহান’ নাটকের দিলদার বিদূষক, সভাসদ, অনাসক্ত দ্রুটা, ঔরঞ্জীব চরিত্রের তীক্ষ্ম সমালোচক ও করুণাকাতর হৃদয়বান দার্শনিক। কোনো কোনো সমালোচক দিলদার চরিত্রের উপর ‘কিং লিয়র’ নাটকের ‘ফুল্’ চরিত্রের প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। ‘ফুল্’ রাজা লীয়রকে তাঁর কন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন; ঔরঞ্জীব সম্পর্কে মোরাদকে দিলদার সতর্ক করেছিলেন। স্বরূপত, দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। ‘ফুল্’ লিয়রের ট্রাজেডির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রাডলে বলেছেন : “Imagine the tragedy without him, and you hardly know it. To remove him would spoil its harmony, as the harmony of a picture would be spoiled if one of

the colours were extracted.” [*Shakespearean Tragedy* (1941), page 311]
সাজাহানের ট্রাজেডির সঙ্গে দিলদারের কোনো যোগ নেই। তাছাড়া, দিলদার চরিত্রটি ক্রমশ তার
রহস্যময় ঐশ্বর্যবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছে—‘কামিক’ উপাদান ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়ে
একটি ‘সিরিয়াস’ চরিত্রেই পরিণত হয়েছে। এই চরিত্র রচনায় নাট্যকার বিশিষ্ট শক্তির পরিচয়
দিয়েছেন।

কবিতা ও গান

আর্ষগাথা (১ম ভাগ) ৫ মার্চ, ১৮৮২ : আর্ষগাথা (১ম ভাগ) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম
গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

বিলাত যাইবার পূর্বে ‘আর্ষদর্শন’, ‘নব্যভারত’ ইত্যাদিতে লিখিতাম।...বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে
আমার বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া
তিনি যখন ভৈরো, আশোয়ারি ইত্যাদির সুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতাম।
শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। ‘আর্ষগাথা’-য় [১ম ভাগ, ইং ১৮৮২]
প্রকাশিত নক্ষত্রবিষয়ক গীতিটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি।...১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর
পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে ‘আর্ষগাথা’ নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন
কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল “দেবঘরে সন্ধ্যা”
নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা ‘নব্যভারতে’ [ইং ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়।

[নাট্যমন্দির, প্রাৰণ ১০১৭]

নিতান্ত অল্পবয়স থেকেই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ও গীতিকার-প্রতিভার বিকাশ
ঘটোঁছিল, এই গ্রন্থখানি তার প্রমাণ। ‘আর্ষগাথা’র ভূমিকায় কবি দুটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন।
‘আর্ষগাথা’র সাংগীতিক মূল্য সম্পর্কে কবি বলেছেন :

‘আর্ষগাথা’র সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি
গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গায়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায়, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু
আমরা গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের
নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য, অসৌন্দর্য স্বরের উপরই অধিক
নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সেজন্য ইহাদের ভাষায় ও
ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি
গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

‘আর্ষগাথা’র ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধী ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ
থাকা কর্তব্য যে, ‘আর্ষগাথা’ কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সমুদ্রভূত ভাবরাজি ভাষায়
সংগ্ৰহ।

দ্বিতীয়ত, ভূমিকায় কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও নির্দেশ করেছেন :

যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, ‘আর্ষগাথা’ তাঁহাদিগের জন্য রচিত
হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও
লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন
প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তম্ভ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সংকুল জগতে
দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবিরি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী
দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, ‘আর্ষগাথা’ তাঁহাদেরই আদর চাহে।

‘আর্ষগাথা’-র গান ও কবিতাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (ক) প্রকৃতিবিষয়ক
কবিতা (প্রকৃতি-পূজা), (খ) ঈশ্বরবিষয়ক কবিতা (ঈশ্বর-স্তুতি), (গ) বেদনানুভূতির কবিতা
(বিষাদোচ্ছ্বাস) ও (ঘ) দেশপ্রেমমূলক কবিতা (আর্ষবীণা)। “দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যে জীবন
সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, থাকা সম্ভব ছিল না—এ যেন একটি অস্পষ্ট নীহারিকার জগৎ।
তাই ‘নক্ষত্র’, ‘আকাশ’, ‘জ্যোৎস্নাস্নাত গগনে মেঘখন্ড’, ‘মেঘ’, ‘কাননকুসুম’ প্রভৃতি নিয়ে আপন
মনের একটি কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছেন। কবি তখনো মানবজগতের মধ্যে প্রবেশ করেন নি।

প্রকৃতির কবিতা হিসাবেও এদের কোনো স্বতন্ত্র রূপ নেই—একটি অস্পষ্ট ছায়া-গোধূলির রাজ্য—কবির অপরিষ্কৃত মানসলোকের ও ছায়াময় অস্তিত্বের স্বপ্নসহচর মাত্র।”

‘প্রকৃতি-পূজা’ অংশের কোনো কোনো কবিতায় বিহারীলালের কাব্যের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি থাকলেও বিহারীলালের কবিতার ধ্যাননিবিষ্টতা ও নির্জন মনের স্বাক্ষর এখানে অনুপস্থিত। কবির অন্তরের বেদনা ও বিষণ্ণতা প্রকৃতির দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি সুগভীর আকর্ষণ কবিচিন্তের ভাব-ভূমিকে স্নেহ-প্রীতি, বেদনা ও ঐক্যানুভূতির বিচিত্র বর্ষণে অভিষিক্ত করেছে। ‘বিষাদোচ্ছ্বাস’ অংশটিতে কবিমনের বিষণ্ণতা আরো পরিষ্কৃত হয়েছে। ‘ঈশ্বরস্তুতি’ কবিতাগুচ্ছের কোনো আধ্যাত্মিক গভীরতা নেই, সুলভ নীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। ‘আর্ষবীণা’ অংশের সাঁইত্রিশটি গানে দেশপ্রেমের উদ্বেগধন করা হয়েছে। পরবর্তী কালে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকে ও দেশপ্রেমমূলক বিখ্যাত সংগীতগুলিতে তিনি যে আদর্শ-বাদের কথা বলেছেন, গানগুলি তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থই পাশাপাশি দুটি মনের অস্পষ্ট ছায়া বিদ্যমান। একটি হল তাঁর বহির্মুখী গীতিধর্মী কবিচিন্তা, আর একটি হল তাঁর সামাজিক মন—যে মন দেশের অধঃপতনের কথা ভেবে বেদনাতুর হয়, যে মন জাতীয় জীবনের জড়ত্বকে পাণ্ডজন্য ধ্বনিত উদ্বেগিত করতে চায়। অবশ্য প্রথম কাব্যে অনুভবের চেয়ে ভাবিতরেকের প্রাবল্য অনেক বেশি। বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র দুজনার প্রভাবই পাশাপাশি চলেছে, সমুদ্রসম্পর্কিত কবিতায় বায়রনেরও প্রভাব আছে, ‘আর্ষবীণা’ অংশে মূরের ‘আইরিশ মেলোডিজ’-এরও দু’একটি গানের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখনো তাঁর প্রতিভার স্বক্লেত্র খুঁজে পান নি।...‘আর্ষগাথা’ পূর্ণশক্তির কাব্য নয়, কাব্যকোত্‌হল মাত্র...এর বেশি এ কাব্য আর কিছু দাবি করে না।

[দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, পৃ. ৯৩-৯৪, রথীন্দ্রনাথ রায়]

আর্ষগাথা (২য় ভাগ) ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ : ‘আর্ষগাথা’ (প্রথম ভাগ) ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দশ বছরেরও বেশি ব্যবধান। এই দশ বছরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। কবি ভূমিকায় লিখেছেন :

দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আশ্বি আর পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নাই।—

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল;

উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।

মলয়ানিলসম্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।

এই দশ বৎসর বঙ্গভাষাও কত অমূল্য রত্নে অলংকৃত হইয়াছে। যখন আর্ষগাথা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সংগীত গ্রন্থ ছিল না। তাই বৃষ্টি সে আদর পাইয়াছিল। আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী গীতিধ্বনির, শত কোমল বেগুবীণাঝংকারের ভিতর, আজ এই পুরাণ সূর কি কেহ শুনিতে চাহিবে?

‘আর্ষগাথা’ প্রথম ভাগে বেদনার চেয়ে বিলাস ছিল বেশি, সাধের চেয়ে সাধা ছিল অনেক কম। তখন কবি ছিলেন অনাভিজ্ঞ, জগতের ‘দূরস্থ-পরিদর্শক’ মাত্র। কিন্তু দশ বছর পরে কবি ত্রিশ বছরের বিবাহিত যুবক। প্রকৃতির ছায়াচ্ছন্ন জগতে তিনি আর বিচরণ করেন না, তিনি মানব-লোকে প্রবেশ করেছেন। ‘আর্ষগাথা’ দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতঃ-স্ফূর্ত ও অকৃত্রিম গীতিধর্মিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোকে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল, তাই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। ‘আর্ষগাথা’ দ্বিতীয় ভাগ কাব্যের মূল উৎস নারীপ্রেম—পত্নী সুরবালা দেবীই এই কাব্যের সৌন্দর্য ও প্রেম্যানুভূতির কেন্দ্রস্বরূপিণী। ‘আর্ষগাথা’-র কয়েকটি কবিতায় গীতিধর্মিতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এক তন্দ্রাতুর সুখালসাময় অনুভব কবিতা ও গানগুলির উপরে এক সুস্কন্দ সুরের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। কবির স্বপ্নবিহীন মনের এমন সুরধর্মী ও আত্মতন্ময় প্রকাশ তাঁর

ছেচাঙ্গশ

পরবর্তী কাব্যগদ্যের মধ্যেও দুর্লভ। বিশ্বপ্রকৃতিও প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আবার প্রকৃতির প্রসাধন-বৈচিত্র্যে কবি তাঁর প্রেয়সীকে নতুন আভরণে সাজিয়ে তুলেছেন। “রক্তমাংসের মানবী ও বাসনালক্ষ্মী—দুজনকেই কবি একই হৃদয়বেগের দ্বারা আরাতি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব সময় যেন ‘সরুমোটা’ দুটি তার এক হয়ে ওঠে নি। রক্তমাংসের মানবীসত্তা যখন জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে, তখন কবিমনের লিরিকপ্রবণতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু যেখানে গৃহিণী সুরবালার মানবীসত্তাই কবিদৃষ্টিতে বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে কাব্যসৌন্দর্য খণ্ডিত হয়েছে। লিরিকের মৃদু-মৃদুর্নাও অন্তর্হিত হয়েছে।”

‘আর্যগাথা’ দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনায় (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর আলোচনায় প্রথমে ‘বিশুদ্ধ কাব্য’ ও ‘বিশুদ্ধ সংগীত’-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন :

বিশুদ্ধ কাব্য ও বিশুদ্ধ সংগীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাহারা কখনো কখনো একত্র মিলিয়া থাকেন। সংগীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সংকুচিত করিয়া লন, কাব্যে আপন বিচিত্র অলংকার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সংগীতেও আপন তালসুরের উদ্দামলীলাভঙ্গকে সংবরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিয়া থাকেন।

হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সংগীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে-একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এ-দেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এ-দেশে সংগীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাব্যও সুর-সহকারে সর্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণব কবিদিগের গানগদ্য ও কাব্য—কেবল চারিদিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগদ্য তাহাদের ডানাস্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্য রচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

‘আর্যগাথা’-র রচনাগদ্যকে লেখক দু’শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : “ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্য সমালোচনার অধিকারবিহীন। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ—যাহা পাঠমাত্রই হৃদয়ে ভাবের উদ্বেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে।” রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রকাব্য থেকে উদ্ধৃতি-সহযোগে তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করেছেন। যে সমস্ত কবিতায় গীতিরসের আশ্বাদন ব্যাহত হয়েছে, সেখানে কাব্যরীতি ও ভাষা অনেক সময় অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। “যে সমস্ত কবিতায় প্রচলিত ছন্দোবিধি ও মঙ্গল সুরকুমার বাণীভঙ্গিকে কবিতার ভাষায় পরিণত করা হয়েছে সেখানে গীতিধর্মের ললিত লীলাস্পন্দন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ঘটে নি—সেখানে অল্প-বিস্তর সংকেত-ব্যঞ্জনাও আছে। কিন্তু যেখানে কবিতার মধ্যে গদ্যাঙ্ক কাব্যরীতি, সংলাপাঙ্ক ভাষা ও যুক্তির ভাষা এসে পড়েছে, সেখানে কবিতার স্বচ্ছন্দ লিরিকপ্রবাহ উপলব্ধির কাব্যভূমিতে নানাভাবে প্রতিহত হয়ে একটি তীক্ষ্ণগ্র তির্যকরূপ লাভ করেছে।” কিন্তু বিশুদ্ধ লিরিক হিসাবে ‘আর্যগাথা’র কয়েকটি কবিতার কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য।

‘আর্যগাথা’ কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি গীতিধর্মী হলেও কখনো কখনো যুক্তিপ্ৰধান গদ্যাঙ্ক ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তিকে আর এক পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবু বিশুদ্ধ লিরিক ও প্রেমগাথা হিসাবে বিচার করলে ‘আর্যগাথা’র শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য। এই কাব্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাদের দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমগীতিকা বলা যায়। উচ্ছ্বাসিত প্রণয়াবেগ, চিরন্তন প্রেমরহস্যের গভীর উপলব্ধি এই প্রণয়সংগীতগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে এর অনেকগুলি গান তিনি নাটকে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটি বিখ্যাত গানে :

আয়রে বসন্ত তোর ও
কিরণ-মাথা পাখা তুলে।

সাতচর্চাশ

নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির
গানের পাতা গানের ফুলে।

শুদ্ধ পদ্যরাগের হৃদয়োচ্ছ্বাসই নয়, অতীত প্রেমের স্মৃতি ও বেদনানুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে :

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে;
যদুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।

যৌবন-বেদনার লীলারূপই নয়, প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধিও এই কাব্যের প্রেমগীতিতে ঝংকৃত হয়েছে :

তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যদুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।

নিবিড় মিলনের মধ্যেও সুগভীর বিরহের অনুভূতি জেগে থাকে। এ যেন বৈষ্ণব কবি বর্ণিত সেই ‘দহুঁ কোরে দহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।’ কবিতাটির শেষাংশে কবি ব্যক্তিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে এক অসীম ও শাস্বত প্রেমের ব্যঞ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে বিশ্বব্যাপক করে তুলেছেন।

‘আষাঢ়ে’ (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের প্রথম্যাংশে (কুহু) যেমন মৌলিক কবিতাগর্ভে সংকলিত হয়েছে, তেমনি এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশে (পিউ) কবি কয়েকটি “অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজি স্কচ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ” করেছেন। বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতি গানের চর্চা করেছিলেন। বিদেশী গানের অনুবাদেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মৌলিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনীমূলক গাথা, কবিতা, প্রেম ও লৌকিক জীবনাশ্রয়ী কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা প্রভৃতি বিচিত্রবিষয়ক কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। গ্রাম্য গাথাগর্ভে স্থানিক ও আঞ্চলিক পরিবেশ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সহজ কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। *Auld Robin Gray, We're a Noddins, Caller Herring, Won't you buy my pretty flowers', Erin ob Erin* প্রভৃতি গানের অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য অনুবাদগুলির মধ্যে কোনো গ্রন্থি নেই একথা বলা যায় না। *Under the green wood tree*-র মত সুবিখ্যাত গানের অনুবাদে আড়ম্বল্য আছে—গানটির অন্তর্নিহিত লিরিসিজম তাই পরিস্ফুট হতে পারে নি। *Home, Sweet Home*-ও খুব রসোত্তীর্ণ অনুবাদ নয়, আড়ম্বল্য আছে। *Rule Britannia*-ও খুব ভালো অনুদিত হয়নি—প্রকাশরীতির মধ্যেও গদ্যাঙ্কক ভাঙে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অনুবাদ-সংগীতগুলির ভাষা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে অনুবাদ সংগীতগুলির মধ্যে অনুবাদক ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় পাওয়া যায়।

আষাঢ়ে (ডিসেম্বর ১৮৯৯) : ‘আষাঢ়ে’ দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক কাব্য হলেও একে আকস্মিক বলা যায় না। গীতিধর্মিতার অন্তরালে দ্বিজেন্দ্রমানসে যে শৈলবন্ধুর কঙ্করময় একটি অংশ ছিল, ‘আষাঢ়ে’র মাঝে মাঝে তার উগ্র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে—সেখানে গান নেই, আছে সংলাপাত্মক গদ্য, আছে যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণী ভাষা। ‘আষাঢ়ে’ কাব্য সম্পর্কে আর একটি কথাও মনে রাখার প্রয়োজন। ‘আষাঢ়ে’ প্রকাশের আগে ‘হাসির গান’-এর কয়েকটি গানও লেখা হয়েছিল। সেই গানগুলি অবলম্বন করে ‘আষাঢ়ে’ প্রকাশের আগেই তিনি দুখানি প্রহসন লিখেছিলেন—‘কল্কি-অবতার’ (১৮৯৫) ও ‘বিরহ’ (১৮৯৭)। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের মানসলোক বিদ্রুপাত্মক রচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিল। ‘আষাঢ়ে’ কাব্যকে তাই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার পক্ষে আকস্মিক বলা যায় না।

আটচাল্লিশ

‘আষাঢ়ে’ কাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্যরীতির সংকেত এর ‘ভূমিকা’র মধ্যেই নিহিত আছে :

“আষাঢ়ে”র গল্পগদ্য প্রায় সবই ইতিপূর্বে সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপে বাহির হইয়াছিল। অদ্য সেই বিচ্ছিন্ন কবিতাগদ্য একত্রে প্রকাশিত হইল।

এ কবিতাগদ্যের ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যে রূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?

‘আষাঢ়ে’-র গল্পগদ্য একজাতীয় নয়; এদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে। ‘কেরাণী’ কবিতায় চাকুরিজীবনের বিড়ম্বনা ও রক্ষণ বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। এই ছন্দোহীন রোমান্স-বর্জিত জীবনের প্রতিটি অসংগতি হাস্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ‘অদলবদল’ কবিতার কোতুকরস সৃষ্টি হয়েছে ঘটনাসংস্থানের কোতুকর অসংগতি থেকে। ‘হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা’ গল্পটিতে নববিবাহিত হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রার কোতুকর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাস পড়ে হরিনাথের মনে যে রোমান্স-রসের উদ্রেক হয়েছিল, তা বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হয়েছে। দাড়ির কাহিনী যুক্ত করে কবি এই কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। ‘রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা’ কবিতাটির মূল রসকেন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত। গল্পটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের কোনো গভীর সংযোগ নেই। বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে এর মূল্য থাকলেও ব্যঙ্গগল্পের সংহত রূপের অভাব আছে। ‘কর্ণবিমর্দন কাহিনী’ দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের অসংগতি হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘আষাঢ়ে’ কাব্যটির মধ্যে বিশুদ্ধ কোতুকরস ছাড়া সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও আছে। ‘শ্রীহরি গোস্বামী’, ‘বাংগালী মহিমা’, ‘ভট্টপল্লীতে সভা’, ‘নসীরাম পালের বক্তৃতা’, ‘কলিযুগ’, ‘শুকদেব’ প্রভৃতি কবিতার মূলরস স্যাটায়ার। ‘ডেপুটি-কাহিনী’ ও ‘বাংগালী মহিমা’তেও বিদ্রুপ আছে, কিন্তু বিদ্রুপের চেয়ে সেখানে কোতুকই বড় হয়ে উঠেছে।

এই কাব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি ইংরেজি ব্যঙ্গকাব্যের কাছে স্বগম্বীকার করেছেনঃ “বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাংলা কবিতা লিখিয়া ‘আষাঢ়ে’ নামে প্রকাশ করি।” [আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭]। রেভারেন্ড রিচার্ড হ্যারিস বারহাম (১৭৮৮-১৮৪৫) রচিত ‘ইনগোল্ডসবি লিজেন্ডস্’ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৮৪০) ইংরেজি সাহিত্যের ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক কবিতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ‘আষাঢ়ে’-র সঙ্গে ইংরেজি কাব্যখানির কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুটি বিষয়ে ইনগোল্ডসবির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মিল আছে। ইনগোল্ডসবি সামাজিক অসংগতি দূর করতে চেয়েছিলেন—তবে অন্যভাবে—

Had they come from other hands, some of the *Legends* might more easily have incurred the charge of irreverence; but *Ingoldsby* is the work of a dignified, respected and christian-heart clergyman, whose only concern at the end of his life was that his purpose should be recognised for what it was—an honest endeavour to combat error and imposture in an age of scientific doubt and unrest.

[The Ingoldsby Legends. Edited by John Tanfield and Guy Boas. Introduction, Page X]

ইনগোল্ডসবি প্রসিদ্ধ গাথা ও কাহিনীকে লঘুভঙ্গিতে বলেছেন। ইনগোল্ডসবির moral-এর অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কোনো কোনো কবিতার শেষে মর্মার্থ যোগ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার টেকনিক্ সর্বত্র সমানভাবে সার্থক না হলেও তার ‘শোষণশক্তি’র অসামান্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ থেকে চলিত ভাষা,

উনপঞ্চাশ

আঞ্চলিক ভাষা, এমন কি ‘স্ল্যাং’ পর্যন্ত কবি ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দী, আরবি-ফারসি, সংস্কৃত নানাজাতীয় শব্দের বিচিত্র মিশ্রণে তিনি এই কাহিনীগদ্য রচনা করেছেন, ছন্দের ছাঁচের মধ্যে ঢেলে সবগদ্যলিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়েও তিনি ইনগোল্‌সবিরও অনুসরণ করেছেন। বারহামের কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

With Barham the fantastic rhyming is part of his facile versification. True, he generally used a loose metre, designed for portmanteau purpose: but even so, his verses has an ostrich stomach. Legal jargon, current slang, quotations in four or five languages, and untractable proper names, all drop into his scurrying pace. Occasionally he solves the problem by splitting a word at the end of the line.

[The Ingoldsby Legends: Edited by John Tanfield and Guy Boas, Introduction. Pp. XIII—XIV]

বলাবাহুল্য এর অনেকগদ্য বৈশিষ্ট্যই ‘আষাঢ়ে’ কাব্যের কাব্যরীতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আষাঢ়ে’ কাব্য প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের এক সমালোচনা লেখেন (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫) এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে আলোকপাত করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য :

প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা, আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পর পরিণতি সহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিষ্কৃত করিয়া তুলে। “আষাঢ়ে”র গ্রন্থকর্তা যতগদ্য কবিতা লিখিয়াছেন, সকলের মধ্যে তাহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগদ্য তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নূতনদের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কবিও তাহার অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্বনিকল্প রচনা করিবে।

প্রবন্ধটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

তাছাড়া সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে “আষাঢ়ে” রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রু-রেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাহার কবিদের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে সকল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।

হাসির গান (১৮ জুলাই ১৯০০) : ‘হাসির গান’ পুস্তকাকারে পরবর্তী কালে প্রকাশিত হলেও এর অনেকগদ্য ‘আষাঢ়ে’ প্রকাশের অনেক আগেই রচিত হইয়াছিল। ‘হাসির গান’-এর জনপ্রিয়তা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন :

বিবাহান্তে অনেকগদ্য প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্ষগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগদ্য হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগদ্য অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্ণোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐসকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগদ্য একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।

‘আষাঢ়ে’র হাস্যরস অপেক্ষা এই গ্রন্থের হাস্যরস পরিণত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই দুই হাস্যরসাত্মক কাব্যের তুলনা করলে বলা চলে—

‘আষাঢ়ে’ বিদূষ-কৌতুকের প্রথম জলোচ্ছ্বাস—প্রথম বর্ষার আকস্মিক যৌবন-সম্ভারের একটি প্রগল্ভ ও দুর্বিনীত আবেগ, তাই অসম পদক্ষেপের স্থলনচিহ্নও সেখানে অনুপস্থিত নয়। ‘হাসির গান’ কবির বিভিন্ন বয়সের সংগীত-সংকলন—বিষয়-বৈচিত্র্য ও রসবৈচিত্র্যে রচয়িতার অনন্যসাধারণ শক্তিমন্তর পরিচয় বহন করে। ‘হাসির গান’-এর কোনো কোনো রচনার যৌবনের

উচ্ছলতার সঙ্গে প্রৌঢ়ের স্থিরদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। তাই 'হাসির গান' হাসির গান হয়েও যেন আরো-কিছু—হাসি ও অশ্রু যেন এক এক সময় সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়।

[দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার, রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ১২১]

'তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য সংবাদ', 'রাম-বনবাস', 'দুর্বাসা', 'কালোরূপ', 'কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ' প্রভৃতি গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সুকৌশলে কালগত অসংগতি সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাস-পুরাণ সম্পর্কে যার স্বল্পতম জ্ঞানও তিনিও পড়তে পড়তে হাস্যকর অসংগতির সঙ্গে বহুবার ধাক্কা খাবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উৎকট-মধুর, লঘু-গুরু, সম্ভব-অসম্ভব, আপাত-বিপরীত রসগুণিকে একই পায়ে পরিবেশন করেছেন।

কতকগুলি গানে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসংগতিকে কশাঘাত করা হয়েছে। 'Reformed Hindoos,' 'বিলাতফের্তা,' 'চম্পটির দল,' 'নতুন কিছু করো,' 'নবকুলকামিনী,' 'বদলে গেল মতটা' প্রভৃতি কবিতায় ও গানে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমকালীন দেশকালের ব্রুটি-বিচ্যুতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পাঁচকাড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙালায় ভাবস্বাধীনতা ঘটিয়াছিল। 'ন্যাকামি'র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানি করিয়া, দেশীয় শৈল্যের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙালী সমাজে একটা ভারবিন্দু ঘটাইয়াছিল।

[সাহিত্য, আশা ১০২০]

বিলাত ফেরত সমাজের অসংগতির ছবিগুলি কবি ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। সামাজিক 'উলট-পুরাণ' সম্পর্কে চমৎকার একটি মন্তব্য—“বিলাত-ফের্তা টানছে হুঙ্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভাচারি।” একটি উপমার বিদ্যুচ্চমকে বৃন্দ ভণ্ড ধর্ম-ধ্বজীর মনের গোপন অন্তঃপুর আলোকিত হয়েছে—“ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসেছেন আহিকে।” 'নবকুলকামিনী'দের আচরণগত অসংগতিও ব্যঙ্গকবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ফুটে উঠেছে। 'ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়িমটা ধর্ম'—এই মন্ত্র যারা সার করেছে, তাদের নিবীৰ্যতাকে তিনি করেছেন নির্মম পরিহাস! ধর্মধ্বজী ভণ্ডদের যখন তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন—“আর মুরগী খাইনা, কেন না পাই না, হয় যদি বিনা খরচই”—তখন স্পষ্টবাদী কবির এই শ্লেষোক্তিতে হাস্যবেগ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শৌখীন ও বাকসর্বস্ব দেশসেবক, ধর্মধ্বজী ভণ্ড, ফাঁকিবাজ, ধাম্পাবাজ, উৎকট ভাবপ্রবণ, প্রাচীন পন্থী ও নবীন পন্থী, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মন্থোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। আত্মম্ভরি কবি (কবি), অলস কর্মহীন অপদার্থ (কি করি), ধর্মের মন্থোশপরা প্রতারক (গীতা) প্রভৃতি সম্প্রদায়কে তিনি বিদ্রুপ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি মালিয়েরের নাটক ও প্রহসনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারিডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গভীরভাবে অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা অবলম্বন করে তিনি প্যারিডি রচনা করেছেন। 'হাসির গান'-এর 'এস এস বন্ধু এস' কবিতাটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতার ব্যাঙ্গানুকৃতি। 'আমরা ও তোমরা' ও 'তোমরা ও আমরা' কবিতা দু'টি রথীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' (সোনার তরী) কবিতার সার্থক প্যারিডি।

কতকগুলি হাসির গান প্রেম, পরিণয় ও নরনারীর রোমান্সকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে। প্রেমসম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণা ও ভাবপ্রণতাকে নিয়ে তিনি রঙ ও ব্যঙ্গ দুই-ই করেছেন। প্রেমের তথাকথিত রঙীন আবরণ ভেদ করে তিনি এক গদ্যাত্মক বাস্তব অসংগতিও নিজে দেখিয়েছেন। বিয়ের পর যাকে উর্বশীর মত মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে মোহপাশ ছিন্ন হওয়ার

একম

ফলে কিভাবে রোমান্সের স্বর্গলোক থেকে পতন হল তারও কোতুককর বিবরণ দিয়েছেন কবি :

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
উর্বাশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হল পতন—
রচোঁছিলাম যাহারে
ভাবলাম বাহা বাহারে।

কিন্তু নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রুপই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মূলসূত্র নয়, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে একটি সহানুভূতিপ্রবণ আবেগময় কবিচিত্ত ছিল। তাঁর হাস্যরস সূক্ষ্ম কলাকৌশলের উপরে নির্ভরশীল নয়, তাঁর হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সশব্দ। জীবনের সত্য, নিষ্ঠুরতম করুণতম সত্য, তাঁর হাসির মধ্যে যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন তারই আলোকে আমাদের মূখচ্ছবি বিবর্ণতা ধরা পড়ে, তখন হাসতে গিয়ে নিজেরই হাসির শব্দে অন্তরাগ্না কেন্দ্রে ওঠে। 'জগৎ', 'পৃথিবী', 'সংসার' প্রভৃতি কবিতায় ব্যঙ্গরস বা হাস্যরসের ছন্দ-আবরণের মধ্য দিয়ে কবির জগৎ ও জীবনের কতকগুলি সত্যানুভূতির অদ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 'যেমনটি চাই তেমন হয় না'—জীবনে এর চেয়ে সত্য আর কি আছে? দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের বহু উপকরণই স্থূল, কিন্তু সেই দৈনন্দিন জীবনের স্থূল উপকরণগুলিকেই তিনি উন্নত শিল্পমর্যাদা দিয়েছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। 'হাসির গান' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই ক্লাসিক গ্রন্থটি সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

...ভন্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাত্মা, সে আত্মা শিশুর মত অসহায় ও সরল, একটু কৃত্রিম বা খাঁটি আনন্দ, সৌন্দর্য, উল্লাস দিয়া খেলাঘর সাজাইতে সর্বদাই ব্যস্ত। এই খেলাঘর বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া যাইতেছে, সেইজন্য মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন। এই ক্রন্দনের রোল 'হাসির গানে'র প্রতি মূর্ছনায় ও ঝংকারে ধ্বনিত হইতেছে।

[দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান : অমূল্যধন মূখোপাধ্যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য']

গদ্য রচনা

ভূমিকা : সুরকার, কবি ও নাট্যকার হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু কবিতা, গান ও নাটক ছাড়াও তিনি পত্রসাহিত্য, রসরচনা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। কবিতা, গান ও নাটকের তুলনায় বিচিত্র শ্রেণীর গদ্যরচনাবলী পরিধিতে ও সাহিত্যিক মূল্য-বিচারে অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানস ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য বিচারের পক্ষে এই জাতীয় রচনার মূল্য নিতান্ত কম নয়।

একসঙ্গে (২ জানুয়ারি, ১৮৮৯) : বিলাতযাত্রা ও বিবাহ অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলালকে যে সামাজিক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছিল, তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই নকশাখানি রচনা করেছিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দকে তাঁর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। এই রচনায় তাঁর ক্ষুব্ধ অভিমান সমস্ত সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র ১২৯৭) পত্রিকায় পুস্তিকাটি প্রশংসিত হয়েছিল :

পূর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দু সমাজকে অস্বাভাবিক আক্রমণ করিয়াছেন, বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক শেলষবাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্মপীড়িত হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা গালি দেওয়া নহে, তাহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে

এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি (১০ আগস্ট, ১৯১৫): ‘কালিদাস ও ভবভূতি’ ১৩১৭-১৮ সালে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখকের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় এই গ্রন্থের ‘নিবেদন’-এ বলেছেন :

স্বর্গীয় পিতৃদেব মাসিক পত্র—‘সাহিত্যে’ “কালিদাস ও ভবভূতি”—অর্থাৎ ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ ও ‘উত্তরচরিতে’র সমালোচনা বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমালোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল এবং সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন বারে প্রকাশিত স্বতন্ত্র অংশগুলি তিনি একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

‘কালিদাস ও ভবভূতি’ দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত মানসের রচনা। এই দুই কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা-গুলিও মনস্বিতার পরিচয় দেয়। কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যের ষড়্গলরত্ন! স্বভাবতই এই দুই কবির প্রতিভা সমালোচকদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে অনেকেই নানাদিক থেকে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমালোচনার চেয়ে বিস্তৃততর ও পূর্ণাঙ্গ এই গ্রন্থে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তরচরিত অবলম্বন করে উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আখ্যায়িকা-বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, নাটকত্ব, কাব্যসৌন্দর্য, রসবৈচিত্র্য, ভাষা-ছন্দ-অলংকার অতিপ্রাকৃত সন্নিবেশ প্রভৃতি নানাদিক থেকে তিনি নাটক দুটির বিচার করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আখ্যায়িকা বিশ্লেষণ করেছেন। সমালোচকের মতে গান্ধর্বিবিবাহ, অভিজ্ঞান ও দূর্বাশার অভিশাপবৃত্তান্তের দ্বারা কালিদাস দৃষ্টিমন্তকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। ভবভূতিও সীতানিবাসন ও শূদ্রকহত্যাব্যাপারে রামচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব দোষ-মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সীতানিবাসন ব্যাপারে প্রজান্দুরঞ্জনরূপ কর্তব্যকেই দায়ী করা হয়েছে। ভবভূতির রামচন্দ্র কৃপা করে তরবারের দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করেছেন। সমালোচকের মতে এর প্রধান কারণ হল, অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা। তিনি এখানে শেক্সপীয়রের নায়ক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এ কথাও ভেবে দেখতে হবে যে, ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ঠিক একবস্তু নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল শকুন্তলার মিলনান্ত পরিণতি সমর্থন করলেও উত্তরচরিতের রাম ও সীতার মিলনকে সমর্থন করতে পারেন নি।

কালিদাস ও ভবভূতি গ্রন্থের ‘নাটকত্ব’ অংশটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই অংশে দ্বিজেন্দ্রলাল সংক্ষেপে নাট্যতত্ত্বের কতকগুলি মূলসূত্র আলোচনা করেছেন। ঘটনার ঐক্য, ঘটনার সার্থকতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কবিত্ব, চরিত্রচিত্রণ, স্বাভাবিকতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে ঘটনার ঐক্য, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্তর্বিবোধ চিত্রণে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত নাটক বিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য নাট্যবিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু দৃষ্টিমন্ত চরিত্র বিচারে যে অন্তর্বিবোধের কথা উল্লেখ করেছেন, তা পাশ্চাত্য নাট্যসূত্রানুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির নারীসৌন্দর্য বর্ণনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সূক্ষ্মরসবোধ ও পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—“কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শূদ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ।” হাস্যরসের রীতিনীতি সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হাস্যরসের মধ্যে তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—ব্যঙ্গ, পরিহাস ও হিউমার।

তিপ্পার

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্বিজেন্দ্রলালের 'কালিদাস ও ভবভূতি' একটি মূল্যবান সংযোজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার যে নতুন-ধারা, নতুন বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, শ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা গ্রন্থটি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) প্রকাশের পর থেকে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কবিকৃত বিচার ও ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু শ্বিজেন্দ্রলাল নিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্যপথ। গ্রন্থটির শেষদিকে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮) ও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সম্পর্কিত আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন :

আমার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুঃস্মৃত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এই নাটকে দেখান হইয়াছে, প্রেমে কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠা-ব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন।...আমি এইরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যা বিবেচনা করি না।

[সংসদ সং, পৃ. ৬৮৮]

শ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীমানসের মধ্যে একটি প্রোঞ্জবলবুদ্ধি যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল, তিনি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করতে চান নি। শ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণ প্রধান—সেখানে বস্তুবিশ্লেষণই প্রধান্য লাভ করেছে, লেখকের 'মনের মাধুরী' প্রধান হয়ে ওঠে নি। যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও মৌলিক চিন্তার সঙ্গতিপূর্ণতায় শ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা গ্রন্থটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্বিজেন্দ্রলালের কিছু কিছু রচনা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলি কোনো গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। শ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ডের মধ্যে এরূপ আটটি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্বিজেন্দ্রলালের স্বরচিত জীবনী 'জন্মভূমি' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩০৪) প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে শ্বিজেন্দ্রজীবনের দু'একটি মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' (নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭) প্রবন্ধ শ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের প্রচুর তথ্য সমৃদ্ধ। 'অভিনেতার কর্তব্য' (নাট্যমন্দির, ভাদ্র, ১৩১৭) প্রবন্ধে নাট্যকার শ্বিজেন্দ্রলালের অভিনয়-সম্পর্কিত নির্দেশনা মূল্যবান। 'কাব্যনীতি' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬) প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য। এই প্রবন্ধে শ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সংগীত থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ করেন। এই প্রবন্ধকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। প্রিয়নাথ সেনের 'চিত্রাঙ্গদা' (সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৬), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'কাব্য সমালোচনা' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৬), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৬) এই বাদ-প্রতিবাদকে মন্থরোচক করে তুলেছিল।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৫)
বাংলা সাহিত্য বিভাগ }
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় }

পাষণী

পুরুষ-চরিত্র

মহর্ষি গৌতম। রাজর্ষি জনক। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। মহারাজ দশরথ। শতানন্দ (গৌতমের পুত্র)। চিরঞ্জীব (গৌতমের শিষ্য)। ইন্দ্র। মদন। শ্রীরাম। শ্রীলক্ষ্মণ। বশিষ্ঠ। বসন্ত। অন্যান্য দেবতাগণ, তাপস বালকগণ, যোগিগণ, পুরুবাসিগণ, পুরোহিতগণ, ভৃত্য, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অহল্যা দেবী (গৌতমের স্ত্রী)। শচী (ইন্দ্রের স্ত্রী)। রতি (মদনের স্ত্রী)। মাধুরী (গৌতমের শিষ্যা ও চিরঞ্জীবের স্ত্রী)। অন্যান্য দেবীগণ, তাপস বালিকাগণ ও পুরুবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত।
জনক ও বিশ্বামিত্র কক্ষ দিয়া চলিয়া
যাইতেছিলেন

বিশ্বামিত্র। রাজর্ষি জনক! এই ব্রাহ্মণ? এত
করে দর্প বিপ্র জাতি এই সম্পদের?
হেলায়, ইঙ্গিতে, আমি তুচ্ছ তপস্যায়
লভিয়াছি তাহা; সম হেলায় তাহারে
বিনা ক্ষোভে অনায়াসে পথের কন্দর্মে
ছুড়ে ফেলে দিতে পারি।

জনক। বিশ্বামিত্র ঋষি
করিও না অহঙ্কার! লভিয়াছ যদি
ব্রাহ্মণ্য তুমি, তাহা বিপ্রেয় বিনয়ে
আপনার গুণে নহে! জানিও তথাপি,—
যদিও ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার আসন
ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে।

বিশ্বামিত্র। প্রমাণ?

জনক। “প্রমাণ?”
যাও ঋষি এক দিন গৌতম-আশ্রমে
নদীর অপর পারে; পাইবে প্রমাণ!

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি গৌতম? পত্নী অহল্যা ষাহার
অনিন্দ্যসুন্দরী! গৃহী তাঁহার আসন
আমার উপরে?

জনক। বহু উর্ধ্ব বন্ধুবর!

দেখিও চাক্ষুণ্য।

বিশ্বামিত্র। সত্য? উত্তম! দেখিব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—তপোবনাভ্যন্তরস্থ বন্য-বীথী। কাল—প্রভাত।
পরিব্রজমান তাপস বালকবালিকাগণ

তাপস বালকবালিকাদিগের গীত

বনের তাপস মোরা থাকি বন ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যামপদ্মপত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় মোদের ‘ঢালি’ স্বরসুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর ছায় বোসে থাকি, চাহিয়া,
দেখি নদী বহে’ যায় কুলদ্রবে গাহিয়া;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি, অধরে মধুর হাসি,
শুনান অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এখানে কে আছি? স?
তাপস বালকবালিকাগণ। এই যে আমরা।
চিরঞ্জীব। হুঃ, তোরা ত ভারি লোক!
যাঃ—

তাপস বালকবালিকাগণ যাইতে উদ্যত
চিরঞ্জীব। আচ্ছা দাঁড়া, তোদের দিয়েই
হবে। আরে শোন্ শোন্।

তাপস বালকবালিকাগণ। কি?
চিরঞ্জীব। ওরে কি করি বলতে পারিস?
একটা বড় ধোকার পড়িছি।

১ম তাপস বালক। কি ধোকা মহাশয়?
চিরঞ্জীব। ধোকাটা হচ্ছে এই যে, ধপাস্
কোরে পড়ে, কি পোড়ে ধপাস্ করে?*

২য় তাপস বালক। এ ত ভারি ধোকার
কথা বটে।

৩য় তাপস বালক। তা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন?

চিরঞ্জীব। করেছিলাম।

৩য় তাপস বালক। মহর্ষি কি বলেন?

চিরঞ্জীব। মহর্ষি কিছুই বলেন না।

২য় তাপস বালক। আর আপনি?

চিরঞ্জীব। আমরা ঐ মত।

৪র্থ তাপস বালক। তবে আর মীমাংসা হবে কি কোরে?

চিরঞ্জীব। ঐ ত গোল। দর্শন শাস্ত্রের কোন ব্যাপারেই মীমাংসা হয় না। ওরে তোরা একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনবি?

তাপস বালকগণ। শুন।

চিরঞ্জীবের গীত

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিণ।
দিনের পরে বাস্তির আসে, রাতের পরে দিন॥
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম শীতকালেতে ঠান্ডা;
একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

২য় তাপস বালক। বাঃ এ ত ভারি দর্শন-শাস্ত্র দেখছি।

চিরঞ্জীব। কেমন! কথাগুলো ঠিক কি না।

তাপস বালকগণ। খুব ঠিক, খুব ঠিক।

চিরঞ্জীব। আমি ভেবে ভেবে বের করেছি।

২য় তাপস বালক। বলেন কি ম'শয়?

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র [চিরঞ্জীবকে] এই কি মহর্ষি গোঁতমের তপোবন?

চিরঞ্জীব। [বিশ্বামিত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া।] কি রকম বোধ হয়?

বিশ্বামিত্র। ঐটি কি মহর্ষির আশ্রম?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি ওটা তাড়ির দোকান বোলে বোধ হচ্ছে?

বিশ্বামিত্র। একটু সোজা ভাষায় উত্তর দিলেই বা।

চিরঞ্জীব। নাই বা দিলাম।

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি কোথায়?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন কি বাপু।

বিশ্বামিত্র। প্রয়োজন আছে, তিনি এখন আশ্রমে আছেন কি?

চিরঞ্জীব। না, তিনি বাঘ শীকার কস্তে বেরিয়েছেন।

বিশ্বামিত্র। তুমি ত ভারি মদুখর! কে তুমি?

চিরঞ্জীব। তুমিই বা কে?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। আমি—অশী চিরঞ্জীব শর্মা।

বিশ্বামিত্র। অশী কি রকম?

চিরঞ্জীব। এই অশ হইছে। তার বেশী এখনো হয় নি। কিন্তু অশটা যেরূপ অধিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে, তাতে মহর্ষি হবার বড় বিলম্ব নাই।

বিশ্বামিত্র। কি? আমার সঙ্গে পরিহাস?

চিরঞ্জীব। নাঃ, পরিহাস কব্বার সম্পর্কটা এখনো হয় নি।

বিশ্বামিত্র। দেখো! আমাকে দেখুছো?

চিরঞ্জীব। তা দেখছি বৈ কি।

বিশ্বামিত্র। কি রকম দেখুছো?

চিরঞ্জীব। একবারে নবকান্তিকটি! শরীরটি বর্তুলাকার! মস্তকটি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী! মদুখের রং দাঁড়ির সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলেছে।

বিশ্বামিত্র। দেখো! আমার মনে ক্রমে ক্রোধের উদয় হচ্ছে!

চিরঞ্জীব। তা নিজের ঐ রকম কেছা শূনে, ক্রোধের উদয় না হোয়ে কি প্রেমের উদয় হবে?

বিশ্বামিত্র। অভিশাপ দিয়ে তোমাকে ভস্ম কোরে দেবো না কি?

চিরঞ্জীব। মদুট্যাঘাত দ্বারা তোমাকে তুলো ধূনে দেবো না কি?

বিশ্বামিত্র। নাঃ, ভস্ম কোরেই দিতে হোল দেখছি। হর হর হর হর হর।

পরিক্রমণ

চিরঞ্জীব। রাম রাম রাম রাম রাম

বিপরীত দিকে পরিক্রমণ

বিশ্বামিত্র। রাম নাম কচ্ছিস্ যে?

চিরঞ্জীব। রাম নাম কল্পে, শূনিছি ভূতের ভয় থাকে না।

বিশ্বামিত্র। আমি কি ভূত নামাচ্ছি?

চিরঞ্জীব। নয় ত কি বিয়ের মন্ত
পড়ছিছিস্?

বিশ্বামিত্র। তুই অতি অস্বাচীন। যাঃ

গলে ধাক্কা দিলেন

চিরঞ্জীব। বটে! তবে আর না দেখি।

বিশ্বামিত্রকে প্রহার আরম্ভ

গোতমের প্রবেশ

গোতম। এ কি চিরঞ্জীব? এ কি?

চিরঞ্জীব। [অপ্রস্তুত ভাবে] অ্যা এই
মহর্ষির সঙ্গে একটু কুস্তি করছিলাম।

গোতম। [বিশ্বামিত্রকে] আপনি কে?

বিশ্বামিত্র। আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

চিরঞ্জীব। শুনলেন মশয়? মহর্ষির ঐ
রকম চেহারা হয়? আজকাল সবাই মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। আপনি কি গোতম ঋষি?

গোতম। ভূত্যের নাম গোতম।

চিরঞ্জীব। এ্যা—“ভূত্য” কি?

গোতম। চিরঞ্জীব! এ’র পদধূলি লও,
ইনি একজন অতি তেজস্বী মহর্ষি।

চিরঞ্জীব। এ্যা!—তাই নিয়েই ত ও’র
সঙ্গে আমার ঝগড়া।

গোতম। ইনি আপনার তেজোবলে মহর্ষি।
আমি এ’র কাছে কীটাকীট। তুমি এ’র প্রতি
অত্যন্ত রুঢ় ব্যবহার করেছো। নতজানু হোয়ে
মাঙ্গর্জনা ভিক্ষা করো।

চিরঞ্জীব। বলেন কি? [বিশ্বামিত্রের ঘাড়ে
হাত দিয়া কোতুহলে তাঁহার আপাদ মস্তক
নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে সন্নেহে দু তিন
চাপড় দিয়া] মশয় কিছু মনে কর্বেন না।

[প্রস্থান।

গোতম। [বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি! ইনি
আমার শিষ্য। এ’র খুস্টতা মাঙ্গর্জনা কর্বেন।
এ’র বিষয়ে পরে বলব। আপাততঃ দয়া
করে আমার আশ্রমে চলুন। জানি না কোন্
পুণ্যবলে আজ প্রভাতে আপনার মত সাধুদর্শন
হ’ল।

বিশ্বামিত্র। [স্বগতঃ] এত বিনয়ী?
[প্রকাশ্যে] চলুন।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহর্ষি গোতমের তপোবন। কাল—মধ্যাহ্ন।
প্রাম্যমানা অহল্যা

অহল্যার গীত

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাইছে পাঁপিয়া।
আজি প্রভাত কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন,
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি’ রে
মম হৃদয় কাহার লাগি’ রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মাধুরীর প্রবেশ

অহল্যা। এসেছিছিস্ এতক্ষণে?—খন্য তোর
পূজা! স্তব্ব শ্বিপ্রহর দিবা। আর লো মাধুরি
বসি গিয়া সুশীতল বটবৃক্ষতলে!

মাধুরী। চল, দেবি।

অহল্যা। আবার ও রুঢ় সম্বোধন!

“দেবি?” আমি গুরুপত্নী বটে। শিষ্যা তুই
তথাপি আমার তুই চির প্রিয় সখী;
আয় সখি, দুই দণ্ড নিস্তত্ব নিভূতে
কহিব প্রাণের কথা আজি উচ্ছ্বসিয়া
ছাপিয়া হৃদয়-পাঠ যাইতেছে মোর
নিরুগ্ধ প্রাণের ব্যথা। তাই ডাকিয়াছি!
বোস্ এইখানে। শোন্ [উপবেশন।]

মাধুরী। বল প্রিয়সখি! [উপবেশন।]

অহল্যা। বলিব। অপেক্ষা কর্। কিম্বা কি
বলিব সকল জানিস্ তুই—

মাধুরী। কিছুই জানি না।

অহল্যা। তবে শোন্। মনে আছে, বিবাহ আমার
হইয়াছে কত দিন?

মাধুরী। পঞ্চবর্ষ হবে!

অহল্যা। সত্য। সখি আজি সেই বৈশাখী
পূর্ণিমা।

তখন ছিলাম দশবর্ষীয়া বালিকা,
আজি আমি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী;
মনে পড়ে সেই দিন! বৃষ্টি নাই হবে
মর্ষ বিবাহের। ভাবিতাম সঙ্গোপনে,

সার্থক হইবে জন্ম পুণ্য-পরিণয়ে।
এত দিনে বৃদ্ধিয়াছি ভ্রম।

মাধুরী। ভ্রম! ভ্রম!

সার্থক নহে কি জন্ম তোমার সুভগে?
যার ধর্মপ্রাণ শিব শম্ভু সম পতি
নহে তার জীবন সার্থক?

অহল্যা। দেখ্ চেয়ে—

শুদ্ধ, চেয়ে দেখ্ সখি, এ রূপ, মাধুরী।
শুদ্ধ, চেয়ে দেখ্ গলে এই পুষ্পমালা;
হয় নি কি অধোমুখী এ বক্ষ পরশে
লজ্জায়? নিশ্চয়, শুদ্ধ, মন্দার ব্রততী
যোগ্য হইবার ভূষা এ মৃগাল ভুজে!
দেখ্, বোঁড়িয়াছে মোরে এ কৌশেয় বেশ
কত না আগ্রহে!

মাধুরী। দেখিতেছি।

অহল্যা। ব্যর্থ নহে

এ রূপ, এ যৌবন, জীবন?—জগৎ
নীরস বিস্বাদ নহে? কভু ভাবি মনে,
ছিলাম না সুখিনী কি কোঁমার জীবনে
এর চেয়ে? আপনারি ছিলাম সঙ্গিনী;
পরহিতে নিজগলে গাঁথিতাম হার।
তুষিতে আপন চিত্ত গাঁথিতাম গীত।
বেড়াতাম শৈলপ্রান্তে, কান্তারে, প্রান্তরে,
মঞ্জু কুঞ্জে, নির্ঝরের শ্যাম উপকূলে;
বেড়াতাম কুড়াইয়া পুষ্প রাশি রাশি।
দেখিতাম দেবী-মূর্ত্তি স্বচ্ছ সরোবরে
উঁকি মারি। আসিলে বসন্ত কুহরিয়া
নাহি শিহরিত দেহ। মনের উল্লাসে
তুলিতাম চম্পকের কিশোর মুকুলে—
নিষ্প্রভ যেন সে মোর অঙ্গুলি পরশে।
প্রচণ্ড নিদাঘে ঘুরি ঘনবনচ্ছায়ে
কত সুখে খাইতাম বনফল পাড়ি।
ভৎসিতেন পিতা মোরে—“এত মধুরাশি
গৃহভরা, কোথা যাস্ কুড়াইতে ফলে?”
উড়াইত কৃষ্ণকেশ বর্ষার শীকর-
স্নিগ্ধ মন্দ বায়ু; মৃগা চাহিতাম তাহে
ফিরাইয়া বক্র আঁখি; চাহিতাম পরে
কৃষ্ণমেঘে, দেখিতাম শুদ্ধ সে ধূসর।

—মধুর শৈশব কাল! [দীর্ঘ নিঃশ্বাস।]

মাধুরী। এ কি চিন্তা সখি!

মহর্ষি গোতম-পত্নী তুমি ভাগ্যবতী
যে গোতম ধর্ম, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বিভবে,

তত উশ্বের্ অন্য নর হতে, উশ্বের্ যত
নক্ষত্র খদ্যোত হতে।

অহল্যা। বালিতে পারি না,

তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
ধার্মিক মাধুরী! কিন্তু রমণীহৃদয়
তার প্রার্থী নহে সখি। থাক্ কাজ্ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বৃদ্ধিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুরূপে? [সুদীর্ঘ

নিঃশ্বাস]

নাহি জানি

কেন আজি হৃদয় কাতর; কেন আজি
ডাকিয়াছি তোরে আমি শূনাতে প্রাণের
নিহিত বেদনা। থাক্।—দেখলো মাধুরী
শুদ্ধায়ে গিয়াছে এই যুথিকার হার,
নব হার দে না গাঁথি'। দে না ভালো কোরে
বাঁধি এ দক্ষিণ করে ব্রততী-বলয়,—
যেতেছে খুলিয়া।

মাধুরী। এস আরো কাছে এস!

কেন দেবি এত বেশভূষা? অভূষিতা
তুমি প্রিয় সখি সব চেয়ে মৃগধকরী
জানো না কি তাহা? পশ্চপদ্রে কোন্ মূঢ়
রঞ্জে বর্ণ তুলিকায়? বিদ্যুৎ আলোকে
কে দেখায় বাতি দিয়া?

অহল্যা। [দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ] হায় প্রিয়সখি!

শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। মা! মা!

অহল্যা। কি বৎস?

শতানন্দ। দাদা আমাকে মেরেছে। দিদি,
দাদা আমাকে কেবল মারে কেন?

মাধুরী। দাদা ভারি দুঃস্ট। তুমি তার
কাছে যেও না।

অহল্যা। তুই বৃদ্ধি দুঃস্টমি করিছিলি?

শতানন্দ। না। আমি বললাম দাদা সশ্বেদশ
খাবি? অর্মানি দাদা ঠাস্ কোরে আমাকে চড়
মাঞ্জে।

অহল্যা। [সহাস্যে] বেশ মিথ্যে কথা
শিখিছিস্।

মাধুরী। কোন্ জায়গায় মেরেছে? এস
ফুঁ দিয়ে দি।

শতানন্দ। এই জায়গায় মেরেছে, এই
জায়গায় মেরেছে, এই জায়গায় মেরেছে

[এইরূপ বলিয়া বহু স্থান নির্দেশ করিল।]
 মাধুরী। এস হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
 [কথাবৎ কার্য।]

গীত

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায়।
 আপন মনে হেসে হেসে, ঢোলে ঢোলে ঢোলে
 যায় ॥

হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মন্থা
 গড়ায়,
 নয়নকোণে অশ্রুকণা দেখলে কি আর থাকা যায়।
 আদর কোরে সোহাগ ভরে বৃকের 'পরে নিই গো
 তায় ॥

শতানন্দ। মা, বাবা ক'কাথায়?

অহল্যা। আমি জানি না। তিনি কোথায়
 জানিস্ মাধুরী?

মাধুরী। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তপো-
 বন দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছেন।

শতানন্দ। এ বিশ্বামিত্র কে মা?

অহল্যা। ও তোর বাবার মত একজন ঋষি।

শতানন্দ। কিন্তু তার গায়ে এত লোম
 কেন মা?

অহল্যা। জানিনে। যাঃ—

[শতানন্দের প্রস্থান।]

অহল্যা। জানি না কি পাপে তোর
 মিলেছে মাধুরী

এ হেন পাশব স্বামী।

মাধুরী। নিন্দা করিও না,

পায়ে ধরি, আমি তারে ভালবাসি।

অহল্যা। সখি!

জ্বালাস্ নে। তারে ভালো বাসিস?

কি গুণে?

মাধুরী জানি না তুই স্বেচ্ছায় কিরূপে

করেছিস্ বিবাহ তাহারে?

মাধুরী। মহর্ষির

আদেশে; স্বেচ্ছায় নহে। করিতে সাধনা

নিষ্কাম বিবাহধর্ম। কহিলেন তিনি

“বিবাহ বিলাস নহে; প্রেম লিপ্সা নহে।

পতিপত্নী পণ্যদ্রব্য নহে; বাহিবার,

মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার বস্তু নহে।

বিবাহ কর্তব্য। প্রেম নিষ্কাম সাধনা।”

অহল্যা। মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা!

হায় বিড়ম্বনা—

ভালবাসা সাধনার বস্তু? নিঃস্মিত
 আদেশে? কূপের মত খনন করিয়া
 তুলিতে হয় কি তারে? না মাধুরি, প্রেম
 গৈরিক উৎসের মত পাষণ ভেদিয়া
 আপনি নিঃসৃত হয়! [সদীর্ঘ নিঃশ্বাস]
 চল গৃহে যাই।
 [নিঃস্মিত]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোতমের আশ্রমের বাহির্ভাগ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

বিশ্বামিত্র ও চিরঞ্জীব আসীন

বিশ্বামিত্র। বড়ই কৌতুককর তোমার কাহিনী।

চিরঞ্জীব। বড়ই কৌতুককর! ভাবিলাম, ঋষি

আসিতেছে জনকের প্রাসাদ হইতে,

ধ্রুব, কিছ্র হস্তে আছে। পরে ঋষি যবে

গাত্র হতে খুলি পট্ট উত্তরীয়খানি,

রাজর্ষির উপহৃত স্বর্ণ কমণ্ডলু,

বস্তু দুটি দিল নিঃসঙ্কেচে, হাস্যমুখে

ভূমিপৃষ্ঠশায়ী নিঃসহায় শত্রুকরে—

অবাক্—মহর্ষি—আমি অবাক্ বিস্ময়ে!

বিশ্বামিত্র। কাহার আঘাতে তুমি পড়িলে

ভূতলে?

চিরঞ্জীব। রাজ-প্রহরীর। মহর্ষির পিছে পিছে

আসিতেছিল সে ভৃত্য গোপনে, অজ্ঞাতে!

না জানিত ঋষি তাহা, আমিও তাহাকে

লক্ষ্য করি নাই। পরে যবে মহর্ষির

গলদেশ ধরিয়ছি সবলে, অর্মানি

প্রহরীর কষাঘাতে স্থলিত চরণে

আমি ত ‘পপাত’! ভৃত্য আসিয়া বসিল

পৃষ্ঠোপরি যেন অশ্বাসনে। পরিশেষে

মহর্ষি দয়াদ্রকণ্ঠে কহিল তাহারে

“ছেড়ে দাও; মন্থ কর দস্যুরে প্রহরী।”

ছাড়িয়া দিল সে। ঋষি উন্মত্ত করিয়া

পট্ট উত্তরীয়, আর স্বর্ণ কমণ্ডলু,

দিল অনায়াসে মম হস্তে সেই ক্ষণে।

কহিল গোতম পরে “দস্যু আরো যদি

ধাকিত আমার, আরো দিতুম। দুর্লভ

স্বর্ণ, কিন্তু সুখ অতি সুলভ সহজ।

তাহা যদি চাও দিব প্রচুর। আসিও

আমার আশ্রমে বস্তু”—সে গঙ্গাদম্বরে

অপারকরুণাশ্লিথপ্রেমাদ্রভাষায়

মানিলাম পরাজয়। সেই দিন হোতে
মহর্ষির শিষ্য আমি। এমনি নিষেধ
বানাইয়া দিল ঋষি। সেই দিন হোতে
নিষ্কর্ষ হইয়া আছি আমি তপোবনে
শীতে ভুজ্জের মত। তথাপি কখন,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অসতর্ক ক্ষণে,
সে পাপ প্রবৃত্তি। ইচ্ছা করে সঙ্গোপনে,
মহর্ষির গলাশিরা রুদ্ধ করি তারে
পাঠাই শমনালয়ে, যদিও তাহাতে
বিন্দুমাত্র লাভ নাই, যেহেতু গোতম
একান্ত দরিদ্র, ঋষি!—অতি নিঃসম্বল।

বিশ্বামিত্র। আর ওই যুবতীটি। উনি কে?
চিরঞ্জীব। মাধুরী?

তাহার কাহিনী সত্য, কি বলিব ঋষি!
বিষম কোতুককর। শূন্যবন?

বিশ্বামিত্র। শূন্য।

চিরঞ্জীব। মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বারাজনা

এ নারী; একদা কুহকিনী কি কুক্ষণে,
কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া মহর্ষির
রোধিল সরলবর্ষ রূপের প্রভায়,
কলকণ্ঠে, শূদ্রহাস্যে, সুবাস নিঃশ্বাসে।
নিষ্ফল প্রয়াস।—নারী পড়িয়া ঋষির
চরিত্র আবর্তে, ছাড়ি বৈশ্যাবৃত্তি, ছাড়ি
হৃদয় অলঙ্কার, শত সহস্র প্রণয়ী,
হইল ঋষির শিষ্যা। শেষে এক দিন,
আমি যে কুৎসিৎ ভীষ্ম বীভৎস আকার,
আমারে মাধুরী আসি করিল বরণ,
কি জানি কি মনে করি।' মহর্ষি! সে দিন,
সমস্ত দিবস ধরি ক্রমাগত আমি
করলাম অটুহাস্য—মিলিয়াছে ভালো,—
চোর পত্নী বারাজনা। সেই দিন হতে,
মাধুরী আমার পত্নী, আমি তার স্বামী।

বিশ্বামিত্র। গোতমের বিবাহের পূর্বে
এ ঘটনা?

চিরঞ্জীব। তার বহুপূর্বে।—ঋষিবর!
এই দিকে

আসিছেন সস্ত্রীক গোতম।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে।

গোতম ও অহল্যার প্রবেশ

গোতম। মহর্ষি চরণসেবা করিতে এসেছি
আজ্ঞা কর!

বিশ্বামিত্র। অন্য কিছুর চাহি না গোতম!—
বড়ই নিস্তব্ধ, শান্ত, পবিত্র, সুন্দর,
আশ্রম তোমার! কিন্তু একান্ত নিষ্কর্ষ।
চিরদিন ভালো লাগে বন্ধুবর?

গোতম। লাগে।

আজন্ম মধুর এই নিষ্কর্ষ আশ্রম,
মিশ্রিত আমার এই জীবনের সনে।
জানো না মহর্ষি প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে,
প্রতি শিলাখণ্ডে, কত নিহিত কাহিনী।
বিশ্বামিত্র। ভালো নাহি লাগে পুরী,
প্রাসাদ, তোরণ,

রথ, গজ, বাজী, পণ্য বীথিকা সুন্দর?
গোতম। না সখে,—তাহার চেয়ে ভাল লাগে
শ্যাম প্রান্তর, মঞ্জুল বন, বিহঙ্গ, নিব্বর।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যার প্রতি] তোমারো কি
তাই দেবি?

অহল্যা। ভর্তার ইচ্ছায়

ভার্যার সম্মতি।

বিশ্বামিত্র। সত্য! আমি ভালবাসি
আশ্রম হইতে কভু প্রাসাদে বসতি।
জীবন বৈচিত্র্য বিনা একান্ত নীরস।

গোতম। তোমার সকলি প্রভু অসাধ্য সাধনা।
কখন নিরত দীর্ঘ তপস্যায়। কভু
মিশি জনস্রোতে সাধো পরহিতরত
সে তপস্যাবলে! আর আমি আত্মপর
করি স্বীয় সুখচিত্তা। কি আর বলিব
কত শিখিলাম বন্ধু তোমার নিকটে।
ধন্য বিশ্বামিত্র তব তপস্যা মহিমা!

চিরঞ্জীব। ধন্য বটে! কে জানিত ঘন
লোমাবৃত

এ কৃষ্ণচর্মের নীচে এত বড় ঋষি।
বিশ্বামিত্র। [গোতমকে] একান্ত দরিদ্র তুমি?
গোতম। একান্ত দরিদ্র।

বিশ্বামিত্র। জানো রাজা দশরথে?

গোতম। শূন্যিয়াছি নাম।

বিশ্বামিত্র। তাহার প্রাসাদে মম নিত্য
গতিবিধি—

আমার সহিত চল সে অষোধ্যাধামে।

গোতম। কেন?

বিশ্বামিত্র। দিব রত্নরাশি।

গোতম। রত্ন? কি করিব?

বিশ্বামিত্র। নিতান্ত নির্বোধ তুমি!
 ধন রত্ন দিয়া

দুল্লভ সুস্বাদ খাদ্য, মহার্ঘভূষণ,
 রম্য উপবন, হুম্ম্য, কাম্য বারাঙ্গনা
 ক্রয় করা যায়।

গৌতম। তাহা চাহিনা। নিষ্কর্মে
 সামান্য আয়াসলব্ধ বন্য ফল মূলে
 পরিপুষ্ট হয় দেহ। পরিধান করি
 অর্জন বস্কল যাহা পাই। অনূপমা
 সুকুমারী সাধবী পত্নী অহল্যা। জীবনে
 কিছুরি অভাব নাই। ধন রত্নরাশি
 কি করিব আমি?

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] এত নির্লোভ ব্রাহ্মণ?
 অথবা অতুলরূপলাবণ্যা সুন্দরী
 বাছিয়া লয়েছে, তাই এত উদাসীন
 বাহ্য সম্পত্তির প্রতি? কি অভাব তার
 যার গৃহে হেন পত্নী?

চিরঞ্জীব। তাকাইছে দেখ
 প্রভুপত্নী পানে;—যেন এক্ষণি ইহাকে
 ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা,—ও ব্যাদান দিয়া
 প্রেরণ করিতে তারে সন্দেশের মত
 বিপুল উদর গন্তে।

বিশ্বামিত্র। [অহল্যাকে] চাহ না বাম্ধবি
 স্বর্ণ অলঙ্কার, মণি মূক্তা,—সাজাইতে
 ও সুগৌর বরবন্দ? কাণ্ডন বলয়
 খচিত হীরকে? স্বর্ণ মূকুট ললাটে?
 রজত নূপূর? মণি খচিত কেয়ূর?
 মূক্তাহার শূভ্রকণ্ঠে?

চিরঞ্জীব। ক্ষমা কর ঋষি,
 কেন মিথ্যা রোপিতেছ কলহঅঙ্কুর
 দম্পতীর মধ্যে, দিয়া সমক্ষে পত্নীর,
 অপ্রাপ্য মহার্ঘ রত্ন গহনার, হেন
 সুদীর্ঘ তালিকা!

গৌতম। চল যাই বন্ধুবর
 আশ্রম ভিতরে। তন্ত উড়িতেছে ধূলি।

বিশ্বামিত্র। হাঁ মহর্ষি, চল [অহল্যাকে] চল
 বাম্ধবি। উত্তম!

[স্বগত] পরীক্ষা করিতে হবে এ পত্নী
 বিয়োগ,

সহিত সক্ষম কি না গৌতম।

চিরঞ্জীব। [পশ্চাৎ যাইতে যাইতে] হুঁ চল

চিরঞ্জীব অনাহুত।—এত বড় ঋষি
 এ কৃষ্ণ চর্ম্মের নীচে?—আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!
 [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—তপোবনের প্রান্তভাগ। কাল—মধ্যাহ্ন।
 তাপস বালকস্বর

১ম তাপস বালক। এ বিশ্বামিত্র ঋষিটা
 শুনছি ভারি তেজস্বী।

২য় তাপস বালক। কি রকম?

১ম তাপস বালক। ও ছিল একটা ক্ষত্রিয়
 রাজা। তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হু লাভ করেছে।

২য় তাপস বালক। রেখে দাও তোমার
 ব্রহ্মর্ষি হু। ওকে দেখে ত আমার ভক্তি হয় না।

১ম তাপস বালক। আমাদের না হোক,
 আমাদের মহর্ষি ত এর গুণে মুগ্ধ! ইনি
 শুনছি বিশ্বামিত্রের তপোবলের কথা শুনে
 তপস্যার জন্য প্রবাসে যাচ্ছেন।

২য় তাপস বালক। সত্যি না কি?

অপর এক তাপস বালকের প্রবেশ

৩য় তাপস বালক। ওহে চিরঞ্জীবের ভারি
 মজা হয়েছে।

২য় তাপস বালক। কি রকম?

৩য় তাপস বালক। কি একটা খেয়ে
 আবোল তাবোল বকছে। ঐ যে এই দিকেই
 আসছে।

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। বাঃ বাঃ বিশ্বামিত্র ঋষির পেটে
 এত গুণ! কি সোমরসই বানিয়েছে বাবা!
 আমাদের মহর্ষিটা নেহাইং মুগ্ধ!

১ম তাপস বালক। সে কি মশয়?

চিরঞ্জীব। আরে ভাই, বিশ্বামিত্র সোমরস
 বানিয়ে তাকে দিলে, তবু বেটা খেলে না। আরে
 সোমরসই যদি না খাবি ত মহর্ষি হুতে গেলি
 কেন? ওরে আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য হব।

২য় তাপস বালক। বলেন কি ঠাকুর?

চিরঞ্জীব। হাঁ—হব! তবে একটা কথা যে,
 ঋষিটা দর্শন শাস্ত্র জানে না। ঐ দর্শন
 শাস্ত্রটার ওপর আমার ভারি ঝোঁক।

৩য় তাপস। বটে!

চিরঞ্জীব। ওরে, একটা দর্শন শাস্ত্রের কথা শুনবি?

৩য় তাপস। শুনিনি?

চিরঞ্জীব। গীত।

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্ষ কিম্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পল্লঙ্গ উরঙ্গ ভূজঙ্গ পতঙ্গ বিহঙ্গ তুরঙ্গ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর।
যে আছো যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,

কিন্তু তার মানে, কি হোল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মদ্য খেলেই সদ্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

চতুর্থ তাপস বালকের প্রবেশ

৪র্থ তাপস। এ কি চিরঞ্জীব ঠাকুর, এ রকম যে?

১ম তাপস। চিরঞ্জীব ঠাকুর একটু রঙে আছেন।

২য় তাপস। ঠুর অঙ্গভঙ্গী যদি এতক্ষণ দেখতে!

৩য় তাপস। আর যে গান গাইলেন!

চিরঞ্জীব। তোরা ভারি গোল করছিস্। তাকিয়ে দেখ্!

৩য় তাপস। কি দেখবো মহাশয়?

চিরঞ্জীব। দেখ্—আমি সশরীরে স্বর্গে উঠছি। বিশ্বামিত্র ঋষি বল্লেন যে “এই সোমরস পান কল্পে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়—একটু খাবে চিরঞ্জীব?” আমি বললাম “কৈ দাও দেখি; কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষি, তোমার আমার স্বর্গে যেতে হলে সশরীরে না গিয়ে পথে শরীরটা বদলে গেলে লাভ ভিন্ন লোকসান নেই; এ চেহারায় স্বর্গে গিয়ে যে কোন সর্বাধিকার হবে তা ত বোধ হয় না;”—বোলে ত খেললাম। যেই খাওয়া, সেই মাইরি ভাই—চেপ্টা পৃথিবী গোল দেখালো, আকাশটা চেঁচিয়ে হাসতে সুরুর কোরে দিলে, পাতালটা পরী সেজে নাচতে লাগলো, আর আমি সশরীরে স্বর্গে উঠতে লাগলাম।

২য় তাপস। বটে! তা হলে অবস্থাটা সঙ্গিন বলতে হবে।

চিরঞ্জীব। সঙ্গিন নয় দাদা রঙিন। বলি-হারি সোমরস! দেখ্ছিস্ তোরা?

৩য় তাপস। কি দেখবো ম’শয়?

চিরঞ্জীব। [মদিরা পাত্র দেখাইয়া] কি রূপ!—কি স্বচ্ছ! কি তরল! কি সফেন! মরি মরি! ওরে তোরা একটু একটু খাবি?

১ম তাপস। আজে না।

চিরঞ্জীব। একটু দেখনা চেকে। ইতে কটু তিক্ত অম্ল মধুর কষায় সব রকম রসই আছে।

২য় তাপস। না ম’শয়।

চিরঞ্জীব। খেতিস্ যদি বেশ কতিস্।

৩য় তাপস। না ঠাকুর।

৪র্থ তাপস বালক। তুমি ওটুকু খেয়ে ফেল। দেখি কি রকম ঢং বদলায়।

চিরঞ্জীব। হুঁ। বেটারা মনে মনে হাস্-ছিস্ বোধ হচ্ছে।

তাপস বালকদিগের হাস্য

চিরঞ্জীব। এই যে প্রকাশ্যেই হেসে ফেলি।

চিরঞ্জীবের গীত

আমি বুঝি সং?

তোমরা যে সব হাস্ছো দেখে

আমার বেজায় নতুন ঢং।

ভাবছো আমার টল্ছে পা?

—মিথ্যে কথা—মোটাই না।—

(শুদ্ধ) ফেল্ছি চরণ নতুন ধরণ,

বাহির কর্ছি রং বেরং।

আবোল তাবোল বক্ছি আমি কি?

ইচ্ছে কোরে শুদ্ধভাষা গুঁছিয়ে বল্ছি নি,—

বোসে রৈলাম হোয়ে গোঁ,

(কোচ্ছে মাথা ভোর-র ভৌ)

তোমরা যত হাস্ছো তত হিচ্ছি আমি রেগে টং।

উগ্রভাবাপন্ন

১ম তাপস বালক। মাল্লে রে—

২য় তাপস বালক। খেলে বুঝি—

৩য় তাপস বালক। পালা পালা—

৪র্থ তাপস বালক। ওরে বাবারে—

[তাপস বালকদিগের পলায়ন]

চিরঞ্জীব। যা বেটারা নরকে পোচে থাকবি।

পুনরায় গীত

ফেলোছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির কর্ছি রং বেরং।

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। এ কি প্রভু?

চিরঞ্জীব। [হতাশ ভাবে] যাঃ—নেশা ছুটে গেল! আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হোল না। তুই এ সময় এলি কেন?

মাধৱী। মদ খেয়েছো?

চিৰঞ্জীৱ। মদ কি রে? সোমৱস—স্বয়ং
বিশ্বামিত্ৰেৰ তৈরি।

মাধৱী। স্বয়ং বিশ্বকৰ্ম্মাৰ তৈরি হলেও
ও মদ।

চিৰঞ্জীৱ। আচ্ছা না হয় মদ—হোলেই বা
মদ।

মাধৱী। ছিঃ মদ খেয়ো না প্ৰভু। মহৰ্ষি
গোতম ত খান না।

চিৰঞ্জীৱ। মহৰ্ষি গোতম একটা ভণ্ড,
ষণ্ড, গণ্ডমূৰ্খ। আমি এখন তাকে পেলে বেশ
দুঃখা দিয়ে দি! আৰ তাকে যখন পাওৱা যাচ্ছে
না তখন তার বদলে এই তোকেই [প্ৰহাৰ]
দুঃখা দি। [প্ৰহাৰ।]

মাধৱী। আৰ না, আৰ না, তোমাৰ পায়ে
পিড়ি।

বিশ্বামিত্ৰেৰ প্ৰবেশ

বিশ্বামিত্ৰ। চিৰঞ্জীৱ! ছিঃ!

চিৰঞ্জীৱ। “ছিঃ” কি?

বিশ্বামিত্ৰ। লজ্জাৰ কথা!

চিৰঞ্জীৱ। কি “লজ্জাৰ কথা?”

বিশ্বামিত্ৰ। নিজের স্ত্ৰীকে মাৰ্জ্জ।

চিৰঞ্জীৱ। নিজের স্ত্ৰীকে মাৰ্জ্জ না ত কি
পরের স্ত্ৰীকে মাৰ্জ্জ হবে?

বিশ্বামিত্ৰ। স্ত্ৰীলোকেৰ গায়ে হাত? ছিঃ
ছিঃ!

চিৰঞ্জীৱ। এ স্ত্ৰীলোক নয় এ পুৰুষেৰ
বাবা।

বিশ্বামিত্ৰ। কেন? তোমাৰ স্ত্ৰীৰ অপৰাধ
কি?

চিৰঞ্জীৱ। সে খোঁজে তোমাৰ দৰকাৰ কি?
দেখ বিশ্বামিত্ৰ ঋষি, তুমি ব্ৰহ্মৰ্ষিই হও আৰ
দেৱৰ্ষিই হও, যদি এ ব্ৰহ্ম বেমজ্জা ব্ৰহ্ম পতি-
পত্নীৰ মध्ये এসে তাদের ন্যায্য দাম্পত্যকলহে
বাধা দাও ত এই—দেখ্ছো—

একখণ্ড ভ্ৰম ব্ৰহ্মশাখা কুড়াইয়া লইয়া ঘূৰাইতে
লাগিল ও সঙ্গ সঙ্গ হৃদকাৰ কৰিতে লাগিল।

গোতমেৰ প্ৰবেশ

গোতম। এ কি চিৰঞ্জীৱ?

চিৰঞ্জীৱ। এ্যাঁ, এ্যাঁ—তাই ত—

বিশ্বামিত্ৰ। চিৰঞ্জীৱ সোমৱস পান কোৱে
একটু বেতৰিবং হৱেছে।

চিৰঞ্জীৱ। এ্যাঁ—তা—সে সোমৱস, ঋষি
বিশ্বামিত্ৰেৰই তৈরি।

গোতম। মাধৱি কাদছো যে?

বিশ্বামিত্ৰ। চিৰঞ্জীৱ একে গুৰুতৰ আঘাত
কৱেছে।

চিৰঞ্জীৱ। কৰিছ না কি? সে কাৰ দোষ?
আপনিই ত আমাকে সেধে সেধে খাওয়ালেন।
আমি কোনমতেই খাবো না—তা ক্ৰমাগত—
“চিৰঞ্জীৱ খাবি? চিৰঞ্জীৱ খাবি?” আমি কত-
ক্ষণ টিকে থাকিবো? ব্ৰহ্মমাংসেৰ শৰীৰ ত!

বিশ্বামিত্ৰ। আমি পৰখ কৰিছলাম তোমাৰ
মনেৰ বল কতদূৰ।

চিৰঞ্জীৱ। কেন? সেটা না জানলে কি
আপনাৰ ঘৃণ হৰিছল না?

গোতম। চিৰঞ্জীৱ! শপথ কৰ যে আৰ
কখন মদিৰা সেবন কৰ্বে না।

চিৰঞ্জীৱ। এ্যাঁ—স্বয়ং বিশ্বামিত্ৰ যখন
খান—

গোতম। মহৰ্ষি বিশ্বামিত্ৰেৰ যা শোভা
পায় তোমাৰ তা পায় না। আবৰ্জনা অগ্নিৰ
গায়ে লাগে না, কিন্তু তাতে জল পৰিষ্কল হয়।
শপথ কৰ এ কাজ আৰ কৰ্বে না।

চিৰঞ্জীৱ। এ্যাঁ—তা—বেশ—তবে তাই।

[প্ৰস্থান।]

গোতম। মাধৱি আমি প্ৰবাসে চল্লাম।
তোমাৰ গুৰুপত্নীকে দেখো।

মাধৱী। আমি প্ৰাণপণে তাঁৰ সেৱা কৰ্ব।
কবে ফিৰবেন?

গোতম। ঠিক নাই। সম্ভৱতঃ বৰ্ষকাল
পরে। আমি এখন তোমাৰ গুৰুপত্নীৰ কাছে
বিদায় নিয়ে আসি। [বিশ্বামিত্ৰকে] ব্ৰহ্মবৰ,
প্ৰস্তুত হন, আমি শীঘ্ৰ আস্ছি!

[সকলেৰ ভিৰাদিকে প্ৰস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—তপোবনেৰ প্ৰান্তভাগ। কাল—প্ৰভাত।

অহল্যা একাকিনী

অহল্যাৰ গীত

হীৰা কি অধাৰে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে
হাৰ!

অবহেলা অনাদরে প্ৰেম লো শূকাৰে যায়।

গুণীর পরশ বিনা গানে কি শিহরে বীণা?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয় বায়?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ. নয়,—
বাঁচে না শব্দ সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।

গোতমের প্রবেশ

গোতম। অহল্যা!

অহল্যা। [চমকিয়া] কে? এ কি প্রভু!

এ বেশে এখানে?

গোতম। আসিয়াছি প্রিয়তমে বিদায় লইতে।

অহল্যা। বিদায় লইতে? বটে—বুঝেছি।

উত্তম।—তবু, কোথা যাইতেছ?

গোতম। সুদূর প্রবাসে।

অহল্যা। কেন?

গোতম। তপস্যায় রত রহিব প্রের্সি।

অহল্যা। তপস্যা? কাহার? কেন আলায়ে

বসিয়া হয় না তপস্যা?

গোতম।

শত সহস্রবন্ধনে

মায়ায় জড়িত, নিত্য সংসার চিন্তায়

জঞ্জরিত গৃহাগ্রমে,—তাই প্রিয়তমে

একাকী নিঃসর্জনে দূরে—পশে না যেখানে

মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি—নিস্ততঃ নিভূতে

করিব তপস্যা চর্যা।

অহল্যা। যাও।

গোতম।

দাও প্রিয়ে

বিদায় প্রসন্ন মনে!

অহল্যা।

শুনি, কার কাছে—

আমারে রাখিয়া যাবে?

গোতম।

সতী সাধবী রহে,

পতিস্মৃতি ধ্যান করি'।

অহল্যা।

প্রভু, ধ্যান করি'

মিটে না আকাঙ্ক্ষা। হায় মিটে কি পিপাসা

পদ্বকরের চিত্রপটে! হা নিস্কর্ম জাতি!

কঠিন পদ্রুশ!—নিত্য, বিয়োগে, মিলনে,

আমরা করিব ধ্যান তোমাদের স্মৃতি:

তোমরা যখন ইচ্ছা আসিবে যাইবে,—

স্বাধীন তরুণসম সহিষ্ণু-সৈকতে।

কেন আসো। ধ্যান করি' রমণীর রূপ

পারো না থাকিতে দূরে? জীর্ণ দেহ যবে,

বান্ধক্যের শেষ দশা, বাছিয়া তথাপি

কেন লও পল্লবিত তরু ক্রোড় হ'তে

স্বদৃষ্ট কুসুম করি?—সে নাচে, সে হাসে,

সে বর্ষিত হয় মাতৃস্তন্যরস পানে।

দেখিয়াই নাই সুখী হও স্বার্থপর
কি হেতু?

গোতম। অহল্যা! বিপ্র আমি। চিরদিন
রহিব কি প্রের্সীর অণ্ডল ধরিয়া

বিপ্রের কর্তব্য ভুলি?

অহল্যা। [উঠিয়া] যদি না থাকিবে,

বিবাহ করিলে কেন? বাঁধিলে আমার

কৈশোর, তোমার শীর্ণ বান্ধক্যের সনে—

দেখ চাহি এই মূখ পানে—এই নব

উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বাসিত রূপ,

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়;—

দেখিছ?—বাঁধিলে কেন নব সুকোমল

কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বঙ্গরী

নীরস বিশুদ্ধ বৃক্ষকাণ্ডে? [ক্রন্দন]

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। [স্বগত]

ঠিক তাই—

যাহা ভাবিয়াছি। জানি ঘটাবে বিদ্রাট

ওই লোমাবৃত ঋষি। [প্রকাশ্যে]

মহর্ষি! দাঁড়ায়ে

বহির্দ্বারে বিশ্বামিত্র ঋষি, মহর্ষির

অপেক্ষায়—প্রস্তুত।

গোতম। প্রের্সী তবে যাই।

অহল্যা। তুমি যাও, তুমি থাকো—একই কথা

প্রভু

অহল্যার। তোমার হৃদয়ে নাই স্নেহ!

তোমার অধরে নাই সুখা! তপস্যার—

শুদ্ধ কর্তব্যের জন্য তোমার জীবন;

আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার

জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয়; আমার

কার্য্য ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজন্য

ভিন্ন দিকে। এ জীবনে হইব না মোরা

কভু সন্মিলিত। যাও। বাড়িবে না তাহে

আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।

গোতম। [স্বগত] সত্য কথা! ঘূর্চিল না এ

বিচ্ছেদ প্রিয়ে।

[নিষ্কান্ত।

অহল্যা। এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?

ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলি না হায়

এ স্ত্রীণ স্ত্রীবিব মূঢ় গোতমে?—হা ধিক্!

চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে? চাহিয়া

শুদ্ধনেত্রে, যেন গাঢ় অনুকম্পাভরে

মোর পানে? হা রমণি! করিস্ না তুই
দর্শন নিষ্ফল এই রূপের গৌরব।

[প্রস্থান।

সস্তম দৃশ্য

স্থান—নন্দন ভবন। কাল—প্রভাত।

সপরিচরবর্গ ইন্দ্রদেব আসীন

অঙ্গরাদিগের নৃত্য গীত

আমরা—এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।

আমরা গানের মতন, হাসির মতন,

কুসুমগন্ধ রাশির মতন,

হাওয়ার মতন, নেশার মতন, চেউর মতন, এসে যাই।

আমরা—অরুণ কনক কিরণে চাঁড়িয়া নামি,

আমরা—সাম্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী,

আমরা—শরত ইন্দ্র ধনুর বরণে,

জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,

বিজলির মত চাঁকিত চাহিয়া, কণিক হেসে যাই।

আমরা—স্নিগ্ধ, কান্ত, সুশ্ৰীতশান্তি ভরা,

আমরা—আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,

আমরা—শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,

মলয়ে, তিমিরে, কিরণে,—নিখিলে,

স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে, স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এই ছোকরা!

চন্দ্র। দেবরাজ!

ইন্দ্র। আর এক পেয়লা।

চন্দ্র। [আর এক পূর্ণ পাত্র ইন্দ্রকে
দিলেন।]

ইন্দ্র। পবন!

পবন। দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। আচ্ছা স্বর্গমর্ত পাতালে ত তোমার
অবারিত গতি।

পবন। আজে!

ইন্দ্র। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি
উত্তর কর্তে পারবে?

পবন। আজে, যদি পারি ত পার্ব।

ইন্দ্র। আচ্ছা বেশ। বল দেখি—স্বর্গের
মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজ্য, শচীর মত নারী,
আর সুধার মত মদ, কোন জায়গায় দেখেছো
কি না?

পবন। আজে নাঃ।

ইন্দ্র। তুমি ত টকাশ কোরে বোলে ফেললে
আজে নাঃ। ভালো কোরে শুনছো?

পবন। শুনছি বৈ কি?

ইন্দ্র। কিসের মত কি বললাম বল দেখি?

পবন। [স্বগতঃ] মন্সিকলে ফেললে
দেখছি। [প্রকাশ্যে]—এ—এই—স্বর্গের মত
নারী, সুধার মত রাজ্য, ইন্দ্রের মত রাজ্য,
আর শচীর মত মদ।

ইন্দ্র। দূর্—তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর
বোলে বোধ হচ্ছে না।

পবন। আজে নাঃ।

ইন্দ্র। না, তোমার মাত্রাটা একটু বেশী
হয়েছে, আর খেয়ো না [সুধাপাত্র সরাইলেন]
বরুণ!

বরুণ। বজ্রপাণি!

ইন্দ্র। এ প্রশ্নের উত্তর কর্তে পারো?

বরুণ। না প্রভু।

ইন্দ্র। তুমি যে শব্দবার আগেই হাল
ছেড়ে দিলে। বৈশ্বানর!

বৈশ্বানর। জীমূতবাহন!

ইন্দ্র। বলি, একটা প্রশ্ন করি?

বৈশ্বানর। আজে নাই বা কল্পেন!

ইন্দ্র। রবি!

রবি। আমি এখনো উঠিনি দেবরাজ!

ইন্দ্র। তাও ত বটে এখন যে রাত্তির।

চন্দ্র!

চন্দ্র। এই যে [সুধাপাত্র সম্মুখে
ধরিলেন।]

ইন্দ্র। বেশ তৈরি ছোকরা!—দেখ পবন!
বুঝছো না কথাটা? উর্বাশী মেনকা রম্ভা
নেহাইং পুরোণো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পবন। নেহাইং।

ইন্দ্র। একটা বেশ যতসৈ নারীর নাম
কর্তে পারো, যাতে জীবনে একটু বৈচিত্র্য হয়?

পবন। পারি; কিন্তু সে সব গেরোস্ত
ঘরের মেয়ে।

ইন্দ্র। হোক্ গেরোস্ত ঘরের—সুধাপাত্র
হলেই হলো।

পবন। তা যদি বলেন, আর স্বর্গ ছেড়ে
মর্তে নামতে রাজি থাকেন, তা হলে' একটা
রমণীর নাম কর্তে পারি যার তুলনা ত্রিভুবনে
নেই।

ইন্দ্র। কে সে?

পবন। মিথিলার মহর্ষি গোতমের স্ত্রী
অহল্যাদেবী।

বরুণ। বড় শক্ত জায়গা। দাঁত বসে না।

ইন্দ্র। [সন্দেহভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন]।

পবন। কিন্তু সে বিষয়ে একটা সন্নিবিধা আছে।

ইন্দ্র। কি রকম?

পবন। মহর্ষি প্রবাসে।

ইন্দ্র। বটে বটে?—তবে ত কেবলা ফতে।—ওরে কেউ মদনকে ডেকে নিয়ে আয় ত!—পবন, তুমিই একবার যাও না!

পবন। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চন্দ্র, ঢালো না ভাই!—এ প্রস্তাবটা মন্দ নয়।—কি বল বৈশ্বানর?—এই, অঙ্গরাদেবের আর একবার ডাকো না কেউ!

বরুণ। এই আমিই ডেকে আনিছি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। বৈশ্বানর!

বৈশ্বানর। আজ্ঞে!

ইন্দ্র। তুমি যে ভারি গম্ভীর হয়ে রৈলে?

বৈশ্বানর। এ্যাঁ—তা—কি জানেন—আমার স্বভাবই ঐ রকম।

ইন্দ্র। সত্যি না কি?—ঐ যে মদন আসছে।

মদনের প্রবেশ

মদন। প্রণাম হই দেবরাজ!

ইন্দ্র। এই যে এয়েছো—বেঁচে থাকো।

মদন। আজ্ঞে হাঁ। বেঁচে থাকবার আমার গোড়াগুড়ি সম্পূর্ণই মতলব ছিল; কিন্তু দেবরাজ তাতে বড় অবসর দিচ্ছেন না।

ইন্দ্র। কেন?

মদন। এই দিব্যরাত্রিই লোকের সর্বনাশে ফির্ছি।

ইন্দ্র। কি সর্বনাশ?

মদন। এই, অমরদের স্ত্রী বের কোরে আনা, অমরদের সতীত্বনাশ, অমরদের তৃতীয়বার বিয়ে দেওয়া।

ইন্দ্র। সে সব ত অতি সহজ শিকার। বিধবা বালিকার সর্বনাশ করা, দ্বিচারিণীকে বেশ্যা করা, অসহায়ার ব্যাভিচার করানো—এ সব ত আমিও পারি।

মদন। আর কি কস্তে বলেন?

ইন্দ্র। যথার্থ সতীর সতীত্বনাশ কস্তে পারো?

মদন। না সেটা মহাশয়ের একচেটে।

ইন্দ্র। তামাসা রাখো। ঐ কার্যটা কস্তার জন্য তোমাকে ডাকিইছি।

মদন। তা আমি আগেই আন্দাজ করিছি। এখন জিজ্ঞাসা করি ভাগ্যবতীটি কে?

ইন্দ্র। [জনান্তিকে] মহর্ষি গোতম-রমণী অহল্যা।

মদন। বড় শক্ত জায়গা।

ইন্দ্র। নৈলে আমি কি তোমাকে ফলার খাবার নিমন্ত্রণে ডেকে পাঠিইছি?—শোন—একটা সন্নিবিধা আছে।

মদন। কি সন্নিবিধা?

ইন্দ্র। মহর্ষি এখন প্রবাসে।

মদন। তবে ভস্ম না হয়েই কার্য উদ্ধার কস্তে পার্ব পার্ব বোধ হচ্ছে যেন!—কিন্তু, কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখবেন।

ইন্দ্র। কি?

মদন। গীত

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
(একদিন) সে জন কাঁদেই কাঁদে।
প্রথমে দুদিন ভারি হাসি,
পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি
(রকম) ভারি গোলযোগ বাঁধে।
প্রথম আরাম চুলকে ঘামাছি
শেষে করে জ্বালা সে ত,
রগড়াতে রগড়াতে রগড়াতে
লেবু হয়ে যায় তেত;
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি,
পরে ঘেঁষিনাক কাছাকাছি;
শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,
(রকম) সোনামণি কাঁলাচাঁদে।

ইন্দ্র। তা পরে যা হবার হবে। এখনকার কাজ ত এখন কর।

মদন। তথাস্তু।

ইন্দ্র। চন্দ্র।—

চন্দ্র। সুরেশ্বর!

ইন্দ্র। আর এক পেয়লা।

অঙ্গরাদিগের প্রবেশ

ইন্দ্র। এয়েছ বাছারা! একটা যতসৈ রকম ধর দেখি। দেখ এমন একটা গান গাইবে

যাতে মনে বেশ স্ফূর্তি হয়। গাও বেহাগ—
আর নাচো তেওট্।

অপ্সরাদিগের নৃত্যগীত

ঢালো অমিয়া ঢালো সুধাকর,
আকুল তুষা অতি অধীরা;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত
ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিংহ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা
মুরলি নন্দন ভবনে;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত
বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমস্ত,
মন্মথ হৃদয়ে বিধ শর অমনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অহল্যার কুটীর। কাল—সায়াহ।
একাকিনী অহল্যা আসীনা

অহল্যা। কি ঘোর বরষা! গাঢ় আচ্ছন্ন আকাশ
ধূসর জলদজ্বালে। অবিরল নামে
জলধারা। পরিব্যাপ্ত আকাশ মেদিনী
এক অবিপ্রান্ত জলপ্রপাতঝঞ্ঝারে।
—এস বর্ষা, শীকরশীতলবায়ুস্বনে,
সুকুমারী! সুশ্যামল কর, স্নিগ্ধ কর,
নিদাঘবিশুদ্ধক তপ্ত বসুধা, সুন্দরি।

গীত

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে
দর্শ দিক তিমিরে আধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখি রে—
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জল ধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি।
সঘন আধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশারে যায় সজল বাতাসে
শূন্য নয়নে রহি চেয়ে;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে সখি রে—
; মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
—ধিক ধিক জনম আমারি।

রতির প্রবেশ

অহল্যা। কে তুমি?
রতি। অতিথি।
অহল্যা। ভুক্ত কিম্বা উপবাসী?
রতি। উপবাসী নহি, পিপাসিত।
অহল্যা। পিপাসিত?
বর্ষার অশ্রান্তবৃষ্টিপ্রপাতে প্লাবিত
প্রান্তর কান্তার অরণ্যানী—আর তুমি—
তুমি পিপাসিত?—এ কি রুঢ় পরিহাস?
রতি। পরিহাস নহে। সত্য। পদুস্কর সরিৎ
স্নিগ্ধজলপূর্ণ; কিন্তু তাহে চাতকের
মিটে কি পিপাসা?
অহল্যা। এ কি পরিহাস ছাড়ি',
ধরিলে কি প্রহেলিকা?
রতি। দেখিয়াছ কভু
আপনার রূপরাশি মৃকুরে বিম্বিত?
অহল্যা। দেখিয়াছি।—আপাততঃ কি চাহ
সুন্দরি?
রতি। চাহিয়া থাকিব শুধু ওই মৃথপানে
তাপসি!
অহল্যা। রমণী তুমি—
রতি। কিবা যায় আসে?
বিশ্বেব সম্পত্তি রূপ—বিশ্বেব বিস্ময়।
অহল্যা। কি নাম তোমার?
রতি। রতি।
অহল্যা। নিবাস?
রতি। ত্রিদিবে।
যাইতেছিলাম আমি এই পথ দিয়া
মিথিলায় কোন প্রয়োজনে—অকস্মাৎ
নামিল অশ্রান্ত জলধারা; নিরুপায়
আশ্রম বাহিরে তাই নিলাম আশ্রয়।
দেখিলাম তব মূর্তি সহসা, অমনি
রহিলাম চিত্তাৰ্পিত, নিস্পন্দ বিস্ময়ে।
কি তোমার নাম সখি!
অহল্যা। অহল্যা তাপসী।
রতি। বড় ভাগ্যবতী আমি; স্বর্গে শুনিয়েছি
অহল্যার নাম।—নামে আবার বরষা।
দিবে স্থান দয়া করি' আজি এ আশ্রমে?
অহল্যা। কৃতার্থ হইব। আমি প্রোষিতভর্তৃকা:
অভ্যাগত তুমি,—এত সৌভাগ্য আমারি।
আশ্রম ভিতরে চল।
রতি। চল প্রিয়সখি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গৌতমের তপোবন পথ। কাল—সন্ধ্যা।

মদন ও বসন্ত

মদনের গীত

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুল বেশে তনু ঢাকি।
ফুলধনু ধরি করে, হানি হুদে ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অবশ আঁখি।
ফুল খেলা, ফুল বঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল'পরে শূয়ে, ফুলপানে চেয়ে থাকি।

মদন। কি ভাবছ বসন্ত?

বসন্ত। ভাবছি প্রভু, এত মিছে কথাও
কৈতে পারেন!

মদন। কি মিছা কথা সখে!

বসন্ত। অন্ততঃ ভেতরের কথাগুলো সব
চেপে গেলেন।

মদন। কি প্রকার?

বসন্ত। এই মূখে বেশ বোলে গেলেন
“ফুলে নব তনু ঢাকি” কিন্তু তার নীচে ত
দেখছি মহাশয়ের খাসা মখমলের পোষাক।

মদন। শূদ্ধ ফুলে কি তনু ঢাকে সখে,
না শীত কাটে?

বসন্ত। আমিও ত তাই বলছিলাম। তা
যদি হতো ত লোকে তুলোর চাষ তুলে দিয়ে
ফুলের চাষ কর্তে।

মদন। আচ্ছা তার পরে? আর কি মিছা
কথা?

বসন্ত। তারপরে “ফুলধনু”। ফলের ধনু
তৈরি কর্তে পারে এ সাধ্য বিশ্বকর্মারও নাই।
পেছনে একখানি বাকারি চাই।

মদন। আচ্ছা আর কি?

বসন্ত। আর “ফুল খেলা”। ফুল নিয়ে
খেলা করা অবিশ্য এমন কিছুর শক্তি নয়,
যদিও মহাশয়কে বোধ হয় আমি ডান্ডাগুলি
খেলেতে দেখেছি।

মদন। সে ছেলেবেলায়।

বসন্ত। তবে যে কেবল ফুলমধু পান
কোরে ঐ বাস্তবিক বসন্তলাকার শরীরটি ঐ
ভাবে পরিপুষ্ট হুছে না, এটা আমি শপথ
কোরে বলতে পারি।

মদন। ওহে—বোঝ না—

বসন্ত। আর ফুলের পানে চেয়ে থাকা

ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় আপনার
আরো দু'চারটে কাজ কর্তে হয়।

মদন। ওহে ওগুলো কবিতা। তুমি বড়ি
কাব্যকলা বোঝ না?

বসন্ত। আজে না। কাব্যকলা পড়িনি,
কিন্তু মর্তমান কলা খেয়েছি। আর শপথ
কোরে বলতে পারি যে, ভালো পাকা মর্তমান
কলার কাছে কাব্যকলা কি চিত্রকলা কোন
কলাই লাগেন না।

মদন। এ সমস্ত কবিতা—ঐ যে শিকার
আসছে। তোমার কোকিল, মলয় সব তৈরি?

বসন্ত। সব প্রস্তুত—দেখবেন? [অদূরে
কোকিল ডাকিল।]

মদন। বাঃ বাঃ! এ কোকিলের আওয়াজে
যদি অহল্যাদেবী না ধরা পড়েন ত তাঁর
শরীর ইন্ট সুরকি দিয়ে তৈরী করা। পাখী
বটে। চল এখন অন্তরালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

যাইতে যাইতে মদনের গীত

আছে একটা ভারি কালো পাখী,
ও তার আছ দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাগুন চৈতে তর বদ' অভোস ডাকা।
তার ডাক শূনে প্রাণ হা হুতাস করে,
বিরহিনীরা সব আছড়ে পড়ে,
প্রাণকান্ত বিনে সে পাখীর স্বরে
তাদের জীবনটা ঠেকে বড় ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্বনেশে
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে;
ভাগ্যস নয় সে পাখী বারোমেসে;—
নইলে মৃস্কল হোত বেঁচে থাকা।

[প্রস্থান।]

অহল্যা ও রতির প্রবেশ

রতি। হায় সখি, এত রূপ, এ ভরা যৌবন,
এ বসন্তকালে!—শূদ্ধ একবার, সখি,
জীবনে, যৌবন আসে; আর সে যৌবন
চিরদিন নাহি থাকে।

অহল্যা। বড়ি, সব বড়ি,
কিন্তু কি করিব? আমি অভাগিনী অতি!
রতি। মণির আদর রত্নবণিক বিনা কি
বড়ি শাখাম্গ? রত্নে দিও না ছড়িয়ে
অরণ্যে। সার্থক কর এ রূপ যৌবন।
চিরদিন রহিবে না। তবে আসি সখি।

বড় ভাগ্যবতী আমি পাইলাম দেখা
পথে হেন অস্রাসম্ভব রূপরাশি।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! কি মধুর! [উপবেশন]

মঞ্জরিত নবশ্যাম

নিকুঞ্জ; গুঞ্জরে ভৃঙ্গ; রঞ্জিত সুন্দর
পল্লবিত বন্যবীথী সন্ধ্যার কিরণে।
সুদূরে তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে
বন্ধুরকান্তার দিয়া। স্তম্ভ অরণ্যানী।—
শুধু দূর আলবনে ললিত উচ্ছ্বাসে
কুহরে কোকিল এক, করি বিকম্পিত,
পদ্পিত অটবী। আসে মন্থর হিম্মলে
বসন্ত সমীর; চাহে নিস্পন্দ বিস্ময়ে,
কুরুগ শাবক এক গ্রীবা বক্র করি
স্তম্ভ অটবীর পানে। সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নিস্মল,
সদ্যোমেঘমুক্ত, নত চুম্বিতে ধরার
সুখস্মিত বিস্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।
কে বলিবে এ বরষা! কে বলিবে ছিল
কল্য সমাচ্ছন্ন করি' ও নীল আকাশ
প্রাবৃটের ঘন ঘটা? বসন্ত বরষা
মধুর মিশ্রণে যেন রচিয়াছে এক
অপূর্ব সৌন্দর্য্যরাজ্য;—আহা কি মধুর!
এত মধুধর চিত্র দেখি নাই আমি
বহুদিন। এত স্নিগ্ধ বহে নাই বৃষ্টি
বহুদিন শীতল সমীর। ডাকে নাই
কোকিল কখন এত অধীর আগ্রহে।

গীত

আজি মোর প্রাণ কি চায়।

জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায় ॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন অজ্ঞানিত টানে, কার পানে ভেসে যায়।

—উঠে চাঁদ! মরি মরি! বন অন্তরালে
পূর্ণ জ্যোৎস্না! একদিকে শান্ত গরিমায়
সূর্য্য হয়ে অস্তমিত, অপর আকাশে
উঠে চন্দ্র স্নিগ্ধ হাস্যে। লয়েছে উভয়ে
বিভাগ করিয়া যেন দিগন্তবিতত
উজ্জ্বল আকাশরাজ্য। দিবা অবসানে
আসে ওই তারাময়ী স্তম্ভ নিশীথিনী
শ্রান্ত পরে শান্তসম, শঙ্ক কাষ্য 'পরে
শিথিল স্বপ্নের মত।—ওই—ও কে—গায়!

সম্ভ্রত তরণীতে আরুঢ়া অস্রাদিগের গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান

গীত

বেলা বয়ে যায়।

ছোট মোদের পানসী তরি সপ্নোতে কে ঘাবি আয়।
দোলে হার, বকুল যুধী দিয়ে গাথা সে;
রেশমি পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেলছে তরি দুলছে তরি, ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নতন প্রেমিক নতন প্রেমে ভোর,—
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে নেশার ঘোর;
বাণীর ধনি হাসির ধনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্বে ঐ বদুছে চন্দ্র প্রেমের স্বপনে;
কছে নদী কুলধনি বছে মদু মধুর বায়।

অহল্যা। একি অপার্থিব গীত? পূলকে

আবেশে

রোমাণ্ডিত হয় তনু। হৃদয়ে জাগিয়া
উঠে কি বাসনা?—আর রাখিতে না পারি
বাঁধিয়া প্রবাহ।—হায় বৃষ্টিছ আমার
বিফল যৌবন, এই নারীজন্ম বৃথা।
বেলা গেল;—যাই তবে শূন্যগৃহে ফিরি'।

[গমনোদ্যত]

—কে যায় সুগোর যুবা, শিরে জটাভার,
বন্যপথ দিয়া শ্লথ চরণবিক্ষেপে?
কে এ? কভু দেখি নাই। সুঠাম সুন্দর
দীর্ঘ দেহ; প্রসারিত বক্ষ; পরিহিত
অর্জুন; চরণভঙ্গ লঘু; কিন্তু তার
মুখখানি সর্বশ্রেষ্ঠ,—ভাসে দেহ'পরে
প্রস্ফুটিত পদ্মসম, শৈবাল বোধিত
কোমল মৃগাল বৃন্তে। কে এ? ডেকে দেখি—
কে পান্থ?

তাপসবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ডাকিলে মোরে, কে তুমি তাপসি?

অহল্যা। বলি, কোথা যাবে?

ইন্দ্র। মিথিলায়। কত দূর
মিথিলা নগরী? মোরে দয়া কোরে দেবি
পথ বোলে দাও যদি।

অহল্যা। পান্থ, বহু দূর
সে স্থান দুর্গম। সন্ধ্যা আগত। তাপস!
মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ। প্রভাতে
যাইও সেথায় কল্যা।

ইন্দ্র। কে তুমি?

অহল্যা। তাপসী।

ইন্দ্র। নাম?

অহল্যা। অহল্যা।—না সখে!

মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শূদ্ধ নারী
কোন নাম নাই মোর। না সখে, কি নাম
যেতেছি ভুলিয়া। নাম? জানিও সন্ন্যাসী
শূদ্ধ সন্ন্যাসিনী আমি।

ইন্দ্র। সত্য কোরে বল,
খুলে বল; প্রহেলিকা বদ্বি না, কে তুমি?

অহল্যা। সত্য বলিব কি প্রিয়? হাঁ, সত্য বলিব,
আমার আশ্রমে চল।

ইন্দ্র। না, না, যাইব না।

অহল্যা। হাঁ যাইবে তুমি! মখে স্পষ্ট ব্যক্ত
তাহা।

কপট! আশ্রমে চল। [অক্ষুণ্ণস্বরে]। সত্য
বলিতেছি, আমি তব দাসী, তুমি মোর
প্রাণেশ্বর।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

মদন ও রতীর পুনঃ প্রবেশ ও নৃত্য গীত

উভয়ে। এমনি কোরে আমরা মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল।

• মদন। আমি বদকে হানি পদ্পশর;
রতি। আমি আনি বন্ধে বন্ধ, অধরে অধর;
মদন। বিছায়ে দি' পাতার শয়ন;
রতি। ছড়ায়ে দি' ফুল।
মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের
ভাষে গান;

রতি। অধর কোণে দিইছি মধু, নয়ন কোণে বাণ;

মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক;

রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ;

মদন। উড়ায়ে দি' আঁচলখানি;

রতি। এলায়ে দি' চুল।

মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ, মানুষ কিবা

ছার;

রতি। আমি কিন্তু ষোলকলা পূর্ণ করি তার;

মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয়;

রতি। আমি শূদ্ধ প্রেমের বিপদ ঘটাই ভুবনময়;

উভয়ে। আমাদেরই সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।

[নিষ্ক্রান্ত।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চিরঞ্জীবের আশ্রমের বহির্ভাগ।

কাল—সায়াহ।

মাধুরীর দ্রুতপদসঞ্চারে প্রবেশ

মাধুরী। কি আশ্চর্য্য! কি অন্যায়! কি

লোমহর্ষণ ব্যাপার! কি করি? কার পরামর্শ
নেই? একবার তপোবনান্তরে যাব না কি?
না। অন্য তাপসদের কাছে এ কুৎসা এখন
ভেগে কাজ নেই। দেখি যদি আমরাই এর
কোন প্রতিবিধান কর্তে পারি। স্বামীর সঙ্গে
পরামর্শ করা যাক! ঐ যে উনি যাচ্ছেন।
প্রভু একবার এদিকে এস!

চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। কি রে ডাকাছিস্ না কি?

মাধুরী। হাঁ একটা কথা আছে।

চিরঞ্জীব। কথাটা কি খুব দরকারী?

মাধুরী। ভারি দরকারী।

চিরঞ্জীব। তবে এখন বোলে ফেল্।

আমিও একটা ভারী দরকারী কাজে যাচ্ছি।

মাধুরী। প্রভুপত্নী কোথায়?

চিরঞ্জীব। আশ্রমে।

মাধুরী। কি কচ্ছেন?

চিরঞ্জীব। কি আর কবেঁন? চোখ
রগড়াচ্ছেন। সেই পুরোগো গল্প।

মাধুরী। কোন্ পুরোগো গল্প?

চিরঞ্জীব। বড়োবড়ীর গল্প। জানিস্
নে বদ্বি?—তবে শোন্।

গীত

বড়োবড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।
বড়ী ছিল বেজায় বৈষ্ণব বড়ো ছিল ভারি শান্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি

পাড়ার লোকে পুঁলিশ ডাকত।

হঠাৎ একদিন “দুস্তর” বোলে,

কোথায় বড়ো গেল চলে;

বড়ী তখন বড়োর জন্যে কপ্পে চক্কু লবণান্ত।
শেষে বছর খানিক পরে বড়ো ফিরে এলে ঘরে,
বড়ী তখন রেঁধে বেড়ে

তারে ভারি খুসী রাখত।

ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে;

মনের মিলে গভীর প্রেমে,

বড়ী দিত দাঁতে মিশী,

বড়ো গায়ে সাবান মাখত।

চিরঞ্জীব। আচ্ছা মাধুরী! আমি একটা
ভারি ধেকায় প'ড়েছি।

মাধুরী। কি ধোকা?

চিরঞ্জীব। ধোকা হচ্ছে এই,—তুই কি
আমাকে ভালবাসিস্?

মাধুরী। হাঁ, বাসি।

চিরঞ্জীব। হুঁ দেখে তাই বোধ হয় বটে।

মাধুরী। তবে আর ধোকা কি?

চিরঞ্জীব। ঐ ত ধোকা।—আচ্ছা খুব ভালবাসিস্?

মাধুরী। খুব বাসি।

চিরঞ্জীব। আমি কিন্তু তোকে কিছ্ ভালোবাসিনে।

মাধুরী। একদিন বাস্বে।

চিরঞ্জীব। উঁহু—বোধ হয় না। [সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িল] তোকে আমি কেন রকমেই ভালোবাস্তে পারিনে।

মাধুরী। কেন? আমি জাতিতে গণিকা বোলে?

চিরঞ্জীব। না তুই জাতিতে স্ত্রীলোক বোলে।—তুই অসার, অকিঞ্চৎকর যৎসামান্য স্ত্রীলোক। আমার মতন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার তোর মত একটা ক্ষুদ্র মেয়ে মানুসকে ভালোবাস্তে পারে না।

মাধুরী। তোমার যেমন ইচ্ছা। তুমি আমায় ভালোবাসো না বাসো, আমি চিরদিন তোমায় ভালবাস্বে।

চিরঞ্জীব। ঐ ত স্ত্রীলোকের দোষ। বেজায় নাছোড়বন্দ্।

মাধুরী। আচ্ছা সে কথা যাক্—প্রভুপত্নীর আশ্রমে সম্প্রতি কিছ্ লক্ষ্য করেছো?

চিরঞ্জীব। করিছি।

মাধুরী। কি?

চিরঞ্জীব। সাপ, ব্যাং, টিয়া, বুলবুলি, তেলাপোকা, টিকটিক—

মাধুরী। না না—নতুন কিছ্?

চিরঞ্জীব। হরিণটার একটা ছানা হয়েছে!

মাধুরী। না গো ও সব নয়! নতুন কোন ব্যক্তি।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি?

মাধুরী। হাঁ।

চিরঞ্জীব। ব্যক্তি?—কৈ, না?

মাধুরী। একজন এসেছে।

চিরঞ্জীব। পুরুষ মানুস, না মেয়ে মানুস?

মাধুরী। পুরুষ মানুস। একজন সুন্দর সুর্গোর যুবক প্রত্যহ অর্ধরাতে আসে, আর প্রত্যহে চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বটে? বটে? এ ত রগড় মন্দ নয়।—কোথা থেকে আসে আর কোথায় চোলে যায়?

মাধুরী। দূরে নদীবক্ষে একখানা সঞ্জিত তরণী দেগ্ নি?

চিরঞ্জীব। দেরিখি যেন।

মাধুরী। সেখান থেকে আসে আবার সেই খানেই চোলে যায়।

চিরঞ্জীব। বোঝা গেছে। বাবা, চিরঞ্জীব শর্মা এত মূর্খ নয়।—যাবে কোথা? স্ত্রী-জাতির চরিত্র ত, তা রেশমী সাড়ীই পরুন, আর গাছের ছালই পরুন,—স্ত্রীচরিত্র যাবে কোথা? যাবে কোথা?

মাধুরী। এখন তোমায় একটা কাজ কর্তে হবে।

চিরঞ্জীব। কি কর্তে হবে বল্ দিখি নি! আমার যে রকম গায়ে শক্তি, সেই রকম যদি মাথায় বুদ্ধি থাক্, তা হলে বোধ হয় আমি একটা বুদ্ধিমান্ লোক হতে পার্লাম।

মাধুরী। কর্তে হবে এই—এই লোকটার সন্ধান নিতে হবে। কে সে? কোথায় তার নিবাস? তার অভিপ্রায়ই বা কি?

চিরঞ্জীব। সে কে, আর কোথায় তার নিবাস, তা জানিনে বটে; কিন্তু তার অভিপ্রায় যে কি তা বেশ টের পাওয়া গেছে। এ রকম অবস্থায় সব পুরুষজাতির একই রকম অভিপ্রায় হয়ে থাকে।

মাধুরী। সে কাল প্রত্যহে যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাবে, তুমি তার পিছ্ পিছ্ যাবে। গিয়ে—

চিরঞ্জীব। তা আমাক্ দিয়ে হবে না। আমি পিছ্ পিছ্ গিয়ে তাকে ধর্তে পার্বে না। ধর্তে হয় ত সম্মুখ সমরে। [উগ্রভাবাপন্ন]

মাধুরী। না প্রভু। মহর্ষি গোতমের পবিত্র আশ্রমে একটা কুকীর্তি কোরে কাজ নাই।

চিরঞ্জীব। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ [হুঙ্কার।]

মাধুরী। দোহাই তোমার। এখানে নয়। যুদ্ধ কর্তে হয় ত, তপোবনের বাহিরে গিয়ে। আজ শেষরাতে একটু সজাগ থাকো।

চিরঞ্জীব। আমার ত আজ সমস্ত রাঙ ঘুম হবে না।—বেশ বেশ! সুখবর! এ রকমে জীবনের একটু বৈচিত্র্য হয়।

মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন? ঐ যে আসছে।

রোরদ্যমান শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। দিদি!

মাধুরী। কি দাদা?

শতানন্দ। মা আমাকে মেরেছে।

মাধুরী। কেন?

শতানন্দ। তা জানি না। আর বলেছে, আজ রাতে আমাকে তার কাছে শূতে দেবে না।

[ক্রন্দন।]

চিরঞ্জীব। তা যে মা তোকে মারে, তার কাছে তুই শূতে যাস্ কেন রে ছোঁড়া?

মাধুরী। বোঝ না, সে যে প্রাণের টান।— চল দাদা আমার সঙ্গে খেলা করবে এস!

[মাধুরীর শতানন্দকে লইয়া প্রস্থান।]

চিরঞ্জীব। হঁ হঁ সাধে কি বলি,— “স্বভাব এবাধ তথার্থিচ্যতে।” যাবে কোথা। স্ত্রীচরিত্র ত—যাবে কোথা?

জনৈক তাপসের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। হঁ হঁ হঁ হঁ [হৃৎকার]।

তাপস। কি ঠাকুর! হঠাৎ এত উগ্র যে?

চিরঞ্জীব। আমার ক্রোধের উদয় হ'য়েছে!

তাপস। কেন?

চিরঞ্জীব। সে খোঁজে তোর দরকার কিরে বেটা? [প্রহারোদ্যত] বেরো আমার আশ্রম থেকে।

তাপস। বেরোচ্ছি। একটা সুখবর দিতে এলাম,—

চিরঞ্জীব। সুখবর? [সাগ্রহে] কি? কি?

তাপস। মহর্ষি গোতম ফিরে আসছেন।

চিরঞ্জীব। কবে?

তাপস। এই সপ্তাহখানিকের মধ্যে!

চিরঞ্জীব। কেন?

তাপস। তাঁদের তপস্যা হোল না। সেখানে রাক্ষসের বিপর্যয় রকম অত্যাচার। বিশ্বামিত্র গিয়েছেন মহারাজ দশরথের কাছে নালিশ কর্তে; আর গোতম ফিরে আসছেন।

চিরঞ্জীব। নেহাইৎ অপদার্থ। এই গোতমটা নেহাইৎ অপদার্থ—স্ত্রী ছেড়ে থাকতে পাল্লে না আর কি? বোঝা গেছে। নেহাইৎ অপদার্থ।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—অহল্যার কুটীরাভ্যন্তর। কাল—শেষরাত্রি।

ইন্দ্র ও অহল্যা

অহল্যা। তুমি ইন্দ্র? তা জানিলে আগে, কে করিত

আপন হৃদয়েশ্বর তোমারে মায়াবী?

ইন্দ্র। কি দোষ আমার?

অহল্যা। শত দোষ। শূনিয়াছি

তুমি শঠ, ব্যাভিচারী, লম্পট।

ইন্দ্র। বিশ্বাস

করিও না সে অখ্যাতি।

অহল্যা। সত্য কোরে বল—

ভালোবাসো অহল্যারে?

ইন্দ্র। [কর দুটি ধরিয়া] অনিন্দ্য সুন্দরী!

আমার হৃদয়েশ্বরী!—নন্দন কাননে

কিশোর মন্দির পুষ্প বসন্ত সমীরে

ঢালে না সুগন্ধ এত, যে গন্ধ তোমার

অক্ষুটপ্রণয়বাণীমিশ্রিতনিঃশ্বাসে।

ত্রিদিব ভাঙারে মোর এত সুধা নাই,

ও রক্ত অধরে যত। [চুম্বন]। সজল বিদ্যুৎ

এত স্নিগ্ধতীর নহে, তব আলিঙ্গন

যত স্নিগ্ধ প্রিয়তমে! [আলিঙ্গন]

অহল্যা। সত্য?

ইন্দ্র। সত্য কথা।

অহল্যা। হায় যদি পারিতাম করিতে বিশ্বাস এই বাক্য!

ইন্দ্র। কেন নহে?

অহল্যা। তব সভাস্থলে

নৃত্য করে বারাঙ্গনা।

ইন্দ্র। তাহারা নর্তকী,—

প্রণয়িণী নহে।

অহল্যা। শচী মহিষী তোমার।

ইন্দ্র। ইন্দ্রাণী মহিষী মাত্র, প্রণয়িণী নহে।

অহল্যা। [সহসা]। না না ফিরে যাও!

এখনো ফিরিতে পার,

এখনো ফিরিতে পারি! যাহা হইবার

হইয়াছে। জানিবে না কেহ। যাও ফিরে।

ইন্দ্র। যাইব প্রেয়সি কিন্তু সঙ্গে যাবে তুমি।

চল এইক্ষণ। তীরে সজ্জিত তরণী।

চল।

অহল্যা। না, হৃদয়েশ্বর! কেন কর মোরে সজ্জিত গভীর পঙ্কে? গোতম-রমণী

আমি।
ইন্দ্র। কেন মিথ্যা এ প্রবোধ! বহুদূর
আসিয়াছ! আর চাহিও না ফিরে ফিরে।
এখন অহল্যা ইন্দ্র অচ্ছেদ্য শৃংখলে
বন্ধ আমরণ। চল, রাখিব তোমারে
মর্ম্মরচিত হর্ম্মা, পদ্প স্দবাসিত
কনকপালকে। দিব হীরক পঠিত
অলঙ্কার; দাস দাসী। তদুপরি আসি
করিবে চরণসেবা দেবেন্দ্র আপনি
প্রত্যহ।

অহল্যা। [কম্পিতস্বরে] শপথ কর,
সত্য ভালোবাসো?
ইন্দ্র। তথাপি সন্দেহ? ভালোবাসি?
হায় প্রিয়ে!

অধীর আগ্রহ এত, জ্বলন্ত বাসনা,
বুঝ নাই প্রাণেশ্বরী?—
অহল্যা। —চল ঝাঁপ দিব
কলঙ্কসমুদ্রে আজি। ফিরে যেতে চাহি
কিন্তু হায় ফিরিতে সামর্থ্য নাই! চল।
—কিন্তু পুত্র শতানন্দ?

ইন্দ্র। তারে রেখে যাও
লালন করিবে শিষ্যদম্পতী তাহারে।
—এখনো রজনী আছে। চল।

অহল্যা। কোথা যাব?
ইন্দ্র। স্বর্গে।
অহল্যা। না না স্বর্গে নহে।
ইন্দ্র। কেন প্রাণেশ্বরী?
অহল্যা। জিজ্ঞাসিছ “কেন?” নিত্য লঙ্কায়
রক্তিম

হইব না,—পথে ঘাটে ত্রিদিবে যখন
অঙ্গুলি বাড়ায়ে মোরে কহিবে সকল
দিব্যাঙ্গনা—“ওই ভ্রষ্টা গোতমরমণী”?
ইন্দ্র। দিব রাখি নিভৃত নিলয়ে, দূরে। কেহ
জানিবে না।

অহল্যা। না বলভ! তার চেয়ে চল—
কোন দূর নিরালয় স্বীপে, উপকূলে,
অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে,—পশেনি যেখানে
মনুষ্য নিঃস্বাস; নাহি পশিবে শ্রবণে
আপন অখ্যাতিগাথা; যেখানে ভূঞ্জিব
পরম্পরে নিত্যচিরঅতৃপ্তবিলাসে
অলঙ্কো নিভূতে স্নখে। সেখানে বৃষ্টিব
বিশ্ব জনশূন্য, শূন্য তুমি আমি আছি।

ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবাধ
ক্ষুদ্র মিলনের তরী, অকূল গভীর
প্রেমের সমুদ্র, তার গাঢ় স্বেচ্ছ নীল
ফেনিল হিল্লোলে।

ইন্দ্র। অত্যাশ্রম! চল যাই
এ মদহর্ষ। শতানন্দ স্দপ্ত। অরণ্যানী
নিম্পন্দ নীরব!

অহল্যা। বৃষ্টি পড়িতেছে।

ইন্দ্র। শূভ।
রজনীর অন্ধকারে শীকরশীতল
নিম্নতম্ব প্রহরে, মৃতবৎ অচেতন
ঘুমায় নিখিল বিশ্ব। শীঘ্র এস।

অহল্যা। চল।

শতানন্দ। মা! মা!

অহল্যা। জাগিয়াছে পুত্র।

ইন্দ্র। পড়েছে ঘুমায়
আবার বালক! চল এইক্ষণে। বিলম্ব কি!

অহল্যা। চল তবে।

শতানন্দ। মা! মা কোথা!

ইন্দ্র। স্থির হ, বালক—
অহল্যা থামাও পুত্রে। নহিলে নিষ্ফল
করিবে এ আয়োজন।

অহল্যা। থাম্ শতানন্দ।

শতানন্দ। মা ও কে? মা যাও কোথা?

ইন্দ্র। বিফল করিল

এত আয়োজন, ওই হতভাগ্য শিশু।

অহল্যা। কি করিব?

শতানন্দ। মা—মা ক্ষুধা—

ইন্দ্র। কর কণ্ঠরোধ।

শতানন্দ। মা ক্ষুধা।

অহল্যা। আবার?—তবে দিতেছি মিটায়ে
চিরজীবনের ক্ষুধা।

গিয়া শিশুর কণ্ঠরোধ

ইন্দ্র। স্তম্ভ হইয়াছে

পাপাত্মা জন্মের তরে শীঘ্র চোলে এস।

অহল্যা। একি! করিলাম হত্যা আপন সন্তানে?

ইন্দ্র। বাহিরে ডাকিছে কাক। এস

[বহির্গমন।

অহল্যা। চল যাই—

বৃষ্টিয়াছি। তবে আমি নামিরা এসেছি
নরকরাজ্যে! তবে বিদায়—বিশ্বাস,
নির্ভর, মমতা, পুণ্য।—আয় নেমে আয়

পাপের করাল রাজ্য প্রগাঢ় তিমিরে!
 প্রস্থানোদ্যত
 মাধুরীর প্রবেশ
 মাধুরী। শতানন্দ কাঁদে কেন?—প্রভুপত্নী তুমি
 এ বেশে? কোথায় যাত্রা করিছ প্রত্যুষে?
 অহল্যা। ধরা পড়িয়াছি।
 ইন্দ্র। [বাহিরে]—এস শীঘ্র চোলে এস।
 বাহিরে শব্দ
 ইন্দ্রকে ধরিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ
 চিরঞ্জীব। তবে পলাতক যাবে কোথা?
 ইন্দ্র। ছাড় জীব!
 প্রাণে যদি মায়া থাকে।
 চিরঞ্জীব। হাঁ চন্দ্রবদন!
 উভয়ে যুদ্ধ। চিরঞ্জীবের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রাঙ্গি
 নিক্ষেপ ও চিরঞ্জীবের পতন
 অহল্যা। একি একি!
 ইন্দ্র। শীঘ্র চোলে এস প্রাণেশ্বর।
 [অহল্যার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—জনকের প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত।
 জনক, গৌতম, চিরঞ্জীব, শতানন্দ
 গৌতম। প্রবাস হইতে ফিরি' বন্ধু দেখিলাম—
 আশ্রম কুটীর জনশূন্য। নিরুদ্ধেশ
 অহল্যা প্রেয়সী। মৌন আনন্দ বিষাদে
 আমার কুটীর চড়া; কুটীর প্রাঙ্গণে
 শব্দ গুল্ম তাহাদের রাজ্য পুরাতন
 করিতেছে অধিকার।
 চিরঞ্জীব। চরিতেছে ঘৃণা!
 গৌতম। সন্নিহিত নিম্ববৃক্ষশিখরে বাদুড়
 রহিয়াছে নীড়। বন নিস্তম্ভ, মলিন।
 আশ্রমে প্রবেশমাত্র উঠিল চীৎকারি'
 বিরাট পেচক এক! বাহিরিয়া গেল
 দেখিয়া আমারে। ডাকিলাম চীৎকারিয়া
 “অহল্যা”—উত্তর দিল “অহল্যা” সদূর
 বনপ্রতিধ্বনি উপহারি'। বাহিরিয়া
 আসিল তখন শিষ্যা মাধুরী। কহিল
 কেহ সে আশ্রমে নাই। শিষ্য চিরঞ্জীব
 আহত কুটীরে। শতানন্দ প্রিয়তম
 পরিত্যক্ত মৃতবৎ, বাঁচিয়াছে বহু
 শূন্যায়! নিরুদ্ধেশ অহল্যা।

জনক। করিলে
 অশ্বেষণ গৌতমীর?
 চিরঞ্জীব। বহু অশ্বেষণ,
 বন হ'তে বনান্তর। কোনই সন্ধান
 মিলিল না।
 জনক। তার পর?
 চিরঞ্জীব। কহিলাম আমি
 সস্ত্রীক সংসার যদি না করিতে পারো
 কেন এই বিড়ম্বনা—উম্বাহবন্ধন?
 গৌতম। সত্য চিরঞ্জীব।
 চিরঞ্জীব। প্রভু শূন্যলেন যবে,
 অহল্যা উজ্জীমান লম্পটের সনে।
 কহিলেন “অসম্ভব”। কহিলাম আমি
 “এ শাস্ত্রসংগত প্রভু—প্রোষিতভর্তৃকা
 দোষ নাই”—তবে কিন্তু রাজর্ষি! লম্পট
 কি ছুড়িয়া মারিল আমারে নাই জানি।
 অদ্ভুত সে প্রহরণ অগ্নিসম তেজে।
 গৌতম। রাজর্ষি! জীবনে আর অনুরাগ
 নাই—

সংসারে প্রবৃত্তি নাই। চলিলাম আজি
 ছাড়ি' বনগ্রাম শিষ্যদম্পতীর সনে।
 জনক। কোথা যাবে প্রিয়বর?
 গৌতম। সদূর কৈলাসে
 শূন্যিয়াছি সে পর্বত অতি মনোহর,
 অতীব নিষ্কর্জন! দিব সকল কামনা
 সকল সাধনা চিন্তা একান্ত আগ্রহে
 বিশ্বনিয়ন্তার পদে।
 জনক। নিজ তপোবনে
 কর না তপস্যা?
 গৌতম। পারিব না প্রিয়বর!
 সুখস্মৃতিসম মম রম্য তপোবন
 সতত জাগায়ে দিবে অতীত কাহিনী।
 জনক। বড়ই করুণ বাস্তব।
 গৌতম। বৃষ্টি এ বেদনা
 বিভূর মণ্ডল বিধি। ভুলিয়াছিলাম
 বিশ্বেশ্বরে এত দিন, মায়ায় জড়িত,
 আত্মসুখরত। বৃষ্টি দয়াময় প্রভু
 ছিন্ন করি' সে বন্ধন লইলেন টানি'
 আমারে তাঁহার পানে!—ধন্য বিশ্বপতি!
 তোমার মণ্ডল ইচ্ছা পূর্ণ হোক।
 [উদ্দেশ্যে প্রণাম]
 —সখে!

বালকে, জীবনাধিক পুত্রে, সমর্পণ
করিলাম তব করে, রাজর্ষি! দেখিও।
জনক। পুত্রবৎ করিব লালন।

গোঁতম। প্রাণাধিক!
শতানন্দ! চলিলাম। বৃদ্ধি আমি তোমার
বড়ই নিষ্ঠুর পিতা! আশৈশব তুই
পিতৃমাতৃস্নেহসুখে বর্ণিত। ছাড়িয়া
গিয়াছে জননী তোমার! আমিও নির্মম
চলিলাম ছাড়ি'। বৎস চলিলাম! কভু
আমারে করিস্ মনে। না, না, ভুলে যাস্,
ফেলে দিস্ বন্ধ হ'তে টানি উপাড়িয়া
নিষ্ঠুরজনকস্মৃতি। ভাবিস্ বালক,
তুই পিতৃমাতৃহীন। [চুম্বন]

গেলাম রাখিয়া
অভিন্নহৃদয়বন্ধু তোমার আশ্রয়ে।
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] বন্ধু দেখিও
বালকে!

অসহায় শিশু—আর কি বলিব—তুমি
জান সব। প্রিয়বর দেখিও। আমার
প্রাণের অধিক শতানন্দ সুদর্শন!
চলিলাম বৎস! [চুম্বন] রাজর্ষি করিও

ক্ষমা

দুর্ভাগ্য অক্ষম বৃদ্ধ গোঁতমে!
জনক। জানি না,
তোমার এ ভাগ্য কেন? অথবা সুহৃৎ
এই তীর যন্ত্রণায় কিনিতেছ তুমি
অনন্ত অক্ষয় পুণ্য।

গোঁতম। চলিলাম তবে।
চিরঞ্জীব। “চলিলাম” “চলিলাম”
এক শত বার

করার সদর্থ বৃদ্ধি, প্রভু যাইবার
ইচ্ছা নাই? কে মাথার দিব্য দিয়া তবে
কহিয়াছে “যাও যাও”—থাকো না এখানে?
গোঁতম। নানা চিরঞ্জীব চল! মাধুরী কোথায়?
চিরঞ্জীব। করিছে ক্রন্দন বহির্দ্বারে! চিরকাল
স্বীজাতির প্রিয়কার্য।

গোঁতম। তবে বৎস যাই!
যাই বন্ধু!

জনক। এস প্রিয়বর!

গোঁতম। একবার
আর একবার চুম্বি। বৎস প্রাণাধিক!
একটি চুম্বন তুই দিবি না পিতারে?

শতানন্দ চুম্বন করিল
গোঁতম। একবার “বাবা” বোলে ডাক্, শুন
যাই!

শতানন্দ। বাবা! বাবা! বাবা!
গোঁতম। না, যাইতে পারিব না আমি।
রহিব সংসারী।
চিরঞ্জীব। তাহা পূর্বে হ'তে জানি। [বসিল]
গোঁতম। হা অবোধ! হা নিষ্ঠুর! বালক!
বালক!

কেন ডাকিলি ও তোমার মধুমাথা স্বরে?
কোথায় যাইব?—বৎস প্রিয় প্রাণাধিক!
কি করিলি তুই?—না না থাক্—যাই, যাই।
বালক! মায়াবী শিশু! কে তুই? কেহ না।
[সবেগে প্রস্থান।]

চিরঞ্জীব। এরূপ ব্যাপার কিন্তু কভু দেখি
নাই।
[প্রস্থান।]

জনক। গোঁতম তোমার নাহি তুলনা জগতে!
বৎস শতানন্দ! চল যাই অন্তঃপুরে।
[নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজা দশরথের সভাকক্ষ। কাল—প্রভাত।
দশরথ, বিশ্বামিত্র, বিশিষ্ঠ, রাম ও লক্ষ্মণ
বিশ্বামিত্র। দাও মহারাজ পুত্রস্বয়ে! পুত্ররায়
যাচ্ছা করি।

দশরথ। বৃদ্ধি কি অমিতপ্রভাব
বিশ্বামিত্র মহর্ষি অক্ষম নিবারিতে
রাক্ষসের অত্যাচার?

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণ যদ্যপি
করিবে সমর, ছাড়ি' তপস্যা অর্চনা,
কোন্ কৰ্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

দশরথ। সত্য কথা, প্রভু;
দিতেছি সেনানী কিম্বা আপনি যাইব
বধিব রাক্ষসে যুদ্ধে। উহারা বালক;
কিরূপে যুদ্ধিবে দুর্দান্ত রাক্ষস সহ?
ক্ষমা কর।

বিশ্বামিত্র। নরপতি! ক্ষত্রিয় ভূপতি
কাতর সমরক্ষেত্রে পুত্রে পাঠাইতে?
উত্তম! ক্ষত্রিয় তুমি?
দশরথ। উহারা বালক।

বিশ্বামিত্র। বারম্বার এক কথা—

“উহারা বালক!”

জানো না কি দশরথ, যে দিন ক্ষত্রিয়
সক্ষম ধরিতে অস্ত্র, সে দিন হইতে
যুদ্ধই ব্যবসা তার, যুদ্ধই কামনা,
যুদ্ধ চিন্তা জাগতে নিদ্রায়।

দশরথ।

শিশুদ্বয়

অস্ত্রবিশারদ নহে মহর্ষি—

বিশ্বামিত্র।

—হা ধিক্!

“ক্ষত্রিয় দ্বাদশবর্ষ বয়সে অক্ষম,
অশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে”—এ কথা বলিতে
হইল না অপमानে কুণ্ডিত রসনা,
রক্তিম কপোল? যদি সমরে অক্ষম,
হইবে নিহত যুদ্ধে। কি করিব? যদি
সমরে অক্ষম, তবু ক্ষত্রিয় ইহারা,
আশা করি ভীরু নহে।

দশরথ।

জানো ঋষিধর!

বহু তপস্যার ধন এই পুত্রদ্বয়।

বিশ্বামিত্র। রাখো নরপতি অনুনাসিকা

কাকুতি,

দিবে কি না দিবে?

বিশিষ্ট।

পূর্ণ কর নরপতি—

ঋষির প্রার্থনা। যবে মহর্ষি সহায়
ভয় নাই।

দশরথ।

গুরুদেব! তবে তাই হোক।

নিয়ে যাও পুত্রদ্বয়ে মূর্খনিবর। আজ
তোমার আগ্রয়ে প্রভু দিলাম সর্পিয়া
প্রাণাধিক শ্রীরাম লক্ষ্মণে।—নিয়ে যাও।

বিশ্বামিত্র। কৃতার্থ, ভূপতি!—সত্য কথা,

মহারাজ

জানি শিশুদ্বয় নহে শস্ত্রবিশারদ
অতিরিক্ত পিতৃস্নেহে। ভংসিয়াছি তাই
তোমারে এক্ষণে। করিতেছ অবহেলা
অন্যায় বাৎসল্যে পিতৃ কর্তব্যে ভূপতি!
আসিয়াছিলাম, সত্য, চাহিতে তোমার
সেনানীসাহায্য; কিন্তু দেখিলাম আসি,
অশিক্ষিত যোগ্য তব রাজপুত্রদ্বয়;
যুদ্ধ বিনা যুদ্ধশিক্ষা অসম্ভব। তাই
চাহিতেছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে। চিন্তা নাই;
আমি শিক্ষা দিব, আমি রহিব নিকটে।

তাহারা পিতার বক্ষে ফিরিবে কুশলে।

দশরথ। তাই হোক ঋষিধর! [স্বগতঃ]

তথাপি রহিল

ভরত শত্রুঘ্ন। ভাগ্যবশে সভাস্থলে
তাহারা অনুপস্থিত। ঋষির অজ্ঞাত
তাহাদের অস্তিত্ব। [প্রকাশ্যে] মহর্ষি!
তাই হোক।
[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বনাভ্যন্তরস্থ পথ। কাল—গোধূলি।
চিরঞ্জীব ও মাধুরী

চিরঞ্জীব। তুই আমার সঙ্গ ছাড়বিনে?
মাধুরী। না প্রভু।

চিরঞ্জীবের গীত

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাহিতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাহিতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য।
আলোর চাহিতে আঁধার বেশী, স্থলের চাহিতে সিদ্ধ।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু।
সত্যের চাহিতে মিথ্যা বেশী, ধর্মের চাহিতে তন্দ্র।
ভক্তির চাহিতে কীর্তন বেশী, পূজার চাহিতে মন্ত্র।
ফুলের চাহিতে পত্র বেশী, মণির চাহিতে কন্দম্ব।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্যার তর্জনি গর্জনি
হৃদম্ব।

তুই ফিরে যা, এখনো বলছি।

মাধুরী। কেন আমি তোমার কি অনিষ্ট
কিচ্ছি?

চিরঞ্জীব। অনিষ্ট?—সমূহ অনিষ্ট। তুই
ক্রমাগত আমার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিস্। ফিরে
যা! যাবি নে?

মাধুরী। না।

চিরঞ্জীবের হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ও পুনরায়
গীত

ব্রহ্মার চাহিতে বিষ্ণু বড়, ব্রহ্মার ধূলি ফর্সা।
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা।
ভক্তির চাহিতে ভার্য্যা বড়, ভক্তা বাড়ীর কর্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্যে ভার্য্যা ভক্তার ভক্তা।
শক্তির চাহিতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি।
পত্নীর চাহিতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভ্রমণী।
সে স্ত্রী পরিত্যজ্য, ও তার কপালেতে অগ্নি।

তবু গেলি নে? কথা শুনিস্ নে কেন? ঐ. ত
তোরে দোষ।

মাধুরী। ঐ আদেশটি কোরো না প্রভু! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। যেখানে তোমার গতি, সেখানে আমার গতি। শাস্ত্র বলে স্ত্রী ছায়ার মত পতির অনঙ্গমন কোর্বে।

চিরঞ্জীব। তা হলে বলতে হবে যে শাস্ত্র অনুসারে পতির অবস্থাটা ভয়ঙ্কর শোচনীয়। যেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা?—একটু নিরবিলা নেই? পতি এমনই কি পূর্বজন্মে পাপ করিছিল? এখনো ফিরে যা! নৈলে ভালো হবে না বলছি। যাবি নে?

মাধুরী। না!

চিরঞ্জীবের গীত

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাস্যের চাইতে অনেক ভালো গলে রঞ্জুবন্ধন ॥
মুক্ত শত্রু বরণ ভালো, নয় তা ভণ্ড মিত্র।
আসল প্রেমের চেয়ে ভালো কাব্যে প্রেমের চিত্র।
গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে, মূর্খ সে যৎপরোনাস্তি ॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো, বলে সর্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধুলে ছাড়ে তবু, ধুলে ছাড়ে না স্ত্রী ॥

দ্যাখ্ তুই যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপেই রৈলি? যদি ফিরে না যাস্ ত তোকে এই জায়গায় গলাটিপে ধোরে মেরে ফেলে পুতে রেখে যাবো। গোঁতম অনেক আঁগিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এয়েছে। রাস্তা জনশূন্য।

মাধুরী। আমি এমনই কি অপরাধ করিছি?

চিরঞ্জীব। তুই পিশাচী ডাইনী। তোর স্নেহে, তোর আগ্রহে, তোর সেবায়, দিবারাত্র আমাকে জড়াবার চেষ্টায় আছি। আমাকে যাদু করিছিস্, মন্ত্র করিছিস্। আমার সর্বনাশ হবার যোগাড় হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে আমি তোকে একটু একটু ভালো বাসি। কৈ আগে তো বাসতাম না?

মাধুরী। তা ভালো বাসলেই বা। স্ত্রীকে স্বামী ভালো বাসবে, ইতে দোষ কি?

চিরঞ্জীব। আবার তর্ক কর্তে আরম্ভ করলে—ফিরে যাবি নে?

মাধুরী। না।

চিরঞ্জীব। ওরে মস্ত বাঘ খেলে—

মাধুরীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দৌড়িয়া পলায়ন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কৈলাস শিখর। কাল—সন্ধ্যা।
অহল্যা একাকিনী

অহল্যা। ভ্রামিলাম বহু স্থানে!

—পদরে, জনপদে,

ক্ষেত্রে, কুঞ্জে, উপবনে, পর্বতশিখরে।
কিন্তু সুখ!—কোথা সুখ?—হৃদয় ভেদিয়া
নিত্য উঠে এক মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।
আকুল অধীর চিত্ত অনন্ত বিষাদে
ছেয়ে আসে। মিলনের তীর সুরাপানে,
ক্ষণেক ভুলিয়া থাকি এ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।
আবার জাগিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া
পাপের বিরাট মূর্তি।—চাহিয়া সহসা
দেখি এক ভীম গর্ত—যার তল নাই,
যার মধ্যে আলো নাই, শব্দ নাই; যার
করাল ব্যাদান আছে নিত্য নিরন্তর
আমারে করিতে গ্রাস।

এই পরিণাম!

এই জন্য করিয়াছি ঘৃণ্য ব্যভিচার,
পুত্র হত্যা, আমি পার্বতিনী। কর্ণে বাজে—
আজিও সে অস্তিম ক্রন্দন। “মা মা”—এ কি
ডাকিল আমারে পুত্র! না, এ প্রতিধ্বনি!
এ কল্পনা।

কল্পনা? না এ কল্পনা নহে;—
এ কল্পনা নহে।—পৃথিবীর গর্ভ হতে
আকাশের প্রান্ত হতে, আসে এ ক্রন্দন।
দিবার প্রথর দীপ্ত সমাচ্ছন্ন করি;
গাঢ়তর করি' গাঢ় নৈশ অন্ধকার;
ছাপিয়া, কর্কশ করি, সঙ্গীত-সুস্বর;
পর্বত বিদীর্ণ করি; শূন্য ভিন্ন করি;—
উঠে সে ক্রন্দন।—সেই করুণ কাতর
রুদ্ধ শব্দ, হস্ত তুলি নীরব কাকুতি;—
জননীর কাছে সন্তানের হস্ত তুলি
নিষ্ফল জীবন ভিক্ষা।—অহো জগদীশ!
এত অন্ধ হয় নারী; এতই নির্মম
হয় মাতা, পড়িলে কামের প্রলোভনে?
—আবার ডাকিল পুত্র? এই যাই। আজি
করিব সে পাপ ধৌত আপন শোণিতে।
এই যে ছুরিকা।—দীপ্ত, শাণিত, সুন্দর,
কুদ্র অস্ত!—এত কুদ্র এত ভয়ঙ্কর!
মধুর প্রণয়ীসম আজি এস নেমে

বন্ধের ভিতরে প্রিয়তম!—পান কর
 অহল্যার তন্ত রক্ত; বিশ্ব পৃষ্ঠ হতে
 মূছে দাও অহল্যার নাম!—শতানন্দ
 আবার ডাকিল? যাই, দাঁড়া, এই যাই—
 বন্ধে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত। পশ্চাৎ হইতে
 মদন আসিয়া তাহার হস্ত ধরিল
 অহলা। কে তুমি?
 মদন। ক্ষমিও দেবি! তব পদতলে
 রাখিলাম অস্ত্র এই। পরিবর্তে তার
 ধর এই সুধাপাত্র পূর্ণ বিম্বাধরে!

রত্নের প্রবেশ

রত্ন। কি করিছ মূঢ় নারী! এ বসন্ত কাল;
 এখন বাতাস; ওই স্বচ্ছ নীলাম্বরে
 পূর্ণ চন্দ্র; এ পূর্ণিত কুঞ্জ;—একি সখি,
 আত্মহত্যা করিবার উপযুক্ত স্থান,
 উপযুক্ত কাল? ছি ছি!!

হাঁ যখন নামে
 ধূসর আকাশ হতে চূর্ণ বারিকণা,—
 সূর্যালোকহীন এক পঙ্কিল দিবস;
 গদ্যময় অপরাহ্ন; ডাকে না কোকিল;
 দীর্ঘশ্বাস ফেলে উষ্ণ সজল বাতাস;
 শূন্য মাঠ, ক্ষেত্রে জল, রাস্তায় কন্দর্ম;
 —হাঁ তখন আত্মহত্যা কর, ক্ষতি নাই;
 অন্ততঃ সে এত রক্ষ এত বিসদৃশ
 ঠেকে না কাহার চক্ষে।

মদন। এ বসন্ত কাল,
 এ সৌন্দর্য্যরাশি, আর এ ভরা যৌবন,
 এর সঙ্গে আত্মহত্যা?—একি শোভা পায়?
 এ কি সহ্য হয়?—এ যে খাঁটি হাস্যরস—
 একান্ত অভদ্র কাজ!

রত্ন। এ মরণ সখি,—
 আছেই ত এক দিন। আপনিই আসে,
 ডাকিতে হয় না। কতটুকু এ জীবন?
 কেন, কিবা প্রয়োজন, সংক্ষিপ্ত করিয়া
 স্বতঃই সংক্ষিপ্ত বস্তু? যত দিন প্রাণ,
 সম্ভোগ করিয়া লও, যেরূপ সম্ভব।

অহল্যা। সত্য করিয়াছ বন্ধু সত্য করিয়াছ
 প্রিয় সখি! দাও সুরা—যাই, জ্বলে' যাই—
 দাও সুরা। নিভাই এ তাঁর তাঁক্ষ জ্বালা।
 [সুধাপান]
 আবার! [পান] আবার! [পান] সত্য

করিয়াছ সখি
 “সম্ভোগ করিয়া লও।” পরে? তার পরে?—
 যা হবার হবে। সম্ভোগ করিয়া লও।
 —আবার ডাকিল শতানন্দ? যা যা তুই
 মূঢ় শিশু। পুত্র? কোথা পুত্র?—পুত্র নাই
 কখন ছিল না পুত্র; কে বলিবে আমি
 করিয়াছি পুত্রহত্যা। করি নাই। ঢালো
 আবার মদিরা; পান কর [পান] নাচো,
 গাও—

মদন ও রত্নের গীত

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আসছে ভেসে
 মলয় বায়।
 সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায় ॥
 বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে
 উঠছে ডাকি,
 শিরীষ আত্ম মূকুল গন্ধ ভেসে আসছে তায়।
 এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময় এমন ঠাঁয়ে,
 আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ ধোরে কি
 থাকে যায় ॥
 অহল্যা। অত্যাশ্রম! অত্যাশ্রম! আহা মরি মরি!
 প্রাণেশ্বর! কোথা প্রাণেশ্বর! এনে দাও
 বল্লভে মদন; বন্ধে জাগিয়ে লালসা।
 যাও ডেকে আনো তাঁরে, যাও রত্নপতি—

ইন্দ্রের প্রবেশ

অহল্যা। [সাগ্রহে] কোথা ছিলে এতক্ষণ
 ছাড়ি অহল্যারে
 নিষ্ঠুর প্রণয়ী; এস পার্শ্ব প্রিয়বর!
 কেন এত চিন্তাকুল আজি?

ইন্দ্র। নাহি জানি।

অহল্যা। চিন্তা কর দূর! আমি নিকটে তোমার,
 তথাপি মলিন মুখ? দেখ, কি সুন্দর
 হাসিছে পূর্ণিমা জ্যোৎস্না! মনে পড়ে প্রিয়
 সেই দিন?

ইন্দ্র। কোন দিন?

অহল্যা। যে দিন প্রথমে

তুমি আসি' দাঁড়াইলে, হে সুন্দর পাপ!
 নেত্রপথে অহল্যার। ঠিক ওই খানে;
 ওই শান্ত শূদ্র চন্দ্র স্বচ্ছ নীলাম্বরে:
 একটি ভাস্বর তারা চন্দ্রমার পাশে;
 এইরূপ শ্যামলা ধরণী; এইরূপ
 বহিতেছিল সুমন্দ মধুর উচ্ছ্বাসে
 স্নিগ্ধ বসন্তের বায়ু; এইরূপ দূরে—

ইন্দ্র। থাক্ সে দিনের কথা। বলিতে এসেছি
নিদারুণ বাস্তবী এক।

অহল্যা। কি? কি সমাচার?

ইন্দ্র। অহল্যা যাইতে হবে আমারে এক্ষণি।

অহল্যা। কোথা যাবে?

ইন্দ্র। যাব স্বর্গে ফিরি'।

অহল্যা। স্বর্গে? কেন?

এই নহে আমাদের স্বর্গ?—করে কর,

বক্ষে বক্ষ, অধরে অধর। শিরোপরি

প্রসারিত অনন্ত নিখিল, পদতলে

উচ্ছ্বাসিত শ্যামবিশ্ব—এই স্বর্গ নহে?

না না নাথ, স্বর্গরাজ্য লুপ্ত হয়ে যাক

সৃষ্টি হতে। স্বর্গে আমি চাহি না যাইতে।

ইন্দ্র। তুমি যাইবে না। আমি যাইব একাকী।

অহল্যা। একাকী? একাকী? আর—আমি?

ইন্দ্র। আর তুমি

ফিরে যাও মিথিলায় আপন আশ্রমে।

অহল্যা। এ অপদর্শ পরিহাস!

ইন্দ্র। পরিহাস নহে,

সত্য বাণী। অহল্যা কি বলিতে হইবে?

বুঝ নাই?

অহল্যা। কি বুঝিব? কিছ্ বুঝি নাই—

ইন্দ্র।—তবে শোন। এতদিন ভুঞ্জিছ তোমারে,

মিটেছে লালসা মম! আর নাহি চাহি।

বুঝ নাই নিম্নগামী প্রেমের প্রবাহ,

উদাস সম্ভাগ, শ্লথ আগ্রহ সম্প্রতি?

নিভেছে লালসাবাহি, মিটেছে পিপাসা।

অহল্যা। শুনিতোছি ঠিক! শুনিতেছ হে
পর্ষত?

শুনিতেছ বৃক্ষ গুল্ম লতা? শুনিতেছ

সমীর, নিব্বর, নীল অসীম আকাশ?

“নিভেছে লালসাবাহি, মিটেছে পিপাসা?”

জানি না জাগ্রত আমি অথবা নিদ্রিত।

স্বপ্ন দেখিতোছি নাকি? “মিটেছে
পিপাসা”

মিটে কি জগতে প্রভু প্রেমের পিপাসা?

আমার ত মিটে নাই। সত্য, দেবরাজ

মিটেছে তোমার আজি প্রেমের পিপাসা?

ইন্দ্র। অহল্যা বালিকা নহ তুমি। বুঝ না কি

যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এতদিন,

তাহা প্রেম নহে, তাহা লিপ্সা?

অহল্যা। সত্য? সত্য?

প্রেম নহে?—তাহা লিপ্সা?

শুনিতোছি ঠিক?

দেখি, দেখি,—কিছ্ই যে বুঝিতে

পারি না—

তুমি ইন্দ্র? আর আমি অহল্যা?

—এ কথা,—

এতদূর ঠিক? কিম্বা স্ব স্বপ্ন? কিছ্

বুঝিতে পারি না!—অহো!—ঘুরিছে

মস্তক।

একটি বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান

ইন্দ্র। অহল্যা ফিরিয়া যাও!

অহল্যা। কোথায়?

ইন্দ্র। স্বদেশে।

অহল্যা। স্বদেশে? কাহার কাছে?

ইন্দ্র। ভদ্রে, এত দিনে

ফিরিয়াছে আশ্রমে গোতম!

অহল্যা। কি বলিছ?

করিছ কাহার নাম? সেই পুণ্য নাম

আমাদের মধ্যে করিও না উচ্চারণ;

সে পবিত্র নাম ওই পঙ্কলনিঃস্বাসে

করিও না কলদ্রবিত। সংজ্ঞা হারাইব।

ক্ষিপ্ত হয়ে যাব।—ধরি' চরণে তোমার,—

ভিক্ষা মাগি'—শুধু করিও না উচ্চারণ

সেই নাম।—“ফিরে যাব তাঁর আলিঙ্গনে?”

সত্য?—ধন্য দেবরাজ!—ধন্য বিবেচনা!

কিরূপে কহিলে এই হাস্যকর বাণী?

লম্পটের পাপস্পর্শ হতে নিঃসঙ্কেচে

ফিরে যাব মহর্ষির পুণ্য আলিঙ্গনে?

ধরিব সে মহর্ষির পবিত্র জিহ্বায়

তোমার উচ্ছ্বস্ত বারি?—জানো না?

—ষে দিন

ছাড়িয়াছি পুণ্যাশ্রম ঘৃণ্য অভিপ্রায়ে,

সেই দিন ছাড়িয়াছি সে আশ্রম পুণ্য

স্পর্শ করিবার স্বভূ? যেই দিন পাপ

লম্পটের সনে নামিয়াছি সুগভীর

নরকগহবরে, সেই দিন পরিত্যাগ

করিয়াছি, স্বর্গে প্রবেশের অধিকার!

ইন্দ্র। অহল্যা, অহল্যা, শুন,

অহল্যা। —সেই দিন হতে,

সে নরকে, আমরণ তুমিই আমার

সর্বস্ব, হৃদয়েশ্বর, জীবনবল্লভ।

আপনাকে ঘৃণা করি, তব সহবাসে—
সহস্র ধিক্কার দিই,—তথাপি, তথাপি,
তোমাতেই বাসিয়াছি ভালো; ভালবাসি:
জীবনে মরণে তুমি মোর প্রাণেশ্বর।
ইন্দ্র। অহল্যা এ বৃথা যুক্তি! আমি স্বর্গপতি
দেবেন্দ্র; মানবী তুমি। প্রেম কি সম্ভবে
তোমার আমার মধ্যে?

অহল্যা। যদি না সম্ভবে,
কেন ভুলাইলে কুলবধু? কেন তবে
শান্ত পুণ্যাশ্রম হ'তে টানিয়া আনিলে?
ছিলাম আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ল'য়ে।
কেন দেখা দিলে তুমি পূর্ণিমাকরণে,
কোকিল ঝংকারে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে
কেন ভুলাইলে মোরে ষড়যন্ত্র করি?
ফাঁদ পাতিলে ধরিলে এ বন্য হরিণীরে?
আদর করিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইয়া
দুর্দিন, তাহার পরে তার গলদেশে
বসাইতে ছুরি?

ইন্দ্র। অতি নিষ্ফল প্রলাপ!—
অহল্যা ফিরিয়া যাও।

অহল্যা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া।] শোন
প্রিয়তম!

কিছু বলিবার আছে | হস্তধারণ।

ইন্দ্র। ছাড়ো,—হস্ত ছাড়ো!

অহল্যা। এতদূর? যাও তবে নিশ্চয় নিশ্চয়!
যাও স্বর্গে ফিরি'।—ভুলে যাও অহল্যারে।
না দেবেন্দ্র! পারিবে না ভুলিতে তাহারে।
যাও স্বর্গে ফিরি। কিন্তু জানিও সুরেশ
রহিবে আমার স্মৃতি মিশিয়া তোমার
হৃদয়শোণিতে চিরদিন। যাও, যাও,—
আহারে নিদ্রায় যেন শিহরিয়া উঠ
দেখিয়া ভৈরবী ছায়া আমার প্রত্যহ;
যাও স্বর্গে ফিরি'। আমি রহিব তোমার
অনন্ত দুঃস্বপ্ন সম অনন্ত জীবনে।

ইন্দ্র। উত্তম অহল্যা! তবে যাই [প্রস্থানোদ্যত।]
অহল্যা। [সংসা ধরিয়া পদতলে পড়িয়া।]
কোথা যাও?

যাইও না প্রিয়! এখনো যুবতী আমি;
দশ বর্ষ ধরি' পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্রসুখা; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে। আরো দিতে পারি। দেখ চেয়ে
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ: এই শূদ্র

কুন্দ দন্তপাতি; এই সুগোল সুঠাম
তল্বী দেহলতা; এই লালসা বিহ্বল
আকর্ষণ বিশ্রান্ত চক্ষু; রক্ত বিম্বাধর;
পান বক্ষ,—যত চাহো দিব, যত চাহ
পান কর।—যাইও না।

ইন্দ্র। নিষ্ফল কাকুতি—
চলিলাম!

অহল্যা। —সত্য? যাবে? কোথা যাবে শঠ?
ভুলাইতে অন্য কুলবধু? সুখী হবে
লেপিয়া ললাটে মোর কলঙ্ককালিমা?
ভাসাইয়া দিয়া মূর্খ আমারে অকূলে?
নিশ্চয় লম্পট! যাবে? যাবে? এই যাও,
স্বর্গপতি—যাও, কিন্তু নহে স্বর্গে ফিরি'।

কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের ক্ষম্ধে
আমূল আরোপণ

ইন্দ্র। ওঃ [পতন] কি করিলি রাক্ষসী
পিশাচী নারকী!

মদন। শাস্ত্রই আছে—“যঃ পলায়তি স
জীবতি।”

[মদন ও রতির পলায়ন।]

অহল্যা। —এই হস্তে বধিয়াছি আপন সন্তানে,
রুদ্ধ করিয়াছি তার তপ্ত ধমনীর
দ্রুত রক্তস্রোত; আজি,—লইয়াছি আজি
এই হস্তে, এই রক্তে তার প্রতিশোধ।
—দেখিয়াছ এতদিন রমণী প্রেমিকা
দেবরাজ? দেখ আজি রমণী ভৈরবী!
হাঃ হাঃ! এইখানে মরো, এইখানে পচো।
করুক ভক্ষণ বন্য শৃগাল শকুনি।

[উন্মাদবৎ অটহাস্য কবিয়া, নিষ্ক্রান্ত।]

ইন্দ্র। পিশাচী—ঘাতকী—অহো—

গৌতম ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এই যে এখানে।
অসাড়—সর্বাঙ্গে রক্ত—হাঁ এই ত চাই—
ঘাতকটা গেল কোথা?

গৌতম। দেখি নাড়ী দেখি—
এখনো জীবিত। চল আশ্রমে লইয়া
চিরঞ্জীব। দেখি যদি বাঁচাইতে পারি।

[উভয়ে ইন্দ্রকে বহন করিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শচীর কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

দেবীগণসহ শচী আসীনা

শচী। তা আমি কি কর্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই ত তুমি কি কর্ব্ব?

কালিন্দী। কিন্তু কথাটা ত ভালো নয়।

পাঁচটি বছর স্বামী নিরুদ্দেশ।

অঞ্জনা। পাঁচ পাঁচটি বছর। সোজা কথা কি দিদি!

শচী। তা আমি কি কর্ব্ব?

অঞ্জনা। তা সত্যিই, ত—তুমি কি কর্ব্ব?

স্বাহা। লোকে কিন্তু ভাই কাণাকাণি কচ্ছে।

অঞ্জনা। কচ্ছে বৈ কি। লোক কি আর রেয়াৎ কোরে চলবে দিদি?

শচী। করুক কাণাকাণি।

অঞ্জনা। হাঁ—কাণাকাণি কল্পে ত বয়ে' গেল।

বারুণী। কিন্তু স্বামীর একটা খোঁজ খবর কর্তে হয় ত বাছা?

অঞ্জনা। তা আর হয় না? খোঁজ খবর একটা কর্তে হয় বৈ কি।

শচী। তা এ ত তাঁর এমন কিছ, নতুন নয়।

অঞ্জনা। তা আর এমন নতুন কি?

কালিন্দী। তবু ত বাছা, স্বামী।

অঞ্জনা। স্বামী বোলে স্বামী! দস্তুর মত বাদ্য বাজিয়ে ধান দর্শ্বা দিয়ে বিয়ে করা স্বামী।

স্বাহা। হাঁ একটা খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

অঞ্জনা। তা হয় না? খোঁজ নিতে হয় বৈ কি।

শচী। তা খোঁজ আবার নেবো কি?

অঞ্জনা। হুঃ—কিসের খোঁজ?

বারুণী। কোথায় যে ডুব মাঞ্জে।

অঞ্জনা তাহাতে এক নিরাশবাজক অংগভঙ্গী করিল

কালিন্দী। মদন আর রতি তার সঙ্গে যখন ঘূর্ছে তখন এ একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে যায় না।

অঞ্জনা। কেলেঙ্কারি বোলে কেলেঙ্কারি! একেবারে টি টি!

স্বাহা। এই যে বলতে বলতে!—

শচী। কে?

স্বাহা। রতি।

অঞ্জনা। হাঁ রতিই ত বটে।

কালিন্দী। নাঃ—রতি না!

অঞ্জনা। কোথায় রতি!

বারুণী। হুঃ রতিই বটে।

অঞ্জনা। রতি না হয়ে যায় না।

কালিন্দী। উঃ হুঃ রতি না।

অঞ্জনা। সেই খবরটা আগে—

রতির প্রবেশ

শচী। কি লো রতি!

অঞ্জনা। কি লো! এত দিন পরে যে!

কালিন্দী। একলা না কি?

স্বাহা। তীর্থযাত্রায় যাওয়া হয়েছিল না কি লো?

বারুণী। বলি—দেবরাজের খবর কি?

অঞ্জনা। সেই খবরটা আগে—

রতির গান

আমি শূন্য প্রেমের ব্যাপারী।

আর কিছুর কি তজ্জা রাখি, আর কিছুর

কি ধার ধারি।

বিস্বাধরে সুধারাশি, কুন্দ দাঁতে মূর্চ্ছিক হাসি,

কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইঁরি

দোকানদারি;

তার বিষয়ে দুটো কথা শুনতে চাও ত

বলতে পারি।

বেণী বাঁধা কৃষ্ণ কেশে, লম্বা কোরে পৃষ্ঠদেশে,

যদিও সে অনেক সময়ই পরের ধনে পোন্দারি;

কালো রঙে ফর্সা সেজে, ষতদূর হয় ঘোষে মেজে,

পোরে রঙিন শাড়ী সঁঙিন, পদ্রুষ কেমন

ভোলায় নারী;

তারির বিষয় শুনতে চাও ত দুটো কথা

বলতে পারি।

চোখে কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে

কেমন দেখায়,

কালো ঠোঁটে আলতা দেওয়া, আমার কর্ম

সর্কারি;

নরন নীচু কর্তে জানা, আঁচল খানি বৃকে টানা,

সময়মায়িক বাহির করা ছটাক খানিক অশ্রু-বারি;

এ সব বটে কতক জানি, এ সব কতক কৈতে পারি।

শচী। এখন রংগ রাখ্ দেখি!

অঞ্জনা। হ্যাঁ—এখন কি ভাই রংগ কৰ্ণার সময়?

রতি। নয় ত কখন সময়?

অঞ্জনা। তাও রটে। এখন কৰ্ণে না ত আর কখন কৰ্ণে?

কালিন্দী। সে স্ত্রীলোকটার নাম কি?

রতি। অহল্যা। অহল্যা।

বারুণী। দেবরাজ কোথায়?

রতি। তাঁর ফিরে আসবার অবস্থা ঠিক নয়।

স্বাহা। কি রকম?

শচী। হে'য়ালী রাখ্। খবর শুন।

রতি। সে অনেক কথা। বলছি, অগ্রে ভেতরে চলতে আঞ্জা হয়।

[সকলে নিষ্কান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শতানন্দের গৃহের সম্মুখস্থ মিথিলাব রাজপথ। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।
অহল্যা দণ্ডায়মানা

অহল্যা। এই সে মিথিলা। সেই উচ্চ সৌধচূড়া,

সেই রাজপথ, সেই জনস্রোত বহে
পিপীলিকা-শ্রেণী-সম অশ্রান্ত উদ্যমে।
যাই গিয়া বসি ওই দারু বৃক্ষতলে।
বিক্ষত চরণে রক্ত পড়ে। চক্ষে ছুটে
ক্ষুণ্ণবর্ণ বহির। অহো বিধাতা!

[উপবেশন। কে ওই
আসিছে সমুচ্চ কোলাহলে?—পদ্রবাসী।

কতিপয় পদ্রবাসীর প্রবেশ

১ম পদ্রবাসী। না সর্ষেব মিথ্যাকথা!
২য় পদ্রবাসী। শতানন্দ ঋষি
স্বয়ং এ শ্ৰুভ বার্তা দিলেন আমারে।
৩য় পদ্রবাসী। কোন্ শতানন্দ?
২য় পদ্রবাসী। গোতম মহর্ষি-পুত্র।
১ম পদ্রবাসী। কবে?
২য় পদ্রবাসী। কল্য প্রভাতে।
৩য় পদ্রবাসী। মহর্ষি বিশ্বামিত্র?
২য় পদ্রবাসী। বিশ্বামিত্র।
৩য় পদ্রবাসী। সগে দশরথ-পুত্রস্বয়?
১ম পদ্রবাসী। আসিছেন সত্য?

২য় পদ্রবাসী। সত্য!

৩য় পদ্রবাসী। শ্ৰুভ!!

১ম পদ্রবাসী। অতি শ্ৰুভ!!!

চল যাই প্রচারি এ বার্তা রাজপদ্রে।

[পদ্রবাসীগণের প্রস্থান।

অহল্যা। [উঠিয়া] একি সত্য আমি স্বপ্ন
দেখিতেছি নাকি!

শতানন্দ জীবিত!—জীবিত! পরমেশ!

ভিক্ষা দাও যেন এই বার্তা সত্য হয়।

আর একদল পদ্রবাসীর প্রবেশ

১ম পদ্রবাসী। পদ্রবাসীর ধর্ম? ইন্দ্র প্রমাণ
তাহার!

২য় পদ্রবাসী। নারীর সতীত্ব? তার অহল্যা
প্রমাণ।

৩য় পদ্রবাসী। দুর্ভাগ্য গোতম!

৪র্থ পদ্রবাসী। ধিক্ অহল্যা দুর্মতি!

৩য় পদ্রবাসী। করিও না অহল্যার নাম
উচ্চারণ প্রতিবেশী।

২য় পদ্রবাসী। নারকী—

৪র্থ পদ্রবাসী। পিশাচী।

৩য় পদ্রবাসী। দ্বিচারিণী।

অহল্যা। [অগ্রসর হইয়া] কে তোমরা পদ্র-
বাসী দ্রুত রসনায় কর অহল্যার কুৎসা?

৩য় পদ্রবাসী। এ আবার কে রে?

২য় পদ্রবাসী। তাই ত রে—পেত্নী না কি?

১ম পদ্রবাসী। না, ছিন্নবসনা

পান্ডুরা পলিতকেশী বল মা, কে তুমি?

৩য় পদ্রবাসী। কে তুই?

অহল্যা। যাহার নাম মনুস্ত অশ্রম্ভায়
করিতেছ ব্যক্ত রাজপথে। পদ্রবাসী—
আমিই অহল্যা।

২য় পদ্রবাসী। এ কি বলে?

৩য় পদ্রবাসী। সত্য নাকি?

৪র্থ পদ্রবাসী। এ অহল্যা বটে।—মার্ মার্—

২য় পদ্রবাসী। মার্ মার্।

১ম পদ্রবাসী। ছেড়ে দাও অসহায়া
স্ত্রীলোকে।

৩য় পদ্রবাসী। অসতী

২য় পদ্রবাসী। দুর্ভাগ্য অহল্যা এই—

৪র্থ পদ্রবাসী। মার্
পাপীয়সী—

অহল্যা। নহি পাপীয়সী, নহি দূর্ষ্বত্তা
অসতী।

আগে শোন ইতিবৃত্ত।
২য় পদ্রবাসী। মার্,
৩য় পদ্রবাসী। মার্ মার্। [প্রহার]।

শতানন্দের প্রবেশ

শতানন্দ। কি করিছ পদ্রবাসী! একি
অত্যাচার

দূর্ষ্বলা নারীর প্রতি।
২য় পদ্রনারী। দূর্ষ্বত্তা অসতী—
শতানন্দ। কেন?—কি করেছে নারী—
[অহল্যাকে]
মা তোমার নাম?

অহল্যা। অহল্যা আমার নাম।
শতানন্দ। অহল্যা!—তাপসী?—
গৌতম-রমণী?—

অহল্যা। সত্য। গৌতম-রমণী।
শতানন্দ। পদ্রবাসী ঘরে যাও; শাস্ত্রীয় বিধান
করিব এ তাপসীর।

৩য় পদ্রবাসী। শূলে দিতে হবে—
৪র্থ পদ্রবাসী। না না মহাশয়! বহিষ্কৃত
কোরে দাও

মস্তক মন্ডন করি নগর বাহিরে।
শতানন্দ। করিব কর্তব্য যাহা। ব্রাহ্মণীর প্রতি
দণ্ডদান ব্রাহ্মণের অধিকার!—যাও।

[পদ্রবাসীগণের প্রস্থান।

শতানন্দ। অহল্যা তোমার নাম? কি চাহো
তাপসী

মিথিলা নগরে?

অহল্যা। পদ্র শতানন্দে!
শতানন্দ। পদ্র

শতানন্দে? প্রয়োজন?
অহল্যা। কে তুমি যুবক?

পরিচিতসম মদুমন্ডল,—সুন্দর
সুগৌর, সুভঙ্গ, দীর্ঘদেহ?—কণ্ঠস্বর
যদ্যপি বিশুদ্ধ, রুদ্ধ, গঙ্গাদ,—তথাপি
যেন পরিচিত। মনে হয়—মনে হয়—

কে তুমি যুবক? তুমি—তুমি কি—
হাঁ আমি

শতানন্দ।
শতানন্দ।
অহল্যা। তুমি? তুমি? [অগ্রসর হইলেন]

শতানন্দ। [পশ্চাৎপদ হইয়া] কি বলিতে
চাহো?

অহল্যা। কি বলিতে চাহি?—বৎস—
আলিঙ্গন করিতে উদ্যত
শতানন্দ। ক্লান্ত হও নারী!

উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নাই। পরিত্যাগ
করিয়াছ বহুদিন পদ্রে বৎস বলি'
সম্বোধন করিবার অধিকার।—যাও—
পাইবে না শতানন্দে—যাও ফিরে যাও—
যাও স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে—
মন্তে' কি নরকে—শতানন্দে পাইবে না।
—অভুক্তা কি তুমি নারী? এই পথ দিয়া
যাও ওই দেবালয়ে; পাইবে আশ্রয়,
ভক্ষ্য ও পানীয়।—ওই উঠেছে ঝটিকা
ঘনাইয়া আসে অন্ধকার।—চলে' যাও।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও স্বারোধ

অহল্যা। অসীম করুণাময় তুমি পদ্র?—অহো
কেন দীর্ণ হইলে না ধরিণী শতধা?
—এ কি বক্র নিয়ম তোমার মহেশ্বর?
আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ-লতিকারে
নারীস পাষণস্তূপে? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইয়া অসহায়্য দূর্ষ্বলা রমণী?
কে তাহারে নিষ্কপিলা করিয়া সম্ভোগ
শূন্য পাত্র সম, পান করি' তীর সুরা?
নহে সে নিষ্মম কুর পদ্রুষ? তথাপি
শুদ্ধ আমি দোষী একা সমাজ বিচারে?
—বহ প্রভঞ্জন। নেমে এস জলধারা
গজ্জ মন্ত হৃৎকার অশনি! ঢেকে এস
দশ দিক কাল নিশিথিনী। কেহ নহ
নিষ্মম, যেমতি কুর পদ্রুষ নিষ্মম।
—বহ বহ ঝঞ্জা কর চূর্ণ ধূলিসাৎ
এই অরাজক রাজ্য।—ভৈরব-উল্লাসে
দাঁড়িয়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষণী।

[উন্মাদিনী অবস্থায় নিষ্কান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কৈলাস পর্বত। কাল—প্রভাত।

গৌতম ও চিরঞ্জীব

দূরে যোগীদিগের গান

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ কির্বাণিখিল তোমারি প্রতিমা;

মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো!
 মন্দির যাঁহাব দিগন্ত নীলিমা।
 তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
 সাগর, নিঝর, ভূধর, অটবী,
 নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন
 তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
 গৌতম। কি মহান্ দৃশ্য!—দূরে নিশ্চল নীরব
 শূন্য তুষারের স্তূপ; উপরে অসীম
 নীলিমা-প্রসার; নিম্নে নিশ্চল কঠিন
 ধূম্র পর্ষ্যতের স্তর—দিগন্ত বিস্তৃত
 দৃঢ় প্রস্তরের ঢেউ। দৃশ্য,—কি মহান্
 কি নিস্তম্ব, কি উদার, সুন্দর, গম্ভীর।

পুনরায় গীত

সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা!
 শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
 সাধুর ভক্তি, প্রতিভা, শক্তি,
 —তোমার মাধুরী তোমার মহিমা,
 যেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—
 শতরূপে মা গো বিবাজিত তুমি,
 বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
 বিকশিত তব বিভবগরিমা।

গৌতম। হেন স্তম্ভ রম্যতম গভীর নিজ্জনে—
 মনুষ্যের সন্ধি হয় প্রকৃতির সনে;
 লঘু হয় চিত্ত; সর্ব বিবাদ ভঞ্জন
 হয়। জীবন সার্থক হয়; দূরে যায়
 ক্ষোভ, পরিতাপ; ঘৃণা যায় মৃত্যু ভয়।

পুনরায় গীত

তথ্যাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,
 তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী!
 অমর কবির হৃদয় গভীর
 ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা।
 খুঁজিয়ে বেড়াই অবাধ আমবা,
 দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
 দুয়ারে দাঁড়ায়ে, হাতটি বাড়ায়ে,
 ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।

গৌতম। আর দুঃখ নাই; আর চিন্তা নাই;
 আর
 লিপ্সা নাই—ঈর্ষা নাই; দ্বেষ নাই; আমি
 পিতার নয়নতলে, জননীর ক্রোড়ে
 লভিয়াছি অনন্ত বিরাম। বসি' আজ
 এ সমুচ্চ শৃংগোপরি, দেখিতেছি চাহি'
 পদতলে, পৃথিবীর স্বন্দর, কোলাহল,
 ক্ষুদ্র লোভ, ঘণ্য হিংসা,—অনন্ত বিস্ময়ে।
 —কি ভাবিছ চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব।

দূরহ সংস্কৃতভাষাবিজ্ঞানে প্রভুর
 প্রভূত ব্যুৎপত্তি। যাহা সরল সহজ,
 জটিল করিতে তাহে প্রভুর এরূপ
 আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে সে অত্যন্ত অদ্ভুত।

ইন্দ্রের প্রবেশ

গৌতম। একি তুমি এখানে? আশ্রম হতে
 এতদূর এসেছ?

ইন্দ্র। পরীক্ষা কোরে দেখলাম, শক্তি
 পেয়েছি। যোগবর—আজ আমি গৃহে ফিরে
 যাচ্ছি।

গৌতম। আরো দুদিন অপেক্ষা কর।
 আরও একটু বল পাও।

ইন্দ্র। যথেষ্ট বল পেইছি। তোমার আগ্রহে
 তোমার জাগ্রত শূন্যায় আমি এখন সম্পূর্ণ
 আরোগ্যলাভ করেছি। এখন জিজ্ঞাসা করিতে
 পারি কি যে তুমি কে?

চিরঞ্জীব। কেন সে খোঁজে তোমার দরকার
 কি?

ইন্দ্র। আমার তুমি অনেক শূন্যসা করেছে।
 তার যথার্থিহিত পুরস্কার দিতে চাই।

গৌতম। প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী
 মানুষ, আমার কিছুই অভাব নাই।

ইন্দ্র। তুমি চাহিতে কুণ্ঠিত হচ্ছ? জেনো
 মনুষ্য, যে আমি ধনী ব্যক্তি। তুমি যা চাহো
 তা দিতে পারি।

গৌতম। কিছুই চাহি না।

ইন্দ্র। কিছুই চাহো না? সত্য?—তোমার
 নাম?

গৌতম। আমার নাম গৌতম?

ইন্দ্র। কি নাম?

গৌতম। গৌতম।

ইন্দ্র। “গৌতম”? তোমার আবাস?

গৌতম। মিথলায়।

ইন্দ্র। যে গৌতমের স্ত্রী অহল্যা আপনি
 কি সেই গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি সেই গৌতমই বটে;—
 সে বিষয়ে কি মহাশয়ের কিছু বক্তব্য আছে?

ইন্দ্র। আপনি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁগো হাঁ—তুমি যে বৃক্কেও
 বৃক্কেতে চাও না হে।

ইন্দ্র। জানো মহর্ষি আমি কে?

গৌতম। জানি, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র।

চিরঞ্জীব। এবং অহল্যা দেবীর উপপতি।

ইন্দ্র। এ্যাঁ—এ্যাঁ—অসম্ভব। কার কাছে শনুনেছেন?

গৌতম। তোমার কাছে।

ইন্দ্র। কখন?

গৌতম। জ্বরের প্রলাপে।

চিরঞ্জীব। আর আমি যে এত দিন তোমাকে হত্যা করি নি', সে এ মহর্ষির নিষেধে। কিন্তু অনেকবার অনুতাপ করেছি, যে বনের মধ্যে তোমাকে অচেতন দেখে, শত্রুদ্বার জন্য কাঁধে কোরে আশ্রমে নিয়ে এইছিলাম।

ইন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তার পর জানু পাতিয়া। মহর্ষি! আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিছি তা', যদিও ক্ষমার অতীত, তথাপি আপনার মার্জনা-ভিক্ষা কর্তে পারি কি?

চিরঞ্জীব। তা আর খায় না। ঐ যে প্রাণটা পেয়েছ তাই বাপের ভাগ্য বোলে জেনো।

গৌতম। চিরঞ্জীব ক্ষান্ত হও।—ইন্দ্র তোমার প্রতি আমার বিম্বেষ নাই।

চিরঞ্জীব। যাও অনেক পেয়েছো। এখন পালাও।

গৌতম। যাও দেবরাজ, বিশ্বপতির ক্ষমা ভিক্ষা কর। যিনি তোমার আমার উভয়ের কর্তা, যার কাছে ছোট বড় সব সমান। ক্ষমা? আমি তোমাকে পূর্ণ অন্তঃকরণে মার্জনা করেছি। দেবরাজ! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে আর কি দিব? আশীর্বাদ করি—সুস্থ হও, সুখী হও।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।]

চিরঞ্জীব। প্রভু! আপনি একেবারে অবাক কোরেছেন।

গৌতম। কেন চিরঞ্জীব?

চিরঞ্জীব। এ রকম পাষণ্ড শত্রুকে আশীর্বাদ? আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কলে, আমি ওর টুটি টিপে ধরে, ওরে সাত ঘাটের জল খাইয়ে এনে, জুতো মেরে, বিদায় কোরে দিতাম।

গৌতম। শিষ্য শত্রুকে নির্যাতন করা ধর্ম নয়।

চিরঞ্জীব। না,—ধর্ম হচ্ছে শত্রুকে সন্দেহ খেতে দেওয়া।

গৌতম। প্রতিহিংসা পিশাচ শত্রুকে দমন কর্তে পারে, বিনাশ কর্তে পারে, ভস্ম কর্তে পারে। কিন্তু একমাত্র ক্ষমাই শত্রুরে মিত্র করে, নিরীহ করে, দেবতা করে। নির্যাতন নরকের ধর্ম, প্রতিহিংসা পৃথিবীর ধর্ম, ক্ষমা স্বর্গের ধর্ম।

জনৈক রাজদূতের প্রবেশ

দূত। [গৌতমকে। আপনি কি মহর্ষি গৌতম?

চিরঞ্জীব। হাঁ ইনি গৌতম বটে। তুমি কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?

দূত। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইয়া। রাজর্ষি জনক আপনাকে এই পত্র পাঠাইয়াছেন।

পত্র প্রদান

গৌতম। রাজর্ষি জনক? দেখি? [পত্র পাঠান্তর। চিরঞ্জীব, বড় শত্রুবাস্তী বড় শত্রু বাস্তী।

চিরঞ্জীব। কি রকম?

গৌতম। রাজপুত্রী সীতার বিবাহ। রাজর্ষি নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছেন। তোমরা কাল প্রত্যুষে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। দূত! তুমি পরিশ্রান্ত। আশ্রমে চল, সেবা করে ধন্য হই।

[নিষ্ক্রান্ত।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গৌতমের তপোবন। কাল—সায়াহ্ন।

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। এই কি সে পূণ্যাশ্রম?

বিশ্বামিত্র। এই পূণ্যাশ্রম

গৌতমের। পরিত্যক্ত, ভগ্নচূড় আজি, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে। ঋষি গিয়াছেন চাঁল' সুদূর কৈলাসে—ছাড়ি' সংসার আশ্রম, অসীম বৈরাগ্যে। তাঁর প্রলুপ্তা পতিতা প্রেয়সী অহল্যা নিরুদ্ভিষ্টা।

লক্ষ্মণ। কি সুন্দর,

কি নিষ্কর্ন, ঘনচ্ছায়, নীরব, গম্ভীর, এই তপোবন প্রভু।

বিশ্বামিত্র। ছিল রম্যতর

সেই দিন তপোবন, যেই দিন

মহর্ষি গৌতম আর অহল্যা তাপসী—

ছিল অবিচ্ছিন্ন সূত্রে মগ্ন তপস্যায়
এই বনগ্রামে।

লক্ষ্মণ। —অতি করুণ কাহিনী
অহল্যার।

বিশ্বামিত্র। আজো মনে পড়ে সে নীরব
সুগভীর শান্তি—স্বচ্ছ সমুদ্রের মত,
মিষ্ট নির্ঝরনের মত। আজো মনে পড়ে
সে পবিত্র যুগ্মমূর্তি—নীলাকাশ বক্ষে
পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার মত। আজো মনে পড়ে
সেই সন্মিলিত কণ্ঠ সমুদ্রিত গীত,—
মৃদুগের সহ বীণাধরনি।

নেপথ্যে যন্ত্রগার শব্দ

রাম ও লক্ষ্মণ। ও কি শব্দ!

বিশ্বামিত্র। সত্যই ত। যেন রমণীর কণ্ঠস্বর;
চল দেখি গিয়া।

লক্ষ্মণ। ও কে বৃক্ষ অন্তরালে
পান্ডুরা রমণী?

বিশ্বামিত্র। কই?

লক্ষ্মণ। ওই সন্মিকটে।

বিশ্বামিত্র। সত্য বটে; ওকে নারী? এ কি!
হরি! হরি!

এ কি অহল্যা!

অহল্যা। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ, আমি অহল্যা।
কে তুমি

পাথক?

বিশ্বামিত্র। অহল্যা! তুমি এখানে?

অহল্যা। হাঁ আমি

এখানে। কে তুমি ডাকো পরিচিতসম
অহল্যার নাম ধরে?

বিশ্বামিত্র। পারো না চিনিতে?

আমি বিশ্বামিত্র।

অহল্যা। তুমি বিশ্বামিত্র?—বটে—

চিনেছি। কি প্রয়োজন?

বিশ্বামিত্র। অতিথি।

অহল্যা। অতিথি?

কাহার? গোতম হেথা নাই; একা আমি,—

ফিরে যাও ফিরে যাও।—সেও এসেছিল

অতিথি বলিয়া। ঋষি! যাও, ফিরে যাও।

বিশ্বামিত্র। এ কি! তোমাকে ত কভু হেন দেখি
নাই,

অহল্যা? কোথা সে সৌম্য বদনমণ্ডল,

রক্তিম লজ্জায়? কোথা সে হাস্য মধুর?

অহল্যা। নাই, নাই;—গেছে সব। গিয়াছে
সে সব

গণ্ডুষে করিয়া পান। যাও, ঋষি! যাও;

কেন এ নিষ্কর্মে, এই দূর বনগ্রামে,

আসিয়াছ হেথা ত্যক্ত করিতে আমারে?

বন্য-পশু সম আমি হেথা বাস করি,

একাকী নিঃসঙ্গী দূরে। রহি না কণ্টক

কাহারো সুখের পথে। এক কপর্দক

কাহারো ধারি না!—যাও।—মহর্ষি তোমায়

একদিন করিতাম ভক্তি শ্রদ্ধা বটে—

কিন্তু আজি শ্রদ্ধা নাই।

বিশ্বামিত্র। কি হেতু তাপসি!—

কি দোষ আমার?

অহল্যা। দোষ?—জানো না কি দোষ?

ঘোরতর দোষ। তুমি কপট পুরুষ!

—এক মহা সত্য বিশ্ব জাণিয়াছি প্রভু!

“লম্পট পুরুষ জাতি।” তুমি ঋষি বটে,

তথাপি বিশ্বাস নাই।—পুরুষ ত তুমি।

আসিয়াছ বৃষ্টি মম রূপ-লালসায়?

আর নাহি ভুলি।—ওই মিথ্যা, প্রতারণা,

এই মৃদু হাসি, ওই একাগ্র চাহনি,

এ বৃষ্টিময় গ্রীবা—সব বৃষ্টি, সব জানি!

বৃথা চেষ্টা মূর্খবর!—গৃহে ফিরে যাও।

বিশ্বামিত্র। অহল্যা! কাহিনী তব জানি:

প্রতারিতা

তুমি দেবি, তাহা জানি। পরিত্যক্তা তুমি,

তাহা নাহি জানিতাম। কিন্তু অভাগিনি!

আমি আসি নাই আজি এ পূণ্য আশ্রমে

প্রতারণা করিতে তোমারে।

অহল্যা। কি বিশ্বাস?

তুমি ত পুরুষ।—সব পারে সে পুরুষ—

ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,

কলঙ্কিতে পাতিত্রতা, পাশব বিক্রমে:

নয় নবোড়ার; ছুড়ে দিতে বালিকার

প্রস্ফুটিত প্রেম-পুষ্প লোকাচার পদে:

বলি দিতে স্নেহভক্তি, ক্ষুধান্তের মুখে

দিতে ভস্ম; তৃষান্তের মুখে বিষ দিতে:

বিনাশিতে অনুকম্পা; বধিতে বিশ্বাস।

—সব পারে—

রাম। মৃগা, হতভাগিনী তাপসী

হারিয়েছ বিশ্বাস মনুষ্যে এতদূর?

এতদূর পতিতা কি? কিম্বা যন্ত্রণায়

হারায়েছ জ্ঞান?—মূর্খ দোষে অন্যজনে,
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্তব্য-স্থলিত
পড়ে গস্তে।—মনুষ্যের জন্ম এ জগতে
নহে ফুল খেলা দেবি!—সতীত্ব, জীবন,
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা।—শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে;
তোমার রাখিতে হবে, আপনারে বাঁধি।
বাধা ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের বর্ষ সदा; তোমায় তাহারে
লঙ্ঘন করিতে হবে, আপনার বলে।
জীবন সংগ্রাম। যদি নিষ্ঠুর জগৎ,
তুমিও কঠিন হও।

অহল্যা। হায়! শক্তি নাই।
রাম। শক্তি নাই? মূঢ়! শক্তি আছে; ইচ্ছা
নাই;

বিবেক, উদ্যম নাই। প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও; পরে রুষ্ঠ হও,
বন্দী হও যবে সে শৃংখলে; সন্ধি কর
পাতকের সনে, পরে দেখ রুদ্ধ যবে
স্বর্গস্বার, ক্রুদ্ধ হও; স্বহস্তে রোপন
কর নিজে বিষবৃক্ষ, পরে শব্দ কর
বিধাতার সঙ্গ, যদি না ফলে অমৃত।

অহল্যা। সব সত্য কথা।—কিন্তু বহে কি
নির্ঝর
শব্দ মরুভূমে? জন্মে প্রস্তুত কুসুম?
পশে কি সূর্য্যের জ্যোতি সাগর কন্দরে?
আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকান্ড প্রমাদে। হায় রাখিল বিধাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্ন গৃহে; পাঁপায়
অধিকারে; ছড়াইল নিষ্কর্ষণ বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধ রাশি?

রাম। হায় মূঢ় নারী!
এত দিন চিনিয়াছ বৃষ্টি প্রেমিকের
ঢল ঢল মূখ খানি, কুণ্ঠিত চিকর,
সরল নাসিকা, দুটি পদ্মবিন্দিত
আরক্তিম গণ্ড, দুটি লালসা-শিথিল
কৃষ্ণচক্ৰ; পূর্ণ পান সরস অধর?
—হা মূঢ়! চিনি তার গভীর হৃদয়,
প্রেমের নিহিত ব্যথা, সংযত আগ্রহ?
—তাহা ছিল গৌতমের! তাহা ঠেলিয়াছ
চরণে; অমূল্য রত্নহার কণ্ঠ হতে,

উন্মোচন করি' ছুঁড়ে দিয়াছ তাপসি!
গভীর সাগর গর্ভে।—

অহল্যা। [ক্ষণেকচিন্তার পর] শিশু
দার্শনিক!—

উন্মোচিত যার সৌম্য পবিত্র আননে
নবীন বসন্ত; চক্ৰ দুটি অবনত
ধরণীর পানে গাঢ়; অনুকম্পাভরে,
বিনিঃসৃত যার কণ্ঠে বীণার ঝংকার—
যেন বর্ষে বরিষার শ্যামল জলদে।
স্নিগ্ধ বারি ধারা—বল, কে তুমি সুন্দর?
রাম। আমি রাম। দশরথ অযোধ্যার পতি,
আমি তাঁর পুত্র।—ইনি কনিষ্ঠ আমার।
অহল্যা। রাজপুত্র তুমি। রত্ন কাণ্ডন তোমার
অক্ষয় ভান্ডারে। কিন্তু হেন রত্ন নাই
সে ভান্ডারে—তব এই উপদেশ-বাণী
মহার্ঘ্য ষেরূপ।—তুমি দেব-নারায়ণ,
দাও শ্রীচরণ-ধূলি।—ক্ষমা কর প্রভু!

চরণধারণ

রাম। আমি কি করিব ক্ষমা?—ক্ষমা চাহো তাঁর,
যাঁহার অনন্ত-প্রেম, অনন্ত নির্ভর,
বিনিময়ে আপনার নীচ হৃদয়ের,
দিয়াছ কাঠিন্য; হানিয়াছ বজ্র-শেল
যাঁহার কোমল-বন্ধে—তব ব্যভিচারে।
যাও মা তাঁহার ক্ষমা চাহো। চাহো পরে,
বিধাতার ক্ষমা—যাঁর মঙ্গল নিয়ম
তাঁছলো, অসীম-গর্বে ঠেলিয়াছ পদে—
নবীন-যৌবন-মদভরে।

অহল্যা। তিনি করিবেন ক্ষমা?

রাম। জানি না তাপসি!
তথাপি চাহিয়া থাকো মৌন প্রার্থনায়।
অহল্যা। তাহাই হইবে।—প্রভু! করিলে উদ্ধার
অহল্যারে আজি। চল, আমার আশ্রমে,
করিব আতিথ্য-পূজা—সানুজে তোমার,
কেশব!—[বিশ্বামিত্রকে] মহর্ষি চল
আমার কুটীরে।
[সকলে নিষ্কান্ত।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গিরিপথ। কাল—মধ্যরাতি।

চিরঞ্জীব। [স্বগতঃ] খুব ফাঁকি দিইছি!
ছুঁড়িটা আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?—চার

দিকে আটঘাট বন্ধ কোরো বৃদ্ধি ভদ্রলোকে
ঘুমোতে পারে! মিথিলায় যেতে যেতে পথে কি
এমনও প্রবল জ্বর এলো। গৌতম আর মাধুরী
শেষে গিয়ে কিনা এক অতিথিশালায় আশ্রয়
নিলে। বেশ জ্বন্দ হ'য়েছে কিন্তু। [হাস্য]
অতিথিশালা! — কোথায় অতিথিশালা? —
শুঁড়ির দোকান! খুব পালিইছি! স্ত্রীটা বলে
—বাইরে যেও না, জ্বর বাড়বে। আঃ—! এমন
ঠান্ডা বাতাস, এতে পোড়ার অসুখ যদি বাড়ে
ত বাড়ুক!—বোধ হচ্ছে যেন আমি একদিন এই
জায়গাটায়ই মাধুরীকে ধাক্কা মেরে পগারে
ফেলে দিয়ে পালিইছিলাম। মাধুরীর তা মনে
নেই। সাধে কি বলি মেয়ে মানুষ বোকার জাত!
আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিরাম নেই, বাক্য
নেই—দিবারান্তির আমার সেবাই হচ্ছে!—ঘুম
থেকে উঠে দেখি, আমার শিওরে হাঁ কোরে
জেগে বোসে আছে! মেয়ে মানুষে এতও পারে
বাবা!—এবার কিন্তু খুব পালিয়ে এইছি। চেয়ে
দেখি কি না মাধুরী ঢুলছে, অর্মান আমি
উঠে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে বাইরে এসে ভৌঁ
দৌড়!—ভারি ঠান্ডা বাতাস—শীত হচ্ছে যেন।
এখানে একটু পেট ভরে' ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।
—ঐ যে আবার আসে কে! মাধুরী দেখছি!
এই মাটি কোরেছে দেখছি।—“যেখান বাঘের
ভয়, সেখানেই সন্ধ্য হয়।”

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। প্রভু! এখানে?

চিরঞ্জীব। [বিরক্তভাবে] এখানে নয় কি
সেখানে!

মাধুরী। চল চল, ঘরে চল।

চিরঞ্জীব। না—যাবো না।

মাধুরী। জ্বর বাড়বে।

চিরঞ্জীব। তোর তাতে কি, আমি এখানে
খাড়া হোয়ে বোসে মর্ষ্ব। তোর তাতে কি?

মাধুরী। ছিঃ প্রভু! চল।

চিরঞ্জীব। দেখ্ বিরক্ত করিস্ নে
বল্ছি।

মাধুরী। তুমি ঘরে চল—

চিরঞ্জীব। আবার ফ্যাছ্ ফ্যাছ্ আরম্ভ
কল্পি? ফের যদি বিরক্ত কর্ব্ব—! আঃ!—
[শয়ন]

মাধুরী। ছিঃ! ওঠ। [ধরিয়া উঠাইবার
চেষ্টা]

চিরঞ্জীব। উঃ! শীত হচ্ছে যেন—
[কম্পন] ওরে এ কি হোলো?—

মাধুরী। কি হোলো?

চিরঞ্জীব। আমার ভারি হাসি পাচ্ছে
[হাস্য]—না রে না, হাসি ত পাচ্ছে না। তবে
কি পাচ্ছে?

মাধুরী। কি পাচ্ছে?

চিরঞ্জীব। —ঘুম পাচ্ছে। শোন্, বোস্
দেখি, তোর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমুই, আর তুই
মাথার ওপরে কু-হু—কুহু—শব্দ কর্ দেখি।

মাধুরী। তা কর্ব্ব—আগে বাড়ী চল!
ওঠ—

চিরঞ্জীব। দেখ্ মাধুরী আমি একটা
ভারি ধোকাই পড়েছি।

মাধুরী। কি ধোকা?

চিরঞ্জীব। ধোকাটা হচ্ছে এই, যে ঈশ্বর
পুরুষকে পুরুষ আর মেয়েমানুষকে মেয়ে-
মানুষ কোরে সৃষ্টি কল্লেন কেন? যদি
পুরুষকে মেয়েমানুষ কোরে, আর মেয়ে-
মানুষকে পুরুষ কোরে সৃষ্টি কল্লেন তা'লে—
আঃ কি মজাটাই হোত। না?

মাধুরী। হাঁ তা'লে বেশ হোত, এখন ঘরে
চল।

চিরঞ্জীব। নাঃ—তুই ঘুমোতে দিবি নে;
একটু আরাম কর্তে এলেম ত কানের কাছে
এসে ঘ্যানর ঘ্যানর—চল্ বাড়িই চল্। এত
রান্তির পর্যন্ত নিজের চোখেও ঘুম নেই—
আমাকেও কি ঘুমোতে দেবে! [গমনোদ্যত]

মাধুরী। আমার ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে
চল।

চিরঞ্জীব। [যাইতে যাইতে] আচ্ছা
পাহারা সৃষ্টি করেছো দয়াময়! চল্।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দন-কাননে মন্দাকিনী তীর।

কাল—জ্যেষ্ঠনা রাত্রি।

দূরে উচ্চ আলোকিত কঙ্ক। নদীবক্ষে তরণী বাধা।

ইন্দ্র একাকী

ইন্দ্র। গাইছে কিনরী, নাচে অপরূপ নর্তকী,
উঠে অটুহাস্য, বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা;—

অদূর সমুদ্র কক্ষে, দীপ্ত দীপালোকে।
আর আমি আমি শ্লথ চরণ বিক্ষেপে,
কম্পিত-হৃদয়ে, কেন একাকী, নিঃস্বর্জনে,
নন্দন-কাননে, নদী মন্দাকিনী তীরে,
চন্দ্রালোকে? কেন আজ সহিতে না পারি
উৎসব, উল্লাস, দীপ, উচ্চ হর্ষধ্বনি,
সঙ্গীত, রমণীসঙ্গ?—ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোক
তাও ঠেকে তীর, পাণ্ডুর কণ্ঠস্বর
হানে বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল মলয়-সমীর
যেন গাধ দাহ করে।

—অন্তরে অন্তরে,
জ্বলে তুষানল। দূর হৃদয় নিভূতে,
উঠে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।—কি করিব!
কিসে নিভবে এ বহি? কে বলিয়া দিবে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অনন্তকাল
জর্জরিত হইব কি তীর অনুরূপে?

[নিস্তম্ভ]

—অহল্যার পতি হেন মহাত্মা গৌতম?
সে মনুষ্য, আর আমি দেবতা? হা ধিক!
বিধির বিচার এই—[জানু, পাতিয়া]
হে মহাপুরুষ!
প্রকৃত তপস্বী তুমি; বিশুদ্ধ, উদার,
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, চির-স্মরণীয় তুমি।—
এই যে আসিছে শচী। [উত্থান]

শচীর প্রবেশ

শচী। [আলোকিত কক্ষের প্রতি চাহিয়া]
—চলেছে সঙ্গীত,
চলেছে উৎসব, এই মধ্যাহ্ন-নিশীথে,
উজ্জ্বল বিলাস-কক্ষে—ছি ছি, লজ্জা নাই!
—বহিছে শীতল মন্দ সুরভি সমীর।
বসি এই মন্দাকিনী-তটতলে।

ইন্দ্র। [অগ্রসর হইয়া] শচি!
শচী। [চমকিয়া] এ কি তুমি!
ইন্দ্র। আসিয়াছি তব প্রতীক্ষায়।
শচী। এত অনুরূপ? নাথ! কৃতার্থ কিঙ্করী।
ফিরিয়া যাইতে দাও প্রভু, পথ ছাড়।
গমনোদ্যত

ইন্দ্র। শচি!
শচী। লজ্জা নাই? কোন্ স্বপ্নে পুনরায়
নাম ধোরে ডাকো মোর?
ইন্দ্র। শুন সত্য বাণী—

শচী। চাহি না শুনিতে আর।—হায় দেবরাজ!
দেবী ছাড়ি' মানবীতে লোভ? পরিণামে
জানি না আরো কি আছে তোমার নিগ্রহ।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা সঙ্গে নৃত্য কর,
মত্ত সুধাপানে, তাহা সহ্য করিয়াছি—
তাহারা দেবতা। শেষে মানবীর পদে
নমিয়াছ যেই দিন—সেই দিন তব
ঘুচেছে দেবত্ব।

ইন্দ্র। সত্য, অহল্যা মানবী;
তথাপি ইন্দ্রাণী! সত্য, অমরা-সম্ভব
রূপ অহল্যার। মৃগ্য সেই প্রলোভনে,
করিয়াছি পাপ।

শচী। রূপ অমরা-সম্ভব
হোক তার, তথাপি সে মানবী। তাহার
স্পর্শে কলুষিত তুমি—স্পর্শ করিও না
পুলোম-কন্যারে আর।

[রোষভরে প্রস্থান।]

ইন্দ্র। চিরদিন এই পরিণাম
অবৈধ লিপ্সার।—তীর ক্ষণিক সম্ভোগ,
পরিশেষে ঘন দীর্ঘ অবসাদব্যাপি—
.. নিতহীন, সূপ্তহীন! তুচ্ছ প্রলোভনে
পতিত, জড়িত, পত্নী-প্রণয়-বিচ্যুত,
পরিণামে।

মদন ও রত্নির প্রবেশ

ইন্দ্র। হায়! এত বিলম্ব মদন?
চলিয়া গিয়াছে শচী।

মদন। কি করিব প্রভু,
বিলম্ব রত্নির জন্য। প্রহর অতীত
কেশ-বেশ-বিন্যাসে তাহার।

রত্নি। চিরকাল
রমণীর এ অখ্যাতি। এ বেশ-বিন্যাস
কার জন্য প্রাণেশ্বর?

ইন্দ্র। চলিবে রূপসি!
দাম্পত্য-কলহ কতক্ষণ?

রত্নি। যতক্ষণে
ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর ম্বন্দর সমাপ্ত হইল
এ দূর নিঃস্বর্জন বনে।

মদন। কিরূপে ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্র। তন্তলোহবৎ।

মদন। পরিসমাপ্ত নাটিকা
হইবে নিতান্ত দৌধ শয়ন-মন্দিরে।

চল দেবরাজ! শুন, কোন চিন্তা নাই,
রমণীর চিরদিন এৰ্ব্বম্বধ বিধি—
ক্ষণেক গজ্জর্ন, পরে ক্ষণেক বর্ষণ,
পারিশেষে শান্তি.—চল, বিলাস-ভবনে।
ইন্দ্র। ভালো নাহি লাগে আর। শিরায় শিরায়
বহিছে অনলস্রোত। মস্তিস্কে, হৃদয়ে,
পাষাণের ভার।

মদন। প্রভু! চিন্তা কর দূর:
প্রেমের এ পরিণাম চিরদিন তাহা,
পূর্বে বলি নাই? ক্রমে থিতাইবে বারি:
এখন বিলাস গৃহে চল—চিন্তা নাই,
শয়ন-মন্দিরে দিব ইহার ঔষধি।
সকলে গিয়া তরীবক্ষে আবোহণ করিলেন।
তরীবক্ষে মদন ও রতিব গীত

ভাসিয়ে দে রে সাধেব তরি,
পাল তুলে দে ভেসে চল।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস, কচ্ছ নদী টলমল ॥
যদি মিলে, ভাবনা মিলে,
দুঃখ পোড়ে' থাক না পিছে,
ভাসবো শূন্য, হাসবো শূন্য,
কর্ষ শূন্য কোলাহল।
ফির্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্তে সে ত হবেই
বটে!

—ডোবে যদি ডুববে তরি, যদি নেহাইৎ মরি,
মর্ষ না হয় খেয়ে খানিক ঘোলা নদীর ঘোলা জল।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মিথিলার রাজপথ। কাল—প্রভাত।
একাকিনী অহল্যা

অহল্যা। আবার কি তিনি তেমন ভালো-
বাসবেন! আবার সে মধুর গম্ভীর স্বরে আমার
নাম ধরে ডাকবেন? আবার তিনি কাছে এসে
তেমনি কোরে স্নেহনত চক্ষে আমার পানে
চাইবেন?—নাথ! প্রাণেশ্বর! ক্ষমা করো।
তোমার এত প্রেম, এত বেদনা, এত জাগ্রত
শুশ্রূষা, আমি বৃদ্ধি নাই। আমি পাষণী!
আমি পাপীয়সী! আমি হতভাগিনী!—মাথায়
কোরে রাখবার জিনিষ, আমি পায়ে ঠেলেছি।
[জ্ঞান পাতিয়া] ক্ষমা করো। প্রভো, সর্বস্ব
আমার, দেবতা আমার! আজ আমি বৃদ্ধি যে
এ গ্রিভুবনে তুমিই আমার সব। তুমিই আমার
ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল! আমি মূর্খ,

তাই এতদিন বৃদ্ধিতে পারি নি। ক্ষমা করো
ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

১ম পূর্ববাসিনী। [প্রবেশ করিয়া] কে গ
তুমি বাছা পথ ছাড়ো না।

[প্রস্থান।

অহল্যা সরিয়া দাঁড়াইলেন

২য় পূর্ববাসিনী। [প্রবেশ করিয়া]
আক্কেল দেখেছ মাগীর। একেবারে ঠিক রাস্তার
মাঝখানে?—একটু সরো না।

[প্রস্থান।

অহল্যা আবার সরিয়া দাঁড়াইলেন

৩য় পূর্ববাসিনী। [প্রবেশ করিয়া] কে
রে মাগী দাঁড়াবার কি আর জায়গা পেলি'নে।
[প্রস্থান।

অহল্যা আবার সরিয়া দাঁড়াইলেন

৪র্থ পূর্ববাসিনী। [প্রবেশ করিতে
অহল্যার ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া] এঃ যা। ওরে
আমার কপাল রে!—কুলের ঝড়টা পড়ে গিয়ে
কি কাণ্ডটা হোল দেখ না [কুল কুড়াইতে
বাস্ত]

অহল্যা। ক্ষমা কোরো বাছা, আমি কুড়িয়ে
দিচ্ছি [কথামত কার্য]

[৪র্থ পূর্ববাসিনীর ঝড়ি লইয়া প্রস্থান।

অহল্যা। আর কি তাঁকে পাবো? তেমন
কোরে হৃদয়ের ভিতরে তাঁরে পাবো? যারে
জাগ্রৎ দিবসে হারিয়েছি, তাঁরে নিশীথের
আঁধারে খুঁজে পাবো?

একদল সজ্জিত রাজভৃত্যের প্রবেশ

১ম ভৃত্য। গায়ের জোর বটে!

২য় ভৃত্য। হাঁ ধনুক গাছটা একেবারে পট্
করে ভেঙে ফেলে!

৩য় ভৃত্য। ছেলেটাকে দেখে গায়ে খুব
জোর আছে বোলে বোধ হয় না।

২য় ভৃত্য। রাজার মেয়ের শেষে কিনা এই
নেড়ে পুতুরের সঙ্গে বিয়ে!

১ম ভৃত্য। চল্ চল্—মুখ সামলে কথা
কোস্।

[ভৃত্যদিগের প্রস্থান।

অহল্যা। তিনি কি আর আমাকে তেমন
ভালবাসবেন? আমি ব্যাভিচারিণী, আমি হত-
ভাগিনী, আমি বিশ্বাসহন্ত্রী, আমি কি সাহসে

তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো? কি সাহসে তাঁর ক্রমা
চাইব?

একদল পুরোহিতের প্রবেশ

১ম পুরোহিত। তা ত হবেই। মণিকাণ্ডন
যোগের কথা শাস্ত্রই আছে।

২য় পুরোহিত। রেখে দাও শাস্ত্র! শাস্ত্রের
কি ধার ধারো বাপু?

১ম পুরো। ধার ধারি না। পুরাণ, উপ-
পুরাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, মনু এসব কণ্ঠস্থ।

৩য় পুরো। আরে এত চেঁচাও কেন?

৪র্থ পুরো। রাজা দশরথকে আন্তে লোক
গিয়েছে?

৩য় পুরো। ওগো গিয়েছে গো গিয়েছে।
তাঁর পুত্র রামের বিয়ে, তাঁকে আন্তে লোক
যাবে না?

১ম পুরো। গৌতমকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিই-
ছিল যে, তিনি এসেছেন?

২য় পুরো। হাঁ, এয়েছেন।

৪র্থ পুরো। রাজবাড়ীতে এতক্ষণ চর্বা-
চোষা-লেহা-পেয় কচ্ছেন।

৩য় পুরো। আরে অত চেঁচাও কেন ছাই?

১ম পুরো। লোকটা বড় মুষড়ে গিয়েছে।

৪র্থ পুরো। তা আর যাবে না। এই
কেলেঙ্কারিটা!

৩য় পুরো। বলি, একটু আশ্তে চেঁচাও না।

[পুরোহিতদিগের প্রস্থান।

অহল্যা। এ কি শব্দ? তিনি এসেছেন?
এসেছেন? আমি কি কৰ্ব্ব! যাই তাঁর পায়ের
তলে পড়ে তাঁর ক্রমা ভিক্ষা করি। তিনি প্রেম-
ময়, তিনি দয়ার সাগর, তিনি ক্রমার প্রতিমা—
ক্রমা কর্ত্তেও পারেন। যাই,—যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—জনকের রাজসভা-কক্ষ।

কাল—প্রহরাতীত প্রভাত।

জনক, গৌতম, শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র

গৌতম। ধন্য হইলাম, আমি। মরি কি মধুর
সজল-জলদ-মুর্তি! রাজর্ষি জনক'
যোগ্যতর পায়ে ন্যস্ত হইত না কভু
সুন্দরী জানকী সীতা। শোভে কি তিড়ং

বিনা নব-জলধরে। শোভে কি সুন্দর
শ্যামলপল্লব বিনা—চম্পক-কলিকা?
জনক। সম্পূর্ণ হইল ক্রিয়া তব আগমনে
বন্ধুবর।

গৌতম। —বহুদিন ছিলাম প্রবাসে,
আচ্ছন্ন গভীর সুখে, ভুলিয়া কর্তব্য
দূর সংসারের প্রতি: ছিলাম নিঃসর্জনে,
স্বার্থমগ্ন আমি।—পত্র তোমার, সুহৃৎ,
হৃদয়ে জাগায়ে দিল অতীতের স্মৃতি
পুনর্বার।

মাধুরীকে টানিয়া চিরঞ্জীবের প্রবেশ

চিরঞ্জীব। এই নেও! এই মায়াবিনী!
বিশ্বামিত্র। একি চিরঞ্জীব', কেন রাজসভাস্থলে,
করিতেছ আপনার পত্নীর নিগ্রহ?

চিরঞ্জীব। মায়াবিনী মন্ত্র জানে! আমি

চিরদিন,

করিয়াছি অনাস্থা তাহারে; বিনিময়ে,
সে করে আমার পূজা।—কহি কটুভাষা,
মায়াবিনী হাসে।—আমি নিম্নদয় প্রহার
করিয়াছি, কাঁদে নারী নিঃশব্দ বিলাপে।

—আমি তারে জনহীন প্রান্তরে, নিশীথে
করিলাম পরিত্যাগ কৈলাসের পথে;
পরে রুগ্ন আমি যবে মিথিলার পথে,
নিদ্রিত,—চাহিয়া দেখি পিশাচী জাগ্রৎ,
শিয়রে বসিয়া সেবা করিছে নীরবে।

—মায়াবিনী মন্ত্র জানে,—বাঁধিয়াছে প্রভু,

এ পেশল বাহু, এই পাষণ হৃদয়,
পাশব প্রবৃত্তি মোর, কোন্ মন্ত্রবলে,
জানি না। অথচ আমি পিশাচীর দাস,
আজি কায়মনোবাক্যে।—অহো! কি দুর্গতি
পূরুষের! [বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

জনক। আচ্ছা, যাও চিরঞ্জীব! আমি

করিব বিধান দণ্ড। [মাধুরীর প্রতি]

মায়াবিনি! তুমি

আজি হ'তে এই পাপে, মহিষীর সখী,—
যাও অন্তঃপুরে। যাও চিরঞ্জীব।

[উভয়ের বহির্গমন।

গৌতম।

হরি!

দয়াময়! তুমি ধন্য! সিদ্ধ এতদিনে
মাধুরীর মহতী সাধনা!

দশরথের প্রবেশ

জনক। [গৌতমকে] বন্ধুবর!
ইনি বৈবাহিক মম, অযোধ্যার পতি,
দশরথ। [দশরথের প্রতি] মহারাজ!
ইনি বন্ধুবর,
মহর্ষি গৌতম।

দশরথ গৌতমকে প্রণাম করিলেন। গৌতম
দশরথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন

দশরথ। মহারাজ! এইক্ষণে,
আসিতে প্রাসাদে সখে, দোঁখলাম পথে,
অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য এক,—উন্মাদিনী নারী।
গৌতম। উন্মাদিনী!

দশরথ। উন্মাদিনী। রুগ্ন গৌর তনু,
আপাদলম্বিত শূদ্রকেশী। চক্ষু দৃষ্টি
জলভরে নত। স্বচ্ছ সূঠাম ললাটে,
অঙ্কিত গভীর দুঃখ-কাহিনী-কালিমা।
গাইছে কিস্তরীকণ্ঠে, কি সঙ্গীত সখে,
কি গঢ় বেদনাপ্লুত, কি গাঢ়, মধুর,
উৎকট, স্বর্গীয় ধ্বনি।—অনন্ত বাসনা,
সঙ্গে তার বিজড়িত অনন্ত, অসীম,
স্বর্গীয় হতাশা।—হেন মূর্ত্তি দেখি নাই
হেন গীত শ্রুনি নাই কভু।

গৌতম। [অশ্ৰুস্বগত]। উন্মাদিনী!
বাহিরে গীতের শব্দ
দশরথ। ওই আসে। বৃষ্টি নারী আসিছে
এখানে।

অহল্যার প্রবেশ ও গীত

আর একবার ভালোবাসো,
বাসতে যেমন আগের দিনে।

ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিয়ে প্রাণে
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয়'পর হে,
শান্ত হোক প্রাণ যাহে,
আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।

তোমারি হারানো বাঁশী লুঠায় ধরনী'পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর;
ভাঙা চূড়া প্রাণের বাঁশী, তেমনি কোরে আজ রে;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে।

গৌতম। অভাগিনী—এ বেশ!—এ দশা!—
অহল্যা। অভাগিনী!

সত্য, অভাগিনী আমি! বড় অভাগিনী,
বড় কলঙ্কিনী, বড় পাপীয়সী, বড়
পাতকিনী আমি প্রভু!—

গৌতম। হায় প্রিয়তমে!

অহল্যা। “প্রিয়তমে!” আজ মোরে এই
সম্ভাষণ?

একি উপহাস! কিম্বা এখনো মহর্ষি
চিন না আমারে বৃষ্টি?

গৌতম। চিনি প্রাণেশ্বর!
অহল্যা। না চিন না—ডাকিতেছ তাই সে মধুর,

সে স্নেহ গঙ্গাদম্বরে! তাই প্রেমভরে
প্রসারিছ বাহু।—যদি চিনিতে, ঘৃণায়
ফিরাইতে মূখ, মোরে কহিতে ককর্শ,
কিম্বা দিতে খেদাইয়া দূরে পদাঘাতে।

গৌতম। অহল্যা—

অহল্যা। অহল্যা নহি;—পাষণী পাষণী,
দ্বিচারিণী, পুত্রহন্ত্রী, ঘাতিকা, পিশাচী
—শোন ইতিহাস—এমনি সে ইতিহাস—
তার ছত্রে ছত্রে গাঢ় কলঙ্কের রাশি;
—পূর্বে শোন ইতিহাস—

গৌতম। শ্রুনিতে চাহি না,
সব জানি!—প্রতারিতা, প্রলুপ্তা, পতিতা,
প্রেয়সী আমার!—তব এই শীর্ণ তনু,
এ পান্ডুর মূখ, এই কোটর-নিহিত
চক্ষুর অপাঙ্গে ঘন গভীর কালিমা,
কহিছে সে ইতিহাস!—

অহল্যা। নরকের জ্বালা—

নরকের জ্বালা, প্রভু, কতবর্ষ ধরি',
সহিয়াছি দিবারাত্র; তীর যন্ত্রণায়
পাষণী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে!

একদা সহসা শেষে বিষ্ণুর কৃপায়,
হইল চৈতন্য। শূঙ্ক পাষণ ভেদিয়া,
ঝরিল নিঝর, বজ্রদম্ব দীর্ঘ তরু
মঞ্জুরিল পত্রপুষ্পে।—কি আর বলিব!
যদি জানো সব নাথ, কি আর বলিব!

—জীবন-সর্ব্বস্ব মোর! বৃষ্টিয়াছি ভ্রম
এতদিনে! ক্ষমা কর।—ধর্ম্মের প্রতিমা
পুণ্যের কাহিনী তুমি, দয়ার সাগর,
স্বর্গের দেবতা!—আর আমি পাপীয়সী,
মূঢ়, ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য নরকের কীট।—আমি
ভাগিয়াছি বিশ্বাস; চরণে ঠেলিয়াছি বিষ।
—আজি বৃষ্টিয়াছি ভ্রম।—ক্ষমা কর।

শতানন্দ। —ক্ষমা!

যে নারী বিনাশ করে বিশ্বাস, প্রণয়,
সে ক্ষমার যোগ্য নহে।—হায় পিতৃদেব!

যে দাম্পত্য-প্রেম ভিত্তি সমাজের, মূল
সর্ব কর্তব্যের, যেই সে দাম্পত্য-প্রেম
স্বহস্তে নির্মূল করে, সেই পাপীয়সী
ক্ষমাযোগ্য নহে। পিতা—ভৃগুর বিধান—
যোগ্য শাস্তি, প্রাণদণ্ড, কুলটা নারীর;—
হোক সে স্বকীয় পত্নী অথবা জননী।
গৌতম। ক্ষান্ত হও প্রিয়তম! শাস্তি দিব?
হায়!

আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মৃত্যুভীত,
দুর্ভল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার,
কর্তব্যস্থলিত, মৃত, মনুষ্য উপরি'
বসিব বিচারাসনে।

[অহল্যার প্রতি]—এস অভাগিনি!
বিধির সর্বাধি এই,—আজি পাইলাম
যাহা পূর্বে কভু পাই নাই—প্রিয়তমে!
তোমারে প্রথম দিন হৃদয় ভিতরে।
এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরী।
এস বাণ-বিষ মম পিঞ্জরের পাখী
হৃদয়পিঞ্জরে ফিরে এস!

অহল্যাকে বন্ধে ধারণ
বিশ্বামিত্র। এত উচ্ছে!
এত উচ্ছে তুমি? এত পবিত্র, মহৎ?
এত ক্ষমাশীল? এত উদার?—ব্রাহ্মণ!
অবনত করি শির।—রাজর্ষি জনক!
বলেছিলে অতি সত্য কথা, বন্ধিয়াছি।
লভি নাই ব্রাহ্মণত্ব! জেনেছি তাহার
বহু নিম্নে পড়ে' আছি! বিশ্বামিত্রে ধিক্,
লক্ষ ব্রাহ্মণত্বে ধিক্! তপস্যায় ধিক্।
জনক। ধন্য এ চরিত্র, যার সংস্পর্শ কুহকে,—
বারাঙ্গণা সতী হয়; দস্যু সাধু হয়;

পবিত্র পবিত্র হয়; কামুক লম্পট
জিতেন্দ্রিয় হয়; গম্বী নত করে শির।
যে, স্পর্শমণির মত, পথের কন্দমে
স্বর্ণে পরিণত করে; পাবকের মত
ভস্ম করে আবিল দুর্গন্ধ; পুণ্যতোয়া
জাহ্নবীর মত, ধৌত করে আবর্জনা।
অহল্যা। নাথ! তব পুণ্যতেজে আজি অন্ধ
আমি,
কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে কোরে লও।
[সকলে নিস্তান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অলৌকিক প্রমোদ-মন্ডপ। কাল—নিশা।
রামসীতার যুগলরূপ
সম্মুখে অঙ্গুরাদিগের নৃত্যগীত
যাচ্ছে বোয়ে প্রেমের সিন্ধু
উঠছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ;
কেউবা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চলে যাচ্ছে কেউ।
কারো বন্ধে এ প্রেম আনে, অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ;
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম, কারো বন্ধে জাগরুক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষ্যা, প্রেমে পুণ্য পরিণয়,—
কারো ভাগ্যে বিষের ভান্ড কারো ভাগ্যে সুধাময়;
প্রেমের টানে টানে আনে জনান্দনে ধরায় জীব;
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী, প্রেমে ভোলা
সদাশিব।
কেউবা প্রেমে সর্বত্যাগী কেউবা চাহে উপভোগ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে
মহাযোগ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে
নাশ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্যে, প্রেমে স্তম্ভ নীলাকাশ।

ষষ্ঠিকা পতন

তারাবাহ

পদ্য-চরিত

রায়মল (মেবারের রাণা)। সূর্যমল (রায়মলের ভ্রাতা ও সেনাপতি)। সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল (রায়মলের পুত্রগণ)। প্রভুরাও (সিরোহীর রাজা)। শূরতান (পলায়িত তোড়া অধিপতি)। সারঙ্গ দেব (রায়মলের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ)। বণিক, মালব, চন্দ্রাও, কৃষক, ফকির ইত্যাদি।

স্ট্রী-চরিত

শূরতানের রাণী। তারা (শূরতানের কন্যা)। তমসা (সূর্যমলের স্ট্রী)। যমুনা (রায়মলের কন্যা ও প্রভুরাওর স্ট্রী)। চারণী, পরিচারিকা, কৃষকরমণী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সূর্যমলের বাটী। কাল—প্রভাত।
রাজভ্রাতা সূর্যমল ও তাহার স্ট্রী তমসা

সূর্যমল। পলায়িত শূরতান তোড়া অধিপতি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে!—হায়! ক্ষত্রিয়, চৌহান
হেন কাপদরূষ?

তমসা। কোথা তিনি?

সূর্য। বনবাসী—

দূরে আরাবলিগিরিসানুপদতলে

তমসা। হ'য়েছিলে অতিথি কি তুমি তাঁর তবে?

সূর্য। হইয়াছিলাম আমি তাহার আশ্রমে
অতিথি শ্বাদশ দিন।

তমসা। তাহার দাম্ভিকা

রাজ্ঞী—তাঁর সঙ্গ?

সূর্য। রাজ্ঞী তাঁর সঙ্গ, আর
অপদ্বলাবণ্যময়ী কন্যা—নাম “তারা”।

—আশ্চর্য্য বালিকা! মহাভারত বৃহৎ
রামায়ণ,—কণ্ঠস্থ! পড়িছে এইরূপে
উত্তরচরিত।

তমসা। জানি তাহার রাজ্ঞীরে।

গর্ষ তাঁর অমানদ্বী; চূর্ণ অহঙ্কার
আজি তাঁর।

সূর্য। হইও না হেন উল্লসিত

পতিতের দূর্ভাগ্যে, তমসা—একদিন
সবারই ঘটিতে পারে তাহা।

তমসা। কি ঘটিবে?

মন্দভাগ্য?—উন্নতের পতন সম্ভবে;

আমি রাজ্ঞী নহি।

সূর্য। সেনাপতি—পত্নী তুমি।

ইহার অপেক্ষা মন্দভাগ্য আছে প্রিয়ে।

—বলিতেছিলাম—সঙ্গ, পৃথ্বী, জয়মল,
যে হইবে রাণা চিতোরের ভবিষ্যতে,
তার উপযুক্ত পাত্রী শূরতানবালা।

তমসা। কেন? নাহি স্থির তবে কে হইবে পরে
মেবারের রাণা?

সূর্য। কিছু বদ্বিতে না পারি;

জটিলসমস্যা তাহা; অতীব জটিল।

যে কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল, অর্ধাচীন;—

সে রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। যে শ্বিতীয়

পুত্র, পৃথ্বী—নিভীক্ উদারচিত্ত বটে,

কিন্তু অসংযত, পরিচালিত সর্বাদা

পরকীয় মন্ত্রণায়। সর্বাশ্রিত পুত্র,

সর্বাগুণাম্বিত সঙ্গ—প্রিয়পাত্র নহে

ভূপতির। কেহ নাহি জানে ভবিষ্যতে

কে হইবে মেবারের রাণা।

তমসা। চিরপ্রথা

নহে রাজ্য পায় জ্যেষ্ঠ পুত্র?

সূর্য। চিরপ্রথা

কে মানিবে, রায়মল স্বহস্তে যদিপি

মুকুট পরায় দেন জয়মলশিরে।

সর্ব্বব রাজার ইচ্ছা। প্রজাবর্গ জানে

জয়মল মেবারের ভাবি অধিপতি।

কিন্তু ছাড়িবে কি সঙ্গ জন্মস্বয়ং তাঁর

সহজে? পৃথ্বীই—নাকি ছাড়িবে?

তমসা। কি স্বয়ং

সূর্য্য। শক্তির স্বভাব। সৈন্যদের প্রিয়
পৃথ্বী, ক্ষত্রগুণে।

তমসা। তবে রাজ্য অরাজক?

সূর্য্য। অরাজক একরূপ।

তমসা। তবে নাহি জানি,

তুমি বা একাকী কেন রাজ্যস্বভাব হ'তে

হইবে বর্ণিত, যবে রাজদ্রাতা তুমি?

সূর্য্য। আমি রাণা মেবারের?—কি বলিছ
রাণী?

স্তম্ভ হও;—বলি, কহিও না পুনর্বার

ওই কথা, আজ্ঞা করিতেছি। যাও—যাও।

[তমসার প্রস্থান।

সূর্য্য। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ইহা!—জানিল
কিরূপে

তমসা আমার পাপ অন্তরের কথা?

সে দিন গিয়াছিলাম চারণী মন্দিরে,

কহিল চারণী, হস্ত দেখিয়া আমার,

“মেবারের রাজ্যভাগ তোমার”—সহসা

কে যেন অর্মানি বেগে করিল আঘাত

উচ্চাশার রুদ্ধস্বারে। হইল চঞ্চল,

উদ্বেল, হৃদয় এই নব সমস্যায়।

আহারে বিহারে এই—কয়দিন ধরি’,

কে কর্ণে নিয়ত যেন করিছে ঝঙ্কার—

“আমিই বা কেন এই রাজ্যস্বভাব হ'তে

হইব বর্ণিত, যবে রাজদ্রাতা আমি?”

তারই প্রতিধ্বনি শুনি’ তমসার মুখে

উঠিয়াছি শিহরিয়া; তস্কর যেমতি

আপনার ছায়া দেখি, চর্মকিয়া উঠে।

রুঢ় হইয়াছি অকারণ,—এই ভয়ে

পাছে এ জিজ্ঞাসামাত্র হয় পরিণত

প্রকৃত প্রস্তাবে। না না, করিব না আমি

হেন হীন হেয় কার্য্য! বীভৎস প্রস্তাব!

যার অন্ন খাই, তার বিপক্ষে তুলিব

খজা? তবে কে কাহারে করিবে বিশ্বাস?

—কি বীভৎস! আপনার মনে উঠে যাহা,

ধ্বনিত যখন তাহা অপরের মুখে,

কি ভীষণ শুনায় সে কথা।—দেখিয়াছি

সমস্ত প্রস্তাব প্রতিবিস্মিত দর্পণে

সাক্ষাৎ সহসা যেন। বীভৎস! ভীষণ!

করিব না হেন কার্য্য আমি—অসম্ভব!

অসম্ভব!

পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য!

সূর্য্য। [চর্মকিয়া] কে? পৃথ্বী?

পৃথ্বী। সত্য, আমি।—

চর্মকিলে কেন?

সূর্য্য। না—

পৃথ্বী। হাঁ বলিতে হইবেই।

সূর্য্য। ভাবিতেছিলাম—না না—বলিব কি
আর,

বিশেষ কিছুই নয়।

পৃথ্বী। যাহাই হউক,

বলিতে হইবে তাহা পিতৃব্য আমারে;

নাহিলে করিব অভিমান। প্রতিদিন

আসি যাই। কই, কভু উঠ নাই তুমি

হেন চর্মকিয়া;—বল।

সূর্য্য। বলিব কি তবে?

ভাবিতেছিলাম বৎস! কে হইবে রাজা

ভ্রাতার মৃত্যুর পরে।

পৃথ্বী। কেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

সংগ!

সূর্য্য। বৎস! নহে অত সমস্যা সরল।

পৃথ্বী। এত কি জটিল প্রশ্ন? চিরকাল জানি,

জ্যেষ্ঠপুত্র পায় রাজ্য।

সূর্য্য। চিরকাল নহে।

ইতিহাসে দেখিয়াছি পাইয়াছে কভু

রাজত্ব—কনিষ্ঠ পুত্র?

পৃথ্বী। জয়মল? ধিক্!

সূর্য্য। লক্ষ্য কর নাই বৎস, তোমার পিতার

স্নেহ সমাধিক জয়মলে?

পৃথ্বী। [চিন্তিত ভাবে] করিয়াছি:

যদি তাই হয়, হোক।

সূর্য্য। সরল, উদার,

একান্ত স্বভাব তোর। অসম্ভব নহে

রাজ্যেশ্বর হ'বি তুই।

পৃথ্বী। [সাস্চর্য্যে] আমি!

সূর্য্য। কেন নহে?

অসিবলে বলী তুই সৈন্যদের প্রিয়:

রাজপুত্র তুই!

পৃথ্বী। [সাস্চর্য্যে] আমি!

সূর্য্য। শোন্ বৎস! তোরে

এতদিন লালন করেছি যত্নে। কত

ক্রোড়ে করিয়াছি; কত স্নেহে চুম্বন

করিয়াছি; ধরিয়াছি বন্ধে। পূর্ণ হয়
আমার সকল বাঞ্ছা, পারি যদি তোরে
বসাইতে সিংহাসনে।

সঙ্গের প্রবেশ

সঙ্গ। পিতৃব্য এখানে?
সূর্য্য। হাঁ এখানে। কি সংবাদ সঙ্গ?
সঙ্গ। জয়মল!
সূর্য্য। কি করেছে জয়মল?
সঙ্গ। আনিয়াছে ধরি'
সুন্দরী বালিকা এক। পিতা বালিকার
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে এক্ষণে
রাজার সমীপে। তাত! জান ত পিতার
কঠোরকর্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মনীতি।
রক্ষা কর জয়মলে।
সূর্য্য। কি করিব আমি?
উপযুক্ত শাস্তি হোক্। আমি কি করিব?
সঙ্গ। বন্ধাও তারে!—সে মূঢ় অবোধ বালক।
পৃথবী। অবোধ বালক জয়মল? চল, আমি
বিধান করিব যথাযোগ্য ব্যবহার,
দোষীর।
সূর্য্য। এই যে জয়মল—

জয়মলের প্রবেশ

পৃথবী। জয়মল!
আনিয়াছ ধরিয়া কি বালিকায়? কহ
সত্য।
জয়মল। আনিয়াছি সত্য।
পৃথবী। উত্তম এক্ষণে
তাহারে ফিরায়ে দাও।
জয়। কেন দিব? তুমি
কে আদেশ করিবার?
পৃথবী। আমি পৃথবীরাও,
অগ্রজ তোমার।
জয়। হোক্, মানি না তোমার
প্রভুত্ব।
পৃথবী। —উত্তর দাও, দিবে কি দিবে না?
জয়। [সঙ্গকে] দাদা—
পৃথবী। দিবে কি দিবে না? [গলদেশ ধারণ]
সঙ্গ। পৃথবী, ছেড়ে দাও
জয়মলে।
পৃথবী। তুমি যাও। [জয়মলকে] দিবে কি

দিবে না?

জয়। দিব।
পৃথবী। চল সঙ্গে। দিতে হইবে এক্ষণে,
আমার সাক্ষাতে। সঙ্গে চল এইক্ষণে।
[পৃথবী ও জয়মলের প্রস্থান।

সঙ্গ। কেন রুঢ় হও পৃথবী? জয়মল—মূঢ়,
অবোধ নিষেধ।
প্রস্থানোদ্যত
সূর্য্য। সঙ্গ!
সঙ্গ। পিতৃব্য।
সূর্য্য। জানো কি,
হিংসা করে জয়মল তোমারে?
সঙ্গ। হাঁ জানি।
সূর্য্য। ঘৃণা করে—
সঙ্গ। এত দূর? কেন?
সূর্য্য। হেতু—তুমি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
সঙ্গ। হায় মূঢ় অবোধ বালক!
[প্রস্থান।
সূর্য্য। মহৎ চরিত্র সঙ্গ তোমার!—তথাপি—

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। পিতৃব্য! কোথায় মেজদাদা? জানো?
সূর্য্য। কেন
যমুনা?
যমুনা। দেখিব শূন্য।
সূর্য্য। কি হেতু?
যমুনা। জানি না।
সূর্য্য। অদ্ভূত বালিকা বটে! চল সঙ্গে চল।
[নিষ্কান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—প্রাত্ন।
গাইতে গাইতে বালকদিগের প্রবেশ
বালকদিগের গীত
এখনও তপন উঠেনি গগনপূর্ব্বভাগে;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নির্বিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপ পদুজ,
শূন্য আছে চাহি মেঘকুল,
সাজি ভূষিত অরুণকিরণরাগে।
ধীরে ধীরে ওই উঠিল গগনে দিবসরাজ;
ছড়ায় পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ;

অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢলিল চামর, শীতল সমীর পরশে
ভুবন উঠিল জাগি।

[প্রস্থান।

কলসকক্ষে পরিচারিকাব্যয়ের প্রবেশ

১ পরিচারিকা। রাণা কাল ভারী ক্ষাপা
হয়েছিলেন, শূন্যলাম।

২ পরিচারিকা। তা ত হবেনই, তা ত
হবেনই;—তবে কার উপর গা?

১ পরিচারিকা। তাঁর মেজো ছেলে পৃথবীর
উপর। আবার কার উপর।

২ পরিচারিকা। তা ত হতেই পারেন
বটে। তবে কেন ক্ষাপা হলেন?

১ পরিচারিকা। শূনি, পৃথবী ছোট রাণীর
ছেলে জয়মলকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে
গিইছিল।

২ পরিচারিকা। ওমা সত্যি নাকি? তা ত
কাটতে যেতেই পারে। তা ত কাটতে যেতেই
পারে। তবে কেন গা?

১ পরিচারিকা। এই ভায়ে ভায়ে বিবাদ।
তার উপর, রাণার ছোট ছেলের উপর টান বেশী
কিনা!

২ পরিচারিকা। হাঁ তা ত হবেই ত। তা
হবেই ত। সুয়োরানীর ছেলে কিনা। তা আর
হবে না? সত্যযুগ থেকে এই রকমই ত হয়ে
আসছে। এই যে, রাজা যুদ্ধার্থীর মলে' তার
সুয়োরানীর ছেলে ভরতের জন্য তার দুয়ো-
রাণীর ছেলে বলরামকে বনে পাঠিয়েছিল না?
তা আর হবে না?—তবে তাই বলে' কি বিবাদ
কর্তে আছে গা?

১ পরিচারিকা। মেজো ছেলে তা সইবে
কেন?

২ পরিচারিকা। তা ত সত্যিই ভাই। সে
সইবে কেন? সে-ও ত ছেলে বটে, সে তা সইবে
কেন ভাই?—তবে কিন্তু এখন কি হবে?

১ পরিচারিকা। রাণার যেমন মর্জি সেই
রকমই কাজ হবে।

২ পরিচারিকা। তা বৈ কি! তা বৈ কি।
নৈলে-কি আর আমার মর্জি মোতাবেক কাজ
হবে! তবে কি না, বলছিলাম যে—

১ পরিচারিকা। হয়ত বা রাণা মলে' ছোট

ছেলেই রাণা হয়।

২ পরিচারিকা। এত দূর! তার আর
আশ্চর্য্য কি গা। তা ত হতেই পারে। তা ত
হতেই পারে। এই যে রামচন্দ্র মলে' তার ছোট
ছেলে দুর্ঘোষনই ত রাজা হয়েছিল। বিধাতা
মনে কল্পে কি না হয়?

১ পরিচারিকা। বিধাতা নয় রে! বরং বল
ছোটরাণী মনে কল্পে কি না হয়?

২ পরিচারিকা। ঐ একই কথা। পুরুষের
ঐ সুয়োরানীও যে আর বিধাতাও সেই।

১ পরিচারিকা। তা বৈ কি? দেখ রাজা বড়
রাণীর মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিলে গা! এক
অপগন্ড জানোয়ারের হাতে সপে দিয়েছে।
তাকে দেখলে গায়ে জ্বর আসে!

২ পরিচারিকা। তা ত আস্বারই কথা, তা
ত আস্বারই কথা—বলি মেয়ে না কি শ্বশুর
বাড়ী যাচ্ছে?

১ পরিচারিকা। যাচ্ছে বৈ কি—মেয়ে কি
বিয়ে করে—বাপের বাড়ী থাকবার জন্য! শ্বশুর
বাড়ী যাবে বৈ কি।

২ পরিচারিকা।—তা ত যাবেই। তা ত
যাবেই।—আহা খাসা মেয়ে!

১ পরিচারিকা। রাজ-জামাতা তাকে নিতে
এসেছে, এখন না গেলে চলে?

২ পরিচারিকা। ও মা! তা কি চলে?

১ পরিচারিকা। চল্। আর একটু হেঁটে
চল্ না। চল্ছিস যেন সমস্ত মাটি মাড়িয়ে
যাচ্ছিস্। যেন গতর খাটিয়ে খেতে আসিস্ নি।

২ পরিচারিকা। ও মা সে কি গো। তবে কি
গায়ে ফন্দ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে এসেছি?
তা'লে কি আর মূনিব মাইনে দিত?—ও মা
বল কি গো?

১ পরিচারিকা। চল্ চল্, এখন চল্।

২ পরিচারিকা। এই চল না গা। ধমক
ধমক দাও কেন? [নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাবলী পদপ্রান্ত গ্রাম। কাল—অপরাহ্ন।
শূরতান ও তাহার রাজ্ঞী। দূরে পাঠনিরতা তারা
শূরতান। সংসারের লীলা খেলা; সৌভাগ্য-
লক্ষ্মীর

চঞ্চলতা; নিয়তিচক্রের আবর্তন!

আজি মহারাজ, কল্যা ভিক্ষুক। প্রেয়সী!
ইহা মাত্র প্রকৃতির খেয়াল!

রাণী। খেয়াল?
জানি না। ক্ষত্রিয় নারী আমি এই নীতি
বুঝি না; আমি ত জানি, স্বীয় বাহুবলে
গড়ে আপনার ভাগ্য, মনুষ্য—

শূর। প্রেয়সী?
গড়ে আপনার ভাগ্য! সাধ্য কি তাহার
রোধিতে বিপক্ষগতি বিশ্বনিয়মের?
চতুর্দিকে, ঘটনার বিপুল প্রবল
ঘোর আবর্তের মধ্যে, কি করিবে একা
মনুষ্যের ক্ষীণ বাহুবল?

রাণী। কি করিবে?
করিবে সংগ্রাম;—ভীরু সৈনিকের মত
নাহি পলাইবে কর্মক্ষেত্র হ'তে।

শূর। যদি
পরাজিত হয়?

রাণী। মরিবে বীরের মত।
প্রেরিত হয় না নর, বিশ্ব, তৃণসম
ভাসিয়া যাইতে, যে দিকে লইয়া যায়
তরঙ্গ; তীরের মত যাইতে হইবে
বাহিয়া বিপক্ষে তার প্রয়োজন যদি।

শূর। ধীরে, কিছুর ধীরে, রাণী—যদি তাই হয়,
কেন তবে নল, রাজ্যভ্রষ্ট পত্নীভ্রষ্ট,
রাজা ঋতুপর্ণের সারথী—

রাণী। আত্মদোষে।
প্রকৃতির খেয়াল নহে সে! আত্মদোষে,
স্বেচ্ছায়, অবৈধ অক্ষত্ৰীড়ায় কুঠার
মারিয়াছিলেন তিনি আপনার পদে—

শূর। স্বেচ্ছায় নহে সে প্রিয়ে দৈবেচ্ছায়;—
কলি—

রাণী। কলি? আসিয়াছিল কি কলি ছিদ্র
বিনা?

কে দিয়াছিল সে ছিদ্র?

শূর। কেন অনুযোগ
কর প্রিয়ে! কি দংশ এখানে? রম্যস্থান
এ বিদর্ভ, আরাবলীশৈলপদতলে।
বাহে' যায় নির্ঝর সন্নিহিত স্বেচ্ছতোয়া
সুন্দর। প্রচর শস্য। অনন্ত আরাম।

রাণী। পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয় প্রিয়তম!
তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মানুষ
হয় বনবাসী। কিন্তু প'রের আঞ্জার,

প্রাসাদে নিবাস হয় ন্যাকারজনক?
শূর। প্রেয়সী একটু তুমি অধিক মাত্রায়
অসংস্কৃত বাক্য আজি করিছ প্রয়োগ;
তাহা যে স্বামীর প্রতি সম্মানসূচক,
বলিয়া হয় না বোধ। শাস্ত্রে আছে বটে,
যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত যবে বনবাসী,—
দ্রৌপদী এরূপ ভাষা পাণ্ডবের প্রতি
করিয়াছিলেন উচ্চারণ! ভগবতী
—এরূপ প্রবাদ আছে, একদা এহেন
করিয়াছিলেন শ্বশুর ভৈরবের সনে।
তথাপি স্বীকার্য ইহা প্রিয়তমে! সতী
হিন্দুরমণীর মুখে এরূপ ভাষা
শোভা নাহি পায়।

রাণী। স্বামী! শোভা পায় বটে
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন!
—নিযুক্ত পুরুষজাতি, বিধান করিতে
নিয়ত, স্বামীর প্রতি কর্তব্য নারীর;—
আপনার কর্তব্যপালনে উদাসীন।

—হায় স্বামী! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম;
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে;
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে
যাইতাম আমি সহমরণে;—

শূর। প্রেয়সী!
আমি যদি মরিতাম সমরে, কিরূপে
দেখিতাম, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারি।
এ যুক্তির ভ্রমটুকু ছাড়িয়া দিলেও,
আমার মৃত্যুর প'রে, মানিলাম যদি,
যাইতে সহমরণে তুমি, কিন্তু প্রিয়ে
তাহাতে আমার লাভ? আমি ত নিশ্চিত
যেই মরিলাম, সেই মরিলাম—

রাণী। ধিক্!
ক্ষত্রের মরিতে ভয় সমরে? হা ধিক্!

শূর। শোন অন্য যুক্তি, প্রিয়তমে! যুদ্ধে যদি
মার বীর, সে নিশ্চিত মরে; যুদ্ধ আর
করে না সে। কিন্তু যদি পলায়, কদাপি
পুনঃ যুদ্ধ করিলেও করিতে পারে সে।

রাণী। বৃথা যুক্তি। ভীরুতার শত যুক্তি
আছে।

প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি।
জয়লাভ করে কিম্বা মরে।—হায় যদি
এ গর্ভে জন্মিত পুত্র, কন্যা না জন্মিয়া—

শূর। সে বিষয়ে একটুকু হয়েছিল ভ্রম,
কাহার জানি না! তবে পুত্র হইলেও,
সে যে নাহি পলাইত, তাহার প্রমাণ?
রাণী। জন্মে না সিংহীর গর্ভে শূগাল-

শাবক—

শূর। সিংহীর বিবাহ যদি হয় প্রিয়তমে,
শূগালের সঙ্গে—তাহা হইতেও পারে।
রাণী। করিতে চাহি না চর্চা এ বিষয়ে প্রভু।
[প্রস্থান।

শূর। প্রেয়সীর মেজাজটা নবনীর মত
অদ্য সুকোমল নহে, তাহা সুনিশ্চিত।
—হা বিধি! যখন তুমি গড়েছিলে নারী,
কি দিয়া যে গড়েছিলে বলিতে না পারি।
[প্রস্থান।

তারা। ধিক্—আমি নারী!—ধিক্! কেন হই
নাই

পুত্র? ধিক্ নারী-জন্ম!—তাহাই বা কেন?
কিসে হীন নারীজাতি? এই নারীকুলে
জন্মে নাই দময়ন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী—
জনা, খনা, লীলাবতী, প্রমীলা রূপসী?
কিসে হীন নারীজাতি? নাহি হস্তপদ?
হৃদয়, মস্তিস্ক নাই? শক্তি, বল, তেজ,
শিক্ষায় অবশ্য সাধ্য সকল। দেখিব
কি করিতে পারি আমি। এ মৃগাল বাহু
করিব লোহের মত কঠিন। ধরিব
শাণিত কুপাণ তাহে। দেখি পারি কি না।
—ক্ষুব্ধ হইও না মাতা। উজ্জ্বল করিব
নির্ব্বাণ গরিমা আমি! আমি উদ্ধারিব
অপহৃত রাজ্য। দেখি কি করিতে পারি।
ক্ষত্রিয়-ললনা আমি।—পুত্র হই নাই;
করিব পুত্রের কার্য জননী তোমার
[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বন, দূরে মন্দির। কাল—মধ্যাহ্ন।
সশস্ত্র সঙ্গ, পৃথবী, ৬ জয়মল মৃগয়া হইতে
ফিরিতেছিলেন

পৃথবী। পথ ভুলিনি ত?
সঙ্গ। না। এ পথ আমি জানি।
জন্ম তুমি আগে এ পথে এইছিলে
নাকি?
সঙ্গ। অনেকবার।

জয়। কবে?
সঙ্গ। পরশুই এইছিলাম।
পৃথবী। কেন? এখানে কেন? কি
খুজতে?

সঙ্গ। নির্জনতা—
পৃথবী। নির্জনতা—সে ত বাড়িতেই
পাওয়া যায়। চোখ বৃজলেই নির্জনতা।
সঙ্গ। আর নিস্তব্ধতা।
পৃথবী। কাণে আঙুল দিলেই হোল!

গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ

সঙ্গ। এ কে?
পৃথবী। তাই ত! জটাইবুড়ী নাকি!

চারণীর গীত

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমির রাশি।
ক্ষুণ্ণলিঙ্গসম এ আঁধারে মোরা
কোথা হ'তে ছুটে আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি,—
কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে
এ আঁধারে মিশে যাই।
অক্ষুণ্ণ ভাতি উপহাস করি'
প্রদীপ শিখার পাছে,
বিরাত মরণ সমান বিরাত
আঁধার জাগিয়া আছে;
মহাসমুদ্র আঘাতে ক্ষুদ্র তরণী ভাঙিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্রও দিগন্ত নীলিমায়।
জয়। আবার গান গায়।
পৃথবী। তাই ত! গানটার কিন্তু কোন
অর্থই বোঝা গেল না।
সঙ্গ। অদ্ভুত! এই নির্জন বনভূমিতে
একাকিনী।

জয়। কে তুই?
পৃথবী। হাঁ, ঠিক কে তুই?
সঙ্গ। কে তুমি মা?
চারণী। আমি বনচারিণী তাপসী।
পৃথবী। তাপসী? তা কখন হ'তে পারে?
চারণী। কেন হ'তে পারে না বাছা?
পৃথবী। তা-ও ত বটে।—কেন হ'তে পারে
না তা ত বোঝা যাচ্ছে না।
জয়। না না এরা সব চোর,—দিনে তাপসী
সেজে বেড়ায়, রাতে চুরি করে।
পৃথবী। ঠিক! বেটী নিশ্চয় চোর। দিনে
তাপসী সেজে বেড়ায়।

চারণী। এ রকম তাপসী চোর কটা
দেখেছ বাছা?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে—এ রকম তাপসী
চোর ত কখন দেখিছি বলে মনে হচ্ছে না।

জয়। তবে এ ভিখারি।

পৃথ্বী। ভিখারি বটে! আমিই তাই
ভাবছিলাম। ভিখারি। নিশ্চয় ভিখারি।

চারণী। ভিখারি কি কঠে বনে থাকবে
বল না বাছা?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে, বনে ভিক্ষাই বা
দেবে কে? তবে তুমি কে সেইটে খুলে বল না
ছাই!

চারণী। আমি চারণী।

সঙ্গ। আপনি চারণী? এখানে কি
আপনার আশ্রম?

চারণী। এখানে নয়। তবে বেশী দূরও
নয়। নিকটেই আমার মায়ের মন্দির।

সঙ্গ। হাঁ! পিতৃব্যের কাছে একদিন
আপনার কথা শুনছিলাম বটে।

জয়। ও তাই ত বটে! আপনি হাত
দেখতে জানেন না?

চারণী। [সহাস্যে] কিছু কিছু জানি।

পৃথ্বী। ভবিষ্যৎ গনতে পারেন না কি?
আচ্ছা, বলুন দেখি, আমাদের তিন জনের মধ্যে
কে মেবারের রাজা হবে?

চারণী। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] সঙ্গ
মেবারের রাজা হবে।

[উক্ত গীতের প্রথম চরণ গাইতে গাইতে চারণীর
প্রস্থান।

পৃথ্বী। মিথ্যা কথা!—ভুঁড!

জয়। কিন্তু নাম জানলে কেমন করে?

পৃথ্বী। তা-ও ত বটে! তবে ত বলেছে
ঠিক বোধ হচ্ছে!

সঙ্গ। [চিন্তিতভাবে] তাই ত! চল বাড়ী
চল। বেলা হ'ল।

পৃথ্বী। [স্বগত] আমি বিশ্বাস করি না
যে মানুষ ভবিষ্যৎ বলতে পারে। যদি পার্ত
তা হলে ভবিষ্যৎ খন্ডনীয় হ'ত; আর
ভবিষ্যৎবাদ খন্ডনীয় হয়, যদি তা হ'তেও পারে
নাও হ'তে পারে, তবে তা আগে থেকে বলবে
কেমন করে? —প্রহেলিকা—প্রহেলিকা—সব
প্রহেলিকা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—প্রাহ্ন।
সূর্য্যমল একাকী।

সূর্য্য। তথাপি বাজিছে কর্ণে সেই এক কথা
—প্রহেলিকাপূর্ণ সেই ভবিষ্যৎবাণী—
আমি পাব রাজ্যভাগ। নিভাইতে চাই
এই দঃসাহসী ইচ্ছা; কৌশলে
ইন্ধান যোগায় পত্নী তমসা সতত,
মন্থরার মত।—না না, ইহা অসম্ভব!
করিব না হেন পাপ। বৃদ্ধ রায়মল,—
স্নেহশীল, বিশ্রম্ব উদার; সেনাপতি
আমি তাঁর;—হইব না বিশ্বাসঘাতক।

নেপথ্যে অলঙ্কারধরিন

আসিছে যমুনা। আজি যাইবে এক্ষণে
পতিগৃহে; আসিতেছে বিদায় লইতে।

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। পিতৃব্য! এখানে? আমি আসিয়াছি,
তাত! বিদায় লইতে।

সূর্য্য। যাইতেছ এক্ষণেই?
যমুনা। এইক্ষণে যাইতেছি। কর আশীর্বাদ।

সূর্য্য। যাও মা স্বামীর ঘরে; পতিব্রতা হও
গুরুজনসেবাপরায়ণা হও সদা;

পরিজনপ্রিয় হও,—কাঁদিও না বৎসে!

যমুনা। কাঁদিব না। পিতৃব্য! জানি না কেন
কাঁদি।

চিরকাল আমি দৃষ্ট। পিতৃব্য তোমারে
করিয়াছি কত ত্যক্ত করিও মার্জনা।

সূর্য্য। যমুনা আমার কন্যা নাই! আশৈশব
করেছি পালন তোরে স্বীয় কন্যা সম।

আজি হ'তে কন্যাস্নেহসম্পদে, যমুনা,
বিশ্রুত পিতৃব্য তোর।—বৎসে! প্রাণাধিকে!

যাও পতিগৃহে তবে, আজি শতদিনে
সুলগ্নে। জানিও বৎসে, স্বামীর ভবন

নারীর আপন বাটী, পর পিতৃগৃহ!
যাও মা আপন গৃহে—যেমন পার্বতী

বিজয়া দশমী দিনে যান মা কৈলাসে!—
আশীর্বাদ করি, পতিসোহাগে গৌরবে

গরিবণী হও। পতি যদি রুঢ় কহে
হইও প্রিয়ভাষিণী; হয় যদি রুঢ়

সহিও নীরবে।—পতি জানিও সতীর
সর্বস্ব, পরমাগতি জীবনে মরণে।

যমুনা। পিতৃব্য প্রণাম হই।
সূর্য্য। আয়ুষ্মতী হও।
[যমুনার প্রস্থান।
সূর্য্য। [পদচারণ সহ] সোনার প্রতিমা এই
—দিয়াছেন ভাই—

সর্পিয়া চন্ডাল করে; এই মৃত্তাহার
পরায়ে বানরগলে!—হায় প্রভুরাও—
বর্ধিতস যদি মূল্য এ রত্নের; তারে
রাখিতস্ শিরে, নাহি দলিতস্ পদে।
[দূরে শিবিকাবাহকদিগের ধ্বনি]
ওই যায় শিবিকায় জননী আমার;—
কোথায় চলিয়া যাস্ নিষ্ঠুর বালিকা
ছাড়িয়া পিতৃব্যে তোর।

তমসার প্রবেশ

তমসা। গিয়াছে যমুনা!
সূর্য্য। গিয়াছে চলিয়া দিবা, গৃহ অন্ধকার।
সূর্য্য। কার জন্য নিত্য বাগ্র হও? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল! বর্ধি না তোমার রীতি।
সূর্য্য। বর্ধিবে কি তুমি? হায়! তাহার
সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে।

দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ

তমসা। সঙ্গ কোথা যাও?
সঙ্গ। বৈদ্য অন্বেষণে—
তমসা। কেন?
সঙ্গ। পীড়িত মর্চ্ছিত পিতা—
সূর্য্য। মর্চ্ছিত? কিরূপ?
সঙ্গ। কহিতেছি: আগে ডাকি বৈদ্যে।
[প্রস্থান।
সূর্য্য। যাই দেখি।
[প্রস্থান।
তমসা। এই যদি সেই মর্চ্ছিত, নাহি ভাঙে
যাহা—

সারঙ্গদেবের প্রবেশ

সারঙ্গ। মা ডাকাইয়াছিলে?
তমসা। কে? সারঙ্গ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলেন তোমারে।

সারঙ্গ। প্রয়োজন?
তমসা। আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন।
সারঙ্গ, বলিব; স্থির হও। কিন্তু তার
পূর্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার।

সারঙ্গ। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে।

তমসা। জানি। তথাপি সারঙ্গ!
প্রতিশ্রুত হও।—অতি কঠিন আদেশ।
সারঙ্গ। প্রতিশ্রুত হইবার পূর্বে শুন তবে
কি আদেশ!

তমসা। নহিলে শপথ করিবে না?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীরসৈকতে তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতাত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিত্তে আনিয়া
করি সৈন্যভূক্ত?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি।
সারঙ্গ। সত্য, রক্ষাকর্তী তুমি, মানি মাতা!
তমসা। তবে

প্রতিশ্রুত হও, যাহা আদেশ করিব,
করিবে পালন, কোন প্রশ্ন না করিয়া।

সারঙ্গ। হইলাম প্রতিশ্রুত।

তমসা। অন্তর্ভুক্ত হও। [নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী-রাজ্য। প্রভুরাওর বিলাস-গৃহ।
কাল—রাতি।

পারিষদবর্গ সহিত প্রভুরাও

পারিষদবর্গের গীত

আমরা—ভাঙ খেয়ে হ'য়ে আছি চর।
যাচ্ছি চলে—সশরীরে যাচ্ছি চলে' মধুপূর।
শুনি'ছি বসে' নিশিদিন, কাণের কাছে বাজছে বীণ;
খাচ্ছে যত অর্ষাচীন—ঐ গাজা গুলি 'চরস';
সস্তা হোক না, তার চেয়ে ভাঙ—লক্ষগুণে সরস;
নেশার রাজা সিংধ, যেমন মণির মধ্যে কোহিন্দুর;

লিখে গেছেন পুরাণকর্তা
 “স্বয়ং; ভোলা খেতেন ভাঙ;”
 খেতেন তা, হয় ভোলা,
 কিম্বা পুরাণকর্তাই. সুতরাং;
 জানে শূদ্ধ সিদ্ধিঘোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর;
 বেশী খেলেই নেশায় ভোর;—
 আর অল্প খেলেই তাহা—
 —আর কি—বসে’ হাস্য কর
 —হাঃ হা হা হা হা—
 হোক্ না কেন, ফাঁকির,
 ভাবে ‘আমি রাজা বাহাদুর।’

প্রভু। দেখ—
 পারিষদবর্গ। দেখ দেখ—
 প্রভু। আমি প্রভুরাও—
 পারিষদবর্গ। [নির্জীবভাবে] ইনি প্রভু-
 রাও—
 প্রভু। সিরোহীর রাজা—
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—
 প্রভু। এই যথেষ্ট।
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] আবার চাও কি?
 প্রভু। তবে লোকে বলে কেন?
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] ঠিক্।
 প্রভু। বলে কেন যে “আমি কে? না রায়-
 মলের জামাই”—বলে কেন?
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] বলে কেন?
 প্রভু। বরং বলা উচিত যে, “রায়মল কে?
 না প্রভুরাওর শ্বশুর।”
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] প্রভুরাওর শ্বশুর।
 প্রভু।—দেখ সব পারিষদবর্গ! তোমরা সব
 বেজায় কুড়ে হয়ে’ যাচ্ছ! খোসামোদ কর্ণে
 তা’ও উৎসাহের সঙ্গ কর্তে পারো না? না,
 আমি যা বলছি, কুড়ের মত শূদ্ধ তাই ‘ইতি’
 করে’ যাচ্ছ।—ইতে আরাম হয় না।
 পারিষদবর্গ। ঠিক্! ইতে আরাম হয় না!
 প্রভু। দেখ, আমি এবার যে বিবাহ করেছি
 সে একেবারে চূড়ান্ত বাবা।
 পারিষদবর্গ। [কতকটা উৎসাহের সহিত]
 চূড়ান্ত বাবা, একেবারে চূড়ান্ত!
 প্রভু। সুন্দরী—একেবারে সাক্ষাৎ উর্ধ্বশী,
 কেবল নাচে না, এই যা!—
 পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—এই যা।
 নাচে না এই যা—
 প্রভু। আবার আমি বলছি যে ফের যদি

ঐ রকম ‘ইতি’ করে’, সেরে দেবার চেষ্টায় থাক,
 তা’ হলে’ পোষাবে না!—মনে রেখো!
 পারিষদবর্গ। [উৎসাহে] মনে রেখো।—
 পোষাবে না। মনে রেখো।
 প্রভু।—মেয়েটা একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী
 —সাক্ষাৎ!—
 পারিষদবর্গ—কেহ বলিল “সাক্ষাৎ” কেহ চুমকুড়ি
 দিল, কেহ বা অগভঙ্গী করিল
 প্রভু। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখলাম—
 কিন্তু আমার যমুনা একেবারে—
 পারিষদবর্গ অগভঙ্গী ইত্যাদি দ্বারা উৎকর্ষ
 প্রকাশ করিল
 প্রভু। দেখতে—কি রকম জানো?—যেন—
 যেন—না দেখলে ঠিক্ বোঝা যায় না।
 পারিষদবর্গ। তা ঠিক্! না দেখলে বোঝা
 যায় না।
 প্রভু। দেখবে। আচ্ছা তোমাদের দেখাচ্ছি।
 —এই প্রহরী!
 পারিষদবর্গ। প্রহরী! প্রহরী!
 প্রহরীস্বয়ং। [প্রবেশ করিয়া] মহারাজ!
 প্রভু। এক্ষণেই আমার রাণীকে এখানে
 নিয়ে আস।—হাঁ করে’ দাঁড়িয়ে রইলি যে!—
 যা!—
 ১ পারিষদ। [মহা উৎসাহে] যা না বোটা!
 প্রহরী। এখানে মহারাজ?
 প্রভু। এখানে বৈ কি! নইলে কি সেখানে!
 ২ পারিষদ। [তদ্রূপ]—নইলে কি
 সেখানে? হাঁঃ—
 প্রভু। বল্ রাজার হুকুম!
 ৩ পারিষদ। [তদ্রূপ] হাঁ হুকুম!
 [প্রহরীস্বয়ংর সবিম্বরে প্রস্থান।
 প্রভু। মেয়েটা কিন্তু আমার ভারি বাধ্য।
 পারিষদবর্গ। বেজায়!
 প্রভু। যেন—[অনেক ভাবিয়া] একেবারে
 যেন কুকুর!—
 পারিষদবর্গ। হাঁ ঠিক্ যেন কুকুর!
 প্রভু। আবার! দেখ, এ রকম কর্ত্তে
 পোষাবে না বলছি। পোষাবে না।
 পারিষদবর্গ। না না না। পোষাবে না।—
 বলছি—
 বৃদ্ধা দাসীর সহিত যমুনার প্রবেশ
 প্রভু। যমুনা এসেছো?

যমুনা। আমরা এখানে নিয়ে এলে কেন?
বৃন্দা। ওমা! সত্যিই ত! আমাদের এখানে
নিয়ে এলি কেন? বলি, ও দারোগা—বলি—
ও—

প্রভু। তুই বড়ী যা!

১ পারিষদ। হাঁ তুমি যাও বৃন্দে—

বৃন্দা। কেন? আমি যাবো কেন?

২ পারিষদ। এ সভায় তুমি কোন কাজে
লাগবে না বৃন্দে।

৩ পারিষদ। হাঁ বৃন্দে। বৃন্দস্য বচনং
গ্রাহ্যমাপৎকাল হ্যাপস্থিত বটে। কিন্তু সর্ব-
ত্রৈব এ রকম বিচারে তু চলবে না ত বাবা!

প্রভু। মূখের ঘোমটা খোল ত সোনার
চাঁদ!—[স্বহস্তে যমুনার অবগদুষ্ঠন উন্মোচন]
বলি, দেখছো চেহারা খানা?—যমুনা!—
প্রাণেশ্বর! একবার আমার পাশে দাঁড়াও ত
সোনার চাঁদ! একবার এরা সব দেখুক যে কি
রকম মানায়।

বৃন্দা। এরা কারা?

প্রভু। এরা যারাই হোক, তোর কি? বেরো
এখেন থেকে।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] বেরো বেটী!

যমুনা। আমাকে এখেন থেকে নিয়ে চল!

বৃন্দা। সত্যিই ত! এখানে নিয়ে এলি
কেন? বলি ও—পোড়ারমুখো—[প্রহরীকে
ধাক্কা দিল]

প্রহরী। আঃ ধাক্কা দাও কেন?

প্রভু। যমুনা! একবার আমার পাশে এক-
বার দাঁড়াও না।—তা নৈলে যেতে দেবো না।

বৃন্দা। আচ্ছা একবার বাঁয়ে দাঁড়া বাছা!
নৈলে ত ছাড়বে না!

যমুনা বৃন্দার বাক্যবৎ প্রভুরাওর বাম পার্শ্ব
দাঁড়াইলেন

প্রভু। [পারিষদবর্গকে] কেমন মানিয়েছে
বল না!

পারিষদবর্গ। বাহবা কি মানিয়েছে—

গীত

(আহা কিবা মানিয়েছে রে—ওহো কিবা মানিয়েছে।)

১

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,

যেন কুঙ্কের পাশে বলরাম;

(রক্তের কুঞ্জবনে)

যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি;

আর টম্পার সুরে হরিনাম।

(বাহবা রে বাহবা)

২

যেন কাঁপির সঙ্গে মটর সঁটী

যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম;

(বৈশাখ চৈত্র মাসে)

যেন মৃদুর সঙ্গে পাঁপির ভাজা,

আর মদের সঙ্গে হরিনাম

(বাহবা রে বাহবা)

৩

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসুচিকা,

যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম;

(ও সেই স্বাপরযুগে)

যেন বিয়ের সঙ্গে রসন চৌকি,

আর মরণকালে হরিনাম।

(বাহবা রে বাহবা)

[গাইতে গাইতে নিষ্কান্ত।

[সর্বাগ্রে প্রভুরাও, যমুনা ও বৃন্দা; তৎপশ্চাতে
পারিষদবর্গ গাইতে গাইতে নিষ্কান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরগৃহ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি।
শয্যায় শয়ান—রাণা। পার্শ্ব বসিয়া—সঙ্গ, পৃথবী
ও জয়মল

রাণ। কত রাত্রি সঙ্গ?

সঙ্গ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

রাণ। তবু তিনজনে বসে আছ!—এত রাত্রি!

ঘুমাওগে; যাও পৃথবী, যাও জয়মল,

ঘুমাও গে, কত আর রবে রাত্রি জাগি।

তোমরা সবাই সম পিতৃভক্ত,—জানি।

সঙ্গ বসে থাক; যবে অতি ক্লান্ত তুমি,

পাঠায়ো, পৃথবীরে, কিম্বা জয়মলে।—

ও কি!

তবু বসে?

পৃথবী। পিতৃদেব। শ্রান্ত নহি আমি।

জয়। জীর্ণ রুদ্র শয্যাগত পিতৃদেবে ছাড়ি'

আসে কি নয়নে নিদ্রা?

রাণ।

ধন্য পিতৃভক্তি!

শুরতান বলিত যে “বিশ্বে দয়া মায়া—

কিছু নাই। সব ধনুর্ভ—নিজ কার্যে ফিরে।”

বৃদ্ধিলাহি শুরতান মিথ্যা বলেছিল।

জয়মল—জল, [জলপান] বাড়ে শীত!

বাড়ে শীত!

একি জ্বর! ডাক বৈদ্যে সঙ্গ!—না না থাক।
কাজ নাই ঔষধে। ঔষধে—কাজ নাই।—
ঔষধে সারায় ব্যাধি? খাব না ঔষধ!
খাব না ঔষধ! এ কি দাহ! একি জ্বালা!
পৃথবী—জল;—সঙ্গ! না না থাক—না না
থাক
—চক্ষু নিদ্রা আসে। অবসন্ন হয় দেহ!
এ কি মৃত্যু!—এত স্নিগ্ধ! এত স্নমধুর!
এ যে বিষাদের মত আলিঙ্গন করে।
এই তন্ত দেহ।—ঘুম আসে। [নিদ্রা]
পৃথবী। [বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া] জয়মল!
মহানিদ্রাগত বৃদ্ধ পিতা। দেখ দেখি!
সঙ্গ। ডাকিব কি বৈদ্যে?
জয়। না না কাজ নাই। আমি
জানি কিছু নাড়ী বিদ্যা।
সঙ্গ। দেখ দেখি নাড়ী।
জয়। [নাড়ী দেখিয়া] সত্য, পৃথবী, নাড়ী
নাই।
পৃথবী। বলিয়াছ ঠিক!
জয়। এ যে অঙ্গ শিলাসম—হিম;—মৃত্যু বটে।
সঙ্গ। নিঃশ্বাস বহিছে?
জয়। কোথা নিঃশ্বাস বহিছে?
সব স্তব্ধ।
পৃথবী। কি করিবে?
জয়। বৃদ্ধিব কি তবে।
রাণা সঙ্গ?
পৃথবী। সেই রাণা যার তরবারি
সমধিক শক্তি ধরে। হোক সপ্রমাণ—
তাহা এইক্ষণে।—সঙ্গ! লও তরবারি।
সঙ্গ। পৃথবী! ক্ষিপ্ত হইয়াছ?
পৃথবী —লও তরবারি
—হোক স্থির এক্ষণে, কে মেবারের রাণা।
সঙ্গ। আমি রাজ্য চাহিনাক।
পৃথবী। রাজ্য চাহোনাক!
শূন্যে চাহি না স্তোকবাক্য।—মিথ্যা কথা!
রাজ্য চাহোনাক বটে?—লও তরবারি।
সঙ্গ। পৃথবী। সত্য বলিতেছি, রাজ্য চাহিনাক।
তমি ভোগ কর রাজ্য, কিম্বা জয়মল।
পৃথবী। মনে নাই চারণীর ভবিষ্যৎ বাণী?—
“সঙ্গ মেবারের রাণা!”—আমি বলিয়াছি
“রাজ্য হবে পৃথবীর।”—পরীক্ষা করিব
দৈববাণী বড় কিম্বা বাহুবল বড়।

—লও তরবারি! আজি হবে এই ভূমি
তব রক্তে কিম্বা মম রক্তে বিরঞ্জিত।
সঙ্গ। কি? পিতার মৃতদেহ উপরে করিব
যুদ্ধ ভূমিখণ্ড জন্য?—ক্ষান্ত হও ভাই!
চাহিনাক রাজ্য। পৃথবী! এ রাজ্য তোমার!
—করি এ শপথ, আমি রাজ্য চাহিনাক।
পৃথবী। শূন্যে চাহি না কথা; খোল
তরবারি।

পৃথবী তরবারি লইয়া সঙ্গকে আক্রমণ
করিলেন, সঙ্গ তরবারি খুলিয়া আত্মরক্ষা
করিতে লাগিলেন

সঙ্গ। ক্ষান্ত হও পৃথবী।—আমি করি
অনুরোধ।
পৃথবী। হা ভীরু! মরিতে এত ভয়! এত ভয়!
সবারই ত একদিন আছে।—এত ভয়!
যুদ্ধ কর—রক্ষা নাই। [পুনরাক্রমণ]
সঙ্গ। [চক্ষু আহত] ক্ষান্ত হও, আমি
বিষম আহত।
পৃথবী যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর:
ছাড়িব না জীবিত তোমারে।
উভয়ের যুদ্ধ
সূর্য্যমঙ্গের প্রবেশ

সূর্য্য। একি! একি!
ভ্রাতৃস্বন্দর রুগ্নপিতৃশয়নমন্দিরে!!!
ক্ষান্ত হও পৃথবী! [উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন]
পৃথবী। ওকি—উঠিয়া বসেছে
শব।
রায়। শব নহি। এখনও মরি নাই।
এরি মধ্যে শৃগাল কি শকুনির মত
শব নিয়ে, কাড়াকাড়ি?—পিতৃভক্তি বটে!
এ কি দৃঃস্বপ্ন না সত্য! পৃথবী! জয়মল!
সঙ্গ!—একি! এত শীঘ্র? মূহুর্ত্ত বিলম্ব
সহিল না জনকের করিতে সংকার?
সামান্য দরিদ্র হইন মূর্খ কৃষকের
এর চেয়ে শীলতার জ্ঞান আছে।—ধিক!
[দীর্ঘশ্বাস সহ]—পিতা সব মূর্খ।
সমস্ত জীবন ধরি'
অনশনে অনিদ্রায়, সদা লালায়িত
সন্তানের সুখ হেতু,—চেয়েও দেখে না
সন্তান পিতার প্রতি, দৃঃখে কি বিপদে;
করে ব্যয় সূখে, বাহা দীর্ঘ অনশনে

অনিদ্রায়, করে পিতা সগুণ!—হা ষিক!
 জয়মল! পৃথদী! সগুণ! একি—
 জয়। কারি নাই
 দ্বন্দ্ব আমি, পিতা।
 রায়। সত্য কথা! সত্য কথা!
 তুমি দ্বন্দ্ব কর নাই। কিন্তু পৃথদী!—তুমি!
 পৃথদী। অপরাধ করিয়াছি, পিতা ক্ষমা কর!
 রায়। অপরাধ করিয়াছ শূন্য?—গুরুতর
 অপরাধ: বদ্ব নাই, কত গুরুতর।
 পৃথদী। বদ্বিয়াছি। পিতা, ধরি চরণে তোমার।
 —চাহি এ মাৰ্জ্জনাভিক্ষা অনুতপ্ত আমি।
 রায়। এইরূপ চিরদিন ব্যবহার তব।
 সেদিন উঠায়েছিলে অসি, শূন্যিয়াছি,
 জয়মল বিপক্ষে। প্রাসাদে করিয়াছি
 দস্যুর গহবর; তব রূচ আচরণে।
 নিব্বাসিত করিলাম তোমারে এক্ষণে
 মেবারের রাজ্য হ'তে।—যথা ইচ্ছা যাও।
 কর রাজ্য সংস্থাপিত নিজ অসিবলে।
 চলে যাও রাজ্য ছাড়ি।
 সূর্য্য। শূন্য মহারাজ!—
 রায়। স্তম্ভ হও সূর্য্যমল! অনন্য কঠিন—
 নির্যাতন মর্ত, জানো, আদেশ আমার
 চিরদিন। পৃথদী এ মূৰ্খদেহে দূর হও।
 [পৃথদীর অবনতিশবে প্রস্থান।]
 সূর্য্য। সগুণ! জানিতাম তুমি
 ধীর, স্থির, শান্ত। শেষে উন্মত্ত তুমিও?
 রায়। স্তম্ভ হও সূর্য্য। সগুণ বদ্বাউক্ আজি
 তার নিজ ব্যবহার।—নিস্তম্ভ তথাপি?
 কিছ্ কহিবার নাই?
 সগুণ। পিতা কিছ্ নাই
 বক্তব্য আমার।
 সূর্য্য। [সাস্চর্য্যে] সগুণ।
 রায়। সগুণ! বদ্বিয়াছি।
 এতদিন যে আদরে করেছি পোষণ,
 ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি; অথবা অধম
 তার চেয়ে,—পদ্বিয়াছি সর্পে দগ্ধ দিয়া,
 আপনার বক্ষে।—ইহা উত্তম। উত্তম!
 দুই পুত্র রূপনিপত্শয্যাপার্শ্বে বসি'
 অপেক্ষা করিতেছিল তাহার মৃত্যুর।
 করি' তারে মৃত অনন্মন, এ কিরীট
 লইয়া করিতেছিলে বিগ্রহ বিবাদ,
 রূপনিপত্শকক্ষে।—এই প্রতিদান বটে!

ভাবিয়াছ যদি এ আমার ভালবাসা
 দিবে প্রক্ষালিয়া সর্ব্ব কালিমা তোমার;
 দিবে ঢাকি' সর্ব্বক্ষত; করিতে মাৰ্জ্জনা
 সর্ব্ব অপরাধ;—তবে বদ্বিয়াছ ভ্রম।
 ভালবাসা বর্ষে সিন্ধ জলধারা বটে!
 তাহাই আবার কিন্তু উদ্গারে বিদ্যুৎ'
 শোন সগুণ—তুমি এই রাজ্য নাহি পাবে।
 রাজা হবে জয়মল। সূর্য্য!—এ সংবাদ
 প্রচার করিয়া দাও রাজ্যের ভিতর।

পুনরায় শয়ন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার অন্তঃপুর। কাল—আগতপ্রায় মধ্যাহ্ন।
 অর্ধশয়ন—রাণা। সম্মুখে সূর্য্যমল
 রায়মল। পাও নাই সন্ধান সগুণের?
 সূর্য্য। পাই নাই—
 এক্ষণে আমার হস্তে দিল ভৃত্য আনি'
 পত্র এক। লিখিয়াছে সগুণ মহারাজে।
 রায়। দেখি পত্র [পাঠ] পড় মন্ত্রী!—পড়িতে
 না পারি।
 ক্ষৌণ্ডদৃষ্টি আমি।
 সূর্য্য। যথা আজ্ঞা, মহারাজ। [পত্র পাঠ]
 লিখিয়াছে সগুণ—পিতা প্রণাম চরণে
 কোটি কোটি। জানি মহারাজের বিশ্বাস—
 “আমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী—আমি রাজ্যের কারণে
 করিয়াছিলাম যুদ্ধ সেই রাত্রিকালে
 রূপনিপত্শকক্ষে পিতৃশয়নমন্দিরে।”
 “করিতেছি বিদ্রোহমন্ত্রণা, সৈন্যদলে
 উৎকোচ দিতেছি;” কহিয়াছে জয়মল।
 চলিলাম রাজ্য ছাড়ি।—“রাজ্য চাহিনাক”
 কহিয়াছি বহুবার—পিতার বিশ্বাস
 হয় নাই সেই বাক্যে; অদ্য, আশা করি—
 হইবে বিশ্বাস।—পূজ্য পিতৃব্য! যদিপি
 করিয়াছি অপরাধ তোমার চরণে
 কভু—অদ্য ভিক্ষা চাহি—করিও মাৰ্জ্জনা।
 —ভাই জয়মল! আজ হ'ল দ্বন্দ্বীভূত
 তোমার আপদ, পথে কণ্টক তোমার।
 রায়। এ উত্তম! সূর্য্য! এ উত্তম প্রতিদান!
 ঈশ্বর! শত্রুর যেন পুত্র নাহি হয়!

—যাক। যাহা হইবার হইয়াছে।—যাক
বন্ধ কর দ্বার! অত্যাশ্রম!—যাও ভাই।
শ্রান্ত আমি।—কিছদক্ষণ ঘুমাইতে চাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদ্যোত। কাল—প্রাতঃ।

শূরতান ও রাণী

শূর। রাণী! তারা কোথায়?

রাণী। গিয়াছে মৃগয়ায়
শিকারীদের সঙ্গে।

শূর। আশ্চর্য্য বালিকা—

রাণী। বালিকা নহে সে আর। সে পূর্ণ
যুবতী।

অন্বেষণ কর পাত্র।

শূর। কোথা পাত্র রাণী?

রাণী। চিরদিন উদাসীন সর্ব্ব কস্মৈ তুমি।

শূর। “উদাসীন”?—পৃথিবীতে, বাধা বিপত্তির
মাঝখানে উদাসীন্য প্রকৃত সন্ধান।

রাণী। কিরূপ?

শূর। “কিরূপ”?—যদি কার্য্য নাহি কর,
ভ্রম হইবার কোন নাহি সম্ভাবনা।

কার্য্য যদি কর, ভ্রম হইতেও পারে।

রাণী। এ যুক্তি বুদ্ধিতে নাহি পারি।

শূর। নাহি পারো?

—তবে শোন।—পৃথিবীতে চারিদিক হ’তে

প্রতিকূল, অনুকূল কিম্বা সমকূল—

শক্তিপূঞ্জ, ক্রমাগত ঘেরিয়া তোমারে,

করিতেছে সম্প্রেষণ সংঘর্ষণ, সদা,

পরস্পরে। তুমি তা’র মধ্যস্থলে বসি’

কেন্দ্রসম থাক যদি কোন ভয় নাই:

কেন্দ্রের বাহির যথা হইয়াছ, তথা

গিয়াছ,—ঘুরিয়া মর আবর্তের সনে।

রাণী। কিরূপ?

শূর। কিরূপ জানো? দুই পত্নী যা’র

নিয়ত সপত্নীদ্বয় করিবে কলহ:

দাঁড়াইয়া দেখ যদি, নাহি কোন ভয়

যোগ দাও যদি, মহা বিপদ নিশ্চয়।

রাণী। হায় ধিক! নিরুদাম বসিয়া রহিবে

সচল বিশ্বের মাঝে ‘জডজীবসম’?

শূর।—তদুপরী আমি করি বিশ্বাস অন্তরে—

যাহা হইবার তাহা হইবেই: কেহ

অন্যথা করিতে নাহি পারে, প্রিয়তমে।
রাণী। এ উত্তম যুক্তি!—তবে বসি’ নিরুদ্বিগে
রহ কার্য্যশূন্য—

শূর। —কি না যতদূর পারো।

বৃথা শক্তি ব্যয় কেন? বরং সপ্তয়,

কর শক্তি বসে’ বসে’।

রাণী। কি হেতু সপ্তয়

যদি ব্যয় কভু নাহি করিবে?

শূর। প্রেয়সী!

দর্শন-শাস্ত্রের তত্ত্ব তত সোজা নয়

যত সোজা ভাবো। ইহা নারীর মস্তিস্কে

প্রবেশ করে না শীঘ্র। কিছদ শিক্ষা চাই।

রাণী। জানি না দর্শনশাস্ত্র। জানিতে

চাই না।

সশস্ত্রে পুরুষবেশিনী তারার প্রবেশ

তারা। পিতা দেখিয়াছ?

শূর। কি দেখিব?

তারা। ব্যাঘ্রশিশু।

শূর। কে আনিল ব্যাঘ্রশিশু?

তারা। সবলে ছিনিয়া—

নিবিড় গহন মধ্যে, ব্যাঘ্রের বিবর

হইতে, এনেছি তারে, আমরা শিকারী।

শূর। আনিয়াছ যদি, মহা ভ্রম করিয়াছ।

এক্ষণ আসিবে ব্যাঘ্রী তাহার সন্ধানে।

শাস্ত্রে কহে হতশাবা ব্যাঘ্রী ভয়ঙ্করী;

নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে; ভ্রমে সন্নিহিত

প্রান্তরে, উন্মত্তবৎ। এক্ষণ আসিবে:

হয়ত বা আসিয়াছে দ্বারে এতক্ষণে।

তারা। আসে যদি কিবা ভয়: করিব সংহার

ভুজবলে।

শূর। বলা যায় অবলীলাক্রমে

সংসারে অনেক কথা: করা শক্ত তাহা।

ব্যাঘ্রীর সহিত যুদ্ধ?

তারা। ব্যাঘ্রী কি করিবে?

শূর। ব্যাঘ্রী যদিও তার ধাতুর হিসাবে

ঘৃণ করিবার কথা: কিন্তু সে কার্য্যতঃ

তাহার অধিক করে। জন-পরম্পরা

শূনেছিও ব্যাঘ্রজাতির সর্ব্বমাংস চেয়ে

নরমাংস-প্রিয়!

তারা। [হাসিয়া] পিতা! থাকিতে নিকটে

আমরা, তোমার ভয় নাই। দেখ এসো।

শূর। কি দেখিব? ব্যাঘ্রশিশু আকারে সম্ভব
ব্যাঘ্রের মতই; শূরধ্ব ক্ষুদ্র আয়তনে।
অনুমান করিতেছি।—আর এক কথা
তারা, তুমি নারী। এই পুরুষের বেশ,
এই পুরুষের কার্য্য শোভা নাহি পায়।
রাণী। শতবার শোভা পায়, পুরুষ যখন
ছাড়িয়াছে পুরুষের কার্য্য! নারীসম
পুরুষ যখন সর্ব্বকর্মে, ব্যবহারে,—
শূরধ্ব লজ্জাহীন। আর পুরুষ যখন
নর্তাশিরে সহৈ পৃষ্ঠে শত্রু-পদাঘাত।
শূর। রাণি! এই ক্রোধ এই অদ্ভুত বক্তৃতা
হইত বিস্ময়কর: তবে কি না তুমি
পড় নাই ন্যায়শাস্ত্র।

তারা। দেখিবে না তবে

ব্যাঘ্রশিশু পিতা?

রাণী। এস, মা, আমি দেখিব।

[রাণী ও তারার প্রস্থান।

শূর। অতীব বিস্ময়কর চরিত্র নারীর।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ন।

ছদ্মবেশী সঙ্গ ও তারা

তারা। আচ্ছা, ব্যাহ ভেদ করার চেয়ে তা
থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

সঙ্গ। পৃথিবীতে সব জিনিষেই তাই।
তর্কে যুক্তিজাল খণ্ডন করা শক্ত নয়, কিন্তু
জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসা শক্ত। প্রেমে ও—

তারা। না আমি প্রেমের কথা শুনতে
চাইনে। ও বাতুলের স্বপ্ন। আচ্ছা মোহিত সিং,
মেঘনাদ কি সত্যসত্যই মেঘের অন্তরাল থেকে
যুদ্ধ কর্ত?

সঙ্গ। ওটা রূপক।

তারা। রাবণের দশমুণ্ডও রূপক?

সঙ্গ। রূপক বৈ কি।

তারা। তবে রাবণও রূপক?

সঙ্গ। রাবণ রূপক হ'তে যাবে কেন?

তারা। বলি হ'তেও ত পারে। রামায়ণের
ঋনিকটা যখন রূপক বলে মেনে নিলাম, তখন
বাকিটুকু রূপক হ'তে পারে না কেন?

সঙ্গ। না তারা! ও যুক্তি ঠিক নয়।
রামায়ণ সত্য। তবে তার ষেটুকু মনুষ্যের

বিশ্বাসের অতীত, তা হয় রূপক, না হয়
কাব্যলঙ্কার বলে ধর্তে হবে।

তারা। কেন ধর্তে হবে? হয় সমস্তই
রাখবো, নয় সমস্তটাই ছাড়বো।

সঙ্গ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, সম্বন্ধে অনেক
অলীক প্রবাদ আছে: তাই বলে কি তাঁরাই
ছিলেন না বলে মানতে হবে?

তারা। [ভাবিয়া] মোহিত সিং! তুমি কত
জানো। তোমার সঙ্গে খানিক কথা কৈলে কতই
শিখতে পারা যায়।

সঙ্গ [নীরব।

তারা। তার উপরে এমন নয়। তাই বাবা
তোমায় এত ভালবাসেন।

সঙ্গ। কেবল তোমার বাবাই ভালবাসেন?

রাণীর প্রবেশ

রাণী। তারা! তোমার বাবা তোমাকে
ডাকছেন।

[তারার প্রস্থান।

রাণী। মোহিত সিং, তুমি মেবারের রাজ-
পুত্র জয়মলকে চেনো?

সঙ্গ। চিন্তাম।

রাণী। তিনি কি মেবাররাজ্যের ভাবী
উত্তরাধিকারী?

সঙ্গ। সেইরূপ শুনোছি।

রাণী। তিনি তারার উপযুক্ত পাত্র বলে
বোধ হয় কি?

সঙ্গ। [চমকিয়া] কি?—না, জানি না!—
হবে।

রাণী। মোহিত সিং! তারার উপযুক্ত পাত্র
পাই না। শূরগালের সঙ্গে সিংহিনীকে বেধে
দিতে পারিনে। তার যোগ্যপাত্র এক মেবারের
যুবরাজ। তারা সমস্ত রাজপুত্রনার মধ্যে
এক চিতোরেরই রাণী হ'বার যোগ্য!—কি
বল?

সঙ্গ। নিঃসন্দেহ।

রাণী। চিতোরের রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র সংগ্রাম
সিং ত নিরুদ্দেশ। মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাও
নির্ব্বাসিত; সুতরাং জয়মলই তারার উপযুক্ত
পাত্র।

সঙ্গ। [স্বগত] এখানেও জয়মল আমার
বিবাদী?

রাণী। তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? মোহিত
সিং কি ভাবছো?

সঙ্গ। আপনি যা বলছেন তাই বোধ হয়
ঠিক।

রাণী। তুমি যদি তারাকে রাজী কর্তে
পারো; সে বিবাহ কর্তে রাজী হয় না। তোমাকে
শ্রম্বা করে, তোমার কথা শুনবে বোধ হয়।

সঙ্গ। [স্বগত] এত শ্রম্বা করে [প্রকাশ্যে]
জয়মল বিবাহ কর্তে রাজী?

রাণী। তিনি সম্পূর্ণ রাজী। তিনি তারার
পাণিগ্রহণেচ্ছায় এখানে এক সপ্তাহের মধ্যে
আসছেন—চমকালে যে?

সঙ্গ। না।

রাণী। আমি তা'কে নিমন্ত্রণ করেছি।
তারাকে বোঝালে সে-ও রাজী হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

সঙ্গ। শেষে জয়মল-শিরে এ রত্ন? ইহার
মূল্য কি বন্ধিবে জয়মল!—কিম্বা এই
দেবীর চরিত্র যদি পাঠকের মত
পবিত্র করিতে পারে সংস্পর্শে তাহারে।
—তাই হোক—আমি ত্যাগ করিব দুরাশা।
স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ি' আমি বনবাসী,
নিঃসম্পদ,—আর তারা রাজার দাহিতা
যোগ্য হইবার রাজমহিষী!—আমায়
যদি শ্রম্বা করে তারা—তার স্বীয় গুণে;
আমি রহিব না বিঘ্ন তাহার সম্পদে।
হোক তারা মেবারের রাণী—আর আমি!
আসিয়াছিলাম কোন ঘটনার স্রোতে
তৃণসম ভাসি' নন্দনের উপকূলে,
কুসুমিত বল্লরীর শাখায় জড়িয়ে
ছিলাম মৃদুস্বকাল—ঘটনার স্রোতে
আবার ভাসিয়া যাই।—

তারার প্রবেশ

তারা। মোহিত! মোহিত!

সঙ্গ। আসিয়াছ তারা?

তারা। আসিয়াছি। এতক্ষণ
কহিতোছিলেন মাতা কি গুঢ় সংবাদ
তোমা'র মোহিত?

সঙ্গ। [তারার হস্ত ধরিয়া] তারা!

তারা। কি মোহিত! একি!

সহসা গদগদস্বর!—

সঙ্গ। [হস্ত ছাড়িয়া] ক্ষমা কর। তারা
কল্য যাইতোছি আমি দূর দেশে।

তারা। সে কি? বহুদূর দেশে? কোথায়?

সঙ্গ। জানি না—

যে দিকে এ চক্ষু যায়।

তারা। কি হেতু মোহিত?

সঙ্গ। হেতু?—সুখী হও তারা! করিও না তুমি
জিজ্ঞাসা, “কি হেতু”?

তারা। এ কি প্রহেলিকা?—[সন্দেহে] বল
মাতা—হন নাই রুঢ়?

সঙ্গ। অসম্ভব।

তারা। তবে?

সঙ্গ। বলিয়াছি করিও না জিজ্ঞাসা “কি হেতু”
—যাইবার পূর্বে এক নিবেদন আছে।

রাখিবে মিনতি?

তারা। অত্যাশ্রম পরিহাস!

সঙ্গ। পরিহাস নহে তারা। তোমার মাতার
ইচ্ছা যে বিবাহ কর তুমি।

তারা। যাদু'কর!

ও ঝড়ালর মধ্যে আরো কিছ' আছে নাকি?
দেখিতে প্রস্তুত আছি।—বিবাহ?—

কাহাকে?

সঙ্গ। শুনিয়াছ “জয়মল” না? মেবারের
ভাবী অধিপতি?

তারা। শুনি, তাহারে কি হেতু?

সঙ্গ। যোগ্য হইবারে তুমি মেবারের রাণী;—
শোভে না এ সমুজ্জ্বল হীরককিরীট
নৃপতির শিরে ভিন্ন।

তারা। মানি, শ্রম্বা করি

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম, আমি তোমা'র মোহিত;—
মানিতে পারি না কিন্তু, বলি দিতে হবে
মেবাররাজ্যপদে জীবন আমার।

মেবাররাজ্য ছার!—করি পদাঘাত
ইন্দ্রপুত্রী—কিম্বা অলকায়।—আমি তারা
বিবাহ করিব তুচ্ছ কাণ্ডের লোভে?

সঙ্গ। দেখিয়াছ জয়মলে?

তারা। দেখিতে চাই না,—

মোহিত! মোহিত সিংহ!—ইহা সত্য বটে
শিক্ষা করি শাস্ত্রবিদ্যা তোমার নিকটে;

এ বিষয়ে উপদেশ দিবার তোমার

দিই নাই অধিকার। তারার বিবাহ

তারার অনিচ্ছা ইচ্ছা। [সগর্বে প্রস্থান।

সঙ্গ। [পদচারণসহ] তারা,—যদি তুমি জানিতে কি যুদ্ধ করিয়াছি এতক্ষণ; আপনার সঙ্গে আমি, করিতে এক্ষণে অপ্রিয় প্রস্তাব এই?—অথবা আমার কি স্বত্ব তাহারে দিতে এই উপদেশ, অর্থাৎ?—[ভাবিয়া] কেন পাই ব্যথা এ অন্তরে করিয়াছি? এ প্রস্তাব—অর্থাৎ যদি—তারার স্নেহের হেতু।

তারার পুনঃপ্রবেশ

তারা। মোহিত! মোহিত!
আমারে মার্জনা কর।

সঙ্গ। কেন রাজকন্যা?

তারা। হইয়াছি রূঢ় আমি!

সঙ্গ। কিবা যায় আসে?
ভৎসনা করিতে ভৃত্যে আছে চিরদিন
অধিকার প্রভুর।

তারা। মার্জনা কর। আমি
নারী মাত্র।—

[সলজ্জভাবে প্রস্থান।

সঙ্গ। বৃদ্ধিয়াছি। বৃদ্ধিয়াছি তারা,
ওই আরম্ভিত গণ্ড লজ্জায়।—না তারা।
তাহা হইবার নহে। করিব না আমি
তোমারে অসুখী কভু। রহিব না আমি
আর তব চরণে জড়ায়ে! সুখী হও!
করিয়াছি “ত্যাগ” ব্রত, ভাঙিব না তাহা।
যেইরূপ অনায়াসে রাজ্য ছাড়িয়াছি,
ছাড়িব এ নারীরত্ন! যায় যাক্ প্রাণ।—
আর রহিব না হেথা—বড়ই অধিক
প্রলোভন; এ হৃদয় অতীব দুর্বল।
চলিলাম এইক্ষণে।—নাহিক সাহস
বিদায় লইতে। তারা! চলিলাম তবে।
উদ্দেশে তোমারে এই আশীর্বাদ করি
“সুখী হও। প্রার্থীক! বৎসে! সুখী
হও।”

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সরাই। কাল—রাত্রি।

বর্গিক ও অর্তিধর্ম্বর

১ অর্তিধর্ম্বর। তবে এ রাজ্য কার?

বর্গিক। আপাততঃ কারুরই নয়। মীনেরা

আরাবল্লীর পার্শ্বত্যাগ প্রদেশ হ'তে নেমে দেশে
যা পায় লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। রাজপুত্রেরা
এদেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড়
পিপড়েয় খায়।

১ অর্তিধর্ম্বর। রাজপুত্রদের কেউ মানে না
কেন?

বর্গিক। তা'দের একজন নেতার অভাব।
সকলেই স্বস্ব প্রধান তা'দের শক্তি গুছিয়ে
একত্রিত করে, এই রকম একটা লোক চাই।

১ অর্তিধর্ম্বর। রাজপুত্রদের সৈন্য নাই?

বর্গিক। থাকবে না কেন? তাঁরা নাড়ালের
দুর্গে বসে' নিরদ্বন্দ্বেরে নাসিকাধর্মন সহ নিদ্রা
যাচ্ছেন। তাঁদের নাকের সামনে মীনের দলপতি
রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে রাজত্ব কচ্ছে, অথচ তাঁরা
যেন দেখতেই পাচ্ছেন না।

২ অর্তিধর্ম্বর। [সভয়ে] ও বাবা! তবে ত
কালই এখান থেকে পাততাড়ি গুটতে হচ্ছে।

১ অর্তিধর্ম্বর। তা আর বলে'

পৃথ্বীর প্রবেশ

বর্গিক। এ আবার কে? রাজপুত্র দেখছি।
পৃথ্বী। তোমরা কারা?

১ অর্তিধর্ম্বর। আমরা আবার কারা? আমরা
হঁচ্ছ আমরা!

পৃথ্বী। [অর্তিধর্ম্বরকে] মহাশয় এটা কি
সরাই?

২ অর্তিধর্ম্বর। [অনুকৃতস্বরে] হাঁগো দাদা
সরাই।

পৃথ্বী। গৃহকর্তা কোথায়?

১ অর্তিধর্ম্বর। কেন?

২ অর্তিধর্ম্বর। এই ধর না আমিই গৃহকর্তা।

পৃথ্বী। এ পরিহাস করবার সময় নয়।
শীঘ্র বল; নহিলে—[তরবারি নিষ্কাশন]

১ অর্তিধর্ম্বর। এ—এ আবার কি প্রকার?

২ অর্তিধর্ম্বর। এ—এর ত কোন কথা ছিল
না।

বর্গিক। মহাশয় স্থির হ'ন। গৃহকর্তা
এখনি আসছেন। রাজ্য অরাজক বটে, কিন্তু
এত অরাজক নয় যে, আপনি যখন ইচ্ছা যাব
তা'র মনুটো কেটে ফেলতে পারেন।

পৃথ্বী। না মহাশয় মাফ করবেন।

তরবারি পিধানবন্ধ করিলেন

বর্ণিক। এই যে গৃহকর্তা এসেছেন।

গৃহকর্তার প্রবেশ

বর্ণিক। ইনিই গৃহকর্তা।

১ অতিথি। [গৃহকর্তাকে] মশায়! ইনি এখনই আপনার খোঁজ করছিলেন।

গৃহকর্তা। [পৃথ্বীকে] আপনি কি চান?

২ অতিথি। আপাততঃ চাচ্ছিলেন ত আমার এই মৃগুটো। যেন বেওয়ারিশী মাল আর কি! ঈঃ!

পৃথ্বী। আমরা আজ এখানে থাকবো।

গৃহকর্তা। তা বেশ! থাকুন না।—কয় জন?

পৃথ্বী। আমি আর পাঁচ জন।

গৃহকর্তা। তা বেশ! থাকুন না। আহারের কি আয়োজন কর্ব?

পৃথ্বী। আমার কাছে, কিন্তু এক কপর্দকও নাই।

গৃহকর্তা। তাই ত! সে ত শূভবাস্তা নয়। আপনার চেহারাখানি নেহাৎই মন্দ নয়। তবে শূদ্ধ এ চেহারাখানি দেখে, এ সহরে যে কেউ বসদ জোগাবে, তা ত বোধ হয় না।

পৃথ্বী। এখানে কেউ বর্ণিক আছেন?

বর্ণিক। কেন?

পৃথ্বী। এই হীরার আংটিটি বেচবো।

বর্ণিক। দেখি [দেখিয়া চমকিয়া] বুদ্ধোচ্ছ, আপনি কি—

পৃথ্বী। [সগর্বে] আমি পৃথ্বী। আমি নাড়োলে বাস কর্তে এসেছি।

বর্ণিক। উত্তম! নাড়োল আজ সরাজক হ'ল। [গৃহকর্তাকে] ইহাদের জন্য যথাদেশ সর্বেসংকষ্ট প্রকোষ্ঠ বাসস্থানের জন্য দাও। সর্বেসংকষ্ট খাদ্যের আয়োজন কর। মূল্য আমি দিব।

গৃহকর্তা। [সবিস্ময়ে] তাই ত! [পৃথ্বীকে] আসুন মশায়; আপনার সঙ্গীরা কি বাইরে!

পৃথ্বী। আজ্ঞা।

গৃহকর্তা। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

বর্ণিক। ইনি মেবারের রাজপুত্র পৃথ্বী-রাও।

২ অতিথি। [সচকিতে] বলেন কি? ইনি!!!

১ অতিথি। তাই অত রুদ্ধ মেজাজ, না?

বর্ণিক। এ'র মত বীর অদ্যাবধি রাজপুতানায়ে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি একবার একা শতাধিক যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ী হয়েছিলেন।

১ অতিথি। [চমক্ বিস্ফারিত করিয়া] বটে!!!

২ অতিথি। আগে বলতে হয়। চল চল দেখি। লোকটাকে ভালো করে দেখে নেওয়া যাক্। ভালো করে দেখা হয়নি!

১ অতিথি। চল চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বর্ণিক। এ'র দ্বারা কার্য উদ্ধার হবে। না, ডাল আবার রাজপুতের হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ন।

বৃক্ষতলে অশ্বাবরুঢ় জয়মল ও বৃক্ষকাণ্ডে ন্যস্তদেহা তারা

তারা। শুনিয়াছি যুবরাজ! সেই এক কথা—

—‘ভালোবাসি’ ‘ভালোবাসি’—একশতবার

শুনিয়াছি। পচিয়া গিয়াছে সেই বাণী:

ঘৃণা জন্মিয়াছে। আর শুনিতে চাই না।

জয়। শুনিতে হইবে! তারা! আমি ভালোবাসি।

তারা। ভালোবাসো নাহি বাসো, কার্ যায়

আসে?

জয়। কার যায় আসে! তারা! সত্য কি এ কথা?

সত্য কি, কিছই যায় আসে না তোমার,

আমি ভালোবাসি কি না বাসি?

তারা।

সত্যকথা।

অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?

শতবার বলিয়াছি, কহি পুনর্বার,

একশত-একবার—তুমি ভালোবাসো

কিম্বা নাহি বাসো, কিছ নাহি যায় আসে

তারার। শূনেছ? যাও।

জয়।

হা কঠিন নারী?

তোমারে রমণী করে' কে গড়িয়াছিল?

তারা। বিধাতার ভ্রম!

জয়।

ভালোবাসো না আপনি,

বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ভালোবাসা

বুঝিতেও পার নাকি? জান না কি, তারা
ভালোবাসা করে কহে?

তারা। ভালোবাসা!—কই
কেহ শিখায় নি মোরে! শিখিয়াছি বটে
শাস্ত্র-কথা, অস্ত্রচর্চা গণিত, বিজ্ঞান।
ভালোবাসা শিখি নাই। ভালোবাসা বুঝি
ধনীর সম্ভাগ। তাহা গৃহপ্রতাড়িত
পরমদুঃখপ্রেমী দীন হীন দরিদ্রের
দুঃহিতা তারারে নাই সাজে।—বাঁধিয়াছি,
প্রাণের সমস্ত বাণ্ডা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
“যতদিন নাই উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিব না অন্তরে।”

জয়। কিরূপে উদ্ধার হবে তব মাতৃভূমি?
তারা। নাই জানি যুবরাজ। তথাপি সতত
সেই এক চিন্তা জাগে মনে। আমি নারী,
শিখিয়াছি শাস্ত্রবিদ্যা; কিন্তু কি করিব
একাকিনী আমি? হায়! কি করিবে নারী,
যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত; যাঁপিছে
জীবন জঘন্য ঘৃণ্য স্বচ্ছন্দ বিলাসে।
জানি না কিরূপে, কি উপায়ে কতদিনে
হইবে কমলমীর উদ্ধার; তথাপি
করিয়াছি পণ; ধরিয়াছি এই ব্রত—
এ কোমার-ব্রত যতদিন এ সাধনা
সিদ্ধ নাই হয়।

জয়। তাহে কি বাধা বিবাহে?

তারা। সর্ব্বের বাধা—এ বিবাহই রঞ্জুসম
বাঁধে হস্তপদ সর্ব্ব উচ্চ সাধনার।
প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নহে।
জাগে না বেগুর স্বরে নির্দ্রিত যে জন;
তুরীধরনি চাই।—ফিরে যাও যুবরাজ!
ভালোবাসিবার মোর অবসর নাই,
যতদিন মাতৃভূমি পরপদানত।

জয়। আমি যদি উদ্ধারি তোমার মাতৃভূমি?

তারা। বিবাহ করিব।—ভালোবাসি নাই
বাসি.
বিবাহ করিব। [ভাবিয়া] সত্য; বিবাহ
করিব।

দিব এ যৌবন-রূপ সতীত্ব নারীর
যাহা কিছুর প্রিয়, সব বলি তবপদে:—
বিসর্জন করে যথা ধর্ম্ম, ক্রুধাতুর.
খাদ্য চূরি করি: ভাসাইয়া দেয় যথা
মাতা প্রাণাধিকপ্রিয় কন্যা গণ্যজলে।

জয়। উত্তম! শিখিবে ভালোবাসিতে আমারে
বিবাহ করিলে মোরে?

তারা। —জানি না; তথাপি।
দিব এ যৌবন-রূপ করিয়া বিক্রয়।
তোমার চরণে, তাহা সম্পত্তি তোমার।
জয়। তাহাই হইবে।

তারা। তবে যাও।—যতদিন
এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ নাই কর যুবরাজ!
আসিও না ততদিন সমক্ষে আমার।
আস যদি অনিষ্ট ঘটিবে। বুঝিয়াছ?
জয়। বুঝিয়াছি

তারা। যাও তবে।
[প্রস্থান।]

জয়। হায় তারা, যত
প্রত্যাখ্যান কর তুমি, তত লিপ্সা বাড়ে
নিরুদ্গ্ন স্রোতের মত। দেখিয়াছি আমি
শতাধিক নারী; বশীভূত করিয়াছি
বাক্যে, অর্থবলে। কিন্তু এ হেন রমণী
দেখি নাই কভু!—সমাধিক অগ্রসর
হইলে জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের মত,
চকিত নয়ন; ওষ্ঠ বিকম্পিত হয়
ক্লোথে; ভয়ে পিছাইয়া যাই। কিন্তু তাঁর
প্রত্যেক বচন, ভঙ্গী, কটাক্ষ—লিপ্সার
ইন্ধন যোগায়।—এ কি আশ্চর্য রমণী।
আকর্ষণ করে সমাধিক সেইক্ষণে,
যবে সমাধিক দেয় দূরে থেদাইয়া!

[নিষ্ক্রান্ত।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—তমসার অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি।
সারণ ও তমসা

তমসা। বুঝেছ?

সারণ। বুঝেছি।

তমসা। মালবের নবাব যোগ দেবেন
স্বীকার হয়েছেন। তুমি মালবকে বলবে যে,
তিনি এসে যদি আমার স্বামীকে একবার
বোঝান, তাহলে আরো ভাল হয়।

সারণ। কিন্তু সূর্য্যমলকে বোঝান এক
প্রকার অসম্ভব, তাঁর দৃঢ় কর্তব্যপরায়ণতা,
প্রভুভক্তি, দ্রাতৃস্নেহ—

তমসা। তাঁর চরিত্র তোমার চেয়ে আমি
ভালো জানি। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত
স্নেহশীল বটে; কিন্তু তিনি জলের মত তরল।

কখন এদিকে, কখন ওদিকে গড়ান।

সারঙ্গ। তবে তিনি সম্মত হ'লেও বিশ্বাস কি?

তমসা। তার জন্য ভাবনা নাই। তিনি যদি একবার প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি প্রাণ দিয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন তা জানি। তবু প্রতিজ্ঞাপত্র দেহের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে বলো। কি জানি যেখানে সত্যপ্রিয়তার বিপক্ষে কর্তব্যপরায়ণতা, সেখানে সত্যভঙ্গ নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সারঙ্গ। উত্তম!—কিন্তু জয়াশা নিতান্তই অল্প। তবে রাজা বৃদ্ধ, আর সৈন্য সূর্য্যামলের হস্তে এই ভরসা। নহিলে—

তমসা। কোন ভয় নাই। কিন্তু এ সুযোগ অতীত হলে আর আসবে না।—বুঝেছো?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। সব কথা মনে থাকবে?

সারঙ্গ। তা থাকবে।

তমসা। আচ্ছা তবে যেতে পারো। জেনো সারঙ্গ, মনে রেখো, [সারঙ্গের স্কন্ধে হাত দিয়া সস্নেহে] তোমার জন্যই এত করছি।

সারঙ্গ। [অধোবদনে] আপনি আমার জন্য এত করছেন কেন?

তমসা। করছি কেন? তোমার জন্য ক'র্ষ না, সারঙ্গ!—ত আর কার জন্য ক'র্ষ?—সারঙ্গ! সারঙ্গ! জানিসনে, তুই আমার কে? না এখনো না। কাজ সিদ্ধ হলে বলব। তোকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তবে বলব।—সে কথা বড় প্রাণের বড় গভীর বড় গোপনীয়।—এখন যাও। [বেগে প্রস্থান।]

সারঙ্গ। অশ্রুত! ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষণী—তা জানি। কিন্তু কেন? আর এতদূর! মাঝে মাঝে ঘোর সন্দেহ হয়।—এতদূর!

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।]

সম্ভ্রম দৃশ্য

স্থান—তারার শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

একাকী জয়মল

জয়মল। আসিয়াছি নিশীথে প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে তারার শয়নাগারে। জানি না তথাপি তারার সম্মতি। একি অন্ধ দৃঃসাহস!

তবে কি আশায় আসিয়াছি সঙ্গোপনে তাহার নিভৃতকক্ষে, নাহি পূর্ণ করি', প্রতিজ্ঞা আমার? তোড়া করিব উদ্ধার কিরূপে? কোথায় সৈন্য? অনুরুদ্ধ পিতা লিখিলেন স্পষ্টাক্ষরে “অন্যে কি করিবে যার কার্য্য সে যদি ঘুমায় নিরুদ্ধে?” তারারে দেখাইলাম সেই রুঢ় লিপি;—

“অত্যাশ্রম! যাও তবে; আসিও না আর!”

কহিল সগর্বে তারা!—কি কহিবে তারা

আমারে দেখিবে যবে?—ফিরাইবে মূখ

করিবে ভৎসনা? দূরে খেদাইয়া দিবে?

তাহাই সম্ভব!—অতি দৃঢ় স্পষ্টভাষে

কহিয়াছে সে, ভালোবাসে না আমায়।—

না না, ভালোবাসে তারা! কে জানে? কে

বুঝে

নারীর হৃদয়? নিত্য বিরোধ তাহার

কার্য্য ও বচনে; ভালোবাসে না বলিলে

বুঝিতে হইবে ভালোবাসে। হায় নারী!

তোমার জীবন এক কি প্রকান্ড ছল!

কি মধুর মিথ্যাবাদ!—বাহু প্রসারিয়া,

আহ্বান করিয়া, পরে দূরে সরে' যাও

মায়া মরীচিকাসম।—যা হবার হবে।

যখন হইয়াছি অগ্রসর এতদূর,

যাইব না—না দেখিয়া শেষ! ভালোবাসে

নাহি বাসে, ছাড়িব না তার আশা। ছলে,

বলে, কি কৌশলে, বশ করিব তাহারে।

—থাকি লুক্কায়িত এই দ্বার-অন্তরালে:

ওই আসে তারা, কথা কহিতে কহিতে

তাহার দাসীর সঙ্গ।—এখন লুকুই।

লুক্কায়িত

তারা ও পরিচারিকার প্রবেশ

তারা। মাতার আদেশ! রামা! কহিও মাতারে,

বিবাহ করিবে তারা জয়মলে; যদি

তাঁহার আদেশ ইহা। কহিও তথাপি,

ভালো নাহি বাসি জয়মলে। কহিয়াছি

স্পষ্টাক্ষরে তারে।

পরিচারিকা। ভালোবাসিতে শিখিবে।

তারা। কখন না। তার ক্ষুদ্র ভয়সঙ্কুচিত,

খল, নীচ চিত্ত ভালোবাসিতে শিখিবে

তার চেয়ে শীঘ্র ভালোবাসিতে শিখিব

পথের কুকুরে কিংবা ঘনের শৃগালে।

পরিচারিকা। রাজপুত্র তিনি—
 তারা। তবু ঘৃণা করি তারে।
 পরিচারিকা। তিনি ভাবী রাজা মেবারের—
 তারা। মন্দগ্রহ
 অতি মেবারের।—তবু ঘৃণা করি তারে—
 পরিচারিকা। এই স্থির?
 তারা। এই স্থির। যাও জননীরে
 করিও এ কথা।—কর স্তিমিত প্রদীপ।
 —উত্তম এখন যাও।
 [কথাবৎ কার্য্য করিয়া পরিচারিকার প্রস্থান।
 তারা। [স্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষের নিকট
 গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া] গভীর
 রজনী!
 ক্লান্তদেহ পরিশ্রান্ত। বহিছে বাতাস
 প্রবল বৈশাখী। স্তম্ভ ধরণী। অদূরে
 বনগ্রাম মগ্ন অন্ধকারে। নীলাকাশে
 মেঘখন্ড নাই; শুদ্ধ জ্বলিছে প্রদীপ্ত
 অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ যৌবন-উদ্যমে
 —ঘুমাই। [শয়ন] না। ঘুম নাহি আসে।—
 চিন্তে ভাবি
 পিতার নিগ্রহ, নিত্য মাতার আক্ষেপ।
 কেন মাতা তিরস্কার করেন পিতারে
 বারংবার?—বুঝেন না তিনি এ লাঞ্ছনা
 বাজে কত পিতৃবক্ষে। চক্ষে ঘুম আসে।
 [নিদ্রিত।
 জয়। ঘুমিয়েছে তারা। এতক্ষণ সঙ্গোপনে
 শুনিয়াছি আত্মনিন্দা। সত্য যদি তাহা,
 তিস্ত তবু। প্রতিশোধ লইব ইহার!
 দ্বার-রুদ্ধ কি না দেখি।
 [স্বার পরীক্ষা করিয়া]
 দ্বার রুদ্ধ বটে। [নিকটে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ]
 [দন্তঘর্ষণ সহ] এখন!—সুন্দরী বটে।
 নিখুঁত সুন্দরী!
 কিবা চক্ষু! কি ভ্রু! আহা! কেশগুচ্ছ
 কিবা
 ন্যস্ত উপাধানে! কিবা বর্ণ! কিবা দেহ—
 আরত বলিষ্ঠ দৃঢ় অথচ কোমল।
 এক হস্ত ন্যস্ত গণ্ডতলে এক হস্ত
 বিলম্বিত শূন্যে। কিবা স্ফূর্তিত অধর—
 স্রস রক্তিম যেন মাগিছে চুম্বন,
 নিষ্ফল লজ্জার পরে উঠেছে রাঙিয়া;
 উঠে নামে বক্ষঃস্থল—আলিঙ্গন মাগি'

যেন অগ্রসর, পরে যাইছে ফিরিয়া
 দীর্ঘশ্বাসী' হতাশ্বাসে।
 তারা। [চমকিয়া উঠিয়া] কে তুমি?
 জয়। [সচকিতে] প্রেরসী
 আমি জয়মল দাস শ্রীচরণে।
 তারা। [দাঁড়াইয়া] তুমি!
 এখানে নিশীথে!
 জয়। প্রিয়ে।—
 তারা। [দৃঢ়স্বরে] বুঝিয়াছি। যাও
 জয়। যাইব না হইয়া নিষ্ফল মনোরথ:—
 তারা! [অগ্রসর হইয়া]
 তারা। নীচ! ভীরু! কাপুরুষ! লজ্জা নাই:
 পশিয়াছ কুমারীর শয়ন-মন্দিরে,
 নিশীথে চোরের মত? শ্লীলতাও নাই?
 জয়। হারয়েছি জ্ঞান তারা! [পদতলে পতিত।
 তারা। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] হারাইবে প্রাণ, যদি
 দীর্ঘ কর তব ঘৃণ্য উপস্থিতি।
 জয়। [উঠিয়া] কি করিবে তারা? রুদ্ধ
 করিয়াছি দ্বার।
 তারা। রুদ্ধ করিয়াছ দ্বার? ভাবিয়াছ তাই
 নিরাপদ তুমি? বটে! অতি স্পর্শী তুমি।
 একা তারা—যুবরাজ!—শত জয়মলে
 চরণে দলিতে পারে পিপীলিকা সম।
 —মৃঢ়! যাও চলি, যদি প্রাণে মায়া থাকে।
 জয়। পূর্ণকাম হ'য়ে যাব।
 [কোমল স্বরে] এবার রূপসী
 ফাঁকি দিতে পারিবে না আমারে।
 [হস্তধারণ।
 তারা। [হাত ছাড়াইয়া শয্যার নিম্ন হইতে
 তরবারি লইয়া] অধম!
 এতদূর স্পর্শী! স্পর্শ কর!—এতদূর
 সাহস?—ক্ষত্রিয় তুমি? বাপ্পার সন্ততি।
 বলিতেছি দূর হও, নতুবা মরিবে।
 জয়। [গ্রাস্তভাবে পলায়নোদ্মুখ হইয়া।
 শান্ত হও নারী! তব কৃপাণের চেয়ে
 ভয়ঙ্কর তব ওই স্ফলিঙ্গ নয়নে।
 শান্ত হও। এ মূহুর্তে যাইতেছি আমি।
 দ্বারমুক্ত করিলেন
 আলোক ও পিস্তলহস্তে শূরতানের প্রবেশ
 শূর। এ ঘোর নিশীথে, কে ও আমার কন্যার
 শয়ন-মন্দিরে?

তারা। মেবারের রাজপুত্র
জয়মল।
জয়। পথ ছাড় যাইতেছি চলি।
শূর। যাইবে? কন্যার কক্ষ কলুষিত করি'
কোথায় যাইবে? আমি দরিদ্র পতিত
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পদাহত; তবু আমি
রাজা, তারা রাজকন্যা; তারে সাধ্য কার
করে অপমান?—হোক্ মেবারের রাজপুত্র—
তারে কলঙ্কিত করি' যাইবে না ফিরে
সজীব স্বগৃহে।
জয়। [কম্পিত স্বরে] ক্ষমা কর।
শূর। শিথি নাই
ক্ষমা।

তারা। ছেড়ে দাও পিতা পলায়নোন্মুখ
ভয়ান্ত নিরস্ত্র জনে। ক্ষত্র-প্রথা নহে
ইহা।

শূর। ঘৃণ্য চোর সম যে প্রবেশ করে
পরগৃহে রাত্রিকালে, সে ক্ষত্রিয় নহে।
তার সঙ্গ পালনীয় নহে ক্ষত্রপ্রথা।
সে তস্কর মাত্র। তস্করের দণ্ড দিব।
—জয়মল দাঁড়াও সম্মুখে।

জয়। [জান্দু পার্তিয়া] ক্ষমা কর।
আর আসিব না।

শূর। চোর। দাঁড়াও সম্মুখে।

গর্জিল করিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।
রাণা ও সূর্যামল

রায়মল। মরিয়াছে জয়মল। ভ্রাতা পূর্বে আমি
শুনিয়াছি সেই বার্তা।

সূর্য্য। কহ নাই কভু
সে কথা আমারে?

রায়। কহি নাই কি কহিব?
কহিবার নহে সে কলঙ্ক কাহিনী।
শূন্যিলাম যবে তাহা—অর্মানি, লঙ্কায়
রক্তিম, আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল:
মেবারের রাজবংশে অর্মানি কে যেন
কালিমা ঢালিয়া দিল।—এত কাপুরুষ
বাস্পার সন্ততি! রায়মলের কুমার!!!

—এত নীচ!!! অহো ধিক—[মুখ ঢাকিলেন]
সূর্য্য। হায় জয়মল!

রায়। কহিও না “হায় জয়মল”। লভিয়াছে
যোগ্য শাস্তি সে অধম।

সূর্য্য। কেন মহারাজ?
রায়। সেই দুঃখ কলঙ্কিত করিবারে চাহে
কুমারীর শূদ্রশয্যা; হেঁট করে' নিজ
বংশের গৌরব; করে লাঞ্ছনা নির্ভয়ে
দুর্ভাগ্য পতিতজনে: যোগ্য দণ্ড তা'র
মৃত্যু। তা' দিয়াছে শূরতান।—দুঃখ এই
দিতে নাই পারিলাম মৃত্যুদণ্ড তা'র
স্বহস্তে আমার।

সূর্য্য। নাই লবে প্রতিশোধ?
রায়। প্রতিশোধ? সূর্য্য ভালো মনে করিয়াছ।
ল'ব প্রতিশোধ! ল'ব এই প্রতিশোধ,—
আমার রাজত্বখণ্ড দিব প্রতাড়িত
লাঞ্ছিত সে শূরতানে;—এই প্রতিকার
সন্তানের দুঃকৃতির, সাধ্য যতদূর
পিতার—করিব আমি।—যাও সূর্য্যামল!
মন্ত্রীরে পাঠাও রাজমন্ত্রণা ভবনে,
এক্ষণে। [প্রস্থান।

সূর্য্য। মহৎ অতি চরিত্র তোমার।
কিন্তু—কিন্তু—এতদূর—ভাবি নাই কভু।—
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাবলীর সান্দ্রদেশ। কাল—প্রাতু।
একাকী সঙ্গ

সঙ্গ। কোথায় মেবার রাজ্য—কোথায় সূর্য্যামল
এই ক্ষুদ্র গ্রাম আরাবলী পদতলে।
দূরে নদী বহে; উন্মেষ্ট চাহে ঘননীল
উদার আকাশ; নিম্নে শ্যামল ধরণী;—
চরে তাহে মেষপাল, দেখিতেছি তাহা—
আলেখ্য চিত্রিত, যেন গিরিশৃঙ্গ হ'তে।
আমি মেষপালক এক্ষণে। মন্দ নহে;—
রাজপুত্র সঙ্গ আমি গোমেষ-রক্ষক
এ দরিদ্র কৃষকের। কে বলিবে আমি
রাজপুত্র?—যেই সাজে সাজিয়াছি আজি.
আপনারে আপনিই চিনিতে না পারি।
—নিয়তির চক্র!—মন্দ নহে এ জীবন।
তবে বড় শীত লাগে শীতে; গ্রীষ্মকালে
প্রথর রৌদ্রের তাপ সহ্য নাই হয়।

কালে সহ্য হইবে।—আশ্চর্য্য! মনুষ্যের
জীবন ধারণ জন্য এতই সামান্য
প্রয়োজন!—খানি দুই দক্ষ রুটি খাই।—
—তাহাতেই দিন চলে' যায়।—কি ভীষণ
ওই গিরিগুহা। কি সুন্দর নিষ্কারণী—
এই ভয়াবহস্থানে;—দৈত্যের সহিত
বিবাহিত যেন কোন কৃশাঙ্গী অঙ্গুরা।

বনদেবীগণের গীত

একি শ্যামল সুসমা, মধুময় বিশ্ব
শিশির ঋতু অন্তে;
নবঘনপল্লবকোকিলমুখরনিকুঞ্জসুধধরবসন্তে।
সুন্দর ধরণী সুন্দর নীল
সুনির্মল অম্বর ভাতি,
অরুণকিরণঅনুরাজিত তরুণ
জবাবনমাল্যাজাত।
একি স্নিগ্ধ সুলালিত বহে তনু
শিহরি' পবন মৃদুমন্দ;
একি স্বপ্নবিজড়িত পদে পড়ি'
মুচ্ছিত কুসুমসুগন্ধ;
কার মুখছবি অরুণ কিরণ সহ
হৃদয়ে উঠিছে ধীরে;
কার নয়নদুটি অঙ্কিত করিছে
চম্পক সরসী নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ
করি' অনুকম্পা;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুপ্তন
গর্ষিত বিকশিত চম্পা;
কার প্রেমমধুর মৃদু অক্ষুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবির্কম্পিতকিশলয়পল্লবমর্মরতানে।

সঙ্গ। সেই মুখখানি মনে আসে; অবিরত
তার মধুমাখা বাণী—কর্ণে বাজে! চাহি
ভুলিতে তাহারে কই ভুলিতে পারি না।
তারা!—না, ভুলিব তারে নিশ্চয় ভুলিব!
এতটুকু বল নাই? ইচ্ছা শক্তি নাই
তবে কেন পশু হয়ে জন্মি নাই? তবে,
কোন স্বপ্নে ধরিয়াছি মনুষ্য শরীর?
ভুলিব তাহারে; আমি ভুলিব নিশ্চয়।

কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। তোর দিয়ে মোর কাম চলবে না।
সঙ্গ। কেন?
কৃষক। তু ভেড়া চরাবি কি? দুপুরে
রুদুদু গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভাবিস।
—না?

সঙ্গ। [ছল ছল নেড়ে] হাঁ ভাবি।
কৃষক। আবার তু শুনতে পাই যে রাতে
লুকিয়ে বহি পড়িস।
সঙ্গ। হাঁ, পড়ি।
কৃষক। তা হ'লে কাম চলবে কি করে'?
তার উপরে তু বসে' বসে' কেবল তুই রুটি
খাস। না?

সঙ্গ। [অন্যমনস্কভাবে] হাঁ রুটি
খাই।

কৃষক। আবার এমন লম্বা লম্বা কথা
কহিস্ যে, মূই সমজাতে পারি না। তোরে
বকলে এমনি হাঁ ক'রে চেয়ে থাকিস্ যে তোরে
বকতে দুকু হয়। না তোরে আমি আর
রাখবো না। তু মাহিনা নিয়ে বিদেয় হ।

সঙ্গ। যে আজ্ঞা।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

কৃষক। বাঃ! এ ত বেশ মজার নোক
দেখছি। নকরি ছাড়িয়ে দিলাম,—ত সটাং বগ্নে
“যে আঙ্তে”! বেটা যেন রাজপুত্র—দেখি
লোকটাকে বুঝিয়ে দেখি, যদি থাকে। লোকটা
ভালো।

কৃষকরমণীর প্রবেশ

কৃষকরমণী। তুমি অমনি ধাঁ করে' লোক-
টাকে ছাড়িয়া দেলে!

কৃষক। হাঁ দেলাম! তাই হয়েছে কি!

কৃষকরমণী। এখন আবার লোক দেখ!

কৃষক। তা দ্যাখবো! তাই কি!

কৃষকরমণী। কি আবার!—এমন লোক
কোথা থেকে পাও দেখি।

কৃষক। কেমন লোক।

কৃষকরমণী। এই এমন খাসা লোক!

কৃষক। তা খাসা লোক পৃথিবীতে বুঝি
ঐ একটাই জন্মেছিল?

কৃষকরমণী। আহা এমন শিষ্ট শান্ত—
মুখে রা টি নেই আর মুখখানিই বা কি! যেন
ছাঁচে ঢালা! মরি মরি কি পটল চেরা চোখ।
যেন সর্বদাই ছল ছল কচ্ছে গা!

কৃষক। ওরে আবাগীর বেটী! তোর ওর
সঙ্গে আসনাই ছেল বোধ হচ্ছে। আমি ভাব-
ছেলাম বটে যে নোকটাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে
রাখি। কিন্তু এখন—ওকে শুষু ছাড়িয়ে দেবো?

ওকে কুরুল মেরে বিদেয় করে' দেবো। দাঁড়া,
আমি এক্ষণি ওর ভূত কাড়িয়ে দিচ্ছি।

[সবেগে প্রস্থান।

কৃষকরমণী। ওমা মোর কি হবে গো!
ওগো এমন রাগ ত কখন দ্যাখিনি গো! ওগো,
বাছা বড় ভালো মানুষ, ওকে মেরো না গো
ওকে মেরো না। ভালোয় ভালোয় বিদেয় করে'
দাও। [পশ্চাৎধাবন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—প্রভাত।

পৃথবী ও বণিক

পৃথবী। স্থাপিয়াছি নবরাজ্য স্বীয় বাহুবলে।
দেখায়েছি পিতারে এ দেহে, এ শোণিতে,
বংশের মর্যাদা ভিন্ন আরো কিছুর আছে।
বর্ষের মীনের রাজ্য এই বাহুবলে
করিয়াছি করায়ত্ত। ভ্রমে রাজপুত্র
নাড়োলে নির্ভয়ে আজি।

বণিক। সত্য প্রিয়বর।

পৃথবী। পণ্ড অশ্বারোহী সহ আসিয়াছিলাম
এ রাজ্যে, এখন পণ্ড সহস্র সেনানী
আমার প্রভুত্ব মানে।

বণিক। [স্বগত] হায় এ বীরত্ব
যদ্যপি হইত নহ্ন!—এ জগতে হায়
নাহি হয় কেহ বাস্তবিক একাধারে
সর্ব গুণান্বিত।

দৌবারিকস্বয়ের প্রবেশ

পৃথবী। কি সংবাদ দৌবারিক?

দৌবারিক। মহারাজ!

আসিয়াছে এক বাস্তাবহ এইক্ষণে
মেবার রাজ্য হতে প্রভুর সমীপে।

পৃথবী। মেবারের রাজ্য হতে? নিয়ে এস
তারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

পৃথবী। মেবারের রাজ্য হতে? কি কহ বণিক
কি বাস্তাব লইয়া আসিয়াছে বাস্তাবহ?

বণিক। বদ্বিতে না পারি।

পত্রবাহের প্রবেশ ও অভিবাদন

পৃথবী। তুমি আসিয়াছ দূত!

মেবারের রাজ্য হতে।

দূত।

আমি আসিয়াছি

মহারাজ! মেবারের রাজ্য হতে।

পৃথবী।

শূনি

এনেছ কি বাস্তাব?—পিতা আছেন কুশলে?

দূত। কহিবে এ পত্র তাহা!

পৃথবী।

দাও পত্রখানি।

[পত্র গ্রহণ ও পাঠ] আশ্চর্য! আশ্চর্য!

বণিক। [সকৌতুহলে] কি সংবাদ? প্রিয়বর!

জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

পৃথবী।

বন্ধুবর! পিতা

লিখিয়াছেন এ পত্র, আহ্বান করিয়া

আমারে মেবার রাজ্যে।

বণিক।

সহসা!—কারণ?

পৃথবী। কারণ? কারণ মৃত ভ্রাতা জয়মল।

বণিক। জয়মল মৃত? হেন সহসা? কিরূপে?

পৃথবী। [বণিককে] পড় এই পত্রখানি?

[পত্র প্রদান]

[দূত] যাও দূত! কর

বিশ্রাম বিরামগৃহে; অপরাহ্নে এই

পত্রের উত্তর দিব।

দূত।

যথা আজ্ঞা প্রভু!

[সাবিবাদন প্রস্থান।

বণিক। অত্যশ্চর্য বাস্তাব!—তবে তুমি এইক্ষণে
মেবারের যুবরাজ?

পৃথবী।

আমি যুবরাজ।

তথাপি না চাহি, বন্ধু, সে সম্পদ আমি!

গাড়িয়াছি নিজ রাজ্য স্বীয় বাহুবলে।

বণিক। যাইবে না চিত্তোরে ফিরিয়া?

পৃথবী।

কদাপি না।

বণিক। অতীব বিস্ময়কর এ প্রেম কাহিনী!

শূরতান কন্যার এ প্রতিজ্ঞা অশ্রুত—

“বিবাহ করিবে তাঁরে সে বীররমণী

যেই উদ্ধারিবে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি।”

—হেন পণ, বন্ধুবর!—শূনি নাই কড়ু,

কালিকালে করিয়াছে কোন স্বয়ম্বর।

পৃথবী। কিরূপ সে নারী জানো বন্ধু?

বণিক।

অনুপমা!

পৃথবী। তাহার কি নাম?

বণিক।

“তারা” তারার মতই

অন্য নারী হতে উদ্ভেদ স্থিতা,

জ্যোতির্ময়ী।

পৃথবী। উত্তম! আমিই তবে করিব ভ্রাতার

নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ! আমি উদ্ধারিব
তোড়া।

বণিক। বৃদ্ধিয়ারছি। তাহা যদি কর সখে,
লভিবে অতুল কীর্তি বিশ্ব; তদুপরি
লভিবে রমণী এক—অতুল জগতে।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। আগত মধ্যাহ্ন প্রভু।
পৃথবী। সত্য নাকি! চল

[ফিরিয়া] আসিও পরশ্ব বন্ধু।

বণিক। উত্তম, আসিব।

[উভয়ের বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী রাজার বিলাস-গৃহ। কাল—রাত্রি।
পারিষদবর্গ ও নর্তকীগণ

১ পারিষদ। রাজা কোথায় হে? এখনো যে
সে বেটার দেখা নেই!

২ পারিষদ। [মদিরাজড়িত স্বরে] সে বেটা
কোন্ খানায় পড়ে আছে আর কি।

৩ পারিষদ। বেটা কখন যে কোথায় থাকে
তার কি ঠিক আছে!

৪ পারিষদ। কোথায় যে থাকে না তা কিন্তু
খুব ঠিক আছে।

১ পারিষদ। কোথায় হে?

৪ পারিষদ। নিজের অন্তঃপুরে। মাসের
মধ্যে তিনি গড়ে এক দিন সে দিকে যান।

৩ পারিষদ। আহা রাণী বেচারীর কি কষ্ট!
—চিতোরের রাণার মেয়ে।

৪ পারিষদ। আহা বড় ভাল মেয়ে। দেখলে
ত সে দিন।

১ পারিষদ। আহা!

২ পারিষদ। তোমাদের যে তার জন্যে
শোক-সাগর উথলে উঠলো। [নর্তকীদ্বয়কে]
গাও গাও—তোমরা গাও—আমাদের সময়
আমোদ কর।

নর্তকীগণের গীত

ভিতরে হাসিছে মধুরা বামিনী
দীপমালা সূখে গলার পরিয়া;
বাহিরে শিশির অশ্রু-নয়না
বিষাদিনী নিশা কাদে গুমরিয়া;
—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে,
ঠিকরিয়া পড়ে মূকুরে, স্ফটিকে;

—বাহিরে পাড়িয়া অসীম আঁধার—
বনপ্রান্তরে ঘন আবারিয়া।
উছলে কক্ষে সংগীতরব নৃত্যলহরী,
রহিয়া রহিয়া;
—সুন্দর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর
বাতাস বাইছে বাহিয়া;
তোরণস্তম্ভাশরে দোলে যবে
গোলাপমালিকা কুলটাগরবে,
বিজন বিপনে নিভৃত নীরবে
তিমিরে শেফালি পাড়িছে ঝরিয়া।

১ পারিষদ। বাঃ বাঃ এ গানটি—আমাদের
রাজারাণীর অবস্থার অতি সুন্দর টীকা।

২ পারিষদ। একেবারে মল্লিনাথ।

৩ পারিষদ। কি! কি বল্লে হে? 'তিমিরে
শেফালি পাড়িছে ঝরিয়া'—না?

৪ পারিষদ। বাঃ অতি সুন্দর! অতি
সুন্দর!

২ পারিষদ। আরে রেখে দাও—এ রকম
জায়গায় তোমাব ও বেদব্যাস ভালো লাগে
না!—একটা ভালো গান গাও।

১ পারিষদ। এ গানটা বৃদ্ধালিনে? বেটা
কুলাঙ্গার?

২ পারিষদ। আর তুই বাপের ভারি
সুন্দর! একেবারে কুল আলো করে' বসে'
আছি' বেটা।

৩ পারিষদ। আরে চটো কেন?

২ পারিষদ। দেখ দোঁখ! মিশ্ছেন ত এই
দলে, মোসাহেবী কচ্ছেন ত এক অপগন্ড
রাজার—আবার ছড়াচ্ছেন ভগবঙ্গীতার তৃতীয়
অধ্যায়। আমরা উচ্ছন্ন গিইছি স্বীকার করি।
এ'রা সব উচ্ছন্নও যাবেন আবার দেখাবেন যেন
এ'রা এই সে দিন হোল ঋষ্যশৃঙ্গমুনির টোল
থেকে বেরিয়েছেন।—ঝেঁটা মারো।

১ পারিষদ। ঘাট হয়েছে বাবা। বেনাবনে
আর মৃত্তা ছড়াচ্ছেনে!

২ পারিষদ। ওহে রাজা আস্ছে.—রাজা
আস্ছে!

প্রভুরাওর প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন

প্রভু। [নর্তকীদের প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ
করিয়া] এরা এখানে কেন? বেরো বেটারা।
বেরো!

পারিষদবর্গ। বেরো বেরো।

[নর্তকীদের প্রস্থান।

প্রভু। [ক্ষণেক পাদচারণ পরে] শোন
তোমরা সব শোন।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

প্রভু। পৃথবীরাও করেছে কি? তার গুণ
গান করে' আমার রাজ্যে সকলে যে একটা হাট
বসাবার যোগাড় করেছে, সে পৃথবীরাও করেছে
কি?

পারিষদবর্গ।—তা বৈ কি! করেছে কি
মহারাজ?

প্রভু। তবে বলবো বোলবো?
বোলবো?

পারিষদবর্গ। হাঁ বলুন বলুন বলুন।

প্রভু। নাঃ বলবো না।

পারিষদবর্গ। না আর বলে' কাজ নেই,
আমরা বৃদ্ধিতে পেরেছি!

প্রভু। বৃদ্ধিতে পেবেছ কি বকম? কি
বৃদ্ধেছ বল দেখি।

পারিষদবর্গ। [পরস্পরকে] হাঁ বল ত কি
বৃদ্ধেছ বল ত।

প্রভু। কিছুই বৃদ্ধিতে পারো নি।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, ভেবে চিন্তে
দেখলাম যে কেউ কিছুই বৃদ্ধিতে পারেনি।

প্রভু। তা পারোনি তা আমি আগেই
জেনেছি। তবে শোন বলি।

পারিষদবর্গ। শোন শোন, মহারাজ বল-
ছেন।

প্রভু। শোন সে পৃথবীরাও—যে আমার
শ্যালক—তার বড় ভাগ্য যে সে আমার
শ্যালক—

২ পারিষদ। বেজায় ভাগ্য। মহারাজের
শ্যালক হওয়া অনেকের ভাগিনীপতি হওয়ার
ধাক্কা।

প্রভু। সে গোটাকতক নেড়েকে যুদ্ধে
হারিয়ে দিয়েছে [প্রথম পারিষদকে]—কি
বল হে।

১ পারিষদ। তা বৈ কি। তবে—তবে

প্রভু। চোপরহো।

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো।

প্রভু। সে আর শক্ত কি! গোটাকতক
নেড়েকে হারিয়েছে। শক্ত কি?

পারিষদবর্গ। তা বৈ কি!—শক্তটা কি!

প্রভু। সে নেড়েগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করা

৫

শক্তটা কি? হাঁ, যদি প্রভুরাওকে হারাত তবে
বৃদ্ধতাম।

পারিষদবর্গ। হাঁ তা'লে বৃদ্ধতাম বটে।

প্রভু। হাঁ আসুক দেখি আমার সঙ্গে।—
আমি একবার একটা যুদ্ধ করেছিলাম জানো?

৩ পারিষদ। আজ্ঞে না। মহারাজ যে কখন
যুদ্ধ করেছিলেন তা ত শুনিনি!—কবে?

প্রভু। এই চোপরহো—

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো—এই চোপ-
বহো না।

প্রভু। কবে?—সে খোঁজে দরকার কি?
যুদ্ধ করেছিলাম, সে কথা সকলেই জানে।

[৪ পারিষদকে] কি বল—তুমি শোননি?

৪ পারিষদ। তা মহারাজ যখন আজ্ঞে
করেছেন, তবে অবশ্যই শুনছি। তবে কি না
ঠিক মনে হচ্ছে না।

প্রভু। চোপরহো।

পারিষদবর্গ। [সতেজে] চোপরহো।

প্রভু। যুদ্ধ করিনি বটে। কিন্তু ইচ্ছে কল্পে
কি আর পার্ত্তম না?

পারিষদবর্গ। ইঃ তা কি পার্ত্তম না?

প্রভু। মনে কল্পে—বীর হওয়া কি? লেখক,
বক্তা, গাইয়ে, যা খুসী তাই হতে পার্ত্তম।
তবে, কি না—তবে, কি না—গোড়ার বাঁধনিটা
একটু আলাগা হয়ে গিয়েছিল, এই যা।

পারিষদবর্গ। হাঁ, এই যা।

গীত

রাজা। দেখ হতে পার্ত্তম নিশ্চয় আমি
মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারদটার গন্ধ কেমন
করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে
লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে
যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম
আমি চটে, মটেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। “হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।”

রাজা। দেখ হোতে পার্শ্বাম্ আমি একটা
প্রত্নতত্ত্ববিৎ
কিন্তু “গবেষণা” শব্দেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর
বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে
হাসিটুকু চরম।
তাই তাঁকে চর্চা কল্পেও একটু
কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম
আমি চটে, মটেই ত—
তা নইলে বেশ এক ভাল—
পারিষদবর্গ। “হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।”
রাজা। দেখ হোতে পার্শ্বাম্ নিশ্চয় একজন
উঁচুদের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো
গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই
বেঁকে না রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও
দেয়নাক সে সাড়া;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে
হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম
আমি চটে মটেই ত,
তা নইলে খুব এক উঁচু—
পারিষদবর্গ। “হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।”
রাজা। দেখ হোতে পার্শ্বাম্ রাজনৈতিক
বক্তাও অস্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণ-
শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মৃৎস্থ সব বুলি এ এমন
বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায়
বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি
দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে
তাই রইলাম বৈঠকখানাবস্তা
আমি চটে মটেই ত;
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। “হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।”

রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক'
সামান্য বিশেষ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই
চোলে যেতাম বেশ;
হতাম পেলে সুযোগ ও বৃষ্টি
একটা যে-ও সে-ও;
ওই কেবল বিস্ট্রর মধ্যে একটা
হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায়
দিলে নাক' কেহ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম
আমি চটে মটেই ত;—
তা নইলে—বুঝলে কি না,
পারিষদবর্গ। “হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।”

চন্দ্রাওর প্রবেশ

—১ পারিষদ। এ কি চন্দ্রাও যে ভোরের
সময় উদয়?
চন্দ্র। মহারাজ! এক ভারি জ্বর খবর
এনেছি।
২ পারিষদ। কেলেঙ্কারি ত?
চন্দ্র। ভারি কেলেঙ্কারি! শূরতানের
একটা মেয়ে আছে তারে জানেন ত?—মহারাজ
খবরটা শুনছেন?
প্রভু। হাঁ শুনছি। হাঁ হাঁ তার পর!
চন্দ্র। তার শোবার ঘরে রাণার ছোট ছেলে
জয়মলের মৃতদেহ পাওয়া যায়—
৩ পারিষদ। পুরোনো খবর।
চন্দ্র। আরো আছে। শোন না।
পারিষদবর্গ। শোন শোন।
চন্দ্র। এই রাষ্ট্র, যে শূরতানই তাকে
মেয়ের ঘরে দেখতে পেয়ে গুলি করে—
৪ পারিষদ। বেজায় পুরোনো!
চন্দ্র। আরো শোন না। রাণা না সেই কথা
শুনে—মহারাজের শব্দ—তাই শুনে—
প্রভু। —শূরতানকে ধরে' আন্তে সৈন্য
পাঠিয়েছে ত। এই ত!—তার আর আশ্চর্যটা
কি?
চন্দ্র। আন্তে তা নয়।—রাণা না তাই শুনে,
—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—
প্রভু। পিলে ফেটে মারা গিয়েছে। এই ত!
তা ত যেতেই পারে।

চন্দ্র। আঙ্কে মহারাজ তাও নয়। রাণা না তাই শূনে,—রাণা না তাই শূনে,—রাণা না তাই শূনে—শূরতানকে পঁচিশটা পর্গনা দিয়েছে।

পারিষদবর্গ। গুলিখুঁড়ি!

প্রভু। হাঁ তা কখন হ'তে পারে?

চন্দ্র। আসুন! মহারাজ! মুকোবালা করে দেবো। মেবার থেকে মহারাজের কাছে এক দূত এসেছে, সে-ই বুলে।

প্রভু। মেবার থেকে দূত? কিসের জন্য?

চন্দ্র। মহারাণীকে না কি নিতে।

প্রভু। মহারাণীকে নিতে!

চন্দ্র। দূত বুলে চিতোরে জনরব যে, মহারাণী এখানে না কি বড় অসুখে আছেন। মহারাজ তাঁর ওপর না কি ভারি অত্যাচার কচ্ছেন।

প্রভু। বটে! তাতে রাণীর বাপের কি! আমার রাণীর উপর আমি অত্যাচার করি, না করি, আমার খুসী! তার কি? আমি ত আর মাইনে করা চাকর নই যে, হুকুম তামিল কর্তে হবে! চল ত সে দূতটাকে মেরে বিদায় করে দিই।—এস ত সব এস ত।—

পারিষদবর্গ। সর সর! মহারাজ যাচ্ছেন।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিদোর; নদীর তীরে বৃক্ষতল।

কাল—অপরাহ্ন।

একাকিনী তারা

তারা। হোল না এখনো সিদ্ধ সাধনা আমার।

কত বর্ষ এল গেল। পরপদানত

অদ্যাপি সে মাতৃভূমি! সে পূর্ণ চন্দ্রমা

হইল না রাহুদন্ত!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। রাজপুত্র! স্বরা

আসিছেন মহারাজ, সঙ্গে রাজপুত্র

মেবারের।

তারা। রাজপুত্র মেবারের সে কি?

কোন রাজপুত্র তিনি!

পরিচারিকা। মধ্যম!

তারা। কি নাম?

পৃথদীরাও?

পরিচারিকা। হবে রাজপুত্র!—অতদূর পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত এখনো আমার।

তারা। তুমি হাসিতেছ কেন?

পরিচারিকা। “কেন” তা শূনিবে যুবরাজের নিকট।

[প্রস্থান।

তারা। কি রূপ! অপূর্ষ আচরণে

কিঙ্করীর!!!

—শূনেছি পৃথদীর নাম: কেবা শূনে নাই?

মহিমামেখলা তাঁর পৃথদীর ভূষণ:

কিন্তু তিনি এ আলয়ে আজি যে সহসা?—

—স্পন্দিত সহসা কেন বামবাহু আজি?

পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত।

জানি না কিরূপ তিনি—দীর্ঘ কিম্বা খর্ষ, গৌরাঙ্গ অথবা শ্যাম: কৃশ কিম্বা শ্বল;—

শূরতান ও পৃথদীর প্রবেশ

শূর। তারা! ইনি পৃথদীরাও। শূনিয়াছ নাম?

তারা। শূনিয়াছি নাম—মেবারের যুবরাজ!

শূর। ইনিই আমার কন্যা তারা!—পৃথদীরাও!

এই দীন দরিদ্রের মাথার মুকুট

আমার এ কন্যা তারা।—কন্যা! শূনিয়াছ

পৃথদীরাও উম্মারিয়া তোড়া বাহুবলে

পাঠানের হস্ত হ'তে, আগত আপনি

লইয়া সে বাস্তা?

তারা। তাহা শূনি নাই পিতা।

শূর। মনে আছে তারা, সেই প্রতিজ্ঞা তোমার?

তারা। [সলজ্জ] মনে আছে পিতা।

শূর। —মেবারের যুবরাজ!

স্বীকৃত যদিপি তুমি, আশীর্বাদ করি

বরিয়া জামাতরূপে।

পৃথদী। সম্পূর্ণ স্বীকৃত;

স্বীকৃত যদিপি তারা।

শূর। সে ভার আমার!

হস্তে হস্তে যোগ করিয়া

দিলাম তারারে পৃথদী।—সাক্ষী নারায়ণ!—

সুখী হও তুমি বৎস! বৎসে সুখী হও।

বল্লধনি

পৃথদী। একি বল্লধনি কেন নির্মল আকাশে!

শূর। বিবাহ উৎসব দিন পুরোহিত ডাকি

করিব এখনি স্থির।—চল বৎস, তবে,

এক্ষণে, বাহির কক্ষে। [উদ্ধবদিকে চাহিয়া]
—উঠিল ঝটিকা!

[পৃথবী ও শূরতানের প্রস্থান।
তারা। ইনি পৃথবী!!! ভগবান মনে শক্তি দাও,
করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা!—আমি স্বয়ম্বরা,
ক্ষত্রিয় রমণী, নাহি ভংগ হবে কভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ!

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। কেন হাসিতেছিলাম
বুঝিয়াছ রাজকন্যা এতক্ষণে?—বর
ধরিয়াছে মনে?—একি কেন অধোমুখ?
একি কাঁদিতেছ কেন?

তারা। না পরিচারিকা।
কাঁদি নাই। কাঁহিও না মাতারে এ কথা;
করিতেছি নিষেধ।

পরিচারিকা। কি কথা রাজপুত্র?
তারা। কোন কথা নহে। চল জননীর কাছে।
[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের কক্ষ। কাল—রাত্রি।
মালব ও সূর্য্যমল

মালব। বৃদ্ধ রাজা রায়মল। এক পুত্র তাঁর
জয়মল মৃত; পুত্র সঙ্গ নিরুদ্দেশ;
স্থাপিয়াছে নবরাজ্য পৃথবী যুবরাজ
সুদূর কমলমীরে। শূন্যিয়াছি বীর
করিয়াছে অবহেলা পিতার আহ্বান
ফিরিতে মেবাররাজ্যে। অতীব সহজ
সুসাধ্য মেবার আক্রমণ। তুমি যদি
এক্ষণে সহায় হও, বীরবর, আমি
পরাস্ত করিব রায়মলে অনায়াসে।

সূর্য্য। তাহাতে আমার লাভ?

মালব। তোমারে করিব
মেবারের রাজেশ্বর।

সূর্য্য। রাজ্য নাহি চাহি।
লালিত শৈশবে যাঁর ভ্রাতৃস্নেহে, তাঁর
বিপক্ষে ধরিব অস্ত্র?

মালব। লালিত শৈশবে?
—হা মূঢ়! লালন কে না করে অসহায়
নিরীহ শৈশবে? ইহা ধর্ম প্রকৃতির,
নহে পালকের। বিশ্ব বাঁচিত কি কেহ,

না রহিত যদি এই মঙ্গল নিয়ম?
গাভী বৎসে দুগ্ধ দেয় বিপদে তাহারে
রক্ষা করে প্রাণপণে; সেই বৎস যবে
গাভী হয়, হয় না সে উৎসুক সতত
স্বকীয় বৎসের হেতু? জননীর পানে
দেখেনাও চাহি'।। বিশ্ব কে কাহার তরে
ছাড়ে আপনার স্বত্ব?

সূর্য্য। মেবার আমার
স্বত্ব নহে, ম্লেচ্ছপতি।

মালব। কে বলিল নহে?
কে বলিবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের চেয়ে
শ্রেষ্ঠতর? এক গর্ভে জন্ম উভয়ের।
তোমার শরীর, রায়মলের শরীর
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তারও দুই পদ,
তোমারও তাহাই, বীর! দুই হস্ত তার,
তোমারও কি নাই তাহা? সমান, তোমার
মস্তকে, শোভে না রাজমুকুট? কি হেতু
সে ভূপতি, আর তুমি শূন্য পৃষ্ঠ হও
কৃপাদত্ত অস্ত্রে তার? ধিক্ বীরবর!
এ বিশ্ব তাহারই স্বত্ব যার বাহুবল।

সূর্য্য। বাহুবল? আমার কি বাহুবল? আমি
সেনাপতি মাত্র, নহে এ সৈন্য আমার।
রাণার এ সৈন্য।

মালব। তিনি আনিয়াছিলেন
সঙ্গে করিয়া কি সৈন্য তাঁর জন্মদিনে?
এ সৈন্যে তোমার আছে সম অধিকার।
কিম্বা সমাধিক অধিকার—যে কারণ
সেনাপতি তুমি, রাজামাত্র রায়মল।

সূর্য্য। [চিন্তা সহকারে] না না, হইব না
আমি বিশ্বাসঘাতক।

মালব। না, রহিবে চিরদিন ভ্রাতৃঅন্নদাস!!!

ভীরু সে, যে রহে পরভৃত্য যবে তাঁর
আছে স্বীয়ভুজে শক্তি।—জাগো বীরবর;
দূর কর এ কলঙ্ক, লও তরবারি;

দেখিবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী চাটুকার সম
তাঁর পক্ষে রহে নিত্য, যে তাহারে আনে
ছিনিয়া স্ববলে।—তুমি পাইতেছ বটে

অদ্য মুষ্টিমেয় অন্ন ভ্রাতার প্রাসাদে:
কিন্তু যবে হবে রাজা অন্যে—কে বলিবে—
তাহার প্রসাদ ভিক্ষা সে দিবে তোমারে?

সূর্য্য। কি করিব?—বুঝি অবশ্য সম্ভাব্য, ইহা
ফলিবেই বুঝি সেই চারণীর বাণী।

আমি কি করিব? আমি হস্তে নির্যাতির
ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র।—ইহা ঘটিবেই পরে।

[প্রকাশ্যে] তাহাই হউক তবে।

মালব। [সোপ্তাসে] স্বীকার?

সূর্য্য। [উদ্ভ্রান্তভাবে] স্বীকার।

মালব। না, কর শপথ।

সূর্য্য। [তদ্রূপ] করিলাম অঙ্গীকার।

মালব। [কাগজ বাহির করিয়া] এই অঙ্গীকার
পত্র। দেহরক্ত দিয়া ইহাতে স্বাক্ষর কর।

সূর্য্য। এত অবিশ্বাস?

এই নেও করিলাম স্বাক্ষর।

মালব। উত্তম!

করিলাম পরীক্ষা যে প্রয়োজনস্থলে
রক্ত দিতে পারো কি না।

সূর্য্য। স্লেচ্ছরাজ! আমি
ক্ষত্রিয়।

মালব। ক্ষত্রিয় তুমি; প্রকৃত ক্ষত্রিয়।

যাও, একত্রিত কর সৈন্য, সেনাপতি।

আমি একত্রিত করি নিজসৈন্যবল।

সূর্য্য। উত্তম!

মালব। উত্তম!—তবে আসি এইক্ষণে।
[মালবের প্রস্থান।]

সূর্য্য। মেবারের অধীশ্বর আমি! ভয় করে
ভাবিতে সে কথা। মেবারের অধীশ্বর।—
উচ্চপদ! কিন্তু বলি দিতেছি, দিয়াছি
সে উদ্দেশ্যে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বপুণ্যফল!
—কি উৎসর্গ! হইতেছি বিশ্বাসঘাতক
ভ্রাতার নিকটে!—করিয়াছি সমুচিত?
না না, করি নাই বৃদ্ধিতেছি। করি নাই
উচিত। অন্যায় করিয়াছি, বৃদ্ধিতেছি
ক্রমে স্পষ্টতর। আমি গভীর অন্যায়
কর্ম্ম করিতেছি। কি করিব?—করিয়াছি
অন্যায় প্রতিজ্ঞা আজি।—কেন করিলাম।

তমসার প্রবেশ

পূর্ণবাঙ্কা তব প্রিয়ে।

তমসা। শুনিয়াছি সব
অন্তরাল হতে। তুমি শুন নাই, যবে
করিয়াছিলাম আমি সে সহজ কথা,
বুঝাইল স্লেচ্ছপতি আসিয়া,—বুঝিলে
অমনি শিশুর মত।

সূর্য্য। সত্য! বুঝিলাম

অমনি শিশুর মত; তমসা তমসা।

একি করিয়াছ? একি করিয়াছি আমি?

তমসা। সাধিয়াছ কর্তব্য আপন।

সূর্য্য। না না, আমি

করিব না ঘৃণ্যকর্ম্ম হেন!—কখন না।

তমসা। করিয়াছ, মনে নাই, আপন শোণিতে

স্বাক্ষর প্রতিজ্ঞাপত্র? সেই জন্য আমি

পরামর্শ পাঠাইয়াছিলাম মালবে

করাইয়া লইতে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি

স্বাক্ষর তোমার রক্তে।

সূর্য্য। [বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র]

কি বলিছ নারী!

পাঠাইয়াছিলে এই পরামর্শ তুমি?

—চক্রান্ত? চক্রান্ত!—নারী! কটু রাজনীতি

স্বতঃ ভয়ঙ্করী অতি; স্ত্রীবৃদ্ধি যদ্যপি

তাহাতে প্রবেশ করে, প্রলয় হইবে

রাজ্যে।—একি করিয়াছি! একি করিয়াছি!

করিয়াছি সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, আজি।

তমসা। যাহা করিয়াছ, করিয়াছ; সত্যভঙ্গ

করিবে না তদুপরি, আশা করি নাথ!

হস্তধারণ

সূর্য্য। যাও, কহিও না মিথ্যা সোহাগমিশ্রিত,

চাটুবাণী। নারীজাতি অত্যুত্তম পারে,

করিতে সোহাগভাণ স্বার্থসিদ্ধি যবে

উদ্দেশ্য তাহার!—যাও, শুনিতে চাহি না!

সত্যভঙ্গ করিব না আমি।—কিন্তু নারী!

আপনারে বিসর্জন দিব এই রণে!

[তমসার প্রস্থান।]

সূর্য্য। অবশ্য করিব এই বৃদ্ধি। কিন্তু দিব

অবসর রায়মলে, করিতে সংগ্রহ

যথাসাধ্য সৈন্য আপনার। বৃদ্ধ অতি,

নিঃসহায় অভিমানী ভ্রাতা রায়মল;

নাহি চাহিবেন তাঁর সর্ব্বগুণাধার

পুত্রের সহায়। আমি বাস্তব পাঠাইব

পৃথবীরাজে! পরে যাহা করেন ভবানী।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—জ্যোৎস্না রাতি।

পৃথবী ও তারা

তারা। শিখি নাই ভালবাসা, নাহি জানিতাম

প্রেমের বিজ্ঞান, তুমি শিখিয়েছ নাথ,

হাতে ধরি'।

পৃথবী। আমি গুরু, আমি শিষ্য তব।
তারা। ভাবি নাই—কমা কর পতি, ভাবি নাই
পারিব বাসিতে ভালো তোমারে কদাপি।
পৃথ্বী যবে শুনিতাম বীরগাথা তব
পথে চরণের মূখে, ভাবিতাম যদি
তুমি হও পতি মের, সব সাধ মিটে।
পরে যবে দেখিলাম, লাগিল আঘাত
হৃদয়ে ও মর্ন্ত হেন বিরূপ ককর্শ;—
ভাবিলাম আপনারে করেছি বিক্রয়।
পরে যত পরিচয় হইল আমার
তোমার সহিত, মূখ হইলাম তত
উদার চরিতে তব। আজি কায়মনে
তোমার চরণে দাসী তারা।

পৃথবী। প্রাণেশ্বরী!
নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে
এ স্থির চপলা স্নিগ্ধ, এ জ্যোৎস্না জগমা,
সজীব সৌরভ এই, শরীরী সঙ্গীত।
তারা। জানি, নহে উপচারপদ এই। তুমি
ভালোবাসো মোরে, তাই এ মূঢ় বিশ্বাস।
আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

পৃথবী। আমি ত দেখি না দোষ।
তারা। ভালোবাসা নাহি
দেখে, শূন্য ভালোবাসে! ভালোবাসা ঢাকে
সমুদ্রবারিষ মত গিরি ও গহবরে
সমভাবে; আনে বসন্তের বারুদসম
কেবল সৌরভ আর কেবল সঙ্গীত।

গীত

এ হৃদি—কুজবনে
তুমি রহহে প্রাণসখা মম জীবনভাতি!
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব,
নীরব সে, দিন রাত!
স্নিগ্ধবসন্ত সুসেবিত পুষ্পিত চম্পক
বেলা মালতি জাতি।
বিরহ তথা মম হৃদয় বিলাসী!
শতফুলগন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভূজডোরে
হে চিরজীবনসাথী;
দিব পিককুজন, মলয়সমীরণ,
কুসুমহার দিব গাঁথি'
শয়নতরে দিব শিশিরসংশীতল
কিশলয়কোমল এ বৃক পাতি'।

ভূতের প্রবেশ

ভূত। উপস্থিত পত্রবাহ মেবার হইতে।
পৃথবী। মেবার হইতে? দাও ফিরায়ে তাহারে।
তারা। ছিছি নাথ! ফিরাইয়া দিবে বৃন্দ তব
পিতার প্রেরিত দূতে, অবমান করি'
তাহারে?—প্রাণেশ!—জানি ইহা অভিমান।
জানি ইহা ভালোবাসো তুমি পিতারে;
নহিলে
হইত না অভিমান।—কিন্তু অভিমান
রাহুসম গ্রাস করে পূর্ণচন্দ্রে যদি
আবার সে রাহুদন্ত পূর্ণচন্দ্র হাসে।
পৃথবী। উত্তম! ডাক সে দূতে।
ভূত। যথাদেশ প্রভু।
[প্রস্থান।

তারা। ভালো নাহি বাসো নাথ চিতোরে?
পৃথবী। চিতোর
আমারে বাসে না ভালো।

তারা। তোমারে বাসে না
ভালো, কেহ হেন আছে জগতে বল্লভ?

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! দিয়াছেন এই পত্রখানি
সূর্য্যমল, মহারাজে।
পৃথবী। দাও পত্র দূত। [পত্র লইয়া পড়িয়া
বিস্ময় প্রকাশ]
তারা। কি সংবাদ পত্রে?
পৃথবী। অতি অদ্ভুত সংবাদ!
—যাহা, কভু কোথা ঘটে নাই, ঘটে তাহা,
দেখিতেছি, মেবারের রাজপরিবারে।
পিতৃব্য বিদ্রোহী! সঙ্গে দিয়াছেন যোগ
মজফর ও সারঙ্গদেব। তিন জন
সমুদ্যত আক্রমণ করিতে চিতোর।
দিয়াছেন সে সংবাদ স্বয়ং বিদ্রোহী,
আমারে করিয়া অনুরোধ, দিতে যোগ
বৃন্দপিপাসহ এই যুদ্ধে।

তারা। অত্যদ্ভুত!
যাইবে?

পৃথবী। না তারা! করিব না পদার্পণ
চিতোরে কদাপি আর।

তারা। কি হেতু বল্লভ?

পৃথবী। দিয়াছেন পিতা মোরে বহিস্কৃত করি'
আপনি চিতোর হ'তে। তদুপরি পিতা

করেন নি আহবান আমারে। পিতৃব্যের
নাহি স্বহ্ম আহবান করিতে!

তারা। পদনরায়
অভিমান?—রহিবে বসিয়া কোন্ প্রাণে
যখন বিপন্ন বৃদ্ধ পিতা—নিঃসহায়?
তিনি তব পিতা, তিনি বৃদ্ধ নিঃসহায়;
তঁর অভিমান সাজে; কিন্তু তুমি নাথ!—
পুত্র তাঁর, বীর, পূর্ণ সম্পদগোরবে:
এই ক্ষুদ্র অভিমান তোমারে না সাজে।
তোমারে না সাজে হেথা রহিতে এ হেন
মগ্ন সুখে, নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
যখন তোমার পিতা আচ্ছন্ন বিপদে
—উঠ বীরবর! উঠ প্রাণাধিক! উঠ,
এ কলঙ্ক কর দূর।—এ ঘন কার্লামা
স্পর্শ করিবে না তব শূদ্র যশোরশি।

পৃথবী। তাই হোক—আর তুমি?
তারা। যাইব সমরে
পতিসঙ্গে। নাথ!—আমি ক্ষত্রিয় রমণী।
পৃথবী। তাহাই হউক! তারা!—তুমি ধন্য
নারী।—

তুলিছ গড়িয়া তুমি নিজ হস্তে প্রিয়ে
চরিত্র পৃথবীর।

তারা। আমি শূদ্র বহিসম
করিতেছি অনাবিল খনিজ কাণ্ডনে।
[নিষ্কান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রাহু।

একাকী সশস্ত্র রাণা

রায়মল। বাধিয়াছে সমর। বিদ্রোহী সেনাপতি,
দিয়াছে সমরে যোগ মালবের সনে
সসৈন্যে—হা সূর্য্যমল! সহিয়াছি আমি
নীরবে উপর্যুপরি তিন পুত্রশোক,
একমাত্র প্রাণাধিক কন্যার বিচ্ছেদ;
কিন্তু এই তব আচরণ—সূর্য্যমল—
শেলসম বাজিয়াছে বন্ধে। এত ব্যথা
কভু পাই নাই। কি করিলে সূর্য্যমল!
কি করিলে?—এ যে কভু স্বপ্নে ভাবি নাই।

দূতের প্রবেশ

রায়। কি সংবাদ দূত?

দূত। রাণা! সমূহ বিপদ
করিয়াছে অধিকার শত্রুদল আসি',
দক্ষিণে বাতুরো সাদ্রি।

রায়। ইহা সত্য কথা?
দূত। সত্য কথা মহারাজ! আসিছে এক্ষণে
আক্রমণ করিতে চিতোর। পাতিয়াছে
শিবির গম্ভীরাতীরে।

রায়। স্পর্শ এতদূর!
কি করিছে আমার সেনানী?

দূত। পলায়িত।

নব সেনাপতি সহ।

রায়। নিয়াছে উৎকোচ।—
চিতোর প্রহরিগণ?

দূত। রক্ষা করে দ্বার
চিতোরের পুর্বেবৎ।

রায়। অত্যাশ্রম! যাও!
[দূতের প্রস্থান।

স্বয়ং যাইব আমি সমরে প্রত্যুষে।
'কি করিব'? একাকী মরিব যুদ্ধে, আমি
ক্ষত্রিয়। জানি না ভয়। মৃত্যু আর আমি
এক ক্রোড়ে মানুষ হয়েছি। নাহি ডরি
মৃত্যুরে। মরিব আজি ক্ষত্রিয়ের মত
চিতোরের রাণার মতই, অসি করে,
যুদ্ধক্ষেত্রে মহানন্দে।—কিন্তু সূর্য্যমল?
কি করিলে তুমি?—রক্ষা কর মা ভবানী।
চক্রীর চক্রান্তগত লুপ্ত সূর্য্যমলে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শিবির। কাল—অপরাহ্ন।

একাকিনী তারা

তারা। বাধিয়াছে ঘোর যুদ্ধ। মরণ কল্পোল
উঠিয়াছে চারিদিকে। দেখিয়াছি আজি,
যাহা দেখি নাই পূর্বে জীবনে কখন,
গজবাজীমনুষ্য রক্তাক্ত কলেবরে
গড়াগাড়ি যায়, ভূমিতলে স্তম্ভপীড়িত
একাকার।—শূন্যিয়াছি—যাহা শূন্যি নাই
পূর্বে কভু,—শস্ত্রধনি, সমরচীৎকার,
মরণের আন্তর্নাদ—বিমিশ্রিত ঘোর
অসীম বিকট কোলাহলে। করিয়াছি
যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি, জীবন, প্রবল
বিরাট উৎসাহে। আনিয়াছি বন্দী করি
এই হস্তে মজফরে আজি।

প্রহরীস্বরের সহিত শৃঙ্খলিত মজফরের প্রবেশ
প্রহরী। যুবরাণী!

তারা। আমার শিবিরে!

রাখিব বন্দিরে কোথা?

—বীর তুমি মজফর! দিব মৃত্তক করি'
এই যুদ্ধ অবসানে তোমারে! 'নির্ভয়
রহিও! আমরা ক্ষত্র! বধ নাহি করি
নিরস্ত বন্দীরে!

মজফর। তুমি বীর নারী বটে!

তারা। তুমি দেখে নাই পুঙ্খবৎ ক্ষত্রিয় রমণী!

ক্ষত্রিয় রমণী আমি!—যাও, নিয়ে যাও
বন্দীরে প্রহরী!—

[সৈন্যসহ মজফরের প্রস্থান।

তারা। এই জয়বার্তা যবে
শূন্যবেদন যুদ্ধ হ'তে ফিরি' প্রাণেশ্বর,
কত ভালোবাসিবেন আমারে। আমার
আজি গৌরবের দিন—কিন্তু এইক্ষণে,
কোথা যুবরাজ?—অবসানপ্রায় দিবা।
এখনো সমরক্ষেত্র হ'তে, কই, তিনি
নহে প্রত্যাগত? যুদ্ধে নাথের উন্মাদ
জানি—

সৈন্যদলসহ সেনাপতির প্রবেশ

—এক সেনাপতি! তুমি আসিয়াছ
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে?

সেনা। সত্য, আসিতোছি আমি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে, রাণী।

তারা। কোথা যুবরাজ!—
হইয়াছে জয়?

সেনা। হায় রাজপুত্র!—জয়!

প্রবেশিত যুবরাজ শত্রু সৈন্যদলে,
যুদ্ধেছেন, বীরবর, দস্ত সিংহবৎ:
কিন্তু এতদূর অগ্রসর যুবরাজ,
ফিরিবার নাহি পথ। তাঁর সৈন্যদল
নিহত শত্রুর ব্যূহে প্রায় সর্বজন।

তারা। কি করিছ সেনাপতি? তুমি পার্শ্ব তাঁর
ছাড়িয়া এসেছ নিরুদ্বেগে? পলায়েছ
শৃংগালের মত তবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে,
পরাজয় সম্বাদ লইয়া?—সেনাপতি!
ক্ষত্রিয় পুরুষ তুমি? আমি তুচ্ছ নারী
ফিরিয়াছি যদি যুদ্ধ হ'তে, ফিরিয়াছি
জয়লাভ করি, বন্দী করি' অরাতিরে;

এইক্ষণে যাই যুদ্ধে পুনর্বার আমি,
উদ্ধারিব যুবরাজে।—কে আসিবে এস।
প্রবল ঝঞ্জার মত গহন কাননে,
পিড়িব শত্রুর দলে; করিব নিশ্চল,
উড়াইব ধূলিসম! বাড়বাগ্নিসম
নিঃশ্বাসে করিব ভস্ম তাহারে নিমিষে।
—যার ইচ্ছা এস সঙ্গে। যার ইচ্ছা রহ।
সেনাপতি। যুবরাণী! কে রহিবে লুকায়ে

গহবরে,

যখন গভীরস্বরে ডাকেন জননী?

কার প্রাণে এত মায়া?—চল মা এক্ষণে,
বিপক্ষ শিবিরে পিড়ি' করিয়া হৃৎকার,
জিনিব সমর কিম্বা মরিব সংগ্রামে।

তারা। চল তবে, ডাক সৈন্যে, কহ 'ভয় নাই'
ঘন উচ্চৈঃস্বরে। 'ভয় নাই, আমি আছি।'
[জানু পাতিয়া] রক্ষা কর ভগবতি চণ্ডি।

প্রাণেশ্বরে,

যতক্ষণ আমি নাহি আসি পার্শ্ব তাঁর।
—দাও শক্তি মহাশক্তি! যাইছে সমরে
সতী—তার প্রাণেশ্বরে করিতে উদ্ধার।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—একটি সাধারণ গৃহাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ন।
শান্তিরক্ষক প্রহরী ও জনৈক সৈনিক

সৈনিক। আঃ, কি যুদ্ধটাই হোল।
শান্তিরক্ষক। হাঁ হাঁ, কি রকম বল দেখি!
কে জিতলে?

সৈনিক। আঃ, যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে
গেল।

শান্তিরক্ষক। এ্যাঁ! যুদ্ধ দেখে চক্ষু
জুড়িয়ে গেল কি রকম!

শান্তিরক্ষক। কে জিতলে?

সৈনিক। যুদ্ধ যারে বলে!

শান্তিরক্ষক। কি রকম! কে জিতলে?

সৈনিক। তবে শুনবে? শোন। কিন্তু
আমি যে রকম নিয়মে বলবো, সেই রকম নিয়মে
শুনে যেতে হবে। নৈলে—এই চূপ।

উভয়ে। আচ্ছা তাই।

সৈনিক। এই শোন। এই প্রথমতঃ মনে
করো খুব যুদ্ধ হচ্ছে। মনে করো।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। মনে কচ্ছে?

উভয়ে। ক'চ্ছ।

সৈনিক। মনে কচ্ছে?

উভয়ে। ক'চ্ছ, তারপর?

সৈনিক। ও রকম "তারপর" বললে চলবে না।—শুদ্ধ শব্দে যাও।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। উত্তর দিক থেকে মজফর, দক্ষিণ দিক থেকে সারঙ্গদেও, পূর্ব দিক থেকে সূর্যামল আর পশ্চিম দিক থেকে রায়মল, চিতোর আক্রমণ কল্লে।

শান্তিরক্ষক। সে কি। আমাদের রাণা রায়মল চিতোর আক্রমণ কল্লে কি রকম?

সৈনিক। কি রকম আবার।—ঐ রকম।

প্রহরী। রায়মল চিতোরের রাণা, চিতোর আক্রমণ কর্তে যাবে কেন?

সৈনিক। তাও ত বটে। তবে পশ্চিম দিক থেকে কে এল? তিনদিক ত মিলে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকটা কি একেবারে ফাঁক ছিল? ও দিক থেকে কে এল?

উভয়ে। তা আমরা কি জানি?

সৈনিক। এই ধর—রোস—মনে করে নেও আমি যেন—আমি যেন মজফর; তুমি সূর্যামল; আর তুমি যেন সারঙ্গদেও;—আর রায়মল কে হবে?

উভয়ে। তা কি জানি।

সৈনিক। আচ্ছা রোস [সহসা বাহিরে গিয়া পথবর্তী একজন কৃষককে ধরিয়া আনিয়া]—এই—দাঁড়া।

কৃষক। এজ্ঞে, ম'ই ত কিছু করিনি।

সৈনিক। আরে, কে বলছে যে করিছিস্।

কৃষক। এজ্ঞে তবে—

সৈনিক। তোকে একটু দরকার আছে। তুই রাণা রায়মল হ'তে পারিবি?

কৃষক। এজ্ঞে না।

সৈনিক। এজ্ঞে না কিরে! দাঁড়া, তোকে রাণা রায়মল হ'তে হবে।

কৃষক। এজ্ঞে—

সৈনিক। আরে দাঁড়া না। একটু খানিকের জন্যে একবার তোকে রাণা রায়মল হ'তে হচ্ছে। ছাড়িছনে।

কৃষক। এজ্ঞে, কি কর্তে হবে?

সৈনিক। কিছু কর্তে হবে না। শব্দে দাঁড়িয়ে থাক্। মাঝে মাঝে একবার কাস্তে ঘোরাতে হবে। ব'ঝেছিস্।

কৃষক। এজ্ঞে।

সৈনিক। আচ্ছা, সূর্যামল কে?

শান্তিরক্ষক। আমি।

সৈনিক। বেশ! [প্রহরীকে] আর তুমি মজফর—না না, আমি ত মজফর। তুমি হচ্ছ সারঙ্গদেও [কৃষককে] ঠিক হয়ে দাঁড়া। সূর্যামল পূর্বদিকে থাক। সারঙ্গদেও—উত্তরদিকে। না না, দক্ষিণদিকে—আর আমি মজফর উত্তরদিকে। রায়মল মধ্যে। ধর, খুব যুদ্ধ হচ্ছে—[কৃষককে] কাস্তে ঘোরা—যুদ্ধ হচ্ছে।

উভয়ে। যুদ্ধ হচ্ছে।

সৈনিক। সারঙ্গদেও, দক্ষিণ দিক থেকে এস, সূর্যামল, পূর্বদিক থেকে এস। আর আমি এই—রায়মলকে আক্রমণ কর। [সকলে আসিয়া কৃষককে প্রহার আরম্ভ করিল।]

কৃষক। এজ্ঞে—

সৈনিক। তোর কোন ভয় নেই। পৃথ্বীরাজ এলো বলে', মাথার উপর কেবল কাস্তে ঘোরা। দেখিস্ যেন আমাদের গায়ে না লাগে। ঘোরা—পৃথ্বীরাজ আর তারা এল বলে'। [কৃষক চীৎকার করিতে লাগিল ও কাস্তে ঘোরাইতে লাগিল।]

লাগল হস্তে এক কৃষক ও কৃষক পত্নীর প্রবেশ

২ কৃষক। সাধুসাকে মাছি'স কেন সব? মাতাল হয়েছিস্ নাকি? বেরো বেটারা।

সৈনিক। [ফিরিয়া দেখিয়া] এই যে পৃথ্বীরাজও এয়েছে—তারাবাইও এয়েছে। এই তারা আমাকে বন্দী কল্লে। [কৃষক পত্নীর গলধারণ] আর পৃথ্বী! ঐ বেটা সূর্যামল—ও'র ঘাড়ে মার কোপ। আমাকে মারিস কেন? আমি যে মজফর। এই যুদ্ধ খতম। পালা সূর্যামল, পালা সারঙ্গ দেও, পালা পালা—পৃথ্বী এয়েছে। দৌড় দৌড়।

[তিন জনে পলায়ন।]

২ কৃষকপত্নী। কি, সাধুসা তোমাকে মাছি'ল কেন?

১ কৃষক। কি জানি—আমারে—আমারে রাণা রাইমল সাজাইছিল।

২ কৃষক। বেটারা তাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়।
চল্।

১ কৃষক। [যাইতে যাইতে] ভাগিগস
এইছিলি ভাই। নইলে মোর জান যেত।
[নিষ্কান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সূর্যামলের শিবির। কাল—রাতি।

সূর্যামল ও তাহার পত্নী তমসা

তমসা। নিদ্রা হয় নাই?

সূর্য্য। নিদ্রা? সমস্ত—দিবস

করিয়াছি শয্যা পরিক্রমণ। বেদনা—

বিষম বেদনা স্কেধে। তমসা! তমসা!

—কেন হইল না মৃত্যু?—পৃথ্বী প্রিয়তম!

মানুষ করেছি—ক্রোড়ে করে; সমর্চিত

পুরস্কার দিলি আজ। তোম খজা শেষে

পাঁড়ল এ স্কেধে? কিম্বা তুই কি করিবি?

ঐ দৈবের প্রতিশোধ। রায়মল ভাই—

সে-ও ত আমারে ক্রোড়ে ধরে, কত স্নেহে

লালন করিয়াছিল। তদস্মে বর্ষিত—

আমি হইয়াছি তার বিশ্বাসঘাতক;

তার পুত্র লইয়াছে প্রতিশোধ। তবে,

—কেন হইল না মৃত্যু।

তমসা। হ'য়ো না অস্থির।

সূর্য্য। অস্থির? হইব স্থির অচিরে প্রেরসী।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। উপস্থিত স্বারে মেবারের যুবরাজ।

সূর্য্য। পৃথ্বী! পৃথ্বী!—নিরে এস স্বরা

সসম্মানে।

[সৈনিকের প্রস্থান।

তমসা। [স্বগত] উপনীত পৃথ্বীরাজ কি

হেতু শিবিরে?

পৃথ্বীর প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। এস প্রিয়তম বৎস!—দীর্ঘজীবী হও!

[তমসাকে] কর আশীর্বাদ!—কেন

ফিরাইছ মৃধ।

ইহা যদ্বন্ধেয় নহে; এ আমার গৃহ।

পৃথ্বী প্রাণঘাতী শত্রু নহে এইকণে;

সে আমার ভ্রাতৃপুত্র। স্নেহের সামগ্রী।

কর আশীর্বাদ প্রিয়ে,—কর অভ্যর্থনা;

—এস বৎস! প্রাণাধিক। দীর্ঘজীবী হও।

তমসা। দীর্ঘজীবী হও।

পৃথ্বী। কত কিরূপ? পিতৃব্য!

সূর্য্য। বেদনা বিষম; তবু বহু উপশম

হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া প্রাণাধিক,

এতদিন পরে।

তমসা। পৃথ্বী—সাধিয়াছ ভালো

পিতৃব্যে তোমার কাজ।

পৃথ্বী। মা, তোমার চেয়ে

বাজিয়াছে এই দুঃখ আমারে অধিক।

মৃধ ঢাকিলেন

সূর্য্য। সাধন করে'ছ তুমি কর্তব্য তোমার।

পিতার রক্ষার হেতু উঠায়েছ অসি

বিদ্রোহীর স্কেধে। তুমি করিয়াছ স্বীয়

কর্তব্য!—করিনি আমি কর্তব্য আমার।

আমি যার অঙ্গে পুন্ট তাহারি মস্তকে

করিয়াছি লক্ষ্য অসি! আমি করি নাই

কর্তব্য আপন।

পৃথ্বী। হায়! পিতৃব্য, কি হেতু

এ প্রমাদ?

সূর্য্য। শূন্যে না বৎস, সেই কথা।

—ভুলিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে এতক্ষণ,

ভ্রাতার কুশল বাস্তী।

পৃথ্বী। দেখা হয় নাই

এখনো পিতার সঙ্গে।—পিতৃব্য এক্ষণে

বিষম কুধার্ত আমি। খাদ্য কিছ্ আছে?

সূর্য্য। আছে খাদ্য কিছ্? দাও তমসা।

তমসা। দিতেছি।

[স্বগত] থাকিত যদ্যপি ভিক্ষ দিতাম

ও মৃধে।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। ধন্য তুমি পৃথ্বীরাজ! আর ধন্য তব

নবোঢ়া বনিতা তারা;—প্রচণ্ড বিক্রমে

করিয়াছে বন্দী মজফরে বীর নারী।

কোথা তারা?

পৃথ্বী। শিবিরে।

তমসার খাদ্য লইয়া প্রবেশ

সূর্য্য। এনেছ?

তমসা। যাহা ছিল এনেছি।

পৃথ্বীর সম্মুখে খাদ্য রাখিলেন

সূর্য্য। তমসা, খাইতে বল।—খাও বৎস তবে।

তমসা জানোই স্বল্পভাষণী স্বতঃই।

পৃথ্বী। [আহার করিতে করিতে]

যদ্বন্দ্ব করিয়াছি আজি সিংহের বিক্রমে,
পিতৃব্য।

সূর্য্য। যদ্যপি স্বন্ধে নাহি পাইতাম

সাংঘাতিক এ আঘাত সহসা, হইত

অদ্যকার সমরের ফল অন্যরূপ।

তথাপি দঃখিত নহি।—পরাজিত আমি

স্বহস্তে লালিত দ্রাতৃপুত্রের বিক্রমে।

পৃথ্বী। দাও বারি।

তমসা। [জল দিলেন]

পৃথ্বী। পান আছে?

তমসা। এই লও। [প্রদান]

পৃথ্বী। তবে

যাই আমি, পিতৃব্য, সমরক্রান্ত আমি;

—আবার হইবে দেখা সমরপ্রাণে,

প্রভাতে, ভরসা করি।

সূর্য্য। নিশ্চয়, যদ্যপি

ক্ৰণমাত্র এই ক্ষত উপশম হয়।

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম

চরণে

সূর্য্য। যাও, যদ্বন্দ্ব জয়ী হও যশস্বী, সর্ব্বদা,

বংশদীপ—মেবারের যুবরাজ!

[পৃথ্বীর প্রস্থান।]

তমসা। বৃদ্ধি না তোমার রীতি।

সূর্য্যমল। বৃদ্ধিবে তমসা,

একদিন!—কোথায় সারণদেব?

তমসা। স্বীয়

শিবিরে।

সূর্য্যমল। আসিতে বল আমার শিবিরে।

করিতে হইবে শীঘ্র যদ্বন্দ্বের মন্ত্রণা।

[তমসার প্রস্থান।]

সূর্য্যমল। জ্বালায়েছি অগ্নি যদি—সে অগ্নি

জ্বলিবে,

জ্বালাইবে পুরুপত্নী! কিন্তু যদি হয়

জয়লাভ? কি করি? বসিব আপনি

মেবারের সিংহাসনে?—না। ছাড়িয়া দিব

সিংহাসন পৃথ্বীরাজে! সম্পত্তি যাহার,

তাহার হউক! আমি করিব যাপন

জীবনের শেষ, দূর অরণ্যে নিভুতে।

ধর্ম্মকর্ম্ম প্রার্থন করিব ইহার।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সিরোহী, যমুনার কঙ্কের ছাদ। কাল—রাতি।

একাকিনী যমুনা

যমুনা। ঘোর অমাবস্যা রাতি।—গগনমন্ডলে

জ্বলিছে নক্ষত্রপুঞ্জ, ভূত কাহিনীর

সুখস্মৃতিসম, ঘন নৈরাশ্য-সাগরে।—

—নিস্তম্ব ধরণী। শূন্য দূরে বংশীধ্বনি

উঠিছে বিলাপসম রজনীর মূখে

—এস নিশাধিনী! এস প্রিয় সখী মম।

দঃখিনী আমরা বসি' কাঁদি এ নিঃস্বপ্নে।

গীত

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে।

ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।

হৃদ করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,

তব শান্তিভলে দেবি নিভাও গো তাহারে।

হয় যে সময় হৃদে হৃদয়ে যে শেল বিধে—

তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে।

—গাঢ় হতে গাঢ়তর অন্ধকাররাশি

ঢেকে আসে পৃথ্বী। গাঢ় হতে গাঢ়তর

ঢেকে আসে নৈরাশ্য অস্তরে, নাহি জানি

হইবে কোথায় পরিসমাপ্ত নাটিকা।

“সতীর দেবতা পতি” পিতৃব্যের এই

উপদেশ করিয়াছি জীবন আশ্রয়।

দঃখে, শোকে, অপমানে, চিন্তের বিপ্লবে,

অকূল সমুদ্রে, করিয়াছি ওই মন্ত্র

জীবনের ধুবতারা। তবু মাঝে মাঝে

ঢেকে যায় সেই জ্যোতি নিবিড় জলদে;

আবার দেখিতে পাই তারে। কিন্তু হায়,

বৃদ্ধিমাছি এ সমুদ্রে কূল পাইব না।

বৃদ্ধিমাছি নাহি এই দঃখের অবধি।

তবু ধৈর্য ধরে' থাকি। করি এই স্বত

নীরবে নিভুতে একা দঃখে উদ্‌যাপনা।

—তবু পারি না যে ভালোবাসিতে পতির;

করিতে তাহারে ভক্তি, দিতে অস্তরের

পূজা,—পারি না। দয়াময়! শক্তি দাও,

শক্তি দাও যমুনার দঃখের হৃদয়ে।

—এই যে আসেন পতি! আজি যে সহসা?

প্রভুরাওর প্রবেশ

প্রভু। যমুনা!—

যমুনা। [স্বগত] স্বর যদি রাজা ডিত

দেখিছি।

প্রভু। তোমার নাম যমুনা? তোমার বাপকে আমি চিনি না ত। তোমার বাপের নাম কি?

যমুনা। আমার পিতা মেবারের রাণা রায়মল।

প্রভু। বটে বটে! সেই বেটাই তোমার বাপ বটে। ঐ যে কি নাম বললে তার। তোমার ঐ বাপ, প্রেয়সী তোমার বাপ চোর—বেজায় চোর।—রাগ করো না;—প্রমাণ দিচ্ছি—

যমুনা। প্রভু! আমার পিতা সাধু কি চোর, তা তোমার মুখে শুনতে চাই নে।

প্রভু। প্রমাণ দিচ্ছি—এই সেই পাজি বদমায়েস বড়ো তার বেহাই শূর্তনকে রাজ্যের খানিক ছেড়ে দিলে। আর আমি কি বাবা ভেসে এসেছিলাম। দেখ যমুনা, তোমার ভাই ওই যে শালা—পৃথবী—শালা একেবারে নীচ খোসা-মুদে জোচোর হাড়হাঘাতে বেশ্যাসক্ত—

যমুনা। পায়ে ধরি প্রভু! আর থাকুক। আমার মনে ব্যথা দিও না। বড় ব্যথা পাই।

প্রভু। ওঃ! উনি ব্যথা পান ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সত্যি কথা বলব, তার আর ভয় কি; নিশ্চয় বলবো। আমি প্রমাণ করে' দিচ্ছি, যে তার স্ত্রী দস্তুর মত বারাঙ্গনা ছিল। তোমার ভাই জয়মল তাকে রেখেছিল। তার শোবার ঘরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তোর ভাই পৃথবী—সাধের ভাই পৃথবী—তোর প্রাণের ভাই পৃথবী—তাকে বিয়ে করেছে কি না?—যাবি কোথায়? শূনে যা—

যমুনা। তা আমার কাছে বলে' কি হবে?

প্রভু। কি হবে? হবে এই যে, আমি তোকে মাথা মর্দিয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চাঁড়িয়ে—দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। এমন বাপের মেয়ে, এমন ভায়ের বোনকে আমার ঘরে রাখলে কলঙ্ক হয়।

যমুনা। তাই হোক।

প্রভু। কিন্তু তার আগে তোর সামনে এই তোর বাপকে এক পয়জার; তোর ভাইকে দুই পয়জার।—

উদ্দেশ্যে পাদুকা প্রহার

যমুনা পায়ে ধরিতে উদ্যত প্রভু তাহাকে সবলে

আঘাত ও যমুনার পতন

প্রভু। কেমন! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান।

যমুনা। এই স্বামী আমার দেবতা। মা জগদম্বে!—এ অন্ধকারে পথ দেখাও, আর পারি না যে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বনশুশিবির; স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে।
কাল রাত্রি।

সূর্যমল ও সারঙ্গ

সূর্য্য। আমার যথাসাধ্য তা করেছি। নগর হতে নগরে, বন হতে বনে বিতাড়িত হ'য়ে শেষে এই বাতুরো জঙ্গলে আশ্রয় নিইছি। আমার কাজ আমি করেছি।

সারঙ্গ। তোমার কাজ তুমি করোনি।

সূর্য্য। আমার কাজ আমি করিনি? হায় ভগবান্! ভাইয়ের বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করেছি; ভাইপোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছি। আর তুমি? লুঠ নিয়ে ব্যস্ত।

সারঙ্গ। নইলে সৈন্যদের বেতন কোথা থেকে আসত সূর্য্য? তোমার কোষাগার নেই; গচ্ছিত ধন নেই।

সূর্য্য। এরূপ অযথা উপায়ে এ সমর নিস্বাহ কর্তে হবে জানলে, আমি এতে প্রবৃত্ত হতাম না।

সারঙ্গ। প্রবৃত্ত হয়েছিলে কেন? কার দোষ?

সূর্য্য। তোমার দোষ। তোমার মন্ত্রণায় এই সর্বনাশ।

সারঙ্গ। যা হবার তা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা কর।—ও কি, ঘোড়ার পায়ের শব্দ না?—শত্রু নাকি?

সূর্য্য। 'এ নিশ্চয়ই ভ্রাতৃপুত্র পৃথবী। তরবারি কই?

তরবারি গ্রহণ, বেগে পৃথবী ও তারার প্রবেশ

পৃথবী। এই যে [সূর্য্যমলকে আক্রমণ ও সূর্য্যমলের পতন]।

সারঙ্গ। ধিক্ পৃথবী! তোমার পিতৃব্যের গায়ে আর সে শক্তি নাই।

পৃথবী। স্তম্ভ হ' বিদ্রোহী। [সূর্য্যকে] পরাভব স্বীকার কর?

সূর্য্য। পরাভব স্বীকার করি, পৃথবী!

পৃথবী। [সূর্য্যকে ছাড়িলেন]

সূর্য্য। পৃথবী! তোর কাছে পরাভব

স্বীকার করি, তাতে আমার লজ্জা নাই! আমি তোকে 'ক্লোড়ে করে' মান্দুষ করেছি। এ সুন্দর সুপেশী বলিষ্ঠ দেহ ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার মত বাড়তে দেখেছি। প্রত্যেক অবয়ব, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী আমার কাছে পরিচিত। তাতে অস্বাভাব্য কণ্ঠে আমার বুক ফেটে যায় পৃথবী।

পৃথবী। কি কৰ্ণে পিতৃব্য! যখন এই কালানল জ্বালিয়েছে—

সূর্য্য। ভাবিসনে পৃথবী, যে আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলছি। চিতোরের বীরমণ্ডলীকে নিয়ে আয়; এখনও যুদ্ধ কণ্ঠে পারি কি না দেখ। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথবী। কেন পিতৃব্য, যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই।

সূর্য্য। নেই বটে! কিন্তু ভেবে দেখেছি যে, তোর সঙ্গে যুদ্ধে আমার জয়েই বেশী লোকসান। যুদ্ধে আমি যদি মরি, আমার কি? আমি অপদ্রব, আমার জন্য কেউ কাঁদবার নেই। কিন্তু তুই যদি মরিস, তা হলে চিতোরের কি হবে?—আমার মূখে চিরকালের জন্য চূর্ণ-কালি পড়বে। তোর সঙ্গে আর না। চিতোরের বেছে বেছে একশত বীর নিয়ে আয়। একা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথবী। [অবনত মস্তকে] বুদ্ধেছি পিতৃব্য, এত দিনে বুদ্ধেছি। যুদ্ধে কেন তোমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যখন আমার দেহে অস্ত্রের দাগটি লাগেনি তা—এখন বুদ্ধেছি।—পিতৃব্য ক্ষমা কর।

সূর্য্য। ক্ষমা কর্ব কি রে? তোর উচিত কাজ তুই করিস্। আমি বিদ্রোহী; আমিই ক্ষমার পাত্র।

পৃথবী। সে ক্ষমার উপায় আমি কর্ব।—না পিতৃব্য, আর না, আমাকে আশীর্বাদ কর।

সূর্য্য। [আশীর্বাদ করিলেন] এ বালকটি কে?

পৃথবী। ইনি আমার পত্নী, তারাবাই!

সূর্য্য। মা তুমি তারা! তুমিই সেই বীর নারী, যে স্বহস্তে মজফরকে বন্দী করেছিল! হায় মা, যে দেশে হেন বীর নারী জন্মে, সে দেশে কি হেন কাপদরুধ জন্মে—যে আপনার

ভাইয়ের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কণ্ঠে হয় যবনের সহায়তা গ্রহণ করে?—মা তুমি আয়ুষ্কামী হও।

সারঙ্গ। তবে কি বুদ্ধে যে এ যুদ্ধ এই-খানেই সমাপ্ত।

পৃথবী। পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ এইখানেই শেষ।

তারা। পিতৃব্যপত্নী কোথায় পিতৃব্য?

সূর্য্য। কালীর মন্দিরে গিয়েছিল।

[সারঙ্গকে] এখনো ফিরে নাই কি?

সারঙ্গ। জানি না [স্বগত] মাঝে মাঝে তাঁকে উল্মাদিনী বোধ হয়। আমার প্রতি তাঁর আচরণ অদ্ভুত। অনেক সময় উদ্ভ্রান্তভাবে আমাকে পুত্র সম্বোধন করেন।

পৃথবী। এখানে কালীর মন্দির আছে না কি?

সারঙ্গ। আছে।

পৃথবী। উত্তম! কাল তুমি আমি সেখানে গিয়ে, মাতাকে উৎসর্গ দিয়ে এ যুদ্ধ শেষ কর্ব। বলির আয়োজন আমি কর্ব।

সূর্য্য। তাই হোক।

পৃথবী। তবে আজ এখানে থাকব।

সূর্য্য। নিশ্চয়।

পৃথবী। আমরা আসবার আগে তোমরা কি করিচ্ছিলে খুড়ো?

সূর্য্য। এই আবোল তাবোল বকিচ্ছিলাম।

পৃথবী। তোমার মাতার উপর আমি হেন তোমার শত্রু যখন খাড়া রইছি, তখন তুমি এত উদাসীন ভাবে আবোল তাবোল বকিচ্ছিলে?

সূর্য্য। কি কর্ব পৃথবী? তিস্তম্ন আর উপায় কি?

পৃথবী। চল ভিতরে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কালীর মন্দির। কাল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত।

পৃথবী একাকী

পৃথবী। কালী! জগদম্বা! আমি করিব তোমার পূজা নরবালি দিয়া। আমার, অথবা সারঙ্গদেবের মন্ড লোটাতে চরণে তোমার জননি, আজি! দিব মহাপূজা।—আসিছে সারঙ্গদেব!

সারঙ্গদেবের প্রবেশ

পৃথ্বী। পিতৃব্য কোথায়?
সারঙ্গ। শোণিতকরণে অতি দুর্বল, প্রভাতে
শয্যাগত তিনি! একা আসিয়াছি আমি।
পৃথ্বী। সে ভালোই হইয়াছে।
সারঙ্গ। কই? বলি কই?
পৃথ্বী। আছে বলি।
সারঙ্গ। কই, কিছই দেখি না।
পৃথ্বী। হাঁ আছে! সারঙ্গদেব! বলি মাতৃপদে
তুমি কিম্বা আমি।

সারঙ্গ। সেকি?
পৃথ্বী। তুমি জ্বালিয়াছ
এ বিদ্রোহ। করিয়াছি প্রতিজ্ঞা কালীর
সম্মুখে করিব এই সময়ের শেষ
আজি নরবলি দিয়া তোমারে, বিদ্রোহী।
তুমি জ্বালিয়াছ এই বিদ্রোহ। তোমার
শোণিতে করিব এই বিদ্রোহ নিৰ্বাণ।
আমি মার দিব নরবলি। বৃঝিয়াছ?
সেই বলি—তুমি কিম্বা আমি! নিষ্কাসিত
কর খজা।

সারঙ্গ। উত্তম তাহাই হোক! অসি
কর মৃত্ত। [অসি নিষ্কাসন] পৃথ্বীরাজ!
রাখিও স্মরণে,
আমি তব স্নেহাতুর কোমল স্বভাব
অথর্ষ পিতৃব্য নহি।—দয়া করিব না।
কঠিন কৃপাণ এই শোণিতলোলুপ।
পৃথ্বী। রক্ষা কর আপনারে বিশ্বাসঘাতক!
বৃদ্ধ ও সারঙ্গের পতন এবং দূরে গিয়া তাঁহার
মৃন্ডু নিষ্কান্ত হইল
পৃথ্বী। হোক এই রক্তে এই সময় নিৰ্বাণ।
লাভিব পিতৃব্যক্ষমা, পিতার চরণে—
করজোড়ে জানু পাতি', দিয়া উপহার
মূল বিদ্রোহীর ছিন্ন মৃন্ডু পিতৃপদে।

তমসার প্রবেশ

তমসা। একি! একি! কে করিল ইহা! পৃথ্বী
তুই? কি করিলি পৃথ্বী?
পৃথ্বী। পূজা দিলাম কালীর।
তমসা। দিয়াছ কালীর পূজা!—দাওনি
কালীর
পূজা, পৃথ্বী! করিয়াছ মোর সর্বনাশ।
নিষ্ঠুর!—জানিস পৃথ্বী কে সারঙ্গদেব?

পৃথ্বী। চিতোরের রাজবংশে জন্ম তার জানি
পূর্বে চিতোরাধিপতি 'লঙ্কে'র সন্ততি।
তমসা। হার পৃথ্বী!—কহি তবে কলঙ্কের
কথা
আমার!—সারঙ্গদেব সন্তান আমার।
পৃথ্বী। তোমার সন্তান?
তমসা। সত্য, আমার সন্তান। কিন্তু—কিন্তু
নহে তার পিতা সূর্যমল।
পৃথ্বী। কি কহিছ উন্মাদিনী?
তমসা। নহি উন্মাদিনী।

—কর রাষ্ট্র, পৃথ্বী, এই কলঙ্ককাহিনী
নগরে নগরে। আর করি নাক ভয়।
গিয়াছে সর্ষেব। ভয় করিব কি হেতু?
যার কিছ রাখিবার আছে বিশ্বতলে,
সেই ভয় করে। অদ্য আমার নিকটে
এই বিশ্ব মরুভূমি। এই চিত্ত হতে
সুখ দুঃখ আশা প্রীতি গিয়াছে ধুইয়া,
এ মহাপ্লাবনে। আর করে নাহি ডরি—
এস এস প্রলয়ের মহাদীপ্ত—তবে
জ্বল, জ্বল, দগ্ধ কর ভস্ম করে' দাও।

[উন্মাদবৎ নিষ্কান্ত]

পৃথ্বী। [হস্তে মূখাবরণ করিয়া]
নারী! ইহা কি সম্ভব!—জায়া তুমি
অবিশ্বাসী?
নারী! নারী! কি করিলে, কি করিলে তুমি।
তুমি যদি সতীধর্ম দাও জলাঞ্জলি,
সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হবে,
ধর্মলুপ্ত হবে;—তুমি যদি অবিশ্বাসী,
কে কাহারে করিবে বিশ্বাস বিশ্বতলে?
আহারে রহিবে বিষ; উপাধান তলে
লুক্কায়িত ছুরি; গৃহী হইবে সম্যাসী।
বাহিরের কর্মক্রান্ত হইতে মনুষ্য
আসে স্বীয়গৃহে, ধৌত করিতে প্রত্যহ
প্রেয়সীর স্নিগ্ধ প্রেম সর্ব অবমান,
সর্ব দুঃখ, সর্ব পাপ। দেখে যদি অসি'
শব্দ সে নিব্বর,—নর কোথায় বাইবে?
উদ্ভ্রান্ত পুরুষ ঘরে কর্ম আবর্তনে।
দিগ্বিদগ্; তুমি তারে রাখিয়াছ বাঁধি,
মাধ্য আকর্ষণে জায়া। ছিন্ন হয় যদি
সেই আকর্ষণ—নর কোথায় বাইবে!
—পবিত্র সম্বন্ধ সব মূছিয়া বাইবে
সংসার হইতে,—পিতা হবে পুত্রহীন;

পুত্র পিতৃহীন: ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন: বৃদ্ধ
বৃদ্ধহীন—ঈর্ষ্যায় সন্দেহে স্বপ্নে, সদা
হইবে গৃহীর গৃহ ভগ্ন ধ্বংসস্থপ,
মহা মরুভূমি, মহাশূন্য, একাকার।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।

রায়মল একাকী

রায়মল। ফিরিয়াছে পুত্র আজি, বিজয়ী সমরে,
সঙ্গে ল'য়ে পুত্রবধু। শূভদিন আজি।
কিন্তু এ সমরে হারায়োঁছ রত্ন এক—
অতুল্য অমূল্য রত্ন—ভাই সূর্য্যমলে।
পারিব না ভুলিতে সে আকোভ জীবনে।
পৃথ্বী ও তৎপশ্চাতে তারার প্রবেশ ও রায়মলকে
প্রণাম

রায়মল। আয়ুস্মান্ হও বৎস!—এ ঘোর সমরে
জয়ী আজি রায়মল তোমার বিক্রমে।
—আয়ুস্মতী হও, তারা। এস মা কল্যাণী!
তুমি আনিয়াছ শান্তি মেবারের গৃহে;
করিয়াছ দূর অভিমান-ব্যবধান
পিতা ও পুত্রের মধ্যে। বড় দয়াবতী
তুমি, বৎসে; তাই আসিয়াছ অনাহত,
অযাচিতভাবে এই রাজপরিবারে।

তারা। পিতা! আপনার স্বপ্নে আসিয়াছি আমি
আপন আলয়ে।

রায়মল। আস নাই স্নেহময়ী,
অশ্রয় লাভের তরে; আসিয়াছ তুমি
হাস্যমুখে—স্নেহময়ী জননীর মত—
অপরাধী পুত্রে টানিয়া লইতে ক্রোড়ে।
পৃথ্বী, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অভিলাষ,
গ্রহণ করিব অবসর, সমর্পিয়া
রাজ্যভার তব করে; করিব যাপন
জীবনের শেষ অঙ্ক নিভূতে নিষ্কর্মে।

তারা। কোথায় যাইবে তাত! যাইতে দিব না।
আমরা করিব সেবা; বহিব তোমার
বান্ধক্য, যেমতি জীর্ণ বটভারে বহে
তার শাখামূল।

রায়মল। বৎসে, শাস্ত্রের বিধান
কৃত্রের অস্তিত্বে যোগকার্য যোগ। আমি
করিয়াছি অবহেলা সে শাস্ত্রীয় বিধি

এতদিন;—তাই বৃদ্ধ এই পরিবারে
এত স্বপ্ন কোলাহল, অশান্তি, বিগ্রহ।
এইক্ষেণে যাই সভাগৃহে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বী।

আমি রাণা

মেবারের! নাহি তবে হইল সফল
চারণীর বাণী।—সঙ্গ হবে চিতোরের
রাণা। হা উদার সঙ্গ! কোথা তুমি আজি!
স্বেচ্ছায় রাজস্ব ছাড়ি' তুমি বনবাসী।
অবিচার করিয়াছি, হইয়াছি রুঢ়
অত্যাচারী আমি, বাহুশক্তিমদভরে।
করিও মাঙ্গর্জনা।

তারা।

কি ভাবিছ প্রিয়তম?

পৃথ্বী। ভাবিতেছি? প্রিয়তমে, করি নাই হেন
প্রতিজ্ঞা যখন, যাহা ভাবিব, তাহাই
করিতে হইবে নিত্য তোমার গোচর।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। যুবরাজ! আসিয়াছে যুবরাজ কাছে
সিরোহী হইতে দূত এ পত্র লইয়া।
পৃথ্বী। কি পত্র? কাহার পত্র? দেখি!

যমুনার!

[পত্র গ্রহণ ও পাঠ। প্রতিহারীর প্রস্থান]
যাহা ভাবিয়াছি।

তারা।

পত্র কার প্রিয়তম?

পৃথ্বী। সে সম্বাদে তোমার কি প্রয়োজন—
প্রিয়ে!

[বেগে প্রস্থান।

তারা। হরোঁছে নাথের পরিবর্তন এরূপ,
যুদ্ধ অবসানাবধি।—কথায় কথায়
উঠেন জ্বলিয়া ক্ষুদ্র-বাড়বাগ্নিসম।
কখন চাহেন হেন তীর, মৃদুপানে,
ভয় পাই; অবনত করি চক্ৰ! দৃটি।
এরূপ হইল কেন? মা ভবানী, কেন
এরূপ হইল—কিছু বৃদ্ধিতে না পারি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গম্ভীরা নদীর তীর। কাল—সন্ধ্যা।

তমসা একাকিনী উদাসিনী বেশে

তমসা। গেছে গেছে—সব গেছে। যা ছিল
না তা হোল না। যা ছিল তা গেল। নারীর

ধর্ম গেল। পতির প্রেম গেল। শেষে যার জন্য এত ষড়যন্ত্র, এত চেষ্টা, সেও গেল।—বুঝিছি এত দিনে, যে অধর্মপথে সুখ হয় না। অধর্মের শাস্তি এক দিন আসেই আসে। সে ইহজন্মেই হোক আর পরজন্মেই হোক। গেছে গেছে সব গেছে। তবে আমি আর পড়ে থাকি কেন। আজ এই গম্ভীরার জলে ঝাঁপ দিব। তার পর?—পরকালে নরকে পড়বো? হোক! তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার জীবন্তেই নরকযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে।—সারণ! সারণ!— কেন তোরে সেদিন দেখেছিলাম?—মায়া কাটিয়ে লোকলজ্জার ভয়ে তোকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিইছিলাম; কে আমার সর্বনাশ কর্তে তোকে বাঁচালো? কেন তুই সেদিন আমার সামনে এসেছিলি?—আহা! সেই সজল কাতরচক্ষে আমার কাছে অন্নবস্ত্র চাচ্ছিলি, অথচ জানতিস্ন না যে আমিই তোর মা? সে কথা তোর জীবনেও কখন জ্ঞান্তে পাল্লিনে। ভেবেছিলাম চিতোরের সিংহাসনে তোক বসিয়ে সে কথা বলবো। সে সুযোগ আর হোল না। সারণ! সারণ! আমার সারণ! আমার প্রাণাধিক পুত্র!—ওঃ—

গাইতে গাইতে এক ফকিরের প্রবেশ ও প্রস্থান
গীত

আমার আমার বলে ডাকি, আমার এও আমার তা তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা। আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে, আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা, আমার পতি, আমার পত্নী;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না। আমার যত্নের দেহ, ভবে, তাও রেখে যেতে হবে; আমার বলে কারে ডাকি?—চোখ বুজলে কেউ কারো না।

তমসা। তাও ত বটে। আমি কার? কে আমার—এ সংসারে কে কার? যাকে আমার বলে ডাকি; বড় আগ্রহে বড় আবেগে যাকে বদকে চেপে ধরি, বদকে চেপে তবু তৃপ্ত হয় না; যাকে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে চাই; সে ঐ যে যাদুকর মৃত্যু তার দণ্ডটি ছুঁইয়েছে, অর্মানি সে আমার একেবারে কেউ নয়—একে-কব্ধের পর!—একেবারে পর!—কেউ নয়। সে মায়া কাটিয়ে যার, ভালবাসা ভুলে যায়, নিন্দ্রয় ভাবে কোথায় চলে যায়, আর দেখতে পাই না।

আর দেখতে পাই না! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজে আর তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পাই না। কি মানব জন্মেই তৈরি করেছিলে দয়াময়? [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

১ সৈনিক। ধরা পড়েছে।

২ সৈনিক। ধরা পড়িনি। সূর্যামল আপনি ধরা দিয়েছে।

১ সৈনিক। ধরা দিলে কেন?

২ সৈনিক। কে জানে, যখন ধরা দিলে জানে নিশ্চয় মৃত্যু, তখন ধরা দিলে কেন, এটা একটা সমস্যা বটে।

১ সৈনিক। না, সূর্যামল হাজার হোক রাণার ত ভাই, রাণা তাকে ছেড়ে দেবে।

২ সৈনিক। উহু! রাণা সে রকম লোকই নয়। বিচারে তাঁর কাছে ভ্রাতৃ জ্ঞাতিত্ব জ্ঞান নাই।

১ সৈনিক। তার বিচার হবে কবে?

২ সৈনিক। কাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তমসা। ধরা দিয়েছেন! শেষে ধরা দিয়েছেন!—তার আর আশ্চর্য কি? এরা জানে না তিনি কেন ধরা দিয়েছেন। আমি জানি। তিনি ধরা দিয়েছেন, মনের ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, লজ্জায়। তাই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্তে যাচ্ছেন।—আচ্ছা, মর্ষার আগে একটা ভাল কাজ করে' দেখি না কেন, কি হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাণার সভা। কাল—প্রভাত।

রায়মল সিংহাসনারূঢ়। সভাসদ ও অনুচরবর্গ।
পার্শ্ব পৃথবী। সম্মুখে শৃঙ্খলিত সূর্যামল
রায়মল। সূর্যামল! তুমি আর ভ্রাতা নহ আজ,
শত্রু তুমি! বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি,
সামান্য বিদ্রোহী প্রজামাত্র। বিদ্রোহীর
শাস্তি দিব আজি বন্দী!

সূর্যামল।

তাহাই হউক।

মহারাজ! আমি সেই শাস্তি চাই!

রায়মল।

কিছ,

বলিবার আছে?

সূর্য্যমল। কিছ্, বলিবার নাই।
রায়মল। সূর্য্যমল! প্রাণদন্ড শাস্তি বিদ্রোহীর,
আছ অবগত তুমি!

সূর্য্যমল। আছি অবগত।
রায়মল। সেই প্রাণদন্ড শাস্তি দিলাম তোমার।
পৃথবী। পিতা! পিতৃব্যের হেতু, নৃপতির
ক্ষমা

চাহি করপুটে। কর পিতৃব্যে মাঞ্জনা!

বায়মল। পৃথবী! স্নেহশীল আমি। কিন্তু
বসায়োছি

কর্তব্যে স্নেহের উচ্ছে। বসি' সিংহাসনে
অবিচার করিব না, বিচার করিব।

পৃথবী! এই রাজদন্ড ক্ষমা নাহি জানে,
সম্বন্ধ না মানে, কেহ যেন নাহি কহে—

—“পড়ে তাহা বজ্রসম অপরাধী শিরে,
শুদ্ধ বর্ষে আশীর্বাদ জ্ঞাতির মস্তকে।”

—যাও তবে সূর্য্যমল। এ শূদ্র প্রভাতে
তব রক্তে বিরঞ্জিত হবে বধ্যভূমি।

সূর্য্যমল। রাণার অসীম কৃপা! আমারে লইয়া
চল বধ্যস্থলে! আমি প্রস্তুত প্রহরী!

প্রহরীসহ প্রস্থানোদ্যত

রায়মল। [সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া]

কোথা যাও সূর্য্যমল! ভ্রাতার নিকটে
বিদায় না মাগি'। ভাই, প্রিয়তম ভাই!

—উঠাও আনত মূখ; চেয়ে দেখ আমি
নাহি নরপতি আর।—আমি এইক্ষণে

ভ্রাতা তব! কর আলিঙ্গন একবার

শেষবার, সূর্য্যমল।—করিয়াছি আমি

এই ক্রোড়ে লালন তোমারে প্রিয়তম,

ভাইটি আমার!—কত আগ্রহে আদরে!

এই হস্তে আজি দিতে হইল তোমারে

প্রাণদন্ড প্রাণাধিক—বিধির বিপাকে!

সূর্য্যমল। বিধিবিড়ম্বনা ভাই! কি করিবে
তুমি?

রায়মল। সূর্য্যমল! সূর্য্যমল! কেন রহিলে না
সেই সূর্য্যমল তুমি—সরল, উদার,

স্নেহশীল! কেন মূখ ফুটে বল নাই

তুমি রাজ্য চাহো ভাই? আমি অনায়াসে

ছাড়িয়া দিতাম তাহা!

সূর্য্যমল। মাঞ্জনা করিও;
আমার মৃত্যুর পরে মাঞ্জনা করিও।

ভুলে যেও অপরাধ অবোধ ভ্রাতার।

আমি মৃত। বৃষ্টি নাই।

রায়মল। না না এত তুমি
নহ সূর্য্যমল!—কহ কে মন্ত্রণা দিল?—
তোমারে শিখন্ডীরূপে রাখি পুরোভাগে,
কে হানিল এ হৃদয়ে এ বিষাক্ত শর?
কে সে? কহ—

সূর্য্যমল। কহিব না; বলিও না ভাই
কহিতে সে কথা আজি।

রায়মল। কি করিলে ভাই?

কি কহিব? তব এই কার্যে, সূর্য্যমল,
জ্বালায়ে দিয়াছ বক্ষে সর্ব্বের বিশ্বাস।
চেয়ে দোঁখ ঘন নীলাম্বরে; শঙ্কা হয়
তাহা আবরণ তরে ক্রুর বজ্রশেল,
দোঁখ স্বচ্ছ নিষ্কর, সন্দেহ হয় বৃষ্টি
তাহাতে মিশ্রিত বিষ; শূনি গীতধ্বনি,
ভাবি আছে তাহে কোন নিহিত বিদ্রুপ!—
সূর্য্যমল!—কি করিলে এ বৃদ্ধ বয়সে
আমার?

সূর্য্যমল। ভুলিয়া যাও এ দুঃস্বপ্ন বলি'
ভাবিও এ ধূমকেতু নিশীথ আকাশে—
আসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু চিরদিন
রহে স্থির অটল নক্ষত্ররাজি তাহে।
ভাবিও এ ভূমিকম্প বিপ্লব ক্ষণিক—
—আসে যায়, রহে কিন্তু শ্যামল পৃথিবী,
ধীর, শান্ত, পূর্ব্ববৎ।—ক্ষমা কর ভাই,
এক্ষণে বিদায় দাও।

রায়মল। যাও সূর্য্যমল!

আমি করিয়াছি ক্ষমা। পাও যেন তুমি
বিধাতার মাঞ্জনা মৃত্যুর পরে ভাই।

[জনতা হইতে তমসা নিষ্ক্রান্ত।

তমসা। কোথা যাও! যাইও না। দাঁড়াও দেবতা,

[সূর্য্যমল স্তম্ভিতভাবে দন্ডায়মান]

দাঁড়াও মূহূর্ত্তকাল [রায়মলের পদতলে
পড়িয়া] শূন মহারাজ!

কিছ্, বলিবার আছে—

সূর্য্যমল। নারী উম্মাদিনী;

শূনিও না এর কথা—

তমসা। শূনিতে হইবে।

সূর্য্যমল। তার পূর্ব্ব বধ কর আমারে।

তমসা। শূনিবে

তুমিও সে কথা।—তবে শূন মহারাজ!

দোষী নহে স্বামী। দোষী আমি
জ্বালায়েছি
আমি এ বিদ্রোহ বহি। দিয়াছি মন্ত্রণা
আমি। আমি ডাকিয়াছি মালবে চিত্তরে।
আমার এ ষড়্‌যন্ত্র—আমার।

রায়মল। তোমার?
তমসা। আমার। তবে এ কার্য কেন করিলাম?
জিজ্ঞাসা করিবে? শুন, কেন করিলাম।
সূর্যমল। শূনিও না মহারাজ' রাখ এ
মিনতি।

তমসা। শূনিতে হইবে। আমি কলঙ্ককাহিনী
রটাইব আপনার, উৎসারিব বিষ;
করিব স্বীকার পাপ—শুন মহারাজ।
জানিতে সারণ্যদেবে?—সে পুত্র আমার!
তথাপি তাহার পিতা নহে সূর্যমল।

রায়মল। সত্য! উল্মাদিনী নারী!—

তমসা। উল্মাদিনী আমি,
কিন্তু যাহা কহিতেছি, নহে সে প্রলাপ।
—তাহাকে করিতে এই মেবারের রাণা
করিয়াছিলাম আমি এ গুঢ় মন্ত্রণা।
—ব্যর্থ হইয়াছে তাহা। না আসিত যদি
পৃথবী এ সমরে, তাহা সফল হইত।
কে দিল পৃথবীকে জানো বিদ্রোহ সংবাদ,
অনুরোধ করি' যোগ দিতে এ সংগ্রামে,
আসিয়া রাণার পক্ষে?—এই সূর্যমল।

রায়মল। সূর্যমল!!! আপনি বিদ্রোহী!!!
সত্যকথা

সূর্যমল?

তমসা। সত্যকথাই পতিত যদ্যপি
এই ষড়্‌যন্ত্রজালে স্বামী, তবু তিনি
বুঝিলেন সেইক্ষণে, স্বকীয় প্রমাদ—
লিখিলেন এক পত্র ভ্রাতৃস্পন্দ্রে, আসি'
দিতে এ সমরে যোগ চিত্তরের সনে।
পৃথবী। ইহা সত্য কথা। পিতা। জানি না কি
হেতু

করি নাই এই সত্য পিতার গোচর
এতদিন!

তমসা। করিলাম সত্য অনাবৃত।

এই মূল বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দাও।

রায়মল। অবধ্য রমণী।

সূর্যমল। কেন কহিলে তমসা,
আমার মৃত্যুর পূর্বে কলঙ্ককাহিনী?

তমসা। কেন কহিলাম! পূর্বে কদাপি জীবনে
করি নাই পুণ্য কৰ্ম,—আজ করিলাম।
ভাবিও না স্বামী, চাহি মার্জনা তোমার।
সেই অধিকার রাখি না। আজীবন,
করিয়াছি ছল, ভাণ, করিয়াছি প্রেম,
শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধি হেতু। চাহি না মার্জনা:
তবে পুণ্য কভু করি নাই; নাই জানি
কি সুখ তাহার, তাই দেখিলাম আজ।
দেখিলাম তাহে সুখ আছে, বড় সুখ,
পাপ কৰ্ম লব্ধ সুখ চেয়েও অধিক
সে সুখ।—আরম্ভ করিলাম জীবনের
নতুন অধ্যায় আজি। নারীর জীবন
যাহা এত তুচ্ছ, ঘৃণ্য রাজদণ্ড, সেও,
তাহারে করিতে স্পর্শ ঘৃণ্য বোধ করে:—
সে জীবন যথাসাধ্য, উৎসর্গ করিব
আজি হ'তে পুণ্য কৰ্মে পরিত্রস্তে।

[প্রস্থান।

রায়মল। প্রহরী এক্ষণে মনুষ্ট কর সূর্যমলে।
[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাণার অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—প্রভাত।
শূরতান ও তাহার রাণী

শূরতান। তোমাকে বরাবর বলে' এসেছি
রাণী যে চুপ করে' বসে' থাক; ঘটনাগুলি
আপনিই ঠিক খাপে খাপে বসে' আসবে। দেখ,
তাই হোল কি না। ঘটনাপরম্পরা এমন
মোলায়েম ভাবে ঘটে' আস্ছে, যে এর পরে যে
কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

রাণী। আবার কি হবে?

শূরতান। এক চিত্তরের রাণাও হ'তে
পারি, চাই কি তুর্কীর বাদশাহও হ'তে পারি।
এই দেখ তোড়া উদ্ভার হ'ল; আমি এখন যে
রাজা সেই রাজা। তার উপর মেয়ের এমন এক
পত্র জুটলো যে, আমি এক নিঃশ্বাসে একেবারে
রাজা রায়মলের বেহাই হয়ে' পড়লাম। তার
উপরে আবার শূনছো যে রাণা ঘোষণা করেছেন
যে, তিনি মাসাধিক পরে পৃথবীকে যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত করবেন। তা'লেই দাঁড়াল এই যে
পৃথবী হোল মহারাণা, তারা হোল মহা-
রাণী—আমি আর একদোড়ে একেবারে মহা-
রাণার শ্বশুর।

রাণী। এই গৌরব নিয়ে অহংকার কর্তে লজ্জা করে না? এ পরদত্ত সাম্রাজ্য ভোগ করার চেয়ে বনবাসী থাকা ভালো।

শূরতান। এই স্ত্রীলোক জাতটাকে কোন রকমেই সন্তুষ্ট করা যায় না। যখন বনবাসী ছিলাম, তাতেও ঘ্যানর ঘ্যানর। আর আজ রাণার বেহাই স্বরূপ নির্মশ্রিত হ'য়ে, চিতোর এসে যে রাজভোগ খাচ্ছি, তাতেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। ফলকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে—ঘ্যানর ঘ্যানর করাই স্ত্রী জাতির স্বভাব,—“যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।” আচ্ছা, এ পরদত্ত রাজ্য না হয় চুলোয় যাক্—এই রাজভোগ চুলোয় যাক্। কিন্তু তারার এর চেয়ে কি সৎপাত্র মিলতো?

রাণী। সে সৎপাত্র বিধাতা জুড়িয়ে দিয়েছেন।

শূরতান। যোগ্য ব্যক্তিকেই বিধাতা ঐ রকমই জুড়িয়ে দেন।

রাণী। তুমি ত সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলে।

শূরতান। আর তুমি তৎপর হ'য়ে ত সবই করেছিলে। ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে ত এক জয়মল বিদ্রাট ঘটিইছিলে।

রাণী। কেন, সে কি মন্দ হ'ত?

শূরতান। মন্দ! তারার তার চেয়ে, ওই যে দেখে একটা ষাঁড়, ঐ ষাঁড়টাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল। বিয়ে করলে আর কি!

রাণী। বিয়ে কর্তে কি না দেখতে, যদি মোহিত সিংহ অন্তরায় না হোত।

শূরতান। এঃ, স্ত্রীজাতিটা নিরেট। যদি তার মাথার উপর গৌতম মৃনির তর্কশাস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে মারা যায়, তা'লে সে ন্যায়শাস্ত্রটাই চূর্ণ হয়, তার মাথার কিছদ হয় না।—মোহিত সিং কি করলে! সেত জয়মল আসার আগেই চলে গিইছিল।

রাণী। চলে' গিইছিল বটে। কিন্তু আমি পরে জেনেছি, যে তারার হৃদয়ে তার মর্দিত মর্দিত করে' রেখে চলে' গিইছিল।

শূরতান। বটে! তোমার হৃদয়ে মর্দিত করে' চলে যাইনি ত?—[গম্ভীরভাবে] রাণী, তা হোত না।

রাণী। কি হোত না?

শূরতান। মোহিতকে ও বিয়ে কর্তে না,

জয়মলকেও বিয়ে কর্তে না। তার নজর আমি চিরকাল দেখেছি রয়েছে ঐ চিতোর সিংহাসনের দিকে। আর সে জানে যে, পৃথবী একদিন না একদিন সে সিংহাসনে বসবেই। এ কি ছেলের হাতে মোয়া! তারা আমার মেয়ে ত বটে।—আমি বরাবর ও'ত পেতে আছি, তাই এতদিন চুপ ক'রে ছিলাম।

রাণী। তুমি আবার কি করলে। ঘটনা-পরম্পরায় এ রকম ঘটে' গেল।

শূরতান। রাণী! যারা চুনোপুটি ধরে, তারা জল ঘুলিয়ে পাঁকের দুর্গন্ধ উঠিয়ে পুকুরময় জাল ফেলে বেড়ায়। কিন্তু যারা রুই কাংলা ধরে, তারা জালটি পেতে চুপ করে' বসে' থাকে। এখন চল, রাজভোগের যথাযোগ্য ব্যবহার করা যাক্ গে—সুস্কমবৃন্দার পরিচালনা করে' শূল শরীরটা একটু কাতর হ'য়ে পড়েছে।

রাণী। [সহাস্যে] বিধাতা তোমাকে ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ না করে' ক্ষত্রিয় করলেন কেন?

শূরতান। বিধাতার ও রকম ভুল আরও দুই একটা তোমাকে দেখিয়ে দেব। একটা মাত্র এখন দেখিয়ে দিচ্ছি—এই তিনি যদি তোমাকে নারী না করে' পুরুরাজের হাভিলদার রূপে সৃষ্টি কর্তেন, তা'লে সম্ভবত সেকেন্দার সার সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরাজ হারতেন না।—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিপরীত দিক হইতে পৃথবীর প্রবেশ

পৃথবী। আমি শূন্তে চাইনি। হঠাৎ কাণে এল। বুঝিছি সব বুঝিছি। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। আমি এদের পার্থিব উন্নতির পথে সোপান মাত্র? ষড়্‌যন্ত্র! ষড়্‌যন্ত্র! না। তাই বা বলি কেন? আমি নিজেই ত ধরা দিইছি, মোহিত সিং কে?—এ মোহিত সিং তবে তারার প্রণয়ী ছিল।—আরও কত প্রণয়ী ছিল কে জানে!—তা নৈলে জয়মল তারার শয়নাগারে প্রবেশ কর্তে সাহস করে?—তা নৈলে তারা একটা রাজ্যের জন্য আপনাকে বিক্রয় করে? পিতৃব্য পত্নীর মূখে সেই ভীষণ স্বীকারকাহিনী শোনার পরে আর কিছদই অবিশ্বাস হয় না। সবই সম্ভব! তারার ইতিহাস দেখিছি অবিকল সেই একই ইতিহাস!—সব স্মীরই কি তাই? এত আদর, আগ্রহ, সেবা,

শুদ্ধ স্বামী'র অর্থের মানের ক্ষমতার জন্য? ঘৃণা জন্মে' গিয়েছে। এই সমস্ত নারী জাতিটার উপরেই ঘৃণা জন্মে গিয়েছে—এই যে তারা আসছে।

তারার প্রবেশ ও সঙ্কোচতভাবে দ্বারদেশে
অবস্থিতি

পৃথ্বী। কি চাও?

তারা। [নীরব]।

পৃথ্বী। নীরব রৈলে যে?

তারা। তুমি কি কোথাও যাচ্ছ?

পৃথ্বী। হাঁ যাচ্ছি—সিরোহী রাজ্যে—

তারা। কেন? সহসা?

পৃথ্বী। কেন!—[স্বগত] আচ্ছা না হয় বল্লামই না। [প্রকাশ্যে] সেদিন যমুনা চিঠি লিখেছিল জানো?—যমুনা আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।

তারা। [অধোমুখে] আমি সঙ্গে যাবো?

পৃথ্বী। না।

তারা। কেন নাথ?

পৃথ্বী। সব কথা শুনে কোন ফল নাই, তারা।

তারা। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] নাথ! একদিন ছিল, যে আমাকে সব কথা খুলে বলতে।

পৃথ্বী। সে দিন আর নাই তারা।

তারা। কেন স্বামী? কি দোষ করেছি?

পৃথ্বী। [স্বগত] ঠিক এক রকম। পিতৃব্যপত্নীও ঠিক এক রকম বলতেন।

তারা। আমি লক্ষ্য করেছি নাথ, যে এই মাসাধিক কাল আমার প্রতি তোমার সে প্রেম, সে নির্ভর, সে বিশ্বাস নাই।

পৃথ্বী। কিছই চিরদিন থাকে না তারা।

তারা। থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরদিন থাকে। এ ভগ্নদর সংসারে এই এক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী—পর্ষতের মত অটল, সমুদ্রের মত গভীর, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। এ সম্বন্ধ ঘোচে না প্রভু।

পৃথ্বী। উঃ কি ভয়ঙ্কর!

তারা। আমি যদি কোন অপরাধ করে' থাকি ক্ষমা কর। তুমি আমার প্রভু, আমি

তোমার দাসী। তোমার কাছে আমার অপরাধ পদে পদে।—ক্ষমা কর।

পৃথ্বী। [স্বগত] পিতৃব্যপত্নীও ঠিক এই রকম বলতেন।—ভারি মিলছে। [প্রকাশ্যে] তারা—[দীর্ঘনিঃশ্বাস]।

তারা। [পদতলে পিড়িয়া] বল, আমি কি দোষ করেছি।

পৃথ্বী। ওঠ তারা, বলছি কি দোষ করেছে। [সম্মুখে তারার হাত দুইটি ধরিয়া] —তারা! তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?

তারা। তুমি জানো ত সব।

পৃথ্বী। [হস্ত ছাড়িয়া কঠোর স্বরে] জানি সব জানি। আর তুমি ভাবচ আমি যা জানি না, তাও জানি।

তারা। কি জানো?

পৃথ্বী। তোমার ভূত জীবনের ইতিহাস। সে কথা যাক!—তারা! তুমি চেইছিলে তোমার পিতার হৃতরাজ্য, তা পেয়েছো। তোমার যে দাম চেইছিলে, তা পেয়েছো। আর কি চাও? তোমার পিতা-মাতা তোমার রূপের ফাঁদ পেতে ছিলেন, রাণার বেহাই হবার জন্য। সে ফাঁদে পড়ে' অবোধ বেচারী ভাই জয়মল মারা যায়; সে ফাঁদে আমি ধরা পিড়িছি।—তোমরা সবাই যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছো। আর কি চাও? বল দিচ্ছি।—হা ঈশ্বর!—নারীরূপের কি ফাঁদই তৈরি করেছিলে! [প্রস্থান।

তারা। নাথ! এ কথা না বলে' বৃকে ছুরী বির্ধিয়ে গেলে না কেন?—অহো ভগবান্!—এতদূর!

[নিষ্কান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রভুরাওর বিলাস কক্ষ। কাল—রাতি।

প্রভুরাও ও পারিষদবর্গ
সম্মুখে নর্তকীদিগের নৃত্য

প্রভু। বাহবা বাহবা! নাচো আবার নাচো! রূপের ফোয়ারা তুলে দাও।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] ফোয়ারা তুলে দাও।

প্রভু। মর্ত্যে নামিয়ে নিয়ে এস স্বর্গরাজ্য। জীবনের সার হচ্ছে সৌন্দর্য্য। আর সৌন্দর্য্যের সারই হচ্ছে নারী।—এই ঢালো।

পারিষদবর্গ। এই ঢালো।

প্রভু। নারী শব্দে ১৫ থেকে ২০ বৎসরের বয়স পর্যন্ত চলনসৈ অসম্পর্কীয়া সব নারী বোঝায়।—কিন্তু স্ত্রী বাদ।

পারিষদ। হাঁ হাঁ অমরকোষে এই রকম লেখে বটে।

প্রভু। লেখে বটে?—হিঃ হিঃ হিঃ।

পারিষদবর্গ। হিঃ হিঃ হিঃ!

প্রভু। স্ত্রী জিনিষটা কি রকম জানো।—

এই বেজায় একঘেয়ে!

পারিষদবর্গ। বেজায় মহারাজ।

প্রভু। কিন্তু নারী জিনিষটা কি রকম জানো? এই পঞ্জিকা রকম আর কি;—অন্ততঃ বছর বছর একখানা করে' নতুন চাই। হিঃ হিঃ হিঃ।

পারিষদবর্গ। হিঃ হিঃ হিঃ।

১ পারিষদ। মহারাজেব মুখে আজকে বসিকতার থৈ ফুটছে দেখছি।

২ পারিষদ। আর মদ নৈলে যা প্রকৃত বসিকতা, তা কি হয় দাদা।

প্রভু বটে—তবে আরো ঢালো এই রূপসীরা—

পারিষদবর্গ ও নর্তকীদের গীত

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো আরো ঢালো।
রূপেব সঙ্গে তাঁর মদিরা লাগে ভালো,

ভাঁর লাগে ভালো।

স্বর্ণপাত্রে ঝর তুমি সুরা,

সরসরস্তুঅধব মধুবা,

চূষন দাও শিরায় শিরায় লালসাবাহি জ্বালো

জ্বালো।

আমবা ঢালিব রূপের আহুতি

জ্বালিবে দ্বিগুণ কামানল,

কামেব সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী,

তুমি হলাহল;

আমরা ঝড়ের মত বয়ে' যাই,

বন্যার মত এস তুমি ভাই,

সর্বনাশটি না করিয়া আজ যাব না লো সখি

, যাব না লো।

চন্দ্রাণ্ডর প্রবেশ

প্রভু। চন্দ্রাণ্ড যে! খবর কি?

চন্দ্র। ভাঁর সুখবর, মহারাজ, ভাঁর সুখবর।

প্রভু। কি রকম!—কি রকম!

চন্দ্র। পৃথবী—

প্রভু। আবার “পৃথবী” জ্বালাতন কল্পে যে।—“পৃথবী” ছাড়া কি আর কথা নেই?

চন্দ্র। তাই ত বোধ হচ্ছে! রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাই, কেবল “পৃথবী” রবই শুনছি। কুলবধুদের মুখে ঐ নাম, চারণ কবিরা ঐ নাম গাচ্ছে; সভায় মন্দিরে—

প্রভু। থাক্ থাক্। তার কি হয়েছে বলে' ফেল। সে মরেছে বলতে পারো?

চন্দ্র। আজ্ঞে সে ছেলেই নয়! বরং এই সপ্তাহ দুই পরে তার অভিষেক। রাণা অবসর নিচ্ছেন। এখন পৃথবীই রাণা হচ্ছে।

প্রভু। পৃথবী রাণা?

চন্দ্র। কেন রাণার ছেলে রাণা হবে, এর মধ্যে আশ্চর্যটা কি দেখলেন? আপনার দুঃখ কিসের!

প্রভু। পৃথবী আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আবার তুমি বল আমার দুঃখ কিসের?—প্রতারণা! প্রতারণা! সঙ্গ সন্ন্যাসী, জয়মল মৃত, পৃথবী নিষ্পাসিত, এতে আমার রাণা হবার কথা ছিল না? প্রতারণা! চুরি! ধাম্পা-বাজি!—আমি তাই রাণার মেয়েকে এতদিন পদুর্ষেছি। আজ, আমি তাকে মেয়ে বাড়ীর বার কবে' দেবো।—এই কে আছি?

দৌবারিকের প্রবেশ

প্রভু। যা, রাণীকে এখানে এক্ষণেই নিয়ে আয়। শূদ্ধ নিয়ে আসবিনে, কুকুরের মত শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আয়।

দৌবারিকম্বয়। যো হুকুম মহারাজ!

[প্রস্থান।

চন্দ্র। মহারাজ!

প্রভু। চোপ রহো!

পারিষদবর্গ নিস্তম্ব

চন্দ্র। আমি তবে আসি মহারাজ!

[প্রস্থান।

প্রভু। —ষড়্‌যন্ত্র!—রাণা ছেলেকে নিষ্পাসিত করেছিল। তাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে শূদ্ধ আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য।—এতদূর জোচ্ছোরি! ঢালো—এই ঢালো।

নর্তকীদের গীত

“ঢালো, আরো ঢালো” ইত্যাদি।

প্রভু। এই চোপরও।

পারিষদবর্গ। চোপরও।

প্রভু। আমি আজ প্রতিশোধ নেবো!
প্রতিশোধ নেবো। [পারিক্রমণ] জ্যোচ্ছোরি!

শঙ্খলাবন্ধ যমুনার প্রবেশ

দৌবারিক। মহারাজ! এনেছি।

প্রভু। এনেছি সু বেষ করেছি সু।—এই
যমুনা!

যমুনা। [নীরব]

প্রভু। আমি আজ তোকে অপমান কর্ব।

যমুনা। অপমান রোজ ত কর্বই। বাকি
রেখেছ কি?

প্রভু। ষেটুকু বাকি রেখেছি, সেটুকু আজ
কর্ব। আজ তোকে জুতো মেরে আমার বাড়ী
থেকে বের করে' দিব।

যমুনা। তাই দাও। এ আপদ দূর হোক।
তাই দাও। আর সহ্য হয় না।

প্রভু। না; তোকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে
দিলে শৃঙ্খল হুছে না। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে
খাওয়াবো।

যমুনা। আমার অপরাধ কি মহারাজ?

প্রভু। তোর অপরাধ যে রায়মল তোর বাপ,
আর পৃথবী তোর ভাই।

যমুনা। এই অপরাধ! এ অপরাধ আমি
স্বীকার করি, মহারাজ! তার জন্য যা শাস্তি
দিবে দাও, মাথা পেতে নেবো। তাই এ জীবনের
সাম্বন্ধনা, অপমানে অহঙ্কার। আমি যে তোমার
এত অত্যাচার সহ্য করছি, তা এই মনে করে',
যে আমি রাণার মেয়ে, পৃথবীর বোন; আমার
অপমান নাই; তা এই মনে করে' যে ইচ্ছা
কল্পেই এ অপমানের প্রতিকার কর্তে পারি।
তবে প্রতিকার করি না—কারণ তুমি যাই হও,
আমার স্বামী;—প্রতিকার করি না—কারণ
আমি হিন্দুনারী—যে হিন্দুধর্মের শিক্ষা দেয়
যে, স্বামী পাষণ্ড হলেও সে নারীর দেবতা।
তাই এতদিন এত সহ্য করেছি;—অপমান গা
পেতে নিইছি। বৃক ফেটে গিয়েছে তবু সহ্য
করেছি, প্রাণ জ্বলে' গিয়েছে তবু সহ্য করেছি,
চৌথের জলে বৃক ভেসে গিয়েছে তবু সহ্য
করেছি। নৈলে আমি কি মর্দুশ্টিমের অশ্রের জন্য
তোমার দুরারে পড়ে' আছি মনে কর?—আমি

—যার বাপ রাণা রায়মল, যার ভাই ভুবনবিখ্যাত
পৃথবীরাজ?

প্রভু। বটে! তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করছি।
আমি যদি তোকে এখানে পদাঘাত করি, তোর
বাপই বা কি কর্তে পারে। আর তোর ভাইই বা
কি কর্তে পারে? [কেশাকর্ষণ ও পদাঘাত;
যমুনার পতন]

পঞ্চ সৈনিকসহ বেগে পৃথবীর প্রবেশ

পৃথবী। প্রভুরাও—একি?

[গলদেশ ধারণ ও পারিষদবর্গের
চীৎকার করিয়া পলায়ন।

প্রভু। কে? এ্যাঁ পৃথবীরাজ? ছাড়া।

পৃথবী। [ছাড়িয়া, অসি নিষ্কাশিত
করিয়া] খোল তরবারি।

প্রভু। এ্যাঁ তরবারি খুলবো কেন?—এই
কে আছি সু?

পৃথবী। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? মর
বীরের মত মর। আজ তোমার অন্তিম দিন।
কি! তরবারি খুলবে না? [গলদেশে ধাক্কা ও
প্রভুর পতন, তাহার উপরে বসিয়া] প্রভুরাও,
এই তোমার শেষ মর্দুশ্টি। ইষ্টদেবের
নাম জপো। [তরবারি উত্তোলন]

প্রভু। [সকাতরে] ক্ষমা কর পৃথবীরাজ!

পৃথবী। ক্ষমা চাও যমুনার—তার পায়ে
ধরে' ক্ষমা চা' কাপুরুষ।

প্রভু। যমুনা! পায়ে ধরি, ক্ষমা কর।

যমুনা। মেজদাদা! ইনি যাহাই হেন্
আমার স্বামী। এই মর্দুশ্টি এ'কে ছেড়ে দাও।

পৃথবী। [ছাড়িয়া স্বগত] এ্যাঁ! রমণী
এরূপও দেখছি হয়!—তাই ত।—[প্রকাশ্যে]
আচ্ছা। ছেড়ে দিলাম এবার, প্রভুরাও। মনে
থাকে যেন যে এবার যমুনার কৃপায় তুমি প্রাণ
পেলে। [ধাক্কা দিয়া] কেমন মনে থাকবে?

প্রভু। থাকবে।

পৃথবী। ভবিষ্যতে শূন্যিচি যে এর গায়ে
আঁচড়টি লেগেছে কি তুমি গিয়েছ জেনো।
যমুনা পৃথবীর বোন; মনে থাকবে?

প্রভু। খুব থাকবে।

পৃথবী। চল যমুনা গৃহাভ্যন্তরে। এ
মাতালের আঙা থেকে চল।

[পৃথবী ও যমুনার প্রস্থান!]

প্রভু। [দস্ত ঘর্ষণসহ] পৃথ্বী! এর প্রতিশোধ নেবো! উপষদুত প্রতিশোধ নেবো। না নেই, আমার নাম প্রভুরাও নয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদ্যান। কাল—সায়াহ।

একাকিনী তারা

গীত

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে সে বিনে।

তারা। কেন আজ হৃদয় আকুল, বারংবার
নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু। কাঁপে বক্ষঃস্থল।

পদবিক্ষেপসহ পুনরায় গীত

নাহি আর মধু রে মধুর অধরে;
শরত চাঁদিমা চরণে লুটায় অনাদরে;
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবারিলে তারে?
বিফলে চন্দ্রমা তারা রাজি ভায় তায় রে।

কে পারে—

সত্য!—ভাবিলেন তিনি, এত নীচ
আমি! মনেও আসিল তাঁর? হয়!—

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। যুবরাণী—

তারা। আমি যুবরাণী নহি—আমি শূদ্র
“তারা”।

পরিচারিকা। কেন রাজপুত্রি?

তারা। “কেন” বলিতে চাহি না। নহি
যুবরাণী, নহি রাজপুত্রি। আমি
শূদ্র “তারা”—ততোধিক সম্মান চাহি না।

পরিচারিকা। আমরা সামান্য নারী! বৃদ্ধিনাক
অত

নামের মহিমা। যাহা বলিয়া এসেছি
এত দিন, তাহাই বলিব। রাজপুত্রী!
চাহে একজন নারী সাক্ষাৎ তোমার!

তারা। কিরূপ সে নারী?

পরিচারিকা। অতি দুর্য্যখিনী।

তারা। দুর্য্যখিনী? নিরে এস।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

তারা। করিয়াছ বড়ই অন্যায় দোষারোপ।

প্রাণেশ্বর!—আমি রাজ্য চাহি! বৃদ্ধিলে না
এতদিনে আমারে প্রাণেশ!

পুনরায় গীত

কে পারে—

তমসা ও পরিচারিকার প্রবেশ

তারা। কে তুমি?

তমসা। চিনিতে নাহি পারিবে।—নাহিও
চিনিবার প্রয়োজন।

তারা। কি চাহো রমণী।

তমসা। তোমার মঙ্গল চাহি!—

তারা। আমার মঙ্গল

তমসা। তোমার মঙ্গল।—তারা! কোথা
পৃথ্বীরাজ?

তারা। সিরোহী নগরে।

তমসা। তুমি সঙ্গে যাও নাই?

তারা। আমি সঙ্গে যাই নাই।

তমসা। এক্ষণেই যাও।

তারা। কি হেতু রমণী!

তমসা। সব বৃদ্ধিতে নারিবে।

তবে এই মাত্র কহি—যমুনার স্বামী
প্রভুরাও, ভাল নাহি বাসে পৃথ্বীরাজে।
তাহার স্বভাব হেন, বিষ দিতে পারে
আহারে, ছুরিকা পৃষ্ঠে বসাইতে পারে।

তারা। জানো ‘তারে’?

তমসা। খুব জানি! ভাল কর নাই
সঙ্গে যাও নাই তুমি। এক্ষণেই যাও।

[প্রস্থান।

তারা। বৃদ্ধিয়াছি বৃদ্ধিয়াছি।—তাই মদুমদুম
কাঁপে বক্ষঃস্থল, চক্ষে ভরে’ আসে বারি;
কেন ছেড়ে দিলাম প্রাণেশে। যেইখানে
যাইতেন, যাইতাম সঙ্গে; এইবার
কেন নাহি যাইলাম?—একি বারংবার
কহিছে কে কর্ণে যেন থাকিয়া থাকিয়া
“আর দেখা হইবে না।”—জগদীশ হেন
হোয়ো না নিষ্ঠুর। দিও ফিরায়ে তারারে
তাহার নয়নতারা।—যাই, আমি যাই,
তোমার সকাশে নাথ। রাখিও, ভবানী!
প্রাণেশ্বরে যতক্ষণ আমি নাহি আসি।
—আর নাই অভিমান; আর ক্রোধ নাই;
লাঞ্ছনার ক্ষত নাই; অপমান নাই।

নাথের বিপদ, আর মূঢ় অভিমানে,
নিশ্চিত হৃদয়ে আমি বসিয়া এখানে?
ক্ষমা কর জীবনসর্বস্ব!—প্রাণেশ্বর
ক্ষমা কর! আসিতোছি আসিতোছি আমি।
[নিষ্কান্ত।

সম্ভ্রম দৃশ্য

স্থান—প্রভুরাওয়ের সম্ভ্রিত অন্তঃপুর কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

একাকী পৃথবী।

পৃথবী। [পাদচারণ সহ।
হৃদয় ব্যাকুল ফিরে যাইতে চিতোরে।
টানিছে আমারে গৃহে নিত্য অভিমানে,
সজল নিশ্চল স্বচ্ছ নীল চক্ষুদুটি।
বুঝিয়াছি ভ্রম—করিয়াছি অবিচার!
ক্ষমা কর প্রাণেশ্বর! চিরদিন আমি
হেন উগ্র অসংযত।

প্রভুরাওর প্রবেশ

প্রভু। পৃথবী, তবে তুমি
অদ্যই যাইবে?
পৃথবী। আমি অদ্যই যাইব।
প্রভু। ভাবিও না আসিয়াছ কুটুম্বের বাড়ী—
এ তোমার বাড়ী, পৃথবী। আরো দুইদিন
থেকে যাও।

পৃথবী। না অদ্যই যাইতে হইবে।

পৃথবী। [স্বগত]
যাইতে হইবে বটে! আর ফিরিবে না।
[প্রকাশ্যে] বুঝিয়াছি! চিতোরের বাতায়ন
পথে,

পথ চেয়ে আছে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদুটি।

পৃথবী। সত্য কথা, প্রভুরাও!

প্রভু। [স্বগত] থাকুক না চেয়ে;
এ জীবনে ঘৃণিবে না সেই চেয়ে থাকা।

যমুনার প্রবেশ

যমুনা। দাদা, যাইতেছ?

পৃথবী। বোন! যাইতোছি আমি।
—তবে যাই!

যমুনা। বল “আসি”—কর মিষ্টিমুখ;
স্বহস্তে মিষ্টান্নপাক করিয়াছি আমি,
আনিয়া দিতেছি ভাই। [প্রস্থান।

প্রভু। আমিও এনোছি—
সিরোহীর সর্বোত্তম মোদকের হস্তে
প্রস্তুত করায়, শ্রেষ্ঠ মোদক এক্ষণে,
তোমারে—তারার জন্য,—দেখ দেখি ভাই,
কিরূপ করিল।

পৃথবী। দাও, সঙ্গে লয়ে' যাই।
প্রভু। না এখানে খেয়ে দেখ, আমার সম্মুখে;
নহিলে কি তৃপ্তি হয়?

পৃথবী। থাকুক না প্রভু।
প্রভু। না, খাও, নহিলে ছাড়িব না।

পৃথবী। দাও তবে,
অবিলম্বে।

প্রভু। এই লও [মিষ্টান্ন প্রদান]।

পৃথবী। [মিষ্টান্ন ভক্ষণ]

প্রভু। কিরূপ করিল?

পৃথবী। উত্তম!—সামান্য কটু।

প্রভু। [স্বগত] পূর্ণ মনস্কাম,

এতদিনে পৃথবীরাজ!

পৃথবী। যাইবে ত তবে
তুমি অভিশেকদিনে।

প্রভু। নিশ্চয় যাইব।

পৃথবী। একি বড় ঘৃণিতেছে মস্তক।

প্রভু। [স্বগত] ঔষধ
ধরিয়াছে।

মিষ্টান্নপাত্র হস্তে যমুনার প্রবেশ

পৃথবী। ঘৃণিতেছে মস্তক—যমুনা
জল আন।

যমুনা। ঘৃণিতেছে মস্তক! কি হেতু?

[প্রস্থান।

পৃথবী। [অস্থিরভাবে] প্রভুরাও! সত্য কহ—
একি প্রবণনা? মিষ্টান্নে দিয়াছ বিষ?

জল লইয়া যমুনার প্রবেশ

যমুনা। এই জল নাও।

পৃথবী। [জল পান করিয়া] সত্য বল
প্রভুরাও একি প্রবণনা?

প্রভু। আর বণনায় নাই কোন প্রয়োজন!
সত্য পৃথবী! খাইয়াছ যে মদক আজি
বিষাক্ত মদক তাহা।

পৃথবী। বিষাক্ত? কে দিল
বিষ?

প্রভু। আমি দেওয়ায়েছি
পৃথবী। একবার তবে

কহিয়াছ সত্যকথা, প্রভুরাও, তুমি
এ জীবনে! জানিতাম তুমি নীচ ক্রুর,
কিন্তু এত নীচ, এত ক্রুর ভাবি নাই
—কেন দিলে বিষ প্রভুরাও?

প্রভু। পৃথবীরাজ!
লইয়াছি প্রতিশোধ তোমার দাম্ভিক
অপমানরাশির।—হইয়াছিল প্রায়
কর্ণরোধ, শূন্যে শূন্যে পথে গৃহে
অন্তঃপদে পর্যন্ত, পৃথবীর যশোগীতি;
হইয়াছি নিয়ত হিংসায় জঞ্জরিত:
পৃথবীরাজ! আজি লইয়াছি প্রতিশোধ।

পৃথবী। অত্যাশ্রম প্রতিশোধ। প্রভুরাও!—হায়!
যমুনার স্বামী তুমি। কি আর বলিব!
যমুনা। ডাকি বৈদ্যে।

প্রভু। নাই বৈদ্য এ তিন ভুবনে,
এ বিষের প্রতিকার করিতে যে পারে।

পৃথবী। কাজ নাই বৈদ্যে আর।—যমুনা!
যমুনা!—

ছাড়িয়া যেও না শেষ সময়ে আমারে।
অধিক বিলম্ব নাই আমার মৃত্যুর:
বিশ্ব অন্ধকার হয়ে আসে।

প্রভু। সত্যকথা—
অধিক বিলম্ব নাই যমুনা! প্রেমসী!
বড় যে করিতে গর্ভ পৃথবীর—এখন!
যমুনা। [জান্দু পাতিয়া]

জগদীশ! রক্ষা কর; বৃষ্টিতে পারি না
স্বামী মোর নর, কিম্বা নরকের কীট।
মানুষ কি এও হয়? এত নীচ হয়?
এত খল হয়? এত কাপুরুষ হয়?
দিতে পারে যেই নর, হেন অনায়াসে
বিষাক্ত মদক তুলি অতিথির মুখে;
বিশ্রম অতিথি—যে অতিথি এক দিন
তার প্রাণদাতা; যে অতিথি এত উচ্চ
উদার মহৎ যে এ নিখিল বিশ্বকে
সরল উদার ভাবে।—দেব!—ওঁকি নর?
বোধ হয় অন্যরূপ। বোধ হয় যেন
দেখিতেছি রহিয়াছে অদূরে পড়িয়া
ঘৃণ্য সরীসৃপ কোন মিশিয়া কন্দমে।

পৃথবী। যমুনা—যমুনা!

প্রভু। যমুনা ডাকিছে ভাই।

“প্রাণের ভাইরে” বলে ডাক একবার।

[প্রস্থান।

পৃথবী। যমুনা! যমুনা! ছোট বোনটি আমার—
যমুনা। [পৃথবীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া]

ক্ষমা কর ভাই। আজি আমার আহ্বানে,
আসিয়া আমার গৃহে, আমার অতিথি
আমার পতির হস্তে—তোমার এ দশা?
তুমি রক্ষা করিলে আমারে; কিন্তু আমি
নাই পারিলাম রক্ষা করিতে তোমারে।

[কন্দন]

পৃথবী। কাঁদিও না বোন—এক মিনতি
আমার—

কহিও তারারে,—আমি মরণ সময়ে—
চাহিয়াছিলাম তার মাঙ্গর্জনা।—যমুনা—
—চক্ষু হতে—নিভে যায়—নিখিল জগৎ—
কহিও সে কথা—ভুলিও না—তবে যাই।

[মৃত্যু]

যমুনা। [উচ্চ স্বরে] দাদা! দাদা! দাদা!
—দীপ নিভিয়া গিয়াছে।

সোণার পিঞ্জর হতে সন্ধ্যার আকাশে
উড়িয়া গিয়াছে পাখী। কি করিব রাখি'
পিঞ্জর ধরিয়া ক্রোড়ে—[মস্তক ভূমিতলে
রাখিয়া দাঁড়াইয়া] তবে যাও ভাই—
যাও সে অমরধামে। আসিতোছি পিছে
আমরা।—ঔদার্য্য বীর্ষ্য স্নেহের আধার
ছিলে তুমি। তব যশোগীতি রাজস্থানে
পথে ঘাটে মাঠে গিরিসঙ্কটে, গহনে
গাইবে চারণ কবি—যাও স্বর্গধামে।
—এ কে আসিছে! এ যে উন্মাদিনী তারা।

তারার প্রবেশ

তারা। কই! প্রাণেশ্বর কই! যমুনা! আমার
কোথায় জীবীতেশ্বর!

যমুনা। [নীরব]

তারা। এই যে এখানে।

ভূতলে পড়িয়া হেন কেন প্রাণাধিক?
জীবনসম্বন্ধ? কেন? বিবর্ণ?—যমুনা—
যমুনা। তারা! তারা! কি দেখিতে আসিয়াছ
আর!

পৃথবী এ জগতে নাই।

তারা। পৃথবী কোথা নাই?

যমুনা, কি বলিতেছ?

যমুনা। কি আর বলিব!
কিছ, বলিবার নাই।—হত্যা হত্যা—তারা!
—হত্যা করিয়াছে।

তারা। হত্যা?—কে হত্যা করিল?
যমুনা। হায় তারা! এই হতভাগিনীর পতি।
তারা। কিরূপে?

যমুনা। দিয়াছে বিষ।
তারা। বিষ! বিষ! [স্তম্ভিতভাবে] তবে
নাই পৃথবী? সত্য কথা? ইহা সত্য কথা?
—উঠিয়াছে শরীরের সমস্ত শোণিত
মস্তকে। বৃষ্টিতে নাই পারি। পৃথবী নাই?
যমুনা। নাই, অভাগিনী। আর গলা ধরাধরি'
আমরা দুজনে বোন কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
আমি হারয়েছি ভাই, তুই পতি, আর
সমবেদনায় মোরা কাঁদি দুইজনে।

তারা। চলে' গেছে?—এত ক্লোধ!—এত
অভিমান!

একবার কহিলে না কথা? একবার
চাহিলে না মৃথ' পরে!—এত অপরাধী
আমি?

যমুনা। কহিয়াছিলেন মরিবার পূর্বে ভাই
“কহিও তারারে, আমি মরণ সময়ে
চাহিয়াছিলাম তার মাজ্জনা।”

তারা। মাজ্জনা!—
মিথ্যা কথা! যমুনা! এ মিথ্যা কথা! তিনি
বড় অভিমানী! বড় নিষ্ঠুর! চলিয়া
গিয়াছেন না বলিয়া—না বলিয়া তাই।
—নাথ! প্রাণেশ্বর!—ফাঁকি দিয়াছ এবার!
—করি নাই নয়নের অন্তরাল কভু—
—একবার করিয়াছি, অমানি, কপট—
সময় বৃষ্টিয়া ফাঁকি দিয়াছ! উত্তম!
দেখিব তথাপি, ফাঁকি দাও কি প্রকারে!

আমিও যাইব।—বনে, সমুদ্রে, পর্বতে,
থাক তুমি; আমি গিয়া মিলিব তোমার
সঙ্গে আজি!—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজিয়া
বাহির করিব, যেথা থাক প্রতারক!

—ভাবিছ কাঁদিব আমি নিষ্ফল বিলাপে
ধরায় তোমার লাগি?—ভাবিছ চলিয়া
গিয়াছ যেখানে, আমি নারিব যাইতে।
না না শঠ! পারিবে না।—আমিও যাইব?—
সলিল দাবাগ্নি দিয়া, মৃত্যু পথ দিয়া,
প্রলয়ের মধ্য দিয়া,—আমিও যাইব।
সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জ্ঞানে ও

অজ্ঞানে

জীবনে মরণে তারা রহিবে তোমার
সঙ্গিনী।—দেখি কে রোধে।

বক্ষে তরবারি দিয়া পৃথবীর পদতলে পতন

যমুনা। —একি সর্বনাশ!
তারা তারা! কি করিলে? কি করিলে তুমি?
তারা। নারীর—সতীর—স্বীর কার্য করিয়াছি
—এস মৃত্যু—এত স্নিগ্ধ, এত সুমধুর
তুমি বন্ধু।—নিয়ে চল নাথের সমীপে
সতীরে সুহৃৎ—[যমুনাকে]
তবে বিদায় ভাগিনি!

যমুনা। কি করিলে তারা—একি?

তারা। নতুন বাসর!
প্রিয় ভগ্নি!—এ আমার নতুন বাসর।

[সহাস্যে মৃত্যু]

যমুনা। অন্ধকার! অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!
[পতন]

শবনিকা পতন

রাণা প্রতাপসিংহ

পদ্য-চরিত

মেবারের রাণা (প্রতাপসিংহ)। প্রতাপের পুত্র (অমরসিংহ)। প্রতাপের ভ্রাতা (শক্তসিংহ)। ভারত-সম্রাট (আকবর সাহ)। আকবরের পুত্র (সেলিম)। আকবরের সেনাপতি (মানসিংহ)। আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ (মহাবৎ)। আকবরের সভাকবি (পৃথ্বীরাজ)। প্রতাপের সর্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত

প্রতাপের স্ত্রী (লক্ষ্মী)। প্রতাপের কন্যা (ইরা)। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী (যোশী)। আকবরের কন্যা (মেহের উম্মিসা)। আকবরের ভাগিনেয়ী (দৌলৎ উম্মিসা)। মানসিংহের ভগিনী (রেবা) পরিচারিকা, নর্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত।

কালীমূর্তীর নিকটে কুলপদুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্তীর সম্মুখে প্রতাপসিংহ ও রাজপুত্র সর্দারগণ দক্ষিণ জ্ঞানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অশ্বেদীপবিষ্ট

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ করিছ—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূজ্জপদ্রে ভক্ষণ কর্ব—

সকলে। ততদিন ভূজ্জপদ্রে ভক্ষণ কর্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশপরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বন্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বন্ধ হব না।

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব না—

প্রতাপ। তার আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

সকলে। তার আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

[পদুরোহিত “স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি” বলিয়া পুত্র বারি ছিটাইলেন]।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

“মনে থাকে যেন রাজপুত্র সর্দারগণ, যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ করে এই শপথ করেছে। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।”

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা।

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,—
জানো?

সর্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহার কুল-পদুরোহিত পুর্ষবৎ নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমেক পরে পদুরোহিত ডাকিলেন

“প্রতাপ!”

প্রতাপ মূখ ফিরাইলেন

পদরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে,
তা পালন কর্তে পারবে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্তাম না!

পদরোহিত। আশীর্বাদ করি—যেন ব্রত
সম্পূর্ণ কর্তে পারো প্রতাপ—

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির-
সম্মুখে পদর্শন পাদচারণ করিতে করিতে
কহিলেন

“আকবর! অন্যায় সমরে, গদুস্তভাবে জয়-
মলকে বধ করে চিতোর অধিকার করেছে।
আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর
পুনরাধিকার কর্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব না।
তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারত-
বর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—
ধর্ম-যুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা,
সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে
যাও—দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে
হয়।” [পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া
করযোড়ে কহিলেন]—“মা কালী! যেন এই
পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম জয়ী হয়, যেন
মহত্ব মহৎই থাকে।—কে?”

প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার
ভ্রাতা শক্তসিংহ দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কে? শক্তসিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতকক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতকক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কচ্ছিলাম?

প্রতাপ। অঙ্ক কচ্ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কচ্ছিলাম।
ভবিষ্যতের অন্ধকারে উর্কি মাচ্ছিলাম।
জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার
বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না
দাদা। কালী-মা ঐ জিভ বার করেই আছেন—
মুক, স্থির, চিত্রিত মূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা

নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয়
না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই
অঙ্ক কচ্ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি
না। আমি মানি না। কিন্তু হতেও পারে সত্য।
মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে যায়, যেমন
ধূমকেতু আকাশে এসে চলে যায়। তাঁকে এ
আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত,
আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে। আবার এও
হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে
মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই
তার মৃত্যু। এই “আমি” বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,
আর, একটা বড় “আমি” দশটা ক্ষুদ্র “আমি”তে
পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু
প্রশ্নই তৈরি করবে, আর তার মীমাংসাই
করবে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত
নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য করি।
সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক
সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ
করিয়া ডাকিলেন

“রাগা!”

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল।
অনেক কাজ করবার আছে। চল, কমলমীরে
চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাৎ
হইলেন। শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন
পরে কহিলেন

“জন্মভূমি? আমি তার কে? সে আমার
কে? আমি এখানে জন্মেছি বলেই তার প্রতি
আমার কোন কর্তব্য নাই। আমি এখানে না
জন্মে’ সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে
পার্তাম! জন্মভূমি? সে’ত এতদিন আমাকে
নির্ধারিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও
পারে নি। তার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্তে
যাব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাগা, তুমি

তার জন্য জীবন উৎসর্গ কর্তে পারো, আমি কৰ্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।”

[এই বলিয়া শক্তসিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হৃদতীর।

কাল—সায়াহ্ন।

প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্যের দিতে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—

“কি গরিমাময় দৃশ্য সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ না, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে, এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে’ অস্ত যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভ ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর যেন দেবারতীর জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কল্প সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন?—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!”

ইরার মাতা লক্ষ্মীবাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন

“ইরা!”

ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন

“কি মা?”

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি করছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখছি মা। দেখ দেখ মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মৃদুচ্ছবি! আমি সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখতে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা’ তাতে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ-

মাথানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগবে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পূর্ব্বচর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনূচর। কখন বা প্রেম-রাজ্যের সন্ন্যাসী কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখ তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!

বলিয়া ইরা একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টি চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন।

“এখন ঘরে চল্ ইরা.—সন্ধ্যা হ’য়ে এল।”

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নিষ্কর্জন উপত্যকায় কে ও?

[দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

[শঙ্করা—একতারা]

সুখের কথা বোলোনা আর,
বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো,
দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা,
সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুঃখের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি’।
দয়া করে’ মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, দুঃখের হাসি হাসতে হবে;
চোখে বারি দেখলে পরে,
সুখ চলে’ যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে’ আদর করে’ মদ্যুর আঁখি।

দুই জনে নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মীবাই কন্যার প্রতি চাহিয়া

দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পভারাবনত।
ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন

“সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ
হয় যে, স্নেহের চেয়ে দঃখের ছবি মধুর।”

লক্ষ্মী। দঃখের ছবি মধুর!

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক
লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও
দেখে! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রু-
সিক্ত, আনতচক্ষু, বিষন্নবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি
কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা
জিজ্ঞাসা করি? আগ্রহ হয় না কি তাঁর দঃখের
কাহিনী শুনতে? ইচ্ছা হয় না কি তাঁর প্রাণে প্রাণ
মিশিয়ে, চুম্বনে তাঁর অশ্রুটি মূছে নিতে?
যুদ্ধে যে জয়ী হয় ভাল লাগে তাঁর ইতিহাস
শুনতে, না যার যুদ্ধে পরাজয় হয় তাঁর ইতিহাস
শুনতে?—কার সঙ্গে সহানুভূতি হয়? গান—
উদাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর,
উষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর? গিয়ে দেখে
আসতে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিতা,
সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী? না বিগতবৈভবা,
শ্লানা, নীরবা মথুরাপুরী—স্নেহে যেন মা
একটা অহংকার আছে! সে বড় স্ফীত, বড়
উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দঃখ মহৎ, স্নেহ
নীচ। দঃখ যা জমায়, স্নেহ তা খরচ করে। দঃখ
সৃষ্টিকর্তা, স্নেহ ভোগী। দঃখ শিকড়ের মত
মাটি থেকে রস আহরণ করে, স্নেহ পত্র-পুষ্পে
বিকশিত হয়ে সেই রস ব্যয় করে। দঃখ বর্ষার
মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, স্নেহ
শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁর উপরে এসে হাসে।
দঃখ কৃষকের মত মাটি কর্ষণ করে, স্নেহ রাজার
মত তাঁর জাত-শস্য ভোগ করে। স্নেহ উৎকট,
দঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বড়ি না ইরা। তবে বোধ
হয় যে এ পৃথিবীতে যারা মহৎ, তাঁরাই
দঃখী, তাঁরাই হতভাগ্য, তাঁরাই প্রপীড়িত।
মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই
মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময় প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ
আসিয়া ডাকিল

“মা!”

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“কি অমর?”

অমর। মা, বাবা ডাকছেন।

লক্ষ্মী। কহিলেন—“এই যাই”—ইরাকে
কহিলেন—“চল মা।”

[লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন।

অমরসিংহ হৃদতটে একখানি শূন্য কাষ্ঠখণ্ডের
উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল

“আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে’
বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার
আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম,
মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র তবু যুদ্ধ ব্যবসা
শিখিছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র
হয়ে লাভ কি? তাঁর উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই
অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুঃখপনের
অভাব,—কেন যে, কিছুই বড়ি না—ঐ কাকা
যাচ্ছেন?—কাকা—!”

শক্তসিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্তী
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“কে? অমর?”

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি
এখানে?

শক্ত। একটু বেড়াছি। এখানে একটু
বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের
তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন
সেখানে এমন হৃদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন
লাগছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা! আপনাকে বাবা
এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে
যুদ্ধ করবার জন্য?

শক্ত। না! তোমার পিতা আমাকে আশ্রয়
দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে
নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন
ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন
আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা।—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য
পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ
হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—“তা জানি না।”
ভাবিলেন—“সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ
হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন
হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ,
সেই রাজ্য পাবে! কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে
জানে—সমস্যা বটে!”

অমর। কি ভাবছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাগিত
হয়েছে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বাহির্বাটী।

কাল—প্রভাত।

পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ—মাড়বার, অম্বর,
গোয়ালীয়ার ও চান্দেবরী-অধিপতি আরাম আসনে
উপবিষ্ট

মাড়বার। পড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা।
[অম্বরের দিকে চাহিয়া] অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও
কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস
গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটার
যেমন সুন্দর নাম, তেমন সুন্দর ভাব, তেমন
সুন্দর ছন্দ।

চান্দেবরী। কবিতাটার নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। “প্রথম চুম্বন।”

চান্দেবরী। নামটা একটু রসাল ঠেকছে
বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন! সে বিষয়ে কখন
কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না?

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা।

যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি
হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী!
সভার কোন নতুন খবর আছে?

পৃথ্বী। এ্যাঁ—খবর আর কি—ঐ এক
রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঁ! প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর
সাহার সঙ্গে! তা কখন হয়, না হতে পারে?
সম্ভব হলে কি আমরা কর্তাম না?

গোয়ালীয়ার। হুঁ!—তালে কি আর
আমরা কর্তাম না?

চান্দেবরী। হুঁঃ!

মাড়বার। “নহ বিকশিত কুসুমিত ঘন
পল্লবে”। সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী!

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়ার। একটা সামান্য জনপদ, তারি
ত রাজা!

চান্দেবরী। আর রাজাও ত ভারি! তার প্রধান
দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।
মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর
কি!

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি
সুন্দর করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল কটক
হঠাৎ আক্রমণ করে নিস্কূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেবরী। চল ওঠা যাক্, আবার এক্ষণি
ত রাজ-সভায় হাজির দিতে হবে—

এই বলিয়া উঠিলেন

মাড়বার। “চল,” বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়ার ও অম্বর নীরবে উঠিলেন

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুর-
মত গোঁয়াত্তমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুর-
মত ক্ষ্যাপামি।

চান্দেবরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের
দস্তুরমত বোকামি।

[তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ
করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।]

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজ-
দার।—এবার তৈয়ার কর্তে হবে একটা কবিতা—
বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি

ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখতে বসলে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অশ্বেদক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন
পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন। আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্ পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আব্দুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশস্বরে কহিলেন

“হায় তাতেও অহংকার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে দিয়ে অহংকার!”

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্বেক হোল! সম্রাট্ আকবর লোকটা বড় যা তা বুদ্ধি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো?—সমস্ত আৰ্য্যাবর্ত্ত যার পদতলে!

যোশী। ধিক্! একথা বলতে বাধলো না?—একথা বলতে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুণ্ঠিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আৰ্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আৰ্য্যাবর্ত্তে প্রতাপসিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্-দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ কবিষ্-হিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এর বেশ এই বকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট্ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, অচল, দঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বলতে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূজ্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উপার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিষ্ হিসাবে দেখতে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি বকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে স্বচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই, তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিসেরও অনটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলো, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে; যদি একটা জিনিস কিনতে ইচ্ছে হোল যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই, মেলা ছেলোপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি টাঁ টাঁ ক'চ্ছেই।—এটা অসুবিধা বলতে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে ওঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী। কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ শাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামির হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝতে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এ বকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামিই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়ি-বাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চার্ট চার্ট করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতরজন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছ্ উৎসর্গ কর্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্ছে না—ছাপিয়ে পড়ছে! যা বলেছ আগে তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও—

[যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। মাটি করেছে!—হার স্বীকার কর্তে হয়েছে। পার্শ্ব কেমন? বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বৃন্দ্বি, তার উপর যোশী উচ্চাশিক্ষিতা নারী। পার্শ্ব কেমন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ একেবারে মাটি!

[এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন।
কাল—প্রভাত।

সমস্ত প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দুর্বিষসর্পি-অরণ্যের প্রতি চাহিয়া ছিলেন অনেকক্ষণ পরে শব্দ স্বরে কহিলেন

“আকবর! মেবার জয় করেছে বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন করিছি আমি! এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দকও তোমার ধনভান্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতি জ্বালতেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করেছি। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করেছি। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকত, সেখানে আজ বন্য-পশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসু মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ

পারিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পারিয়ে রেখে দেবো মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।”

বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাত্পরুদ্ধ হইল এই সময়ে একজন মেঘরক্ষক-সর্মাভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল

“রাণা!”

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন

“কি সৈনিক!”

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গ-পার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেঘ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেঘরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

“মেঘরক্ষক, এ সত্য কথা?”

মেঘরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা!

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কষণ কর্তে কিংবা গো মেঘাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেঘরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেঘ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেঘরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেঘরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা করবেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখবে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মূণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখন্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কর্তেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

[সৈনিক মেঘরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। নিরীহ মেঘপালক! তুমি বেচারী

নিগ্রহের মধ্যে পড়ে মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—মা জন্মভূমি' তোমার জন্য। তাই তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চীরধারিণী কুটীরবাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যরত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সম্যাসী হয়েছি।

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্তিসিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীর-পদক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখলে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই?

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করবার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্য-পশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়! এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নিজ্জর্ন পথ। এ' সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিষ্ক্রেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিষ্ক্রেপ কর্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বপ্নে মেবারের রাণা, আমি যার কুপাদন্ত অঙ্গে পরিপূর্ণ।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্ল ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-ববাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্কে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিষ্ক্রেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্তিসিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হৃদ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম আছে! মর্ষ্বী না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ষ্বীর ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিষ্ক্রেপ কর।—[চীৎকার করিয়া] নিষ্ক্রেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিষ্কেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিষ্কেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভুল নিষ্কেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কহিলেন “এ কি! দ্রাতৃবন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।”

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বোরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্ণে তুমি!

পুরোহিত। কিছুর না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত করবার জন্য এ কাজ করিছি।

প্রতাপ। কি কর্ণে শক্ত?

শক্ত। [উদ্ভ্রান্তভাবে] সতাই ত! কি কর্ণাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনোছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ধনাশের কারণ হবে। এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ধনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখতে পারি না। তুমি এই মহর্ন্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব। যাও।

[উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ন।

মানসিংহের ভাগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন

গীত

[হাস্বর—মধ্যমান]

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।

নিদাঘ নিশীথে, ভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।

আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;

মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে

ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধ পরিচারিকা প্রবেশ করিল

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর আমি এদিকে তোমার জন্যে আঁতপাঁতি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'।—কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্শির ঘুম নেই।'

'দরকার কি?' তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো!

আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে! মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা! তাহলে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কবেই বা কে?—

যখন আমার বিয়ে হয় বাছা তখন তোরা জন্মাস্নি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির করে বকতে হবে না—যা বড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি

করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে, চুমো খাবে; না বলে কি না 'যা বর্ডা'। না হয় আজ আমি বর্ডাই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বর্ডা বলে' গাল দিতে হয়! হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বর্ডাই হইছি। চিরকাল ত বর্ডা ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো, টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছ্ অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুনতে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিসনে বলছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ওমা সে কি গো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাকতে এসেছি। তোমার মা ডাকছিল, তা শেষে বলে কিনা, "না, ডেকে কাজ নাই"। বিয়ের সম্বন্ধ শুনাই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়-সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক ষাট বছরের বড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখতে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৈবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনো তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখিনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখিনি! কুরুক্ষেত্রের। এই মারে ত, এই মারে!

রেবা। এ্যাঁ!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছ্ মারেনি।—তবে—

রেবা। তবে বলছিল যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না; তা আমি বলবো কি।—তোমার মা বলে যে,—“না—এমন বড়োর হাতে আমার সোনার মেয়েকে সপে' দিতে পার্ব না।” তা তোমার বাপ তাতে বলে “ঠিক কথাই ত, এমন বড়োর হাতে কিছ্ তে আর মেয়েকে সপে' দিতে পার্ব

না!” তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মান-সিংহকে পত্র লিখতে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগতে কতক্ষণ! আমার মিন্সে। সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোখ রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্ব; ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্ব!' তার পর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাতে ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষা। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্রের বাধত নিচ্চয়। তার পরদিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধা-সাধি! যত আদরের কথা সে জান্ত, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেবা। জ্বালাতন করলে। যা বলছি। যাবি নে?

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো!—তোমাকে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!

এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদতে লাগিল

রেবা। মাল্যাম কখন?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারোনি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে করে' মানুষ করলাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বর্ডা হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সে নেই, যৈবনও নেই, তা তোমাদের ধর্ম্ম নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোটটি ছিলে। তখন আর কিছ্ এত বড় হও নি!—একদিন তোমাকে নুকিয়ে রামনীলে দেখতে নিয়ে গিইছিলাম। শুনো মহারাজ আমার গন্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা!

পরিচারিকা। ওই শুনলে!

রেবা “যাই মা” বলিয়া চলিয়া গেলেন!

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া
রহিল; পরে উঠিয়া কহিল

“যাই, আমিও যাই। আর কার কাছে
বকবো।”

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত।

আকবর ও শক্তিসিংহ উভয়ে পরস্পরের
সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান

আকবর। আপনি রাগা প্রতাপসিংহের
ভাই?

শক্ত। আমি রাগা প্রতাপসিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য
কি?

শক্ত। রাগার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য
নিয়ে যেতে চাই; রাগাকে মোগলের পদানত
কর্ত্তে চাই। রাগার সৈন্যদের রক্তে মেবারভূমি
রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তাতে মোগলের লাভ? মেবার
হতে ত এক কপর্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল-
ভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাগাকে জয় কর্ত্তে পারলে প্রচুর অর্থ
রাজভাণ্ডারে আসবে। আজ রাগার আজ্ঞায়
সমস্ত মেবার অর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি
স্বর্ণপ্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-
দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক
স্থানে মেষ চরাচ্ছিল: রাগা তার ফাঁসি দিয়েছেন।

আকবর। [চিন্তিতভাবে] হু! আচ্ছা,
আপনি আমাদের কি সাহায্য করবেন?

শক্ত। আমি রাজপুত্র, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি,
রাগার বিপক্ষে যুদ্ধ করব। আমি রাজপুত্র,
সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাগার বিপক্ষে মোগল-
সৈন্য চালনা করব।

আকবর। তাতে আপনার লাভ?

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসৈন্য সাহায্য
দিলে প্রতাপসিংহকে জয় কর্ত্তে পারবেন?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পারবে। আমি
প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি,
অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি।

প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। প্রতাপ ক্ষত্রিয়,
আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজ-
পুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ—আমি কনিষ্ঠ।
একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমরাসিংহ
বলেছিল যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে
কথায় সে দিন ধাঁধা লাগিইছিল। আজ সেটা
সত্য বলে জেনেছি।

আকবর। হু—

এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া
ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন

“দৌবারিক!”

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মহারাজ মানাসিংহকে সেলাম
দেও।

দৌবারিক “যো হুকুম খোদাবন্দ” বলিয়া
চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্তিসিংহের সম্মুখীন হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন

“শুণ্তে পাই যে আপনি প্রতাপসিংহের
কাছে কৃতজ্ঞ।”

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ
শুনেছি।—প্রতাপসিংহ কখনো কি আপনার
উপকার করেন নি?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয়
সিংহ যখন আমাকে বধ করবার হুকুম দেন—

আকবর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ
করবার হুকুম দেন?”

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট, আমার জীবনের
ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স,
তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা
করবার জন্য, আমার হাতে বসিয়েছিলাম।
আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি এক-
দিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো।
আমার পিতা যখন দেখলেন যে, আমি এক-
খানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কেচে নিজের হাতে
বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্ত্তে নষে,
আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব
দুঃসাহ্য সাধন হতে পারে। তখন তিনি
আমাকে বধ করবার হুকুম দিলেন!

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন;— সম্রাট কি ভীরু উদয়সিংহকে জান্তেন না? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুত্রের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্বেন যে বর্ষের রাজপুত্র রাজ্য শাসন কর্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ষের রাজপুত্র কি বর্ষের মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বলতে শুনিন নাই যে সে বর্ষের।

আকবর যুবকের স্পর্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন।
পরে বিষয়-পরিবর্তন মানসে কাহিলেন

“আচ্ছা, শুনিন তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন— তার পর?”

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালদুস্ত্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখতেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা ল'ন। আমি সালদুস্ত্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা। সালদুস্ত্রাপতির দ্বারা অনুরোধ হয়ে তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে।

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে

ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্তে গিয়েছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে যদি প্রতাপ আমাকে নিৰ্ব্বাসিত কর্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নিৰ্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই।

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

“প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?”

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধু-ভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট, তা আমার দ্বারা হবে না। তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধ হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট, আপনারা সভ্য মুসলমান-জাতি; আপনাদের এ সব ফেরপে'চ্ শোভা পায়। আমরা বর্ষের রাজপুত্র—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়াঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত্র বন্ধুত্বেও রাজপুত্র, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত্র। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী সমাজ-দ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত্র। তার অনর্দচিত আচরণ কর্ব না!

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে শ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অধ্বেদক জয়ই কৌশলে। সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময়, কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্বেন না? নইলে তিনি মোগল

সেনাপতি না হ'য়ে ত আমিই মোগল সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত্র।

শক্ত। হাঁ, তার মা বাবা শূন্যে উভয়েই রাজপুত্র ছিলেন!

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুদ্ধিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুদ্ধেন নাই; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

“তবে?”

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টোকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উত্রে যায়, মানসিংহ রাজপুত্র হয়েও, কি রকম উত্রে গিয়েছেন। তার উপরে—

বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালকপুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোষ্মা খেয়েছেন— একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কাহিলেন

“আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথায় আঞ্জা আমি কাল দেব!

শক্ত। যে আঞ্জা—

এই বলিয়া শক্তসিংহ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন; যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বাহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কাহিলেন

“প্রতাপসিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মৃষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্ঘ্যবর্ষ আজ জয় কর্তে পারতাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান বোপে থাকতো! এই যে মহারাজ আসছেন।”

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে বিনীত অভিবাদন করিলেন।

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব! সম্রাট আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপসিংহের ভাই শক্তসিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখলাম।

যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেম ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিম্বান্, নিভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্বজগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পারনি। তবে ধাতু খাঁটি, গড়ে নিতে পারা যাবে।

মানসিংহ। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, যার যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত আদায় কর্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শূন্যেছেন যে প্রতাপসিংহ একজন মোগল মেঘরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে?

মান। না, শূন্যে নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ করে তিনটি মোগল কটক নিস্কূল করেছে!

মান। সে কথা শূন্যেছি।

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত?

মান। আমি ভাবছিলাম কি, যে, আমি শোলাপুর থেকে আসবার সময় পথে প্রতাপসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবো: যদি কার্য্য ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয়, যুদ্ধ হ'বে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞেব মতই উপদেশ দিয়েছেন। তবে তাই হোক। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যয়ে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আঞ্জা।

[আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত

হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুত্রকুলে—প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শূদ্র পতাকা!—খন্য প্রতাপ!

[এই বলিয়া সৈন্যস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
কাল—অপরাহ্ন।

আকবর-কন্যা মেহের উম্মিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতোছিলেন

[খাম্বাজ—ষৎ]

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান;
নিজ মনে করি খেলা, আপনাকে করে' সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাত।
সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উম্মিসা
দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা
দিয়া কহিলেন

“মেহের ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে,—দেখ্ না বেকুফ্!”

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখুবো কি?

[গীত] “নিজ মনে কাঁদি হাসি—”

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছ্ আর দেখতে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শূনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাবে ধরিয়
কহিলেন

“তবে শোন্। এই দেখ্, প্রথমতঃ এই

পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস, কাজ নেই, কর্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে মছে, কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরণে দিনকতক উলট-পালট খেয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের করতে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়; এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ মানুষগুলো—বৃদ্ধ শূদ্ধ আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে, খয়েবন্ধনে পড়ে—না পারে খে খেতে, না পায় হাত খুলতে—এটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দম্ভুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া-দাওয়ার বিষয় ভাবতে হয় না। তবে আমি সম্রাট আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর একজনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি;—আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দম্ভুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্বনে ঠিক করে' বসে আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু বসে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম না থাকলে যে রকম হয়, সেই রকম। শূচ্ছি, বস্ছি, উঠ্ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুল্ছি, তুড়ি দিচ্ছি। শূন্তে বেশ কুমারী। কিন্তু এদিকে শূয়ে শূয়ে ওমরখাইয়াম পড়াচ্ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়িকাঠের গায়ে এ'কে নিচ্ছি। সূবিধা হ'লে আল্‌সের ফোঁকর দিয়ে উ'কি মেরে দু'নিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কর্ছি,—

এই বলিয়া মেহের উম্মিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছ্, ঠিক করে' উঠিছিস্ না কেবল বিচারই কিছ্'স? মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন

"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বলতে যাবো?"

দৌলৎ। বলবিনে কেন? আমি তোর বোন, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদয়মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তারি জিনিস। একথা তোকে খুলে বলতে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরাপাকড়া করিস্; আমার মনোচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বলতে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি' দেখি যদি তোর মনোচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন—আমার মনোচোরের চেহারাটা কি রকম! নাক—আছে। কান—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাসলে মুক্তা ছাড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চোঁচয়ে কাঁদলে—অবিশ্য যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে বলেও ভ্রম হয় না।—আমার মনোচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পারিবি?

দৌলৎ। একেবারে হুবহু। সত্যি কথা বলতে কি মেহের, তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সামনে দেখছি।

মেহের। তা দেখ। কিন্তু দেখিস ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্লেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি, কিছ্'স মেহের।

মেহের। এই দৌলৎ বললে পৃথিবীতে যত

আশ্চর্য্য জিনিস আছে তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বলতে হবে? বল না দৌলৎ, মদুখন্ড বল না! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখলি ত, বল না। আমি কি বলছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলত উল্লিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব; আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্তে পারে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বলছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগাব করছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়োবার জন্যে;—এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম।

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম।

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিছিস্, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই, এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে।

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট-সৈন্যকে বাতিবাস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে। ১০০ রাজপুত, ৫০০ মোগল সৈন্যের সঙ্গে লড়াই। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুর মত যুদ্ধ করে' তা'দের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হবে। মানসিংহ

শোলাপদুর থেকে আসবার সময়, পথে প্রতাপ-সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আসবেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ করব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে থাকবো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা আমাদের কাছে এসে 'এরমনি যুদ্ধ কল্লাম, অরমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে বড়াই কর। আমরা গিষে দেখবো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তারপর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ-পিঠ, অন্য পক্ষ নেয় ও পিঠ, তারপরে একজন সেটা বড়ো আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—মাটিতে পড়লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্যে?

মেহের। একটা হাঁক্ ডাক্ কর্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ করবে। তোমার আর যুদ্ধ কর্তে হয় না—কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ করবে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখবে?

মেহের। হাঁ দেখবো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখবো বৈকি!

সেলিম। আচ্ছা, আলবাৎ দেখবে। আমি

বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি! দেখ, যুদ্ধ করি কিনা।

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এরমনি দেমাক্, যে তাতে ঘা' পড়লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া

“সম্রাট্ আসছেন!”

[বলিয়া চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ!

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আজ্জি কর্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারী ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেলবেন না ত!

দৌলৎ। না আমি যাই।

[এই বলিয়া বাস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মেহের। দৌলৎ সম্রাটকে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন

“মেহের এখানে একেলা বসে?”

মেহের সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন

“হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আসছেন শুনে দৌড়।”

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাটকে শত্রুরা ভয় করে করুক আমরা ভয় কর্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

“তুমি আমাকে ভয় কর না?”

মেহের। কিছ্ না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের মতই দেখতে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। কেন? মান্য করব না!—বাবা! একে বাপ, তাতে বয়সে বড়!

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি

আমায় ভয় করিবে তাহলে আমায় ভালো-
বাসবে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপ-
সিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে?

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে
যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কতট
হবে। মানসিংহ চিরকাল থাকবে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আঞ্জি
আছে।

আকবর। কি আঞ্জি?

মেহের। মঞ্জুর করবেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানো না কি
মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখতে
দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি! স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে
কি?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় যে
চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে? তাদের সখ
নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন
হতে পারে?

মেহের খুব হতে পারে। শুধু হতে
পারে না, তাই হবে। বাপ আবদার কর্তে পারে,
আর মেয়ে আবদার কর্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আবদার করলাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে
এসে বসেন, 'মেহের, হিন্দু শাস্ত্র থেকে একটা
গল্প বল দেখি, যাতে কোন ধার্মিক বীর
ছিলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের
কথা বললাম; দ্রোণ-বধ করবার কথা বললাম। তখন
আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ
যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তা কি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে বিবেচনা
করে; দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক।

[উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয় সাগর হৃদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন।

একদিকে রাজপুত্র সর্দারগণ—মানা, গোবিন্দসিংহ,
রামসিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপসিংহের মন্ত্রী ভীম
সা সমবেত, অপর দিকে মহারাজা
মানসিংহ দণ্ডায়মান

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল
আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপসিংহের
নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মান-
সিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা
থেকে করিবে। তবে আমরা জানি যে অম্বরের
অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য
বিবেচনা করবেন এবং সকল গুটি মার্জনা
করবেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপসিংহের
আতিথ্য গ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুত্রের
পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য
কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র
প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্যে তিনি প্রতাপের
চিরশত্রু মোগলের পদ-লেখী!

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ
আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ
কি আচরণ প্রত্যাশা কর্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ
আমাদের অতিথি। মানার কথা ধরবেন না
মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা
সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে
রাখবেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য
আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য আমার
স্বকৃত নহে। তবে আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি,
একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে
অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র
অধিপতি।

মানা। কোন স্বপ্নে?

মানসিংহ। শক্তির স্বপ্নে। যুদ্ধে পুনঃ

পূর্নঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ! স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এক বৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বপ্ন পিতা হতে পুত্র বর্তে সে স্বপ্ন বংশপরম্পরায় চ'লে আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা' নিষ্ফল। প্রভূতবল ও অপরিমিত-শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' রক্তপাত কবার ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ কবে' যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই সাধনী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্মিক হিন্দু মূণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্য এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে, যা মানসিংহের সম্রাটপদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা ধিক্!

এই সময় অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া
মানসিংহকে কহিলেন

“মহারাজ মানসিংহ! পিতা বল্লেন—আপনি স্নাত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।”

মানসিংহ। প্রতাপসিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ, আজ কিছু আহার কর্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুদ্ধোচ্ছ অমরসিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্বে যে, এতদিন তাঁর সম্মান-

রক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি; তাঁকে বোলো যে, আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহংকার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

“মহারাজ মানসিংহ, উত্তম! তাই হোক। প্রতাপসিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি: নহিলে এখানেই স্থির হয়ে যেত যে, কে বড়-সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।”

মানসিংহ। উত্তম! তবে তাই হোক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চূপ কর রোহিদাস।

[মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সময়ের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নিৰ্ব্বাণ কর্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধে যাই হয়—জয় কি পরাজয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপসিংহের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পৃথবীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাতি।

পর্ষাঙ্কে অশ্বর্ধ-শয়ান পৃথবীরাজ; সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী ষোণীবাই দণ্ডায়মানা

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের

অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বা-
পেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট।

পৃথনী। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহৎ ভাব!
আমি ভাবছি যে এটার উপর একটা কবিতা
লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায়
সম্রাটকেই বড় করবে?

পৃথনী। সম্রাটকে বড় করবে না? তিনি
হলেন সম্রাট, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা
খাই। এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে কি
আমি নেমকহারামি করব?

যোশী। কলিকালই বটে। নইলে প্রতাপের
ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ
এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে!
নইলে অম্বরপতি রাজপুত্রবীর মানসিংহ,
রাজপুত্রানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজ্য
মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বন্ধপরিকর।—
নইলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথনীরাজ
মোগল সম্রাট আকবরের স্তাবক! হায়! চাঁদ
কবি বলেছিলেন ঠিক, যে, হিন্দুর সর্বা-পেক্ষা
ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথনী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী—
হিন্দুর সর্বা-পেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা]
ঠিক! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।—ঠিক!—হু
—ঠিক—

এই বলিতে বলিতে পর্য্যাক হইতে উঠিয়া, বাম
ও দক্ষিণ পার্শ্ব শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে,
পশ্চাতে সম্বন্ধ-করয়ুগ পৃথনী কক্ষ মধ্যে পাদ-
চারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া
দাঁড়াইয়া রহিলেন

পৃথনী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা
লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু'। এই
রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে
মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক,
সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু
মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে
গর্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে
বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে
—সে শত্রু হলে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা
অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহংকার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ
উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথনী। বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো
সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দেয়।
তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে কি বাস্তব-জগতে, কি
সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে—সব জায়গায়,
বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,—
যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা
দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে?—
উপমায়—'উপমা কালিদাসস্য।'—উঃ কি কবিই
জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম,—প্রণাম কালি-
দাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী,
আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সভাবর্ণনা,
শোননি, শোন—

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা
ছাড়া।

পৃথনী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ময়িত
নেত্রে কহিলেন

“কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে ব'র্টিটি
নিয়ে এসে গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা
লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী?”

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি
রায়সিংহের ভাই! তুমি হলে সম্রাটের চাটুকার
কবি! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেথে এই
দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যয় করে দিলে। লজ্জাও
করে না!

পৃথনী পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন

পৃথনী। “ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ”—এও
সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্নরুচির্হি
লোকঃ—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে
ভালবাসে; কেউ বা তা শুনতে ভালবাসে। কেউ
বা রাঁধতে ভালবাসে; কেউ বা খেতে ভালবাসে।
প্রতাপ যুদ্ধ কর্তে ভালবাসে; আমি কবিতা
লিখতে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে। আমি
মসী ধরেছি।

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! এ কাব্যময়
সংসারে এসে অসার কথার অসারতর মিল
খুঁজে খুঁজে, জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে
কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছো?

পৃথনী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস,
ভবভূতি, মাঘ, যে পথের পথিক, আমিও যদি
সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছুর লজ্জাও
হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা
নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

পৃথ্বী। বন্ধুছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে, যাতে আমার মেজাজ ঠান্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর; যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন

“প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্ত-হস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও; পূর্ণ আহার পাবে, বাস করবার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়াসুঁমি করে, একটা আদর্শ খাড়া করে’ অনর্থক যত ক্ষত্রিয়-পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও!”

[এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্দিঘাটের গিরিসঙ্কট; সৌলমের শিবির।
কাল—প্রাহ্ন।

সৌলমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। কৈ, সৌলম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। বাস্। আমি বসে’ তার অপেক্ষা কর্বে।

দৌলৎ। তুই যে আজ চাটীছস্ দেখছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখতে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুনছি! না। আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে থাকতে চাই না! আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আজই চলে’ যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বন্ধুতে পার্লাম না। তাড়াতাড়ি এলি যুদ্ধ দেখতে; এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্ চলে’ যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনের দিন দুই সৈন্য মন্থোমুখি হ’য়ে বসে’ রয়েছে, আর

চোখ রাঙাচ্ছে! একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাকতে পারে না! ঐ শোন—ঐ ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাকতে পার্বে না! আমি এখনি চলে যাবো।—এই যে সৌলম আসছে!

সসম্ভ্র সৌলম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীশ্বরকে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“এ কি!—তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?”

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সৌলম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে’ যাবো।

সৌলম। কি রকম?

মেহের। [উঠিয়া] কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত্র-সৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল-সৈন্য,—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক্ দিচ্ছে বটে, কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজছে বাদ্য। এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সৌলম। তা কি হয়! যুদ্ধ হ’বে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি, তাই আক্রমণ কর্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ’তাম্—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও! তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হ’য়ে এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে’ গেছি! আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাকবো না।

সৌলম। তা কেমন করে হবে। আগ্রায় অগ্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্, বাঁকাই হোক্, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্বে—

সৌলম। কি রসাতল কর্বে?

ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বলবো, কি আত্মহত্যা কর্বে,—আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা—[পরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন]—“আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।”

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্য একেবারে পাগল! স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা! তখন যে আমার পায়ে ধর্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যেটুকু বাকি রেখেছিলাম সেটুকু এখন করিচ্ছি! [এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।] “আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধরিচ্ছি। হয় কালই একটা এম্পার ওম্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।”

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাবি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্য মেয়ে। ভাগ্যিস তুই মাত্র ছোট বোন,—তাতেই এই আবদার।

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।]

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছি।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে?

এই সময়ে “সেলিম, সেলিম” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্তসিংহ শিবির-মাধ্য প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া

“ওঃ—মাফ কর্বেন।”

[এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।]

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শূনোঁছ রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ। দিব্য চেহারা—না?

দৌলৎ। হাঁ—না,—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শূনোঁছ—শক্তসিংহ খুব বিদ্বান, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যক্তিপ্রিয়! আহা, এসে চট করে চলে গেলেন! থাকলে, একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনানামি এখানে নাইবা কর্ণাম। আর সত্য কথা বলতে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অমনি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাবছি?—আয়!

[এই বলিয়া দৌলৎ উম্মিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।
সেলিম ও মহাবৎ মৃথোমূর্খ দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

সেলিম। মহাবৎ খাঁ। প্রতাপসিংহের সৈন্য কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হবে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? | পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে। আর কিছ্ নাহোক্, প্রতাপের স্পর্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুুষটাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপসিংহ সৈন্যের পিছনে থাকেন না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। [পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া] দেখ্—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবার সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক।

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুনতে শুনতে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইস্ট দেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহাজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হতে আরাকান, হিমগিরি হতে বিস্কা—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট তা জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শূনোঁছ মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শূনোঁছ! শূনতে শূনতে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময় মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন

মান। বন্দেগি যুবরাজ। বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিম-দিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দুর্দিকে অনূচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন

“তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?”

মান। দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসংগত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্বে!

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে থাকবো?

মান। যতদিন পারি। দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি।

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্বে!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্বে! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও।

সেলিম। তা হতে পারে না। মহাবৎ, সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যুষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি!

সেলিম। আর আমি কি এই যুদ্ধে সাক্ষী-গোপাল হয়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সন্ন্যাসের প্রতিনিধি-স্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সন্ন্যাসের নামস্বরূপ, ফার্মানস্বরূপ, চিহ্ন-স্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সন্ন্যাসের একখানি চর্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখতো!

সেলিম। এতদূর আশ্চর্য্য মানসিংহ!

এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন

মান। তরবারি কোষবন্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে স্বপ্নযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন।

আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্য আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সন্ন্যাসের কাছে দিব। মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

[মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গস্তীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ “বন্দেগি যুবরাজ” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হোক, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো।—ভূত্যের এতদূর সম্পর্ক!

[এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সমবাগান। শক্তসিংহের শিবির।

কাল—অপরাহ্ন।

শক্ত একাকী দণ্ডায়মান

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অর্চিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হবে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা ফিরে পাবে। বাস্ শোধবোধ।—আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে! মেবার ছারখার কর্বে, ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্বে! এই মাত্র, আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে শ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শত্রু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্বে। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্তে পারি না, তাই

মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বলতে পারে যে, অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই! বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ে দিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শাস্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শাস্তি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উম্মিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন, শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কাহিলেন
“কে?”

মেহের। আমি মেহের উম্মিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাহিলেন
“আপনি সন্ন্যাসের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!”

মেহের। আপনি প্রতাপসিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে?

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কাহিলেন
“হাঁ, আমি প্রতাপসিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।
—আমি প্রতিশোধ চাই।”

মেহের। তাহলে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাবছি।

মেহের। তা বেশ ভাবুন না? আমিও ভাবি!

এই বলিয়া মেহের বসিলেন, শক্তসিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কাহিলেন
“আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্তে পারি?”

মেহের। পারেন বৈকি, খুব পারেন? আমি ভারি মন্থকলে পড়েছি!

শক্ত। মন্থকল! কি মন্থকল!

মেহের। মহামন্থকল! সেলিম আমার ভাই হ'ন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উম্মিসা যুদ্ধ দেখতে এসেছি, তা'ও হয়ত শুনেন থাকবেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখতে; কিন্তু কৈ,—যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে'

বসে' কি করি বলুন দেখি? দৌলৎ উম্মিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প করছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে পড়লো!—বাবা, কি ঘুম! এই গোল-যোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে! —আমি এখন একা কি করি! দেখলাম—আপনিও এখানে একা বসে। তা' ভাবলাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনছি আপনি একটা বিম্বান লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা। তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই।—যাহোক, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একা-কিনী শূনে সেলিমই বা কি বলবেন, সন্ন্যাস আকবরই বা কি বলবেন?

মেহের। সন্ন্যাস আকবর কিছু বলবেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম। সেলিম বলবেন আর কি? আমি তাঁর বোন। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শূনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না!—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য।

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাকতেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আসতেন, তা'হলে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে। তবে বিবাহ করা একটা প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আসছে—মেনে চলতে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্তা কি ধরণের। শূন্যে বড় কোতূহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বলেন, “প্রিমে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচনে” আর উনি বলেন যে, “নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না

দেখে আমি ম'লাম;—সব দুদিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনাশুনা ছিল না,—দু-তিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল যে, পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাঁচেন না!

শক্ত। আপনি দেখেছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনোছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারাখানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হলেই গন্ধর্বা'কুমার, আর নায়িকা হলেই অ'সরা হতেই হবে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ষণবিশ্রান্ত নয়। দু'দুটো—শুনোছি যুগ্ম দুই ভালো; তা আমার দু'দুটোর মধ্যে একে-বারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা আমার নাক চেঁটা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দু'জনার মাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখতে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন দৌলৎ উম্মিসা দেখতে খুব ভালো! আমি দেখতে যা খারাপ, সে তা প'রিয়ে নিয়েছে। তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে ত দিব্যরাত্রি কিছু আয়না সামনে ধ'রে রাখতে পারে না!

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপসিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনীবেশে! এ কি স্বপ্ন দেখেছি!

ইরা। না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখতে এসেছি, পিতৃব্য।

মেহের উম্মিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন
“ইনি কেন?”

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উম্মিসা [স্বগত] এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজপুত্ররাজের কন্যা অনির্মিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন

“তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?”

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! তাই এবার নাছোড়বান্দা হয়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোনও এসেছে, তাব নাম দৌলৎ উম্মিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা—কি ঘুম!—আমি চিম্টি কেটেও তার ঘুম ভাঙাতে পারি না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে?—তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বলবার আছে।

মেহের। বল না! আমি এখানে আছি বলে কিছু মনে করো না ইরা। তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা বলবে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুনবো, কাউকে বলবো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না। আমি পারি ত সে কথা-বাস্তায় যোগ দেব! নৈলে কেবল শূনে যাবো। তোমার নাম ইরা বসে না? খাসা নাম! আর চেহারাখানা নিখুঁত!—কৈ, কথাবাস্তা চলুক না।—চূপ করে' রৈলে যে?—আচ্ছা বেশ, তোমার কথাবাস্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উম্মিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুসী হবে।

[এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে!—তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে এলে?

ইরা। নিরাপদে আসবার জন্যই এ সম্মা-সিনীবেশ পরিচ্ছিন্ন!

শক্ত। প্রতাপসিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না, পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপসিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কচ্ছেন?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কচ্ছেন, কখনও সামন্তদের উত্তেজিত কচ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু'তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চোঁকি দিচ্ছেন। পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভৎসনা কচ্ছেন, কখন বা বলছেন 'ভয় নাই'! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যিই তোমার জন্মভূমির সর্বনাশের মূল হ'লে!"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা
অবনতমুখে ডাকিলেন

"পিতৃব্য!"

শক্ত। ইরা!

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি—বাবার ভাই,—তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সৎগে যোগ দিয়েছেন; যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নিষ্পাসিত করেছেন।

ইরা। শুনছি সেই ব্রহ্মহত্যা।—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল!—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালদ্বারপতি অনুগ্রহ করে

আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালদ্বারপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালদ্বারপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র ধরেছেন? যারা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বশ্বপরিষ্কার!

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নিষ্পাসন করেছেন, এ কথাই তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধই করে থাকে পিতৃব্য,—পৃথিবীতে ক্রমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ, উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দলছে, চষছে, সে প্রতিদানে অকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মর্দাড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নতুন পল্লব বিস্তার কচ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গজ্জর্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হ'য়ে আশীর্বাদে মত সৃষ্টি জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে।—পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই শ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা, পৃথিবীতে ক্রমা আছে; কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইচি!

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নিষ্পাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নিষ্পাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে শ্বন্দ্র সূচিত করে, যার জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নিষ্পাসিত করেছিলেন, কিন্তু তার পূর্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সন্মানে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দুরীভূত ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয়সিংহ যা করেছিলেন, তাঁর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয়

আবার সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে রাখতে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন,

“সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নাহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিছিনে!” [কিছক্ষণ নীরবে চিন্তা করতে লাগিলেন। পরে কহিলেন]—“ইরা। আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পারিছিনে! ভেবে দেখবো।”

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিস বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন করবার জন্য আপনি এই মোগলসৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপসিংহ রক্ষা করবার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হতে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি!

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপসিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন

“ইরা, তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বলছো। আমি ভেবে দেখবো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তার যথাসাধ্য প্রতিকার কর্ব, প্রতিশ্রুত হিচ্ছি।—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।”

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হতে বিরত হতে সর্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে’

নয়। তা এই বলে, যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক, আমারই ভুল। প্রতিশ্রুত হিচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

[ইরা চলিয়া গেলেন।

শক্ত। আমি বিম্বান্ বৃদ্ধমান্ বলে’ অহংকার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দোঁখ ভেবে।

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উম্মিসা সমাভিব্যাহারে মেহের উম্মিসা প্রবেশ করিলেন

মেহের। ইরা কোথায়?

শক্ত। চলে’ গেছে।

মেহের। চলে’ গেছে! বাঃ এ ভারি অন্যায়! মহাশয়। আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আন্তে গিচ্ছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন। এ কি রকম ভদ্রতা!

শক্ত। মাফ কর্বেন সাহজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী?

মেহের। হাঁ ইনিই আমার ভগিনী দৌলৎ উম্মিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল ত বোন। দৌলৎ। যাও—[বলিয়া ঘোমটা দ্বিগুণিত করিলেন।]

মেহের। খোল না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখবে সে তুলে নিয়ে টপ্ করে’ গালে ফেলে দেবে।—খোল না ভাই, খুলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্ যে তার একটু খয়ে গিয়েছে, তাহলে আমাকে বকিস্।—খোল না। [সবলে দৌলৎ-এর অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া

কহিলেন]--“এইবার ভাল করে’ দেখুন,—
দেখছেন! সুন্দরী কি না?”

শক্ত। সুন্দরী বটে। এত রূপ আমি
দেখিনি! কি বলে’ এ রূপকে বর্ণনা করি—
জানি না।

মেহের। আমি কিচ্ছ।—নিস্তত্ব নিশীথে
এম্রাজের প্রথম ঝংকারের মত, নিজ্জন বিপিনে
অক্ষুট গোলাপকলির মত, প্রথম বসন্তে প্রথম
মলয়হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর
স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মূখ চাপিয়া ধরিলেন

মেহের। মূখ চেপে ধরিস কি লা ছাড়
হাঁফ লাগে। [পরে শক্তকে কহিলেন] “কি
বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক
উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এক কথায় এমন বর্ণনা
কর্তে পারি, যে আজ পর্যন্ত হাফেজ থেকে
ফইজ পর্যন্ত কেউ সে রকম কর্তে পারেন নি।”

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে, বিধাতা এ
মূখখানা এর চেয়ে ভালো কর্তে গিয়ে যদি কোন
জায়গায় বদলাতেন ত খারাপই হোত, ভালো
হোত না!—ওকি লা! একদৃষ্টে ঠুর মূখপানে
হাঁ করে’ চেয়ে রইছিস্ যে! শেষ শক্তসিংহের
সঙ্গে প্রেমে পড়িল নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ
হচ্ছে। হাঁ করে’ চেয়ে থাকা চোখোচোখি
হলেই চোখ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্যন্ত
আরক্তিম হওয়া, তার উপর যার কথার জ্বালায়
বাঁচা যায় না, তার মূখে কেবল ঐ এক কথা
“যাঃ”—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে
যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু!
ঠুরা হোলেন রাজপুত্র, আমরা হোলাম মোগল!
—তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা
রাজপুত্র; তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ। যাঃ!

বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈশৎ তদাভিমূখে
হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন

“হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে
নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান

কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে
এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে
লেখে না। দেখবেন সাবধান! এমন কাজটি
কর্ষেন না।”

[এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাম্বয়;—এক জন
অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ
মনীষণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ
উন্মিসা, দুদুদু দাঁড় করিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।
আর মেহের উন্মিসাও দেখবার জিনিস বটে।
এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী—
আশ্চর্য্য বালিকাম্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হল্দিঘাট; প্রতাপের শিবির।

কাল—মধ্যরাত্রি।

শিবির বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বন্ধবাহু যুগল
প্রতাপসিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন।

পরে শব্দস্বরে কহিলেন

মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা
কর্ষেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিচ্ছ!
আমি আক্রমণ কর্ব না। কমলমীরের পথ—
এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব। আক্রমণ কর্তাম,
কিন্তু, একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত
মোগল সৈন্য, আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র
অশ্বর্শিক্ষিত রাজপুত্র সৈন্য।—তার উপর
মোগল সৈন্যের কামান আছে, আমাদের কামান
নাই।—হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান
পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে
রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।”

এই বলিয়া ক্ষিপ্ত পাদচারণ করিতে লাগিলেন।
এমন সময় গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

“রাগার জয় হোক্।”

প্রতাপ। কে? গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাতে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

গোবিন্দ। মোগল সৈন্যাধিপতি মানসিংহ
তাঁর মতলব বদলেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্তসিংহ কমলমীরের সুগম

পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন! মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্তে আজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রতাপ। শক্তসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যাচালনা সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত্র-সৈন্য আক্রমণ করবার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তাঁর প্রতিরোধ করেন। পরে শক্তসিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—“গোবিন্দসিংহ! আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যুষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা করব না। আমরা আক্রমণ করব। যাও।”

[গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন।]

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন—“শক্তসিংহ! হাঁ শক্তসিংহই বটে। জ্যোতিষীগণনা মনে আছে, যে, শক্তসিংহ মেবারের সর্বনাশের মূল হবে। আর বৃদ্ধি আশা নাই! সেই গণনাই ফলবে—হোক! তাই হোক! চিতোর উদ্ধার কর্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্যে পার্বে।”

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর। এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত! এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষু ঘুম আসছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরই ঘুম আসছে না! মন হতে চিন্তা দূর কর দেখি।—যুদ্ধ—সে ত ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাট-লিপি। যা ভবিষ্য তা হবেই। জীবন মরণ! সেও ত ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যুষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্তে।

সেই চিন্তায় মস্তিস্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পারিছিনা!

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি! প্রভাতে নতুন জীবন, নতুন তেজ, নতুন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না! জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এস ঘুমাতে এস।

[উভয়ে শিবিরান্তরে গেলেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রমণীশিবির—বহির্দেহ। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্মিসা সেই নিস্তরু নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাইতোছিলেন

[ভীমপলশ্রী—মধ্যমান]

বাঁধ যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁর চরণে লুটায়।
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধ বাঁধ—তত ভেঙে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্মিসা সেন্সানে প্রবেশ করিলেন

দৌলৎ। মেহের এত রাত্রে তুই জেগে!

মেহের। আর তুই বৃদ্ধি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না!

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দেলাৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি করি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও; উভয়েই জেগে,—তুইও আমিও। কারণ এক—ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না!

তারও একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ?

মেহের। বল্ছি না যে তা প্রকাশ কর্তে নেই?

দৌলৎ। বল না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়-বান্দা! পরখ করে' দেখ্ছিহ্‌স্ টের পেইছি কি না? টের পেইছি রে. টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমোচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধর্দান শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখ্ছিহ্‌স্?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শূন্তে চাইনে!

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শূন্তে চাইনে?

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বলবোই।

দৌলৎ। আমি শূন্‌বো না।

মেহের। তোর শূন্তেই হবে।

দৌলৎ মূখ ফিরাইয়া রহিল, মেহের তাহার মূখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল

মেহের। তবে শূন্‌বি নে। তবে শূন্‌হি নে।—আঃ [হাই তুলিয়া] ঘুম পাচ্ছে। স্বুমায়েগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্! বলে' যা।

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি যে শূন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্! আমি পরখ কর্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরখ কর্ছিলাম।

দৌলৎ। কি?

মেহের। যে যা, অনুমান কর্ছি তা ঠিক কি না!—তা দেখ্লাম ঠিক। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাস্তিতে ঘুম না হওয়া,

লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনার চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ দেখেনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস্ কেন?—আমি ত তোর শঙ্ক-সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলত মেহেরের মূখ চাপিয়া ধরিল, মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কর্হিলেন

“বল্, ঠিক রোগ ধরিছি কি না?—মূখ নীচু করে' রইলি যে!”

দৌলৎ। যাও!

মেহের। বেশ যাচ্ছি! [বালিয়া গমনোদ্যত হইলেন।]

দৌলৎ। যাচ্ছিহ্‌স্ কোথায় ভাই!—শোন্। মেহের ফিরাইয়া কর্হিলেন—“কি!—যা বল্‌বি বল্ না। চূপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।”

দৌলৎ। হাঁ বোন্! এ কি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের?—মূখটি ফুটে বল্‌তে পারিস্‌নে? আচ্ছা সেটা না হয় উহাই থাকুক! দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন্!

মেহের। কেমন করে' জান্‌লি যে তিনি স্বীকার নন্?

দৌলৎ। তিনি গম্বী রাজপুত রাগা উদয়সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গম্বী মোগল-সম্রাট হুমা-য়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিহ্‌স্ কৈ?

দৌলত। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। ‘একবার চেষ্টা করে' দেখ্লে হয়’—এই কথা ত! আচ্ছা ধর, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভাল হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুক্‌গে ছাই। আচ্ছা দেখ্, ঘটকালি-বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ-টোধ আমার কিছ্‌ হয় না! আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয় সে কাজ পুরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য

কথা বলতে কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কৌতূহল গোড়াগড়াই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্তিসিংহের প্রথম দেখা আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কর্তে আমার কি রকম বেথাপ্পা ঠেকছে। কাঠামটা খাড়া করেছি, এখন মাটি দিয়ে গড়ে' না তুলে এতখানি পরিশ্রম ব্যথা যায়। আমি বলিছি মেহের যা করে, অর্কেক করে' ফেলে রাখে না, শেষ করে' তবে ছাড়ে' এখন চল্ দেখ একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্ ভাই তোকে আর কি বলবো।

মেহের। কিছু বলতে হবে না। যা আমি যাচ্ছি!

[দৌলৎ উল্লসিতা চলিয়া গেলেন।

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উল্লসিতা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘৃণাক্ষরেও জানতে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উল্লসিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্তে পারি। তাহলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাই না। কেবল এই বর চাই, যে, এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শূভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হল্দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।

প্রতাপসিংহ ও সমবেত রাজপুত্র সন্দারগণ

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে! বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মূর্খিময়। হোক্ রাজপুত্র-সৈন্য অল্প: তাদের বাহুতে শক্তি আছে। বলতে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতৃপুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালদুস্ত্রাপতি,

ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্রের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদের দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম, আমাদের দিকে রাজপুত্রগণের কুলদেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক্, পরাজয় হোক্, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব, যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাকবে; এমন যুদ্ধ কর্ব, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবে; এমন যুদ্ধ কর্ব, যা মোগল সিংহাসনখানি বিকম্পিত করবে।—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্ আকবর—যাঁর পুত্র আজ সমরাঙ্গনে, যার সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়।

প্রতাপ। রাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে তোমরা বেদনোরপতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীর পুত্রের বংশে তোমার জন্ম—ষোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধ করেছিল। দেখো যেন তাঁদের অপমান না হয়। সালদুস্ত্রাপতি গোবিন্দসিং। চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।—[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।]

“জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়” বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূবে শিঙা বাজিল, দামামা বাজিল

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত।

সোলিম ও মহাবৎ

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপসিংহকে চিলতে পাচ্ছেন?

সোলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখছেন লোহিত ধ্বজা, তার নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ

—প্রভাত সূর্য্যকিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ
কচ্ছে; পার্শ্ব শাগিত ভল্ল!—ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপসিংহের ঠিক
দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে?

মহাবৎ। সালদুস্ত্রাপতি গোবিন্দসিংহ।

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মূখে! কি
দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায়! ওরা আমাদের আক্রমণ
কর্ত্তে আসছে। ধিক্ মোগল সৈন্যদের! তারা
এখনও প্রস্তুতখণ্ডের মত নিশ্চল। আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম
আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা। — আমি বিপক্ষকে
আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা
অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা! মানসিংহের
আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পশুসহস্র
পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ
দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ তুমি আমার অবাধ্য!
যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।

[বালিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেলিম। মানসিংহের স্পর্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষ-
দিগের মধ্যে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন
সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা, আমার সে
ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মানতে চায়
না—গর্বিত মানসিংহ! তোমার শির বড় উচ্ছে
উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক। তোমার এই
স্পর্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।

[বালিয়া প্রস্থান করিলেন।

দৃশ্যান্তর (২)

স্থান—হল্দিঘাট সমরাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ন
অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সন্দারগণ

প্রতাপ। কৈ? মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু
উকীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উকীষ দেখে সকলেই আপনাকে
রাণা বলে জাম্তে পাচ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেরে
আপনার দিকেই ধেয়ে আসছে।

প্রতাপ। আসুক। প্রতাপসিংহ লুক্কায়িত
হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক,
মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক—যে আমি
প্রতাপসিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক
আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চূপ কর মানা। ঐ সেলিম না?
রোহিদাস। হাঁ রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তুমি প্রতাপসিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপসিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ
কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয়া
যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে
আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও
সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন

“কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?”

এই বালিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন

“হাঁ প্রতাপ!”

এই বালিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ
করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া
পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ
ক্ষত বিক্ষত হইলেন এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা
করিতে গিয়া অস্ট্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই! আপনি
যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আসছে,
আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি
মর্ত্তে জানি না? আসুক শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপ-
সিংহ সহসা স্থলিতপদে এক মৃত দেহের উপর
পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপসিংহের মূণ্ড-

ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময় সসৈন্যে গোবিন্দ-
সিংহ প্রবেশ করিলেন

মানা। গোবিন্দসিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

[গোবিন্দসিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন।
যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে
নিষ্কান্ত হইলেন।

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের
সৈন্য প্রায় নিম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ
প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—[উঠিয়া
কহিলেন] “দাও তরবারি।”

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরূপ
তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ—[পরে
প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া] “অশ্ব কৈ?”

[এই বলিয়া নিষ্কান্ত হইলেন।

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগল-
সেনানী-বন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু
সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই
ছিল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্তিসিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

একাকী শক্ত

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল — বিরূপ
যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গজ্জন!—উন্মত্ত
সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার! অশ্বের হেঁচা, হস্তীর
বৃহতি, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের
আন্তর্ধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য
মোগল সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র
রাজপুত্র, এক দিকে কামান, আর এক দিকে
শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক
প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে
তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই
বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে
আসছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তি ও
গর্বে লুপ্ত হতে ইচ্ছা হচ্ছে—প্রতাপ!
প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাক্ষের মুখে
তোমার বীরত্বকাহিনী শুনছি, আর গর্বে
আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে! সে প্রতাপ রাজপুত্র;
সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর
মেবাররাজ্য মোগল সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত,

বিধ্বস্ত দেখছি, আর ধিকারে আমার মাথা
নুয়ে পড়ছে। আমি এই মোগলবাহিনী এই
চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি!

এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ
কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্তসিংহ। এ
যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে,
তখন তুমি নিষ্কর্তব্যে কুশলে নিজের শিবিরে
বসে? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্যের জন্য
তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নাই। আমি
স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নাই।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ। এতদিন তবে
মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্তসিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত
নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্তসিংহ শিবিরে
বসে থাকত না।

মহাবৎ। আর আশ্ফালনে কাজ নাই! তুমি
বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে
পরীক্ষা কর্ব্ব বিধর্মী?

এই বলিয়া শক্তসিংহ তরবারি নিষ্কাশন করিলেন

মহাবৎ। প্রস্তুত আছি কাফের।

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাশন করিলেন
ঠিক এই সময়ে মেপথ্য হইতে শ্রুত হইল

প্রতাপসিংহের পশ্চাৎদিক কর! তার মৃত্যু
চাই।

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়?
প্রতাপসিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য
মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই
আসছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?—

[এই বলিয়া শক্তসিংহ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্তসিংহ
নিশ্চয়ই প্রতাপসিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে!
কি বিধিনির্বাণ! প্রতাপসিংহ আপন
দ্রাতৃপুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত!

আর প্রতাপসিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে
প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত
কর্তে'—

[এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম দৃশ্য

স্থান—হল্দিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা।
মৃত ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব
শেষ। আমার পনের হাজার সৈন্য ধরাশায়ী।
আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি
নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্বল, ভূপতিত।
আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার
চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ
দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও
বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে
এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত
নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে।
পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাকলে
“হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো!”
ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত
চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে
না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্যম। শত্রুরা হাসছে,
বলছে প্রতাপসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে হতে
পালিয়েছে। চৈতক! মর্ষার পূর্বে জীবনে
একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হ'লি! লজ্জায়
আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুচ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মূলতানপতি প্রবেশ
করিল

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মূলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—“মরিনি এখনও!
যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বার
কর।”

মূলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপসিংহ খোরাসানের ও মূলতানের সঙ্গে
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে
শ্রুত হইল “হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো”

প্রতাপ। আরো আসছে। আর আশা
নাই।

মূলতান। অসম্মত কর। তলওয়ার
দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্ছিত হইয়া
পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্তসিংহ
প্রবেশ করিলেন

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মূলতান। মারো একে।

তবে মর।

এই বলিয়া শক্তসিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও
মূলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে
ভূপতিত করিলেন

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপসিংহ
এক রকম নিরাপদ—দাদা! দাদা!—অসাড়!—
ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।

এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের
মস্তকে সিঞ্জন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন

“দাদা! দাদা! দাদা!”

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই!—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে
বন্দী! আমার শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায়
বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত। আমাকে মেরে
ফেলে তারপরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে
তোমার মনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ
জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার
বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্তে কর্তে
প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমার
অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্রে
হতে পালিয়ে এসেছে! তা'কে কোনরূপেই
ফেরাতে পার্লাম না। যদি সময়ে মর্ষার গৌরব
হতে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী করে' সে
লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর।
শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার
করণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি
বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি
দাঁড়িয়ে আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'।
আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে
বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি
কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি,
বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ

শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—
বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি
হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—
“তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দাও
দাদা।”

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই
মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ
রক্ষা করেছে?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক,
রাজপুত্রকুলের গৌরব প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে
মর্্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এতদিন
তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার
চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা করবার জন্য
সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে? কিন্তু আজ
এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র;
তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ
নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্বনাশ করেছি! কিন্তু
যখন তোমাকে রক্ষা কর্তে পেয়েছি, তখন
এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুত্রকুল-
প্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে
ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

দ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।

সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্তসিংহ
দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার
চান্দেবীপতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া
চিত্রাৰ্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্তসিংহ! সত্য বল! প্রতাপ-
সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী? — সেলিম! — তোমার
বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে। প্রতাপ-
সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে হতে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন
নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের
দন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তার ঘোটক
চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন
সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন
সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে
কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে
পুনর্বার কাসিলেন

অম্বর। শক্তসিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ
পরিহাস করবার জন্য ডাকা হয় নি। এ
বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবে-
ছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম
বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-
সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবাব হাস্য-সংবরণ করিতে
পারিলেন না

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্তে হয় তুমি কর;
সোজা উত্তর দেবো। এই সব পরভূক্ত রাজ-
পারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল-
সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে
বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেবী। তা আমি পূর্বেই অনুমান
করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি
প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করিলেন

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছে?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্ছিত ভাই প্রতাপকে
অন্যায় হত্যা হতে রক্ষা করবার জন্য।

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছে?
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্বার কাসিলেন

শক্ত। জয়পূরাধিপতি! আমি বিশ্বাস-
ঘাতক হতে পারি, কৃতঘ্ন হতে পারি, কিন্তু
ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধপ্রান্ত

ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্ছ!

শক্ত। হাঁ কচ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্ছ যুবরাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব না? আমি এর পূর্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কর্লাম। আমাকে কি সম্মাট বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্ন দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষা কর্তে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হয়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা

মাড়বারপতি নিষ্বিকারভাবে চান্দ্রেরীপতির সহিত গদ্বস্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন

অম্বর। যে প্রতাপসিংহ পার্বত্য-দস্যু রাজবিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপসিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বলতে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবর সাহ চিতোরের ন্যায় অধিকারী। কিম্বা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন

সেলিম। তুমি তবে সম্মাটকে কি বলতে চাও?

শক্ত। আমি বলতে চাই যে, সম্মাট ভারতের সর্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নিষ্বিক বিস্ময়ে মূখব্যাদন করিলেন

সেলিম। হুঁ—প্রহরী! শক্তসিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল

সেলিম। শক্তসিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই! আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তাহলে মিথ্যা বলতাম, সত্য বলতাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম, স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে ফিরে আসতাম না। যখন সত্য কথা বলতে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে' মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো!—মোগলের সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কটু, বিবেকহীন, কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নিষ্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুকুর।—চোখ রাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্বে এই পদাঘাত! [পদাঘাত করিলেন]—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—

[এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। একবার এক মূহুর্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মূহুর্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন
প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল

শ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলং উম্মিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।
মেহের ও দৌলং সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতোছিলেন

[বারোয়া—ভরতঙ্গা]

প্রেম যে মাথা বিধে, জানিতাম কি তায়
তা হলে কি পান করি' মরি ষাতনার!
প্রেমের সূখ যে সখি পলকে ফুরার;
প্রেমের ষাতনা হুদে চিরকাল রয়।

প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
 প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।
 দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
 “বল না কি হয়েছে?”
 মেহের। গুরুতর!—‘প্রেমের সুখ যে
 সখি’।—
 দৌলৎ। কি গুরুতর?
 মেহের। বিশেষ গুরুতর।—“পলকে
 ফুরায়!”
 দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?
 মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর।
 “প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়!”
 দৌলৎ। যাঃ আমি শুনতে চাইনে!
 মেহের। আরে শোন না!—
 দৌলৎ। না, আমি শুনতে চাইনে।
 মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্তিসিং
 কি কর্বে বল?
 দৌলৎ উম্মিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন
 মেহের। কি কর্বে বল। ভাইকে রক্ষা
 কর্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।
 দৌলৎ। মেহের!—
 মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই
 করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার
 আর অপরাধ কি!
 দৌলৎ। মেহের কি বল্ছিস্?
 মেহের। কি আর বলবো! লড়াই ফতে
 করে’ এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব’ড়ের
 কিস্তি দিয়ে মাৎ করে’ দিলেন।
 দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্তিসিংহের
 প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে?
 মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ
 রকমই দাঁড়ায় বটে।
 দৌলৎ। না, তামাসা।
 মেহের। ভালো! ভালো! কিন্তু শক্ত
 সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তামাসার মত
 ঠেক্ছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।
 দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন
 কি হিসাবে?
 মেহের। খরচের হিসাবে! সেলিম বেশ
 বিবেচনা করে’ দেখলেন যে, বিধাতা যখন শক্ত
 সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল
 করেছিলেন।

দৌলৎ। সে কি রকম?
 মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব
 যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্-
 লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক
 বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে
 দিয়ে বিধির ভুলটা শোধরাবার ইচ্ছা প্রকাশ
 করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত
 সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্পে না—
 দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ?
 মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক
 বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময়
 ঈশ্বরের কাজ থেকে পাওয়া গিয়েছিল! অন্যের
 সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ’তে পারে না। আর
 একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চির-
 বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখতে কি
 রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি আমার মাথাটা
 পায়ের তলায় পড়ে’। দেখেই চক্ষুস্থির আর কি!
 —কি! তুই যে চা-খাড়ির মত শাদা হয়ে গেলি!
 দৌলৎ। মেহের! বোন! তুই তাঁকে রক্ষা
 কর। জানিস্ বোন! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়,
 তা হ’লে এক দিনও বাঁচবো না। আমি শপথ
 করি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ’লে আমি বিষ খেয়ে
 প্রাণত্যাগ করব।
 মেহের। প্রাণত্যাগ করব ত করব! তার
 আর অত জাঁক কেন। ঈঃ! তোর আগে অনেক
 লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে,
 অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়।
 আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন
 একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যাতে
 সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ করবার
 আগে! আত্মহত্যা ত করবই! সে ত অনেকেই
 করে’ থাকে।
 দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই?
 মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল
 ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত
 তুই করবই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর
 উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলৎ!
 যদি আত্মহত্যা করিসই, তাহলে এমন ভাবে
 করিস্, যাতে একটা নাম থেকে যায়।
 দৌলৎ। সে কি রকম?
 মেহের। এই, তুই তোর নিজের কাপেট-
 মোড়া কামরায় মখমলমোড়া গাঁদিতে হেলান

দিয়ে বস্। সামনে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়লা—সেটা বেনারসি কাজ করা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস্? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শূদ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিশ্বাধরে ঠেকা, একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু কর্তে হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্তিসিংহকে উদ্দেশ করে একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' যা সেই ভাবেই, টং বদলাস্ নে'। তা হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখবার, একটা বিষয় হবে!

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা কর্বার এর চেয়ে সর্বাধিক কখনও হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বস্ফরস হুদে নৌকাবক্ষে নয়, দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বলতে হবে! তাও নিভুতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সিম্মিলন, আর অর্মানি প্রেম; একেবারে না দেখলে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তার বিহনে আত্মহত্যা কর্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব!

দৌলৎ। মেহের। সত্যিই কি এর উপায় নাই। তুই কি কিছুই কর্তে পারিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উঁহু!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্তে হবে বল। মানুষে যা কর্তে পারে আমি তা কর্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শূদ্রে পড় যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম! হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক

বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্তিসিংহই জানে। ডাক্ শক্তিসিংহকে। শক্তিসিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যপদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলি যে!—না না কাঁদিসনে। থাম্! দৌলৎ। বোন, মূর্খ তোল্!—ছিঃ কাঁদিসনে। ভয় কি। আমি শক্তকে বাঁচাবো। তা যদি না পার্তাম, তাহলে কি তার প্রাণদণ্ড নিয়ে রংগ কর্তে পার্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন, 'দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভুতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শূদ্র বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মূর্খ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদগদস্বরে কহিলেন

দৌলৎ উন্মিসা! জানিস্ না বোন আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি। হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মূগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্ষ্যে, বীর্যে ও মহত্ত্বে মূগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব; নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মূগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্মিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান।—বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলঙ্কিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

“মেহের উন্মিসা।”

মেহের। কে? সেলিম।

সেলিম। মেহের উম্মিসা একা। দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আসছে।—
সেলিম। তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল,—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম। তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কব্বার বয়স তোমার হয় নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি। আমি বিচার করে' তার প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার। বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদশাহের পুত্র। আমার বিচার কব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদশাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্তসিংহকে মৃত্ত করে দাও।

সেলিম। তোমার কথায়?

সেলিম উচ্চহাস্য করিলেন

মেহের। হাঁ। আমার কথায়। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যাই কর, এই দণ্ডে শক্তসিংহকে মৃত্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। নহিলে—

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মৃত্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমার বাধা দেয়। তারা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উম্মিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আত্মপক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্তসিংহকে মৃত্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্তসিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না— বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষে হয়ে—

মেহের। সেলিম। এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোক-মুণ্ডিত। শক্তসিংহ যদি তার ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধহয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘণা কর্ত্তাম।—সেলিম। সংসারে প্রভু ভূত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভূত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ দ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছদ্মবেশী দ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম। চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্জারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উম্মিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছে। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্তসিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়-ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা।

সেলিম। মিথ্যা কথা?—তুমি নিভূতে তার শিবিরে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয়?

মেহের। শক্তসিংহকে মৃত্ত করে' দিবে কি না?

সেলিম। না। তোমার যা ইচ্ছা তা কর—

[এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন, সেলিম

চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন পরে একটু হাসিলেন; পরে কহিলেন

“সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কর্তে হবে? ভেবেছো পার্শ্বের না দেখ পারি কি না?”

[বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—শেষ রাত্রি।

শঙ্খলাবন্ধ শক্তিসিংহ উপবিষ্ট

শক্ত। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে সঙে সঙে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আসছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই পেশল সুগোর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটারবে। সবাই দেখতে পাবে! আমিই দেখতে পাব না। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম। আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছুর ঠিক কর্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছুর বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে, এর মীমাংসা পাই নি। কে আমি! চাঞ্চল বৎসর পূর্বে কোথায় ছিলাম! কাল' কোথায় থাকবো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। আমি মেহের উল্লিসা।

শক্ত। মেহের উল্লিসা সম্রাট্ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উল্লিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্তে?—কেন!—আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সান্ধর্ষ্য বলিলেন

“সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?”

শক্ত। কিছুর না। পুরানো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য উঠে, রাত্রি-কালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইং

পুরানো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছুর নতুন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এতদিন দেখা গেল। নেহাইং অসার। দেখা যাক মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্তি দেখছি। অথচ তার বিষয়ে কিছুর জানি না। আজ জানবো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাসতে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালোবাসে নাই। কাহার কিছুর ধারিনে। সব শোধ দিইছি। [স্বগত] তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন

“হাঁ, চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হলে আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।”

মেহের ডাকিলেন

“প্রহরী!”

প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন

“শঙ্খল খোল।”

প্রহরী শঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন

“এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না—যাও।”

[প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন

পরে কহিলেন

“একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?”

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?—

শক্ত। কোতুহল মাত্র।

মেহের মনে মনে বলিল—“বলিই না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক না।”

পরে শক্তকে কহিলেন—“তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উল্লিসাকে মনে পড়ে?”

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিনী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার। আর যদি ভুল বুদ্ধি না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।—অপলাপ কচ্ছেন কেন?

শক্ত। আমার মনুষ্যত্বে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে;—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উল্লিসাকে বিবাহ কর্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ!—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্বপুরুষ বাম্পারাও করেন নি?

শক্ত। সে আসুরিক-বিবাহ।

মেহের। হোক আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত-সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালো-বাসা। যে বন্ধনকে ভালোবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উষ্ণতা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তাঁরা পুরো-হিতের মন্তোচ্চারণের অপেক্ষা করে?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদ! যে সমাজ মানে না তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি?

মেহের। তবে আপনি স্বীকার?

শক্ত ভাবিলেন

“মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে’ দেখা হয় নাই।—দেখা যাক?”

মেহের। কি বলেন? স্বীকার?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম সাক্ষী?

শক্ত। ধর্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন “ধর্ম সাক্ষী।”

শক্ত। ধর্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্তসিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে’ তোমার গলায় পরিবে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—

যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন

“এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চলছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁষে গেল।”

মেহের। তবে চলে’ আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথবীর অন্তর্বাটি। কাল—রাত্রি।
যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মান

যোশী। যাক নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজ-পুতনায় একটা প্রদীপ জ্বলছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপসিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত; বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন

পৃথবী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথবী। রাজসভার শেষ খবর শুনছেন?

যোশী। না, তুমি না বললে শুনবো কোথা থেকে।

পৃথবী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে?

পৃথবী। হয়েছে বলে’ হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার!—চূপ করে’ রৈলে যে।

যোশী। আমি কি বলবো?

পৃথবী। তবে শোন!—শক্তসিংহ কাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে!

পৃথবী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ

উম্মিসাও—[এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।]

যোশী। সে কি?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে। সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাটকে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট গুর্জর হ'তে কাল ফিরে আসছেন।

যোশী। কেন?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার “কেন”?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বলবেন—‘আহা মানসিংহ আশ্রিত’; আর মানসিংহকে বলবেন ‘আহা সেলিম ছেলে-মানুষ’।

যোশী। রাণা প্রতাপসিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুচ্ছেন! বলেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত।
আকবর অর্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতে-
ছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্তে পার্ত? আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র; হল্দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বার।

আকবর চিন্তিতভাবে কহিলেন

হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ

দেখবেন কেন! মানসিংহ যে আপনার শ্যালক-পুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔষ্ণ্যত্যা সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তাঁর অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখতে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্তে হয়, জয় ক'রে শাসন কর্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ অর্ধ্যাবস্ত—শুদ্ধ অর্ধ্যাবস্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট ঋণী হতে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔষ্ণ্যত্যা পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবো না সেলিম, যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তাঁর দ্বারা কার্য উদ্ধার হলে' আমি তাঁকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব। কিন্তু যতদিন কার্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভু স্বীকার কর্ব না। যদি সম্রাট এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি আজ্ঞার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিকার নেবো। আমি দেখবো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—

এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট আমি! তুমি নও।—কি

সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফূর্তি দেখছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও।

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জানবেন—

এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।
আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন; পরে কহিলেন

“হা মৃত পিতা সব! এই সম্ভানের জন্য এত করে’ মর! ইচ্ছা কর্তে যাকে মৃত্যুর মধ্যে চূর্ণ কর্তে পারো, তার দর্শনীয় ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদর্শনই করেছিলে? এও নীরব হয়ে সহ্য কর্তে হোল!—কে? মেহের উম্মিসা!

মেহের উম্মিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন
“হাঁ পিতা আমি।”

এই বলিয়া তিনি সম্রাটকে ষথারীতি অভিবাদন করিলেন

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনোছি।

মেহের। সেলিম দেখছি এসে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাটপদে নিবেদন কর্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্তিসিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মৃত কর্তে দিয়েছি।

আকবর। আর দৌলৎ উম্মিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্তিসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন

উত্তম!—শক্তিসিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নতুন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের!—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝবে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি ধর্মনীতি বুঝি!

আকবর। ধর্মনীতি মেহের উম্মিসা? ধর্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে তুমি তাকে এ বয়সে আয়ত্ত করে’ ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম কেন? একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সূধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুনলাম, এত ব্যাখ্যা শুনলাম; পার্শী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করলাম; কে? কিছুই ত বুঝতে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মূঠোর মধ্যে ধরে’ রেখেছো!

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্ন শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে’ তারা ভিন্ন নয়। শক্তিসিংহও মানুষ, দৌলৎ উম্মিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্তিসিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উম্মিসা ভারতসম্রাট্, আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্তিসিংহ গৃহহীন, প্রত্যাড়িত পথের কুকুর।

মেহের। শক্তিসিংহ মেবারের রাণা উদয়-সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্তিসিংহ যদি মুসলমান-

ধর্মাবলম্বী হ'ত, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্মী।

মেহের। শুরু হউন সন্ন্যাসী। জানেন, আমার মাতা—সন্ন্যাসী এই হিন্দু মনে থাকে যেন।

আকবর। সন্ন্যাসী হিন্দু! কিন্তু সন্ন্যাসী হিন্দু নয় মেহের! সে সন্ন্যাসী আমার কে?

মেহের। সে সন্ন্যাসী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যি কি ভারতসন্ন্যাসী রাজা-ধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুনলাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সন্ন্যাসী জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে? স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্মিনী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বলতে পারে যে স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু! সে তা বলে না, কারণ তার হৃদয় মহৎ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর স্মৃতিই তার স্মৃতি, স্বামীর কাজেই তার আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্বল জীবনকে আরও দুর্বল কর!

আকবর। মেহের উল্লিসা! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ভত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আত্মপক্ষা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না! তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না করে আমার আঞ্জা পালন করা। মনে থাকে যেন।—

আকবর এই বলিয়া বিরক্তভরে কক্ষ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। মেহের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কহিলেন

“সন্ন্যাসী আমার কর্তব্য কি তা আমি জানি। আমার কর্তব্য এই যে, যে পিতা আমার

মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদীর মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য! এস তবে উন্মত্ত আকাশ, এস শীতের প্রথর বায়ু, এস জনশূন্য নির্বিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজি আমি আর সন্ন্যাসী-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ।”

[নিষ্কান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা।
মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বোধ হয় তাঁর বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে সে বিবাহ মোগল পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি? ভেবেছিলাম যে মেবারের পবিত্র বংশগরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো। কিন্তু সে আশা নিস্কূল হয়েছে। প্রতাপসিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব। আমরা বংশগরিমা হারিয়েছি! তুমি সর্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখবো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্তে পারি কি না? তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন অন্য ছাউনি রাখবো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ সান্ধে কহিলেন

“যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!”

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—
মামদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল
সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া
মানসিংহকে কাহিলেন

“এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে
লও।”

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত
হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর
সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব!।

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব!। তুমি সম্রাটের
শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে
তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের
অজেয় সেনাপতি। সম্রাট তোমার দম্ভ সহিতে
পারেন, আমি সহিব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি
আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি
যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব না—
যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়বো না!
মানসিংহ অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে
যাবে যে কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন যুবরাজ সেলিম!
শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
কোন কথা শুনবো না। নেও অস্ত্র—

এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান
করিলেন

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কাহিলেন
“যুবরাজ, আপনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?”

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহারাজ মান-
সিংহ—

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করি-
লেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষা করিতে
লাগিলেন

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন।

“রক্ষা নাই।”

এই বলিয়া সেলিম পুনর্বার আক্রমণ করিলেন
মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য হারাইলেন;
গঞ্জর্জন করিয়া উঠিলেন

“তবে তাই হোক! যুবরাজ আপনাকে
রক্ষা করুন।”

এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করি-
লেন, ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন! নাহিলে
মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে
লোটাবে।

“স্পর্ধা—”

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্বার
আক্রমণ করিলেন

এই সময় আলদুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা
সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত
হইয়া হস্তাস্তোলন করিয়া কাহিলেন

“অস্ত্র রাখুন। এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন
নয়।”

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্রিষ্টদৃষ্টি হইয়া
মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন; তাহার
দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্থলিত হইয়া ভূতলে
পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি
অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্ধ উচ্চারিত স্বরে
কাহিলেন

“কে ইনি? দেবী না মানবী?”

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্বতগুহার বহির্ভাগ।
কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপসিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি! ধুম্মেটী
আর গোগুন্ডা দুর্গ শত্রুহস্তগত। উদিপুর
মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ
দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার
ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি! কিন্তু মানা আর
রোহিদাস। তোমাদের যে এই হল্দিঘাট যুদ্ধে
হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত
হইলেন

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ
কোন জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জুগল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা! পাহাড়টি কি
ধুল্ল, কি স্তব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। ছেলোপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার
এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ করবে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী, খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন।
পরে কহিলেন

“আমি ছেলোপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে।”

[এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন : পরে কহিলেন

“এই ত রাজপুত্রের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূল ভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুত্রের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুখার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।

এই সময়ে ভীলসর্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন

প্রতাপ। কে? মাহু?

মাহু। হাঁ রাণা! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুখানি দেখতে এলাম!

প্রতাপ। মাহু! ভক্ত ভীল-সর্দার!

ইরা। মাহু! ভাল আছ?

মাহু। এই যে বহিন্ হামার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য মাহু!
—এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই এই সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে!

মাহু। মরে' যাবে বহিন্ মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কর্তে বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি কর্তে মাহু! বিঠর জুগলে খাবার উদ্যোগ করিছি, এমন সময় পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য ঘেরাও কর্তে। আমি দশ অনুর সঙ্গ করে, পার্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি। এদের ডুলি করে এনেছি!

মাহু হতাশব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল

মাহু। এক খবর আছে রাণা!

প্রতাপ। কি?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তাঁর এক হাজার সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ—কোথায় সে?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। তাঁর ধুম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশ'-এর বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তাঁরা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তার শিবির আক্রমণ কর্তে।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

মাহু। যে আজ্ঞা, তাঁরা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন্ শরীরের যতন করিস্। নৈলে বাঁচবি না! মরে যাবি।

[এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল।

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। [অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন]—
“বাবা!”

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধবিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুর্দিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! • যদি আমরা শূন্য পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্তাম, তা' হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্তে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে

নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে
পিঁছিয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশী মেহের উল্লিসাকে লইয়া
অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। কে? অমরসিংহ?—এ কে?

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর।
কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মেহের একদৃষ্টে প্রতাপসিংহকে দেখিতেছিলেন

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই
কুটীর আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপ-
নার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে?
সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বলবো না। কিন্তু সত্য
বলতে ভয় হয়; পাছে আপনি শূনে আমাকে
পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুত্রকুলের প্রদীপ।
আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার
বিষয় অনেক শুনোঁছি। অনেক কথা বিশ্বাস
করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখছি, তা
অদ্ভুত, কম্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা,
আমি মানসিংহের চর নাই—

বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে,
মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী! এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু
এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা
করি।

প্রতাপ। বালিকা তুমি কে তা এখনও বল
নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জানবার প্রয়ো-
জন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম-শত্রু।
—প্রতিজ্ঞা করুন যে পিতার নাম শূন্যে
আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। আমি
আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম
শত্রু—আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নিৰ্ব্বাক হইয়া
রাহিলেন। পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন
করিয়া প্রশ্ন করিলেন

“সত্য কথা! না প্রতারণা!

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা!

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার
শিবিরে কি জন্ম!—অসম্ভব!

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি
পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্ম?

মেহের। বিস্তারিত বলছি এখনই—

ইরা। মেহের না? হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, একে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার
কন্যা মেহের উল্লিসা!

প্রতাপ। এর সঙ্গে তোমার কোথায়
সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন
“মেহের উল্লিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা।
কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও
সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—
আমি নিজেই নিরাশ্রয়; তবুও তোমাকে পরি-
ত্যাগ করব না! এস মা, গৃহহার ভিতরে লক্ষ্মীর
কাছে চল!”

[অতঃপর সকলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গ। কাল—স্বিপ্রহর দিবা।
শক্তসিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চূপ করে’
এই দুর্গে বসে’ আছি বলে’ মনে কোরো না যে,
আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ছুঁলে
গিরেছি। আগ্রা হতে পথে আসতে কতিপয়

রাজপুত্র সৈন্য সংগ্রহ করে', এই ফিনশরার দূর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা করেই নিশ্চিত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি, আরো কত হত্যা কর্তে হবে, কে জানে! —অন্যায় কিচ্ছ? কিচ্ছ না। শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশ-বৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিচ্ছ অন্যায় কিচ্ছ না।

জৈনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল
শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ রাগা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জর্দালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—
দূর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও! মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলৎ উম্মিসা।

সসঙ্কাচে দৌলৎ উম্মিসা প্রবেশ করিলেন
শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“কি চাও দৌলৎ?”

দৌলৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন

“সুশীতল ছায়া।”

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিচ্ছ কি বক্তব্য আছে দৌলৎ?—নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ। নাথ—

এই বলিয়া দৌলৎ উম্মিসা পুনরায় স্তম্ভ হইলেন

শক্ত। হাঁ ‘নাথ’! তার পর? আচ্ছা দৌলৎ!—এই দুপদর রৌদ্রে ‘নাথ, প্রাণেশ্বর’ এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেথাপ্পা ঠেকে না? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা স্নিপ্রহরে ‘নাথ, প্রাণেশ্বর’ এই শব্দ-গুলো কি একটা উত্তম রন্ধনশালার পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকে না?

দৌলৎ। নাথ! পদরূষের পক্ষে কি, জানি না! কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পদরূষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু?

শক্ত। পদরূষ নারীর ত এই সম্বন্ধ। পদরূষিতের গোটা দুই অননুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর

আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উম্মিসার কণ্ঠমূল পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল,
তিনি কহিলেন

“প্রভু!”

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধর-সুধাপান ভিন্ন পদরূষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উম্মিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টিপথের বাহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

“এই ত নারী। নেহাৎ অসার।—নেহাৎ কদাকার। আমার লালসায় মাত্র তা’কে সুন্দর দেখি। শব্দ ‘নারী’ কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পদাঙ্গুলের জন্য নেয় যত সুন্দর, সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস; আর—[ওষ্ঠ-দ্বয় নিস্পীড়িত করিয়া কহিলেন] আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং মৃত্যুর পরে তা’কে দুদিন গৃহে রাখলে, মন্দার সৌভ হুড়াতে থাকেন।”

দূর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

“মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?”

শক্ত। হাঁ প্রত্যুষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল।—আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দূর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দূর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন

সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিস্পিষ্ট কর্ব—
[এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলায় আজন্মরীণ দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেখান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেঝের উপর বাম-কফোনি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে

একজন মহাখ্যাত্ত্বাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন

“এখানে কি বিক্রয় হয়?”

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল?

রেবা। অপরািজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি; কিন্তু
মালাটি ছোট। কত দাম?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।।

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালা-
গাছটি। সন্মাতের গলায় পরিয়ে দেবো—

[বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। ইনি ত সন্মাতী! কৈ সন্মাতকে
দেখলাম না ত।

এই সময় অন্যরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা
আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

“এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয়?”

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

২ আগন্তুক। দেখি—[বলিয়া দেখিতে
লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন] এ মালা গাছটি কি ফুলের?

রেবা। কদম্ব।

২ আগন্তুক। এই নেও দাম—

[বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। কি আশ্চর্য মেলা! এমন জিনিস
নাই যা এখানে নাই। কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের
স্ফটিকপাত্র, চীনের মৎপুস্তালি, তুর্কীর
কাপেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই?—এরূপ
মেলা দেখিনি!

মালা গলায় সন্মাত্ প্রবেশ করিলেন

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের
ভাগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর। [স্বগত কহিলেন] সেলিমের
উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বদ্বতে পাচ্ছি।
ভারতের ভাবী সন্মাতী হবার উপযুক্ত বটে।
[পরে রেবাকে কহিলেন] তোমার আর মালা-
গর্দল দেখি [বলিয়া দেখিতে লাগিলেন] এ
সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগর্দলই
ক্রয় করলাম—

বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন

রেবা। আপনি সন্মাত্ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো—

[এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দৃশ্যান্তর

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর।

কাল—রাতি। নৃত্যগীত

[খাম্বাজ—একতালা]

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী
এ মহানগরী সাজি'

একি, নিশীথ ভবনে ভবনে,
বাঁশরি উঠিছে বাজি'।

একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বাসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।

গায়—“জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়”

দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়,

আজ, তার গৌরব পরিকীর্তিত নগরে নগরে—

ভুবনে;

আজ, তার গৌরবে সমুচ্ছ্বাসিত গগনে তারকারাজি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল রাতি।

পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,

কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,

সমবীর্য ভূমন্ডলে মহীপতি

ভারত সন্মাত্ আকবর সাহা।

এই শেষটা খাপ্ খাচ্ছে না। আকবর কথাট
যদি তিন অক্ষরের হ'ত শব্দে হ'ত ঠিক?
কিন্তু—

এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আসছে!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখলে! কি বিপুল

আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলোঁছলাম

না! তা হবে না—আকবর সাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,

কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,

সমবীর্য ভূমন্ডলে মহীপতি

সন্মাত্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি
ক'ন্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়ছে

না? গণ্ড আরস্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হ'চ্ছে না? এই নীচ স্তূতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তূতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধুকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি তাই বলছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাকতো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাগনার অন্যতম হোত।

পৃথ্বী। কি বলছো যোশী!

যোশী। কি বলছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে করব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বপ্ন নাই, যে স্বপ্নে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষজাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়; ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি।—হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুনছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। সত্য কথা! কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যে করে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধুর নিকট শোনগে যাও,—আরও শুনবে। যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম হারিয়ে, সম্রাট-দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধু বলে পুনর্ব্বার গ্রহণ করলেন। আর্ষ্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে? ধিক্—

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। কি শুনছি! এ সত্য কথা!

কিছুই বন্ধে উঠতে পারি'নে। এখন কি করি? কি তার কর্ব? আকবর সাহা সর্বশক্তিমান। কি আর কর্ব! উপায় নাই!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা।

ইরা রুগ্নশয্যায। নিকটে মেহের উল্লিসা বসিয়া ছিলেন।

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদতে কাঁদতে বাহিরে গেল কেন?—আমি মর্ন্তে যাচ্ছি বলে'?

মেহের। বালাই! ও কথা বলতে নেই, ইরা!

ইরা। ও কথা বলতে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন কাঁদনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণসমুদ্রে জীবন চেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব! চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্তীর্ণ মস্তিস্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মূখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবে তোর সঙ্গে আলাপ কাঁদনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিলবো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিলবো!—কোথায়?

ইরা উদ্বেগে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন—“ঐখানে! এখন তা দেখতে পারি'না; কারণ জীবনের তীরালোক তাকে ঢেকে রেখেছে, যেমন সূর্য্যের তীর জ্যোতি কোটি

জ্যোতিষকে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি
নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব জ্যোতির রাজ্য
মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্যন্ত
উন্মাদিত হয়ে উঠবে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!”
মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে
লাগিলেন

“ঐ যে দেখ্‌ছিস্ মেহের, ঐ আকাশ—কি
নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর! ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য
অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণ-
বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ
রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা
নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস
দেখতে পাচ্ছিস্ মনে করিস্?”

মেহের তবে কি বোন?

ইরা। এ সব একটা পক্ষীর উপর আসল
সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম
সৌন্দর্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের
পিছনে, ঐ সূর্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

“ঘুম আসছে! ঘুমাই!”

এই সময় নিঃশব্দে পদসঞ্চারে
প্রতাপ প্রবেশ করিলেন

“ঘুমোচ্ছে?”

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে,
আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে থাকি—আপনি
সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন
নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে
পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা।

উঠিলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলোপিলেদের জন্য রুটি বানা-
চ্ছেন। ডেকে দেব?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে একবার আসতে
বলো।

[মেহের উম্মিসা প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন
একাধিকমে বন হতে বনান্তরে ফিচ্ছি—

মোগল-সৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা
আহার হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার
উপর এই রুদ্র কন্যা আর একহারী পুত্র
কন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—

এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্ব গিয়া বসিলেন।
তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্রকন্যার
রোদনধ্বনি শুনতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম।
কেবল বিশ্বস্ত ভীল-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে সে
অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীল-সম্প্রদায়
নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে!
এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে।
তাদের স্ত্রীরা অনাথ হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয়
হয়েছে, আমার জন্যে—আমাকে বাঁচাতে।
প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখতে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

“ইরা ঘুমোচ্ছে?”

প্রতাপ। হাঁ ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী! ছেলেরা
কাঁদছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে
রেখেছে এমন সময়ে বন্যবিড়াল এসে রুটি
কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায়?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি।
আমরা একদিন নিরাহারে থাকতে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন

“লক্ষ্মী”

লক্ষ্মী। প্রভু!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে’
অনেক সয়েছো আর সহিতে হবে না। এবার
আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে! কেন নাথ?

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সামনে
তোমাদের এ কষ্ট দেখতে পারি না। আর কত-
কাল এই শৃগালের মত বন হতে বনে প্রতাড়িত
হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই!
আমি সব সহ্য কর্তে পারি! কিন্তু তুমি!—

লক্ষ্মী। আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা
পালন করেই আমার আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য করারও একটা সীমা আছে।

আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্তে পারি!
কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা
করো না। নারীজাতি স্বামীর স্নেহে স্নেহ কর্তে
জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে
জানে। নারীজাতি কষ্ট সহিতে জানে। কষ্ট
সহিতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার
আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে
কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিধে আমার বক্ষে।
আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে
ভালবাসি; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে
রক্ষা কর্তে চাই; সন্তানকে বৃকের রক্ত দিয়ে
পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র-কন্যারা!—তাদের
দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য! তোমার তুলনা
নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দিনে, তুমিই
আমাকে উচ্চ তুলে রেখেছো! কিন্তু আমি যে
আর পারি না। আমি দুর্বল, তুমি আমাকে বল
দাও; আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর;
আমি অন্ধকার দেখছি, তুমি আমাকে আলো
দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বলছো মা?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি
সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুগ্ধ
আত্মা তাতে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম
সৌন্দর্যাময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কচ্ছে!
কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে
বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মর্ন্তময়ী, কামনা বর্ণময়ী,
ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন

“স্বপ্ন দেখছে!”

ইরা সচকিত জাগ্রত হইয়া কহিলেন

“যাঃ ভেঙে গেল!—একি মা, আমরা
কোথায়!”

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি;—মেহের কোথা?

লক্ষ্মী। ডাকবো?—ঐ যে আসছে!

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময়
ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা করে
দুটো কথা বলে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বলছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বৃদ্ধিতে
পাচ্ছেঁ না। কিন্তু আমি বৃদ্ধিতে পাচ্ছি—আমি
যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই; মনে
রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে
এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সহিবে
না—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা,
তা করেছে! সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর
নিরে সুখী হন হোন! কি হবে কাটাকাটি মারা-
মারি করে সব? ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর
চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে,
দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য
বাবা!—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন!—
বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে
গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত
দেখো। কি শৃঙ্খলে মেহের এখানে এসেছিল,
সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম?
মেহের! তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি,
তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই
রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এদের মধ্যে
শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন।
মেহের। মনে থাকবে ইরা!

ইরা। তবে যাই! বাবা—! মা! চরণধূলি
দেও।—

পিতামাতার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে
কহিলেন

“মেহের, যাই বোন! বড় স্নেহের মৃত্যু এই।
আমি বাপ মায়ের কোলে শূন্যে তাঁদের সঙ্গ
শেষ কথা করে মর্তে পাল্লিম!—তবে যাই!”

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা! মা চলে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের মন্দির-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।
আকবর পঠহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ
করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান
আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য
কার্য নাই! তোমার অজ্ঞের শত্রু নাই! তুমি

প্রতাপের মত দৃঢ় শব্দকেও বিচলিত করেছে।

—কৈ! পৃথ্বী এখনও এলেন না?

মহাবৎ প্রবেশ করিলেন।

মহাবৎ। দিগ্বীশ্বরের জয় হোক।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও প্রতি সৌধচুড়ায় শব্দ চীনাংশুক পতাকা উড়ুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিগ্বীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত্র ও মুসলমান উৎসব সন্মিত করুক; মন্দিরে, মস্জিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; আগ্রানগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বৃদ্ধেছো মহাবৎ। যাও শীঘ্র।

মহাবৎ। যো হুকুম জাঁহাপনা।

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে
আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন

“পৃথ্বী! ভারী সুখবর! এ বিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখিতে হবে।”

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ।

পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা করছে।—[পরে স্বগত কহিলেন]—“কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মৃত্যুর কাছে নকল মৃত্যু।”

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ জাল-পত্র।

আকবর চমকিয়া উঠিলেন

আকবর। কিসে বৃদ্ধে জাল?

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পশ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে ককশ কল্পনা কর্তে পারি; কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্তে পারি না।

আকবর। প্রতাপসিংহেরই হস্তাক্ষর। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়!

পৃথ্বী! কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আয়োজনা দিইয়াছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—

আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন

“কি বল পৃথ্বী!”

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নিষ্করণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বৃদ্ধেছ পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ।

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কল্পে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে পড়লো।

[এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি।

প্রতাপ ও লক্ষ্মী

প্রতাপ। মেহের উন্মিসা কোথায় লক্ষ্মী? লক্ষ্মী। রন্ধন করছে।

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে আমার ভাবি পুত্রবধু যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী। নাথ—

বলিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন

প্রতাপ। আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো। কেদো না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদবো

না। তুমি গুরু, আমি শিষ্য, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!

[বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া
রাণাকে কহিলেন

“রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; সৌধ-চুড়ায় বিরাজিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল। ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।”

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন

“সম্মানের কথাই বটে।”

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব প্রথম আসন নির্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুরুর শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কৈ? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসেছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ কমল-মীর।

শক্ত। পৃথিবী হাসবে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মড়াবার, চান্দেবী হাসবে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মানসিংহ হাসবে।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস সহ উত্তর করিলেন

“হাসুক! কি কৰ্ব্ব!”

শক্ত। দাদা! তোমার মূখে একথা শুনবো য তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কৰ্ব্ব ভাই।—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায়

না।' এতদিন মেবারের দুর্দর্শন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আসবে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন! শক্ত আবার কহিলেন

“জান দাদা, এখানে আসবার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় করে' এসেছি।”

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে' বলতে বলতে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপসিংহের ভাই শক্ত-সিংহ; যাচ্ছি প্রতাপসিংহের সাহায্যে।—কে আসবে এসো।'—তা শূনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তায় মূটে মোট ফেলে অস্ত্র ধল্লের, কুঞ্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুরুর এই সময়ে পৃথবীরাজ প্রবেশ করিলেন

পৃথবী। কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কৈ? পৃথবীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথবী। প্রতাপসিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো?

প্রতাপ। হাঁ পৃথবীরাজ।

পৃথবী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপসিংহও তোমাকে পরিত্যাগ করল।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে, প্রতাপের গৌরব কর্তে পার্ভাম। বলতে পার্ভাম যে এই সার্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথবী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালীর, মাড়োয়ার সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান করবে; আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজ-পুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জন করে' তোমাদের গৌরব কৰ্ব্বার আদর্শ যোগাবো?

পৃথবী। হাঁ প্রতাপ। অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নিষ্কর্মে

গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চেষ্টে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুদ্ধ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, নিরন্ধ, কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট করবে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত্র এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত করবে ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধরে একাকী যুদ্ধ করলাম,—একজনও এমন রাজপুত্র রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে! হা ধিক্!—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথবী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জ্বগলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নই আমি এখন তার কঙ্কালমাট্র।

পৃথবী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—
“কি?—ইরা নাই!!”

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোর তুষার-সম্পাতে ঝরে গিয়েছে।

পৃথবী। হা-ভগবান! মহত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সমদুঃখী। তুমি মহৎ, আমি নীচ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই।

পৃথবী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথবী?

পৃথবী। তবে শুনবে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী?—খুসরোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয়; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী

ফিরে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুঁরি বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্ত হয় নি? আকবর! তুমি ভারতবিজয়ী বীর-পুরুষ।

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথবী। প্রতাপসিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে থাকবেন?

প্রতাপ। কি ক'র্ষ?—আমার যে কিছুই নাই।—আমি একা কি ক'র্ষ। আমার সৈন্য নাই। পাঁচ জন সৈন্যও নাই।

শক্ত। আমি নতন সৈন্য সংগ্রহ করব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকতো, তা হলে আবার নতন সেনাদল গঠন কর্তে পারতাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নাই।

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দকও নাই।

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা! চিতোরের সূর্দিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ! কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধরে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভূভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে-অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে! তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে যখন
ভূত্যের নিকট গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমান-
কর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ
কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে
দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়াছে,
ধর্ম গিয়াছে, শেষে এক যা আছে—নারীর
সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!
—রাণা! আমি আমার পূর্বপুরুষের ও আমার
আজন্ম অর্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে
নহে: তোমার হস্তে দিচ্ছি—

এই বলিয়া জানু পাতিলেন
শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কাঁহলেন
“দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!”
প্রতাপ। তবে তাই হোক! এ-দান আমি
নেবো!

[প্রস্থান।

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! স্মৃতিসিংহ
জেগেছে!—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—
দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বজ্র নিসর্মাণের জন্য
নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগ:
কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা। আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ
করিগে যাই! এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র
সেনার বন্দকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ
তাঁহাকে বাধা দিয়া কাঁহলেন

“দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!”
সকলে। জয় মা কালী।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসংকট। কাল—প্রভাত।
পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ। দূরে পল্লীবাসিগণ
পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে,

গাও উচ্ছে রণজয়গাথা!

রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম

শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।

কে বল করবে প্রাণের মায়া,—

যখন বিপন্ন জননী-জায়া?

সাজ সাজ সকলে রণসাজে

শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!

চল সমরে দিব জীবন ঢালি—

জয় মা ভারত, জয় মা কালী!

সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে,
শত্রুবিদগ্ধ যখন পূরপল্লী?
মোগল-চরণ-চিহ্নিত বক্ষে

সাজে প্রেয়সীর ভূজবল্লী?

কোষ নিবন্ধ র'বে তরবারি,
যখন নিলাঞ্ছিত ভারত নারী?

সাজ সাজ (ইত্যাদি)

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে;

শত্রুকরে কভু হব না বন্দী,

ডরি না, থাকে যাই অদৃষ্টে

অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।

রব না, হব না, মোগল ভৃত্য,

সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু।

সাজ সাজ (ইত্যাদি)

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে,

শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভ্রম;

পুণ্য সনাতন আর্ঘ্যাবর্তে

রাখিব নাহি যবন পদাচিহ্ন।

মোগল রক্তে করিব স্নান,

করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।

সাজ সাজ (ইত্যাদি)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটি। কাল—সন্ধ্যা।

মানসিংহ ও মহাবৎ

মানসিংহ। কি! শক্তসিংহ আমার প্রধান
বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুণ্ঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপসিংহ কমলমীর দখল
করে, সেখানে দুর্গ তৈরি কচ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশহাজার মোগল-
সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের ফিনশরার দুর্গ আক্র-
মণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা!

[বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ! কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ।
—কি সাহস! কি কোশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ
মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের
মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ-
সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে
নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি
গৌরব কর্তে পার্তাম; সে আমার কি সম্মান,
কি মর্যাদার কারণ হ'ত। কিন্তু এখন দেখছি,

আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা করি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্মাট্ বন্ধুয়েছেন। তাই তিনি সের্লামের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নতুন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সের্লামের বিদ্বেষক্ষত আরাম কস্তে মনস্থ করেছেন।—কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর।

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষ প্রবেশ করিয়া ডাকিল

“দাদা।”

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

সেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা।

রেবা। কুমার সের্লামের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—

এ বিবাহ সম্মাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—এ সম্মাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্মাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হতে পারে। কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে।—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না করে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না করে ঘোড়া-বেচার মত যার হাতে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি।

রেবা। সম্মাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে? মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম। তবে আমার আপত্তি নাই। মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে। তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্তব্য জানি। তোমার মতেই আমার মত। মানসিংহ। রেবা। এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেইটুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না—

[এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমার ভগ্নিনীর মত দরিদ্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর।—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায়

রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে,

আমি চিরদিন তারি:

চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার,

দিব নয়নেব বারি।

দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব,

র'ব তারি অনুরাগী,

মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,

পশিব তাহার লাগি।

ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি

তাহে অভিমান নাই রে—

সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু

হবে দুঃখনার ঠাই বে,

নিরবধি কাল—হয় ত কখন

ভুলিব সে ভালবাসা;

বিপুল জগৎ—হয় ত কোথাও

মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত।

সশস্ত্র শক্তিসিংহ একাকী সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকান্ড কষাইখানা। ভূকম্প, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বান্ধকো, প্রত্যহ পৃথিবী-ময় কি হত্যাই হচ্ছে: আর তার উপরে আমরা,

যেন তাতেও তৃত না হয়ে—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বলাবিনী রক্তবন্যার ভৈরব স্রোত পৃষ্ঠ করিছ।—পাপ? আমরা হত্যা করিই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্পাদর্শি কিছ, নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা করি তার নাম হয় হত্যা; আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্মনীতিই তৈর করেছিল!

দূরে কামান গর্জন করিয়া উঠিল

“ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—

ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!”

কক্ষে শশবাস্তে দর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল

শক্ত। কি সংবাদ?

দর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দূর্গের পূর্বাঙ্গের প্রকার ভেঙে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপসিংহকে দূর্গ অবরোধের সংবাদ পাঠাইছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দর্গাধ্যক্ষ। না।

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর!

[দর্গাধ্যক্ষ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। দূর্গের পূর্বাঙ্গের প্রকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মৃত্যুকেশী বিস্মতবসনা দৌলৎ উন্মিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্মিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যুষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বৃষ্টিতে পাক্সে না? তবে শোন, ভাল করে বৃষ্টিয়ে বলিছ।—মোগলসৈন্য দূর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তা'রা দূর্গজয় সম্পূর্ণ-প্রায় করেছে! রাজপুত্র জাতির একটা প্রথা আছে যে দূর্গ সমর্পণ করবার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সৈন্যে দূর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে মর্ষ।

আবার কামান গর্জন করিল

“ঐ শোন।—পথ ছাড়ো যাই।”

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে! যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলত। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ! আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে।—আমি যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন

“কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স; সংসারটা দিনকতক ভোগ করে নিলে হত না?”

দৌলৎ উন্মিসার পান্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল

শক্ত। বৃষ্টি—ও চাহনির অর্থ বৃষ্টি। ওর অর্থ এই—‘নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি।’—তা’ দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্তসিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন পরে স্থির স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন

“প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হতে পারে, কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম ধুবতারার মত স্থির।”

শক্ত। ভগবদ্গীতা আওড়ালে যে!—উত্তম! তাই যদি হয় তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?

আবার দূরে কামান গর্জন করিল

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ষ।

শক্ত। [ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন] বাগ্যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ!

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম চর্ম পরে এস! কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগর্দলি এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্মিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্তিসিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

“সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শূন্য বিলাস নয়, শূন্য সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!”

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন

“সৈন্য প্রস্তুত?”

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

[উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর

স্থান—ফিন্‌শরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত।
প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্মপরিহিতা দৌলৎ উন্মিসা
দণ্ডায়মান

শক্ত। [অঙ্গুর্দলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।] ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রু-বৃহ ভেদ কর্ব! পার্বে?

দৌলৎ। পার্বে।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত!—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো?

দৌলৎ। জানি!

শক্ত। তবে এস। কি? বিলম্ব কর্ব যে। ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয়? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার স্বর্ষ্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এতদিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা একদিন বাসবে; হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত একদিন স্নেহ গদগদ স্বরে আমাকে “আমার দৌলৎ” বলে ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে’ ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে। আবার ভয়।

শক্ত। উত্তম! চল!

“চল।—তবে—”

এই বলিয়া দৌলৎ শক্তিসিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন

শক্ত। ‘তবে’?

দৌলৎ। নাথ। মর্ত্তে যাচ্ছি! মর্ষ্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ষ্বার আগে, একবার বল, ‘ভালবাসি’!

নেপথ্যে কোলাহল প্রবলতর হইল

শক্ত। দৌলৎ! পূর্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয়া নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্মিসাব একটি সাধ—শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে’ একবার সে কথাটি শুনতে চেয়েছি, শুনতে পাই নাই। আজ মর্ষ্বার আগে, সে সাধটি মেটাও। বল, হাত দুইখানি ধরে’ বল ‘ভালবাসি’।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য উঠছে—[আবার কামান গজ্জর্ন করিয়া উঠিল।—“ঐ শূন মৃত্যুর বিকট গজ্জর্ন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ:—এখন একবার বল ‘ভালবাসি’।—কখনও বল নাই, যে সূধার আশ্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শূনবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ষ্বার আগে একবার বল—‘ভালবাসি’—সুখে মর্ত্তে পার্বে।”

শক্ত। দৌলৎ—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে আসে কেন? দৌলৎ না বলতে পার্বে না।

দৌলৎ। বল।—[সহসা শক্তিসিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন। “বল, একবার বল।”

শক্ত। বিশ্বাস কর্বে? আজ—

বাষ্পগদগদ হইয়া শক্তের কণ্ঠবোধ হইল

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে’ দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্: প্রশ্ন কর্ব না, মিথ্যা কর্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কর্ব না। তবে কথাটি কেন শুনতে চাই যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর—আমি নারী—নারী-জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ

মর্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনেন মর্বা।
—সুখে মর্ত্তে পার্বে।—বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার
মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি!—তোমার কণ্ঠে
এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি
—মুখ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি!
পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবে-
ছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি।—দৌলৎ!
দৌলৎ! কি কল্পে। আমার জীবনগত ধর্ম,
আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্মাগত
বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'।—এ রণবাদ্য
বাজছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ—
[পুনরায় চরণ ধরিয়ে কহিলেন। “একবার
একবার—”

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য
বলছি ভালবাসি; প্রাণ খুলে বলছি ভালবাসি।
এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষণ
চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো।
দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখে আজ
এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারিস্রোত ছুটেছে।
আর চেপে রাখতে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে
ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার
আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে
যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই
শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ
চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উম্মিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন
করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন

“দৌলৎ উম্মিসা”—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মৃদুহৃৎ! বড়
মধুর স্বপ্ন! মর্বার আগে ভেঙে না যায়—চল,
এই সমরতরণে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—এ অশ্ব প্রস্তুত।

[উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন।
নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকারনিম্নে
দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা
নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপর
দিকে এক হাজার রাজপুত্র—উঃ, ভীষণ
গর্জন! কি মন্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল
“জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়”

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন
“এ কি।”

নেপথ্যে পুনর্বার শ্রুত হইল

“জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়।”

“আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার
জন্য এসেছেন, আর ভয় নাই।”

[দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান
হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপসিংহের
শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথদীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান
প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথদী। স্বয়ং মহাবৎ ত বন্দী!

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস
গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃংখলা-
বন্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দসিংহ
ও প্রহরীস্বয়ং

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—“শৃংখল খুলে
দাও।”

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য করিল

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মৃত্ত। যাও আগ্রায়
যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে
বোলো' যে প্রতাপসিংহ ভেবেছিলেন, এ সমর-
ক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে'
হলদিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনা-
পতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার
সমরাগনে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও!

[মহাবৎ নিরন্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান
করিলেন।

পৃথদী। উদিপদুর রাণার করতলগত
হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথদী।

পৃথদী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মন্ডল-
গড়।

এই সময়ে শক্তিসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন
“এস ভাই—”

এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্তিসিংহকে
আলিঙ্গন করিলেন

“আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে
জীবিত পেতাম না, শক্ত।”

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছ বটে দাদা,
কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসসহ কাহিলেন—“এ যুদ্ধে
আমি আমার সর্বস্ব হারিয়েছি।”

প্রতাপ। কি হারিয়েছ শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উল্লিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উল্লিসা।”

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উল্লিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ
করেছিলে।

শক্ত। হা দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ
করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তম্ভ রহিলেন। পরে ললাটে
কবাঘাত করিয়া কাহিলেন

“ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে
সর্বস্ব পণ করে' এ বংশের গোরুব রক্ষা করে'
এসেছি—”

এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন
প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তম্ভ রহিলেন; পরে শূন্য স্থির
দৃঢ় স্ববে কাহিলেন

“না। আমি জীবিত থাকতে তা হবে না
—শক্তিসিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার
ভ্রাতা নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্শরার
দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হতে তোমাকে
বিশ্বিত করবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু
সেই দুর্গ ও তুমি আজ হতে মেবার রাজ্যের
বাইরে।”

পৃথদী। কি করছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি করছি আমি বেশ জানি,
পৃথদী। শক্তিসিংহ, আজ হতে তুমি মেবারের
কেহ নও' এ রাণা-বংশের কেহ নও।

এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া
চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চূপ কর গোবিন্দসিংহ! এ পবিত্র
বংশগোরুব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে'
এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ

কর্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাকব এ
বংশগোরুব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার
হবে।

পৃথদী। প্রতাপ! শক্তিসিংহ এই যুদ্ধে—
প্রতাপ! আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি।
কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায়
পরিভাগ করলাম—

[এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!”

[এই বলিয়া পৃথদীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
গোবিন্দসিংহ নীরবে পৃথদীর পশ্চাদ্গামী
হইলেন।

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার
মত। কিন্তু তোমার আঞ্জামতও দৌলৎ
উল্লিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না।
একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে
বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-
বাদা বাজে নাই, পুরোহিতের মন্তোচ্চারণ হয়
নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি
তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এইটুকু
স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি
দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি
যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব
দেখিয়েছো, সেও আমার চোখ খুলে নারীর
মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থ-
পবই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে
পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে
তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে' মনে করে-
ছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য।
কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়ে-
ছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত,
কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ীরূপ
মন্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির
ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চির-
জীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে
ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদ-
তলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছাঁব!
সেই হত্যার ধূমীভূত নিঃশ্বাসে, সেই মরণের
প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে,
কি সে মূর্ত্তি!

[এই বলিয়া শক্তিসিংহ সে স্থান
হইতে-ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের উদয় সাগরের তীর। কাল—
জ্যোৎস্না রাত্রি।

মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন
সে মৃদু কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাই সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তাবি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই সুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে ভেঙেছে মোব;
কেন রহে পিছে পিড়ি' পাপবাঙ্গা পরশনে।
“কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তম্ভ
নিশীথে এই শূন্য চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা
বার বার মনে আসছে! এতদিনেও ভুলতে
পারলাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি।
পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ করে আগ্রার প্রাসাদ
পরিত্যাগ করেছিলাম বটে; কিন্তু এখানে আমায়
টেনে এনেছে কে? শক্তসিংহ। এখানে এসে
প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চোখের দেখাও
দেখবো না; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু
তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্তে পারি না কেন?
কারণ, এখানে তবু শক্তসিংহের সেই প্রিয় নাম
দিনান্তে একবারও শুনতে পাই। তাতেই আমার
কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে
সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধরেছিলাম,
তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে, চিন্তা
হতে, এত দিন রক্ষা কর্তে পেরেছিলাম। কিন্তু
সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে'
রাখতে পারি না। না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই
ঠিক। দৌলৎ উল্লিসা জানতে পেলেন বড় কষ্ট
পাবে। বোন! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর
সংবাদ পাইনি। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্ত-
সিংহ সে কথা প্রকাশ করেন নি। আমিও সেই
কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট
জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস
করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়ে-
ছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের মন্তুরাজ্যে
এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য
আমি তা' বৃষ্টি না। কি জানি! কিন্তু যা
করেছি, বোন দৌলৎ উল্লিসা, তোরই সুখের
জন্য। তুই সুখে থাক। তুই সুখী হ'
বোন। সেই আমার সুখ। সেই আমার
সাম্রাজ্য।

এই সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল
মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

“কে?”

পরিচারিকা। সাহজাদি! রাণা ফিরে
এসেছেন। মা আপনাকে ডাকছেন। বাদসাহের
কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি
এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমর-
সিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

“তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি।”

[বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে
কন্যাকে মনে পড়েছে!—দেখি যাই। কে?
অমরসিংহ?

অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে
কহিলেন

“হাঁ, আমি অমরসিংহ।”

মেহের। পরিচারিকা তুমাকে খুঁজতে
এসেছিল। চল' যাই।

অমর। কোথায় যাবে দাঁড়াও!

এই বলিয়া মেহের উল্লিসার হাত ধরিলেন

মেহের। কি কর অমরসিংহ! হাত
ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা
আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখছি।

পরে অমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন

“কি, বল।”

অমর। কি বলছিলাম জানো?—ঐ দেখ,
ঐ হৃদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখছো?—
কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখছো মেহের,
দেখছো!

মেহের। দেখছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই
বাতাস!—দেখছো?—এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য
তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য
মেহের! ভোগের জন্য!

মেহের। পথ ছাড় অমরসিংহ।

অমর। সম্ভাগ। প্রকৃতি কেন এই পূর্ণ-
পাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্ষে—যদি সে তা পান
না কৰ্ণ মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—

বলিয়া যাইতে অগ্রসব হইলেন; অমর পথ রোধ
করিলেন

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি, আর পারি
না। শোন মেহের উন্মিসা! আমি যুবক! তুমি
যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি
মধুর রাত্রি!

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান
করেছো। কি বলছো জানো না।

“জানি মেহের উন্মিসা!”

এই বলিয়া অমর পুনরাব হাত ধবিল
মেহের উচ্চস্বরে কহিলেন

“হাত ছাড়ো।”

“মেহের উন্মিসা! প্রেয়সি!”

এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন

মেহের। অমরসিংহ! হাত ছাড়।

হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন

“এই কে আছে?”

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপসিংহ সেই স্থানে প্রবেশ
করিলেন

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।

পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন

“অমরসিংহ!”

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে
দাঁড়াইলেন

প্রতাপ। অমরসিংহ!—এ কি! — আমি
পূর্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস,
তার যৌবন উচ্ছ্বল হতেই হবে।—তবু
আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে
আমার পুত্রস্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও
ভাবি নাই! কুলাঙ্গার! এর শাস্ত দিব!
দাঁড়াও।

বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন

অমর শব্দ “পিতা”

বলিয়া প্রতাপসিংহের পদতলে পাড়িলেন

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ন্তে ভয়!—
দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পাড়িলেন,
কহিলেন

“মার্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এত-
দিন আমি বৃথা নাই।”

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জনা নাই। পুত্র
বলে ক্ষমা কর্ব না।

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমরসিংহ
প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—
প্রতাপ। সুরাপান!—অমরসিংহ।

অমর। ক্ষমা করুন পিতা!

“ক্ষমা!—ক্ষমা নাই!—দাঁড়াও!—”

এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন

মেহের। পুত্রহত্যা কর্বন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

“তার পূর্বে আমাকে বধ কর।”

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল।
লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন

মেহের। এ কি সর্বনাশ!—মা—মা

দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—

লক্ষ্মী। নাথ! অমরসিংহকে ক্ষমা কর।
আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি।
আমাকে ক্ষমা কর!—মৃত্যুকালে চরণে স্থান
দাও!—

প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ
করিলেন

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি জানো?

অমরসিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।
মেহের উন্মিসা কাঁদিতোছিলেন

প্রতাপ। জগদীশ্বর! আমি পূর্বে-জন্মে
কি পাপ করেছিলাম যে সর্ব প্রকার যন্ত্রণাই
আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ!—চক্ষু অন্ধকার
দেখিছি!—

এই বলিয়া মর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

আকবর ও মানসিংহ মদ্বোমদ্বি দণ্ডায়মান

আকবর। শুনোছি, মানসিংহ! সমস্ত
শুনোছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত
হয়েছে; শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরা-

জিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।—এও শুনতে হল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপসিংহ আজ মর্ন্তমান প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুনবার জন্যে মহা-রাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরন্তর রহিলেন

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শূন্য মোগলের পরাজয় নহে; এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজ-গণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ-ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ। [অবনতবদনে কহিলেন।] করেছি।

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্তে হবে। এই প্রতাপসিংহের গতিরোধ কর্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরন্তর রহিলেন, আকবর তাঁহাব মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন

মহারাজ! প্রতাপসিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাশ্রয়ী ভগবান-দাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপসিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সংকল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ; আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তাহলে এ সাম্রাজ্য হারাব; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাশ্রয়ী ভগবানদাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি

আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জানবেন।

মানসিংহ। সম্রাট! চিতোর যাতে মোগল-করচ্যুত না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

“তবে আমি আসি।”

[বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট কক্ষমধ্যে ধীর-পাদচারণ করিতে করিতে কাঁহতে লাগিলেন

“সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে পরকে শাসন কর্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত্র রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বৃদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না—মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের উল্লিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্! এও শুনতে হল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তাকে আমার কোড়ে ফিরে আসতে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহ-দুর্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মেহের উল্লিসা! মেহের উল্লিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি; তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল

“খোদাবন্দ—মেবার থেকে দৃত এসেছে।”

আকবর। [চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন] কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কে? দৌবারিক। সৎগে সম্রাটকন্যা মেহের উল্লিসা।

“সৎগে মেহের উল্লিসা! কোথায় মেহের উল্লিসা!”

এই বলিয়া সম্রাট আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে মেহের উল্লিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া

“পিতা! পিতা—”

বলিয়া সন্ন্যাসের পদতলে লুপ্ত হইলেন।
দৌবারিক অলঙ্কিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান
করিল

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সতাই
তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন!
আমি আপনার উগ্র, মূঢ় নিৰ্বেশ কন্যা।
আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বৃদ্ধির
দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সৰ্বনাশ করেছি, রাণার
সৰ্বনাশ করেছি, আমার সৰ্বনাশ করেছি।
ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে
লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা
করেছি?—ভারতের দুর্জয় সন্ন্যাসি যে তোর
কাছে তুণখণ্ডের মত দুর্বল।—মেহের তুই
আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মাজ্জনা
চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আসতিস্
না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে,
বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র
পেলাম, পড়লাম, থাকতে পার্লাম না, তাই
ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি
আগে জানতাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া
কাঁদতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া
কহিলেন

“পিতা, এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্তব্য
তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য বাহিরে
নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম স্বেচ্ছাচার নয়।”

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ কখন তোর
প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সন্ন্যাসি? তিনি এই
অভাগিনীকে অত্যাচার হতে রক্ষা কর্তে গিয়ে
আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পত্র অমরসিংহ
সুদ্রাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই
দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পত্রকে গুলি করেন।

রাণার স্ত্রী পত্রকে রক্ষা কর্তে গিয়ে হত
হয়েন।

আকবর। প্রতাপসিংহ! প্রতাপসিংহ!
তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র
হতে' তাহলে তোমার আসন হত আমার
দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার
সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব।
আমি যদি সন্ন্যাসি আকবর না হতাম ত আমি
রাণা প্রতাপসিংহ হতে' চাইতাম। আমি সন্ন্যাসি
বটে; ভারত শাসন কর্তে চাই; কিন্তু আপ-
নাকে সম্যক্ শাসন কর্তে শিখি নাই। আর
তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্তে
গিয়ে, ক্ষত্র-ধর্মের পদে স্বীয় পত্রকে স্বহস্তে
বলি দিতে পারো! এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে
রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ
করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ-
সিংহ শত্রু হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য
নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্যাতন আমার
পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত,
পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের
সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা
পরিত্যক্ত, পত্র উচ্ছৃঙ্খল। তাঁর প্রতি কৃপা
প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত
চিতোর অপর্ণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ,
ভুলে গিইছিলাম, পিতা, প্রতাপসিংহ আমার
হাতে সন্ন্যাসিকে এক পত্র দিয়েছেন।

প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন

আকবর। কি, স্বয়ং রাণা প্রতাপসিংহের
পত্র!—কৈ?

এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহেরের

হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন

“আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়!—”

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন

“প্রবল প্রতাপেশু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার
ভাগিনেয়ী দৌলত উন্নিসা আর ইহজগতে
নাই! ফিন্শরার যুদ্ধে যোদ্ধবৈশিনী দৌলত
উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাহার যথার্থীতি সংকার
করাইয়াছি।”

আকবর। দৌলত উল্লিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পুস্তক শুনিয়েছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন

“দৌলত উল্লিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সহ-জাদী মেহের উল্লিসার নিকটে শুনিল। তাহার পুস্তকই মেবার কুলকলঙ্ক শক্তিসিংহকে বর্জন করিয়াছি। শক্তিসিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্তিসিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

“আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত লুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

“আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলত উল্লিসার কলঙ্ক ও মেহের উল্লিসার আচরণ যেন বহিজ্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে না।

“আমি যদি মেহের উল্লিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উল্লিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাহাকে আমি বাধা দিবার কে! তাহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি—

রাণা প্রতাপ সিংহ।”

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন

“প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা করি। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন

মোগলের সাধ্য নেই যে, আর তাঁর কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আসছি।”

[এই বলিয়া সম্রাট সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্রেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্তে পেরেছি।

পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন

“এই আবার আমি আমার শৈশবের দৌলত শত্রু স্মৃতিস্মৃতিময় চির-পরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি! এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজছে। ঐ সেই স্বেচ্ছসালিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমি বদলিইছি। আমার মৃত, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্তিসিংহের, দৌলত উল্লিসার, রাণা প্রতাপসিংহের, আর আমার সর্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি! তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে। আমি আজ এ কোলাহলময় রণভূমি হতে অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কস্তব্যসাধনায়। ভগবান আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটের নিভৃত কক্ষ। কাল—রাতি।
মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীর, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ!
তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বলছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বার চিন্তা কর্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন; পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরি-

মাগে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত-পরিবারবর্গের অন্তঃ-
পদ্য পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না।
কিন্তু আকবর সম্রাট হলেও, তিনি মানুষমাত্র।
তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপুবর্গের
অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সক্রলেরই
হয়ে থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার
করেছেন; মার্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারত-
মহিলার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য প্রতিশ্রুত
হয়েছেন। আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে,
হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত
করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়ার। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া
যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান;
কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্মের
পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম গ্রহণ
কর্ত্তে পারত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা
কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত-
মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম স্থাপন করবার চেষ্টা
কর্ত্তেন যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ
কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্মচারী
সমান উচ্চপদস্থ। ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়ার। ভারতে ভাবী সম্রাজ্ঞীও
হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!

পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন

“বলোছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে
পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা
স্বপ্নমাত্র।”

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয়
জীবন থাকলে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন
অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্ছে।

চান্দেবরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ
অসীম আলস্য, ঔদাসীনা নিশ্চেষ্টতা—
জীবনের লক্ষণ নয়! দুর্ভাগ্যের ব্রাহ্মণ বারণসীর
ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে জাত
যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম, তা আজ মৌলিক
আচার মাত্র:—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ
নয়। ভ্রাতার ভ্রাতার ঈর্ষ্যা, স্বন্দর, অহংকার,—এ

সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।—সেদিন
গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি
হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর
প্রাণ এতই শূন্য হয়েছে, এতই জড় হয়েছে,
এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়ার। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু
এই শূন্য শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস
হাতে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যতিক
বলে কম্পমান নবধর্ম গ্রহণ করবে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—
যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে
বহন করছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক
সম্বন্ধরঞ্জু আমি অত্যন্ত গর্বভরে গলদেশে
জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা
প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই
অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়।
যা নেই তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে,
তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—

এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বিকানীর। আমি পূর্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়ার। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা
চাহি না! আমরা প্রতাপসিংহের সঙ্গে যোগ
দিব। আমরা বিদ্রোহ করব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট আপনাদের
অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা-কক্ষে
আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন
—“কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন
তাঁহারা আমার সর্ব অপরাধ মার্জনা করেন।”

চান্দেবরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভ বিবাহ উপলক্ষে
সম্রাট কি কর্ত্তেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্্বপ্রধান শত্রু প্রতাপসিংহকে ক্ষমা কচ্ছেন। আর প্রতাপসিংহের জীবদ্দশায় আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন—“দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগলসেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপসিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।”

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট এই মহুস্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

[এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গোয়ালীর। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন

মাড়বার। যাই বল—সম্রাট মহৎ।

চান্দেৱী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীর। মাজ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেৱী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে সম্রাট জেতা বিজিতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না!

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীর। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল রাত্রি।

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড়ান। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পাশে কয়েকজন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ান [ধাক্কা]

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আসতে দেৱী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচ: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভাগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর তা কখন হয়! মহারাজের মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভাগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল? এ ত হ'তে পারে না।

১ দর্শক। কেন? বল, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুন্দা হুমায়ুন বিয়ে কর্লে ভগবানদাসের এক মেয়েকে আবার সেলিম বিয়ে কর্লে আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কর্লে ভগবানের বোনকে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধছে না। বাপ বিয়ে কর্লে ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুন্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত-রকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজ মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একেবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগির কথা বটে—সেলিমের শালা হওয়া ভাগির কথা।

৫ দর্শক। ভাগির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ, শালা হওয়াই ভাগি। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করবি বল। ললাটের লিখন—

৩ দর্শক। পূর্বজন্মের কর্মফল রে, পূর্বজন্মের কর্মফল। এতেই পূর্বজন্ম মানতে হয়।

৫ দর্শক। মানতে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা!—সন্ন্যাসের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সোলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমরা ত মাসে একটা করে বিয়ে দেখে আসছি।

৪ দর্শক। আহা যার এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বসতে, শতে, উঠতে, নাইতে, খেতে, যেতে—সব সময়েই একটা মুখ দেখছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আসছে যে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়া না।

২ দর্শক। ওহে রামসিংহ। তোমার মাথাটা অঙ্গ নয়।

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আসতে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ চুপ। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিম্নপ্রয়োজন। তাহা সন্ন্যাসের পুত্রের বিবাহের উপ-যোগী সমারোহই হইয়াছিল

দর্শক। ঐ সন্ন্যাস রে, ঐ সন্ন্যাস।

৩ দর্শক। আর ঐ বৃদ্ধ মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ করি। ভুলে গিয়েছি' এর মধ্যে!

৪ দর্শক। সন্ন্যাসের মত সন্ন্যাস বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্তকীর দল রে, নর্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচছে দেখ। নর্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচছে!

৩ দর্শক। নাচলোই বা—ও যে ময়ূর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচছে কিন্তু—চল্।

দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সোলিম হতাম।

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখলে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাটলেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

ব্যক্তিগণ শশব্যস্তে প্রবেশ করিল

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সোলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি।

৩ ব্যক্তি। তার পর সোলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি!

১ ব্যক্তি। তারপর, তাকে ধর্তে লোক ছুটলো; তাদের মাঞ্জে' না; তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ।

২ দর্শক। চিন্লে কেমন কোরে।

২ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্তসিংহ, সোলিম এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ।"—বলে আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত!

- ২ দর্শক। মরে গিয়েছে?
 ১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।
 ৩ ব্যক্তি। দেখা যাক্, তাকে পোড়ায় কি
 গোর দেয়।

[সকলে মিলিয়া চলিয়া গেল।

অন্তিম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা।
 প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ,
 রাজপুত্র-সন্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল!
 সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন?
 ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্বল,
 পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে
 আর আক্রমণ কর্বেন না। শেষে মরবার
 আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ
 সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে
 একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার
 চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন।
 কবিরাজ কাঁহলেন

‘ক্ষতি কি।’

সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্য্যাক্ষ বাঁহিয়া
 দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ
 জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন

“বাঁচবার কোনও আশা নাই?”

কবিরাজ। কোন আশা নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন

প্রতাপ শয্যায় অর্ধস্থিত হইয়া অদরে চিতোর
 দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কাঁহলেন

“ঐ সেই চিতোর! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ
 যা' একদিন রাজপুত্রের ছিল; আজ সেখানে
 মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ
 আমার পুর্ষপুরুষ স্বর্গীয় বাম্পারাণকে—
 যিনি চিতোরের আক্রমণকারী স্লেচ্ছকে পরাস্ত
 করে' তাকে গর্জনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে'
 গর্জনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে
 বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে

সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগার-
 নদের নীল বারিরাশি স্লেচ্ছ ও রাজপুত্র
 শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে
 পশ্চিমীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী
 চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তার
 পুত্রবধুর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ
 করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ
 দেখছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব
 ভেবেছিলাম! কিন্তু পার্বাম না। কার্য্য প্রায়
 সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পুর্বেই
 দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল
 সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না,
 অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও
 যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই রত্নের উপযুক্ত
 উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে
 আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে,
 আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে;
 এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম
 স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার!
 জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও
 প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাকত না, যদি বীর পুত্র
 রেখে যেতে পার্বাম। কিন্তু—ওঃ—

এই বলিয়া পার্ব পরিবর্তন করিলেন

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা
 হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা
 দৈহিক নয় গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা মানসিক।—
 আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ
 কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা?

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র
 অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত
 রাজ্য মোগলের হাতে সর্পে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই
 রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দসিংহ!
 অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্তে
 পার্ব না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে
 এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর

মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাম্পার নামে অঙ্গীকার করিছ তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি।—[পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন]—অমরসিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়!—কে'দ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাঁদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যারা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে না। তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো।—আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—[অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন] যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্বাদ লও।

অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন ক্রমেক নিস্তত্ব থাকিয়া পরে কহিলেন

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমরসিংহ!—কোথায় তুমি।—এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে—যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আস্ছি!

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন
“রাগার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সংকারের আয়োজন করুন।”

গোবিন্দ। পুত্রদুঃখোত্তম! মেবার সূর্য্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসংগীকে ফেলে কোথায় গেলে।

বলিতে বলিতে মৃত রাগার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন

রাজপুত্র সন্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাগার পদধূলি গ্রহণ করিল

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুত্রের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাকবে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্গ-অক্ষরে মর্দিত থাকবে; আরাবলির প্রতি চুড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাকবে।

ষট্ঠিকা পতন

দুর্গাদাস

পুরুষ-চরিত্র

ঔরঞ্জীব (ভারতসম্রাট)। রাজসিংহ (মেবারের রাণা)। শ্যামসিংহ (বিকানীর-পতি)। শম্ভুজি (মারাঠাধিপতি)। দুর্গাদাস (মাড়বারের সেনাপতি)। দিল্লীর খাঁ, তাহবর খাঁ (মোগল সেনাপতিস্বয়)। মোজাম, আজীম, আকবর, কামবক্স (ঔরঞ্জীবের পুত্র চতুষ্টয়)। ভীমসিংহ, জয়সিংহ, (রাজসিংহের পুত্রস্বয়)। সমরসিংহ (সোনিং) (দুর্গাদাসের ভ্রাতা)। অজিতসিংহ (যশোবন্তসিংহের পুত্র)। কাশিম (জনৈক মুসলমান)।

স্ত্রী-চরিত্র

গুলনেয়ার (ঔরঞ্জীবের সন্নাজ্ঞী)। মহামায়া (যশোবন্তের বিধবা পত্নী)। রমা (শম্ভুজীর স্ত্রী)। কমলা, সরস্বতী (জয়সিংহের পত্নীস্বয়)। রাজিয়া উৎ-উল্লিসা (আকবরের দৃহিতা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদভবনে সম্রাটের দরবারকক্ষ।
কাল—প্রহরাধিক প্রভাত।

সিংহাসনে ভারতসম্রাট ঔরঞ্জীব উপবিষ্ট ছিলেন। বামপার্শ্বে বিকানীর মহারাজ শ্যামসিংহ আসীন। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে তাহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ এবং দুইজন প্রহরী নিবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস ও তাহার ভ্রাতা সমরসিংহ দণ্ডায়মান।

ঔরঞ্জীব। দুর্গাদাস! যশোবন্তসিংহের মৃত্যু মোগলসাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য!

দুর্গাদাস। জাঁহাপনা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজাজ্ঞা পালনের জন্য মরা প্রত্যেক প্রজার গোরবের বিষয়।

ঔরঞ্জীব। তুমি উচিত কথা বলছো, দুর্গাদাস! যশোবন্তসিংহ ভিন্ন আর কে সেই দুর্জয় বিদ্রোহী কাবুলীদের দমন কর্তে পারত? তাঁর কাছে যে আমি কতদূর ঋণী—সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্তে পারব না—[শ্যামসিংহকে] কি বলেন, মহারাজ?

শ্যাম। নিঃসন্দেহ।

সমর। কেন? জাঁহাপনা ত সে ঋণ যশোবন্তসিংহের পুত্র পৃথ্বীসিংহের প্রাণ সংহার করে পরিশোধ করেছেন!

ঔরঞ্জীব। আমি তার প্রাণ সংহার করেছি! যুবক! তুমি কি বলছো, তুমি জান না। আমি তার প্রাণ সংহার করেছি! আমি

পৃথ্বীসিংহকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালবাসতাম। আমি তাকে স্বহস্তে সম্মান-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছিলাম।

সমর। সম্রাট! সেই অবোধ বালকও তাই ভেবেছিল। কিন্তু সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত, তা' সরল বেচারী পৃথ্বীসিংহ জানত না!

শ্যামসিংহ। যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ—জানো?

সমর। জানি, মহারাজ বিকানীর! আপনার প্রভুর সঙ্গে—আমার নয়।

ঔরঞ্জীব একটু চমকিত হইলেন। তাহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাহার প্রসঙ্গ ইষৎ আকৃষ্ট হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—

—“কে বলে যে সম্মান-পরিচ্ছদ বিষাক্ত?”

দুর্গা। না, জাঁহাপনা! তার কোন প্রমাণ নাই। সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত, তা' সাধারণের অন্তর্মান মাত্র।

সমর। [সক্রোধে] অন্তর্মান। তার পর-দণ্ডেই বিধে জম্জীরিত হয়ে দারুণ যন্ত্রণায় বেচারীর মৃত্যু হয়। আমি কি সে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিনি?—অন্তর্মান! তবে যশোবন্তসিংহকে আফগানিস্থানে পাঠিয়ে হত্যা করাও অন্তর্মান! আর আজ তাঁর রাণী আর পুত্রকে দিল্লীতে অবরোধ করাও অন্তর্মান! তবে তুমি অন্তর্মান; আমি অন্তর্মান; সম্রাট ঔরঞ্জীব অন্তর্মান; মোগল-সাম্রাজ্য অন্তর্মান; এ নিখিল

বিশ্ব অনন্দমান। এ অনন্দমান নয়, দুর্গাদাস—
এ ধুব, স্থূল, প্রত্যক্ষ।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও, দাদা—মনে কর, কি
প্রতিজ্ঞা—করে' এসেছিলে।

সমর। আচ্ছা! এই চুপ ক'ল্লাম! কিন্তু
এক কথা বলে' রাখি, জনাব! মনে ভাববেন
না যে, আমরা একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু,
কিছুই বুঝি না! কিছু কিছু বুঝি।

দুর্গা। রাজাধিরাজ! আমার উগ্র ভ্রাতাকে
ক্ষমা করুন।—জাঁহাপনা, আমরা আজ এক
বিনীত প্রার্থনা সন্ন্যাসপদে নিবেদন ক'র্তে
এসেছি।

ঔরং। উত্তম! নিবেদন কর।

শ্যাম। বল, দুর্গাদাস! ভয় কি? সন্ন্যাস
উদার। তিনি তোমার ভাইয়ের উগ্র ব্যবহার
ক্ষমা করে'ছেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ
নাই।

দুর্গা। আমাদের বিনীত নিবেদন এই
যে, যোধপুরের মহারাণী তাঁর শিশু পুত্র-
কন্যাদের নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে চান। সে
সম্বন্ধে সন্ন্যাসের অন্তিম ভিক্ষা করি।

ঔরং। আমার অন্তিমের প্রয়োজন?

দুর্গা। জাঁহাপনার অন্তিমের প্রয়োজন
কি, তা' আমিও জানি না। কিন্তু মোগল
সৈন্যাদ্যক্ষ—তাহবর খাঁ—সন্ন্যাসের বিনা অন্ত-
মিতে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছেন না।

ঔরংজীব তাহবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—“কি জন্য তাহবর খাঁ?”

তাহবর। জাঁহাপনার সেইরূপ আজ্ঞা
বলেই জেনেছিলাম।

ঔরং। ও—হাঁ, আমি বলে'ছিলাম বটে যে
যশোবন্তসিংহের পরিবারকে তাঁদের দিল্লী
হ'তে যাবার পূর্বে আমি পুরস্কৃত ক'র্তে
চাই। যে অন্তিম মহারাজ যশোবন্তসিংহের
প্রতি দেখাতে কাৰ্পণ্য করি নাই, সে অন্তিম
মহারাজ হ'তে তাঁর পরিবারবর্গকে বণ্ডিত
ক'র্ষ না—কি বলেন মহারাজ?

শ্যাম। সন্ন্যাসের চিরদিনই এই যশোবন্ত-
সিংহের পরিবারের প্রতি অসীম অন্তিম।

সমর। সন্ন্যাস!—আমি না বলে' থাকতে
পাচ্ছি না, দুর্গাদাস—সন্ন্যাস! অন্তিম
ক'র্ষ না, এইটুকু অন্তিম করুন। আপনা-

দের প্রকৃষ্ট দেখে বড় ভীত হই না, কারণ,
সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু হাসি দেখে বড়
ভয় পাই, জনাব! কারণ, সেটা বুঝতে পারি
না।—সোজা ভাষায় বলুন যে, যশোবন্তসিংহের
প্রতি প্রতিহিংসা চান, তাঁকে যেমন বধ করে'-
ছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংকে যেমন
বধ করে'ছেন, সেইরূপ তাঁর রাণী আর কনিষ্ঠ
পুত্রকে বধ ক'র্ষেন। বলুন, সোজা ভাষায়
যে, যশোবন্তসিংহের কুলের কাউকে রাখবেন
না।—বলুন—আমরা বুঝতে পারি। কেবল
অন্তিম ক'র্ষেন না জনাব, এই ভিক্ষা চাই।
আপনাদের শত্রুতার চেয়ে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর!

দুর্গা। দাদা! তুমি কি আমার প্রার্থনা
ব্যর্থ ক'র্তে এসেছো?—তুমি ফিরে যাও।

সমর। যাচ্ছি, দুর্গাদাস। আর এক কথা
—একটি কথা মাত্র। মহাশয়ের পূর্বপুরুষ
আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক
শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকবরের মত
ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুসলমান—সরল
গোঁয়ার ধার্মিক মুসলমান। সন্ন্যাস তাঁর মত
বিবাহে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না।
সোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান
প্রথায় স্বধর্ম প্রচার করেন।—করুন, তাতে
ডরাই না। তবে অন্তিম ক'র্ষেন না। যা
অন্তিম করে'ছেন, যথেষ্ট! তাতে এখনো
জঞ্জীরিত হ'য়ে আছি। আর অন্তিম ক'র্ষেন
না। দোহাই—

[প্রস্থান।

তাহবর খাঁ তাঁহাকে রোধ করিতে যাইলে
ঔরংজীব নিষেধ করিলেন।

ঔরং। দুর্গাদাস! তোমার খাতিরে
তোমার উগ্র ভাইকে ক্ষমা ক'ল্লাম। কিন্তু
তোমার ভাই একটি কথা সত্য বলে'ছেন যে,
আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে
মুসলমান। এই সনাতন ধর্ম ভারতবর্ষে
প্রচার ক'র্ষার জন্য এই রাজ্যভার নিহঁছি!
রাজ্যভার গ্রহণ ক'র্ষার পূর্বে যাই করে'
থাকি—রাজ্যভার গ্রহণ করে' অবধি এই
ধর্মের ফকিরী করি।

দুর্গা। তা সম্পূর্ণ মানি, জাঁহাপনা!—
তার পরেও যদি আপনি কখন শাঠ্য ক'রে
থাকেন, সে শঠের প্রতি। তা' গহঁত

হয় নি।—উদার না হ'তে পারে, অনর্চিত হয় নি।

ঔরং। স্বীকার কর?

দুর্গা। করি! কিন্তু জাঁহাপনা! মহারাজ যশোবন্তসিংহ যদি ভ্রমবশে কখন আপনার প্রতিকূল আচরণ করে' থাকেন, তাঁর বিধবা পত্নী ও নিরীহ সন্তান সম্রাটের প্রতিহিংসার পাত্র নয়। তারা কোন অপরাধ করে নি।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তাঁদের পীড়ন কষ্টে চাই না। পদরক্ষিত কষ্টে চাই।

শ্যাম। সম্রাট তাঁদের পদরক্ষিত কষ্টে চান, দুর্গাদাস।

দুর্গা। সম্রাটের ইচ্ছায়ই মহারাণী পদরক্ষিত হয়েছেন।—এখন অনুমতি দিন।

সম্রাট মহারাজ বিকানীরকে কহিলেন—
“মহারাজ, এখন আপনি আমার নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি আসছি।”

শ্যামসিংহ চলিয়া গেলে ঔরংজীব দুর্গাদাসকে কহিলেন—“দুর্গাদাস! তুমি দেখছি শূন্য প্রভুভক্ত ভৃত্য নও; তুমি চতুর রাজনৈতিক। তোমার সৎগে চাতুরী নিষ্ফল। শোন তবে সত্য কথা! আমি যশোবন্তসিংহের রাণীকে আর তাঁর সন্তানকে চাই।

দুর্গা। জাঁহাপনা! তা' পদক্ষেপই জানি। কিন্তু কারণ কি জানি না। মহারাণী নারী, আর যশোবন্তের পুত্র সদ্যোজাত শিশু। তাঁদের নিয়ে সম্রাটের কি প্রয়োজন হ'তে পারে?

ঔরং। দুর্গাদাস! ভারতসম্রাট তাঁর প্রত্যেক প্রজার কাছে প্রত্যেক কার্যের প্রয়োজন ব্যক্ত কষ্টে বাধ্য নহেন বোধ হয়।

দুর্গাদাস ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন—
“তবে জাঁহাপনা, আমার যাগ্ণা নিষ্ফল?”

ঔরং। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দুর্গা। তবে আমার আর কিছুর বক্তব্য নাই।

ঔরং। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আমার হাতে সমর্পণ কষ্টে প্রস্তুত নও?

দুর্গা। প্রাণ থাকতে নয়।

ঔরং। শোন, দুর্গাদাস। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার সন্তানকে আমার হাতে দাও। প্রচুর পদরক্ষার দিব।

দুর্গাদাস হাসিয়া কহিলেন—“সম্রাট—আমি

সে শ্রেণীর লোকের একটু উপরে। দুর্গাদাস জীবনে কর্তব্য মাত্র চেনে। দুর্গাদাস জীবিত থাকতে কারো সাধ্য নাই যে, তার মৃত প্রভু যশোবন্তসিংহের পরিবারস্থ কাহারো গায়ে কেহ হস্তক্ষেপ করে।—তবে আসি জাঁহাপনা! আদাব!”

ঔরং। দাঁড়াও।—দুর্গাদাস জীবিত থাকতে তা' সম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর তা' ত সম্ভব। তাহবর খাঁ—বন্দী কর।

তাহবর অগ্রসর হইলে দুর্গাদাস সহস্রা তরবারি খুলিয়া কহিলেন—“খবদার!—এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি, সম্রাট”—এই বলিয়া দুর্গাদাস কটিবলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন।

মুহুর্তে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল

দুর্গা। এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট!—আর এক তুরীধরনিত প্যাঁচ শ' সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ কর্বে—বুঝে কাজ কর্বে।

ঔরং। যাও!

[সৈনিকসহ দুর্গাদাস চলিয়া গেলেন।
ঔরংজীব মুহুর্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—“দুর্গাদাস! জাস্তাম তুমি প্রভুভক্ত চতুর সাহসী, বীর! কিন্তু তোমার যে এতদূর স্পর্ধা হবে তা' ভাবি নি।” তিনি পরে তাহবরকে ডাকিলেন—“তাহবর খাঁ!”

তাহবর। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁকে বল যে, আমার হুকুম—সেনাপতি এই মুহুর্তেই সৈন্যে যশোবন্তের গৃহ অবরোধ করেন। যাও!

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ—অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞী
গুলনেয়ারের বসিবার কক্ষ।
কাল—স্বপ্রহর।

সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন

সম্রাজ্ঞী। যোধপদরমহিষী! তুমি একদিন গর্ষিত হয়ে আমাকে ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞী বলে' ডেকেছিলে। সে গর্ষ চূর্ণ করেছি কি না? তোমার স্বামীকে কাবুলে

পাঠিয়ে হত্যা করিইছি; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিইছি; তোমার সম্মুখে তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করি। তোমাকে আমার পাদোদক খাওয়াবো। পরে তোমায় মৃত্যুকায় জীবন্তে প্রোথিত করি। জেনো, যোধপুত্ররাণী! যে এই ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞীই আজ এই সুবিস্তীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্য শাসন করছে।—ঔরঞ্জীব? ঔরঞ্জীব ত আমার এই তর্জনীসংলগ্নরশ্মিসমগ্ণালিত কাষ্ঠ-পুত্রলিকা। লোকে জানে অন্যরূপ। সে লোকের মৃত্যুর পরাকাষ্ঠা। নহিলে এই যশোবন্তের রাণী আর তার সদ্যোজাত শিশুকে ঔরঞ্জীবের কি প্রয়োজন? এ কথা একবার লোকে নিজেকে জিজ্ঞাসাও করে না।

এই সময়ে ঔরঞ্জীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

গদুল। কে! সম্রাট? বন্দীগ জাহাপনা!

ঔরং। গদুলনেয়ার, তুমি এখানে একা?

গদুল। এই যে যোধপুত্রের রাণীর অপেক্ষা করি।—কোথায় সে?

ঔরং। এখনো ধরা পড়েনি।

গদুল। পড়েনি?

ঔরং। না!—দুর্গাদাস তাকে দিতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

গদুল। জীবিতাবস্থায়?

ঔরং। হাঁ—তার সঙ্গে সৈন্য ছিল।

গদুল। আর মোগল-সাম্রাজ্যে কি সৈন্য নাই—ধিক!

ঔরং। প্রিয়তমে—

গদুল। আমি কোন কথা শ্রুতে চাই না, সম্রাট! আমি আজই সম্রাটের পুত্রের যোধপুত্র-মহিষীকে চাই।

ঔরং। গদুলনেয়ার! আমি মহারাণীর আবাসগৃহ অবরোধ কর্তে দিলীর খাঁকে পাঠিয়েছি।

গদুল। আচ্ছা! সম্রাটের পুত্রের আমি তাকে চাই। মনে থাকে যেন।

[এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঔরঞ্জীব যাইতে যাইতে কহিলেন—“কি অশুভ স্পর্শ! এই দুর্গাদাসের! এখনো তাই ভাবি।—আমার সম্মুখে দরবার-কক্ষে তরবারি খুলে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে’ গেল!—

এরূপ সাহস পুত্রের কাহারও হয় নাই;—তার প্রভু যশোবন্তসিংহেরও না।”—

[এই বলিয়া সম্রাট ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর বাহিন্যটী।
কাল—অপরাহ্ন।

দিলীর খাঁ বস্ম পরিতোছিলেন; সম্মুখে তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ দাঁড়াইয়া ছিলেন

দিলীর খাঁ। কি বল্ছো খাঁ সাহেব?

রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস সম্রাটের নাকের কাছ দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে চলে’ গেল?

তাহবর। তা’ গেল বৈ কি!

দিলীর। আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলে?

তাহবর। তা’ দেখলাম বৈকি!

দিলীর। সোজা হয়ে?

তাহবর। যতদূর সম্ভব।

দিলীর। যতদূর সম্ভব কি রকম?

তাহবর। এই তার তরোয়ালখানা নাকের উপর দিয়ে ঘুরলো কি না—

দিলীর। ঘুরলো না কি?

তাহবর। ঘুরলো বলে’ ঘুরলো!—বেশ একটু ঘুরলো!

দিলীর। তাই তুমি বদ্বি একটু কাৎ হলে?

তাহবর। হ’লাম বলে’ হ’লাম! আমি বলেই কাৎ হ’লাম! আর কেউ হলে চিৎ হ’তেন।

দিলীর। নিজের তরোয়ালখানা বের করলে না কেন?

তাহবর। ফুর্সৎ পেলাম কৈ?

দিলীর। ফুর্সৎ পেলে না বদ্বি?

তাহবর। আরে! সে বেটা এমনি হঠাৎ তরোয়াল বের করলে যে, কোন ভদ্রলোকে সে রকম করে না। তার পর সে চলে’ গেল—

দিলীর। তখন তরোয়াল বের করলে বদ্বি?

তাহবর। তখন আর বের করে’ কি করি?

দিলীর। তবে সে চলে’ গেল কি করলে?

তাহবর। নাঁকে হাত দিয়ে দেখলাম—
নাকটা আছে কি না!

দিলীর। সন্দেহ হ'ল বৃষ্টি?

তাহবর। একটু হ'ল বৈ কি! বেটা এমন
ধাঁ করে' তরোয়াল ঘুরাল যে, তাতে তার সঙ্গে
নাকের খানকটা যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

দিলীর। [সম্মিত মুখে] নতুন রকম
ব্যাপার বটে! লোকটাকে দেখতে হ'চ্ছে ত!

তাহবর। তাকে দেখবার জন্যই ত
সম্মাট্ তোমাকে ডেকেছেন। নাও, তোমার যে
বর্ম পরা শেষই হয় না।

দিলীর। আরে রোস! দুপুর বেলায়
কোথায় একটু বিশ্রাম কর্ব, না, ছোট এখন
সৈন্য নিয়ে একটা উন্মাদের পেছনে। এ
সামান্য কাজটা তুমি কর্তে পার্তে না?

তাহবর। না! তার সঙ্গে সমাধিক পরিচয়
কর্বার আমার ইচ্ছা নাই!—তার উপরে—

দিলীর। তার উপরে?

তাহবর। তার উপরে এই রাজপুত্র
জাতটার উপর আমার কেমন একটা অভক্তি
আছে। তারা যুদ্ধ কর্তেই জানে না।

দিলীর। কি রকম?

তাহবর। আরে! তারা যুদ্ধ করে—কোন
প্রথা মেনে করে না। ফস্ করে' তরোয়াল বের
কোরেই কোপ্। নিজের মাথার দিকে লক্ষ্য
নেই। তার নজর দেখ'ছি বরাবর আমার এই
মাথাটার উপরে। এ রকম বেকুবের সঙ্গে যুদ্ধ
কর্তে আছে?

দিলীর। নজর বৃষ্টি তোমার মাথার
উপরে?

তাহবর। হাঁ—আরে নিজের মাথা বাঁচিয়ে
যুদ্ধ কর্—না ধপাধপ্ কোপ দিচ্ছে! যেন
শত্রুগুলোকে কচুবন পেয়েছে।

দিলীর। রাজপুত্র সৈন্য কত?

তাহবর। আড়াইশ' হবে।

দিলীর। যাও, তাহবর! পাঁচ হাজার
মোগলসৈন্য তৈয়ের হ'তে আজ্ঞা দাও! যা'রা
প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করে, তা'রা ভয়ঙ্কর
জাত; তাদের সঙ্গে ভেবে-চিন্তে যুদ্ধ কর্তে
হয়। পাঁচ হাজার মোগল অশ্বারোহী—
বৃষ্টি?—যাও।

তাহবর চলিয়া গেলে দিলীর নিজমনে

কাহিলেন—“অসমসাহসিক এই রাজপুত্র
জাতি!—কিন্তু সম্মাটের এ আদেশের অর্থ
বৃষ্টি না। তিনি যশোবন্তসিংহকে বধ
করিয়াছেন, কেননা তাকে ভয় কর্তেন! কিন্তু
তার পরিবারবর্গের প্রতি আক্রোশ কেন?—
যাই, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বিদায় নিয়ে আসি!
ফিরে এসে বিদায় নেবার অবসর যদি নাই
পাই। আগে নিয়ে রাখা ভাল।”—

[এই বলিয়া দিলীর অন্তঃপূর্বাভিমুখীন
হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাণা রাজসিংহের অন্তর্বাতী।

কাল—অপবাহু।

রাজকুমার জর্জসিংহের নবোঢ়া দ্বিতীয়া স্ত্রী—
কমলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিলেন

কমলা। কেমন তোমাকে পেঁচের মধ্যে
ফেলোছি, স্বামী! ঘোরো এখন! দিদি অবাক
হয়ে গিয়েছে! এত অল্পদিনের মধ্যে
এসে আর একজন তার মুখের গ্রাস খপ্
কোরে' কেড়ে নিলে গা! কি দুঃখ!—হাঃ হাঃ
হাঃ—মন্ত্র জানি দিদি, মন্ত্র জানি! খুব
হয়েছে! এমন একটা স্বামীর মত স্বামী, রাণা
রাজসিংহের পুত্র;—এমন একটা স্বামী
নরকিয়ে একা একা ভোগ কর্ব' ঠিক করে'-
ছিলে দিদি! লজ্জাও করে না!—রাণার এই
পুত্রই ত মেবারের রাণা হবে! আর তুমি একা
রাণী হবে মনে করে'ছিলে! তা' হ'চ্ছে না
দিদি! কেমন চিলের মত ছোঁ মেরে খপ্ করে'
কেড়ে নিই'ছি!—কেমন! রাণী হবে? হও!
—আর ভীমসিংহ! তুমি রাজা হবে? হ'লে
আর কি! রাণী নিজ'হাতে আমার স্বামীর
হাতে রাজবন্দনী বেঁধে দিয়েছিলেন, জানো?
বলি ও ভাসুর! তার খবর রাখ কি? তার
উপরে আমার স্বামীই ত রাণার প্রিয়পাত্র।
ক'র্বে কি ভীমসিংহ!—দুই ভায়ে খুব ঝগড়া
বাধিয়ে দিয়েছি! ভীমসিংহ এখন থেকেই
যাক্, দূর হোক্! এমনি কল পেতেছি বাবা!
—পড়তেই হবে। তার পর শ্রীজয়সিংহ
মেবারের রাজা, আর শ্রীমতী কমলা দেবী
মেবারের রাণী;—আর তুমি দিদি—সরে' পড়
—দিদি!—সরে' পড়!

চীৎকার করিতে করিতে জনৈক ধাত্রী কক্ষে
প্রবেশ করিলেন

ধাত্রী। ওরে বাবা রে!

কমলা। কি হয়েছে?

ধাত্রী। ওরে বাপ! একেবারে কুরুক্ষেত্রের
কাণ্ড রে—ওরে কি হবে রে!

কমলা। মর্! বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আরে একেবারে দক্ষিণযজ্ঞ! ওরে
বাবা! এমন কাণ্ড কেউ দেখিনি গো—একে-
বারে নিশুম্ভ বধ!

কমলা। বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আর হয়েছে কি—ওরে—একেবারে
নশ্কাকাণ্ড রে!

কমলা। বল্ না, কি হয়েছে?

ধাত্রী। তবে শুনবা!—ঐ ছোট রাজ-
পুত্র—ঐ যে জয়সিংহ—তোমার সোয়ামী
গো।

কমলা। হাঁ—কি করেছে?

ধাত্রী। সে ঐ যে বড় রাজপুত্র ভীমসিং
—তার পায়ে তরোয়াল খুলে এক কোপ—ওরে
একেবারে রক্তগঙ্গা ভগীরথ রে!

কমলা। এ্যাঁ! তার পর?

ধাত্রী। তার পর আবার কি?—বড় রাজ-
পুত্র ভীমসিং ঐ ছোট রাজপুত্র জয়সিং-
এর গলা টিপে ধরেছে, এমন সময় রাণা এসে
হাজির। এসে বড় রাজপুত্রকে কি
বকুনিটাই বকলে গা—একেবারে সাত কাণ্ড
রামায়ণ, ন ভূতি ন ভবিষ্যতি শুনিয়ে দিলে।
ভীমসিংহের মুখে রা-টি নেই। চুপ করে
বেরিয়ে এলো! মুখখানি চুণ করে' চলে' গেল।

কমলা। বেশ হয়েছে।

ধাত্রী। ওমা, সে কথা বোলো না! বড়
ছেলে বড় ভাল গো, বড় ভালো! দেশশুম্ভ
লোক তাকে ভালো বলে! আর ছোট ছেলেও
ত ছেলে ভালো! মর্ই ত তাকে হাতে করে'
মানুষ করে'ছি—যত গোল পাকালি ত এ
সংসারে এসে তুই সর্বনাশী!

কমলা। চুপ্ হারামজাদী!

ধাত্রী। “ওরে বাবা! একেবারে তাড়কা
রাক্ষসী রে!”—বলিয়া উম্মর্দ্বাসে পলায়ন
করিল।

কমলা। কি! এতদূর গাড়িয়েছে? এতদূর

গড়াবে তা' ভাবিনি! তা' মন্দই কি! দিন
থাকতেই মীমাংসা হ'য়ে যাক্ না।

[এই সময়ে তাহার সপত্নী সরস্বতী সেই কক্ষে
প্রবেশ করিলেন

সরস্বতী। এই যে কমলা—কমলা! এই
কি তোমার উচিৎ কাজ হ'চ্ছে? জানো আজ
কি হয়েছে?

কমলা। জানি। তবে আমার কি উচিৎ
কাজ হ'চ্ছে না দিদি?

সর। স্বামীকে ক্রমাগত তাঁর বড় ভাইয়ের
বিরুদ্ধে উত্তোজিত করা?

কমলা। কে ক'চ্ছে?

সর। তুমি।

কমলা। মিথ্যা কথা! ভাসুরই ত ঝগড়া
বাধান—তাঁর লক্ষ্য চিরকাল দেখছি এই
মেবারের সিংহাসনের দিকে। এ ত তাঁর দোষ।

সর। তিনি এ রাজ্য চান না, কমলা!
আমি বেশ জানি।—আর যদিই বা চান!—
তিনি ত বড় ভাই!

কমলা। হাঁ, ঘণ্টাখানেকের বড় বটে! রাণা
নিজে স্বামীর হাতে তাঁর জন্মবার সময়
হল্দে সূতো বেঁধে দেন নি?—ঐ নিয়েই ত
ঝগড়া।

সর। যদি তাই হয়—আমাদের চেষ্টা করা
উচিত নয় কি বোন, যাতে সে বিরোধ ভ্রাতৃ-
স্নেহে পরিণত হয়, যাতে সে কালো মেঘ
বিদ্যুৎ উদ্গার না করে' জল হ'য়ে নেমে যায়,
যাতে সে বহি দাহ না করে' দুইটি হৃদয়কে
যুক্ত করে?

কমলা। সে কথা আমি তোমার সঙ্গে
বিচার কর্তে চাই না। আমার স্বামীর বিষয়
আমি বদ্ববো।

সর। বোন! তিনি তোমারই স্বামী,
আমার কি কেউ নন?

কমলা। “তবে তুমি তাঁকে বদ্বিয়ে
বোলো। আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্তে আসো
কেন?”—বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সে স্থান
হইতে প্রস্থান করিলেন।

সর। আমি তাঁকে বদ্বিয়ে বোলবো! হা
কপাল!—এক দিন ছিল, যখন তিনি আমার
কথা শুনতেন। তার পরে তুমি এসে তাঁকে
যে কি মন্তে যাদ্ ক'লে বোন, তুমিই জানো!

জয়সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন
জয়। কে সরস্বতী? আমি ভেবেছিলাম
কমলা।

সর। ভেবেছিলে সত্য? এতখানি ভুল
করেছিলে? কিন্তু কেন সে ভুল এত শীঘ্র
ভেঙ্গে গেল! সে ভুল ভাঙবার আগে কেন
একবার আমায় কমলা ভেবে প্রাণেশ্বরী বলে
ডাকলে না? আমি ভুলেও একবার ভাবতাম
যে, আমাকে ডাকছে? সে ভুল ভাঙতো;
কিন্তু একবার এক মনুষ্যেরও জন্য স্বর্গসুখ
অনুভব কর্তাম!

জয়। সরস্বতী, আমি এখন যাই। আমার
বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর। দাঁড়াও!—আমি তোমাকে আমার
হৃদয়ের আবেগ জানাবার জন্য ডাকছি না। যা
গিয়েছে তা' আর ফির্ষে না!—শোন! একটা
কথা জিজ্ঞাসা করি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে আজ
আবার বিবাদ করেছিলে?

জয়। সে আমার দোষ নয়।

সর। তাঁর দোষ?

জয়। আমি রাগে তাঁর পায়ে তরোয়াল
দিয়ে মেরেছিলাম; তিনি আমার গলা টিপে
ধরেছিলেন।

সরস্বতী। তাঁরই ত দোষ বটে!—প্রভু,
তুমি ত এরকম ছিলে না! কমলা তোমায় নিয়ে
খেলাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ কোরো না, প্রভু!
যদি কমলা বদ্বিষয়ে থাকে যে, ভাস্কর মেবারের
সিংহাসনপ্রার্থী, সে মিথ্যা কথা। ভাস্কর উদার,
মহৎ।

জয়। আর আমি নীচ!—বেশ!—

সরস্বতী। আমি তা' বলি নাই। তবে
আমি বলি যে, যে তোমার কাণে এই মন্ত
দিয়েছে সে নীচ, সে তোমার হিতার্থিনী নয়।
সে তোমার সর্বনাশ করছে!—ঐ ভাস্কর
আসছেন, আমি যাই।—“নাথ, তোমার যদি
মনুষ্য থাকে, ত এইক্ষণেই এই ভাইয়ের
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।”—বলিয়া প্রস্থান
করিলেন।

তৎপরেই ভীমসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া
জয়সিংহকে মৃদুস্বরে ডাকিলেন—“জয়সিং—
ভাই!”

জয়সিংহ নীরব রহিলেন

ভীম। জয়সিং—ভাই—আমারই অন্যায়
হয়েছিল! আমাকে ক্ষমা কর।

জয়সিংহ তথাপি নীরব রহিলেন

ভীম। হাঁ জয়সিং। আমি সম্যক্ ক্রোধ
সংবরণ ক'র্ত্তে শিখিনি। আমার উচিত ছিল,
ছোট ভাইকে ক্ষমা করা।—ভাই! আমায় ক্ষমা
কর।

এই সময়ে রাণা রাজসিংহ আসিয়া ভীমসিংহকে
কহিলেন

“ভীমসিং! জয়সিং তোমাকে তরবারি
দিয়ে আঘাত ক'রছে?”

ভীম। না, পিতা, বিশেষ কিছু নয়।

রাজ। আমি তা' জানতাম না। পরিচারিকার
মুখে শুনলাম। পরে কক্ষে রক্তের রেখা দেখে
বুঝলাম যে, এ সত্য কথা।—দেখি, কোথায়
আঘাত করে'ছে?

ভীম। বিশেষ কিছুই নয়।

ভীমসিংহ দক্ষিণপদ দেখাইলেন

রাজ। হুঁ!—ভীম! পুত্র! আমি না দেখেই
বিচার করে'ছিলাম। অন্যায় বিচার করে'-
ছিলাম। শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না,
জয়সিংহকে দেওয়া উচিত ছিল। এই নাও
আমার তরবারি—আমার হয়ে তুমি তার শাস্তি-
বিধান কর।

ভীম। না পিতা, অন্যায় আমার। জয়সিংহ
অবোধ।

রাজ। না ভীমসিং! আমি ন্যায় বিচার
ক'র্ব্ব। লোকে বলে যে আমি জয়সিংহের
পক্ষপাতী। তা' হ'তে পারে। কিন্তু ন্যায় বিচার
ক'র্ব্ব।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা ক'র্ত্তাম।

রাজ। না, ভীমসিংহ! শাস্তিবিধান কর।
আরো আমি একটা দেখছি যে, কিছুদিন
থেকে তোমাদের যে কারণেই হোক বনে না।
ভবিষ্যতেও বোধ হয় বন্বে না। দুই জনেই
রাজ্যের জন্য যুদ্ধ ক'র্ব্ব। আমি মরে' গেলে
তা' হওয়ার চেয়ে আমার জীবিতাবস্থায়ই সে
যুদ্ধ হয়ে যাক্। রাজ্যের অমঙ্গল হবে না।
এই নাও তরবারি। যুদ্ধ কর।

ভীম। পিতা, আমি রাজ্য চাই না, এর
জন্য বিবাদ ক'র্ব্ব না,—শপথ ক'র্ত্তি।

রাজ। প্রমাণ কি?

ভীম। আমি এই দণ্ডেই রাজ্য পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।—প্রতিজ্ঞা করি যে, এই রাজ্যে যদি আর জলগ্রহণ করি, ত আমি আপনার পুত্র নই।

রাজসিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে কহিলেন—

রাজ। “তুমি আজ বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছ, ভীম!—তুমি নির্দোষী; জয়সিংহের দোষের জন্য তুমি স্বদেশ হ’তে চিরনির্বাসিত হবে। তবে আমি যখন ভ্রমবশে রাজবন্দনী জয়সিংহের হাতে বেঁধে দিয়েছি, এখন বোধ হয় রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার এ রাজ্য পরিত্যাগ করাই ঠিক। কিন্তু মনে রেখো ভীম! যে, এই স্বার্থত্যাগ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য করি, রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষবশে নয়।”

ভীম। এই রাজ্যের কল্যাণেই যেন আমি মর্ন্তে পারি। ‘পিতা, প্রণাম হই’। [—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—] “ভাই, আশীর্বাদ করি, জয়ী হও, যশস্বী হও।”

[এই বলিয়া ভীমসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাজ। আমার পুত্র বটে।—জয়সিং! শিক্ষা কর—বীরত্ব করে বলে।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লী নগরীতে যশোবন্তসিংহের গৃহের দ্বিতল কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

দুর্গাদাসের ভ্রাতা—সমরসিংহ ও যোধপুত্রের সামন্তগণ উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান

বিজয়সিংহ। তুমি তা হ’লে উদ্দেশ্য বিফল করে’ এসেছো?”

সমর। বিজয়সিংহ! আমি ক্রোধ সংবরণ কর্তে শিখিনি।

মুকুন্দসিংহ। তবে গেলে কেন?

সমর। এক উদ্দেশ্য! একবার পাঁপিষ্টকে দেখতে—মুখোমুখি দেখতে। সম্রাটের কাছে কোন ভিক্ষা কর্তে যাইনি। সে কাজ দুর্গাদাস করুক। আমার কৌশল নাই, চাতুরী নাই। আমার সহায় ভগবান্, আর এই তরবারি।

সুবলদাস। সেনাপতি এখনো এলেন না কেন?

বিজয়সিংহ। সম্রাট্ তাঁকে ছলে বন্দী করেন নি ত?

সমরসিংহ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—
“কি! তাও কি সম্ভব?”

সুবল। না, সমর! সেনাপতি সম্যক্ সতর্ক না হ’য়ে কোন কাজে হাত দেন না।

মুকুন্দ। এ দুর্দ্দিনে তিনিই আমাদের ভরসা। ঐ তুরীধরনি।—ঐ যে সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন!—উঃ! কি ছুটিয়ে আসছেন!

বিজয়। এসে প’হুঁছিলেন বলে’। চল, নীচে যাই। শুন কি সম্বাদ!

সুবল। দরকার কি? সেনাপতি এখানে আসুন না।

নেপথ্যে দুর্গাদাসের স্বর শ্রুত হইল

“প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।”

সমর। প্রস্তুত! কিসের জন্য?

সুবল। ঐ যে দুর্গাদাস উপরে আসছেন

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। সকলে প্রস্তুত হও।

সমর। কিসের জন্য?

দুর্গা। আত্মরক্ষার জন্য।

বিজয়। কি সংবাদ শুন?

দুর্গা। বিস্তারিত বলবার এখন সময় নাই, বিজয়সিংহ যশোবন্তের পরিবারকে ছাড়বে না সম্রাট্; সে তাঁদের চায়।—মহারাণী আর তাঁর পুত্র-কন্যাদের বাঁচাতে হবে। এক্ষণেই মোগলসৈন্য এসে এ বাড়ী ঘেরাও করবে।

বিজয়। উপায়?

দুর্গা। একমাত্র উপায় আছে, আপনাদের প্রাণদান করা। বন্ধুগণ! মহারাণীর জন্য কে কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সকলে। সকলেই প্রস্তুত।

দুর্গা। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণ দিলেই হবে না। মহারাণীকে আর তার সন্তানদের নিরাপদ করা চাই।

ঠিক এই মহূর্ত্তে যশোবন্তের রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন—

“যশোবন্তের রাণী নিরাপদ! তার জন্য চিন্তা নাই, দুর্গাদাস! তার পুত্রকে—যোধপুত্র

বংশের প্রদীপকে বাঁচাও। সে বংশ রক্ষা কর।
রাণীর জন্য ভয় নাই। সে মর্ন্তে জানে।—
শিশুকে বাঁচাও, দুর্গাদাস!”

দুর্গা। সে চেষ্টার চূড়ি হবে না, মা!
—মা, শিশুকে আনুন।

[যশোবন্তের রাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। বিজয়! কাশিমকে ডাকো।

[বিজয় প্রস্থান করিলেন।

দাদা! বাহিরে একটা মিষ্টানের ঝড়ি
আছে, নিয়ে এসো।

সমর। মিষ্টানের ঝড়ি! কি জন্য?

দুর্গা। তর্কের সময় নাই দাদা!—যাও।

[সমরসিংহ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। মদকুন্দ দাস—এই যে কাশিম।

এই সময়ে বিজয় ও কাশিম সেই কক্ষে প্রবেশ
করিল ও কাশিম দুর্গাদাসকে অভিবাদন করিল

কাশিম। হৃজুর, কি আজে হয়?

দুর্গা। কাশিম! তোমায় একটা কাজ
ক'র্তে হবে। মহারাজ-কুমারকে বাঁচাতে হবে।
মোগলসৈন্য এখনি আসবে তাকে ছিনিয়ে
নিতো।—তোমায় তাকে বাঁচাতে হবে।

কাশিম। আজে করুন, হৃজুর।

সমর একটা ঝড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। এই যে—তুমি এই মেঠায়ের ঝড়ি
করে' যশোবন্তের শিশুকে নিয়ে যাবে। তুমি
মুসলমান, তোমাকে কেহ সন্দেহ ক'র্বে না
—বদলে?

কাশিম। কোথায় যেতে হবে, হৃজুর?

দুর্গা। দূরে ঐ মন্দিরের চূড়া দেখছো?

কাশিম। দেখছি।

দুর্গা। ঐ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে
দিয়ে আসবে, তার পর যা ক'র্তে হবে, তিনি
জানেন। মোগলসৈন্য এসে প'লো বলে—
এই ক্ষণেই যেতে হবে।

কাশিম। যে আজ্ঞা, হৃজুর। আমি
লেড়্কার জন্য জান দিতে পার্ব।

দুর্গা। তা' জানি, কাশিম!—নৈলে এ
কাজ তোমাকে দিতাম না।

শিশুকে লইয়া রাণী প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। মহারাণী! শিশুকে কাশিমের

হাতে দিউন।—কোনও ভয় নাই, মা—আমি
বলছি।

রাণী। তুমি যখন বলছো, দুর্গাদাস—
কাশিম। তোমারও একটা ধর্ম আছে।

কাশিম। কোন ভয় নেই, মা! আমি তাকে
নিজের জানের চেয়ে যতন করে' নিয়ে যাবো,
মা!

কাশিম রাণীর হস্ত হইতে লইল। রাণী পুনর্বার
শিশুকে কাশিমের হাত হইতে লইয়া চুম্বন করিয়া
গদগদস্বরে কহিলেন—

“বাছা-আমার!”

দুর্গা। দেন।—আর সময় নাই।

রাণী। পুনর্বার চুম্বন করিয়া কাশিমের
হস্তে দিলেন—“ধর্ম সাক্ষী, কাশিম।”

কাশিম। “ধর্ম সাক্ষী, মা! কোন ভয়
নেই মা!”—বলিয়া কাশিম শিশুকে ঝড়িতে
পূরিল ও ঝড়ি মাথায় করিল।

সমর। যদি ধরা পড়ে?

রাণী। যদি ধরা পড়ে, ত এই ছুরি ওর
বুকে বিধিয়ে দিও। জীবিতাবস্থায় ওকে
কেউ যেন ঔরঞ্জীবের কাছে নিয়ে যেতে
না পারে।

দুর্গা। কোন ভয় নেই, মা!—যাও, এই
পিছনের দরোজা দিয়ে যাও।—এস, দেখিয়ে
দিচ্ছি।

[কাশিম ঝড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ দুর্গা-
দাস ও তাহার রাণী বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়। দুর্গাদাস! ধন্য তোমার উপস্থিত
বদ্বি!

সুবল। এ সব দুর্গাদাস সম্রাটের কাছে
যাবার পূর্বে ঠিক করে' গিয়েছিল, আমি
নিশ্চয় বলতে পারি।

মদকুন্দ। ঐ মোগলসৈন্য আসছে!

বিজয়। এ যে অসংখ্য সৈন্য!

সুবল। সত্তে স্বয়ং সেনাপতি দিলীর
খাঁ!

দুর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন
“বাস্! এখন নিশ্চিত। মোগল সৈন্য এসে
প'ড়েছে—এখন তোমরা মর্বার জন্য প্রস্তুত
হও।”

বিজয়। আর স্ত্রী-কন্যারা?

দুর্গা। তাদের উপায় আমি ক'ছি!

সন্ধ্যাটের কাছে যাবার আগে কেন সে বিষয়ে ভাবিনি?—ডাকো তাঁদের, দাদা!

[সমরসিংহ আবার বাহির হইয়া গেলেন।

মুকুন্দ। ঐ মোগলসৈন্য এসে পড়লো!

বিজয়। গুলি চালাচ্ছে!

সুবল। দরোজা ভাঙবার চেষ্টা ক'চ্ছে!

মুকুন্দ। আগুন জ্বালছে বাড়ীতে আগুন দেবে বোধ হয়।

দুর্গা। না, হ'লো না; আর সময় নাই।

নারীগণের সঙ্গে সমরসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। মা সকল! আজ তোমাদের জন্য বড় কঠোর বিধান ক'র্তে হ'চ্ছে। আজ তোমাদের পুড়ে ম'র্তে হবে।

জনৈক প্রোঢ়া নারী। সে আমাদের পক্ষে কিছূ নতুন নয় সেনাপতি! আমরা ক্ষত্রিয়-নারী, ম'র্তে জানি।

দুর্গা। অন্য উপায় নাই, মা! আমরাও ম'র্তে যাচ্ছি—যাও মা সকল! ঐ ঘরে যাও; ঐ ঘর বারুদে পোরা। তাতে তোমাদের দাঁড়াবার মাত্র স্থান আছে। বারুদের উপর গিয়ে দাঁড়াও, তার পর আর কি বলব, মা!—

উক্ত নারী। তার পর আমি স্বহস্তে তাতে আগুন দেবো! চল সব!

আলদুলায়িতকেশা রাণী সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন

নারীগণ। রাণীমার জয় হউক!

রাণী। জয়! আমাদের জয় মৃত্যু! ম'র্তে যাচ্ছো!—যাও!—যাও — স্বর্গধামে!—আমি তোমাদের সঙ্গে আজ যাব না। আমি আজ পারি যদি, বাঁচবো।—এখনি ম'র্তে চাচ্ছলাম দুর্গাদাস! না, আমি ম'র্তে না। উপর থেকে কে আমাকে ডেকে বল্লেন—“সময় হয় নাই—তোমার কাজ বাকি আছে।” আমায় বাঁচতে হবে। দুর্গাদাস! পারো ত আমায় এই দিন—এই এক দিন মাত্র আমাকে বাঁচাও। [জানু পাতিয়া করজোড়ে] ঈশ্বর! আজ আমাকে রক্ষা কর। [উঠিয়া] তার পর—তার পর—দেশে আগুন জ্বালবো—এমন আগুন জ্বালবো—যে, সন্তসমুদ্রের বারি তাকে নেবাতে পারবে না।

দুর্গা। মা! পারি ত আজ আমাদের প্রাণ দিয়ে মহারাণীকে বাঁচাবো।—তোমরা যাও, মা! দরোজা ভাঙলো বলে!

[অন্যান্য নারীগণ প্রস্থান করিলেন।

রাণী। চল তবে, দুর্গাদাস।—রোসো। আমি কন্যাকে নিয়ে আসি। তাকে ফেলে যাবো না। ব'কে ক'রে নিয়ে যাবো।—তোমরা এসো।

দুর্গা। দাদা!

সমর। ভাই!

দুর্গা। চল তবে ম'র্তে।

সমর। চল।

দুর্গা। একটু অপেক্ষা কর, এদের শেষ দেখে যাই! ঐ—ঐ—[দূরে ভীষণ শব্দ] ঐ যাক্! হয়ে গিয়েছে; সব শেষ!—চল।

সমর। চল।

দুর্গা। ভাই! ভাই! ব'ঝ শেষ দেখা। ম'র্তের আগে এসো একবার কোলাকুলি করি। উভয়ে কোলাকুলি করিলেন

সমর। দুর্গাদাস!—ভাই।

দুর্গা। দাদা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর শয়নকক্ষ।

কাল—প্রায় এক প্রহর দিবা।

শম্ভুজীর স্ত্রী রমাবাই তাহার পরিচারিকার সহিত সাগ্রহে কথোপকথন করিতেছিলেন

রমা। তা রাজা আমার স্বামীকে কি বল্লেন?

পরিচারিকা। কি না বল্লেন তাই বল। উনকুটি প'য়ষটি যা বলবার তাই বল্লেন। বল্লেন “সেয়ানা ছেলে;—দিন নেই রাত্তির নেই কেবল পরের সর্বনাশে ফিচ্ছ'স।” বলি, তোমার সোয়ামী কিন্তু ভারি ব্যাদড়া।

রমা। আমার তিনি ত এ রকম ছিলেন না।

পরি। ছিলেন না?—শোন একবার!! বলি পেট থেকে পড়েই কি মানুষ ঐ রকম হয়, বয়েসের গুণে হয়—খনি্য ছেলে যা হোক! বলি, বাছা, বয়েস কাল না হতেই এই। পরে আর কত কি হবে! বলি, তোমার ঘরে এমন

সোমন্ত বো, আর তুই—তোর—ঐ—কিনা
বাইরের মেয়ে মানুস নৈলে তোর চলে না!

রমা। না দাসী! তুই বলিস না, তিনি এ
রকম নন! আমি তাঁকে বেশ জানি।

পরি। বলি, বেশ জানবারই ত কথা।
কিন্তু বাছা, পুরুষ মানুষের মনের মধ্যে
সেঁধোবার সাধ্য স্বয়ং মধুসূদনের নেই, তা
তুমি কি কব্বে বল।

রমা। তবে কুসংসর্গে পড়ে' তিনি যদি
এ রকম হয়ে থাকেন।

পরি। এই!—এই!—ঐ যা বলেছো বাছা;
সঙ্গদোষ। তার এক মোছলমান এয়ারবাক্স
জুটেছে; তার নাম কাবলেস খাঁ। সেই ত
খারাপ কর্লে। আজকে রাজা তোমার সোয়া-
মীকে খুব বকে' দিয়েছেন। তা কে শোনে!
একবারে তেরিয়া! এমন রাগও দেখিনি! তার
বাপকে কি কথাই না বল্লে। বলি, পিরথিম
শুধু নোক যাকে মান্য করে, ডরায়, তাকে
ডরালে না; আচ্ছা ছেলে জন্মেছিল যা
হোক।

রমা। ঐ তাঁর স্বভাব! নরম কথায় একে-
বারে জল। কিন্তু কেউ যদি রুক্মিণী কথা বল্লে
ত তাঁর জ্ঞান থাকে না।

পরি। নরম কথার বশ, তবে তুমি তাকে
বশ কর্তে পাল্লে না।

রমা। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাঁকে বশ
কর্তে পাল্লাম না।

পরি। হুঁ, তুমি বশ কর্বে—বলি, বড়
বড় হাতি গেল তলিয়ে—

রমা। তিনি এখন কি কচ্ছেন?

পরি। কি আর কর্বে'ন, নিজের ঘরে
বসে' আছেন। গাল খেয়ে এখন জাবর কাট্-
ছেন।

রমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন

পরি। আর কে'দে কি কর্বে বল বাছা।
এখন বলি, বাছা নাও খাও; বেলা হোল।
বাপ্। পিরথিম শুধু নোক যাকে দেখলে
থরহরি কম্প, সটাং তাকে দুকথা শুনিয়ে
দিলে—হায় রে কলিকাল।”—বলিয়া প্রস্থান
করিল।

রমা। ভগবান্! আমার পতির মতি
ফেরাও। তার চরিত্র বিশুদ্ধ কর। যেন কারো

মুখে আর তাঁর নিন্দা শব্দে না হয়। বড়
ব্যথা পাই। বড় ব্যথা পাই।

এই সময়ে কক্ষে শম্ভুজী প্রবেশ করিয়া
ডাকিলেন—“রমা।”

রমা। এই যে তুমি।

শম্ভু। দেখ রমা! আমি বিদায় নিতে
এসেছি।

রমা। কেন?—কোথায় যাবে?

শম্ভু। যে দিকে চক্ষু যায়। স্বেদে স্বেদে
ভিক্ষা মেগে খাবো—সেও স্বীকার। তবে—

রমা। নাথ! সব শুনছি। কিছু মনে
কোরো না! আমার শ্বশুর তোমার ভালোর
জন্যই ভৎসনা করেন। গুরুজনের তিরস্কারে
কি রাগ কর্তে আছে?

শম্ভু। আমি ত আর ছেলে মানুসটি নই
যে, সে যা খুসী তাই বল্বে?

রমা। ছি ছি। ও কথা মুখেও এনো না!
—বাপ্—গুরুজন।

শম্ভু। জানো বাবা কি হুকুম দিয়েছেন?
যদি আমি আর সন্ধ্যার পরে দুর্গের বাহিরে
থাকি—তা হলে যেন কেউ আমাকে দুর্গের
ভিতর প্রবেশ কর্তে না দেয়।

রমা। সে কি বিনা দোষে বলেছেন?—বল
দেখি নাথ!

শম্ভু। আমার দোষ? তুমিও বলছ আমার
দোষ!

রমা। তোমার দোষ আমি দেখি না। তাই
বলে কি—সকলেই ত আমি নয়।—মন দুট
কর। সংযম শেখো! তুমি মারাঠা জাতির
গৌরব হও—এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করি।—

শম্ভু। রমা—[ক্রন্দন]।

রমা। ছিঃ পুরুষের কি ক্রন্দন শোভা
পায়?—ছিঃ!

শম্ভু। ঠিক বলেছো রমা! আমি এর
প্রতিহিংসা নেবো।

রমা। ও কি কথা নাথ!

শম্ভু। আমি প্রতিশোধ নেবো! প্রতিশোধ
নেবো!—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রমা। হা রে আমার কপাল!

পরিচারিকা পুনঃপ্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে
কহিল—“বলি নাইতে খেতে হ'বে। বেলা যে

পুইয়ে এলো!—তোমার গুণধর ত রাগে গর
গর কত্তে কত্তে—ঐ দিকে গেল। তা তুমি
কি করবে বল বাছা!—এখন এসো।”

রমা। চল যাচ্ছি।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—প্রভাত।
ঔরঞ্জীব একাকী

ঔরঞ্জীব। কি!—যশোবন্তের রাণী আড়াই
শ' মাত্র সৈন্য নিয়ে পাঁচ হাজার মোগলসৈন্যের
ব্যুহ ভেদ করে' চলে গেল!—আর সে মোগল-
সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং দিলীর খাঁ!—এর
মধ্যে কিছুরহস্য আছে!—দৌবারিক!—

নেপথ্যে। খোদাবন্দ।

ঔরঞ্জীব। সেনাপতি দিলীর খাঁ!—

নেপথ্যে। যো হুকুম।

ঔরঞ্জীব। এখন সম্রাজ্ঞীর কাছে মুখ
দেখাবো কি করে'—অপমানে আমার অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ জ্বলছে।

বেগে গুলনেয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন

গুলনেয়ার। সম্রাট! এ যা শুনছি, তা'
কি সত্য?

ঔরঞ্জীব। কি সত্য?

গুল। এই সংবাদ—যে যশোবন্তের রাণী
আড়াই শ' মাত্র সৈন্য নিয়ে মোগল ফটক ভেদ
করে' চলে' গিয়েছে?

ঔরঞ্জীব। হাঁ প্রিয়ে সত্য।

গুল। তোমার এই সৈন্য, এই সেনাপতি,
এই শক্তি নিয়ে তুমি ভারতবর্ষ শাসন কত্তে
বসে'ছো?

ঔরঞ্জীব। প্রিয়তমে—

গুল। আর কাজ নেই সোহাগে সম্রাট!
আমার একটা যৎসামান্য ইচ্ছা পূর্ণ করবার
জন্য তোমাকে বলছিলাম—তার এই
পরিণাম।

ঔরঞ্জীব। আমার যথাসাধ্য করেছি।

গুল। তোমার যথাসাধ্য তুমি করে'ছো?—
তোমার সাধ্য এইটুকু? তুমি বলতে চাও—
আজ তোমার হাতে পড়ে', মোগল রাজশক্তি
এমন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে যে, এক নারী—

সঙ্গে আড়াই শ' মাত্র সৈন্য—সেই শক্তি
চূর্ণ, দলিত করে' চলে' গেল! হা ধিক্!

ঔরঞ্জীব নীরব হইলেন

গুলনেয়ার। যশোবন্তের রাণী এখন
কোথায়?

ঔরঞ্জীব। সম্ভবতঃ তিনি রাণা রাজ-
সিংহের আশ্রয়ে—মেবারে।

গুলনেয়ার। মেবার আক্রমণ কর—আমি
যশোবন্তের রাণী আর তার পুত্রকে চাই।

ঔরঞ্জীব। গুলনেয়ার এ বিষয়ে বিবেচনা
করা যাবে।

গুলনেয়ার। বিবেচনা?—বেগম গুলনেয়া-
রের ইচ্ছাই সম্রাট ঔরঞ্জীবের কাছে যথেষ্ট
নয় কি?—বিবেচনা?—শোন, আমার এক কথা
শোন; আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই-ই।
সে স্বর্গে থাকুক, মর্ত্যে থাকুক, পাতালে
থাকুক, আমি তাকে চাই। মেবার আক্রমণ কর।

ঔরঞ্জীব। প্রিয়তমে—

গুলনেয়ার। শূন্যে চাই না। মেবার
আক্রমণ কর!—

এই বলিয়া সম্রাজ্ঞী গভীর অভিমানে কক্ষ
পরিত্যাগ করিলেন। ঔরঞ্জীব সেই কক্ষে একাকী
পাদচারণ করিতে লাগিলেন

ঔরঞ্জীব। আমি এ কথা বিশ্বাস কত্তে
পারি না। আড়াই শ' মাত্র রাজপুত্র সৈন্য
৫০০০ মোগলের ব্যুহ ভেদ করে' গেল!
নিশ্চয় এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা আছে।—
কিন্তু সেনাপতি দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা
ক'র্ষে এই বা কি বলে' বিশ্বাস করি? দিলীর
খাঁ আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহায়, বান্দা-
কোর মন্ত্রী—দিলীর খাঁ—সরল, মহৎ, উদার
দিলীর খাঁ—আমার বিশ্বাসঘাতক হবে!—আমি
বিশ্বাস কত্তে পারি না। কিন্তু আড়াই শ' রাজ-
পুত্রসৈন্য ৫০০০ মোগলসৈন্য কেটে বেরিয়ে
গেল! আর সে মোগলসৈন্যের সেনাপতি স্বয়ং
নিভীক পরাক্রান্ত বীরবর দিলীর খাঁ!—তাই
বা কি বলে' বিশ্বাস করি—নিশ্চয় এর ভিতর
কোন গুঢ় রহস্য আছে।—এই যে দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন

দিলীর। বন্দিগ, জাঁহাপনা!

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! তোমায় ডেকে

পাঠাইছি জান্তে যে, এ কথা সত্য কি না যে—

দিলীর। সম্রাট্ যা শব্দেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরঞ্জীব। আমার কথা শেষ কর্তে দাও—এ কথা সত্য কি না যে, আড়াই শ' মাত্র রাজপুত ৫০০০ মোগলসৈন্য ভেদ করে' চলে গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাহাপনা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরঞ্জীব। আর সে সৈন্যের সেনাপতি তুমি!

দিলীর। হাঁ, জনাব!

ঔরঞ্জীব। যুদ্ধ করেছিলে?

দিলীর। জনাব! এ যুদ্ধে আমাদের পাঁচ-হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচ শ' বেঁচেছে। রাজপুতদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচটি।

ঔরঞ্জীব। আর যশোবন্তের রাণী?

দিলীর। তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন।

ঔরঞ্জীব। শিশু?

দিলীর। শিশুকে সেই সৈন্যদের মধ্যে দেখি নাই জনাব! তবে যশোবন্তের রাণীর বৃকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্যা ছিল।

ঔরঞ্জীব। মোগলসৈন্য কি মেঘের অধম হ'য়েছে যে, একটা নারীর গতি প্রতিরোধ কর্তে পারলে না?—সঙ্গে তার আড়াই শ' মাত্র সৈন্য?

দিলীর। জানি না জাহাপনা কিন্তু যখন সেই নারী মোগল সৈন্যবাহ্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা আলদুলায়িতকেশা, বন্ধে সন্ত কন্যা; তখন মহারাণীর আড়াই শ' সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগল-সৈন্যকৃষ্ণমেঘের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের মত এসে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে স্পর্শ কর্তে সাহস করলে না।

ঔরং। আর তুমি?

দিলীর। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সে অপূর্ণ মাতৃমূর্তি দেখলাম। বলতে চেষ্টা করলাম—“ধর যশোবন্তের রাণীকে”—কণ্ঠরুদ্ধ হোল! তরবারি খুলতে চেষ্টা করলাম—তরবারি

উঠলো না। পিস্তল নিলাম—পিস্তল হাত থেকে পড়ে' গেল।

ঔরং। দিলীর খাঁ তুমি কি পাগল হয়েছো।

দিলীর। হয়ত হয়েছি। জানিনা। কিন্তু সেই মদহস্তেই যেন বোধ হোল যে, আমি আর একটা মানুষ হয়ে গেলাম। একমদহস্তে' কে যেন এসে আমার হৃদয়ের ম্বারে আঘাত করে' রুদ্ধদুয়ার খুলে দিল। একটা নতুন জগৎ দেখলাম।

ঔরং। তাই তুমি ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সঙের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?

দিলীর। হাঁ জনাব! দেখলাম সে এক মহিমাময় দৃশ্য! কি সে মহিমা! আশ্চর্য!—আলদুলায়িতকেশা নারী! বৃকের উপর তার যুগ্ম শিশু। কি সে দৃশ্য জাহাপনা! নিম্মেঘ উষার চেয়ে নিম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র—সেই মাতৃমূর্তি!—আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রৈলাম।

ঔরং। তারপর!

দিলীর। তারপর সে মূর্তি অন্তর্হিত হ'লে জ্ঞান হোল। চেষ্টা করে উঠলাম, আক্রমণ করো। আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সম্মুখলোকে ঝলসে উঠলো। বিপক্ষ ফিরে দাঁড়ালো। যুদ্ধ বাধলো। মানুষ পড়তে লাগলো, ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মত। যুদ্ধ শেষ হলে দেখলাম—আমাদের পাঁচশ সৈন্য অবশিষ্ট; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃতদের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম! যাও।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিম্মান্ত হইলেন

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাণা রাজসিংহের বিহস্বাটী।

কাল—অপরাহ্ন।

উচ্চ আসনে রাণা রাজসিংহ। সম্মুখে শিশুহস্তে যশোবন্তসিংহের রাণী মহামায়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। দক্ষিণে দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও কাশিম রাণী। রাণা! আমার এই শিশুকে

আপনার দুর্গে স্থান দিউন, বেশী দিনের জন্য নয়, রাণা! কিছুদিনের জন্য!

রাজসিংহ। মহামায়া, তোমার পুত্র আমার পর নয়। এর জন্য মিনতির প্রয়োজন কি?—দুর্গাদাস! ঔরঞ্জীব কি এরও প্রণবধ কর্তে চান?

দুর্গা। নইলে আর কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে মহারাণা?

রাণী। রাণা! এক পুত্র আর এক কন্যা—শুদ্ধ এই সম্পত্তি নিয়ে সেদিন মাড়বার গেঁকে বেরিইছিলাম। পথে কন্যাটি হারিইছি। আমার সম্পত্তির অবশিষ্ট মাত্র আছে এই সদ্যোজাত পুত্রটি।—আমার এই শেষ, একমাত্র, সর্বস্বধন পুত্রটিকে রক্ষা করুন রাণা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল কর্বেন।

রাজ। তোমার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই মহামায়া। আমি তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ব।

রাণী। রাণার জয় হোক।

রাজসিংহ কাশিমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কে?”

দুর্গা। এ কাশিমউল্লা। আমাদের পুরাতন বন্ধু। এ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমার প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করেছে।

কাশিম। রাণা! মূই এঁদের পুরানো চাকর। মহারাণা একবার মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মূই সেই থেকে এঁদেরই ঘরে খায়ে মানুষ।

রাজ। দুর্গাদাস! মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্মায়।

কাশিম। মহারাণা, মোদের জাতের নিন্দা করো না মোরা জাত খারাপ নই! মোরা সব হ'তি পারি। নেমকহারাম নই।

রাজ। না কাশিম! তোমার জাতির নিন্দা করিছ না। তবে বাদশাহের সঙ্গে তোমার তুলনা করিছ। বাদশাহ এই ছোট ছেলের প্রাণ নিতে চান—আর তুমি—

কাশিম। আহা দেখ দেখি। আহা এই চ্যাংড়া; এখনো চোখ ফুটেনি।—আহা বাছা

মোর শীতে রন্দুরে বড় দুস্কু পেয়েছে। বাছা মোর!—হুঁ—এখন পুট পুট কোরে তাকানো হচ্ছে। আহা চোখ ত নয়—লীল পদ্দ।

রাজ। ঔরঞ্জীব! তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসে এক নিরীহ শিশুকে হত্যা করবার জন্য ব্যগ্র: আর তোমারই জাতের এই কাশিম তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্তে প্রস্তুত!—ঈশ্বরের চক্ষে কে বড় ঔরঞ্জীব?

রাণী। রাণা! আমি এই বিরাট অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো!—এর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই সেদিন অন্যান্য নারীদের সঙ্গে পুড়ে মরিনি। তার জন্যই এখনও বেঁচে আছি।—আপনি কেবল এই শিশুকে রক্ষা করুন।

রাজ। আমি বলেছি, এর জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া। তুমি আর তোমার পুত্র এখানে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস কর।

রাণী। না রাণা! আমি এখানে বাস কর্বো না। আমাব এ ঘর নয়। আমি আমার মৃত স্বামীর রাজ্যে ফিরে যাবো। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে বিগ্রহে, জীবনে মরণে, স্বামীর ঘরই নারীর ঘর, পিতৃগৃহ পর। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো।

রাজ। কিন্তু সে স্থান ত এখন তোমাব পক্ষে নিরাপদ হবে না মা!

রাণী। নিরাপদ! আমি কি এখানে নিরাপদ খুঁজতে এসেছি? না রাণা, আমি আর নিরাপদ খুঁজি না। আমি আপদ খুঁজি। আপদের ক্রোড়ে আমি লালিত—ভূমিকম্পে আমার জন্ম, ঝঞ্জায় আমার আবাস, প্রলয় মেঘে আমার শয্যা।—বিপদ! তার সঙ্গে ত সই পাতিয়েছি রাণা। আমার বিপদ!—বিধবা পুত্র-হারা, হতসর্বস্বা পথের ভিখারিণী আমি!—আমার আবার বিপদ!—রাণা আমার একমাত্র বিপদ অবশিষ্ট আছে—সে এই শিশুর হত্যা। তাকে রক্ষা করুন, রাণা! আর কিছু চাই না, তাকে রক্ষা করুন। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো! আগুন জ্বালবো—আগুন জ্বালবো। এমন আগুন জ্বালবো—যাতে ঔরঞ্জীব ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
কাল—সন্ধ্যা।

ঔরঞ্জীবের পৌত্রী ও আকবরের কন্যা রাজিয়া
একাকিনী সে উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া
গাহিতোছিলেন

কোথা যাও হে দিনমাণ,

আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।

যখন নিয়ে গেলে চলে' তোমার সর্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে আঁধার ছেয়ে আসে যবে?
—চাহে যে সে থাকুক পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে, সিন্ধুনীরে, আশা ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক তা'রা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরমসুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি;
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

গুলনেয়ার প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকি-
লেন—“রাজিয়া।”

রাজিয়া। কি ঠান্দি?

গুল। এখানে একা একা—কি করিছ'সু?

রাজিয়া। গান গাচ্ছি! দেখ ঠান্দি!—
আকাশে বর্ণের কি খেলা! ঠান্দি এই
আকাশটা যদি একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার হোত,
বেশ হোত, না?

গুল। বেশ হোত? তা' হলে প্রাণ ওষ্ঠা-
গত হোত। একটা কথা কইবার অবসর পেতাম
না।

রাজিয়া। কথা!—কথার জ্বালায় ত
অস্থির, ঠান্দি! তা'র উপরে বড় বোঝা যায়!
একটা কথা ব'লেই তা'র পিছনে অর্মানি একটা
মানে।—অস্থির! দু'পা এগিয়ে যাবার যো
নাই।—সঙ্গে সঙ্গে মানে ঘুচ্ছে।

গুল। আর গান?

রাজিয়া। মানে ধর্ম্মীর ছোঁবার যো' নাই।
কেবল একটা উদাস ভাব মনে এনে দেয়।
বোঝবার যো' নাই। এই যেমন 'চামেলিয়া
বেলা চম্পা।'—এর মানে বেশ বোঝা যায়—কি
না তিনটে ফুল—চামেলিয়া, বেলা আর চম্পা।
কিন্তু [হাসিম্বরে সুর করিয়া] 'চামেলিয়া বেলা
চম্পা'—ধর দিখনি মানে!

গুল। তা' বটে—ওর মানে ধর্ম্মীর যো'
নাই। ভারি সুন্দর!

রাজিয়া। না, ঠান্দি! তুমি গান কিছ

ভালবাসো না, তা' আমি জানি। কিন্তু আমি
গানে ডুবে আছি, মজে' আছি, বিভোর হয়ে
আছি। [সুরে গুন্-গুন্ করিতে লাগিলেন]
—“চামেলিয়া বেলা চম্পা।”

গুল। রাজিয়া, তুই গান শিখোঁছিলি কার
কাছে?

রাজিয়া। বাবার ওস্তাদের কাছে। বাবা
গান বড় ভালবাসেন। বাবা নিজে একটা গান
তৈয়ার করে'ছেন। ওস্তাদজি সুর দিয়ে দিয়ে-
ছেন। এই আমি একটা তাঁরই গান গাচ্ছিলাম;
—রাগিনী পুরবী; ভারি মিষ্টি রাগিনী!
[পুরবী সুরে] “তা রি না তোম তোম তোম
না দেরে তোম”—উঃ কি মিষ্টি!

গুল। মোরোস্বার চেয়ে?

রাজিয়া। ঠান্দি! তুমি একেবারে একটা
জন্তু! একটা গাধার মধ্যে যতটুকু সুর-জ্ঞান
আছে—তাও তোমার নেই।—আচ্ছা—ঠান্দি,
এই গাধাগুলো কি বিস্তী ডাকে! নীচেকার
গাধার থেকে একেবারে উপরকার কোমল
রেখাব।

গুল। তা' হবে।

রাজিয়া। আচ্ছা, ঠান্দি, কোকিলের স্বর
এত মিষ্টি, আর কাকের স্বর ককর্শ কেন?—
আমার বোধ হয় কোকিলের স্বর থেকে গানের
সৃষ্টি হ'য়েছিল। সা, রে, গা, মা, পা—ঠিক
কোকিলের স্বর।—শোন—কু, কু, কু, কু, কু—
ঠিক কোকিল স্বর।

গুল। তোদের বাংলাদেশে খুব গানের
চর্চা হয় ব'ঝি?

রাজিয়া। তা' হয়। তবে তা'রা কীর্তন
গায় বেশী। আমি একটা একটু শিখি'ছিলাম
—শুনবে? শোন—

ব'ধূয়া আর কি কহিব আমি!

জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের
ফাঁসি,
মন প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইন্দু দাসী।
একলে ওকলে দুকলে গোকলে

কে আর আমার আছে,
রাধা বলে আর শূন্যহাতে নাম

দাঁড়াতে আমার কাছে।—

তার পরটা জানি না।—বেশ!—না?—
আচ্ছা, ঠান্দি; ঠাকুর্দা গানের উপর এত চটা

কেন? তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ একটা তান ধরিছি—ত আমার দিকে চেয়ে বলেন, “এ্যাঁ”;—আর ঘাড় নাড়েন।

গদুল। তোর ঠাকুন্দা তোকে খুব ভালো-বাসেন?

রাজিয়া। উঃ! কি ভালোই বাসেন! [সদর করিয়া] “বংধুয়া—” তোমাকে বাসেন?

গদুল। আমায়?—তোর ঠাকুন্দাকে এক-বার জিজ্ঞাসা করে’ দেখিস্।

রাজিয়া। [সদর করিয়া] “কি আর কহিব আমি—” তুমি যা কণ্ঠে বল তাই ক’বন?

গদুল। করেন? দেখেছিস না যে আমার জন্যে একটা যুদ্ধই বাধলো।

রাজিয়া। যুদ্ধ!—যুদ্ধ করে’ বলে, ঠান্দি!

গদুল। লড়াই।

রাজিয়া। ওঃ!—এ একখানা তরোয়াল নেয়, ও একখানি তরোয়াল নেয়। তার পরে দু’জনে বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে, আর ঘোরে—আমি দেখেছি বাংলাদেশে। যুদ্ধ কার সঙ্গে হবে, ঠান্দি।

গদুল। মেবারের সঙ্গে।

রাজিয়া। মেবার পুরুষ মানুষ, না মেয়ে মানুষ?

গদুল। দূর হাবা মেয়ে!—মেবার একটা দেশ!

রাজিয়া। বাবা! একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।—কেন, ঠান্দি, যুদ্ধ হবে কেন?

গদুল। এক রাণীকে ধরে’ নিয়ে আসবার জন্য।

রাজিয়া। তুমি বড়ি তাকে তাই বলেছো?

গদুল। হাঁ।

রাজিয়া। ধরে’ নিয়ে এসে কি ক’র্বে?

তাকে ভালোবাসবে?

গদুল! তার শ্রাম্ব ক’র্বে।

রাজিয়া। বেঁচে থাকতে থাকতেই? আমি ত শুনোছি মরে’ গেলেই শ্রাম্ব হয়—ঐ যে ঠাকুন্দা আর বাবা আসছেন।—দেখবে মজা।

ঔরঞ্জীব ও আকবর প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া কীর্তন ধরিল

“বংধুয়া”

ঔরঞ্জীব। এ্যাঁ—রাজিয়া!—আবার!

রাজিয়া। ঐ শোন—হাঃ হাঃ হাঃ—

[হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল।

ঔরঞ্জীব। আকবর! তোমাকে বংগদেশে পাঠাইছিলাম—শাসন করা শেখবার জন্য। তা’ তুমি দেখছি নৃত্য-গীতেই কাল হরণ করেছো। আর এই মেয়েটাকে পর্যন্ত গান শিখিয়েছো!—এত অপদার্থ তুমি, তা’ জান্তাম না।

গদুল। সত্য কথা। মেয়েটার গান ভিন্ন আর কথা নেই। দিবারাত্রিই গুণ-গুণ ক’র্ছে। জ্বালাতন!

ঔরঞ্জীব। ওর পরকাল খেয়েছো। সে যাক্ সে বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন আকবর, তুমি মেবারে যুদ্ধে যাও। আমি তোমার অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি। মেবার আক্রমণ কর।

আকবর। যে আজ্ঞা।

ঔরঞ্জীব। আমি শুনোছি, তুমি অত্যন্ত অলস, বিলাসী, আর সম্ভোগপ্রিয় হ’য়েছো। জীবনের কঠোরতা কিছু শিখা করা তোমার দরকার। মেবার যুদ্ধে যাবার জন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাইনি, তোমার সংস্কারের জন্য তোমার প্রধানতঃ ডেকে পাঠাইছি। যাও প্রস্তুত হওগে। সেনাপতি দিলীর খাঁকে তোমার সাহায্যে পাঠাচ্ছি। আর আমি আর আজীবম দোবারীতে গিয়ে তোমাদের জয়ের প্রতীক্ষা ক’র্বে।—যাও।

[আকবর নীরবে প্রস্থান করিলেন।

ঔরঞ্জীব। গদুলেনয়ার! তোমার অনুরোধে আজ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি।

গদুল। প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—একটা সামান্য জনপদ মেবারের সঙ্গে যুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—আমি ত জানি, ভারতসম্রাট্ ঔরঞ্জীবের কাছে এ একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

ঔরঞ্জীব। তা’ নয়, সম্রাজ্ঞী! যে দিন আড়াই শ’ রাজপুত্র সৈন্য ৫০০০ মোগল-

সৈন্যকে মর্ষিত করে' চলে' গিয়েছে, সেই দিন জেনেছি যে, রাজপুত্র জাতি একটা অসম-সাহসিক জাতি। আমি তাই এ যুদ্ধে বঙ্গদেশ হ'তে যুবরাজ আকবর আর কাবুল হ'তে কুমার আজীমকে ডেকে পাঠাইছিলাম।—মেবার জয় নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

গুল। আমি মেবার জয় চাই না। আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই।—আর কিছ্ নয়। তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ চাই।

ঔরঞ্জীব। এবার সাক্ষাৎ হবে।—ভিতরে চল, গুলনেয়ার! বৃষ্টি প'ড়ছে।—

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আবদুর গিরিদুর্গ। কাল—স্বপ্রহর দিবা।
দুর্গাদাস ও রাঠোর সামন্তস্বয়—মুকুন্দ ও শিব
দণ্ডায়মান

দুর্গাদাস। শিবসিং, মুকুন্দসিং! রাণীর পত্রকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যাচ্ছি। এ আবাসস্থানের অস্তিত্বমাত্র যেন প্রকাশ না হয়।

উভয়ে। তা' হবে না, সেনাপতি!

দুর্গাদাস। সম্রাট্ সৈন্যে মেবার আক্রমণ করে'ছেন। কুমারকে আর উদয়পুরে রাখা শ্রেয় নয় বলেই রাণীর উপদেশক্রমে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুকুন্দ। সম্রাট্ মেবার আক্রমণ করে'ছেন কেন?

দুর্গাদাস। সেখানে ষোড়শপুরের রাণী ও রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়াই তার প্রধান কারণ। তবে আর এক কথা শুনো'ছি যে, ঔরঞ্জীবের অত্যাচারের, বিশেষতঃ হিন্দুর উপর এই জিজিয়া করার প্রতিবাদ করে' রাণা যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রই এর কারণ। কিন্তু সেটা একটা ওজর মাত্র। সে পত্র সতেজ, নির্ভীক বটে; কিন্তু সে অতি নম্র, সরল। তাতে সম্রাটের ক্রোধ হবার কোন কারণ ছিল না। আমি সে পত্র দেখেছি।

শিব। আপনি এই যুদ্ধে যাচ্ছেন?

দুর্গাদাস। আমার প্রভুকে আশ্রয় দেবার জন্যই এ যুদ্ধ। আমি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকলে চলে না, শিব। তোমরা এ দুর্গে

থাকবে। এখান থেকে এক পা ন'ড়বে না। এ দুর্গ খুব নিভৃত, খুব গুপ্ত, খুব নিরাপদ। তবে এই দুর্গ পাহারা দিবার জন্য ১০০ সৈন্য রহিল। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা মাত্র দেখ, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

মুকুন্দ। সম্রাট্ কি মেবার আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছেন?

দুর্গাদাস। হাঁ। তাঁর সৈন্য পঙ্গপালের মত মেবার রাজ্য ছেয়েছে। চিতোর, মণ্ডলগড়, মন্দশূর ও জীড়ন দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হ'য়েছে। রাণা তাঁর সৈন্য সব পার্শ্বত্যা প্রদেশে টেনে এনেছেন।

শিব। আমাদের মহারাণী কোথায়?

দুর্গাদাস। মাড়বারে। তিনি ১০০০০ মাড়বার সৈন্য—সৈন্যাধ্যক্ষ গোপীনাথের অধীনে মেবারে পাঠিয়েছেন। নিজে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে' নিয়ে আসছেন!—আচ্ছা যাও, তোমরা আহা'রাদি করগে যাও।

[মুকুন্দ ও শিব প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস। আজ মৃষ্টিমেষ রাজপুত্রসৈন্য নিয়ে বিরাট মোগলসৈন্যসমুদ্রে নাম'ছি। ঈশ্বর জানেন এর পরিণাম কি! এক আশা যে, মিলিত মাড়বার আর মেবার আজ প্রাণ তুচ্ছ করে' এ সমরে নাম'ছে। এই মাত্র আশা। দিগন্তব্যাপী ঘনীভূত মেঘসঙ্ঘে—এই মাত্র জ্যোতির ক্ষীণ রেখা।—যদি একবার এই সঙ্গে মারাঠা শক্তির সাহায্য পেতাম! এই বিচ্ছিন্ন হিন্দু শক্তিকে যদি একবার একত্রিত কর্তে পার্তাম।—কি অদ্ভূত জাতি। ৩০ বৎসরে একটা জাতির সৃষ্টি হ'য়ে গেল!

এই সময়ে সেখানে কাশিম প্রবেশ করিল

দুর্গাদাস। কি কাশিম! রাজকুমার কোথায়?

কাশিম। এতক্ষণ মোর সাথে খেলা করি'ল। এই ঘুমায়ে প'ল! তাকে আশ্রয় কাছে রাইখে আলাম। ম'ই নাবো না খাবো না?

দুর্গাদাস। হাঁ! যাও, স্নানাদি করগে যাও—বেলা হ'য়েছে।

কাশিম। আর—তুমি—নাবা না, খাবা না?

দুর্গাদাস। না, আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।

কাশিম। ঐ ত আপনার দোষ। নৈলে
ত আপনি নোক খারাপ নও। ঐ ত
দোষ!

দুর্গাদাস। হাঁ, ঐ আমার দোষ।

কাশিম। মোর ইস্তিরিরও ঐ রকম ছিল।
আজ কাসি, কাল জ্বর, পরদিন শূলবেদনা।
মোর ওরকম নয়। জ্বরে পলাম ত পলাম!
নৈলে ত খাসা আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি—কোন
ন্যাঠাই নেই।

দুর্গাদাস। তোমার স্ত্রীর কিসে মৃত্যু হয়
কাশিম?

কাশিম। আরে! কে জানে! এক দিন ঘুম
থেকে উঠে দেখি মরে' রয়েছে। হাকিম বল্ল যে
বৃকের ব্যামো।

দুর্গাদাস। আর তোমার ছেলে?

কাশিম। মোর পুত্রের কতা কৈবান না,
হুজুর। টুকটুকে ছাওয়াল! হেঁটে যাতো,
যেন আদারির মন্দে দিয়ে একটা পিরদিম
চলি' যাচ্ছে। কতা কৈত, যেন বাঁশি বাজতো।
হাসতো, যেন নদীর কিনারায় ছাপিয়ে ঢেউ
উঠতো।—ঠিক এই মোদের রাজপুত্রের
মত। তবে রংএর এত জেদলা ছিল না। আহা!
মুই এক দিন কাম করে' বাড়ী ফিরে এসে
দ্যাখি বাছা মোর শূয়ে পড়ে' রয়েছে। বাছার
রং একেবারে কালীবরণ। পুছ কল্লাম কি
হয়েছে? জবাব নেই। চাচীকে ডাকলাম, চাচী
কাঁদতে লাগল! হাকিম ডাকলাম, হাকিম
মাতা নেড়ে চলে' গেল।

দুর্গাদাস। কি হয়েছিল?

কাশিম। —“আরে সেইটেই ত মুই কইতে
নারলাম। তার পরে দ্যাশে একরকম জ্বর
এলো; তার নাম কালাজ্বর। ধড়ধড় মানুষ
মর্ন্তি নাগলো। ভাগ্যর দোষে মুই মলাম না।”
—এই বলিয়া কাশিম চক্ষু মুছিল।

দুর্গাদাস। সংসারের এই নিয়ম, কাশিম!
—তুমি কি ক'র্বে?—যাও—এখন স্নান
করগে।

কাশিম। এই যাই।—

[বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

দুর্গাদাস। এই কাশিমের সঙে দুদন্দ
কথা কইলে মন পবিত্র হয়, সরলপথে চলা
সহজ হয়, ঈশ্বরে ভক্তি বাড়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জয়সিংহের স্ত্রী কমলার শয়ন-কক্ষের
প্রাঙ্গণ। কাল—রাতি।

কমলা দেওয়ালে হেলিয়া উপবিষ্ট। তাহার মুখে
জ্যোৎস্নালোক আসিয়া পড়িয়াছিল; অদূরে কমলার
মুখে নিবন্ধদৃষ্টি, করতলন্যস্ত, বামপার্শ্বোপরি
অন্ধশয়ান জয়সিংহ

জয়সিংহ। কি সুন্দর রাতি, কমলা।

কমলা। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি
সুন্দর—নাও, তিন সত্যি কল্লাম।

জয়সিংহ। প্রিয়ে!

কমলা। [ভেংচাইয়া] নাথ! প্রাণেশ্বর!

জয়সিংহ। না, আমার কিছু বক্তব্য নাই!
তুমি অমনি ভাবে বসে' থাকো, আমি তোমার
সৌন্দর্য্য পান করি।

কমলা। দেখো যেন একচুমুকে শেষ করে'
দিও না; আমার জন্যও একটু রেখো।

জয়সিংহ। কমলা! সৌন্দর্য্য কি সুরা।
নাহিলে দেখতে দেখতে এ মাদকতা আসে
কোথা থেকে? অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে কেন?
চক্ষু মুদে আসে কেন?

কমলা। তোমার ঐ রকম হয় বৃঝি!—
আমার ত ঠিক বিপরীত। তোমাকে দেখলেই
আমার নেশা ছুটে যায়।

জয়সিংহ। তবে তুমি আমায় ভালোবাসো
না।

কমলা। [কটাক্ষ করিয়া] বাসি না?—
আচ্ছা বেশ বাসি না।

জয়সিংহ। বাসো বোধ হয়। কিন্তু আমি
তোমায় যেমন বাসি?—দেহের প্রত্যেক লোম-
কূপ দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে,
প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে,—ইহকাল দিয়ে,
পরকাল দিয়ে—সেই রকম ভালোবাসো?

কমলা। হাঁ, বাসি! তবে অতগুলো
সংস্কৃত কথা দিয়ে ভালোবাসি না।

জয়সিংহ। না, কমলা! ততখানি প্রাণ
তোমার নেই।

কমলা। তা' না থাকুক। কিন্তু তোমার
নাকে দাঁড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি ত!

জয়সিংহ। তা' ঘোরাচ্ছি। তোমাকে বিয়ে
করে' অর্থাৎ, প্রিয়ে, আমি সংসারটাকে একটা
যেন নতুন ভাবে দেখছি।

কমলা। কেমন!—দেখ্ছো কি না?

জয়সিংহ। দেখ্ছি।—যেন একটা অশ্রান্ত ঝঞ্জার,—যেন একটা অনন্ত বিশ্রাস্তি, যেন একটা অসীম মোহ;—অর্দ্ধ সূঁপ, অর্দ্ধ জাগরণ।

কমলা। যেমন আঁপং খেলে হয়, না? আমার ঠান্দির মুখে শুনোছি।

জয়সিংহ। কি রকম, আমি বোঝাতে পারি না—যেন একটা আকাঙ্ক্ষা, অথচ কিসের বোঝা যায় না। হাসি অধরে বিকসিত হয়, অথচ দেখা যায় না। যেন গানের মূর্ছনা, উপরে উঠে মিলিয়ে যায়। কি রকম একটা অবাধ স্নেহস্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য, অনন্ত তৃপ্তি।

কমলা। কেমন? প্রথম পক্ষে এ রকম হয়েছিল?—ঐ যে বলতে না বলতে প্রথম পক্ষ এসে হাজির!

এই সময়ে সরস্বতী সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন—

“এখানে প্রভু! আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!”

জয়সিংহ। কেন সরস্বতী?

কমলা। তবে তুমি এখন প্রথম পক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কর—আমি আসি।

[এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়সিংহ। না, যেও না—শোন!—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সরস্বতী। আমি তোমার মুখে বাধা দিতে আসিনি, নাথ!—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি এই উচিত প্রশ্ন, নাথ? যাক্ সে কথা। এখন তোমার আদর কাড়াবার জন্য আমি আসিনি—যদিও তার উপর কমলারই মত আমারও দাবী আছে।—যাক্ যা' গিয়েছে, তা' গিয়েছে।

জয়সিংহ। কি প্রয়োজন?

সরস্বতী। বড় ব্যস্ত হয়েছো? তবে শোন! মোগল মেবার আক্রমণ করেছে, শুনোছো?

জয়সিংহ। না।

সরস্বতী। তোমার পিতা তবে তোমাকে সে সংবাদ দেওয়া দরকার বিবেচনা করেন নি।

জয়সিংহ। বৃন্দ্রিক কাজ করেছেন।

সরস্বতী। তিনি এই যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যোধপুত্র থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জয়সিংহ। তার পর?

সরস্বতী। শূনে লজ্জা হোল না? তুমি ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, মেবারের ভাবী রাণা। রাণা তোমাকে মেবার আক্রমণের সংবাদও দিলেন না। আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সূদূর যোধপুত্র থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতে কি প্রমাণ হয়, প্রভু?

জয়সিংহ। কি প্রমাণ হয়?

সরস্বতী। এতে এই প্রমাণ হয় রাণা তোমাকে কাপুত্র মনে করেন। যোধপুত্র থেকে দুর্গাদাস, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর বীর গোপীনাথ—সকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা এখন রাণার মন্ত্রণাকক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা—তুমি বিলাসকুঞ্জে বসে' প্রেমের স্বপ্ন দেখ্ছো! শূনে লজ্জা হ'চ্ছে না? শোণিত উষ্ণ হ'চ্ছে না? নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না?—কি! চূপ করে' রৈলে যে?

জয়সিংহ। সব বুদ্ধিতে পাচ্ছি। কিন্তু সরস্বতী!—কে যেন আমার সমস্ত উদ্যম ভেঙ্গে দিয়েছে; আমাকে নারীরও অধম করেছে।

সরস্বতী। তা' যদি বুদ্ধি থাকে, তবে এখনো আশা আছে। নাথ! কমলাকে ভালো-বাসো। সে-ও তোমার অনর্চিত নয়।—কিন্তু যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু স্বেচ্ছা, যখন কঠোর কর্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরসুধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়!

জয়সিংহ। সত্য কথা। সরস্বতী! তুমি চিরদিন সত্য, উচিত, সঙ্গত কথা বল—কিন্তু শূনে চাই না। কর্তব্যপথ বৃদ্ধি, কিন্তু সে পথে চলতে পারি না।

সরস্বতী। যদি কর্তব্যপথ বুদ্ধি থাকে নাথ, তবে ওঠো! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস—পুত্রাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলো দেখি নাথ! দেখবে কর্তব্য সহজ হবে। একবার কর্তব্যকে আমার বলে' ডাকো দেখি, তার পর সে তোমার হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘিরে রক্ষা করবে।

কর্তব্য যত কঠোর ভাব্ছ, সে তত কঠিন নয়! একবার সবলে, উদ্যমভরে, উঠে দাঁড়াও দেখি, নাথ!

জয়সিংহ। তুমি ঠিক বলেছো, সরস্বতী! উত্তম! দেখি একবার চেষ্টা করে'।—কি ক'র্তে বল, সরস্বতী!

সরস্বতী। এই ত আমার স্বামীর উপযুক্ত কথা। শোন তবে, নাথ! এসো বীরবেশ পর। তার পর যাও তোমার পিতার মন্ত্রণা কক্ষে। সেখানে গিয়ে তোমার পিতাকে বল, “আমাকে এ যুদ্ধে কেউ ডাকো নাই, আমি স্বয়ং এসেছি।” তোমার পিতা সগর্বে স্নেহে তোমাকে বীরপুত্র বলে' বক্ষে ধ'র্বেন; সমস্ত মেবার সাহস্কারে বল্বে—এই ত আমাদের ভাবী রাণা; সমস্ত রাজস্থান মাথা উ'চু করে' চেয়ে সে দৃশ্য দেখ্বে। সে কি গৌরবময় ম'হ'র্ষ!—নাথ! ধিকৃত হ'য়ে চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হ'য়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের।

জয়সিংহ। সরস্বতী! আমি এই ম'হ'র্ষেই যাচ্ছি।

সরস্বতী। হাঁ, এই ম'হ'র্ষেই চল। আমি স্বহস্তে তোমায় বীরবেশ পরিয়ে দিই! চল।

[জয়সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সরস্বতী। যাও, নাথ, এই যুদ্ধে। আমার গাঢ় স্নেহ তোমাকে অভেদ্য বশ্মের মত ঘিরে থাক্বে। শত্রুর তরবারি তোমাকে স্পর্শ ক'র্তে পার্বে না।

[সরস্বতী এই বলিয়া জয়সিংহের পশ্চাৎগামিণী হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর। রাণা রাজসিংহের মন্ত্রণা-কক্ষ
কাল—মধ্যরাত্র।

রাণা রাজসিংহ, মহারাণী মহামায়া, ও অন্যান্য
রাজপুত্র সামন্তগণ সমাসীন

বিক্রম সোল্যাক। আমরা সম্মুখ-যুদ্ধে
মোগলসৈন্য আক্রমণ ক'র্ষ।

রাজসিংহ। সেটা উচিত নয়। মৃত্ত ক্বেদ্রে
অসংখ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়ানো যুক্তি-
সঙ্গত নয়।

গোপীনাথ। আমি বলি অল্পসংখ্যক

সৈন্যের অনেকগুলি দল বাঁধা যাক। তা'রা
মোগলসৈন্যের গতি-পথ দূরূহ করুক।

রাজসিংহ। তুমি কি উপদেশ দাও,
গরিবদাস? তুমি এ পার্শ্বত্যা প্রদেশের প্রত্যেক
পথ, উপত্যকা, অরণ্যের সঙ্গে পরিচিত আছো।
—তোমার কি মত?

গরিব। আমি বলি—মোগলেরা এ
পার্শ্বত্যা পথে আসুক। আমরা কোন বাধা
দেবো না। কেবল কৌশলে তাদের সর্বাপেক্ষা
দূরূহ পথে টেনে আন্বো। সেখানে তাদের
সৈন্যসম্মিলন করা কঠিন হবে। তা'রা
পার্শ্বত্যাতে বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়লে, তাদের
আক্রমণ ক'র্ষ।

দুর্গাদাস। এ অতি উত্তম প্রস্তাব, রাণা!
গোপীনাথ। সে কথা মন্দ নয়।

বিক্রম। খুব ভালো! তা'রা সেখানে দল
বাঁধবার সুযোগ পাবে না।

রাজসিংহ। সকলেরই কি এই মত? তুমি
কি বল, মহামায়া?

রাণী। সকলের মতেই আমার মত। কিন্তু
সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নি?

রাজসিংহ। না, তিনি আর আজীবন
দোবারীতে। সম্রাটের পুত্র আকবর উদয়পুরে
আসছেন;—এই ত ঠিক সম্বাদ, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। হাঁ, মহারাণা। সম্রাট-সৈন্য
তিন ভাগে অবস্থিত—এক, আকবরের অধীনে
উদয়পুর-পথে; এক, দিলীর খাঁর অধীনে
দাসরূপীপথে; আর এক সম্রাটের অধীনে
দোবারীতে।

রাণী। আমি বলি—আমরা সসৈন্যে
সম্রাটকে আক্রমণ করি।

রাজসিংহ। না। তা' হলে আকবরের
অগণিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে আসতে হবে।
সেটা উচিত নয়। কি বল, দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। না, তা' উচিত নয়।

রাজসিংহ। তবে গরিবদাসের প্রস্তাবে
সকলেই সম্মত?

সকলে। হাঁ, সকলেই সম্মত।

রাজসিংহ। উত্তম! এখন এই মিলিত
সৈন্যের অধিনায়ক কা'কে করি?

গরিব। কেন, দুর্গাদাসকে।

রাজসিংহ। তাই সকলের মত?

রাণী ও দুর্গাদাস ব্যতীত সকলেই
কহিলেন—“নিশ্চয়ই।”

রাজসিংহ। তবে দুর্গাদাস! তোমাকে এই
মিলিত রাজপুত্রসৈন্যের সেনাপতিরূপে বরণ
ক'লাম।

দুর্গাদাস। আমি সে সম্মান গ্রহণ ক'লাম,
রাণা! এই যে কুমার ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ আসিয়া রাণার চরণ বন্দনা করিলেন ও
অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিলেন

রাজসিংহ। এসো, বৎস—তোমাকে বৃষ্টি
'এসো' বল্‌বারও আমার অধিকার নাই।

ভীম। কেন পিতা!

রাজা। আমি তোমাকে নিষ্ৰাসিত করেছি।

ভীম। না, পিতা, আমি স্বেচ্ছায়
নিষ্ৰাসিত হ'য়েছি।

রাজসিংহ। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ
নাই, ভীমসিংহ?

ভীম। আপনার প্রতি ক্রোধ! আপনার
ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্তে আমি প্রাণ দিতে পারি।
ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষা কৰ্ণার
জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। আমি ক্ষুদ্র নর।
কিন্তু আমি সেই ক্ষত্রিয় বলে' আপনাকে
পরিচয় দিই।

রাণী। তোমাকে আজ তোমার পিতা
ডেকেছেন—তোমার জন্মভূমি রক্ষার জন্য।

ভীম। সে আমার গোরবের কথা,
মহারাণী!

বিক্রম। তোমার জন্মভূমিকে ভোলোনি,
ভীমসিংহ?

ভীম। জন্মভূমিকে ভুল'বো?—বিক্রমসিং!
এ কয় বৎসর, আহারে, বিহারে, জাগতে,
নিদ্রায়, এই কঠিন পৰ্ব্বতসঙ্কুল ধূমধূসর
মেবারভূমি সৰ্ব্বদাই আমার চক্ষে ভাস্তো।
আজ সেখানে ফিরে আস্তে, সেই চির-
পরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা,
দেখতে পেলাম, আর আমার চক্ষু জলে ভরে'
এলো; আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

রাণী। [স্বগত] রাণা রাজসিংহের অবি-
কল প্রতিচ্ছবি!

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন

রাজসিংহ। কে? জয়সিংহ!

জয়। হাঁ, পিতা, আমি! পিতা আমায় এ

যুদ্ধে ডাকেন নি।—আমি নিজে এসেছি।

রাণা রাজসিংহ অতি বিস্মিতভাবে ক্ষণেক
জয়সিংহের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে
কহিলেন—“সত্যকথা, জয়সিংহ? স্থিরচিন্তে
এ কথা বল্‌ছো?”

জয়। হাঁ, পিতা! মেবার বিপন্ন; আমি
মেবারের ভাবী রাণা;—এ সময় আমার নিশ্চিন্ত
ভাবে থাকা শোভা পায় না।

ভীম। দীর্ঘজীবী হও, ভাই! এই ত
তোমার উপযুক্ত কথা।

রাজসিংহ। ভীমসিংহকে প্রণাম কর জয়-
সিং।

জয়সিংহ ভীমসিংহকে প্রণাম করিলেন। ভীম-
সিংহ তাঁহাতে আলিঙ্গন করিলেন

রাজসিংহ। দুর্গাদাস! আমার এই পুত্র-
দ্বয়কে তোমার অধীনে দিলাম।

দুর্গাদাস। এ আমার মহৎ সম্মান, রাণা!
রাজসিংহ। তবে আজ সভাভঙ্গ হ'ল।

তোমরা সকলে যাও।—যাও, রাণী, অন্তঃপুরে
যাও।

রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ভিন্ন আর সকলে
প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে
রাজসিংহ মৃদুস্বরে ডাকিলেন

“ভীম!”

ভীম। পিতা!

রাজসিংহ নীরব রহিলেন

ভীম। বৃঝেছি, পিতা! আমি সে প্রতিজ্ঞা
ভুলি নাই। আমি এই মৃদুস্বরেই মেবার পরি-
ত্যাগ ক'র্ছি। তবে আসি, পিতা! আসি ভাই!

ভীম যথাক্রমে রাজসিংহকে ও জয়সিংহকে প্রণাম
ও আশীর্বাদ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

রাজসিংহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন—পরে
জয়সিংহকে কহিলেন—“জয়সিংহ—পারো যদি
তোমার এই ভাইয়ের উপযুক্ত হও।—যাও,—
বৎস, শয়ন করগে।”

জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ
কহিলেন—“ভীম! ভীম! আর আমার ভূমি
ভালবাসো না। জন্মভূমির কথা বল্‌তে
বল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। আর
আমার প্রাপ্য এক শব্দক প্রণাম—নিজ দোষে
কি পুত্রই হারিয়েছি!”

[—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—শম্ভুজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—প্রভাত।
শম্ভুজীর স্ত্রী রমা ও পরিচারিকা মদুখোমুখী
হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন

রমা। অসম্ভব! আমার স্বামীই তাঁর
পিতাকে হত্যা করেছেন। দাসী! তুই কি
বল্ছিছিস্?

পরি। কি বল্ছি? যা বলবার তাই
বল্ছি। কেন? তোমার সোয়ামী কি একেবারে
ধর্মপুত্রের যুধিষ্ঠির যে বাপকে মেরে
ফেলতে পারেন না?

রমা। কি বল্ছিছিস্। জানিস? পিতৃহত্যা।
জানিস?

পরি। তাই কি? সহর শম্ভু লোক টের
পেলো, আর বাড়ী বসে' তুমি টের পেলো না!

রমা। এ্যাঁ!

পরি। কি গা? একেবারে আকাশ থেকে
পড়লে যে। শোন, তোমার শ্বশুর—বাবা!
পিরিথম শম্ভু লোক যারে মান্য কর্ত।—
তোমার গুণধর সোয়ামী আবার রাতে কেপ্লার
বাইরে গিইছিল। রাজা সে রাত তাকে কেপ্লার
চুকতে দেয় নি। সেই রাগে তোমার সোয়ামী
তারে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

রমা। আমি বিশ্বাস করি না।

পরি। করো না ত করো না, মোর ত সেই-
জন্যে ঘুম হচ্ছে না। মূই বলে খালাস।—
হ্যাঁ।”

[—বলিয়া চলিয়া গেল।

রমা। ভগবান! রক্ষা কর। এ কথা যেন
সত্য না হয়। এ কথা সত্য জানবার আগে যেন
আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়।

শম্ভুজী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—“রমা!”

রমা। নাথ! বল একথা সত্য নয়। শম্ভু
বল। আমি বিশ্বাস কর্ব। বল এ কথা মিথ্যা।

শম্ভু। কি কথা রমা?

রমা। যে তোমার পিতাকে—

শম্ভু। আমি হত্যা করিছি কিনা?—যদি
করেই থাকি!

রমা। নাথ—

নেপথ্যে। মহারাজ! মহারাজ!

শম্ভু। ঐ কাব্লেস খাঁ ডাকছে। এখন
যাও রমা—আমি মারাঠার রাজা, আমার অনেক

কাজ আছে।—আমি এসেছিলাম শম্ভু তোমাকে
বলতে যে আমি সেতারায় যাচ্ছি। এই মদুখোমুখী
যেতে হবে। তোমার হাতে এ দুর্গের ভার
রইল। তুমি ত এখন মারাঠার রাণী। রাণীর
যোগ্য ব্যবহার কর্ব। আমি সপ্তাহকাল পরে
ফির্ব! এখন চললাম!

রমা। যেখানে যাও—যাও। শম্ভু বলে
যাও।

শম্ভু। চুপ—কোন প্রশ্ন কোরো না।

রমা। একটা মাত্র কথা—একটামাত্র! আর
কখন কিছু প্রশ্ন কর্ব না। একটামাত্র কথা—
বল এ কথা মিথ্যা—

শম্ভু। “এ কথা সত্য।”

[—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রমা “ভগবান!” বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রাজপুত্র-শিবির। কাল—প্রহরাধিক দিবা।
রাণা রাজসিংহ, মহারাণী ও রাজপুত্র সামন্তগণ
রাজসিংহ। গরিবদাস! শম্ভুর কোন
সংবাদ পাচ্ছি না কেন?

গরিব। একটা খবর ত পেয়েছি কাল।
বিক্রম সোলাঙ্ক দিলীর খাঁকে পরাস্ত
করেছে। এক সপ্তাহের জন্য কোন খবর
আসবার সময় হয় নি।

বিজয়। যুবরাজ জয়সিংহ শম্ভু সাহ-
জাদা আকবরকে সসৈন্যে উদয়পুরের গিরি-
পথে অবরুদ্ধ করেছেন।

গরিব। সাহজাদা তা হলে ঠিক আমাদের
পাতা কলে পড়েছেন।

বিজয়। শম্ভু ত সেই রকম।

রাজ। দুর্গাদাস একটা অসম সাহসিক
কাজ কর্তে গিয়েছেন।

গরিব। কি রকম রাণা?

রাজ। তিনি ৩০০০০ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং
সম্রাট ঔরঞ্জীবকে দোবারীতে আক্রমণ কর্তে
গিয়েছেন। সম্রাটের সৈন্য লক্ষাধিক হবে।

সুবল। রাণা! দুর্গাদাস এতদিন কোন
কার্যে নিষ্ফল হয় নি।

রাজ। কিন্তু সম্রাট সৈন্য রাজপুত্র সৈন্যের
প্রায় চতুর্গুণ।

গরিব। রাণা! সেদিন ২৫০ রাজপুত্র

সৈন্য নিয়ে দুর্গাদাস ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ করে' চলে এসেছিলেন।

রাজ। মোগলশক্তিকে তুচ্ছ কোরো না গরিবদাস! একদিন মিলিত রাজপুত্র সৈন্য মোগলসৈন্যের কাছে কাগার হৃদতীরে পরাজিত হয়েছিল।

গরিব। সেদিন গিয়েছে রাণা! মোগল আর সে মোগল নাই। আজ সে তার পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ভারে নুয়ে পড়েছে।

রাণী। ভীমসিংহের সম্বাদ কি রাণা?

রাজ। ভীমসিংহ ইন্দোর দুর্গ জয় করেছে। পরে—নগরের পর নগর জয় করে' স্মার্ট অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

রাণী। ধন্য ভীমসিংহ! রাণার উপযুক্ত পুত্র বটে!

রাজ। কিন্তু আমি কাল ভীমসিংহকে ফিরে আসতে আদেশ দিয়েছি।

গরিব। কেন রাণা?

রাজ। গুজ্জর থেকে পলায়িত অনেক গ্রামবাসী এসে আমার কাছে আবেদন করেছে। ভীমসিংহ গুজ্জর লুণ্ঠন কচ্ছে শূন্যে পাচ্ছি।

রাণী। মিথ্যা কথা রাণা—আমি ভীমসিংহকে জানি।

রাজ। সে যা হোক। গুজ্জরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আমি দিগ্বিজয় কর্তে বসি নি। আত্মরক্ষা কর্তে বসিছি।

রাণী। সে কি মহারাণা! আমরা যখন সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কর্তে বসিছি।

রাজ। না মহামায়া। বিনা বহুরক্তপাতে তা সিদ্ধ হবে না। যখন একটা শাসন সংস্থাপিত হয়েছে, তাকে ধ্বংস কর্তে চেষ্টা করা অন্যায়; বরং তাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তে চেষ্টা আমাদের করা উচিত।

রাণী। তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত? অত্যাচারকে প্রশ্রয়? বিজাতি শাসনকে রক্ষা? এই কি ক্ষত্রধর্ম?

রাজ। ক্ষত্রধর্ম কেবল বধ করার ধর্ম নয় মহামায়া! বধ করার বিদ্যা যে একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা তা আমার ধারণা নয়। আত্মরক্ষার্থে বা আত্মরক্ষার্থে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে বধ করার নাম হত্যা।

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন গরিব। এই যে জয়সিংহ! কি সম্বাদ জয়সিংহ?

জয়। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে পিতা। আকবর সৈন্যে আরাবালি গিরি-সঙ্কটে বন্দী। বেরোবার পথ নেই।

বিজয়। কেন? যে পথে প্রবেশ করেছিল? জয়সিংহ। সে পথ আমরা একদিনের মধ্যে বড় বড় গাছ কেটে, তাই দিয়ে বন্ধ করেছি।

গরিব। কি? সমস্ত মোগলসৈন্য তা হলে সেই উপত্যকায় বন্ধ?

জয়। হাঁ। তাদের খাদ্য নাই। আজ তিন দিন সমস্ত মোগলসৈন্য অনাহারে আছে।

সুবল। তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? তোমরা যে কাজ আরম্ভ করেছো অনাহার সে কাজ শেষ করুক। তারা এখন অনশনে মরুক।

রাজ। কি? স্মার্টপুত্র সৈন্যে না খেয়ে মর্বে?

সুবল। তন্মিহ্ন আর উপায় কি?

রাজ। না খেয়ে! না এ হতে পারে না। জয়সিংহ! তুমি যাও। পথ খুলে দাও।—খাদ্য নিয়ে যাও।

সুবল। বলেন কি মহারাণা!

রাজ। না সুবলদাস! এতগুলো প্রাণী না খেয়ে মর্বে? উপবাসে হত্যা করা ক্ষত্রধর্ম নয়। আকবর যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত তাঁকে ছেড়ে দাও। শূন্য ছেড়ে দাও নয়—তাঁর আর তাঁর সৈন্যের আহারের ব্যবস্থা কর। যাও—রাজহস্তী বোঝাই করে খাদ্য নিয়ে যাও জয়সিংহ!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সম্মিলিত কানন; মোগল শিবির।
কাল—অপরাহ্ন।

স্মার্ট, ঔরঞ্জীব উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান।
সম্মুখে দিলীর খাঁ ও স্মার্টপুত্র আজীব। পার্শ্বে
শ্যামসিংহ

ঔরং। কি দিলীর খাঁ তুমিও যুদ্ধে হেরে এসেছো?

দিলীর। হাঁ, জনাব। শূন্য হেরে আসিনি। সর্বস্ব হারিয়ে এসেছি।

ঔরং। আর কুমার আকবর?

দিলীর। তাঁর বিষয়ে যা শুনোছি তা বিশেষ শূভ নয়। তিনি আরাবালি গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের হস্তে বন্দী!

ঔরং। বন্দী!—আকবর—ভারতের ভাবী সম্রাট রাজপুত্রের হাতে বন্দী!—এবার মোগলের অবমাননার মাত্রা পূর্ণ হোল।

আজমী। [স্বগত] কি? ভারতের ভাবী সম্রাট আকবর!

দিলীর। এখন জাঁহাপনার নিজের সম্বাদ কি?—জাঁহাপনা দোবারী ছেড়ে যে চিতোরের দুর্গমূলে আশ্রয় নিয়েছেন!

ঔরং। দিলীর খাঁ! আমি রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি। আমার খাদ্যভান্ডার, উট, হস্তী, প্রাণাধিকা বেগমকেও এই যুদ্ধে হারিইছি।

দিলীর। তা' হলে বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে বলুন জনাব! এখন দিল্লী ফিরে যাওয়া অনেকটা সোজা হবে!

ঔরং। দিল্লী ফিরে যাব এই অপমান নিয়ে? কি বলেন মহারাজ।

শ্যাম। অসম্ভব।

দিলীর। যেমন অপমান নিয়ে যাচ্ছেন, তেমন অনেক জিনিষ রেখেও ত যাচ্ছেন। যথা উট, হস্তী, গো, মহিষ, বেগম। ফিরে যাওয়া এখন খুব সহজ।

ঔরং। এ দুঃখের সময় তোমার পরিহাস ভালো লাগে না দিলীর খাঁ।

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি পরিহাসের সময় অসময় আছে।

দিলীর। সম্রাট! পরিহাসটা আমার দুঃখেই বড় ভাল লাগে। দুঃখেই সেটা আমার মখে বেরোয় ভালো!—করুণ হাস্য বলে' একটা জিনিস আছে জানেন জনাব?

ঔরং। মোগলের এরূপ অপমান কখন হয় নি—যেমন—

দিলীর। যেমন আজ আপনার হাতে হোল। তা মানি সম্রাট!

ঔরং। আমার হাতে না তোমার হাতে? দুর্ভাগ্যক্রমে আজ দিল্লীর খাঁ মোগলের সেনাপতি। আজ যদি রাজা যশোবন্তসিংহ জীবিত থাকতো—

শ্যাম। যদি রাজা যশোবন্তসিংহ জীবিত থাকতো জাঁহাপনা।

দিলীর। সম্রাট ইচ্ছা করলে তিনি আজো জীবিত থাকতে পারতেন।

ঔরং। কি? তুমি কি বিবেচনা কর যে—?

দিলীর। বিবেচনা কিছুর করি না সম্রাট—জানি। জানি যে সম্রাট তাকে আফগানিস্থানে হত্যা করেছেন। সম্রাট যদি ইচ্ছা করতেন ত এই সাহসী বীর সম্রাটের শত্রু না হয়ে মিত্র হোত; আর এই রাজপুত্র জাতি [মহারাজ শ্যামসিংহের মত আত্মাভিমানবর্জিত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষ রাজপুত্র নয়—দুর্গাদাসের ন্যায় প্রকৃত, উদার, সরল বীর রাজপুত্র যা'রা তা'রা] মোগল রাজ্যের ঋণস্বরূপ না হয়ে রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হোত।

ঔরং। কিরূপে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কিরূপে?—ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটান। দেখতে পাবেন কিরূপে? মানসিংহ, ভগবান দাস, টোডরমল, বীরবল—এ'রা না থাকলে আজ মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্বও থাকত না; আর ঔরংজীবও তার সিংহাসনে বসতে পেতেন না। যে ভিত্তি আকবর দৃঢ় করে' গিয়েছিলেন, আপনি আজ আপনার আত্মঘাতী নীতিতে সে ভিত্তি জীর্ণ করে' তুলছেন।

ঔরং। আমি!

দিলীর। হাঁ আপনি। জিজ্ঞাসাকর স্থাপিত না করলে এদিকে রাজপুত্র এক হোত না, ওদিকে মারাঠা হুকুমার দিয়ে উঠতো না। রাণা রাজসিংহ আপনারই হিতার্থে এই কথাই লিখেছিলেন। আপনি তাঁকে তুচ্ছ করে' নিজের এই সর্বনাশ টেনে আনছেন।—রাজাধিরাজ! জানবেন যে, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাতকে কেউ শাসন করতে পারবে না। তা'রা ইচ্ছা করে' যদি অধীন থাকে ত থাকবে। আর যদি সমস্ত জাতি বিদ্রোহী হয়, ত তা'দের শৃঙ্খলিত উচ্চ নিঃশ্বাসে মোগলসাম্রাজ্য উড়ে যাবে।

ঔরং। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করব দিলীর খাঁ! আমার মাথা ধরেছে। আমি এখন ভাবতে পাচ্ছি না।

[এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন।]

দিলীর। ভগবান তোমার মতি ফেরান
ঔরঞ্জীব!

আজীম। [স্বগত] আকবর ভারতের
ভাবী সম্রাট!—এ হবে না! এ হতে পারে না।

দিলীর। [স্বগত] কুমার আজীমের
চেহারাটা বড় সুবিধার বোধ হচ্ছে না!
[প্রকাশ্যে] কি ভাবছেন সাহাজাদা।

আজীম। সে কথা তোমার সঙ্গে বিচার্য
নয় সেনাপতি।—

[—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিলীর। হু—একটা বিশেষ কিছ
হয়েছে। এ শব্দ দোবারীর পরাজয় নয়—
কুমারের মনে একটা বেশ খটকা লেগেছে।

শ্যামসিংহ। তুমি হেরে এলে দিলীর খাঁ।

দিলীর সহসা শ্যামসিংহের প্রতি চাহিয়া
কহিলেন—“হ্যাঁ—এলাম বৈকি চাঁদ। হ্যাঁ চাঁদ
হেরে’ এলাম।—আপনার মনে বড় আক্ষেপ
হয়েছে মহারাজ। না?—যে রাজপুত্র জাত
শক্তিবলে জেগে উঠবে? খোসামোদের জোরে
নয়—গায়ের জোরে উঠবে। এটা আপনার
সইছে না।—না?

শ্যাম। না আমি বলিছিলাম যে—

দিলীর। দরকার কি!—ভগবান্ . তোমার
অদ্ভুত সৃষ্টি! যে জাতে দুর্গাদাস জন্মায় সেই
জাতেই শ্যামসিংহ জন্মায়।—এক জাত?—
আচ্ছা সিংহ মহাশয়! আপনার নাম শ্যামসিংহ
না হয়ে শ্যামসুজ্জোহা হলে ঠিক হোত না?

নেপথ্যে কোলাহল শ্রুত হইল

শ্যাম। ও কি শব্দ! জয়েল্লাসধর্নি!—
দুর্গাদাস এখানে এসে আমাদের আক্রমণ
করেনি ত?

দিলীর। পালাও মহারাজ! পৈতৃক প্রাণটা
রাখো।

শ্যাম। না, ওরা “আপ্লা হো” বলে’
চেঁচাচ্ছে।—ওরা আমাদের সৈন্য।

দিলীর। আপনাদের সৈন্যই বটে। যদি
আমাদের সৈন্য হোত ত—“হর হর ব্যোম”
বলে’ চেঁচাত।—না? আচ্ছা মহারাজ! আপ-
নাকে খোসামোদে বিদ্যাটা কে শিখিইছিল?

শ্যাম। কেন?

দিলীর। সে একটা ভারি ওস্তাদ মানু
হবে। কি কর্তব্যই শিখিইছিল!—বাঃ।

সাহাজাদা আকবর প্রবেশ করিলেন

শ্যাম। এই যে সাহাজাদা আকবর!

দিলীর। সত্যই ত! সাহাজাদাই ত বটে।
বন্দীগ কুমার—শুনছিলাম যে যুবরাজ শত্রু-
হস্তে বন্দী। সে সম্বাদ তবে মিথ্যা।

শ্যাম। আমি জানি ও মিথ্যা।

দিলীর। হাঁ নিশ্চয় মিথ্যা; মহারাজ
যখন বলেছেন মিথ্যা, তখন নিশ্চয়ই মিথ্যা।
কেমন মহারাজ! হচ্ছে কিনা?

শ্যাম। সাহাজাদা নিশ্চয় শত্রুজয় করে’
ফিরে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ আমি ত তাই ভাবিছিলাম।—
যুবরাজ রাণাকে কি বন্দী করে এনেছেন?—
নৈলে এত জয়েল্লাস ধর্নি কেন?

আকবর। না দিলীর। আমিই রাণার হাতে
বন্দী হয়েছিলাম।

শ্যাম। কৌশলে মৃত হয়ে এসেছেন?

আকবর। না মহারাজ!—রাণার বদান্য-
তায়।—দিলীর খাঁ। রাজপুত্র জাতটা যুদ্ধ
কর্তে জানে।

দিলীর। বলেন কি যুবরাজ?

আকবর। শব্দ যুদ্ধ কর্তে জানে তা নয়।
—কমা কর্তে জানে।

দিলীর। অদ্ভুত আবিষ্কার!

শ্যাম। এখন, মৃত হলেন কিরূপে?

আকবর। দিলীর!—শোন—

দিলীর। মহারাজকে বলুন—উনি বড়
ব্যস্ত হয়েছেন।

আকবর। শুনুন মহারাজ! আমি যখন
আরাবালের গিরিসঙ্কটে পিঞ্জরাবন্ধ, সসৈন্যে
অনাহারে মৃতপ্রায়; তখন রাণা তাঁর পুত্র
জয়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন—আমাকে বধ
কর্তে নয়; বন্দী কর্তে নয়; আমাকে খাদ্য
দিতে, আমাকে মৃত কর্তে।—আর কি
চাও?

দিলীর। রাণা আরও একটা কাজ কর্তে
পার্তেন, তাঁর এক কন্যার সঙ্গে সাহাজাদার
বিয়ে দিতে পার্তেন।—যান এখন ভিতরে
যান। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই
যথেষ্ট।—চলুন মহারাজ!—না মহারাজের
এখানে আজ নিমন্ত্রণ আছে?

[সকলে বিজয় দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাজপুত্রশিবির। কাল অপরাহ্ন।

রাণা রাজসিংহ ও যশোবন্তের রাণী উপবিষ্ট।
সম্মুখে মোগল পতাকা হস্তে দুর্গাদাস ও রাজপুত্র
সামন্তগণ দণ্ডায়মান

রাজ। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি মোগলকে
মেবার হতে প্রতাড়িত করেছো।

রাণী। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি বেগমকে
বন্দী করেছো!—আজ প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি? দুর্গাদাস! তুমি সম্রাটের
বেগমকে বন্দী করেছো? কোন্ বেগম?

দুর্গা। কাশ্মীরী বেগম।

রাজ। তাঁকে বন্দী করেছো? তৎক্ষণাৎ
তাঁকে মুক্ত করে' দাওনি?

দুর্গা। রাণা! আমি সেনাপতি মাত্র।
যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বন্দী করবার অধিকার
আমার। তাকে মুক্ত করবার অধিকার রাজার।

রাজা। যাও দুর্গাদাস! বেগমসাহেবাকে
এইক্ষণেই মুক্ত করে' সসম্মানে সম্রাটের কাছে
পাঠিয়ে দাও।

রাণী। কেন দিব রাণা?

রাজ। নারীর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই।

রাণী। নাই বটে! তবে আমি এসে
আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি কেন মহারাণা?
আমাকে বন্দী করবার জন্য কি এই প্রকান্ড
যুদ্ধ নয়? আমি যদি এ যুদ্ধে সম্রাজ্ঞীর বন্দী
হতাম, সম্রাজ্ঞী কি করতেন?

রাজ। মোগলের নীতি আমরা অনুকরণ
কর্তে বসিনি।

রাণী। না মহারাণা! আমি এই বেগমকে
ছেড়ে দেবো না। আমি প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ
মহামায়া।

রাণী। কিসের? কিসের নয় তাই
জিজ্ঞাসা করুন! এই কাশ্মীরী বেগমই আমার
পতিপুত্রকে হত্যা করিয়েছে! এই কাশ্মীরী
বেগমই আমাকে বন্য পশুর মত স্থান হতে
স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—এর শোধ
নেবো রাণা। আমি তাকে মৃত্যুর মধ্যে পেরে
ছাড়বো না। প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি প্রতিশোধ নেবে?

রাণী। তা এখনো ঠিক করে' উঠতে

পারি নি রাণা। এ বিষয়ে চিন্তা কর্ব। ভেবে
বার কর্ব। তিলে তিলে তাকে পোড়ালে
যথেষ্ট হবে না। সর্ব্বাঙ্গে তার সূচিভেদ
কল্পে যথেষ্ট হবে না। ভেবে বার কর্ব।
নতন যন্ত্রণার যন্ত্র আবিষ্কার কর্ব। নারীর
উচিত শাস্তি নারীই বোঝে।

রাজ। মহামায়া! পাপের শাস্তি দেবার
তুমি আমি কে। যিনি দেবার তিনি দেবেন।

রাণী। [উঠিয়া] তিনি?—কোথায় তিনি?
তিনি কোথায়? তিনি হাত গুটিয়ে বসে
আছেন। আকাশের বজ্র চিরদিন পার্শ্বীর
শিরেই পড়ে না, মহারাজ! পুণ্যস্মার শিরেও
পড়ে। ভূকম্প এক পার্শ্বীর গৃহই ভগ্ন হয়
না, নিরীহ বেচারীর কুঁড়েখানি আগে ভাঙে।
প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্র শম্পাই ডোবে, বিরাট
মহীরুহ তেমনই মাথা উঁচু করে' থাকে।
ঈশ্বরের নিয়ম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিচার করে না—
যেখানে দুর্ব্বল, জীর্ণ, স্থবির পায়, আগে
গিয়ে তারই টুটি চেপে ধরে।

রাজ। রাণী! উদ্ভত হয়ে ঈশ্বরের উপর
বিচার কর্তে বোসো না।—জেনো তাঁর নিয়মে
অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই।

রাণী। সে কবে!—আমি ত তা আজ
পর্যন্ত দেখলাম না রাণা। আমি ত আজ
পর্যন্ত দেখেছি—সারল্য আজীবন শাঠ্যের
চরণে পড়ে' ভিক্ষা মেগেছে, শাঠ্য একবার
ফিরেও চায় নি। সত্য চিরকালটা মিথ্যার দাস্য
করেছে, মাথা ওঠাতে পারি নি। আমি চিরদিন
দেখেছি—ন্যায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভীন অন্যায়ের
বিজয় নিশান। আমি চিরদিন শুনে এসেছি—
ধর্ম্মের ভগ্ন মন্দিরে আধাত অধর্ম্মের জয়-
ভেরী। পুণ্যের শ্যামল রাজ্যের উপর দিয়ে
পাপের ভৈরব রক্তবন্যার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে;
শ্যামলতার চিহ্নমাত্র নাই। উৎকোচে, অত্যা-
চারে, মিথ্যাবাদিতায় পৃথিবী ভরে' গেল—
তবু বলেন অন্তিমে ধর্ম্মের জয় হবে।—সে
কবে—কবে, কবে?—

রাজা। ক্ষান্ত হও মহারাণী! তুমি উত্ত্যক্ত
হয়েছো। ধৈর্য ধর।

রাণী। ধৈর্য রাণা! আপনি যদি নারী
হতেন, আর আপনার দূরে প্রোষিত ভর্তা
বিশ্বাসঘাতকের বিধে প্রাণত্যাগ কর্তে; আপ-

নার সরল উদার পুত্রের যদি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হোত; ক্ষুদ্র নিঃসহায় নিরীহ শিশুকে নিয়ে—আমার মত আপনার যদি প্রতাড়িত হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে পরের দুয়ারে ভিখারী হয়ে বেড়াতে হোত, ত বৃদ্ধতেন—ধৈর্য্য!—না রাণা—আমি সেই পাণ্ডিসীকে ছাড়বো না।

রাজ। দুর্গাদাস! আমি জীবিত থাকতে অবলার প্রতি অত্যাচার দেখবো না। যাও তুমি তাঁকে সসম্মানে সম্রাটের করে সমর্পণ কর।

রাণী। দুর্গাদাস! তুমি রাণার ভৃত্য নও। আমার কর্মচারী।

দুর্গা। ক্ষমা কর্বেন মহারাণী! এযুদ্ধে আমরা সকলেই রাণার ভৃত্য। বেগম আজ মেবারের রাণার বন্দী; মাড়বারের মহিষীর নয়। মহারাণী আত্মবিস্মৃত হবেন না। আপনারই রক্ষার্থে রাণা এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। রাণার প্রতি রুঢ় হবেন না। তাঁর আজ্ঞার অবাধ্য হবেন না।

রাণী কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন “তুমি সত্য কথা বলেছো দুর্গাদাস”—পরে রাণার সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন—“রাণা মাঞ্জনা করুন! যন্ত্রণায় উত্ত্যক্ত হয়ে দুর্ভবনীত হয়েছি; ক্ষমা করুন! কিন্তু যদি বৃদ্ধতেন রাণা এই তীর বেদনা এই নিদারুণ জ্বালা, এই গাঢ় অন্তর্দাহ!—ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি; ক্ষমা করুন!”

রাজ। ক্ষমা করেছি মহামায়া! তবে তুমি যে ক্ষমা আমার কাছে চাহিলে, সেই ক্ষমা এই সম্রাজ্ঞীর প্রতি দেখাও। তাঁকে তোমার কাছে বিচারার্থে রেখে যাচ্ছি। তাঁকে ক্ষমা করে তোমার মহত্ত্ব দেখাও! মহামায়া! নারী স্নেহ দয়া ভক্তি ক্ষমা গুণেই পূজ্যা। তাতেই তার শক্তি।—আর যদি শাস্তি দিতেই চাও মা—মনে কর কি মা যে তোমার অত্যাচারীকে যদি তুমি হাস্যমুখে ক্ষমা কর—সে তার কম শাস্তি!

রাণী। উত্তম! সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এসো দুর্গাদাস।

[দুর্গাদাস প্রস্থান করিলেন।

রাজ। তবে তোমার দয়ার উপরে নির্ভর করে সম্রাজ্ঞীকে রেখে গেলাম মহামায়া।

[—বলিয়া রাণা চলিয়া গেলেন।

রাণী। তাই হোক! আমি তার উপর বিচার কর্ব—এই বিচারাসনে বসে—সেই যথেষ্ট। ভারতের সম্রাজ্ঞী, ঔরঞ্জীবের বেগম, আমার পতিপুত্রহন্ত্রী শত্রু আজ আমার সম্মুখে বন্দী হ'য়ে দাঁড়াবে; আমি সিংহাসনে বসে' নীচুপানে তার মুখের দিকে চেয়ে তাকে প্রাণভিক্ষা দিব। তাই বা মন্দ কি!—ঐ আস্ছে। এখনো মুখে সেই দর্প, চাহনিতে সেই দীপ্ত, পদদাপে সেই গর্ব!—জগদীশ্বর! পাপকে এমন উজ্জ্বল করে তৈরী করেছিলে।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারসহ দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন

রাণী। সেলাম বেগম সাহেব!

গুল। যশোবন্তসিংহের রাণী?

রাণী। হাঁ চিন্তে পাচ্ছেন না। অথচ আমাকে বন্দী কর্বার জন্যই এই বিরাট আয়োজন। আপনি আমার পতিপুত্র খেয়েছেন। তাতেও ও রাক্ষসী উদর ভরেনি! এখন আমায় আর আমার ছোটছেলেকেও খেতে চান! এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? এত ভুল করলে চলবে কেন বেগম সাহেব?

গুল। তুমিই দুর্গাদাস!

দুর্গা। হাঁ জাঁহাপনা!

গুল। আমাকে এখানে এনেছো কেন?

রাণী। আপনার বিচার হবে।

গুল। আমার বিচার? কার কাছে?

রাণী। আমার কাছে।—কথাটা কি একটু রুদ্ধ ঠেকছে না? কি কর্বেন বলুন।—চাকা ঘুরে গিয়েছে বেগম সাহেব! কি! দুর্গাদাসের পানে অত চাইছেন যে? ভাবছেন এতদূর আশ্রয় এই কাফেরের যে আপনাকে বন্দী করে! তাই ভাবছেন—না? এখন কি শাস্তি চান?

গুল। আমি তোমার বন্দী, যা ইচ্ছা হয় কর।

রাণী। যা ইচ্ছা তাই কর্ব? সে বড় কঠোর হবে বেগম সাহেব! আমার যা ইচ্ছা সে শাস্তি দিলে সৈতে পার্ব না। সে বড় নিদারুণ শাস্তি। নরকের জ্বালা তার কাছে বসন্তবায়ুর মত শীতল, শত বর্শিকের দংশনের যন্ত্রণাও তার কাছে শৈলনির্ঝর-বারির মত স্নিগ্ধ! আমার যা ইচ্ছা?—আমার

কি ইচ্ছা জানো বেগম সাহেব?—যাক্—তুমি আমাকে বন্দী করলে কি কর্তে ভারত সম্রাজ্ঞী?

গুল। কি কর্তাম? তোমার আমার পাদোদক খাওয়াতাম। পরে বধ কর্তাম।

রাণী। এখনও তেজ যায় নি! বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, তবু আশ্ফালন যায় নি! বেগম সাহেব!—বড় আশায় নিরাশ হয়েছো। আজ আমি তোমার বন্দী না হয়ে, তুমি আমার বন্দী? দেখ গুলনেয়ার! ভারতসম্রাজ্ঞী! তুমি আজ আমার মর্শ্চিগত। ইচ্ছা করলে তোমায় আমার পাদোদকও খাওয়াতে পারি, বধও কর্তে পারি। কিন্তু তা কিছই কর্ব না। আমি তোমাকে মৃত্ত করে' দিলেম। সেনাপতি! একে রেখে এসো এ'র স্বামীর কাছে— [গুলনেয়ারকে] যাও—দাঁড়িয়ে রৈলে যে?—আশ্চর্য হচ্ছো?—এই রাজপুত্রের প্রতিশোধ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের বহিঃকক্ষের বারান্দা।

কাল—প্রভাত।

তাহবর খাঁ ও আকবর দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

তাহবর। তাই ত! তোমাদের তা'লে রাজপুত্রেরা ঠিক ই'দুরের কলে ফেলিছিল।

আকবর। অবিকল। আমরা বরাবর সোজা গিয়ে দেখি যে সে দিকে বেরোবার পথ নাই। ফিরে গিয়ে দেখি সে দিকও বন্ধ।

তাহবর। আর পাহাড়ের উপর থেকে রাজপুত্রেরা মজা দেখিছিল—সে ঠিক কলের ভিতর ই'দুরের মত তোমরা একবার এদিক একবার ওদিক করে' বেড়াচ্ছো?

আকবর। আর সে গিরিপথ এমন সংকীর্ণ যে ১০০ জন মানু'ষ পাশাপাশি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের সৈন্যেরা কে কোথায় আছে দেখবার যো নাই।

তাহবর। দেখলে ব'ঝি সব পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে?

আকবর। হাঁ দস্তুর মত।—এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে—

তাহবর। বোঝা দৃষ্কর যে কোন'গুলো পাহাড় আর কোন'গুলো সৈন্য?

আকবর। না তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তাহবর। যাচ্ছিল না কি?—যুদ্ধ তা'লে হোলো না?

আকবর। যুদ্ধ কর্ব কার সঙ্গে? পাহাড়ের সঙ্গে?—শত্রুরই সম্বান পেলাম না।

তাহবর। ঐ আমি বরাবর বলে' আসছি, রাজপুত্র জাতটা যুদ্ধই জানে না।—একটা প্রথা মেনে চলে না। কেউ কখন শ'নেছো যে না খেতে দিয়ে যুদ্ধে জেতা!

আজ্ঞীমের প্রবেশ

তাহবর। বন্দিগী সাহজাদা!

আজ্ঞীম। [সে'দিকে দ্রুক্ষেপ না করিয়া] আকবর শ'নেছো?

আকবর। কি আজ্ঞীম?

আজ্ঞীম। মেবার যুদ্ধে তোমার এই পরাজয়ে পিতা বড়ই ক্ষু'ব্ব হয়েছেন।

আকবর। তা কি কর্ব!—আর আজ্ঞীম, এ যুদ্ধে আমিই একা পরাজিত হইনি। স্বয়ং দিল্লীর খাঁ—

আজ্ঞীম। দিল্লীর খাঁর উপরও পিতা সন্তুষ্ট হন নি।

আকবর। আর সম্রাট নিজে? আর তুমি? তোমরাই জিতে এসেছো নাকি?

আজ্ঞীম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আর আমি?

আজ্ঞীম। বিলাসে কালহরণ করেছিলে।—অন্ততঃ পিতা তাই বলেন।

আকবর। বলেন কি কর্ব!

তাহবর। কুমার যুদ্ধ কর্ব'ন কার সঙ্গে সাহজাদা?—

আজ্ঞীম। চোপ রও।

তাহবর। ওরে বাবা—

আকবর। তা এখন কি কর্তে হবে।—আমি ভীরু, বিলাসী নৃত্যগীতিপ্রিয়।—তা হবে কি?

আজ্ঞীম। হবে আর কি! আকবর! জানো পিতা তোমাকে অকর্মণ্য বিবেচনা করে' তোমাকে ফের ব'ঙ্গদেশে পাঠাচ্ছিলেন। আমি

তাঁকে নিরস্ত করেছে—অনেক অনুনয়ের পর।
জেনো, পিতা তোমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হয়েছেন।—সাবধান! পিতার কাছে এখন
বেশী ঘেঁষোনা! আমি বন্ধুভাবে বলছি।

[প্রস্থান।

তাহবর। কি বলেন কুমার!—গতিক বড়
সুবিধার নয়! আপনি যুদ্ধটা না জিতে বড়ই
বেকুফি করেছেন।

আকবর। আমি কি ইচ্ছা করে' হেরেছি
না কি!

তাহবর। তা বটে! তবে ইচ্ছা না করে'ও
হারা উচিত ছিল না। সাম্রাজ্যটা বা যদি কখন
পাবার আশা ছিল—তা গেল।

আকবর। তবে সাম্রাজ্য পাবেন কে?

তাহবর। আজীম। দেখলেন না, কি রকম
আমার পানে ফোঁস করে' উঠলেন। পেছোনে
বিষ না থাকলে অমন 'কলো পানা' চক্র হয়?
ও'র তাড়াতে আমি কি রকম মুষড়ে গিই-
ছিলাম দেখলেন না?

আকবর। আজীম ত নিজে ভারি বীর!
উনিই কি জিতে এসেছিলেন নাকি!—হেরে—
বেগম সাহেবকে পর্যন্ত হারিয়ে এসেছেন।
রাজপুত্র উদার জাত, তাই বেগম সাহেবকে
ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাহবর। আজীম হেরে এসেছেন সত্য;
কিন্তু সে হারাটা সম্রাটের নিজের কি না।
সম্রাট কিছ' ম'খ ফুটে বলতে পারেন না।
আজীম ছিলেন সম্রাটের অধীন কর্মচারী।
আর আপনি ছিলেন স্বাধীন সেনাপতি।

আকবর। আজীম সম্রাটের প্রিয়পাত্র—
কেননা সে খোসামুদে, গোঁড়া মুসলমান—মদ
ছোয় না, গান শোনে না, দশবার নেওয়াজ
পড়ে।—ভন্দ! কেবল সম্রাটকে খুসী রাখবার
ফন্দি।

তাহবর। আপনিও তাই করুন না কেন?

আকবর। তাহবর!—আমি রাজ্য ত্যাগ
কর্তে' প্রস্তুত আছি; সুরা, নারী আর গান
ত্যাগ কর্তে' প্রস্তুত নই। আমি আজীমের মত
নীচ নই। দরাজ হাতে জীবন ব্যয় করি।—
যত নীচ, ভীরু, কৈতববাদী।

তাহবর। চুপ!—সম্রাট আসছেন—মাথা
সামাল!

আকবর বিনাবাক্যে অলক্ষিতভাবে চলিয়া গেলেন
ঔরঞ্জীব ও দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন

ঔরং। কি? দুর্গাদাস ঝালোর জয়
করেছে? আর পুরমন্ডলে সুবলদাস খাঁও
রোহিলাকে পরাস্ত করেছে?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা!—আরো আছে।
দয়াল সাহা মোগল সৈন্যকে মালব থেকে
তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে কাঁজিদের ধরে'
শ্মশ্রুদুন্দন কচ্ছে, কোরাণ ক'পে নিক্ষেপ
কচ্ছে, মসজিদ সব ভূমিসাৎ কচ্ছে।

ঔরং। কি! শেষে ধর্মের উপর অত্যাচার!

দিলীর। তা'রা এ জিনিসটা জানতো না।
সম্রাটই পথ দেখিয়েছেন। সম্রাট হিন্দুর বেদ
অস্থিক'পে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে'
কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি?
দেবমন্দির বিচুড় করেন নি?—জনাব! কথা
শুনুন! হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন,
জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক
হোক।

ঔরঞ্জীব। কখন না। আমি যত দিন
জীবিত আছি, ততদিন মুসলমান মুসলমান,
কাফের কাফের। দিলীর খাঁ! দাক্ষিণাত্য হতে
মোজামকে আসতে লিখছি। এবার সমস্ত
মোগল সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্ব।
দেখি কি হয়!—তাহবর খাঁ! সত্তর হাজার
সৈন্য নিয়ে মাড়বারের বিপক্ষে যাত্রা কর।
আরো সৈন্য আকবরের অধীনে পাঠাচ্ছি।
আমি নিজে সসৈন্যে পিছে যাচ্ছি। দেখ—যদি
মাড়বার জয় কর্তে' পারো, এক সাম্রাজ্যখণ্ড
তোমায় দিব। যদি না পারো—তোমার পুর-
স্কার লোহশু'খল। [প্রস্থান।

তাহবর। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমি একবার দেখলাম; তুমিও
একবার দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ
উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার সেই উদ্যানে পরিভ্রমণ
করিতেছিলেন।

গুস। কি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ! কি উচ্চ
প্রশস্ত ললাট, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কি দৃঢ়নিবন্ধ

বিশ্বকম ওষ্ঠযুগল!—সুন্দর পুরুষ এই দুর্গা-
দাস! কিন্তু কি আশ্চর্য্য—সে একবার আমার
পানে গদগদভাবে চাহিল না? জগতে এই
অতুলনীয় রূপ সে বিস্মিত হয়ে দেখল না?
এ চাহনির জ্যোতির ছটায় সে অন্ধ হয়ে গেল
না? আমার করস্পর্শের তড়িতপ্রবাহে সে
মর্দুচ্ছিত হয়ে পড়লো না? জগদীশ্বর! তোমার
জগতে এ রকম মানুষ আছে?—

গাইতে গাইতে রাজ্যার প্রবেশ

গীত

কেমনে কাটাবো সারা রাত রে সে বিনা সই।
পলখ না হেরে যারে বাঁচি না বাঁচি না সই?
রাখি' এ হৃদয় পুরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি রব কেমনে—জানি না সই।

রাজিয়া। কি ঠানদি!—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে
গিয়েছে। তুমি এখনও ঐ নিষ্কর্জন উদ্যানে
একা?

গুল। একাই আমার ভালো লাগে!

রাজিয়া। আগে ত লাগতো না—ঠানদি!
আজকাল তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখি কেন?
—আগে ত এরকম ছিলে না?

গুল। রাজিয়া, তুই কখন ভালো
বেসেছিছিস?

রাজিয়া। ওমা তা আর বাসিনি! গ্রীষ্মে
আম আর বর্ষার খিচুড়ি আমি খুব ভালো-
বাসি। তার উপর ঐ পুরুষ মেনিটাকে যে কি
ভালোই বাসি ঠানদি—কেমন “মেউ মেউ
মেউ” করে—যদিও সেটা জানিত কোন রাগ-
রাগিণীর সঙ্গে মেলে না।

গুল। দূর্! হাবা মেয়ে! বলি কোন
মানুষকে ভালো বেসেছিছিস?

রাজিয়া। মানুষ! বেসেছি বৈ কি—তোমায়
ভালোবাসি, মাকে ভালোবাসি,—আর এক-
জনকে ভারি ভালো বাস্তাম; সে মরে'
গিয়েছে।

গুল। কে সে?

রাজিয়া। ঐ আমাদের বড়ো বাবুর্চি। কি
রাজ্যাই রাখত ঠানদি! যেন একেবারে “সুদরট
মল্লার”—বলিয়া গান ধরিল দিল—“পিয়ারে
কহিও বর্ষা ঋতু আই”—এটা কিন্তু দেশ-
মল্লারেরই কাছাকাছি।

গুল। তুই একটা গান গা, রাজিয়া, আমি
শুনি।

রাজিয়া। [সোল্লাসে] শুনবে?—বোস
এস্রাজটা আনি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

গুল। যা হোক, আমি আর একবার তাকে
চাই! তার দম্ভ চূর্ণ কর্ব। কি স্পর্শ! আমার
সম্মুখে একজন পুরুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে
চলে' যাবে? লালসায় জরজর হবে না? নত-
জানু হয়ে আমার কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করবে
না?

রাজ্যার প্রবেশ

রাজিয়া এস্রাজ লইয়া বাসিয়া কহিল—“কি
শুনবে?”

গুল। কাল ছাদের উপর রাতে যেটা
গাচ্ছিল!

রাজিয়া। সেটা?—সেটা ত এস্রাজে
বাজাতে পারবে না।

গুল। বিনি এস্রাজেই গা'।

রাজিয়া এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া গান ধরিল

গান

হৃদয় আমার গোপন করে'
আর ত লো সই রৈতে নারি,
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে—
থর থর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে
ছাঁপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান
আর কি ধরে' রাখতে পারি।
মানের মানা শুনবো না আর,
মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে
ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে
যাবো তার তরণে চড়ি',
দেখবো গিয়ে কোথায় পড়ি,
জীবন যখন করেছি পণ,
সরমের ধার আর কি ধারি।

রাজিয়া। এটা হচ্ছে ছায়ানট—ছায়া আর
নট—পঞ্চম থেকে একবারে রেখাব [সুদর
করিয়া দেখাইয়া] ভারি সুন্দর! না?

গুল। সত্যই ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে! বাঁধ
দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখতে
পারি। দরকার কি! ধরে রাখতেই বা যাবো
কেন। ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাস এসে আমায়

গ্রাস করুক; আমার ছেয়ে ফেলুক। উচ্ছ্বসিত হলেই আমার আনন্দ; বিরাজেই আমার উল্লাস। তবে এই দুর্গাদাসকে আমি চাই। যশোবন্তের রাণী আমার উপলক্ষ্য মাত্র। আমার লক্ষ্য দুর্গাদাস। ঔরংজীব!—মাড়বার আক্রমণ কর। এই দুর্গাদাসকে আমি চাই।

[প্রস্থান।

রাজিয়া। কি রকম! ঠানদি কি বিড়ির বিড়ির বক্তে বক্তে চলে' গেল। এমন ছায়ানট্ বদলে না।

[এই বলিয়া রাজিয়া মুখে কৃপা-প্রকাশক ধ্বনি করিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মাড়বার পর্বতশ্রেণী। কাল—প্রভাত।
দুর্গাদাস ও ভীমসিংহ মন্থোমুখি দাঁড়াইয়া
অদূরে গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতেছিল

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ! সম্রাট সমস্ত মোগলসৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করেছেন!—এবার আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা। এবার রাজপুত্র জাতির হয় উচ্ছেদ, না হয় উত্থান,—বীর! এই মহাসময়ের জন্য প্রস্তুত হও।

ভীম। সেইজন্যই পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি এসেছি এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

দুর্গাদাস। শিশোদীয় বীর! তোমার শৌর্য্য তোমার স্বার্থত্যাগের কথা অবগত আছি। কিন্তু মেবার যুবরাজ! তুমি মহৎ আছো, তোমায় মহত্তর হতে হবে। তুমি বীর; কিন্তু এ যুদ্ধে তোমার বীর্যের শিখরে উঠতে হবে।

ভীম। নিশ্চিন্ত থাকুন সেনাপতি! এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন কর্তে এসেছি—কর্তব্য-জ্ঞানে। সে কর্তব্য নিজের প্রতি, পিতার প্রতি, রাজপুত্র জাতির প্রতি। সে কর্তব্যের পথ হতে ভীমসিংহ স্থলিত হবে না। আমার বিশ্বাস করুন।

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ! আমরা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ভীম। মহারাণী কোথায়?

দুর্গাদাস। তিনি সমস্ত মাড়বারে;—নগরে, গ্রামে, অরণ্যে পর্বতে। তিনি স্বয়ং সৈন্য

সংগ্রহ করছেন। জাতিকে উত্তেজিত করছেন! মাড়বার যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! তাই মহারাণী স্বয়ং মাড়বার জাতিকে একত্রিত কর্তে বেরিয়েছেন!

ভীম। আমি তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্তে চাই!—

দুর্গাদাস। আজই সাক্ষাৎ হবে কুমার! তিনি আজ প্রভাতেই এই গ্রামেই আসবেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যেই এসেছি।

সমরসিংহের প্রবেশ

দুর্গাদাস। সম্বাদ পেয়েছো দাদা?—

সমর। হাঁ, মোগল সেনাপতি তাহবর খাঁ ৭০০০০ সৈন্য নিয়ে মাড়বার অভিমুখে আসছেন! কুমার আকবরের সঙ্গে আরো সৈন্য আসছে পিছনে।

দুর্গাদাস। আর সম্রাট?

সমর। তিনি সসৈন্যে আজমীরে। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

দুর্গাদাস ভীমসিংহের দিকে চাহিলেন

ভীম। রাঠোর সৈন্য কত সেনাপতি?

দুর্গাদাস। ১০০০০। আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য ছিল; যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে ছত্র-ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে—অনেক সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা কি কৃষি ধরেছে। মহারাণী তাদেরই ডাকতে বেরিয়েছেন। দেখছো গ্রামবাসীদের? যেন জীবন নাই।

ভীম। ওরা কি বলাবলি করছে শুন!

১ গ্রামবাসী। আরে জিজিয়া কর করেছে না হয় করেছে। হয়েছে কি?

২ গ্রামবাসী। কিন্তু এয়ে মাত্রা বাড়তেই চলেছে ভাই।

৩ গ্রামবাসী। আফিং খেয়ে ভোঁ হয়ে আছি বাবা। পৃথিমটা উল্টো ঘুচ্ছে কি সোজা ঘুচ্ছে খবর রাখি নে বাপ। তোদের যদি বস্ত্র দঃখু হয়েছে, আফিং ধর।

৪ গ্রামবাসী। দঃখু কিসের? আর যদি দঃখু হলোই—একবার ভেউ করে উঠলাম। চুকে গেল।

১ গ্রামবাসী। ওরা যা করে সৈব। সৈতেই হবে। কি বল হে?

২ গ্রামবাসী। কিন্তু আর যে নয় না।

৩ গ্রামবাসী। বলছি আফিং ধর।—সব সৈবে।

৪ গ্রামবাসী। আফিং ধর্তে হবে না, আপনিই সৈবে—এত সৈল। এইটে সৈবে না?

গীত

পাঁচশ বছর এমনি করে' আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটে কি আর সৈবে নাক
—দু'ঘা বেশী জুতার ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দু'ঘা দেনা বাবা;
দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে এমনি কি আসে যায়!
তবে কিনা জুতোর গুতো হয়ে গেছে অনেকবার—
একটা কিছু নতুন রকম করলে হতো উপকার;
ধরনা যেমন 'বেটা' বোলে,
দি'লি না হয় কানটা মোলে;
জুতোর খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে' গেছে সকল গায়।
পড়ে' আছি পায়ের তলায় নাকটা গুজে অনেক-
কাল,

সৈবে সবই—নই ত মানুষ, মোরা সবাই
ভেড়ার পাল;

যে যা করিস দেখিস চাচা,
মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা;
শাঁসটা খেয়ে আসিটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।
খেয়ে তোদের লাখি ঝাঁটা
কতক ভরে' আছে পেট;
খোসাভূষী পেলেই কিছু
বল'বো করে মাথা হেঁট—

“পেলাম হুজুর বৃহৎ পেলাম,”
দুটি হাতে কর্ব সেলাম—
নাই বা যদি দিস রে চাচা কর্তে কিবা পারি তায়।
তোরাই রাজা তোরাই মূনিব
—মোরা চাকর মোরা পর;
মনে করিস চাচা এটা
তোদের বাড়ী তোদের ঘর;

মোরা বেটা মোরা পাজি
যা বলিস তাই আছি রাজি,
রাজার মেয়ে ওগো প্যারি, যা বলিস তাই শোভা
পায়।

১ গ্রামবাসী। ঐ মহারাণী আসছেন।
চল্ চল্।

২ গ্রামবাসী। হাঁ চল্ চল্।
দুর্গা। কি রকম উদাসীন দেখলে ত।
কিন্তু এরাই উত্তেজিত হবে। মহারাণীর মূখে,
বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা কি তাড়িত শক্তি
আছে।—তিনি আজ যেন একটা কি স্বর্গীয়
প্রেরণায় উদ্দীপিত। তাঁর কথায় আজ হিম
পাথরকে উষ্ণ করে, মেঘকেও ক্ষেপিয়ে দেয়।

ভীম। ঐ মহারাণী আসছেন।

দুর্গা। হাঁ ঐ আসছেন। ভীম! সরে
দাঁড়াও।

ভীম। সত্যই ত! এ যে অপূর্ষ, সেনা-
পতি। এ ত কখন দেখি নাই। কি দানবদলনী
মূর্ত্তি! পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি,
দু-চারি গাছ উদ্ভাসিত কপোলে এসে পড়েছে;
চক্ষে কি দিব্য জ্যোতি, ললাটে কি গর্ষ?
ওষ্ঠে কি বরাভয়প্রদ হাস্য! আর ভয় নাই
সেনাপতি। স্বয়ং মা জন্মভূমি মানবীমূর্ত্তি
ধারণ করে' এসেছেন। আর ভয় নাই।

রাণী ও তৎপশ্চাতে গ্রামবাসীরা প্রবেশ করিল
গ্রামবাসীগণ। জয় রাণীমাইর জয়।
প্রথম গ্রামবাসী। মহারাণীকে জায়গা
ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী। আমরা মহারাণীকে
দেখতে পাচ্ছি না।

রাণী একটি সন্নিহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়া-
ইয়া কহিলেন,

“গ্রামবাসীগণ—সৈনিকগণ—পুত্রগণ।”

তৃতীয় গ্রামবাসী। আমরা শূন্যে পাচ্ছি
না। আমরা শূন্যে পাচ্ছি না।

রাণী। শূন্যে পাবে। স্তম্ভ হও।
চতুর্থ গ্রামবাসী। স্তম্ভ হও। স্থির হও।
রাণী। শোন আমি আজ এখানে এসেছি
কেন—শোন—

পঞ্চম গ্রামবাসী। আহা তোমরা স্থির হও
না—শূন্যে দাও।

রাণী। আগে আমার পরিচয় দেই। শোন
—আমি কে।

ষষ্ঠ গ্রামবাসী। এই চূপ কর। শূন্যে
পাচ্ছি না।

রাণী। মাড়বারবাসীগণ! আমি যশো-
বন্তের রাণী। সম্রাট ঔরঞ্জীবের কোশলে
হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার
মধ্যে আমার স্বামী তোমাদের রাজা যশো-
বন্তের মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাদের
যুবরাজ পৃথ্বীসিংহ ঔরঞ্জীবের কোশলে
বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। আমার কনিষ্ঠপুত্র
তোমাদের বর্তমান কুমার অজিতসিংহ
ঔরঞ্জীবের গ্রাস হতে দূরে নিভূতে রক্ষিত।

আর আমি—তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখারিণী!

গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতে লাগিল

সপ্তম গ্রামবাসী। তা আমরা কি কর্ব।

অষ্টম গ্রামবাসী। আমাদের ক্ষমতা কি?

নবম গ্রামবাসী। সম্রাটের এসব অত্যাচারের কিন্তু একটা প্রতিকার করা উচিত।

দশম গ্রামবাসী। আমাদের ত রাণী বটে। আমরা কর্ব না ত কে কর্ব?

রাণী। শোন গ্রামবাসীগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্তে। সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্তে আসছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত্র; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিত, উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হতে দেখবে।

একাদশ গ্রামবাসী। লক্ষাধিক সৈন্য! হায় হতভাগ্য মাড়বার!

দ্বাদশ গ্রামবাসী। সেনাপতি ঝালোর আক্রমণ না করলে এটা হতো না।

ত্রয়োদশ গ্রামবাসী। হাঁ। কেন সুস্থব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তোলা।

চতুর্দশ গ্রামবাসী। লক্ষ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হীনবীর্য্য মাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ গ্রামবাসী। কিছতেই নয়।

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার করবে, তাই তোমরা নিষ্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখবে। হা ধিক্। এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত কর্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত্র তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!—সম্ভব নয়? যশোবন্তসিংহ জীবিত থাকলে তাঁর সম্মুখে একথা বলতে সাহস কর্তে না। তাঁর জন্য সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত ছিলে। যশোবন্তসিংহের এক চাহনিতে তোমাদের

রক্ত উষ্ণ হোত, তাঁর একটি কথাতে দশসহস্র তরবারি পিধান হতে বেরিয়ে আসতো; তাঁকে অশ্বারূঢ় দেখলেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ ধ্বনিত কর্ত। আমি নারী! আমি তাঁর বিধবা পত্নী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। আমার কথা শুনবে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই।

গ্রামবাসী। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুনবো।

রাণী। শুনবে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে এসো। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশব্দে শূন্য সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো;—যেমন ডমরুধ্বনি শূনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো;—যেমন বজ্রধ্বনি শূনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্জার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল ওঠে, ওঠো; রাজস্থান জানক, ঔরঞ্জীব জানক যে তোমাদের শৌর্য্য সুস্থ ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।

গ্রামবাসীগণ। মহারাণী আমরা যাবো। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়শা নাই। মৃত্যুই সার হবে।

রাণী। মৃত্যু! গ্রামবাসীগণ,—মৃত্যু কি একদিন আসবে না? সে যখন বিছানার এসে তোমার টুটি চেপে ধর্বে, সে বড় সুখমৃত্যু নয়! কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।

গ্রামবাসীগণ। আমরা যাবো মহারাণী! যেখানে আপনি নিয়ে যান আমরা যাবো।

রাণী। এই ত তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্তে প্রস্তুত থাকে—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প স্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থির-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ। আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত

ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ; আর এক-
দিক দেশের প্রতি কর্তব্য—বেছে নাও।

সকলে। আমরা কর্তব্য বেছে নিলাম।

রাণী। উত্তম! তবে আজ সব রাঠোর
মিলিত হও! তুচ্ছ বিসম্বাদ এই মহারতের
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক
হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক "মাইজির
জয়।"

সকলে। মাইজির জয়!—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজ্যার শিবির।

কাল—মধ্যরাতি; বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও বজ্র।

রাজ্যার গাইতেছিলেন—

ঘন ঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন,
বহে শীকর স্নিগ্ধচ্ছদসিত পবন,
নামে গভীর মন্ত্রে, গদরু গদরু গরজন।
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্জা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।

পিঙ্গল দামিনী মূহুর্মূহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

রাজ্যার। উঃ বাপু রে কি কোলাহল!
সৈন্যদের চীৎকার। কামানের গর্জন! রণ-
বাদ্যের ধ্বনি! হঠাৎ এ কি! কাণ ঝালাপালা
করে' দিলে! মানুষগুলো সঙ্গীতশাস্ত্র কখন
চর্চা করেছে বলে' বোধ হয় না—উঃ [কর্ণে
হস্তপ্রদান]

আকবরের প্রবেশ

রাজ্যার। কে? বাবা?

আকবর। হাঁ রাজ্যার।

রাজ্যার। এঃ আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে
যে বাবা! বাহিরে এ সব কি! এত কোলাহল!

আকবর। যুদ্ধ হচ্ছে। রাজপুত মোগল
শিবির আক্রমণ করেছে।

রাজ্যার। তা না হয় করেছে? কিন্তু এত
বেসুরো চেঁচায় কেন?

আকবর। বেসুরো কি বল্‌ছিস রাজ্যার;
ব্যাপার গদরুতর।—উঃ কি রাশি রাশি মৃত্যু!

রাজ্যার। তা বেশ বদ্বাছ। কিন্তু চেঁচায়
কেন?

আকবর। কি বল্‌ছিস রাজ্যার—এ সাক্ষাৎ
মৃত্যু। মৃত্যুকে এত কাছাকাছি কখন দেখিনি!

—উঃ—বাইরে কত লোক মর্ছে জানিস?

রাজ্যার। মর্ছে! তাই পালিয়ে এসেছো
বাবা! ভয় কর্ছে? ভয় কি বাবা?—

আকবর। হয়ত আমার আর তোরও আজ
মর্তে হবে।—

রাজ্যার। যদি মর্তেই হয় ত গাইতে
গাইতে মর্ব! তীরাপহত লহরীর মত গাইতে
গাইতে নেমে যাবো?

আকবর। কি! বারবার রাজপুতের জয়-
ধ্বনি!—এ আরো নিকটে।

নেপথ্যে। জয় মহারাণীর জয়।

তাহবরের প্রবেশ

তাহবর। যুবরাজ! পালান পালান।

আকবর। কেন তাহবর খাঁ?

তাহবর। আমাদের পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আমাদের সৈন্যরা কি কর্ছে।—
সব মরে গিয়েছে!

তাহবর। না সব মরেনি! তারা এ রকম
অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যা করে' থাকে—তাই
কর্ছে:—শত্রুকে "পশ্চাত্তাগ দেখহ" করে'
ছুটেছে।

রাজ্যার। পালাচ্ছে! সে কি! পালাচ্ছে
কেন? সেনাপতি! রাজপুতের হাতে পরাজয়
মেনে পালাতে লজ্জা হচ্ছে না!—

তাহবর। তাদের আবার লজ্জা কি? তারা
ত স্ত্রীলোক নয়! পালান সাহাজাদা এখনও
সময় আছে! বেগম সাহেবকে সাহাজাদীকে
নিয়ে পালান।—এখনো সময় আছে।

রাজ্যার। আমি পালাবো না। পালাবো
কেন? না হয় মর্ব। বাবা—তুমি মোগল হয়ে
কোন্ মুখে পালাবে?

তাহবর। যে মুখে যুদ্ধ হচ্ছে তারই ঠিক
উল্টো মুখে। পালাতে হয় আবার কোন্
মুখে।

রাজ্যার। আমি পালাবো না।

তাহবর। তা আপনি যদি না পালান,
আমরাই পলাই। আপনি স্ত্রীলোক একটু
লজ্জা হচ্ছে হয়ত, আমাদের সে বিষয়ে কোন
লজ্জা নাই—কি বলেন সাহাজাদা!

আকবর। উঃ! কি ভীষণ রাত্রি! কি হাহাকার! কি হত্যা!

বাহিরে। “পালাও, পালাও!” “জয় রাণার জয়” “হর হর” ইত্যাদি।

রাজিয়া। উঃ কি কোলাহল!

তাহবর। কি ভাবছেন যুবরাজ! চলে আসুন! আপনি দেখাছি স্ত্রীলোকেরও অধম!

আকবর। উঃ কি হত্যা! এত হত্যা আমি কখন দেখি নি!

তাহবর। তা খাড়া হয়ে থাকলে কি হবে। ঐ—ঐ—শিবিরের দুয়োরে—এই দিকের দবোজা দিয়ে—ঐ শত্রু—

[—বলিয়া তাহবর পলায়ন করিলেন।

আকবর। চলে আস রাজিয়া।—আমরাও পালাই!

রাজিয়া। বাবা!

আকবর। কথা কসনে, এই দিক দিয়ে— এই দিক দিয়ে আস!—বলছি।

[আকবর রাজিয়াকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত।

দুইজন রাজপুত্র সেনানীর প্রবেশ

১ সেনানী। কেউ নাই—পালিয়েছে। কোন্ দিকে পালালো!

২ সেনানী। এই দিক দিয়ে—

তাহারা চলিয়া গেল। সমরসিংহ ও আরো রাজপুত্র সৈন্য প্রবেশ করিল

সমর। বল ভগবান একলিঙের জয়।

সকলে। জয় ভগবান জয় একলিঙের জয়।

সমর। ভীমসিংহ কোথায়?

১ সৈনিক। তাঁকে দেখাছি না।

সমর। যাও, অন্বেষণ কর।

[সমর ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

সমর। উঃ কি রাত্রি! কি যুদ্ধ! কি স্তূপীকৃত হত্যা!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গিরিদুর্গ। হৃদতীরে দুইটি প্রস্তর নির্মিত বেদী। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

কমলা বেদীতে বসিয়া একাকিনী গাহিতোছিলেন—

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ-বিরহ অবসানে।

কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত,
তব, প্রেমসুধারস দানে।

বন, আকুল বনফুল গন্ধে,
বন, মূর্খারিত মর্ম্মর ছন্দে,

বহে, শিহরি পবন মৃদুমন্দ,
গাহে, আকুল কোকিল, কুহু কুহু তানে।

একি জ্যোৎস্না গর্ষিত শর্ম্মরী;
একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ;

একি সুন্দর নীরব মেদিনী;
একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ;

বসে' আছি পাতি' মম অঙ্গল;
অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল;

এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত!—
মম প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে।

জয়সিংহ গানের মধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া
সে গীত শুনিতোছিলেন

কমলা। কে! ও! তুমি—

জয়। হাঁ আমি।

কমলা। কতক্ষণ এসেছো?

জয়। অনেকক্ষণ।

কমলা। এতক্ষণ কি করছিলে?

জয়। শুনছিলাম।

কমলা। কি?

জয়। বীণার ধ্বনির সঙ্গে মৃদুগ!—কি শুনছিলাম? কি শুনছিলাম তা ঠিক জানি না! কিন্তু যা শুনছিলাম তা পূর্বে কখন শুনি নাই।

কমলা। বুঝেছি। তুমি আমার গান শুনছিলে।

জয়সিংহ। হবে। আমি ত এতক্ষণ এ রাজ্যে ছিলাম না। স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। কিছু শুনছিলাম কি?—না, দেখাছিলাম?—দেখাছিলাম বুঝি, যে কতকগুলি সুন্দর কিশোর স্বর শূদ্রপক্ষ বিস্তার করে' আকাশে বিচরণ করছে। শেষে সে স্বরগুলি আরো গাঢ় হয়ে, আরো গদগদ হয়ে, আরো উজ্জ্বল হয়ে, একটি একটি নক্ষত্রে বিলীন হয়ে গেল!

কমলা। না! তুমি এত বেশী সংস্কৃত বলে, যে তার অর্থ বোঝা আমার অসাধ্য। সোজা প্রচলিত ভাষায় বল—বুঝতে পারি।

জয়। কমলা! তুমি যা গাইলে প্রাণ থেকে গাইলে কি? না একটা যা মনে এলো তাই গাইলে?

কমলা। কি বোধ হয়?

জয়। জানি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কোন যাদুকরী, আমাকে যাদু করেছে!

কমলা। যাদু করবার দরকার নেই। তুমি নিজেই যাদু আছো।

জয়। আমি যে নিষ্কর্ষ, নিস্তেজ, অকর্মণ্য হয়ে গিইছি।—একি ভালবাসা? না মোহ?

কমলা। যাই বল, ফল ত দাঁড়াচ্ছে এক। তুমি ত এই কড়ে আঙুলের চারিদিকে ঘুরেছো।

জয়। এ যদি ভালবাসা হয় ত এ ত বড় ভয়ানক!

কমলা। ভয়ানক নাকি?

জয়। ভয়ানক নয়? যে ভালোবাসা সব উৎসাহ, তেজ লুপ্ত করে, যে ভালোবাসা মানুষকে অজ্ঞানপ্রায় করে দেয়, তার চক্ষু হতে বিশ্বনিখিলকে নিষ্কর্ষিত করে; যত মানুষ মনুষ্য হারায়—সে বড় ভয়ানক অবস্থা!

কমলা। তাও ত বটে! এ ত বড় ভয়ানক! রোগ শক্ত। চিকিৎসা করা দরকার। বড় রাণীকে ডাকবো নাকি? সেই একা তোমার এ রোগ সারাতে পারে। কেমন দুটো ন্যাকা কথা বলে' সেদিন তোমায় যুদ্ধে পাঠাইছিল। ডাকবো?

জয়। না কমলা! এ রোগ তার চিকিৎসারও অসাধ্য হয়েছে। আর কেউ সারাতে পারে না। শোন কমলা—মাড়বারের সঙ্গে সম্রাট ঔরঞ্জীবের যুদ্ধ বেধেছে। পিতা আমায় সে দিন ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে বল্লেন—“যাও পুত্র! দুর্গাদাসের সাহায্যে যাও।” আমি মাথা হেঁট করে রৈলাম। তিনি বল্লেন “কি জয়সিং—নীরব রৈলে যে?” আমি মাথা হেঁট করে রৈলাম। পরে বল্লেন—“বুঝেছি, আচ্ছা অস্তঃপূরে যাও; আমি ভীমসিংহকে পাঠাচ্ছি।” মাথা হেঁট করে' চলে' এলাম। পরে সরস্বতী এসে ভৎসনা করলে। কথা কৈলাম না। মনে ধিক্কার হোল—আমায় একি করলে কমলা! কি মোহে আচ্ছন্ন করেছে! কি নেশায় বিভোর করে' রেখেছে!

কমলা। আমি কিন্তু তোমায় কিছু খাওয়াই নি টাওয়াই নি!—দোহাই ধর্ম!—শেষে যে আমায় দুষবে তা হবে না।

জয়। না কমলা, আমি তোমার দোষ

দিচ্ছি না!—একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'রূপ কি সূরা'! এখন দেখছি যে রূপ—

কমলা। আফিং! আমিও সে দিন বলেছিলাম! তুমি বিশ্বাস করলে না।

জয়। কমলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

কমলা। সে ত অনেকবার বলেছে।

জয়। তৃপ্ত হয় নাই। আবার বলছি ভালবাসি। বলতে বড় ভালো লাগে।

কমলা। তা যত খুসী বল।—তা মূখে যতই বল, আমি জানি কাজের বেলায় তুমি বড়রাণীগত প্রাণ।

জয়। আমি!

কমলা। নয় ত কি আমি!—আমি তোমার মূখের ভালোবাসা পেইছি মাত্র। কিন্তু কাজ গুঁছিয়ে নিয়েছে বড় রাণী।

জয়। কিসে?

কমলা। বলে' দরকার কি?

[সাভিমানে প্রস্থান।

জয়। শোন কমলা।—না এ নারীর ক্ষণিক অভিমান মাত্র! এই বৃষ্টি আর এই রৌদ্রে কি অপূর্ষ জাতিই তৈর করেছিলে পরমেশ!

সরস্বতীর প্রবেশ

সরস্বতী। নাথ!

জয়। সরস্বতী।

সরস্বতী। মাড়বারে মোগল ও রাজপুত্রের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম শুনছেন?

জয়। না।

সরস্বতী। শুনতে চাও? অবকাশ আছে?

জয়। বল শুন।

সর। সমরে মাড়বার জয়ী হয়েছে। কিন্তু—

জয়। কিন্তু?—

সরস্বতী। কিন্তু তোমার ভাই আর নাই।

জয়। কে, ভীমসিংহ?

সরস্বতী। হাঁ। তিনি এই যুদ্ধে মাড়বার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন!—বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

জয়। মহৎ উদার বীরোত্তম ভাই, তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছে।

সরস্বতী। আর তুমি?

জয়। বুঝি নরক!

সরস্বতী। হায় নাথ!

[প্রস্থান।

জয়। সরস্বতী আমায় ঘৃণা কোরো না।
আমি অক্ষম!—আমি অক্ষম!—এই যে পিতা
আস্ছেন। সঙ্গে মাড়বার মহিষী ও সমরসিংহ।
আমি কূপের ভেক, কূপের মধ্যে যাই। আমি
পিতার অবজ্ঞাকরণ দৃষ্টি সৈতে পার্শ্বা না।
[প্রস্থান।

রাজসিংহ, মহারাণী ও সমরসিংহের প্রবেশ

রাজ। এইখানে বোসো রাণী! ঘরে অসহ্য
রকম উত্তাপ! এই জ্যোৎস্নালোকে বস'।—এই
স্থান ভীমসিংহের বড় প্রিয়স্থান ছিল। সে
এখানে এসে ঐ নীল সরোবরের দিকে চেয়ে
সমস্ত প্রভাত কাটিয়ে দিত।

সকলে বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন

রাণী। রাণা! ভীমসিংহের শৌর্য্যকাহিনী
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার
জিনিষ।

রাজ। আমি তাকে হারিইছি—চিরদিনের
মত হারিইছি।

রাণী। রাণা! যুদ্ধে মরার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের
আর অধিক গৌরবের মৃত্যু আর কি আছে।
ভীমসিংহ যদি আমার পুত্র হোত, তা' হলে
তার অন্যরূপ মৃত্যু আমি কামনা কর্তাম না।

রাজ। তুমি সত্য কথা বলেছ মহারাণী—
বল সমরসিংহ' ভীমসিংহ কিরূপ যুদ্ধ
কর্লে!

সমর। সে রকম যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত কেহ
করে নাই রাণা। শুনুন! সে রাত্রি ঘোর অন্ধ-
কার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি
পড়াছিল। এরূপ ঘন অন্ধকার যে সেরূপ
অন্ধকার বৃষ্টি আর কখন হয় নাই। কেবল
মুহূর্মুহূর্ন আকাশব্যাপী বিদ্যুচ্ছটার পিঙল
দীপ্তি সে অন্ধকারকে দীর্ণ করিছিল। আর
মুহূর্মুহূর্ন বজ্রধ্বনি সে ভীষণ রাত্রিকে আরো
ভীষণ করে' তুলেছিল। উঃ—কি সে রাত্রি!

রাণী। তারপর?

রাজ। [উদ্ভ্রান্ত ভাবে] এ রকম রাত্রি!
—এ রকম রাত্রি!

সমর। এ হেন রাত্রিকালে আপনার পুত্র
আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দশ সহস্র
মেবার সৈন্য নিয়ে মোগলশিবির আক্রমণ করলে
—মোগলসৈন্য লক্ষাধিক হবে!

রাজ। [উদ্ভ্রান্তভাবে] আমি তাকে
নির্বাসিত করেছিলাম—তাকে নির্বাসিত
করেছিলাম।

রাণী। ধন্য শিশোদীয় কুমার! তারপর?
সমর। তার পরে একটা প্রকাণ্ড কঞ্জোল
—সেই বজ্রধ্বনি ছাপিয়ে উঠে আমাদের
কামানের বিরাট গঞ্জর্ন। আর সেই নৈশ
বৃষ্টিধারা ছাপিয়ে শত্রুসৈন্যের আত্মধ্বনি!

রাজ। [উদ্ভ্রান্তভাবে] আমি নিজের
দোষে তাকে হারিইছি।—পরে ভুল বুঝে-
ছিলাম! কিন্তু বড় অধিক বিলম্ব!

রাণী। তারপর?

সমর। তখন আমি দশ সহস্র রাঠোর সৈন্য
নিযে ভীমসিংহের সাহায্যার্থে গেলাম। গিয়ে
দেখলাম,—সেই বিদ্যুতের আলোকে কি দৃশ্য
দেখলাম রাণা—তা জীবনে ভুলতে পার্শ্বা
না!

বাজ। [উদ্ভ্রান্তভাবে] সে দিন সে
বলেছিল—পুত্র সেদিন বলেছিল যে এ যুদ্ধে
প্রাণ দিতে যাচ্ছি।

রাণী। বল সমরসিংহ!—

সমর। মহারাণী! বিদ্যুতের আলোকে
দেখলাম যে শত্রুসৈন্য বন্দুক তরবারি ভুল্ল
নিযে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভীমসিংহের সৈন্য
একটী বিশ্বগ্রাসী প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত তার
উপর গিয়ে পড়লো। অর্মানি বিপক্ষ পক্ষের
বন্দুক আর কামান অগ্নি উদ্গীরণ করল! কি
সে যুদ্ধ!—যেন জ্বালামুখীর গৈরিক
উদ্গারিত জ্বালার সঙ্গে ঘৃণীকঙ্কার যুদ্ধ!

রাণী। ধন্য ভীমসিংহ!—তারপর?

রাজ। [উদ্ভ্রান্তভাবে] অভিমান করে'
চলে' গেছে। পিতার পুত্রি পুত্র অভিমান
করে' চলে' গিয়েছে!

সমর। ভীমসিংহকে বিদ্যুতের আলোকে
তখন দেখতে পেলাম: উন্মত্তের ন্যায়—
মূর্ত্তমান প্রলয়ের ন্যায়। যেখানে শত্রুসংখ্যা
অধিক সেখানে ভীমসিংহ! তার দশ সহস্র
সৈন্য দশলক্ষ বোধ হতে লাগলো—একা
ভীমসিংহ একত্রে দশ জায়গায় দশজন সৈন্যা-
ধ্যক্ষের কাজ কর্তে লাগলো।

রাণী। ভীমসিংহ, ভীমসিংহ, তুমি যদি
আমার পুত্র হ'তে!

রাজ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে] অভিমান করে' চলে' গিয়েছে।

রাণী। তারপর?

সমর। এই সময়ে রাঠোর সৈন্য মেবার সৈন্যের সাহায্যে এসে উপস্থিত হোল। তাদের আসা মাত্রই, শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে— উদ্ধ্বাসে পালালো। আমরা তাদের বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম!

রাণী। তারপর?

সমর। শিবিরে ফিরে এলাম, ভীমসিংহকে দেখতে পেলাম না! পরদিন প্রাতঃকালে তার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পেলাম।

রাণী। রাণা! আপনার পুত্র আজ স্বদেশ রক্ষা করেছে।

রাজ। ভীমসিং, ভীমসিং! পুত্র—পুত্র!—
রাণা মূর্ছিত হইলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মোগলশিবির। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।
সম্রাটপুত্র আকবর ও মোগল সেনাপতি তাহবর খাঁ

আকবর। কি বল তাহবর খাঁ! এ যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইছি।

তাহবর। সম্পূর্ণ! সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই।

আকবর। কি বীরত্ব এই রাজপুত্র জাতির! কামানের গোলাকে বধুর মত আহ্বান করে, তরবারিকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করে!

তাহবর। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো ঠিক প্রেয়সীর মত এসে যে আমাদের আলিঙ্গন করে, তা ঠিক বলতে পারি না সাহাজাদা! বরং অনেকটা বারাগনার মত ফস করে' দেখতে না দেখতে কণ্ঠদেশে এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, বেশ একটা উদ্দেশ্য টের পাওয়া যায়।

আকবর। কি জাত! সাহসী বজ্রের মত; স্বচ্ছ আকাশের মত; উদার সমুদ্রের মত; কি জাত!

তাহবর। জাত ত বেশ! কিন্তু ঐ একটা দোষ সাহাজাদা!—ফুর্সৎ দেয় না। বড় বেশী ধাঁ করে' এসে পড়ে। দেখুন সাহাজাদা, কাল

রাতে শিবিরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে রৈছি। বাহিরে বিপর্যয় ঝড় বৃষ্টি। কোন ভদ্রলোক সে সময় ঘর থেকে বেরোয় না। এই রাজপুত্র জাতটা তা মানলে না! ঐ অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি ফুড়ে ধাঁ করে' আমাদের শিবিরে এসে পড়লো—বন্দুক, বর্ষা না নিয়ে এলে হয়ত ভাবতাম বৃষ্টি তামাসা কচ্ছে।

আকবর। সোভানাল্লা! কি জাঁকালো রকম আক্রমণই করল।

তাহবর। আর আমাদের সৈন্যগুলো কি জাঁকালো রকমই পালালো! সোভানাল্লা! এমনি উল্টো দিকে দৌড়লো যে ঐ অন্ধকারে হোছট খেয়ে পড়লো না, এই আশ্চর্য!

আকবর। কিন্তু এ পরাজয়ের কথা শুনে পিতা কি বলবেন?

তাহবর। তা ঠিক জানি না। তবে যে সন্দেশ খেতে দেবেন না সেটা নিশ্চিত। আমাকে ত আসবার আগে বেশ প্রাজল বিশুদ্ধ উদ্দেহে বলে' দিয়েছেন যে, আমি যদি এ যুদ্ধে হেরে আসি, ত আমার দুই হাতে দুগাছা লোহার বালা পরিবে দেবেন; সাড়ী পরাবেন কি না সেটা ঠিক করে' বলেন নি। তবে আমার নাচতে হবে না বোধ হয়।

আকবর। এখন উপায়? রাজপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ের আশা ত নাই।

তাহবর। তা নাই। আর ও জাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা-টায় আমার আপত্তি আছে।

আকবর। কি?

তাহবর। ওরা যুদ্ধ জানে না। সে দিন দেখলেন ত মেবারে? না খেতে দিয়ে মার্শ্বার ফন্দি বের করল। এ কোন শাস্ত্রে লেখে? তারপর এখানে যুদ্ধ হবার পূর্বে এসে আক্রমণ করল।—কেউ শুনেনি! আরে যুদ্ধ করি ত যুদ্ধ কর। তরোয়াল নে। দ্বার এগো, দ্বার পেছো; দ্বটো চক্র দে; দ্বটো বোল ছাড়। না, ধাঁ করে' এসে একধার থেকে কাটতে সুরু করল। যেন বেটা মাথাগুলো বেওয়ারিশ মাল পেয়েছে।

আকবর। না তাহবর খাঁ! আমি এ জাতটাকে ষতই দেখছি ততই মূর্খ হচ্ছি!—এদের সাহায্য পেলে আমি পৃথিবী জয় কর্তে পারি।

তাহবর। এদের সাহায্য পেলে ত পারেন, না পেলে ত নয়।—আচ্ছা একটা ত কাজ কর্তে পারেন।

আকবর। কি?

তাহবর। এঃ—এ যে ভারি সোজা কাজ। এতক্ষণ ত মাথায় ঢুকিনি।—বেজায় সোজা। আঃ এমন কাজ একটা হাতে রয়েছে!

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এ যে যতই ভাবছি, ততই বেশী সোজা বোধ হচ্ছে।—শুনুন, আপনি সম্রাট হ'তে চান?

আকবর। কি রকম করে?

তাহবর। কি রকম করে?—অত এগিয়ে গেলে হবে না।—আগে চান কি না?

আকবর। হাঁ চাই।

তাহবর। সোনার চাঁদ আমার! সম্রাট অর্মানি হলেই হোল!—পড়ে' রয়েছে!

আকবর। তুমিই ত প্রস্তাব করলে!

তাহবর। তা করেছি বটে। তবে শুনুন—এর এক খুব সোজা উপায় রয়েছে।

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এই রাজপুত্র জাতি—হাঃ হাঃ হাঃ—এ যে ভারি সোজা।

আকবর। কি রকম? কৈ? খুব সোজা না কি?

তাহবর। ভারি সোজা! বলছিলেন না সাহাজাদা যে রাজপুত্র ভারি জাত? ধরুন, তারা যদি ঔরঞ্জীবকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে চাঁড়িয়ে দেয়। আপন্তি আছে? আমাদের সৈন্য আর রাজপুত্র সৈন্য যদি যোগ হয়—

আকবর। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম। সোভানাল্লা!

তাহবর। আরে শুনুন। এ বাইজির গান নয় যে, না শুনাই চোঁচয়ে উঠবেন, সোভানাল্লা! শেষ পর্যন্ত, শুনুন।—এখন প্রশ্ন হতে পারে এই যে, রাজপুত্রেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না?—তাদের ত ঘুম হচ্ছে না।

আকবর। সেটা ত প্রশ্ন হতেই পারে বটে।—এঃ আবার ঘুর্লিয়ে দিলে!

তাহবর। তার যে অত্যন্ত সোজা উত্তর রয়েছে।

আকবর। রয়েছে না কি?

তাহবর। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, কেন যে দেবে না তা ত বোঝা যাচ্ছে না।

আকবর। বাঃ খুব সোজা উত্তর ত!

তাহবর। বলি তারা দারার পক্ষ হয়ে লড়েনি? সম্রাটের পক্ষ হয়ে লড়েনি?

আকবর। আমিও ত তাই বলছিলাম।

তাহবর। কিন্তু—

আকবর। আবার কিন্তু কি—আবার সব ঘুর্লিয়ে দিলে!

তাহবর। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি বলি একবার রাঠোর সেনাপতির সঙ্গে সেটা যুক্তি করে দেখলেই ত বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় ছাই।

আকবর। আমিও তাই বলছিলাম! ব্যাস্—তুমি তবে রাঠোর শিবিরে যাও।

তাহবর। সে বিষয়ে আমার একটু আপত্তি আছে। দুর্গাদাস যদি সেই সময়ে তরোয়াল-খানা নাকের সামনে সেই রকম ঘোরায়—আর মাথায় হাত দিয়ে মাথাটা খুঁজে না পাই।

আকবর। তা ঘোরাবে না।

তাহবর। যদি ঘোরায়?

আকবর। তখন বলো—হাঁ।

তাহবর। তখন হাঁ বলবার ফুর্সৎ পেলাম কৈ। আমার মাথাটাই যদি রৈল আমার পায়ের নীচে পড়ে, তবে হাঁ বলবো কি দিয়ে!

আকবর। তবে উপায়?

তাহবর। উপায় এক—রাঠোর সেনাপতিকে এখানে ডাকা। পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, ত মহম্মদ ত পর্বতের কাছে আসতে পারেন।

আকবর। ব্যাস্—তাও ত হতে পারে। আমিও ত তাই—

তাহবর। তাও যখন হতে পারে, তবে তাই হোক না। সব গোল মিটে গেল ত। এখন আমি আসি—একটু নাসিকাধর্মান করিগে যাই।

[—বলিয়া তাহবর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

আকবর। মন্দ কি—এতদ্ভিন্ন আমার সম্রাট হবার উপায় দেখি না! অন্ততঃ আজমী জীবিত থাকতে!—উঃ কি মেঘগজ্জন।

রাজিয়ার প্রবেশ

রাজিয়া। বাবা বাইরে এসো। শিল
পড়ছে—শিল পড়ছে।

আকবর। তা পড়ুক।

রাজিয়া। দেখসে! [হাত ধরিয়া টানিলেন]

আকবর। যাঃ তোর লজ্জা নেই। তুই বড়
হইছিস! জানিস্? যাঃ—

[রাজিয়া বিষন্নভাবে প্রস্থান করিল।

আকবর। দেখি! তীরে বসে' ঢেউ গুণে
কি হবে। ঝাঁপিয়ে ত পড়ি! পরে যা হয় হবে।
এই রমজান—সরাব লে আও, বাইজি লে
আও!—উসি তাঁব্দমে।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মারাঠা শম্ভুজির প্রাসাদের অন্তঃপুর কক্ষ।
কাল—রাতি।

রমা একাকিনী কাণ পাতিয়া কি শুনিতোছিলেন

রমা। উঃ কি চীৎকার! কি পৈশাচিক
হাস্যধ্বনি। সঙে সঙে রমণীর আন্তর্নাদ।
এ কি! নৈশ ব্যাভিচারলীলা বাড়তেই চলেছে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কেন গা? ডাক্ছিলে কেন?

রমা। দেখে আয় ত বোন, বাইরে ও
কিসের কোলাহল।

পরি। কিসের আবার! জান না আর কি?
—ন্যাকা সাজো কেন?

রমা। কিন্তু দেখে আয় রমণীটি কে?

পরি। কে আবার!—শুন্লাম এক
ব্রাহ্মণের ইস্তিরি! রাজার ঐ পোড়ারমুখো
শনি কাব্লেস খাঁ—তাকে নিয়ে এসেছে।
এখন তারা দুজনে মিলে তাকে নিয়ে চেঁচাচ্ছে।
আবার কি!

রমা। তবু দেখে আয় রমণীটি কে?—
সেকি সত্যই কুলনারী।

পরি। সত্যি মিথ্যা তুমি দেখে এসো।
আমি পার্বে না। শেষে নকরি কর্তে এসে
জান দেবো। যদি মোরেই দু'ঘা বসিয়েই দেয়!
বিশ্বেস কি?

রমা। হায় স্বামী! [কন্দন]

পরি। এই নাকিসদর ধর্মে। তুমি চুপটি

করে' বসে' থাকো। তোমার রাণীপদ কেউ
কেড়ে নিচ্ছে না। তুমি যে রাণী আছো, সেই
রাণীই থাকবে। ভয় নেই।

রমা। কি বোন! ভাবিস্ যে আমি সেই
ভয়ে কাঁদছি। এরকম রাণী হওয়ার চেয়ে
কাটকুড়োনী হওয়াও ভাল ছিল।

পরি। ওমা বলে কিগো! বলি সোনার
পালঙে বসে' অমন বলা সোজা যে কাট-
কুড়োনী হওয়া ভালো। কখন গতির খাটিয়ে
ত খেতে হয় নি!

রমা। আমি তাই খাবো বোন। আমাকে
তুই শেখা। এ রকম নামে মাত্র রাণী থাকতে
চাই না। যদি রাণী হয়েও কুলনারীর ধর্ম
রক্ষা কর্তে না পারলাম ত রাণী হয়ে লাভ কি।

পরি। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানী শব্দে
চাইনে। তোমার যা মনে লাগে কোরো। মোর
কি! আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ
কি ভাই।

[বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

রমা। হায় নাথ! এতদিন বারাঙ্গনা নিয়ে
নৃত্যগীত কর্তে—কর্তে। যে স্বেচ্ছায় ব্যাভি-
চারিণী—যে ব্যবসায় কুলটা, তাকে নিয়ে হাস্য-
পরিহাস করো, যায় আসে না; কিন্তু
কুলবধুকে দুর্গের ভিতরে টেনে এনে তার
অপমান!—সাবধান! ধর্ম সৈবে না, এতদূর
ধর্ম সৈবে না।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—মোগলশিবির। কাল—রাতি।

মুকুটশোভিত আকবর সিংহাসনারূঢ় মস্তকে রাজ-
চ্ছত্র ও পার্শ্ব চামর ধারণীস্বয়ং। সম্মুখে পারিষদ-
বর্গ ও নর্তকীবন্দ

আকবর। আমি সম্রাট আকবর নম্বর
দোয়েম্।—কি না?

১ পারিষদ। হাঁ।

আকবর। আমার মাথায় রাজচ্ছত্র আছে—
কি না?

২ পারিষদ। আছে বলে' আছে!

আকবর। আমার জয়পতাকা উড়ছে—কি
না?

৩ পরি। শব্দ উড়ছে! একবার পত-
পত শব্দে উড়ছে।

আকবর। বাস্! আর কিছই চাই না, গাও।

বাজনা বাজিল

আকবর। দাঁড়াও।—সম্মাট বেটা কি কচ্ছে বলতে পারো?

১ পারিষদ। সে বেটা পালিয়েছে।

আকবর। উহু—বেটা পালাবার ছেলে নয়। বেটা যুদ্ধ করবে। সহজে ছাড়বে?—তা করুক বেটা যুদ্ধ। যখন আমার পক্ষে দুর্গগোদাস আছে, আমি কাউকে ডরাই নে।—ওহে জানো বেটা দুর্গগোদাসকে বাবা—অর্থাৎ কিনা দুর্গগোদাসকে বেটা বাবা ভারি ডরায়।

৩ পারিষদ। ডরায় নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ।

আকবর। উঃ!—সেদিন এক বেটা ছবি-ওয়াল শিবাজি আর দুর্গগোদাসের ছবি একে নিয়ে এসে বাবাকে দেখাচ্ছিল। তা বাবা শিবাজির ছবি দেখে বললে “এ বেটাকে সাপটে নিতে পারি—কিন্তু ঐ বেটা—কিনা দুর্গগোদাস—জ্বালাবে।

২ পারিষদ। ছবি দুটো কি রকম একে-ছিল।

আকবর। শিবাজি একেছিল গদিতে বসে’ আছে; মাথায় মুকুট, কপালে তিলক। কিন্তু দুর্গগোদাস ঘোড়ার উপর চড়ে’ বর্ষার আগায় ভুটা পোড়াচ্ছে।

২ পারিষদ। ও বাবা! শুনেনই আমাদের ভয় পাচ্ছে, তা সম্মাট—

আকবর। সম্মাট কে?

১ পারিষদ। [ম্বিতীয় পারিষদকে।] হাঁ সম্মাট কে হে?

আকবর। সম্মাট ত আমি।

১ পারিষদ। জাঁহাপনাই ত সম্মাট, খোদা-বন্দ!

আকবর। বাস—তবে গাও।

বাজনা বাজিল

আকবর। হাঁ শোন।—দুর্গগোদাস কোথায় গেল? কেউ জানো?

৩ পারিষদ। কৈ? না।

আকবর। হাঁ উদয়পুরে গিয়েছে বটে:—তবে আমার অনুর্তি না নিয়ে গেল কেন? কেন যায়!—আমি সম্মাট—সে জানে না?—কেন যায়?

২ পারিষদ। হাঁ কেন যায়!

আকবর। ও! রাণা রাজসিংহের পীড়ার খবর পেয়ে গিয়েছে বটে! আচ্ছা এবার তাকে মাফ করলাম।

২ পারিষদ। হুজুর মা বাপ।

আকবর। আমি সম্মাট।

১ পারিষদ। হাঁ হুজুরই ত সম্মাট—আবার কে?

আকবর। বাস্! তবে গাও।

গীত

আহা কি মাধুরী বিরাজে।

নন্দনকানন ভুবন মাঝে।

উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,

নৃত্যবিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—

মন্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।

চরণে কিঞ্চিকণী, রিনিরিনি রিনি ঝিনি,

তালে তালে উঠে—তাজ বে তাজে

বেগ্ন বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে।

নৃত্যগীতের মধ্যে রাজিয়া আসিয়া দূরে একটি ত্রিপদীর উপর দক্ষিণ হস্তের কফোনি রাখিয়া ও দক্ষিণ করতলে চিবুক রাখিয়া গান শুনিতোছিলেন

আকবর। সোভনাল্লা—স্বর্গ যদি এই রকম হয় ত স্বর্গ বড় সুখের জায়গা।

রাজিয়া। ভূপালীতে ত কড়িমধ্যম নেই।

আকবর। এই! তুই এখানে কেন?

রাজিয়া। তা হবে মিশ্রভূপালী—বাবা! মা ডাকছেন।

আকবর। তোর মার ঠাকুন্দার পিন্ড!—এই কি ডাকবার সময়?—এঃ সব ঘূলিয়ে দিলে!

পারিষদ। সব ঘূলিয়ে দিলে, জনাব সব ঘূলিয়ে দিলে!

আকবর। যাঃ এখন ভেতরে যা।—তোরা লজ্জা নেই।—এখানে এসে উপস্থিত।

রাজিয়া। মা ডাকছেন; তাঁর অসুখ বড় বেড়েছে।

আকবর। তাই কি!—অসুখ ত হাকিম ডাক্। আমি কি কর্ব!—আমি এখন যাবো না।

রাজিয়া। তিনি মৃত্যু শয্যায়। তিনি বলেন, “রাজিয়া তুই তাঁকে গিয়ে বল্ যে

মর্ষার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।”

আকবর। দেখা! দেখা করে' কি হবে!—সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে!—মর্ষার কি আর সময় পেল না! যাঃ—এই তোমরা কেউ একে ভেতরে রেখে এসো।—এই কেন্ হ্যায়।

দৌবারিকের প্রবেশ

আকবর। একে ভেতরে রেখে আয়।—টেনে নিয়ে যা।—দাঁড়িয়ে রৈলি যে।—

দৌবারিক আসিয়া রাজ্যার হাত ধরিয়া কহিল—“আসুন, সাহাজাদী!”

রাজিয়া। খবর্দার।—বাবা! আমি তোমার মেয়ে!—একজন চাকর এসে আমার হাত ধরে?—

আকবর। আমার হুকুম।

রাজিয়া। “তোমার হুকুম!—বাবা!”—

[বলিয়া অপমানে কাঁদিয়া সেখান হইতে রাজিয়া চলিয়া গেল।

আকবর। সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে! সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে।—এই—গাও—নাচো—

আবার বাজনা বাজিল

এই সময়ে তাহবর খাঁ শিবিরে প্রবেশ করিলেন

আকবর। কে! তাহবর খাঁ? সেনাপতি?

তাহবর। সাহাজাদা—

আকবর। এই!—সাহাজাদা কি?—বল ‘সম্মাট’—‘জাঁহাপনা’—এ দিকে দেখছো না?—রাজচ্ছত্র দেখাইলেন।

তাহবর। দেখাছ বৈ কি!—আমি এ দিকে দেখাছ। সাহাজাদা একবার এসে ও দিকটা দেখুন।

আকবর। কেন! ওঁদিকে কি হয়েছে?

তাহবর। ওঁদিকে রাজপুত সৈন্য আপনাকে পরিত্যাগ করেছে।

আকবর। পরিত্যাগ করেছে! তাহবর! তুমি কি নেশা করেছে?—ভাং, চণ্ডু, না তাড়ি? পরিত্যাগ করেছে বল কি হে? তা কখন হতে পারে?

তাহবর। শব্দ হতে পারে না। সেই রকম ঠিক হয়েছে।—ঘোড়ার কিস্তী; দাবা গেল।

আকবর। দাবা গেল কি?

তাহবর। হাঁ সাহাজাদা! রাজপুতদের কে বদ্বিয়েছে যে, সাহাজাদা সম্মাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

আকবর। সম্মাটই বা কে আর সাহাজাদাই বা কে?—এ সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে।

তাহবর। সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে সাহাজাদা! বাহিরে এসে দেখুন—বাহিরে একটাও রাজপুত শিবির নেই, সব ঘূর্ণলিয়ে গিয়েছে।

আকবর। বল কি—আর আমাদের সৈন্য—বাদ্যকরগণকে কহিলেন—“এই চোপরও।”

তাহবর। সম্মাটের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আকবর। চক্রান্ত! চক্রান্ত! তাহবর তোমার চক্রান্ত!—

তাহবর। যুবরাজ মদিরা বেশী খেয়েছেন। আমার চক্রান্ত! নিজের গম্ভীরন দিয়ে চক্রান্ত! আপাততঃ কিস্তি সামলান। ঘোড়ার কিস্তি, দাবা গেল।

আকবর। আমি বুঝেছি তোমার চক্রান্ত! পাকড়া—এই কেন্ হ্যায়।

তাহবর। হাঃ হাঃ হাঃ এখন কে কাকে পাকড়ায় সাহাজাদা, আর আমার গম্ভীরন নিলে আপনার গম্ভীরন বাঁচবে না!—একটা কথা শুনুন সাহাজাদা! আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। বিকানীরের মহারাজের কাছে এক পত্র পেয়েছি যে যদি এখনো সম্মাটের বশ্যতা স্বীকার করি, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। তাই চেষ্টা করে' দেখা যাক না। চলুন সম্মাটের কাছে।

আকবর। পিতার কাছে!

তাহবর। মন্দ কি? আমার এই মাথাটার উপর যে আমার বিশেষ ভক্তি আছে তা নয়। তবে দেখা যাক যদি টেনেটুনে রাখতে পারি। চেষ্টা করা মন্দ কি?

[প্রস্থান।

আকবর। কি রকম! রাজপুত জাত বিশ্বাসঘাতক।—তারা পরিত্যাগ করবে!—সব ঘূর্ণলিয়ে দিলে। এই কে আছে—কুছপরোয়া নেই—নাচো—গাও—

আবার বাজনা বাজিল—

নবম দৃশ্য

স্থান—আজমীরে ঔরঞ্জীবের বাহিকক্ষ।

কাল—প্রহরাধিক রাত্রি।

ঔরঞ্জীব অর্ধশয়ান, সম্মুখে দিলীর খাঁ

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! রাজপুত্র শিবির হতে আর কোন সম্বাদ পেয়েছো?

দিলীর। সম্বাদের মধ্যে তাদের বজ্র-নিলাদসম কামানের ধ্বনি শুনোছি—তার বেশী কিছু নয়। ধ্বনি ক্রমেই নিকটতর আর স্পষ্টতর হচ্ছে।

ঔরঞ্জীব। উদ্দেশ্য?

দিলীর। উদ্দেশ্য বিশেষ সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না।

ঔরঞ্জীব। আকবর! আকবর!—আমাকে ঠেলে ফেলে তুমি সম্রাট হবে ঠিক করেছে? একদিন তুমিই সম্রাট হ'তে!—তোমার জন্য এত যত্ন, এত শ্রম, এত ব্যয় সব নিষ্ফল হ'ল!—দিলীর খাঁ! আমি এ কখন ভাবিনি।

দিলীর। কেন যে ভাবেন নি, তা বলতে পারি না। আকবর বাদশাহী চালই চেলেছেন? তবে তিনি মৌজাম, আজীম, আর কামবক্স সম্বন্ধে বাদশাহী নীতি অবলম্বন কববেন কিনা তা এখনো টের পাওয়া যায় নি।

ঔরঞ্জীব। দিলীর! যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমার এই সাম্রাজ্য অধিকার কর্তে হয়েছে, আমার মত নয় যে তার পুনরাভিনয় হয়।

দিলীর। সম্রাটের মত এরই মধ্যে অনেক বদলেছে দেখছি—আহা সম্রাট সাহজাহান যদি এসময় বর্তমান থাকতেন! তাঁর দেখেও সুখ হোত।

ঔরঞ্জীব। সাবধান হয়ে কথা কও দিলীর খাঁ!

দিলীর। কি জন্য সম্রাট? দিলীর সত্য কথা বলতে কখন কারো অপেক্ষা রাখে না! সম্রাট কি ভাবেন যে একথা স্বপ্নেও আকবরের মনে আসতো, যদি সম্রাট তার পথ না দেখাতেন। জাঁহাপনা! বন্ধুর উপদেশ শুনুন! এখনও পুণ্যকার্যে সে হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করুন। জিজিয়া কর রথ করুন। হিন্দুজাতিতে বন্ধু করুন। আর বলতে হবে কি—সর্ব সর্বনাশের মূল এই কাশ্মীরী বেগমকে দূর

করুন। নহিলে এই অন্যায় পরম্পরায় ফল-ভোগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।”

[বলিয়া চলিয়া গেলেন

ঔরঞ্জীব। কথা সত্য! তিন্ত হলে' কি কর্ব। সত্য! তারই পুনরাভিনয় হচ্ছে; দারা! সরল উদার ভাই দারা! ক্ষমা কোরো! আমি অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় করেছি বটে—কিন্তু সে এই ইসলাম ধর্মের জন্য।—ঈশ্বর সাক্ষী!

শ্যামসিংহের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। কি সম্বাদ মহারাজ?

শ্যাম। কার্য উদ্ধার হয়েছে—জাঁহাপনা। যতদূর আশা করিনি তা হয়েছে! রাজপুত্র আকবরকে পরিত্যাগ করেছে।

ঔরঞ্জীব বলিলেন—“কিরূপ?”

শ্যাম। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের দিকে গিয়েছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কুমার নৃত্য-গীতে ব্যস্ত থাকায়, তা লক্ষ্য কর্তে অবসর পান নি! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন।

ঔরঞ্জীব। কি রকম?

শ্যাম। বন্দার পরামর্শে জাঁহাপনা আকবরকে যে পত্র লিখেছিলেন—

ঔরঞ্জীব। কোন্ পত্র?

শ্যাম। এই বলে' যে “কুমার আকবর যে মতলব করেছেন যে রাজপুত্রেরা সম্রাটকে যেই আক্রমণ করবে, আকবর পিছন থেকে রাজপুত্রদের আক্রমণ করবেন, এ মতলব অতি সুন্দর”—সে পত্রখানা আমি সেনাপতির ভাই সমরসিংহের হাতে দিতে বলেছিলাম! রাজপুত্রেরা সে কথা বিশ্বাস করেছে; আর রাজপুত্রের সঙ্গে আকবরের যোগদান করা সম্রাটের ছিল এইরূপ বন্ধে, তাঁরা আকবরকে পরিত্যাগ করেছে।

ঔরঞ্জীব। সত্য মহারাজ? সে কথা রাজপুত্র বিশ্বাস করবে আমি ভাবি নাই। দুর্গাদাস তাই বিশ্বাস করেছে?

শ্যাম। দুর্গাদাস সেখানে নাই। সে রাজসিংহের পীড়া সংবাদ শূনে উদয়পুর গিয়েছে।

ঔরঞ্জীব। আর তাহবর খাঁ—তার সম্বাদ কি?

শ্যাম। তাহবর খাঁ বন্দী! তাকে আমি পত্র লিখেছিলাম যে—“তুমি এখনও যদি বিদ্রোহী-

দের পরিত্যাগ করে' তোমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে এসে সন্ধ্যার মাজ্জানা ভিক্ষা কর, তিনি মাজ্জানা করবেন।" সেই পত্র তিনি বিশ্বাস করে' মোগলশিবিরে এসেছিলেন। কুমার আজীম অমনি তাকে বন্দী করেছেন।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ! আপনার কাছে যে আমি কি কৃতজ্ঞ রৈলাম, তা আর কি বলবো।

শ্যাম। সন্ধ্যার অন্তর্গত।

ঔরঞ্জীব। ও কিসের গোলোযোগ বাহিরে?

শ্যাম। "দেখি।"

[—বলিয়া শঙ্কিতভাবে বাহিরে চালায়া গেলেন।

ঔরঞ্জীব। এ কি! কোলাহল যে বাড়ছেই!—অস্ত্রের শব্দ! এ কি! বন্দকের শব্দ!—দৌবারিক।

রক্তাক্ত কলেবরে তাহবর প্রবেশ করিলেন

ঔরঞ্জীব। তাহবর খাঁ!

তাহবর। "এই যে সন্ধ্যাট!" সন্ধ্যার প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন; এমন সময় দিলীর খাঁ আসিয়া কহিলেন—"খব্দার!" তাহবর একবার মাত্র ফিরিয়া দেখিলেন, আবার সন্ধ্যার প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলে দিলীর খাঁর পিস্তলে ভূপতিত হইলেন।

ঔরঞ্জীব। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি! নেমক হারাম কুকুর!

দিলীর। মরে' গিয়েছে জাঁহাপনা! গাল-গদলো একটাও শব্দে পেলেন না।

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

দিলীর। জাঁহাপনা! তার আর আশ্চর্য্য কি! আপনার প্রাণরক্ষা করবার জন্যই ত মাহিনা খাচ্ছি।

ঔরং। দিলীর খাঁ! তোমাকে চ্যুত করে এই পাঠানকে সেনাপতি করেছিলাম।—তার এই ফল। আমাকে ক্ষমা কর দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা আমি সামান্য ভৃত্য! আমার ও কথা!

ঔরং। তুমি ভৃত্য নও', এ রাজ্যে একা তুমিই আমার বন্ধু। কি পুরস্কার চাও দিলীর?

দিলীর। জাঁহাপনার জীবন রক্ষা কর্তে

পেরেছি, তাই আমার প্রচুর পুরস্কার।—আর কিছু চাই না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মহৎ।

দশম দৃশ্য

স্থান—রাজপুত্র শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও রাজপুত্র সম্ভারগণ

দুর্গা। বিজয়সিং! এবার সত্যই আমরা প্রতারণিত হয়েছি।

সমর। তুমি এতদিনে মোগলকে চেনো নাই, দুর্গাদাস!

বিজয়। আকবর এত কুট, আমি তা ভাবিনি!

মুকুন্দ। দেখতে বেশ সরল।

গোপীনাথ। তবে নেহাইৎ অপদার্থ। চন্দ্রশঙ্কর নৃত্যগীত। কিন্তু ওরকম লোক ত খল হয় না।

সমর। গোপীনাথ! মোগলের সবই সম্ভব।—আমি জলকে বিশ্বাস কর্তে পারি, গহ্বরকে বিশ্বাস কর্তে পারি, সর্পকে বিশ্বাস কর্তে পারি; কিন্তু মোগলকে বিশ্বাস কর্তে পারি না! এ তার জাতিগত ধর্ম! কর্তে কি? গোপীনাথ। সেনাপতি! রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হোল কিসে?

দুর্গা। ঠিক জানা যায় নি। কুমার ভীমসিংহের মৃত্যু সম্বাদ শুনে তিনি মর্ছিত হয়েন, সে মর্ছা আর ভাঙে নি।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"প্রভু! সন্ধ্যাপুত্র আকবর সপরিবারে দ্বারদেশে উপস্থিত।"

বিজয়। আকবর?

দুর্গা। সপরিবারে?

সমর। সাবধান! এর মধ্যে আরো কিছু আছে। ঢুকতে দিও না।

দুর্গা। না, শুন। বন্ধুর সঙ্গে দুই একবার দেখা না করলে যায় আসে না, দাদা! কিন্তু শত্রুকে ফেরাতে নেই।—[দৌবারিককে] তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো দৌবারিক।

[দৌবারিক প্রস্থান করিল।

মুকুন্দ। এর অর্থ?

সমর। আর এক জুয়াচুরী—সাবধান দুর্গাদাস!

গোপীনাথ। এ যুদ্ধে কি বিস্ময়ের অন্ত নাই।

দুর্গা। সকলে এঁদের যথোচিত সম্মান দেখাবে।

সপরিবারে আকবরের প্রবেশ

সকলে সসম্মানে গাটোথান করিলেন

দুর্গাদাস। আজ আমাদের এ সম্মান কি হেতু সাহাজাদা?

আকবর। রাঠোর সেনাপতি! আমি প্রতারণিত হয়েছি।

সমর। আপনি প্রতারণিত হয়েছেন? না আমরা প্রতারণিত হয়েছি?

আকবর। হয় ত উভয়েই প্রতারণিত। রাজপুতসৈন্য আমার সহায় হয়ে আমাকে সম্রাটপদে অভিষেক করে। পরে আমি যখন নিশ্চিন্ত; যখন আমি পিতার বিশ্বেষভাজন; তখন রাজপুত আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

সমর। মিথ্যা কথা।

রাজিয়া। সৈনিক!—পিতাকে . . . অসম্মান করবেন না!—বলিয়া রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে দুর্গাদাসের দিকে চাহিলেন।

দুর্গা। একটু চুপ কর দাদা।—সাহাজাদা! রাজপুত বিনাকারণে আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকের জাত নয়। সম্রাটের এই পত্রপাঠে এঁরা বোঝেন যে রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি সাহাজাদার ছিল।—‘পড়ুন এই পত্র’—বলিয়া আকবরের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। আকবর পত্রপাঠান্তর করিলেন “সেনাপতি এ. মিথ্যা।”

সমর। কি মিথ্যা?—এ সম্রাটের হস্তাক্ষর নয়?

আকবর। হাঁ তাঁরই হস্তাক্ষর। কিন্তু এ পত্র কপট; আমাদের বিচ্ছিন্ন করবার অভিপ্রায়ে লিখিত। এ পত্র আমার নামে বটে; কিন্তু রাজপুত সেনাপতির উদ্দেশে প্রেরিত। নহিলে এ পত্র আমার হাতে না পড়ে’ রাজপুত সেনাপতির হাতে পড়বে কেন? মোগলদূত কি রাজপুত মোগল চেনে না? যদি এ সত্য কথাই হয়, তবে এ হেন গোপনীয় সম্বাদ দূত কি যার হাতে দিত?

দুর্গাদাস সকলের প্রতি চাহিলেন—বলিলেন “কি বল?”

সমর। আমরা শূন্যে চাই না। আমরা বরাবর মোগলের দ্বারা প্রতারণিত হয়েছি। তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই না।

আকবর। রাঠোর বীর! আমার দুর্কুল নষ্ট করে’ আমাকে অতল জলে ভাসিয়ে দেবেন না। আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

দুর্গা। সভার কি মত?

বিজয়। আমি বলি মোগলের সংস্রবে না থাকাই ভালো।

মুকুন্দ। আমারও সেই মত! মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ একস্থানেই প্রার্থনীয়—সে সমর ক্ষেত্রে।

জগৎ। আমিও তাই বলি! মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি না। আমরা যুদ্ধ কর্তে জানি—যুদ্ধই কর্ব।

দুর্জর্জন। সেনাপতি! আমারও সেই মত সাহাজাদা। ফিরে যান মোগলের শিবিরে। আপনার পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই নিজের পুত্রকে ক্ষমা করবেন।

আকবর। তবে আপনারা আমার পিতাকে চেনেন না।

সমর। বেশ চিনি। আর অধিক চিনবার প্রয়োজন নাই।—ফিরে যান যুবরাজ।

আকবর দুর্গাদাসকে করিলেন “রাঠোর-সেনাপতি! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

দুর্গা। সামন্তগণ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আশ্রয়-দান করা।

সমর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হতে পারে না সর্পকে দুগ্ধ দিয়ে পোষা।

আকবর। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারণিত হইছি।

দুর্জর্জন। সম্ভব। তথাপি এ ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভালো।

আকবর। এই কি সভার মত? রাজপুত-জাতি আশ্রয়দানে অসম্মত?

সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

আকবর। সেনাপতি! আমি সম্রাটের পুত্র—প্রতারণিত, পরিত্যক্ত, নতজানু হয়ে, পুত্র-কন্যাসহ আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

[পদকন্যাগণকে] নতজান্দ হও সাহাজাদা!
নতজান্দ হও সাহাজাদি!

রাজিয়া নতজান্দ হইয়া সবাপনেদ্রে কহিলেন—দুর্গাদাস! পিতাকে রক্ষা কর।

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

দুর্গা। উত্তম! তবে আমি একা সম্মত।—
সামন্তগণ! দুর্গাদাস আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। আশ্রয়প্রার্থীকে সে আশ্রয়দানে পরাম্ভু হবে না। সামন্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ কর্ব না—চলে আসুন যুবরাজ! ষতদিন দুর্গাদাস জীবিত আছে, কারো সাধ্য নাই যে আপনার একটি কেশও স্পর্শ করে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার-কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

সম্রাটপুত্র মৌজাম ও সেনাপতি দিল্লীর খাঁ
দন্ডায়মান

দিল্লীর। তা হলে দুর্গাদাস আকবরকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছে।

মৌজাম। হাঁ সেনাপতি! আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর সামন্তগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এখন তাঁর শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

দিল্লীর। ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। পাঁচশ মাত্র তাঁর একান্ত অনুগত সৈন্য এ দূরপ্রবাসে তাঁর সহযাত্রী হয়েছে। আমি সসৈন্যে তাদের ঘেরাও করেছিলাম। দুর্গাদাস একদিন রাত্রিকালে তাঁর পাঁচশ সৈন্য নিয়ে মোগল ফটক ভেদ করে' চলে গেলেন।—পরে শুনলাম দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন।

দিল্লীর। ধন্য; ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে ৪০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দুর্গাদাসকে পাঠাইছিলাম। দুর্গাদাস সে সমস্ত আকবরকে দিয়েছেন। নিজে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নি।

দিল্লীর। আবার বলি ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। এখন মাড়বারের সেনাপতি কে? দিল্লীর। দুর্গাদাসের ভাই সমরসিংহ।

মৌজাম। আকবরের পরিবার?

দিল্লীর। তাঁরই আশ্রয়ে। তাঁর বেগমের মৃত্যু হয়েছে। তবে সাহাজাদী সমরসিংহের আশ্রয়ে।

আজমীর প্রবেশ

আজমীর। সেনাপতি! সম্রাটের ইচ্ছা—
রাজপুত্রের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। এই কথা আপনাকে জানাতে সম্রাট আমায় পাঠিয়েছেন।

দিল্লীর। কি! সত্য! সন্ধি! সত্য সাহাজাদা?—সম্রাট সত্যি কি সন্ধিপ্রার্থী?

আজমীর। হাঁ সেনাপতি।

দিল্লীর। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।—এখন সন্ধির প্রস্তাবটা করবে কে? আমি না সম্রাট স্বয়ং?

আজমীর। রাজপুত্র করবে।

দিল্লীর। রাজপুত্র! তাঁরা জয়ী হয়ে সন্ধির প্রস্তাব কর্তে আসবে!

আজমীর। পিতা বঞ্জন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব কর্তে পারেন না। তাতে তাঁর মর্যাদার হানি হয়।

দিল্লীর। অতএব তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্য বিজয়ী রাজপুত্র সন্ধি ভিক্ষা করবে!—
এ বৃদ্ধি সম্রাটকে কে দিল!

আজমীর। বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ। তিনি বঞ্জন যে, সম্রাটের মর্যাদা রেখে তিনি সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেবেন।

দিল্লীর। ও!—বুঝেছি। তবে সম্রাটের এ পূর্ববৎ কপট সন্ধি!

আজমীর। সেনাপতি! মূখ সামলে কথা কইবেন।

দিল্লীর। হুঁ—সাপের চেয়ে সাপের ডাঁপের চক্র বড় দেখাচ্ছে।—যান, কুমার আজমীর! সম্রাটকে বলবেন গিয়ে যে, যদি সম্রাট সত্যি রাজপুত্রের সঙ্গে সন্ধি কর্তে চান, তাহলে আমি সম্মানকর সন্তে যাতে সন্ধি হয় তার ব্যবস্থা করব।—আর যদি তাঁর এ কপট সন্ধি হয় ত, তাঁকে বলবেন—এর মধ্যে আমি নাই।”—

[—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মৌজাম ও আজীম অন্তঃপূরাভিমুখীন হইলেন
মৌজাম। পিতা হঠাৎ সন্ধি কর্তে চান
কেন আজীম!

আজীম। তিনি এখন দাক্ষিণাত্যে যেতে
চান। তার জন্য পঞ্চাশ হাজার তাঁবু ফর্মাইজ
দিয়েছেন।

মৌজাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি যেতে চান কি
আকবরের উদ্দেশ্যে?

আজীম। সেই রকম বুঝি।—মৌজাম!
তুমি আকবরকে বন্দী করে' আশ্তে পারোনি—
এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন কি
তিনি সন্দেহ করেন যে তুমি ইচ্ছা করে' তাকে
পালাতে দিয়েছো।

মৌজাম। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়,
আজীম। পিতার ক্রোধের অগ্নিকুণ্ডে আমার
অবোধ সরল-দুর্বল ভাইকে আমি প্রাণ
ধরে' ফেলে দিতে পারি না। তার চেয়ে
আকবর দুর্গাদাসের আশ্রয়ে নিরাপদে
আছে।

আজীম। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে
তুমি জেনে শূনে কাজ করেছো মৌজাম?

মৌজাম। হাঁ আজীম! পিতা পিতা বটে
কিন্তু ভাইও ভাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ।

কাল—প্রভাত।

পটবসনপরিহিতা মহারাণী মহামায়া একাকিনী

রাণী। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার
মৃত-স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে।
মাড়বার হতে মোগল দুরীভূত হয়েছে। যাক্,
কাজ শেষ হয়েছে। আজ সতী-ধর্ম প্রতি-
পালন কর্ব। আজ স্বামীর অনুগমন কর্ব!
আজ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জন দিব!
আজ পুড়ে মর্ষ! [জানু পাতিয়া] প্রভু!
স্বামী! বল্লভ—একদিন তুমি যুদ্ধে হেরে এলে,
আমি অভিমানে দুর্গম্বার রুদ্ধ করেছিলাম;
যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যুকামনা করেছিলাম।
দেখ নাথ! আমরা তোমাদের যেমন দেশের
জন্য মর্ত্যে বলি, আমরাও তেমনি তোমাদের
জন্য হাস্যমুখে মর্ত্যে পারি।

“বনে ঠনে কাঁহা চলি, বনে ঠনে”—

গাহিতে গাহিতে রাজ্যের প্রবেশ

রাজিয়া। রাণী আপনি এ কি কচ্ছেন?

রাণী। আমি যাচ্ছি রাজিয়া।

রাজিয়া। সে কি! কোথায়?

রাণী। [উদ্ধের অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া]

ঐখানে—যেখানে আমার স্বামী এতদিন ধরে'
আমার অপেক্ষা কচ্ছেন!

রাজিয়া। আপনার স্বামী অপেক্ষা কচ্ছেন!
—ঐখানে? কৈ? আমি ত দেখতে পাচ্ছি
না।—

রাণী। সে কি অপরে দেখতে পায় মা?

রাজিয়া। আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

রাণী। পাচ্ছি বৈ-কি রাজিয়া!

রাজিয়া। আমি বিশ্বাস করি না। আমি
দেখতে পেলাম না; আর আপনি দেখলেন?—
হতেই পারে না।—

রাণী। সরলা বালিকা! ঔরঞ্জীবের বংশে
তোমার জন্ম!

রাজিয়া। রাজকুমারকে কার কাছে রেখে
যাচ্ছেন?

রাণী। তোমাদের কাছে।

রাজিয়া। আমি ওঁকে দেখতে পার্বে
না। আমার দায় পড়েছে। আপনার ছেলেকে
আপনি ছেড়ে যাবেন—আমরা দেখবো—কখন
দেখবো না।

রাণী। আমার যে যেতে হবে রাজিয়া—
আমার স্বামী ডাকছেন।

রাজিয়া। আপনার ছেলের চেয়ে আপনার
স্বামী বড় হোল।

রাণী। সেই আমাদের ধর্ম—সাহাজাদী!
পতিই সতীর সর্বস্ব, পতিই সতীর সব।
এতদিন কাজ বাকি ছিল, তাই তাঁকে ছেড়ে
ছিলাম। এখন আমার এখানকার কাজ শেষ
হয়েছে। আমি তাঁর কাছে যাই।

রাজিয়া। কাজ শেষ হয়েছে কি! কাজ
কখন শেষ হয়?—না আপনার ত আমি দেখছি
কোন মতেই যাওয়া হচ্ছে না।

রাণী। সে কি মা!

সমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া। সে কি আবার! তা কখন হয়?

—এ ত হতে পারে না।—এই যে সেনাপতি!
কি বলেন সেনাপতি, এ কখন হয়?—ও
সেনাপতি!

রাণী। কেন হতে পারে না রাজিয়া?

রাজিয়া। কেন যে হতে পারে না তা জানি
না। তবে এটা যে হতে পারে না তা বেশ
বুঝতে পাচ্ছি।—সেনাপতি! আপনিই বলুন,
এ হতে পারে?

রাণী। বেশ হতে পারে মা! বিদায় দাও
—যাই।

রাজিয়া। যাবেন যাবেন যাবেন। তা যান,
আমার গান শুনতে পাবেন না। আমি এমন
সুন্দর একটা কেদারা শিখেছি—[সুরে]
“বনে ঠনে কাঁহা চলি”—উঃ কি মধুর!—

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

রাণী। -অজিত কোথায় সমর?

সমর। ভিতরে।—কাঁদছে!—তাকে বোঝাতে
পারলাম না মা! আর কি বলেই বা বোঝাব।

রাণী। কি বলে?

সমর। বলে, “আমি মাকে যেতে দেবো
না।”

রাণী। তাকে নিয়ে এস সমর।

[সমরসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাণী। ভগবান্!—আমার সতীধর্ম রক্ষা
কর্ত্তে হৃদয়ে বল দাও! সকলের চেয়ে কঠিন
কাজ এই—ছেলে ছেড়ে যাওয়া।—[বক্ষে হাত
দিয়া] ভগবান্!—

অজিতকে লইয়া সমরসিংহ পুনঃপ্রবেশ
করিলেন। সঙ্গে কাশিম

রাণী। এই যে!—বাছা অজিত!—বাবা!—
আমি যাচ্ছি।—বিদায় দাও বাবা।—

অজিত। মা তুমি যাচ্ছে—আমাকে ছেড়ে
তুমি কোথায় যাচ্ছে মা?

রাণী। যেখানে সকলেই একদিন যায়।—
তবে দুদিন আগে আর দুদিন পিছে।—
অজিত! বিদায় দাও বাপ!

অজিত। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো
[কম্পিত স্বরে] মা!—মা!—মা!

রাণী। কারো মা চিরকাল থাকে না
অজিত!

অজিত। কারো মা নিজে ইচ্ছে করে
সন্তানকে ছেড়ে যায় না মা।

রাণী। কিন্তু এই যে আমার সতীধর্ম
অজিত!

অজিত। কিন্তু এই কি তোমার মাতৃধর্ম
মা?—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাণী। হিঁ অজিত! কেঁদো না।—আমায়
যেতেই হবে।

অজিত। যদি যেতেই হবে ত যাও। যেতে
চাও, আমায় ছেড়ে যেতে পারো—যাও। আমি
বাধা দিব না।

রাণী। আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দাও বাবা।

অজিত। আমি বিদায় দিব না।

রাণী। সমর! বুঝিয়ে বল।

সমর। অজিত! তোমার মায়ের এই সতী-
ধর্ম! এ ধর্ম বাধা দেওয়া তোমার কর্তব্য
নয়।

অজিত। ধর্ম! সমরসিংহ!—ছেলে-মেয়ে
ছেড়ে তাদের পরের হাতে সঁপে দিয়ে, চলে
যাওয়া ধর্ম হোল সমরসিংহ!—একে তুমি
ধর্ম বল!—

সমর। ধর্ম আমরা বিচার কর্ত্তে বাসনি
অজিত!—অনুষ্ঠান কর্ত্তে বসিছি। তার কাছে
মাথা হেঁট করাই আমাদের শোভা পায় কুমার।
যাঁরা এ ধর্ম করে' গেছেন তাঁরা আমাদের
চেয়ে অনেক বড়।

অজিত। তবু—মা আমাকে ছেড়ে যাবেন—
[কম্পিতস্বরে] এ তোমার বেশ লাগছে?—
উচিত বোধ হচ্ছে?—কষ্ট হচ্ছে না?

সমর। কষ্ট হচ্ছে না! [কম্পিতস্বরে]
অজিত! তিনি কি তোমারই মা, আমার মা
নন? সমস্ত মাড়োবারের মা নন?—তবু তাঁকে
ছেড়ে দিতে হয় অজিত!—[পুনরায় কতক
প্রকৃতিস্থ হইয়া] এ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া
—এ মেয়েকে শব্দর বাড়ী পাঠানো।—কষ্ট
হচ্ছে বলে' কি নিষ্ঠা ভঙ্গ হবে?

অজিত। আমি ওসব বুঝি না। আমি
আমার মাকে ছেড়ে দেবো না।

মহারাণী নিরুপায় ভাবিয়া সমরসিংহের পানে
চাহিলেন

সমর। [পুনর্বার কহিলেন] অজিত!
তুমি ক্ষত্রিয় কুমার—তোমার কি এই
ক্রন্দন, এই অন্যায় আবদার শোভা পায়?—
তোমার বয়সেই বীরবর বাদল চিতোরের জন্য,

কর্তব্যের জন্য, সমরে প্রাণপণ করেছিল! আর তুমি শিশুর মত, নারীর মত ক্রন্দন কর্তে বসলে?—ছিঃ! মাকে প্রণাম কর অজিত!

অজিত নীরবে প্রণাম করিলেন

সমর। এখন যাও।

কাশিমের সহিত অজিত নীরবে প্রস্থান করিলেন

রাণী। ভগবান্, ভগবান্! এরই জন্য কি নারীজাতিকে তৈর করেছিলে। তাকে বুকভরা স্নেহ দিইছিলে তাকে জঞ্জরিত করবার জন্য? তাকে প্রাণভরা ভালবাসা দিইছিলে তাকে দক্ষ করবার জন্য?—ওঃ [মর্স্তক অবনত করিয়া] তবে যাই সমর—কথা কচ্ছ না যে?—

সমর। যাও মা! হিন্দু হয়ে কি রকম করে' বলি যে স্বামীর অনুগমন করবে না। যাও মা—[বলিয়া প্রণাম করিলেন]

রাণী। দুর্গাদাসকে বোলো। আমার আশীর্বাদ দিও।—

[প্রস্থান।

[সমরসিংহ ধীরে ধীরে অধোবদনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর

জ্বলন্ত চিতা। মহারাণী ও কুলনারীগণ

নারীগণের গীত

যাও সতি পতি কাছে—

পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!
পৃথিবীর যত দুঃখশোক

দেহসনে পুড়ে ভস্ম হোক;

—যাও মা অক্ষয় স্বর্গ লোক মাঝে মা।

পতি বিনা সতীর গতি আছে মা।

দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;

ঐ শুন ভেরী ঘন বাজে মা।

পতি বিনা সতীর গতি কি আছে মা।

রাণী সেই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নারীগণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।—

“যাও সতী পতি কাছে”—ইত্যাদি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আজমীরে মোগল প্রাসাদকক্ষ।

কাল—প্রভাত।

ঔরঞ্জীব ও দিলীর খাঁ

দিলীর। জাঁহাপনা! রাজপুতজাতির সঙ্গে

সন্ধি করেছি। রাঠোর সমরসিংহকে সন্ধিতে সম্মত করা কঠিন হয়েছিল; তিনি বন্দেন এ কপট সন্ধি।

ঔরঞ্জীব। কি রকমে শেষে তাকে সম্মত করলে দিলীর খাঁ?

দিলীর। আমি নিজের পুত্রস্বয়কে আমাদের প্রতিভূস্বরূপ রাখায় তিনি স্বীকৃত হলেন।

ঔরঞ্জীব। কি সত্তে' সন্ধি হোল?

দিলীর। যে চিতোর আর তার অধীনস্থ জনপদ রাজপুতকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; হিন্দুর দেবমন্দিরাদি সব ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ষোড়শপুরের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; আর রাণা সসৈন্যে সম্রাটের পুর্ষবৎ সাহায্য করবেন।

ঔরঞ্জীব। রাণা সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য করবেন? রাণা তাতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দিলীর। সম্পূর্ণ স্বীকৃত! তাঁর এ সন্ধি-স্থাপনে সকলের চেয়ে আগ্রহ বেশী! সমর-সিংহ তাঁকে “ভীরু! রাজপুত কুলাঙ্গার! স্ট্রেন” বলে' প্রথমে ত সভা পরিত্যাগ করেই চলে যান। অর্মানি রাজপুত সামন্তরা রাণাকে টিট্‌কিরি দিতে লাগলেন। রাণা অধোবদনে রহিলেন।

ঔরঞ্জীব। পরে?

দিলীর। পুত্রস্বয় আর এক সভা হয়। তাতে নূতন সত্তে' সন্ধিপত্র নূতন করে' লেখা হোল। সমরসিংহ বলে উঠলেন, “মোগলকে বিশ্বাস কি?” পরে আমি নিজের পুত্রস্বয়কে মোগলের প্রতিভূ রাখায় তাঁকে বহু কষ্টে স্বীকৃত করা গেল।

ঔরঞ্জীব। তুমি নিজের পুত্রস্বয়কে প্রতিভূ রেখে এসেছো?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা।

ঔরঞ্জীব। দিলীর তুমি অতি মহৎ।—
আমি এ সন্ধি পালন করব।

দিলীর। সম্রাটের জয় হোক!—

শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। রাজাধিরাজ বাদশাহ ঔরঞ্জীবের জয় হোক!

ঔরংজীব। কি সম্বাদ মহারাজ!

শ্যাম। কার্য উদ্ধার হয়েছে খোদাবন্দ—
আশাতীত রকম উদ্ধার হয়েছে—সাম্রাজ্য
নিষ্কণ্টক।

ঔরং। কিরূপ?

শ্যাম। সন্ধির পর কতিপয় ব্রাহ্মণ দিয়ে
উদ্ধৃত সমরসিংহের হত্যা করিইছি।

দিলীর। কি?—তাকে হত্যা করিয়েছে
মহারাজ! সত্যকথা?—

শ্যাম। হাঁ সত্য কথা!

দিলীর। তুমি তাকে হত্যা করিয়েছে?

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি?

দিলীর। সম্রাট ক্ষমা কর্বেন। [শ্যাম-
সিংহের গলদেশ হস্ত দিয়া ধরিয়।] পামর!
পামন্ড! রাজপুত্র কুলাঙ্গার!—তোমাকে আজ
আমি হত্যা কর্ব।

শ্যামসিংহ কাতরভাবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া
কহিলেন—জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। ক্ষান্ত হও দিলীর—ও নিতান্ত
ক্ষুদ্র জীব! মশা মেরে হাত কালো কোরো না
দিলীর।

দিলীর। সত্য কথা! তোমাকে মেরে
এ হাত কালো কর্বা না।—হেয়,
কাপুরুষ, নরকের ঘৃণ্য কীট! তোমায় দেখলে
পাপ!—তোমাকে হস্তে স্পর্শ করা একটা
মহাপাতক।—দূর হও। [এই বলিয়া তাহাকে
ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া সম্রাটকে কহিলেন।]
—হাত ধুয়ে আসি সম্রাট।—বলিয়া চলিয়া
গেলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমার জন্য তুমি
নিজের পুত্রদ্বয় হারালে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য
সাধু ছিল। এর জন্য আমি দায়ী নই বন্ধু! এ
হত্যা আমার পরামর্শে হয় নাই। এত নীচাশয়
আমি নই!

মৌজামের প্রবেশ

মৌজাম। পিতা ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ মৌজাম। — দাক্ষিণাত্যে
যাবার জন্য সমগ্র মোগল সৈন্যকে প্রস্তুত হতে
আজ্ঞা দাও। তুমিও প্রস্তুত হও!

মৌজাম। যে আজ্ঞা।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে পালিগড় দুর্গ।

কাল—স্বাতি।

মরাঠা অধিপতি শম্ভুজী, দুর্গাদাস ও আকবর
আসীন

শম্ভুজী। দুর্গাদাস, তুমি অসমসাহসিকের
কাজ করেছো! ৫০০ মাত্র রাজপুত্র ঘোড়-
সোয়ার নিয়ে যোধপুর থেকে পালিগড়ে
এসেছো।

আকবর। আমরা এসেছি অনেকদিন।
এতদিন মহারাজের দর্শন পাইনি।

শম্ভুজী। সাহাজাদা! আমি বিশেষ রাজ-
কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।
মাফ কর্বেন সাহাজাদা! অভ্যর্থনার কোন
বন্দোবস্ত হয়নি?

আকবর। না! মহারাজের সামন্তরা আমাকে
যথাযথ সমাদর করেছে। কোন বন্দোবস্ত হয়নি।

শম্ভুজী। সাহাজাদার পরিবার?

দুর্গাদা। মাড়বারের মহারাণীর কাছে তাদের
রেখে আসতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি সম্রাটের
আক্রোশ নাই। শম্ভু সাহাজাদাকে মহারাজ
আশ্রয় দান করুন।

শম্ভু। আপনার আর কোন চিন্তা নাই
সাহাজাদা! আপনি এখন মনে কর্তে পারেন
যে আপনি লোহদুর্গে আছেন!—দুর্গাদাস,
তোমরা এঁকে সম্রাট করেছিলে না?

দুর্গাদা। করেছিলাম মহারাজ!

শম্ভু। বাস্! আকবরসাহ! আমরা মরাঠা
জাতিও আপনাকে সম্রাট বলে মানি।

আকবর। আমার ভাই মৌজাম সসৈন্যে
আমার বিপক্ষে এসেছেন।

দুর্গাদা। কুমার আজীমও সসৈন্যে আমেদ-
নগরে এসেছেন।

শম্ভু। কোন ভয় নাই সাহাজাদা! আমি
বরহমপুরে গিয়ে নিজে আপনাকে সম্রাট বলে
অভিষেক কর্ব।

শম্ভুজীর দুই সৈন্যাধ্যক্ষ শান্তাজি ও কেশবের
প্রবেশ

শান্তাজি। জিজিরা দুর্গের পতন হয়েছে
মহারাজ!

শম্ভু। উত্তম! সন্তুষ্ট হলাম!

কেশব। মহারাজ! কর্ণেল কোরি আর

ফার্ডিনান্ড মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী। এখানে নিয়ে আসবো কি?

শম্ভু। আনো না—ক্ষতি কি!

[শান্তজি ও কেশবের প্রস্থান।

শম্ভু। বিশ্রাম নেই সাহাজাদা—রাজার রাজ-কার্য্য সঙে সঙে ফেরে। এই জিজিরা দুর্গ ইংরেজরা মাসাধিক হোল তৈর করেছিল। তা ভূমিসাং হোল দেখলেন—দুর্গাদাস! রাজ-পদতেরা যুদ্ধ কর্তে জানে?

দুর্গা। তা'রা দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানে।

শম্ভু। তাতে যুদ্ধ জয় হয় না দুর্গাদাস।

দুর্গা। জানবেন মহারাজ! যে দিন দেশের চতুর্থাংশ লোক দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে, সে দিন আর এই স্বর্ণপ্রসূ ভূমি যবনের পদদলিত থাকবে না।

শম্ভু। কিন্তু রাজপদ জাতি ত বার বার যবনের পদদলিত হয়েছে।

দুর্গা। হয়েছে সত্য! কিন্তু মনে করে' দেখুন মহারাজ! সমস্ত আর্ষ্যবর্ষে রাজস্থান রেণুকার মত! তবু সমস্ত আর্ষ্যবর্ষে একা রাজপদতই এই তিনশ বছর মাথা উঁচু করে' আছে।

শম্ভু। আর মরাঠা মাথা শূধু উঁচু করে' নেই—মাথা তৈর কছে—কার ক্ষমতা অধিক দুর্গাদাস!

দুর্গা। মহারাজ! আমি মরাঠা হীন বলি নাই; শূধু রাজপদত অসার নয় তাই বলি ছিলাম।

শম্ভু। আচ্ছা এসেছো—দেখে যাও মরাঠা যুদ্ধ করে কেমন! দেশে গিয়ে গল্প করবার একটা বিষয় পাবে।

দুর্গাদাস। [স্বগত কহিলেন] তোমাকে দিয়ে হবে না শম্ভুজী—এত দম্ভ যার, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

কোরি ও ফার্ডিনান্ডের সহিত কেশবের প্রবেশ

শম্ভু। কোরি সাহেব! তোমাদের জিজিরা দুর্গের অবস্থা দেখলে?

কোরি। হাঁ রাজা।

শম্ভু। ঐ অবস্থা তোমাদের বম্বে উপ-

নিবেশের হবে, যদি আমার বিপক্ষ জাহাজ তোমাদের বন্দরে আশ্রয় দাও! আর এলি-ফ্যান্টায় মরাঠা দুর্গ নিষ্কারণ কর্ব।

কোরি। রাজা—

শম্ভু। কোন কথা শুনতে চাই না। যাও—আর পোর্ট দুর্গীজ সন্দার সাহেব! তোমরা আমার বারণ শুনলে না। তোমাদের আঁক দ্বীপ দখল কর্তে জাহাজ পাঠাইছি। দেখি তোমাদের গোয়ার বাণিজ্য কিসে চলে। এখনো সাবধান—যাও।

[কোরি ও ফার্ডিনান্ড কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শম্ভু। এই ফিরিঙ্গিগলোকে আমি একটু ভয় করি দুর্গাদাস।—কাব্লেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।—

শম্ভু। সরাব আওর অওরং—

নেপথ্যে। যো হুকুম মহারাজ!

শম্ভু। এই ফিরিঙ্গিগলো বড্ড সোজা বন্দুক আওয়াজ করে!—আর কখন ছত্রভঙ্গ হয় না। একটা সৈন্য যুদ্ধ করে যেন একটা প্রাণী! এক গতি, এক লক্ষ্য, একদিকে মুখ!—ভারি জমাট!

সরাব হস্তে কাব্লেস খাঁর প্রবেশ

শম্ভু। [সরাব লইয়া আকবর ও দুর্গাদাসকে দিয়া] নেও দুর্গাদাস।

দুর্গা। মাফ কর্বেন মহারাজ!

শম্ভু। সে কি বল! সরাব খাও না নেহাইং—[অপদার্থের সঙ্কেত করিলেন]—সাহাজাদা—

আকবর। মন্দ কি!—

শম্ভু। এই ত! তুমি সম্মাট হবার উপযুক্ত বটে। আমি তোমায় সম্মাট কর্ব।

কাবলেস্। অওরং?

শম্ভু। আলবাং—আভি—হি'য়া—

দুর্গা। তবে আমি যাই। একটু বিশ্রাম করিগে যাই।

শম্ভু। কি তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে!—আচ্ছা যাও!—

দুর্গাদাস উঠিতে উঠিতে ভাবিলেন—
“এতদূর অসার!—তোমায় দিয়ে কার্য্য উদ্ধার হবে না মহারাজ।”

নর্তকীগণের প্রবেশ

শম্ভু। এই যে! গাও নাচো। সাহাজাদা!
মুসলমান জাতটা কিন্তু সম্ভাগ বেশ
জানে।

আকবর সুরাপান করিতে করিতে
কহিলেন—“সুরাপান কিন্তু তার ধর্ম
নিষিদ্ধ।”

শম্ভু। বটে!—তবে সে ধর্ম আমার জন্য
নয়।—এমন সুন্দর জিনিষ আছে? কেমন
শুভ্র, শান্ত, স্থির! কিন্তু ভেতরে গেলেই
সংসারটাকে রঙিন করে তোলে—হাঃ হাঃ হাঃ।
সুরা আর রমণী—গাও।

দুর্গাদাস যাইতে যাইতে স্বগত কহিলেন—
“এই সুরা আর এই রমণীই তোমার সর্বনাশ
কর্ষে শম্ভুজী।”

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। দুর্গাদাস কি রকম করে আমার
পানে চাহিলে, দেখলে আকবর! উনি সতীত্ব
দেখাচ্ছেন! ভণ্ড!—

আকবর। গাও—

শম্ভু। হাঁ গাও—নাচো—কিসের জন্য যুদ্ধ
করে মরি সাহাজাদা! যদি জীবনটা ভোগ না
করাম—গাও। একটা সাহাজাদার আবাহন
গীতি গাও—উনি ভারতসম্রাটের পুত্র আকবর-
সাহ—

নৃত্যগীত

যদি এসেছো এসেছো দয়া করি বন্ধু হে—

কুটীরে আমারি;

আমি কি দিলে তুষিবে ভূষিবে তোমারে

—বুঝিতে না পারি।

আমি যাব কি ও ছাঁদি পর ছুটিয়া?

আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?

হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে

নয়নের বারি?

যদি পেয়েছি তোমার কুটীরে আমার,

আশার অতীত গণি;

আজি আধারে, পথের ধলার মাঝারে,

কুড়ারে পেয়েছি মণি;

যদি এসেছ দিব হৃদয়সন পাতি;

দিব গলে নিতি নব প্রেম হার গাখি;

রাহিব পড়িয়া দিবস রাত হে

—চরণে তোমারি।

স্থান—রাগা জয়সিংহের অন্তঃপুর।

কাল—সায়াহ্ন।

জয়সিংহ ও তাহার ধাত্রী মদুখোমুখি
দাঁড়াইরাছিলেন

জয়। কি! কমলা আমার না বলে' চলে
গিয়েছে?

ধাত্রী। গিয়েছে ত গিয়েছে! হয়েছে কি?
আপদ দূর হয়েছে।

জয়। বড় রাণী কোথায়?

ধাত্রী। সে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আছে।

জয়। তাঁকে ডাকো ত। নিশ্চয় তার সঙ্গে
ঝগড়া করে' চলে' গিয়েছে।

ধাত্রী। না গো না! তার মদুখে রাটি নেই।
সে মাটীর মানুষ! ছোট রাণীই তাকে মাঝে
মাঝে এমনি মদুখামটা দেয়।—বাপু—যেন
তাড়কা রাকসী! ছোট রাণীর মদুখ ত নয়, যেন
তুর্বাড়ি। আবার যখন মান করেন—তখন ভালো
[দেখাইল]—সুন্দর বিচ্ছরি অমন আমি
কখন দেখিনি বাপু।

জয়। চোপু, মদুখ সামলে কথা বলিস!

ধাত্রী। ওরে বাবা! যেন কুম্ভকর্ণ! খেতে
এলো! কেন? ভয় কিসের? তুই ছোটমাগী
বলে অজ্ঞান, মদুই ত আর অজ্ঞান নই। আর
সে মোর ইন্টি দেবতাও নয় যে, মদুই তোমার মত
রাজ্য ভুলে তার জপে বোসবো!

জয়। দ্যাখ, তুই আমার মানুষ করেছিস্
বলে' অনেক সহ্য করি। বেশী জ্বালাসনে—
যা, বড় রাণীকে ডেকে দে!

ধাত্রী। ডেকে দেবো কেন! নিজে যাও না
তার ঘরে! সে ত আর মোর মত তোমার কেনা
দাসীটি নয়, আর তোমার ঘরে খেতে খেতেও
আসি নি—সেও রাজরাজড়া ঘরের মেয়ে!

জয়। তুই যাবিনে?

ধাত্রী। ঈঃ—চোখ রাঙানী দেখো—যেন
দুর্ভস্ মনি। মাঝি নাকি! তার আর
আশির্ষ্যই বা কি। দ্যাখকে মোহলমানের
হাতে সপে দিলে, বাড়ী এসে ধাইমাগীর উপর
রোখ! নজ্ঞাও নেই।

জয়। সবাই নিন্দে করছে মানি, কিন্তু
ধাইমা তুইও—আমার প্রাণ যে কি করছে তুই
জানবি কি?

ধাত্রী। জ্ঞান্তে বাকিই বা আছে কি!—যাদু করেছে গো—যাদু করেছে। পেঙ্গী হয়ে ঘাড়ে চেপেছে!—নৈলে ছেলি ভালো!—আচ্ছা, যাচ্ছি। বড় রাণীকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি রক্ষি কৈবি, ত এই ব'টি তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবো; তা মানুষ করে' থাকি আর যাই করে থাকি—সতীলক্ষ্মীর অপমান সৈবো না।

[প্রস্থান।

জয়। যাদুই করেছে। আমায় তন্ময় করেছে! আর কিছই ভালো লাগে না। সে এই নগর ছেড়ে চলে' গিয়েছে—সংসার শূন্য দেখছি। চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

ধীরে ধীরে সরস্বতী প্রবেশ করিলেন

সরস্বতী। আমায় ডাকছিলে?

জয়। হাঁ—ছোটরাণী কোথায় জানো?

সর। না।

জয়। তোমার কিছ, বলে যায়নি?

সর। না।

জয়। তোমার সঙ্গে [মস্তক নীচু করিয়া] কোন বচসা হয়নি?

সর। না।

জয়সিংহ কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন—এই কথা আমায় বিশ্বাস কস্তে বল, সরস্বতী?

সর। বিশ্বাস কর না কর তোমার হাত! আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তাই বললাম।

জয়। এর কারণ জানো কিছ?

সর। না ঠিক জানি না।

জয়। অনুমান করেছে?

সর। করেছি।

জয়। কি অনুমান করেছে?

সর। বলতে পার্বে না।

জয়। বলতে পার্বে না? না বলবে না?

সর। ভালো!—তবে তাই! আমি বলবো না।

জয়। সরস্বতী! এই তোমার পতিভক্তি!—সে যাই হোক! আমার কথা শোন! আমি তার জন্যে দেশত্যাগী হ'তে হয় হব!—তা জানো বোধ হয়?

সর। বিশেষ জানি। দেশকে ও মুসলমানের পারে বিক্রিয়ে এসেছো!

তাকে ছাড়বে—তার আর আশ্চর্য কি! জয়। দেশকে আমি বিক্রিয়ে আনি। সন্ধি করেছি।

সর। একে সন্ধি বল রাণা? মুসলমান জাত পাঁচশ'—বছর ধরে' দেশ, জাতি, ধর্মকে পীড়িত করে। সেই মুসলমান জাতকে মাড়বার বীর সমরে পরাস্ত করেছিল—তার সঙ্গে এই সন্ধি!—তুমি রাণা-পদের অবমাননা করেছে।

জয়। কার জন্য করেছি—নিজের জন্য না জাতির জন্য?

সর। ছোটরাণীর জন্য!—তোমার আর কিছ, জিজ্ঞাসা করবার আছে?

জয়। না।

সর। উত্তম—তবে আমি যাই?

জয়। যাও—আমিও যাই?

সর। যেরূপ অভির্চি!—শোন নাথ, এক কথা বলে' যাই—যেখানে যাবে যাও। কিন্তু শাস্তি পাবে না। যে উদ্দাম প্রবৃত্তিভরে আজ আমায় ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, চলে' যাচ্ছ, সে প্রেম নয়, সে লালসা। প্রেমের গতি নির্ঝরিশীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর; বারি-প্রপাতের মত উচ্ছ্বসিত, ফেনিল, দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত বিদ্যাতের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মধুর!—এই কথা মনে করে' নিয়ে যাও! মনে রেখো! অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। জানি সরস্বতী, যে এ প্রেম নয়, এ লিপ্সা! এ আমায় ধীরে ধীরে রাহুর মত গ্রাস করছে; ব্যাধির বিষের মত সমস্ত শরীর ছেয়ে আসছে! এ টান আবস্তের টান! সব বন্ধতে পাচ্ছি। কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই।

[বলিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পুণ্যমালীর দুর্গ। দুর্গাদাসের শয়নকক্ষ।

কাল—স্বপ্রহর রাতি।

শয্যার উপরে উপবিষ্ট দুর্গাদাস একখানি পত্র পড়িতেছিলেন

“এই রূপে আপনার সরল উদার ভ্রাতা সমরসিংহের মৃত্যু হয়—এদিকে আমাদের মহা-

রাণী চিতারোহণে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর অনঙ্গমন করিয়াছেন। ওদিকে স্ত্রী কাপদরুষ রাণা জয়সিংহ মোগলের সঙ্গে এক অবমাননা-কর সন্ধি করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, স্বিতীয়া মহিষীকে লইয়া জয়সমুদ্রের তীরে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার আচরণে, মহারাণীর স্বর্গারোহণে, বীর সমরসিংহের মৃত্যুতে রাজস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।—রাঠোর সেনাপতি! আপনি দেশে ফিরিয়া আসুন। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। আমাদের সমবেত মিনতি রক্ষা করুন।—হু পত্রে শতাধিক সামন্তের দস্তখৎ।—এই বলিয়া পত্রখানি মর্দািয়া উপাধানতলে রাখিয়া দুর্গাদাস অধোবদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শম্ভুজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মদিরাজিড়িত স্বরে কহিলেন—“শুনেছো দুর্গাদাস!”

দুর্গাদাস চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন—“কি মহারাজ!”

শম্ভুজী। ঔরঞ্জীবকে সমস্ত পার্শ্বতা প্রদেশ হতে তাড়াইছি।—এসেছিলেন চাঁদ শম্ভুজীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে! জানেন না।

দুর্গাদাস। কিন্তু বিজাপুর আর গোলকুন্ডার পতন হয়েছে না?

শম্ভুজী। তাতে আমার কোন হানি হয় নি। আমি এদিকে বিজাপুরের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে বসে আছি! চাঁদ এদিকে এগিয়ে আসছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য; ওদিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে শম্ভুজীর সৈন্য। ব্যতিব্যস্ত করে তুলিছি—জানেন না চাঁদ এ শম্ভুজী!—আর কেউ নয়।

দুর্গাদাস। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে ফল কি? অনুমতি দিউন মহারাজ! আমি রাজপুত সৈন্য এখানে নিয়ে আসি। আর মরাঠা রাজপুত মিলে ঔরঞ্জীবের বিপক্ষে দাঁড়াই!

শম্ভু। রাজপুত! রাজপুত যুদ্ধ কর্তে জানে? তাদের সাহায্য প্রয়োজন নাই দুর্গাদাস! একদিন মরাঠাই রাজপুত আর মোগলকে সমভাবে পেষণ করবে।

দুর্গাদাস। মহারাজ! রাজপুতকে পরাজয় করে মরাঠার গৌরব বাড়বে না। তাঁরাও হিন্দু, মরাঠাও হিন্দু।

শম্ভু। তা বটে—দুর্গাদাস তোমার বিছানা নরম হয়েছে তা।

দুর্গাদাস। রাজপুতের পক্ষে এ বিছানা যথেষ্ট নরম। আমাদের অনেক সময় অশ্বপৃষ্ঠই শয্যার কাজ করে।

শম্ভু। ঐ ত দুর্গাদাস, ঐ জায়গায়ই তোমার সঙ্গে মেলে না। যুদ্ধও চাই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও চাই।—দুর্গাদাস! জীবনের অন্য সব কঠোর জিনিসে আপত্তি নাই।— কিন্তু বিছানাটি নরম চাই।—কাব্লেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।

শম্ভু। তৈরি?

নেপথ্যে। হাঁ হুজুর!

শম্ভু। তবে এখন নিদ্রা যাও দুর্গাদাস। আমি যাই।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। [কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে] যোদ্ধা বটে মরাঠা জাত!—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমরকৌশল অদ্ভুত সহিষ্ণুতা!—এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পারত! না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্ষ্যজাতি—যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্তব্যজ্ঞান ছিল। সে সব গিয়েছে; আর ফির্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্তে হবে, নূতন বলে উঠতে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে। [এই বলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।—সহসা দূরে আন্তঃস্বর শ্রুত হইল।—ওঃ! কি তাঁর আন্তঃধ্বনি! কি করুণ!—কি অপ্রভেদী!—আরো কাছে। আরো কাছে!—একি আমার স্ফারের বাহিরে যে! এ যে নারীর কাতরোক্তি!—কি হৃদয়ভেদী—আলুলায়িতকেশী স্তম্ভাবসনা রমা দোঁড়িয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

রমা। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

দুর্গাদাস। ভয় কি! ভয় কি মা!—কে তুমি মা!

তরবারি হস্তে শম্ভুজী ও তৎপশ্চাৎ কাব্লেস
খাঁ প্রবেশ করিল

শম্ভু। পিশাচী!—শয়তানী—তুমি তাকে
দরোজা খুলে দিয়েছো? তুমি তার পলায়নের
পথ পরিষ্কার করে' দিয়েছো?

রমা। সে কুলনারী।

শম্ভু। সে কুলনারী; তোর তাঁতে কি?

রমা ভয়ে ভূপতিত হইলেন! শম্ভুজী তব-
বারি হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন।
দুর্গাদাস সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া
কহিলেন—

শম্ভুজী!—মহারাজ!—এ কি! অবলার প্রতি
আক্রমণ!—এও কি সম্ভব!

শম্ভু। 'চোপ্‌রাও—সরে' যাও—

দুর্গা। কখন না। অবলার প্রতি অত্যাচার
দুর্গাদাস আজ পর্য্যন্ত কখন দাঁড়িয়ে দেখে
নাই। তরবারি কোষবন্ধ করুন মহারাজ!

শম্ভু। জানো ও কে?

দুর্গা। উনি যেই হোন—উনি আমার মা।

শম্ভু। সরে' দাঁড়াও দুর্গাদাস।

দুর্গা। প্রকৃতিস্থ হও মহারাজ! তুমি
সুদূরপান করেছো! নইলে এ অবলার প্রতি
অত্যাচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শম্ভু। এখনো বল্ছি সরে' দাঁড়াও।

দুর্গা। কখন না।

শম্ভু। তবে তরবারি নাও। আমি নিরস্ত
শত্রুকে বধ করি না। তরবারি নাও।

দুর্গা। এটুকু ত জ্ঞান আছে! তবে নারীর
প্রতি অত্যাচার কেন?—শোন মহারাজ!—

শম্ভু। তরবারি নাও। [পদাঘাত করিয়া]
নাও!—

দুর্গা। তরবারি নেওয়ার প্রয়োজন নাই—

—এই বলিয়া তিনি শম্ভুজীর গলদেশ ধরিয়া
ফেলিয়া দিয়া, তরবারি কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ
করিলেন। পরে তিনি নিজের উষ্ণীষ খুলিয়া,
তাঁহার হস্তম্বয় বন্ধন করিলেন। কাব্লেস সুযোগ
বুঝিয়া পলায়ন করিল।

দুর্গা। মহারাজ! আপনার আতিথ্য গ্রহণ
করেছিলাম! ক্ষমা কর্ণন? [এই বলিয়া
তিনি নিজের তরবারি লইয়া, পরে রমাকে
ক্রোড়ে উঠাইতে গিয়া, আবার ভূমিতলে রাখিয়া
কহিলেন]—একি!—বালিকা মরে' গিয়েছে!

শম্ভু আতঙ্কে মরে' গিয়েছে।—মহারাজ! এই
ক্ষুদ্র নিরীহ কপোতীকে মাধ্বার জন্য
তরোয়াল নিয়ে ছুটেছিলে!—তুমি মহাত্মা
শিবাজির পুত্র!—ধিক্।”

[এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। কোন্ হ্যায়—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—
বাহিরে অস্ত্রের শব্দ শ্রুত হইল

শম্ভু। ছোড়ো মাং—পাক্‌ড়ো—

রক্তাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস পুনঃপ্রবেশ করিলেন।
সঙ্গে কাব্লেস্ ও সৈনিক প্রবেশ করিল। কাব্লেস
শম্ভুজীর বন্ধন মুক্ত করিল

দুর্গা। সব স্থির থাকো। আমি পালাচ্ছি
না। পঞ্চাশ জনের বিপক্ষে একার আত্মরক্ষা
সম্ভবে না। আর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য
স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার কর্তে চাই না। এক-
জন নারীর ধর্মরক্ষা কর্তে পেরেছি এই
যথেষ্ট পুরস্কার—যদিও তার প্রাণরক্ষা কর্তে
পাল্ল্যাম না। ধরা দিচ্ছি; বাঁধো। যে শাস্তি হয়,
দাও। [এই বলিয়া দুর্গাদাস তরবারি ভূতলে
নিক্ষেপ করিলেন। হস্ত বাঁধবার জন্য
আগাইয়া দিলেন। শম্ভুজীর ইঙ্গিতে কাব্লেস
তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বাঁধিল।

শম্ভু। দুর্গাদাস! বড় স্পর্ধা তোমার!—
তোমাকে পোড়াবো, না জীবন্তে গোর দিব?
কি শাস্তি দিব? কি রকমে মর্তে চাও?

কাব্লেস। মহারাজ! মেহমানকে আপন
হাতসে জান লওয়া ঠিক নয়। আমি বলি,
একে ওর বড় দোস্ত ঔরঞ্জীবের হাতে দিই।
—ফল দাঁড়াবে একই। তবে মহারাজের বদরা
কামটা কর্তে হবে না।

শম্ভু। হাঁ তা বটে! সেই ভালো। কাব্লেস
একে ঔরঞ্জীবের হাতে দিয়ে এস। সেখানে
দেওয়াও যা, ব্যাঘ্রের বিবরে ছেড়ে দিয়ে আসাও
তাই।—[এই বলিয়া অতুচ্চ হাস্য করিলেন।]

কাব্লেস। [স্বগত] সঙ্গে সঙ্গে কাব্লেসের
কিছু নফা হয়ে যাক্ না। বহুৎ ইনাম পাবো।

দুর্গা। উত্তম!—আমি চল্ল্যাম মর্তে। কিন্তু
মনে রেখো শম্ভুজী! একটা কথা বলে' যাই।
তোমারও একদিন এই দশা হবে—এই কাব্-
লেস খাঁরই হাতে। যদি এখনও ভালো চাও—
সুদূর পরিত্যাগ কর। নারীজাতির সম্মান কর।
আর এই কাব্লেস খাঁকে বিশ্বাস কোরো না।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আমেদনগর প্রাসাদ; অন্তঃপুরকক্ষ।

কাল—রাতি।

সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার একাকিনী সেই কক্ষে পাদ-
চারণ করিতেছিলেন

গুল। আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে—
কার উদ্দেশে? লোকে জানে যে ঔরঞ্জীব
আকবরের উদ্দেশে এসেছেন; বিজাপুর গোল-
কুন্ডা জয় কর্তে এসেছেন; মরাঠা জাতিকে
দমন কর্তে এসেছেন।—মুর্খ তা'রা। এ সব
ছোট চক্র ঘূর্ছে বটে, কিন্তু এই ঘূর্ণিত চক্র-
রাশি ঘোরান্ধি—এখানে বসে—আমি! আমি
সেদিকে তর্জনী না ফেরালে, শত আকবর,
বিজাপুর, শম্ভুজী, দিল্লীর সমগ্র প্রাসাদকে
দাক্ষিণাত্যের দিকে টেনে আনতে পার্ত না।
—কি প্রভূত শক্তি কি দরাজ হাতে অপব্যয়
কিচ্ছ—বাঁদি! সরাব!—দুর্গাদাস! দুর্গাদাস।
তুমি যদি জান্তে—যদি জান্তে—আমি তোমায়
কি ভালবাসি! যদি জান্তে কি মধুরতিস্ত
উত্তমশীতল, তীক্ষ্ণকোমল প্রবৃত্তি আমার
অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো! যদি জান্তে, তোমার
উদ্দেশে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য মাড়বার থেকে
দাক্ষিণাত্যে টেনে এনেছি!—আমায় কি ভালই
বাস্তে!—বাঁদি সরাব!—[বাঁদি আসিয়া
তাঁহার হস্তে সরাব দিল। গুলনেয়ার পান
করিয়া অবহেলায় দূরে পাত্র নিক্ষেপ করি-
লেন।]—উঃ কি পিপাসা!—দুর্গাদাস! আমি
মদিরা পান ধরেছি কেন জান?—দুর্গা-
দাস! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, চিন্তে
পারো কি না সন্দেহ!—এত শীর্ণ হয়ে
গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জ্বালা! কি
দুর্দ্দমনীয় বেগ! কি মধুর উৎপীড়ন!

ঔরঞ্জীবের প্রবেশ

ঔরং। গুলনেয়ার!

গুল। জাহাপনা! বন্দেগ!

ঔরং। গুলনেয়ার! বড় সুসম্বাদ।—
দুর্গাদাস ধরা পড়েছে।

গুলনেয়ার উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া
কহিলেন—“এ্যাঁ—না পরিহাস!”

ঔরং। পরিহাস নয় প্রিয়ে, সত্য কথা!—
কাব্লেস খাঁ তাকে ধরে' এনেছে। তাকে

৩০০০০ আসরফি পুরস্কার দিইছি। আর
তাকে বলেছি যে শম্ভুজীকে ধরিয়ে দিতে
পালে, এর দশগুণ পুরস্কার দিব।

গুল। সত্য কথা!—এতদিনে বুঝলাম
নাথ! তুমি আমার ভালোবাসো! আমাদের
দাক্ষিণাত্যে আসা এতদিনে সার্থক হোল!

ঔরং। কিন্তু গুলনেয়ার তুমি সুরাপান
করেছো।

গুল। হাঁ করেছি। এখন আর এক পেয়ালা
এই দুর্গাদাসের ধরা উপলক্ষে পান কর্ব।
বাঁদি—

ঔরং। সে কি গুলনেয়ার! সুরাপান
আমার প্রাসাদ কক্ষে?

গুলনেয়ার সগর্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

—তাই হয়েছে কি সম্রাট?

ঔরং। জানো আমি সুরাপানের বিরোধী!

গুল। তুমি হতে পারো। আমি নহি।

ঔরং। তুমি নও?—তুমি মুসলমান ধর্ম
দাক্ষিত হও নি?

গুল। সে আমার মর্জি। আমার মর্জি
হলে এ ধর্ম ছেড়েও দিতে পারি!—ধর্ম?—
ধর্ম আচরণের জন্য আমি তৈরি হইনি।
আমার দিকে চাহো দেখ সম্রাট! এই সুগোল
কোমল বাহুদুগল দেখো! এই সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ
কেশদাম দেখ, এই তরল স্বচ্ছ স্বর্ণাভ বর্ণ
দেখ। এ রূপ কি মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বার
জন্য তৈরী হয়েছিল?—তুমি বড় ধার্মিক
জাহাপনা! তবে আমাকে বিবাহ না করে' এক
মোস্তানীকে বিবাহ করনি কেন!

ঔরং। কি বল্ছো গুলনেয়ার—তুমি
জানো না।

গুল। বেশ জানি।—শোন!—দুর্গাদাস
কোথায়?

ঔরং। দিল্লীর খাঁ রক্ষণায়!—তাকে কি
শাস্তি দিব জানি না। আগে—

গুল। তাকে কোন শাস্তি দেবে না। তাকে
মৃত্ত করে' দেবে।

ঔরং। সে কি?—সে কি হতে পারে?

গুল। হতে যে বেশ পারে, তা তুমি
নিজেই বুঝতে পাচ্ছে। শব্দ মৃত্ত করে'
দেবে না! আমার সঙ্গে কারাগারে যাবে। আমি

বল্বো দুর্গাদাসকে মৃত্ত ক'রে দাও—আর তুমি স্বহস্তে তাকে মৃত্ত করে' দেবে।

ঔরং। অসম্ভব।

গুল। সম্ভব কি না দেখবে?

ঔরং। তাতে তোমার লাভ?

গুল। মর্জি!

ঔরং। তোমার মর্জির খাতিরে রাজ্যের সর্বপ্রধান শত্রুকে ছেড়ে দিতে পারি না। এ রকম মর্জি—

গুল। কেন? — শুনবে কেন? — কারণ দুর্গাদাস আমার হৃদয়েশ্বর।

ঔরং। একি মদিরাসজাত প্রলাপ।

গুল। শোন—পুনরায় খুব স্পষ্ট করে' বলি—দুর্গাদাস আমার প্রাণেশ্বর।

ঔরং। তুমি কি বলছো জানো না। গুল-নেয়ার তুমি প্রকৃতিস্থ হও।—তুমি অত্যধিক সদূর্যাপন করেছো। প্রকৃতিস্থ হও।

[এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।]

গুল। উত্তম! আমি প্রকৃতিস্থ হচ্ছি! দুর্গাদাস তোমাকে আমিই স্বহস্তে মৃত্ত কর্ব। আমার সে কি গৌরব! আমি তোমাকে স্বহস্তে রক্ষা করে' আমার বৃক্ষের কাছে টেনে এনে, আমার প্রেম ভিক্ষাস্বরূপ দেবো! দুর্গাদাস! আমি তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো; আর আমি তোমার সন্ন্যাসী হব। কি সে সম্মান!—আর ঔরংজীব! শীর্ণ শ্ববির ঔরং-জীব! তুমি ত এই মৃত্তের মধ্যে! তোমার নামাতে কতক্ষণ?—দুর্গাদাস! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্লাম! এতদিন যে এ তাঁর লালসার জ্বালায় আমায় জ্বালিয়েছে; আমার হৃদয়ের পিঞ্জরে না এসে, বনে বনে, পর্বতে পর্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায় আমাকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়েছে;—সব ক্ষমা কর্লাম! দুর্গাদাস! আজ তোমার সব দোষ ক্ষমা কর্লাম! উঃ আজ কি আনন্দ!

[প্রধান।]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শিবির-কারাগার। কাল—গভীর রাত্রি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাস

দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হোল! যে লাক্ষনা এতদিন বিজাতীয় বিধর্মী শত্রুর

কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম হিন্দুর হাতে হোল!—তা না হলে মা ভারত-ভূমি!—তোমার আজ এ দুর্দর্শা কেন? যদি হিন্দু ক্রুদ্ধ স্বার্থের জন্য, ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির জন্য, হিন্দুর নিগ্রহ না কর্বে, তা হলে, হা নির্দোষ জাতি, সকলে একত্রে সম-ভাবে পরের পদতলে পড়ে' থাকবে কেন! ওরে হতভাগা!—একদিনের জন্য এক 'হ' দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভারের চিন্তা কর্ দেখি। একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে' মা বলে' ডাক্ দেখি। দেখ্ এই অত্যাচার, এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা। না, যদি আমি তোদের জাগাতে যাই, তোমরাই আগে সে শবর শত্রুশিবিরে দিবে আসবি!—শম্ভুজী! তুমি ভেবেছো যে মরাঠা একদিন রাজপুত্র মোসলমানকে এক সঙ্গে পদদলিত কর্বে। তা হলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু তা হবো' না। দেখ্বে যে একদিন মরাঠা, রাজপুত্র, মোসলমান এক সঙ্গে অন্য কোন জাতির পদ-তলে এসে লোটাবে। কিংবাসঘাতকতার শাস্তি আছেই আছে।—কে কারাগারের দরোজা খুল্লে না?—কে?

সুসজ্জিত গুলনেয়ার কারাগারে প্রবেশ করিলেন

দুর্গা। এ কি অপরাধ সজ্জা! এ কি রূপের জ্যোতি!—কে আপনি?

গুল। আমি বেগম গুলনেয়ার!

দুর্গা। বেগম গুলনেয়ার!—

গুল। চিন্তে পাচ্ছে' না দুর্গাদাস? আমাদের পূর্বে একবার দেখা হইছিল। সে দিন আমি তোমার হাতে বন্দী হইছিলাম। আজ তুমি আমার হাতে বন্দী।

দুর্গা। আপনি কি আমার শাস্তি বিধান কর্তে এসেছেন?

গুল। না আমি তোমাকে মৃত্ত কর্তে এসেছি।

দুর্গা। প্রত্যাশকার স্বরূপ?

গুল। না!

দুর্গা। তবে?—সন্ন্যাসীর আশ্রয়?

গুল। বেগম গুলনেয়ার সন্ন্যাসী ঔরংজীবের

আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। আমার আঞ্জাই তিন পালন করে' এসেছেন।

দুর্গা। তবে!

গুল। আমি তোমায় মন্ত্র করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

দুর্গা। এক পরিহাস?

গুল। তোমার খুব আশ্চর্য বোধ হচ্ছে?—যে আমি স্বয়ং সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার; আর তুমি একজন রাজপুত্র সেনাপতি মাত্র; আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে' ডাকাছি! হাঁ আশ্চর্য হবার কথা বটে! তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না। সম্রাজ্ঞী হয়ে একজন সামান্য সেনাপতিকে "তুমি আমার প্রাণেশ্বর" এ কথা এইভাবে আমি ছাড়া জগতে আর কেউ বলতে পারত? কিন্তু অদ্ভুতই আমার প্রবৃত্তি। সাধারণ যা, সামান্য যা, তা সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার করে না! সে যখন ঘোড়া ছুটোয়, রশ্মি ছেড়ে দেয়; সামান্য, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় না। অসীমের—উচ্ছ্বালের রাজস্ব তার বাস।

দুর্গা। কিন্তু—সম্রাজ্ঞী—

গুল। শোন বাধা দিও না। আমি যা করি তাই অদ্ভুত। এই প্রকাণ্ড মোগল সাম্রাজ্য একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় না? সে বিস্ময় আমার সৃষ্টি! এ সাম্রাজ্য সম্রাটের হস্তাক্ষর বটে, কিন্তু রচনা আমার! আমার তর্জনী উত্তোলনে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ, আমার অভয়দানে সাম্রাজ্যে শান্তি! আমার সহস্য দৃষ্টিতে এক একটা রাজ্যের উত্থান; আমার ভ্রূক্ষেপে এক একটা রাজ্যের পতন! এতদিন এই হয়ে আসছে।—যে দিন তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলাম, সে দিন সে অবস্থা নিয়তির কঠোর বিধান বলে' মেনেছিলাম; কোন মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিনি। সেইদিন তোমাকে ভালবেসেছিলাম! কিন্তু সে প্রেম জানাই নি; কেন না, বন্দীভাবে যে তোমার প্রেমভিক্ষা কর্ব, সে রূপ উপাদানে আমার প্রবৃত্তি গঠিত হয়নি। আজ তুমি আমার বন্দী। এই আমার প্রেম জ্ঞাপনের উপযুক্ত সময়।—দুর্গাদাস! আমি তোমায় ভালোবাসি!

দুর্গা। বেগমসাহেব আপনি কি বলছেন বোধ হয় আপনি বদ্বতে পাচ্ছেন না।

গুল। সম্রাটকে ভয় কর্ব? এসো! দেখবে,

সম্রাট আমার দাস; আমি তাঁর দাসী নহি। দেখবে, ঔরঞ্জীব প্রেমের পূর্ণপাত্র আমাদের সম্মুখে ধর্ষ; আমরা পান কর্ব। তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো!—এসো!

দুর্গা। বেগমসাহেব! মাফ কর্বেন! অসদুপায়ে পৃথিবীর সম্রাট হতে চাই না।

গুল। সাম্রাজ্য চাও না?

দুর্গা। না বেগমসাহেব!—আপনি ফিরে যান।

গুল। কি? তুমি আমাকেও চাহো না।

দুর্গা। না। পরদারকে আমরা রাজপুত্র-জাতি মাতা বলে' মানি। আপনার মর্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখবো!

[গুলনেয়ার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আপাদমস্তকে উষ্ণ রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি বদ্বিতে পারিলেন না যে, তিনি আকাশে কি মর্ত্যে। পরে তিনি কহিলেন]—কি দুর্গাদাস! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্ব—সম্রাট ঔরঞ্জীব যার ইচ্ছাভেদে অপেক্ষায় থাকে।

দুর্গা। বেগমসাহেব! জগতে সকলেই ঔরঞ্জীব নয়। পৃথিবীতে ঔরঞ্জীবও আছে, দুর্গাদাসও আছে।

গুল। এ কি সম্ভব?—জানো দুর্গাদাস, তোমার পক্ষে এর ফল কি?

দুর্গা। জানি—মৃত্যু।

গুল। না, দুর্গাদাস তুমি পরিহাস কর্ব।

দুর্গা। জীবনে এর চেয়ে গম্ভীরভাবে কখন কথা কহি নাই।

গুল। কি? আমাকে উপেক্ষা কর্ব? দুর্গাদাস, পদর্ষ বলেছি গুলনেয়ার নতজানু হয়ে প্রেমভিক্ষা করে না; আশীর্ষাদের মত প্রেম বিতরণ করে।—বেছে নাও—বেগম গুলনেয়ার, কিম্বা মৃত্যু।

দুর্গা। বেছে নিলাম—মৃত্যু।

গুল। মৃত্যু! তবে তাই হবে—আমি তোমাকে বধ কর্ব। গুলনেয়ারের কাছে একটা পাবে। হয় প্রেম, না হয় প্রতিহিংসা! যদি প্রেম না চাও, প্রতিহিংসা নেও—কামবন্ধ!

গুলনেয়ারের পুত্র কামবন্ধের প্রবেশ

বেগম। কামবন্ধ!—বধ কর! একে বধ

কর! এই মূহুর্তে বধ কর!—চেয়ে রয়েছে যে!
—বধ কর!

কাম। কেন মা?—পিতার বিনা
অনুমতি—

বেগম। পিতার অনুমতি! আমার আজ্ঞার
উপর পিতার অনুমতি! বধ কর এই মূহুর্তে।
কি আমার কথার অবাধ্য তুমি?—[চীৎকার
করিয়া কহিলেন]—বধ কর—বধ কর—বধ
কর!

কামবক্স তরবারি বাহির করিতে
করিতে কহিলেন—উত্তম! তবে প্রস্তুত হও
বন্দী!

দুর্গা। আমি প্রস্তুত।

[কামবক্স দুর্গাদাসের বধার্থে তরবারি
উঠাইলেন। এমন সময় দিলীর খাঁ প্রবেশ
করিয়া কহিলেন]—সাবধান কামবক্স—নাহিলে
[—পিস্তল কামবক্সের দিকে লক্ষ্য করিলেন।]

গুল। কে তুমি?

দিলীর। আমি মোগল সেনাপতি দিলীর
খাঁ।

গুল। কি? তোমার স্পর্শ যে আমার
আজ্ঞার বিপক্ষে দাঁড়াও?

দিলীর। দিলীর খাঁ কাউকে ভয় করে না
বেগম সাহেব! সে এমন সত্যতার অভেদ্য বশ্মি
আচ্ছাদিত যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে ভয় করে না।
তুমি ত তুচ্ছ জীব।—পাপীয়সী! নির্লজ্জা!
—মনে কোরো না, আমি কিছু শূন্য নাই।
সব শূন্যেছি।—[পরে দুর্গাদাসের দিকে
ফিরিয়া কহিলেন] দুর্গাদাস! বীর! জাম্তাম
যে তুমি মহৎ! কিন্তু এত মহৎ স্বপ্নেও ভাবি
নাই। আমি স্বহস্তে তোমার বধন মোচন
করে দিচ্ছি। [বধন মুক্ত করিয়া] চলে এসো
বাহিরে—আমার নিজের সর্বাংকুশ্ট অশ্ব
তোমাকে দিচ্ছি। সঙ্গে পঞ্চশত অশ্বারোহী
দিচ্ছি। দেশে ফিরে যাও।—আমার আজ্ঞায়
কোন মোগলসেনানী তোমার কেশ স্পর্শ
কর্ষে না! চলে এসো বীর!—বন্দেগী বেগম
সাহেব!—

[দুর্গাদাসের হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গুলনেয়ার ও কামবক্স প্রস্তরমূর্তিবৎ দণ্ডায়মান
রহিলেন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পাহালার উদ্যানচন্দ্রাতপ।

কাল—রাত্রি।

সিংহাসনারূঢ় আকবর। সম্মুখে নর্তকীগণ

নৃত্যগীত

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে!
হের নয়ন—হর্ষমগন চারু ভুবন রে!
নির্দ্রিত সব কুজন রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধ পবন জ্যোৎস্না-মগন রে—
নন্দন-বন-তুল্য-ভুবন-মোহিত মন রে!

আকবর। কেয়াবাৎ!—বাহবা!—সোভানাজ্জা!
—বাহবা বেহাগে কোমল নিখাদ! স্বর্গ যদি
এই রকম হয় তবে স্বর্গ বড় সুখের জায়গা।
সোভানাজ্জা। আবার নাচো; আবার গাও।
এই সময়ে সহাস্যবদনে কাবলেস খাঁ প্রবেশ
করিল

আকবর। কে? কাবলেস্ খাঁ!—শম্ভুজী
কোথায়?

কাবলেস্। আর শম্ভুজী! সাহাজাদা!
শম্ভুজী—এই—[এই বলিয়া কাবলেস্ পতনের
ভঙ্গী দেখাইল]

আকবর। সে কি!

কাবলেস্। কুপোকাৎ।

আকবর। কুয়োয় পড়ে গিয়েছে? বেশী
থেয়েছিল বুদ্ধি?

কাবলেস্। না সাহাজাদা! শম্ভুজী
গ্রেস্তার। চাঁদ এখন তোমার পিতার শিবিরে।
হাতে—এই বলিয়া বন্ধনের অবস্থা দেখাইল।

আকবর। সে কি!—অসম্ভব!

কাবলেস্। অসম্ভব টব নয় সাহাজাদা!
একেবারে ঠিক—এখন আপনার নিজের পথ
দেখুন।

আকবর। একি সত্য কথা কাবলেস্?

কাবলেস্। ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ভারি
সত্য সাহাজাদা! মিথ্যা কথা কাবলেস্ খাঁ
কদাচিৎ কয়। শম্ভুজী একেবারে গ্রেস্তার।
এখন আপনি কি কর্বেন ঠিক করেছেন?
আপনার মুখ যে কালীবরণ হয়ে গেল।

আকবর নীরব রহিলেন

কাবলেস্। শূন্যন। সাহাজাদা! আমার

পরামর্শ যদি শুনতে চান—আপনি আমার সঙ্গে সম্রাটের কাছে আসুন।

আকবর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—সম্রাটের কাছে? তার চেয়ে ব্যাঘ্রের বিবরে যেতে রাজি আছি।

কাবলেস্। আমি বলছি সাহাজাদা—আপনি আমার সঙ্গে চলুন বাদসাহের কাছে। কোন ভয় নাই! তিনি আপনাকে কিছু বলবেন না। বরং কাবাব খেতে দেবেন! আমি জামিন হচ্ছি।

আকবর। পিতার কাছে?

কাবলেস্। হাঁ আকবর! পিতার কাছে। পিতার কাছে।—কি বলেন?

এমন সময় দুর্গাদাস প্রবেশ করিয়া কাবলেস্ খাঁকে কহিলেন—বিশ্বাসঘাতক! তোমার ষড়যন্ত্রজালে নিরীহ কুমারকেও জড়াতে চাও!

আকবর। এ কি! এ যে দুর্গাদাস!

কাবলেস্। তাই ত!—এ যে—[কম্পিত]

দুর্গাদাস। কাবলেস্! তোমার অভিশাপ পূর্ণ হয় নি। আমি জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছি। আমায় শত্রু করে ধরিয়ে দিয়েছিলে, যার আসে না। আমি তোমার কেহ নই। কিন্তু শেষে তুমি তোমার আপন প্রভু শম্ভুজীকেও ধরিয়ে দিয়েছো।—কৃতঘ্ন! নরপিশাচ!

কাবলেস্। না মশায়—আমি না—মহারাজ—

দুর্গাদাস। তুমি নও? কাবলেস্! মহারাজ শম্ভুজী তোমার পরামর্শে এক নবোঢ়া ব্রাহ্মণ বালিকাকে হরণ কর্তে দুর্গের বাহির হয়েছিলেন—কিনা?—সত্য বল। মিথ্যা বললে নিস্তার নাই।

কাবলেস্ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—এক্সে।—

দুর্গাদাস। আর তুমি আগেই সে সম্বাদ কুমার আজীবনকে দিয়াছিলে কি না? তার পরে কুমার আজীবন ৫০০ মোগল সেনানী নিয়ে এসে মহারাজকে বন্দী করেন।—কেমন? ঠিক কি না?

কাবলেস্। অক্সে! [পলায়নোদ্ভ্যত।]

দুর্গাদাস। ভাগোমৎ। — [এই বলিয়া দুর্গাদাস কাবলেস্ খাঁর পলা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন]—কাবলেস্ খাঁ, আমার নাম করো।

কাবলেস্। মাফ করো খোদাবন্দ—আমি, আপনার কুস্তা।

এই বলিয়া সেই ভয়বিহীন কম্পিত কলেবর কাবলেস্ খাঁ দুর্গাদাসের চরণে ধরিল

দুর্গা। যাও তোমার বধ কর্ব না।

আমার হাত তোমার হত্যার কর্মক্ষিত কর্ব না। তুমি শম্ভুজীর পরকাল খেয়ে শেষে তার ইহকালও খেলে। নরকেও তোমার স্থান নাই।

—যাও।—[বলিয়া পদাঘাত করিয়া কাবলেস্ খাঁকে দূর করিয়া দিলেন। কাবলেস্ চলিয়া গেলে দুর্গাদাস আকবরকে কহিলেন]—সাহাজাদা একদিন আমি শম্ভুজীকে বলেছিলাম

যে, এই সূরা আর এই নারীই তোমার সর্বনাশ করবে। আর সে সর্বনাশ সাধন করবে এই কাবলেস্ খাঁ।—অবিকল তাই হোল—যুবরাজ! এই দৃষ্টান্ত হতে শিক্ষা লউন। পূর্বেও অনেকবার বলেছি আজ আবার বলছি—দিন থাকতে সূরা আর নারী পরিত্যাগ করুন!—বড় ভয়ঙ্কর নেশা এই দুই।

আকবর। বড় অধিক বিলম্ব দুর্গাদাস!—বড় অধিক বিলম্ব!

দুর্গাদাস। কিছুই বড় অধিক বিলম্ব নয় কুমার! কেবল প্রবৃত্তি ষত অধিক দিন আসন দখল করে থাকে, ততই তাকে তাড়ানো দৃষ্কর হয়। আপনি উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চহৃদয় ব্যক্তি; আপনি চেষ্টা করুন কি এ পাপ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না?

আকবর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধীরে-ধীরে কহিলেন—দুর্গাদাস! তুমি ঠিক বলেছো। আমি এ নেশা পরিত্যাগ করব। শম্ভু এই নেশা নয়! সংসারের নেশা পরিত্যাগ করব। সব পরিত্যাগ করব।

দুর্গাদাস। সে কি সাহাজাদা!

আকবর। হাঁ বীর! সব পরিত্যাগ করব। জীবনে ঘৃণা হয়ে গেছে। পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে মস্কিত হয়ে আছি। এ কি সাধারণ মানসিক দুরবস্থা! সেটা আজ যেমন অনুভব করছি, তেমন কখন অনুভব করি নাই।—[বলিয়া মস্তক নত করিলেন।]

দুর্গাদাস। শুনুন সাহাজাদা! আমার সঙ্গে মাড়বারে চলুন—আমি জীবিত থাকতে আপনার কোন ভয় নাই।—চলুন।

—আকবর। না দুর্গাদাস! আমি মাড়বারে যাবো না। আমি মক্কায় যাবো। অনেক দিন তোমাদের গলগ্রহ হয়েছে। তোমায় অনেক ক্রেশ দিয়েছি। ক্ষমা করো। আমাকে রক্ষা কর্তে তুমি স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছো। আমার জন্য তুমি ভ্রাতা হারিয়েছ, নিজের ম'র্তে বসেছিলে।
দুর্গাদাস। সে আমার ধর্ম, কুমার! কর্তব্য মাত্র।

আকবর। কর্তব্য! আমি মক্কায় গিয়ে ঐ রকম কর্তব্য পালন কর্তে শিখবো। অনেক পাপ করেছি; সর্বকাৰ্য্যে অবহেলা করেছি; বিলাসে মগ্ন হয়ে কালক্ষেপ করেছি; পিতার বিদ্রোহী হয়েছি; স্ত্রীহন্তা হয়েছি; নিজের জন্য জেনে শূনে তোমায় সর্বনাশ করেছি; শেষে শম্ভুজীর মৃত্যুর কারণ হলাম।
—যাই দুর্গাদাস! আমার জন্য এত করেছো, আর একটা কাজ কর। তুমি দেশে ফিরে যাও—আমায় রাজ্যকে দেখো। তাকে দেখো দুর্গাদাস!—তোমায় হাতে তাকে স'পে দিয়ে গেলাম।—তবে যাই! বিদায় দাও।—[বলিয়া আকবর দুর্গাদাসের কর ধারণ করিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জয়সমুদ্রের তটতীরে প্রাসাদ।

কাল—সায়াক্ষ।

জয়সিংহ ও কমলা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন

জয়সিংহ। কমলা তুমি বিরূপ হয়ো না। তোমায় জন্য আমি দেশ ছেড়েছি, রাজ্য ছেড়েছি, পুত্র ছেড়েছি।

কমলা। কে ছাড়তে বলোছিল?

জয়। তুমি।

কমলা। কোন জন্মেয়ও নয়। আমি বলেছিলাম মাত্র যে বড়রাণীর আর ছোটরাণীর মধ্যে যাকে চাও, একজনকে বেছে নাও; একত্রে দু'জনকে পাবে না।

জয়। আমি তোমাকে বেছে নিইছি। বড়রাণীকে ছেড়েছি।

কমলা। কিন্তু রাজ্য ছাড়তে আমি বলিনি। রাজ্য বড়রাণীর হলে অমরসিংহের হাতে স'পে দিয়ে আসতে বলিনি। আমার পুত্র কি কেউ নয়?

জয়। ও! এই নিয়ে তোমায় সঙ্গে বড়রাণীর ঝগড়া! তা এতদিন ম'খ ফুটে বলিনি কেন কমলা? বড়রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, কলহের কারণ সেদিন প্রকাশ করে নি। এখন বুঝতে পারছি।—কমলা! রাজ্য অমরসিংহের। কিন্তু আমি তোমায়। অমরসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের অধিকারী।

কমলা। আমার চেয়ে তোমায় শাস্ত্র বড়?

জয়। কমলা! আমার কাছে সব শাস্ত্রের চেয়ে তুমি বড়।

কমলা। তবে!—তোমায় কি ইচ্ছা যে তোমায় মৃত্যুর পরে আমি অমের জন্যে বড়রাণীর দ্বারায় ভিখারী হব।

জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—এত ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমায় আছে কমলা? আমি ত তা কখন ভাবি নি—তবে তোমায় চিন্তা তোমায় পুত্রের জন্য নয়; নিজের জন্য?

কমলা। নিজের জন্য চিন্তা কি এতই গর্হিত হোল রাণা! কে সে চিন্তা করে না মহারাজ!

জয়। কৈ! আমি ত কখন করিনি রাণী। আমি রাণা রাজসিংহের পুত্র। আমি মনে করি কি না হতে পারি। যশ, মান, অর্থ, প্রভৃৎ, বিলাস পরিত্যাগ করে—জাতির খিঙ্কার নিয়ে, আমি তোমায় জন্য বনবাসী হয়েছি। ভবিষ্যৎ ত দু'য়ের কথা, আমি তোমায় জন্য বস্তুমান ছেড়েছি।

কমলা। আমার জন্য ছেড়েছো! না আমার রূপের জন্য? তুমি আমার বিয়ে করেছিলে আমার জন্য নয়, আমার রূপের জন্য। আমি তোমায় বিয়ে করেছিলাম তোমায় জন্য নয়, তোমায় রাজ্যের জন্য।

জয়। আমার রাজ্যের জন্য! এক শূন্য ঠিক?—কমলা! আমার বড় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলে!—কমলা! কমলা! জানো না তুমি আমার কি সর্বনাশ করলে!

কমলা। —আমি তোমায় সর্বনাশ করিনি না তুমি আমার সর্বনাশ করলে!

জয়। রাণী! তোমায় রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি?—কৈ সে রূপ? আর ত দেখতে

পাচ্ছি না! কোথা থেকে এক জ্যোতি এসে তোমার মূখে পড়েছিল; চলে গেল। এখন তোমার মূখে সে রূপের কঙ্কাল-মাত্র দেখাছি।—নারী! রূপ কতক ঈশ্বর দেন, আর কতক রমণী নিজে সৃষ্টি করে। নারীর উজ্জ্বল হৃদয়ের প্রতিভা তার মূখে এসে পড়ে' এক নতুন রাজ্য রচনা করে; বাহিরের রূপ তার কাছে কিছই না। না রণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি নাই, তোমার জন্যই ভালবেসেছিলাম।

কমলা। মিথ্যা কথা!

জয়। রূপ? সংসারে কি রূপের অভাব আছে নারী? যেখানে অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার ঐন্দ্রজালিক খেলা, শস্যক্ষেত্রের তরুণায়িত শ্যামল বৈভব, আকাশের অবাধ নীল প্রসার; সেখানে যেদিকে চাই সেই দিকে সৌন্দর্য, সুগন্ধ, সঙ্গীত; সে বিশ্বসংসারে রূপের জন্য তোমার কাছে গিইছিলাম? আর বিস্তীর্ণ রাজস্থানে একা তুমিই সুন্দরী?—কৈ তোমার সে রূপ কমলা? কোথা থেকে এসেছিল! কোথায় চলে গেল!

কমলা। এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

জয়। অভিপ্রায়! জানি না। মোহ ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু বড় অকস্মাৎ। সময় দাও।

এই সময়ে দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভি-বাদন করিয়া কহিল—মহারাজা! রাজমন্ত্রী সাক্ষাৎ চান।

জয়। রাজমন্ত্রী!—এখানে!—যাও এখানেই নিয়ে এসো।

দৌবারিক চলিয়া গেলে জয়সিংহ কমলাকে কহিলেন—যাও কমলা ভিতরে যাও। তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। তুমি বড় আশায় নিরাশ হয়েছো, আমি বড় আশায় নিরাশ হইছি। ভিতরে যাও।

কমলা যাইতে যাইতে ভাবিলেন—বৃদ্ধি যা ছিল তাও হারালাম।

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়। এরই জন্য সব ছেড়েছি! লক্ষ্মী রূপিণী সরস্বতীকে ছেড়ে এসেছি! সরস্বতী! এখন বোধ হয় তোমায় কিছ কিছু চিন্তে পাচ্ছি। সেদিন সত্য বলেছিলে—‘এ প্রেম নয়, মোহ।’

এই সময় মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন জয়। কি মন্ত্রী? রাজ্যের সম্বাদ কি? মন্ত্রী। মহারাণা আমি ইস্তাফা দিতে এসেছি।

জয়। সে কি! কি হয়েছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। কি হয়েছে। রাণার পুত্র আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছেন। আমি রাজসংসারে চাকরি করে' বড়ো হয়ে গেলাম। কিন্তু এমন অপমান কখন হয় নি।

জয়। কি অপমান করেছে?

মন্ত্রী। কুমার অমরসিংহ এক উন্মত্ত হস্তী খুলে সহরে ছেড়ে দেন। তাতে কয়েক পুর-বাসীর প্রাণনাশ হয়। আমি তাতে তাঁকে তিরস্কার করায়, তিনি আমার মাথা মর্দিয়ে, গাধার পিঠে চাঁড়িয়ে, সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছেন।

জয়। এতদূর! অমর জানে যে, আমি তোমায় তার অভিভাবক করে' রেখে এসেছি?

মন্ত্রী। তাঁর যে পিতৃভক্তি বিশেষ আছে, তা কোন কাজেই প্রকাশ পায় না।

জয়। চল! কাল আমি রাজ্যে ফিরে যাবো! এবিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন গৃহে চল!—শীত কচ্ছে।

[এই বলিয়া উভয়ে নিষ্কান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কোয়েলার দুর্গাশিখর।

কাল—জ্যোৎস্না রাতি।

অজিত ও রাজিয়া একাট বেদীর উপর বসিয়াছিলেন

রাজিয়া। কি সুন্দর চাঁদ উঠছে দেখো অজিত। ঐ যে দেখছো পূর্বাঁদিকে একখানা কালো মেঘের উপর দিয়ে উঠছে। মেঘের উপরটার ধারে ধারে কে যেন তরল স্বর্ণরেখা বর্দিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মেঘখানার নীচে সব গাঢ় কালো। চাঁদের সিকি ভাগ মেঘের উপরে দেখা যাচ্ছে। কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি স্থির!—কি সুন্দর দেখছে অজিত!

অজিত। না আমি কেবল তোমাকে দেখছি।

রাজিয়া। তা হলে অত্যন্ত ভুল কচ্ছে। এ পৃথিবীতে চারিদিকে এত দেখবার জিনিষ

রয়েছে, তা ছেড়ে আমাকে দেখেছো? কি সুন্দর এই পৃথিবী! আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবীটা একটা অশ্রান্ত অনন্ত অব্যাহত সংগীত। এই নীলিমা তার অনুলোম, এই শ্যামলতা তার বিলোম, আলোকে তার গ্রহ, অন্ধকারে তার সম, পর্বতে পর্বতে তার ন্যাস, তরুণে তরুণে তার মূর্ছনা!—কি সুন্দর এই পৃথিবী অজিত!

অজিত। আমি সবচেয়ে তোমার মুখই সুন্দর দেখি।

রাজিয়া। সবচেয়ে আমার মুখ তুমি সুন্দর দেখ? অপরিষ্কৃত গোলাপের ক্রীড়া-রক্তিম চাহনির চেয়ে সুন্দর? বেলাবিলীন লহরীলীলার চেয়ে সুন্দর? ঐ কৃষ্ণমেঘান্তরিত শরচ্চন্দ্রের চেয়ে সুন্দর?—অজিত! তুমি অত্যন্ত বালক।

অজিত। আমি আর বালক নই বলেই তোমার মুখ সবচেয়ে সুন্দর দেখি। বৃষ্টি ছি এখন রাজিয়া যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সার সৌন্দর্য্য নারী। আর নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি।

রাজিয়া। আমি! আমি তা বিশ্বাস করি না।

অজিত। রাজিয়া! বিশ্বাস কর না, কারণ, রাজিয়া তুমি আমায় ভালোবাসো না।

রাজিয়া। ভালোবাসি না? জানি না ভালোবাসা কাকে বলে অজিত! তবে যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে যদি সর্বদাই দেখতে ইচ্ছা করে; যদি তাকে দেখলে, তার স্বর শুনলে, হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে ওঠে; তবে আমি তোমায় ভালবাসি! অত্যন্ত ভালোবাসি!

অজিত। বাসো রাজিয়া?—সত্যকথা?—

রাজিয়া। মিথ্যাকথা বলতে ত শিখিনি।—

অজিত। প্রাণাধিকে [হস্ত ধরিলেন]

রাজিয়া। প্রিয়তম।—বলিয়া গাহিলেন—

এসো এসো বন্ধু বাঁধি বাহু ডোরে,
এসো বৃকে করে' রাখি।
বৃকে ধরে' মোর আশ ঘুমঘোরে
সুখে ভোর হয়ে থাকি।
মুছে যাক্ চখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব
মিলিত হৃদির মৃদুগীতিরব—
আধানিমীলিত আঁখি।

বহু ক বাহিরে পবন বেগে,
করুক গঞ্জনি অর্শনি মেঘে,
রাবি শশী তারা হয়ে যাক হারা,
আঁধারে ফেলুক ঢাকি;
আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু,
এই শব্দ নিয়ে থাকি,
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক—
আর যা' রহিল থাকি।

গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন। ঠিক এইসময়ে মৃকুন্দদাস প্রবেশ করিলেন

মৃকুন্দ। “মহারাজ”—বলিয়াই অজিতকে রাজিয়ার বাহুলীন দেখিয়া পশ্চাঙ্গমন করিতে-ছিলেন। অজিত তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—“কি মৃকুন্দদাস! বিশেষ কোন সম্বাদ আছে?”

মৃকুন্দ। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে এসেছেন।

অজিত। কে? দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন? কোথায় তিনি?

মৃকুন্দ। বাহিরে।

অজিত। চল!—না তাকে এখানেই নিয়ে এসো।

মৃকুন্দ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

অজিত। যাও রাজিয়া এখন নিজের কক্ষে যাও।

[রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

অজিত। দুর্গাদাস ফিরে এসেছে? আমার রক্ষক, দেশের ভরসা, দুর্গাদাস ফিরে এসেছে; এতে একটা উল্লাস না এসে মনে এক খটকা লাগছে কেন? এ কি চিন্তা, যাতে আমার চিরসংগত ভক্তি স্নেহ কৃতজ্ঞতাকে আবিলা করে' দিচ্ছে! না, এ অত্যন্ত অনর্চিত! না, এ প্রবৃত্তি মন থেকে দূর কর্ব।

রাজপুত্র সামন্তস্বয়ং মৃকুন্দদাস-ও শিবসিংহ সমাভিব্যাহারে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন

দুর্গাদাস। মহারাজ! ভূত্য ফিরে এসেছে। বহুদিনের সংগত আশা আমার—কুমারকে মহারাজ সম্বোধন কর্তে কণ্ঠ আনন্দে রুদ্ধ হয়ে আসছে। মহারাজ অভিবাদন করি।—
[বলিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলেন।]

অজিত। ভক্ত বন্ধু! আমার প্রিয়তম সেনাপতি!—কুশল ত?

দুর্গা। হাঁ আপাতকুশল। মহারাজ! তবে আপনি নিজেই সামন্তদের দেখা দিয়েছেন?

অজিত। হাঁ আমি নিজেই সামন্তদের দেখা দিইছি।

মুকুন্দ। প্রভু! আমি বহুদিন ধরে' তাতে সম্মত হইনি, বল্লম প্রভুর বিনা-অনুমতি তা হবে না। কিন্তু সামন্তরা ছাড়লে না, বল্লম মহারাজকে দেখবো। কোন কথা শুনবো না।

দুর্গা। তা উত্তম হয়েছে।—তারা মহারাজের যথোচিত অভ্যর্থনা করেছে?

মুকুন্দ। অভ্যর্থনা! সে কি অভ্যর্থনা! চৈত্র সংক্রান্তিতে মহারাজ তাঁর সামন্তদের দেখা দিলেন। সেখানে দর্শনশাল, উদয়সিং, তেজসিংহ, বিজয় পাল, জগৎসিং, কেশরী—আরো বহু সামন্ত উপস্থিত ছিলেন! তাঁরা মহারাজকে ঘিরে জয়ধ্বনি কর্তে লাগলেন! গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, উল্লাস চীৎকার।—প্রভু সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

দুর্গা। উত্তম! এদিকে যুদ্ধের সম্বাদ কি শিবসিং?

শিব। ঔরঞ্জীব মহম্মদ সাহাকে যশোবন্তসিংহের এক পুত্র বলে' যোধপুরের রাজা নামে খাড়া করেছিলেন। তার আপনিই মৃত্যু হয়। যোদা হরনাথ সজায়েৎ খাঁকে কচ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মহারাজ স্বয়ং আজমীরে গিয়ে সেফি খাঁকে পরাস্ত করেছেন।

মুকুন্দ। সব শুভ। সব শুভ সেনাপতি! তবে সমরসিংহের যে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে, তাতে সমস্ত জয় উৎসবহীন হয়েছে।

অজিত। সেনাপতি! জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ তার পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে। জয়সিংহ মাড়বারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সেনাপতি তুমি সসৈন্যে জয়সিংহের সাহায্যে যাও!

দুর্গা। যে আঙ্কে মহারাজ। কালই প্রত্যয়ে যাবো!—কাশিম কোথায়?

শিব। সে পীড়িত! নহিলে সকলের আগে সে এসে প্রভুর পদ বন্দনা কর্ত।

দুর্গা। পীড়িত! কি পীড়া? কোথায় সে?

শিব। ভিতরের ঘরে শূন্যে। বিশেষ কিছু নয়। জ্বর; সামান্য জ্বর।—

দুর্গা। চল—তাকে দেখে আসি—

[এই বলিয়া সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে মোগল শিবির। কাল—প্রভাত।
ঔরঞ্জীব ও দিলীর খাঁ দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! আকবর তা হলে' পারস্য দেশে চলে' গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাহাপনা। একখানা ইংরাজ জাহাজ করে' ধোঁয়া উড়িয়ে সেই দিকে চলে' গেলেন—সকলে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।—সেখান থেকে—শূন্যে পেলাম—তিনি মক্কা যাবেন।

ঔরঞ্জীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তার শিক্ষার জন্য এত ব্যয়, যত্ন, শ্রম, সব নিষ্ফল হোল!

দিলীর। না জনাব। সে শিক্ষার যা কিছু ফল আজ দেখা গেল। শিক্ষা না হলে' অন্ততাপ হোত না।

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! আমিও মক্কা যাবো! আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। একটা মাত্র বাকি আছে। রাজ্যের উদ্ধার সাধন করা। তুমি যদি দুর্গাদাসকে মৃত কর' না দিতে, হয়ত বা যাবার আগে সে কার্য উদ্ধার কর্তে পার্তাম।

দিলীর। দুর্গাদাসকে ভয় দেখিয়ে? না সম্রাট—তা হোত না। ভয় কাকে বলে, তা সে বীর জানে না। সে রাত্রিকালে কামবন্ধ যখন দুর্গাদাসের মাথার উপর তরবারি উঠিয়েছিল, তখন দুর্গাদাস যে কি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনাব—সে দৃশ্য ভুলবো না। হঠাৎ তার মাথা যেন শৈল শিখরের মত সোজা হ'ল। তার বক্ষ আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হোল।—তাকে এত উচ্চ এত আয়তবক্ষ আর কখনো দেখিনি জনাব!

ঔরঞ্জীব। হাঁ দিলীর! দুর্গাদাস মহৎ। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু—

দিলীর। জাহাপনা! দেখাছ যে, কর্তব্যের জন্য রাজপুত্রজাত শূন্য মর্তে ভয় পায় না,

তা নয়;—তাতে যেন সে একটা গর্ষ্ব অনুভব করে। আর সেই রাজপুত্র জাতির মধ্যে সেরা রাজপুত্র দুর্গাদাস।

ঔরঞ্জীব। স্বীকার করি দিলীর খাঁ।—
তবে রাজ্যকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা দুরাশা?

দিলীর। দুরাশা নয়। আমি সে কাজ উদ্ধার করে' দিতে পারি জনাব—যদি আমায় সম্রাট এ বিষয়ে অবাধ অধিকার দেন।

ঔরঞ্জীব। কি উপায়ে?

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি জানি, এই রাজপুত্র জাতিকে, বিশেষ এই দুর্গাদাসকে, কি রকম করে' চালাতে হয়। তার আত্ম-মর্যাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুত্রের মত কোমল। তাকে ভয় দেখাতে চান, সে লৌহবৎ দৃঢ়।

ঔরঞ্জীব। উত্তম। তোমার উপর অবাধ ভার দিলাম। আমার মাথার ঠিক নাই। আমি বুদ্ধির দোষে মোজামকে শত্রু করেছি, আজীমকে লোভী করেছি, আকবরকে বিদ্রোহী করেছি, কামবককে পিশাচ তৈর করেছি। অথচ বুদ্ধির দোষ যে কোন্‌খানে সেইটে বুঝতে পারি না।

দিলীর। ঐ ত জনাব। বুদ্ধির দোষ কোন্‌
খানে তাই যদি বোঝা যাবে, তা হলে ত বুদ্ধির
দোষ কেটেই গেল।

এই সময়ে কাবলেস্‌ খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন
করিল

ঔরঞ্জীব। কি কাবলেস্‌ খাঁ?

কাবলেস্‌। আজ্ঞে! শম্ভুজীকে গাধার
পিঠে চড়িয়ে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসা
হয়েছে। কাফের চেঁচিয়ে বলতে বলতে
এসেছে 'আমায় কেউ বধ কর।' কেউ সাহস
করেনি।—তাকে এখন এখানে নিয়ে আসবো
খোদাবন্দ?

ঔরঞ্জীব। নিয়ে এসো।

কাবলেস্‌। আমার ইনামটা খোদাবন্দ।

ঔরঞ্জীব। দিব, কাবলেস্‌! দিব, প্রচুর
পুরস্কার দিব।

[কাবলেস্‌ সেলাম করিতে
করিতে প্রস্থান করিল।

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! জীবনে আর
আমার স্পৃহা নাই। আমার উদ্যম গিয়েছে।

আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। [—পরে
ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকার পর কহিলেন—] যা
কখন ভাবিনি সম্ভব—আমার সম্রাজ্ঞী, ভারতের
অধীশ্বরী—তাকে কি না দিয়েছিলাম। দিলীর
—এ কখন ভাবিনি—স্বপ্নেও ভাবিনি।

দিলীর। জাঁহাপনা আমি বরাবর দেখে
এসেছি যে, যেটা কখন ভাবা না যায়, সবার
আগে সেইটে ঘটে।

পিঞ্জরাবন্ধ শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাবলেস্‌
ও প্রহরীরা প্রবেশ করিল

ঔরঞ্জীব। এই যে মরাঠা বীর। কেমন
মহারাজ! কোরাণের আর কুৎসা কর্ষে?
মস্‌জিদ অপবিত্র কর্ষে? মোল্লার অপমান
কর্ষে?—কি? কথা নেই যে?

কাবলেস্‌। হুজুর! ও উত্তর দিবে কেমন
করে'? কোরাণের নিন্দে করার দরুন ওর
জিভ কেটে দিইছি।

ঔরঞ্জীব। মরাঠা বীর! এখনো বল,
কোরাণ গ্রহণ কর্ষে? এখনও যদি বল, তোমার
জীবন দান করি।

শম্ভুজী ঔরঞ্জীবের উদ্দেশে পিঞ্জরের গরাদেতে
পদাঘাত করিলেন

কাবলেস্‌। এই ভালো বুদ্ধি? জাঁহা-
পনা—একে জলদি বধ করুন। একে বধ
করুন। নহিলে—

ঔরং। যাও, এক্ষণি এর ছিন্ন মূণ্ড আমার
সম্মুখে নিয়ে এসো।

[শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাবলেস্‌ ও
প্রহরীগণ প্রস্থান করিল।

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! কথা কচ্ছ' না
যে?

দিলীর। এর পরে আমার আর কিছু
কহবার নাই। বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য
ব্যবহারই বটে!

ঔরঞ্জীব। শম্ভুজী যদি কোরাণ গ্রহণ
কর্ত্ত, আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তাম।

দিলীর। যদি শম্ভুজী এই সময়ে মৃত্যুভয়ে
কোরাণ গ্রহণ কর্ত্তেন, আমি তাঁকে ঘৃণা
কর্ত্তাম।—জনাব! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে,
কেউ তার বিবেকের বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম
গ্রহণ করে?

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ, এই ইসলাম

ধর্ম প্রচারের জন্যই এই রাজ্যভার নিইছি। এরই জন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, ভ্রাতাকে হত্যা করেছি।—খোদা জানেন।

দিলীর। জানি সন্ন্যাসী। আপনি সরল ধার্মিক মুসলমান বলে' এখনো আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাকে কপট বিবেচনা করলে বহুদিন পূর্বে বন্দা বিদায় নিত। কিন্তু সন্ন্যাসী, বাহুবলে কি ধর্ম-প্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈর হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি, শেষবার বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও রুক্নের নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিবৈষম্য ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক দেখি সন্ন্যাসী। সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরঞ্জীব। হিন্দু মুসলমান এক হবে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সন্ন্যাসী! তা'রা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে', একই জল পান করে', একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হইনি? তা'রা একবার ধর্ম-ভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তি বাৎসগদগদ-স্বরে এই শ্যামলা সূজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে' মা' বলে ডাকুক দেখি সন্ন্যাসী!

ঔরঞ্জীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখেছো।

দিলীর। আমায় মাপ কর্বেন জাঁহাপনা। আমি স্বপ্নই দেখছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন।—ভেঙে গেল!

ঔরঞ্জীব। স্বগত কহিলেন—“তা যদি হোত। তা যদি হোত।—না বড় অধিক বিলম্ব। এ বয়সে আর নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে—রক্তভূমিতে নামতে পারি না।” [পরে প্রকাশ্যে কহিলেন—] দিলীর খাঁ, আমি বৃদ্ধিতে পাচ্ছি

না যে আমি কি করছি—আমি যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছি। ভাবতে পাচ্ছি না। সব ঝাপসা দেখছি। মাথা ঘুচ্ছে। দিলীর! আমি আর সে ঔরঞ্জীব নই। আমি তার কঙ্কাল মাত্র।

দিলীর। এখনো কিছু দেরি আছে জনাব। এখনো সে কঙ্কালের উপর মাংসটুকু ঝুলছে; ঝরে' পড়ে নি। তবে তার বড় বেশী দেরিও নাই।

এই সময়ে কাব্লেস শম্ভুজীর ছিন্ন মূন্ড এক রৌপ্যপাত্রে আনিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে রাখিল।—

সঙ্গে রক্তাক্ত আজীম ও প্রহরীগণ

ঔরঞ্জীব। শম্ভুজীর মূন্ড!—যাও, নিয়ে যাও।

দিলীর। দারার রক্তে যে রাজত্বের আরম্ভ হয়েছিল, এই বীরের রক্তে সেই রাজত্বের শেষ হোল।—

[এই বলিয়া দিলীর খাঁ চলিয়া গেলেন।

কাব্লেস্। জাঁহাপনা আমার ইনাম?

ঔরঞ্জীব। তোমার পুরস্কার? এই যে— [প্রহরীদিগকে কহিলেন] বাঁধো।

কাব্লেস্। “এ্যাঁ—আমাকে”— [প্রহরীরা কাব্লেস্ খাঁকে বন্ধন করিল।]

ঔরঞ্জীব। আজীম একে বাইরে নিয়ে যাও—এর মূন্ড নিয়ে এসো।—কাব্লেস্ খাঁ! আমরা অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিতে বাধ্য হই বটে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঘৃণা করি—যাও যেখানে তোমার মনিব শম্ভুজী গিয়েছে।

কাব্লেস্। আজ্ঞে—জাঁহাপনা।

ঔরঞ্জীব। যাও—

[বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আজীম। চল্ কুস্তা!

কাব্লেস্। দোহাই সাহাজাদা সাহেব, আমায় মাঝে'ন না। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো!—আপনার—

আজীম। চল্ নেমকহারাম—[বলিয়া ষষ্টি দিয়া প্রহার করিলেন।]

কাব্লেস্। মারো মারো মারো—জুতা মারো—লাঠি মারো—তার পরে লাঠি মেয়ে তাড়িয়ে দাও—শুধু একেবারে মেয়ে ফেলো না—দোহাই!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।
অজিতসিংহ ও শ্যামসিংহ

শ্যাম। মহারাজ বিবাহ করেছেন তবে
রাণার ভ্রাতৃপুত্রকে?

অজিত। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গা-
দাস সম্প্রতি উদয়পুরে গিয়েছিলেন। সেখান
থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন।
আমি তাতে স্বীকার হই।

শ্যাম। মহারাজ! এ বড় সৌভাগ্য যে
আজ মেবারের ও মাড়বারের ঘর মিলিত
হোল। গজসিংহের কন্যাটিও শূন্যিছ পরম
রূপবতী।

অজিত। কিন্তু কাঠের পুতুল! নেহাইং
বালিকা।

শ্যাম। ঐ কাঠের পুতুলই একদিন রক্ত-
মাংসে গড়ে আসবে। কিছ্ বলতে হবে না
মহারাজ!

অজিত। একটা কথাও কৈতে জানে না।

শ্যাম। শিখবে! মহারাজ, শিখবে! মেয়ে-
মানুষ টিয়াপাখীর জাত—সীতারাম পড়াও,
তাও পড়বে; আবার রাধাকৃষ্ণ পড়াও, তাও
পড়বে।

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন

শ্যাম। কি দুর্গাদাস! সাহাজাদী?

দুর্গা। আমি তাঁকে সেনাপতি সুজায়েৎ-
এর হাতেই দিইছি আপনার হাতে দেওয়ার
চেয়ে তাঁর হাতে দেওয়াই শ্রেয় মনে করলাম।

শ্যাম। কি আমাকে কি বিশ্বাস হোল না?

দুর্গা। মহারাজ সত্য কথা বলতে কি—
বিশ্বাস ঠিক হোলো না। কিন্তু একই কথা ত।
তাঁকে সন্মতের সমীপে আপনি নিয়ে গেলেও
যা, সুজায়েৎ নিয়ে গেলেও তা।

শ্যাম। হাঁ—না—হাঁ—তা বেশ করেছেন।
সাহাজাদীকে তার হাতে দেওয়াও যা, আমার
হাতে দেওয়াও তা।

অজিত। সাহাজাদী! কোন্ সাহাজাদী
দুর্গাদাস?

দুর্গা। আকবর সাহের কন্যা রাজিয়া
উং উম্মিসা! তাঁর বিনিময়ে আমি মাড়বার

পতির জন্য তিনটি জনপদ বিনা যুদ্ধে লাভ
করেছি।

অজিত। কি দুর্গাদাস তুমি কি বলতে
চাও দুর্গাদাস যে, তুমি আমার—তুমি
রাজিয়াকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছো?
দুর্গা। হাঁ মহারাজ! তাঁকে ফিরিয়ে
দিয়েছি।

অজিতসিংহ ক্রমেক স্তম্ভ রহিলেন; পরে
কহিলেন “তাকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে
দেবার তোমার অধিকার কি সেনাপতি?—
রাজা আমি! আমার অনুমতি না নিয়ে—”

শ্যাম। আমিও তাই সেনাপতিকে বলে-
ছিলাম মহারাজ! যে মহারাজের অনুমতি না
নিয়ে—

অজিত। তবে তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে
আছো বিকানীর-পতি?

দুর্গাদাস। অনুমতি নেই নাই, কারণ
অনুমতি চাইলে পেতাম না মহারাজ! আর
আকবর আর তাঁর পরিবার আমার আশ্রয়
নিরেছিলেন। মহারাজের আশ্রয় নেন নি।

অজিত। তোমার এতদূর স্পর্ধা দুর্গা-
দাস!—ভেবেছো—[ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ
হইল।]

দুর্গা। শুনুন মহারাজ! স্পষ্ট কথা
কহি! আমি জেনেছি যে আপনি সাহা-
জাদীর প্রণয়মুগ্ধ। এ কথা আমি যে দিন
দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে আসি, সে দিন মদুকুন্দ
দাসের কাছে শুনি। তার পরে নিজেও লক্ষ্য
করেছি। এ প্রেম কোন পক্ষেরই শূভ নয়।
কারণ আপনাদের বিবাহ হতে পারে না।—
আমি সেই জন্যই উদয়পুরে আপনার বিবাহের
প্রস্তাব করি। সেখানেই এই বিকানীরপতি
সাহাজাদীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন।
আমি তাতে সন্মত হই।

অজিত। সন্মত হও! প্রচুর উৎকোচ
নিরেছ বৃদ্ধি সেনাপতি—

দুর্গা। উৎকোচ মহারাজ! তা যদি
নিতাম—না কমা কর্বেন মহারাজ! আমি
অন্যায় বলতে বাঞ্ছলাম।

অজিত। কমা!—দুর্গাদাস! এই উৎকোচ
নেওয়ার অপরাধে তোমাকে মাড়বার থেকে
চিরনির্ধ্বাসিত করলাম।

দুর্গা। যে আজ্ঞে মহারাজ—

[এই বলিয়া দুর্গাদাস সেলাম
করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অজিত। চক্রান্ত—চক্রান্ত—একটা প্রকাণ্ড
চক্রান্ত!

শ্যাম। মহারাজ! আমি এর মধ্যে নেই—
আমি বলেছিলাম—

অজিত। দূর হও—

বলিয়া শ্যামসিংকে পদাঘাত করিয়া দূর
করিয়া দিলেন

অজিত। রাজিয়া! তবে তোমায় হারালাম!
জন্মের মত হারালাম। আর তোমার জন্য
আমি দুর্গাদাসকেও হারালাম।

বলিয়া সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন

কাশিম দ্রুতপদক্ষেপে সেই কক্ষে
প্রবেশ করিল

কাশিম। রাজা! মহারাজ দুর্গাদাস
কোথায়?

অজিত। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে
গিয়েছেন।

কাশিম। তিনি গিয়েছেন না তুই তাড়িয়ে
দিয়োছিস্—শ্যামসিংহের মুখে যা শুনলাম!
সত্যি?

অজিত। হাঁ আমি তাকে নিৰ্ব্বাসিত
করেছি।

কাশিম। তা বদ্বোঁছ! কেন তাড়িয়েছিস্
রাজা?

অজিত। উৎকোচ—ঘৃষ নেওয়ার জন্য।

কাশিম। ঘৃষ!—মহারাজ দুর্গাদাস ঘৃষ
নিয়েছে!—ভালা রে ভালা! ওকথা মুখেও
আনলি! দুর্গাদাস ঘৃষ নিয়েছে! দুর্গাদাস
ঘৃষ নিলে তোরই মত একটা মহারাজা হতি
পান্ত না? সে ইচ্ছা করলে তোকে পায়ে ঠেলে
ফেলে দিয়ে যোধপুরের রাজা হয়ে বসতি
পান্ত না? দুর্গাদাস ঘৃষ নেবে? হা রে
নেমকহারাম! যে তোরে এতদিন জান দিয়ে
বাঁচিয়েছে; ধড়ের রক্ত দিয়ে এই পঁচিশ বছর
দ্যাশের জন্যে লড়েছে—তার এই বৃড়ো বয়সে
তুই তাড়িয়ে দিলি; পরের দুরোরে ভিক্ষে
মেগে খাতি!" এই তোর ধর্ম হোল রে নেমক-
হারাম?

অজিত। কাকা—

কাশিম। খবন্দার! আর মোরে কাকা
বলে ডাকিস্ না। মুই এমন নেমকহারামের
কাকা নই!—মুই আর তোর রুটি খাতি' চাই
না। মুইও যাবো। খাটি' খাবো। খাটি' ভিক্ষে
মেগে আমার মহারাজ দুর্গাদাসকে খাওয়াবো।
তার কিম্বৎ তুই কি বদ্ববি রে নেমকহারাম!
[—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল। অজিত কোন
কথা না করিয়া বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ওরংগাবাদ রাজপ্রাসাদ। কাল—অপরাহ্ন।
গুলনেয়ার একাকিনী স্বিতলকক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া-
ছিলেন—সম্মুখে রাজভৃত্য

গুলনেয়ার। কি! সম্মাট বন্ডেন ফুর্সৎ
নেই?

ভৃত্য। হাঁ বেগম সাহেব। বাদসাহ মক্কায়
যাবার আয়োজন কচ্ছেন। এখানে আসবার
তার ফুর্সৎ নাই।

গুল। আচ্ছা যাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে গুলনেয়ার কহিলেন

—“এতদূর! আমি সম্মাটকে আমার পুত্রের
বিজাপুর গমন রহিত কর্তে বললাম—উত্তর
এলো ‘তাকে যেতেই হবে।’ সম্মাটকে ডেকে
পাঠালাম—উত্তর এলো—“ফুর্সৎ নেই”।—হু
মানুষের যখন পতন হয়, এই রকমই হয় বটে!
সময় বদলেছে।—কিন্তু আমি একথা আজ
নীরব হয়ে শুনলাম!—আশ্চর্য!—আমি কি
সেই গুলনেয়ার? বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখি—
[আয়নার গিয়া নিজমূর্তি দেখিয়া কহিলেন]
—একি! সত্যি ত আমি সে গুলনেয়ার নই।
চন্দ্র কোটরে সোধিয়েছে; গন্ড বসে গিয়েছে;
চুল সব পেকে গিয়েছে। আমি ত সেই গুল-
নেয়ার নই।—কে আমি? [চীৎকার করিয়া]
কে আমি?”

এই সময়ে রাজিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

—সম্মাজী।

গুল। কে? রাজিয়া! কি বলে ডাকলে?
সম্মাজী? আমি তবে সম্মাজী! আমি তবে
সেই গুলনেয়ার!

রাজিয়া। ঠানদিদি—

গুল। রাজিয়া আমার পানে চেয়ে দেখে দেখি—সত্য সত্য বল্—আমি সেই গুলনেয়ার কি না?

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি সেই গুলনেয়ার কি না জানি না। কিন্তু তুমি আমার সেই ঠানদিদি।

গুল। সত্য কি রাজিয়া? চিন্তে পাচ্ছি'স্। সত্য করে বল্ দেখি—চিন্তে পাচ্ছি'স্? সেই একদিন আমায় দেখেছিল ভারতসম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার—ভারতসম্রাট যার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যার রোষকৃষ্ণিত দ্রুভঙ্গ সভয়ে লক্ষ্য কর্ত; দৃঢ়মূর্তিবন্ধকৃপাণ দশ লক্ষ সেনানী যার তর্জনির দিকে ইংগিতের অপেক্ষায় চেয়ে থাকতো। আর আজ আমি—সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজন্যবর্গের ধিক্কৃত, বিশ্বের বর্জিত। আমি সেই গুলনেয়ার কি? চেয়ে দেখে ভালো করে'।

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি আমার সেই ঠানদি। জগৎ তোমায় বর্জন করে করুক। আমি তোমায় আঁকড়ে ধরে' থাক'বো।

গুল। কেন রাজিয়া? আমি তোর কবে কি করেছি?

রাজিয়া। কিছু কর নাই। কারণ ঠানদিদি আমরা সমদুঃখিনী। আমিও অভাগিনী—ভালোবেসেছি।

গুল। তুই ভালোবেসেছিস? কাকে রাজিয়া? কিন্তু আমার মত বেসেছি'স্ কি! আমার মত—ভালবাসার তুষানলে জ্বলে-ছি'স্? একটা সাম্রাজ্য তার জন্য বিলিয়ে দিই'ছিস? পরে তার ম্বারা প্রত্যাখ্যাত হই'ছিস?—না রাজিয়া! তুই এ দাহ কল্পনাও কর্তে পারিস না।—সেইদিন হতে আমার সব শেষ হয়েছে। আজ যা দেখি'ছিস সে গুলনেয়ার নয়—তার কঙ্কাল। আর আমি সে গুলনেয়ার নেই—সব গিয়েছে।

এমন সময়ে বাঁদি প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিল

“সাহাজাদি! আসুন।”

রাজিয়া। দাঁড়া, যাচ্ছি একটু পরে।

বাঁদি। না সাহাজাদি বাদসাহের হুকুম নেই।

গুল। কি হুকুম নেই বাঁদি?

বাঁদি। সাহাজাদিকে এখানে আসতে দেওয়া—

এই বলিয়া বাঁদি রাজিয়াকে কহিল

“চলুন।”

রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে গুলনেয়ারের মূখের দিকে চাহিলেন

গুলনেয়ার রাজিয়াকে কহিলেন

“যাও!”

[রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

গুল। আমি আজ এতই হেয়! নিজের পৌত্রীর সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নহি! একটা বাঁদিও চোখ রাঙিয়ে যায়! না, এর শেষ কর্তে হবে! ভূত্যেরও ধিক্কৃত হয়ে গুলনেয়ার এ রাজ্যের পশ্চাৎ কক্ষে বাস করবে না। এ রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে প্রবেশ করে-ছিলাম। সম্রাজ্ঞী হয়ে এখান থেকে যাবো।

গাহিতে গাহিতে নৃত্যসহকারে একদল বৈরাগী নীচে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল

গীত

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ'বি—
ওরে মরণটাকে দেখ'বি, ওরে মরণটাকে দেখ'বি চল্।
পড়ে আছে অসীম পাথার,
সবাই তাতে দিচ্ছে সীতার;
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে, সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গঞ্জ'টেউ সে, দৃঢ়মাত্র নয়ক স্থির;
নীচে পড়ে আছে অগাধ স্তম্ভ শান্ত সিম্বদুর্নী;
এতদিন ত টেউয়ে ভেসে, দিলি সীতার উপর দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখ'ব, নীচে কতখানি গভীর জল।

গুল। ঠিক বলেছে “ডুব দিয়ে আজ দেখ'বো নীচে কতখানি গভীর জল।” ব্যস্ তাই হোক। কিসের ভয়? সেই ভালো। আজ আত্মহত্যা কর'ব।

এই সময়ে কামবর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—“মা আমি বিদায় নিতে এসেছি।—এখনি বিজাপুরে যাচ্ছি। পিতার আদেশ।”

গুল। হাঁ শুনি'ছি তোমার পিতার আদেশ। আমি বাধা দিবার কে? যাও।

কামবন্ধ গুলনেয়ারের চরণ স্পর্শ করিলেন। গুল-
নেয়ার শূন্য ঈষৎ মস্তক হেঁট করিলেন। পরে
কহিলেন—

“কামবন্ধ এই আমাদের শেষ দেখা পুত্র।”
কাম। কেন মা?

গুল। কেন? কারণ আমি মর্ষ্ব—আমি
মর্ষ্ব—আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

কাম। সে কি মা! জানি মা তোমার মন
উত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু—

গুল। মর্ষ্ব কেন? জাস্তে চাও? তবে শুন!
যতদিন আমি সম্রাজ্ঞী হয়ে ছিলাম—ততদিন
বেঁচেছিলাম। যতদিন শাসন করে’ এসেছিলাম
—বেঁচেছিলাম। যতদিন মাথা উঁচু করে গর্ষ্ব
থাকতে পেরেছিলাম;—বেঁচেছিলাম। আজ
সম্রাটের তাচ্ছল্য নিয়ে, ভৃত্যের ধিক্কার নিয়ে,
পুত্র প্রপৌত্রের করুণা নিয়ে, মাটীতে মূখ
নর্দকিয়ে গুলনেয়ার থাকতে চায় না।

কাম। আবার সেদিন আসবে। মা, পিতার,
মার্জনা ভিক্ষা কর।

গুল। কি কামবন্ধ? মার্জনা! আমি
মার্জনা ভিক্ষা কর্ব্ব?—আমার পুত্র না তুমি?
—কামবন্ধ, সূর্য্য যে গরিমায় ওঠে সেই গরি-
মায় অস্ত যায়!—যাও! কিন্তু ফিরে এসে
তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।

কাম। মা—

গুল। চূপ! কোন কথা নয়। আমি স্থির-
প্রতিজ্ঞ! জেনো ধুব জেনো, এই আমাদের
ইহজগতে শেষ দেখা—যাও—

[কামবন্ধ ধীরে অবনত মুখে চলিয়া গেলেন।

গুল। সূর্য্য অস্ত যাবার অধিক বিলম্ব
নাই! বাঁদী!—না কেউ নাই। একটা দাসীও
আজ আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করে’ থাকে না।
স্বেচ্ছায় চলে’ যায়। গিয়েছে—আমার গরিমা
বৈভব সব গিয়েছে। আমিও যাই।

এই বলিয়া গুলনেয়ার সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইলেন। ক্ষণপরে ঔরঞ্জীব জনৈক পরিচারিকার
সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

ঔরং। কৈ সম্রাজ্ঞী?—

বাঁদী। জানি না। এখানেই ত ছিলেন।
বোধহয় ভিতরে গিয়েছেন।

ঔরং। খবর দাও।

[বাঁদী চলিয়া গেল।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তোমার কাছে
বাহুবলে পরাজিত হয়েছিলাম, কিন্তু তার
চেয়ে এই পরাজয় অধিক। তুমি গুলনেয়ারের
মত নারীকে মূঠোর মধ্যে পেয়ে ফিরিয়ে
দিয়েছো, গুলনেয়ারের মত সম্রাজ্ঞীর প্রেম
প্রত্যাখ্যান করেছ।—তুমি মহৎ! দিলীর খাঁর
অনুরোধে, আর তোমার সম্মানে, আজ গুল-
নেয়ারকে ক্ষমা কর্ব্ব—মক্কা যাবার আগে এক
উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল নারীর প্রতি আর ক্রোধ রাখি
কেন?

গুলনেয়ার অধিকতর সঙ্জিতভাবে প্রবেশ
করিলেন

গুল। কে?—কে, সম্রাট?—এত অনুগ্রহ
যে!—

ঔরংজীব। সম্রাজ্ঞী!—

গুল। চূপ! আর আমি সম্রাজ্ঞী নই।
যতদিন তোমায় শাসন করেছিলাম, ততদিন
আমি সম্রাজ্ঞী ছিলাম। আজ আর আমি
সম্রাজ্ঞী নই। আমি শূন্য গুলনেয়ার।—কি
বলবে বল।

ঔরংজীব স্বগত কহিলেন—সেই গুল-
নেয়ার আর এই গুলনেয়ার!

গুল। বল! অধিক সময় নাই! আমি
মর্ত্যে যাচ্ছি। আমি বিষ পান করিছি।

ঔরংজীব। বিষপান করেছো গুলনেয়ার?
কেন?

গুল। কেন? জিজ্ঞাসা করছ? স্থাবির
শীর্ণ ঔরংজীব! তোমার তাচ্ছল্য নিয়ে আমি
জীবন ধারণ কর্ব্ব মনে করেছিলাম। তোমার
কৃপা ভিক্ষা করে’ বেঁচে থাকবো ভেবেছিলাম?
—ঐ সূর্য্যের পানে তাকাও, তার পরে আমার
পানে চাও—বল দেখি, দেখে বোধ হয় না কি
যে আমরা দুই ভাই বোন! সম্রাজ্ঞী হয়ে
দিগন্তরেখায় উঠেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্ত
রেখায় অস্ত যাচ্ছি!

ঔরংজীব। গুলনেয়ার, আমি এসেছি
আজ তোমায় ক্ষমা কর্তে।

গুল। ক্ষমা!

ঔরংজীব। তোমায় আর ভালোবাসতে
পারি না গুলনেয়ার! আমার সে শক্তি নাই।
কিন্তু তোমায় ক্ষমা কর্তে পারি।

গুল। [ব্যঙ্গস্বরে] কি মহৎ তুমি!—কিন্তু

সম্মাট্! গুলনেয়ার কখনো কাউকে ক্ষমা করেনি; সে কারো ক্ষমা চাহেও না।

ঔরঞ্জীব। সে কথা সত্য গুলনেয়ার, তুমি কাহারে কখন ক্ষমা করনি।

গুল। না, দুর্গাদাসকেও না। আমি নরকে নেমে যাচ্ছি—সঙ্গে হৃদয়পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছি—তার প্রতি তীর অসীম বিরাট ভালবাসা। যদি তাকে পেতাম, আমি তাকে একখণ্ড মেঘের মত, আমার সেই ভালবাসার ঝঞ্জা দিয়ে ঘিরে, টেনে, সঙ্গে করে' নিয়ে যেতাম; তাকে সেই ঈশ্বর জ্বালায় তিলে তিলে তুষানলের মত দগ্ধ কর্তাম। ঔরঞ্জীব! বিশ্বসংসারে বৃষ্টি কেহ কেহ আছে, যার ভালবাসা প্রতিহিংসার মত প্রবল, উন্মাদ, জ্বালায়। জেনো আমি সে নারী।—আমার মাথা ঘুচ্ছে, আর পাচ্ছি না। আমি মর্চ্ছি। কোন দুঃখ নাই আমার ঔরঞ্জীব! পিঁড়ি বলে' কোন দুঃখ নাই।—উঠিছিলাম—পড়েছি। যারা মাটী কামড়ে পড়ে থাকে, তারা পড়ে না। কোন দুঃখ নাই। যদি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, পুরুষকে রেখেছিলাম মূঠোর মধ্যে। যদি সম্রাজ্ঞী হয়েছিলাম—সাম্রাজ্য শাসন করেছিলাম! যদি ভালবেসেছিলাম—ভালবাসা দান করেছিলাম, ভিক্ষা করিনি।—কোন দুঃখ নাই। একদিন মর্ন্তে হবেই। তবে দিন থাকতে মরারি ভালো?—ঐ সূর্য্য অস্ত গেল—আমিও যাই।

—বলিয়া ভূপতিত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদের যমুনাগ্ন অলিন্দ।
কাল—সন্ধ্যা।

দিলীর খাঁ এবং একজন কর্মচারী কথা
কহিতেছিলেন

কর্মচারী। সম্মাটের মৃত্যু হয়েছে?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! বড় শোচনীয় মৃত্যু সে। তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর একজন পুত্র ছিল না—তাঁর বেগম ছিল না।—একা আমি! বড় শোচনীয় মৃত্যু।

কর্মচারী। তাঁর মরায় যাবার কথা ছিল না?

দিলীর। হাঁ! কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই।

ঔরঞ্জীবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সে দৃশ্য আমি ভুলবো না। অন্তত হৃদয়ের অর্ধ সন্ত অবস্থায় সেই মর্মভেদী ক্রন্দন—ক্ষমা কর মরাঠা, ক্ষমা কর রাজপুত, ক্ষমা কর পাঠান। তার পরে মর্ষার পূর্ষ মর্হুস্তেই সেই ভয়বিহ্বল ভগ্ন উক্তি—ঐ সম্মুখে মৃত্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র! তাতে তরী ভাসিয়ে দিলাম।—শেষে 'হো আল্লা' বলে সেই মর্মভেদী চীৎকার—সে দৃশ্য ভুলবো না।

কর্মচারী। বড় শোচনীয়।—এখন সম্মাট কে হন বলা যায় না।

দিলীর। যুদ্ধ বেধেছে, মৌজাম আর আজীমে!—ফল জগদীশ্বর জানেন।

কর্মচারী। আপনি সাহাজাদী রাজিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! সাহাজাদীর আজ পিতা নাই, মাতা নাই—কেহ নাই। তাঁর মত দুঃখিনী কে?—এখানে তাঁকে এক বৃন্দা পরিচারিকার কাছে রেখে যেতে হচ্ছে।

কর্মচারী। আপনি কোথায় যাবেন?

দিলীর। আমি যাবো একবার দুর্গাদাসের উদ্দেশ্যে।

কর্মচারী। কেন?

দিলীর। প্রয়োজন আছে। এখন চল বাহিরে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

উদ্ভ্রান্তভাবে ধীরে ধীরে সেখানে রাজিয়া
প্রবেশ করিলেন

রাজিয়া। আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। তাতে কি অন্যায় হয়েছিল? কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করলে? কেন করলে?—এত দুঃখ তাদের সৈল না!

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া ডাকিল—“ওগো সাহাজাদি”—

রাজিয়া। সে দিন আমাদের সেই আব্দুগিরি দুর্গে শূদ্র জ্যোৎস্নালোকে পর্বতপাদ-মূলে দেখা হোল—কেন আমাদের দেখা হোল অজিত!

পরি। ঐ সেই আবার বিড়ির বিড়ির করে বক্ছে। বলি ও সাহাজাদি।

রাজিয়া। অজিত! অজিত! তার নামটিও মিস্ট! অজিত।

পরি। না ও এখন উত্তর দেবে না। আমি এখন যাই। সাহাজাদীদের রকমই আলাদা।”

[—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজিয়া। সন্ধ্যার বাতাস বইছে! কোকিল ডাকছে। নীল-সলিলা যমুনা নদী প্রাসাদমূল বেণ্টন ক'রে ব'হে যাচ্ছে। আকাশ কি নিম্মল—কি নীল!

গীত

তবে আর কেন বহে মলয় পবন
আর কেন পাখী গায় গান?
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখ মধুমাংস
হয়ে গেছে যবে অবসান।
আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত,
ছিল ছেয়ে আকাশ ভুবন—
আমার, নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি,
হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।
[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—পেশোলা হৃদতীরে প্রাসাদ।
কাল—মধ্যাহ্ন।

দুর্গাদাস একাকী দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য
দেখিতোছিলেন

দুর্গা। ব্যর্থ হয়েছি। পাল্ল্যাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নিজীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বোড়িয়ে দেখেছি যে, পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন! বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বোড়িয়ে গিইছি, দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে! সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদা-হত স্থাবির কুকুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্ন্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না।

জয়সিংহ ও সরস্বতী আসিয়া পদবন্দনা করিলেন

সরস্বতী। ভিতরে আসুন দেব! জল গ্রহণ করুন। স্নিপ্রহর অতীত হয়েছে।

দুর্গা। যাচ্ছি। চল মা!

জয়। এখানে আপনার কোন কণ্ট হচ্ছে না?

দুর্গা। কণ্ট?—রাগার আতিথেয় আমি পরমসুখে আছি।

জয়। আমার আতিথেয় বলবেন না। সরস্বতীর আতিথেয়। সরস্বতীই এস্থান পছন্দ করে' দিয়েছে! সরস্বতীই এ স্ফটিক হর্ম্য তৈরী করিয়েছে। যে দিন আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এক নিজ্জন স্থানে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই দিন সে নিজে এখানে এসে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে। এখানে সে প্রতিদিন আপনার জন্য নিজে পাক করে।

দুর্গা। অসীম অনুগ্রহ মহারাণীর!

সর। অনুগ্রহ? অনুগ্রহ বলবেন না। দেব!—এ দীনের অর্ঘ্য! ভক্তের নৈবেদ্য! রাজ-স্থানে কে আছে, রাঠোর দুর্গাদাসের নামে যার বন্ধ স্ফীত না হয়: শির গর্বে উন্নত না হয়? যদি একান্ত ভাগ্যবলে, পূর্বজন্মের পুণ্য ফলে, এই দেবতাকে অতিথি স্বরূপে পেয়েছি, পূজা করে' সাধ মেটাবো!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। মহারাজ! স্বেরে মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ রাঠোর সেনাপতির সাক্ষাৎ চান।

দুর্গা। দিলীর খাঁ! সে কি! দিলীর খাঁ?

দৌবারিক। হাঁ, সেই নামই ত বল্লেন।

দুর্গা। যাও পরম সমাদরে নিয়ে এসো! [সরস্বতীকে কহিলেন]—যাও মা ভিতরে যাও! আমরাও আসছি এখনি।

[মহারাণী সরস্বতী
অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গা। দিলীর খাঁ এখানে? অর্থ কি?

জয়। বদ্বতে পাচ্ছি না।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন

দিলীর। বন্দেগী বীর দুর্গাদাস!—
আমায় মনে পড়ে?

দুর্গা। আমার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব কিরূপে? আসুন, আমার আজ পরম

সৌভাগ্য! কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে সেনা-পতি?

দিলীর। তীর্থদর্শনে। দুর্গাদাস! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিম্ভার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? সেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে?—আমিও মন্দির আগে তোমায় একবার দেখতে এসেছি।

দুর্গাদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন পরে কহিলেন—দিলীর খাঁ—আমি সামান্য মানুষ; সাধ্যমত নিজের কর্তব্য করে' এসেছি মাত্র।

দিলীর। এ পাপযুগে তাই কয়জন করে দুর্গাদাস?—যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে' আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিত্যক্ত, যে যুগে তোষা-মোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে, সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শূন্য হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ের সর্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা করবার জন্য দেশ ছাড়ে, মসরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের বুক আর্গিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম-রক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়—সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। পুরাণে কেন দিলীর খাঁ! তার চেয়ে উচ্চ চরিত্র দেখতে চাও যদি—নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর।

দিলীর। আমার!

দুর্গাদাস। হাঁ দিলীর খাঁ, তোমার। আরও দেখতে পেতে দিলীর—যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো। তোমারই জাতভাই কাশিম—

কাশিমের প্রবেশ

কাশিম। কৈ মহারাজ কৈ—এই যে! [আভূমি প্রণত অভিবাদন করিল।]

দুর্গাদাস। এ কাশিম যে! কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে খুঁজে এলে কেমন করে'?

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম মহারাজ! কত জায়গায় তল্লাস করেছি—তার আর কি বলবো মহারাজ!

দুর্গাদাস। তুমি মহারাজ কাকে বলছ কাশিম?

কাশিম। যাকে চিরকাল বলে' আসছি মহারাজ।

দুর্গাদাস। না কাশিম! তোমার আর আমার মহারাজ এখন যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহ।

কাশিম। তার নাম কর্ষন না মহারাজ! সে নেমকহারাম—

দুর্গাদাস। কাশিম তুমি কার কাছে এ কথা বলছো মনে রেখো।

কাশিম। জানি! মোর দ্যাবতার কাছে কথা বলছি। তবু বেহক কথা চূপ করে শুনো যাকি পারবে না। যাকে আপনি বৃকের মন্দির করে' মানুষ কল্পে, যার কামে বেবাক জানটা দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের মত দেখতো, সেই তাকে যে বৃড়াবয়সে—মাফ কর্বন মহারাজা—গলা ধরে' আসছে—আর বলতে পারবে না।

জয়সিংহ। কাশিম! ইসলাম ধর্ম ত তোমার মত মানুষও তৈর করে'?

দুর্গাদাস। সব ধর্মই এক কথা এক মহা-নীতি শিক্ষা দেয় মহারাজ! তবু যদি কেউ মানুষ না হয়ে পিশাচ হয়, সে ধর্মের দোষ নয়! মুসলমান ধর্ম কাব্লেস খাঁও আছে, দিলীর খাঁও আছে।

দিলীর। আর হিন্দুধর্ম শ্যামসিংহও তৈরী হয়, দুর্গাদাসও তৈরী হয়।

কাশিম। তবে হুজুর মোর যে এক আর্জি আছে।

দুর্গাদাস। কি কাশিম?

কাশিম। শুনোছি যে হুজুর আজ রাণার রুটি খায়ে মানুষ! তা ত হতি পারে না।

দুর্গাদাস। কি হতে পারে না?

কাশিম। মোর জান থাকতে মহারাজ ত আর একজনের দরোজায় যাবে না। তা ত মই জান থাকতি দ্যাখবো না।

জয়। সে কি! তুমি কি কর্তে চাও কাশিম?

কাশিম। কি কর্তে চাই? শোন রাণা, মই মহারাজকে খাওয়াবো।

জয়। কেমন করে?

কাশিম। যেমন করে পারি। মজুর খেটে খাওয়াবো!—ভিক্ষা মেগে খাওয়াবো।

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছেো কাশিম!
তুমি পাবে কোথা থেকে!

কাশিম। যেখান থেকে পাই! যদি আজ
রাণী বেঁচে থাকতো, দুর্গাদাসকে পরের
দুয়োরে ভিখরী হত হোত না।
তিনি নেই, কিন্তু মূই আছি! মূই
খেটে খাওয়াবো—খুঁদকুঁড়ো যা পাই
খাওয়াবো—

জয়। তা কি হয়!

কাশিম। হয় না?—দেখ মহারাজ দুর্গা-
দাস! তোমার যেমন মনে লয় করো। বেছে
লাও মহারাজ!—রাণার ফেলে-দাওয়া রাজ-
ভোগ খাবা? কি মোর পুজোয় দেওয়া খুঁদ-
কুঁড়ো খাবা? বেছে লাও,—রাণার পায়ের
তলায় থাকবা? না মোর মাথায় থাকবা?—
যেটা লেবা; বেছে লাও!

এই বলিয়া কাশিম নিজবন্ধোপরি বাহুদুগল
সম্বন্ধ করিয়া সান্ভিমান গর্বে দুর্গাদাসের দিকে
চাহিল।

দুর্গা। ঠিক বলেছো কাশিম! দুর্গাদাস
তোমার দেওয়া খুঁদকুঁড়োই খাবে।—[এই
বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গন
করিয়া কহিলেন—] ভাই কাশিম! আজ হতে
আমরা দুই ভাই—[পরে দিলীরকে কহিলেন]
—দেখ দিলীর খাঁ, কি উচ্চ!

দিলীর। সত্য কথা বলেছিলে দুর্গাদাস!
—দাঁড়াও তোমরা দুইজনেই আজ আমার
সম্মুখে দাঁড়াও: একবার নয়নভরে দেখি—
ঈশ্বর!—তোমার স্বর্গে যারা দেবতা আছেন
শুনি, তাঁরা কি এঁদের চেয়েও বড়?

যবানিকা পতন

সাজাহান

পুরুষ-চরিত্র

সাজাহান (ভারতবর্ষের সম্রাট)। দারা, সুজা, ঔরঞ্জীব, মোরাদ (সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়)। সোলেমান, সিপার (দারার পুত্রস্বর)। মহম্মদ সুলতান (ঔরঞ্জীবের পুত্র)। জয়সিংহ (জয়পুরপতি)। যশোবন্ত সিংহ (যোধপুরপতি)। দিলদার (ছদ্মবেশী জ্ঞানী—দানেশমন্দ)

স্ত্রী-চরিত্র

জাহানারা (সাজাহানের কন্যা)। নাদিরা (দারার স্ত্রী)। পিয়ারা (সুজার স্ত্রী)। জহরং উমিসা (দারার কন্যা)। মহামারা (যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ।
কাল—অপরাহ্ন।

সাজাহান শয্যার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণ-মূল করতলে ম্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতে-
ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা
টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান। তাই ত! এ বড়—দঃসংবাদ
দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে
বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি;
কিন্তু মোরাদ, গুর্জরে সম্রাট নাম নিয়ে
বসেছে, আর দারাক্ষণ্য থেকে ঔরঞ্জীব তার
সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরঞ্জীব তার সঙ্গে যোগ
দিয়েছে—দেখ, ভেবে দেখ—এ রকম কখনও
ভাবিনি, অভ্যস্ত নই; তাই ঠিক ধারণা কর্তে
পারিছ না—তাই ত! [ধূমপান]

দারা। আমি কিছুর বুদ্ধিতে পারিছ না।

সাজাহান। আমিও পারিছ না। [ধূমপান]

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র
সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করবার জন্য
লিখিছ, আর তার সঙ্গে বিকানীর মহারাজ
জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে
পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি
মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! [ধূমপান]
দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না।
এ বিদ্রোহ দমন কর্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাবিছ না
দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে বৃদ্ধ—তাই
ভাবিছ। [ধূমপান; পরে সহসা] না—দারা,
কাজ নেই। আমি তাদের বুদ্ধিতে বলবো।
কাজ নেই। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে
আসতে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখন না। এ হাতে পারে না
পিতা। প্রজা রাজার উপর খজা তুলেছে, সে
খজা তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তার
আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি ষার আসে।
পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী?
পুত্রকে পিতার শাসনও কর্তে হবে!

সাজাহান। আমার হৃদয় শুধু এক শাসন
জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন! বেচারী মাতৃ-
হারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন
করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে
দেখ—ঐ স্ফটিক গঠিত [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঐ
তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ—তার পর
বলিস্ তাদের শাসন কর্তে।

জাহানারা। পিতা, এই কি আপনার উপ-
যুক্ত কথা! এই দৌর্ভাগ্য কি ভারতসম্রাট
সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর!
একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকান্ড শাসনের ভার
আপনার উপর। প্রজা বিদ্রোহী হলে সম্রাট

কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর্বেন? স্নেহ কি কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা। আমার কোন যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমার তোমার ম্লান-মুখখানি দেখতে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান-মুখ কল্পনা কর্তে হবে। কাজ নেই দারা। তা'রা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বদ্বিয়ে বলবো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম করে তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ করবে! পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উন্মত্ত সূজা, স্বকল্পিত সম্রাট মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীব বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ করবে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হ'য়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে?—উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হ'তে পারে? আমার আজ্ঞা দিন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বৃকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লোহ দিয়ে গড়নি!—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে, আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়! আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্তে, দক্ষুতকে শাসন কর্তে, এই দেশের কোর্টী কোর্টী নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে! যদি রাজ্যে এই দৃশ্যপ্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয় দিন?

দারা। পিতা আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ কর্ব না, তা'দের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা

তখন তা'দের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্বেন! তা'রা জানুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্বল নয়।

সাজাহান। [উঠিয়া] তবে তাই হোক! তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তি বিধান কর। [পাঞ্জা প্রদান]

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তা'দের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!

[প্রস্থান।

জাহানারা। তা'দের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছ, অনুমান করেছো দারা?

দারা। তা'রা বলে যে পিতা রুগ্ন এ কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হয়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভাবী সম্রাট।

দারা। তা'রা আমাকে সম্রাট বলে' মানতে চায় না।

সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মানতে চায় না বাবা?

জাহানারা। দেখ ত আম্পর্ধা! [হাস্য]

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে? তুমি যেন কিছ, বলবে!

নাদিরা। শুনবে প্রভু? আমার একটা অনুরোধ রাখবে!

দারা। তোমার কোন অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বলতে সাহস করছি। আমি বলি—তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা!

নাদিরা। দিদি—

দারা। কি! বলতে বলতে চূপ করলে যে! কেন তুমি এ অনুরোধ করছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দৃশ্য দেখেছি।

দারা। কি দৃশ্য?

নাদিরা। আমি এখন তা বলতে পারব না। সে বড় ভয়ানক। না নাথ। এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কা-কুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি, যদি জানতে যে সে কি দৃশ্য! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি! তুমি ভাবছো! এত তরল তুমি! এত স্নেহ! পিতার স্মৃতি পেয়ে এখন স্ত্রীর স্মৃতি নিতে হবে না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্তব্য স্মৃতি! আর ভাববার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য, আমি যাই। যথেষ্ট আশ্রয় দেই গে যাই।

[প্রস্থান।

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার।

[সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান।

জাহানারা। এত ভয়ানক! কি কারণ বদ্বি না।

সাজাহানের পুনঃপ্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। [কর্ণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া]

জাহানারা—

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃস্বন্দেহ?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন জাহানারা। এ বড় নিষ্ঠুর কাজ! কি কর্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে বাস্ নে। তোর কাজ—স্নেহ—ভক্তি—অনু-কম্পা। এ আকর্ষণের তুইও নামিস্ নে। তুইও অন্তঃত পবিত্র থাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্মদাতীরে মোরাদের শিবির।

কাল—রাতি।

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মৃত্যু মোরাদের বিদ্রোহ। আমি হাস্য পরিহাস কর্তে যাই, সে ব্যঙ্গের ধুম হ'য়ে ওঠে! মৃত্যু তা বদ্বিতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোদ্ভাস, আর একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিস্কৃত দেশ—এই যে বর্ষের এখানে আসছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, সফর্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বসছি!—কি ভাবছো দিলদার? ঘাড় নাড়ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি? শুন।

দিলদার। আমি শুনছি যে, হিংস্র জন্তু-দের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দুরকমই চাই ত! খুব বদ্বি!

মোরাদ। খুব বদ্বি! হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বদ্বি, তার কাছে ঈশ্বরের বদ্বি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দরাময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য? চর্বার কর্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্বার জন্য নয়;

কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ষণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বলতে হবে।

মোরাদ। তা বলতে হবে বৈ কি—

দিলদার। শব্দ হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়ে-ছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্বার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে' ফেলে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেলবার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শব্দবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘূমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আচ্ছ, জাঁহাপনার শব্দ যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দপদরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাকবে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত—ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা, দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী করতে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেলে যে, কান টানলে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আচ্ছা।

দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরঞ্জীবের প্রবেশ

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় 'আলিঙ্গন করি। তোমার বৃদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। [আলিঙ্গন]

ঔরঞ্জীব। আমার বৃদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্য্যবলে? কি অশুভ শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বলতেন মনে আছে যে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবন ধারণ করার যোগ্য নয়। সে যা হোক, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মস্তবলে বশ করলে! তারা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত্র সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়াল! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরঞ্জীব। যুদ্ধের পূর্বা দিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তারা মোগলদের বৃদ্ধিয়ে গেল যে, কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার যুদ্ধ করা বড় হয় কাজ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ। তারা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরঞ্জীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্য-শিবির প্রদক্ষিণ করছেন। আমরা আক্রমণ করব?

ঔরঞ্জীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরঞ্জীব। রাজপুত্র দর্প! এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্মদা-তীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমার আক্রমণ করতেন ত আমার পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথপ্রান্ত ছিল;

কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ করব না?

ঔরঞ্জীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্য-শিবির প্রদক্ষিণ করে' যদি মহারাজের কিছু সান্দ্রনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না। যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সূজার সৈন্য শিবির। কাল—রাতি।
সূজা ও পিয়ারা

সূজা। শুনছেন পিয়ারা, দারার পুত্র—বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হলে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাভ এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে' চেয়ে রয়েছে কি! লোক পাঠাও।

সূজা। লাভ কি! যুদ্ধ—তা'র সঙ্গে—

পিয়ারা। তা'র সঙ্গে যদি বেলের মোরঝা থাকে ত আরও ভালো। তাতেও আমার অর্দাচি নাই; কিন্তু দিল্লীর লাভ শুনতে পাই, যো খায়া উয়োবি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পাস্তায়া। দু'রকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

সূজা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকিটুকু বলবার ফুর্সৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি! তুমি তো কেবল যুদ্ধ করবে।

সূজা। আর যা কিছু বলতে হবে, তা বলবে বদ্বি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি। আমরা যেমন গুঁড়িয়ে বলতে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বলতে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

সূজা। যে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্থে'ক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অর্থ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অন্তত কুঞ্জো হয়ে চলতে হবেই।

সূজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বদ্ববার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা বদ্বিমান স্বীজাতিকে এমন নিষেধ পদব্জাতির হাতে স'পে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ার চড়িয়ে দিতে, তা হলে বোধ হয় তা'রা সুখে থাকতো!

সূজা। যাক্—তুমি বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শ'ড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছন-কার পারে, বাগালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সূজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উ'হঃ—অপাঙ্গ প্রথম কিছু কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

সূজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে বসে থাকে।

সূজা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট্ করে' বল। আর দেয়ী কোরো না।

সূজা। তবে শোন—

পিয়ারা। বল; কিন্তু সংক্ষেপে! মনে থাকে যেন—এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পত্র সোলেমান। আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দাও!

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষীই করবে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ, তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই ত তাকে একটু—হ্যাঁ—তরল করে' নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন! বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, সম্রাট সাজাহান মরেন নি। এমন কি তিনি সম্রাটের দস্তখত পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে' ফেল আর আমার ধৈর্য থাকছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হলে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত করবেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত করবেন! এই ত। যাক্! তার পরে আর কিছ্ ত বলবার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাবি। পিতার প্রভু আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু দারার প্রভু আমি কোন মতেই মানবো না।

পিয়ারা। তুমি আমার গাইতে দেবে না। নিজেরই বকে' যাক্, আমি গাইব না!

সুজা। না, গাও! আমি চুপ করলাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছে।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষার প্রেম, ভাবে প্রেম, ভাষায় প্রেম, মর্ছনার প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনিনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না

পিয়ারা—যেন বারিবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চলাম।

সুজা। না, ও কিছ্ নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'।

কুদ্র এ হৃদয় হার ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।

তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে,

যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রাইয়াছে।

এ কুদ্র জীবন মোর এ কুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।

যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।

হৃদক অসীম স্থান হৃদক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;

তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালোবাসা
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুবৃষ্টি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভাঙ্গমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বৃষ্টিয়ে দেয়, এ সুবৃষ্টির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝংকার। নৈলে এত মধুর হয়!

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা। [চমকিয়া] ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাতে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তাই ত! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝংকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেল-বিস্ফ হ'য়ে একটা মহা কোলাহলে আন্তর্নাদ করে' উঠলো।—এ সব কি!

বেগে সুজার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ!—
আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন
ভয় নাই পিয়ারা—

[প্রস্থান।

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়তে চলল।
উঃ এ কি—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে
প্রবেশ

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাৎ-
বন কর দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ
করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাতেই নদী পার হয়ে
শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কৰ্ম্ম যে, তারা কিন্তু তা
ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয় লাভ কৰ্ম্ম কখন
মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একে-
বারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্ধেক
সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তাঁদের সম্পূর্ণ
যুদ্ধ ভাগে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত
যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা
জ্ঞানেন না?

জয়সিংহ। আমি সন্ধ্যার পক্ষ হতে তাঁর
সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গ-
দেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন
কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্তে আজ্ঞা
দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। সাহাজাদা! সুলতান সুজা
সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সন্ধিত
নৌকার।

সোলেমান। পশ্চাৎবন কর—যাও সৈন্য-
দের আজ্ঞা দাও।

[দিলীর খাঁর প্রস্থান।

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি
করেছিলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সন্ধ্যার আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা
কিছু লেখেন নি? তা আপনিও আমার বলেন
নি!

জয়সিংহ। সন্ধ্যার নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা!—
যান।

[জয়সিংহের প্রস্থান।

সোলেমান। সন্ধ্যার এক আজ্ঞা আর
আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?
—যদি তাই হয়! মহারাজকে হয় ত অন্যর
ভঙ্গনা করেছি। যদি সন্ধ্যার এরূপই আজ্ঞা
হয়!—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে “সুজাকে
সপরিবারে বন্দী করে’ নিয়ে আসবে পুত্র।”
না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তাঁর
আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত।

মহামারা ও চারণীগণ

মহামারা। গাও আবার চারণীগণ!

যেথা গিয়াছেন তিনি সমরে,
আনিতে জয়গোরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহবানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে;

মিথিতে অমর মরণসিদ্ধ আজি গিয়াছেন তিনি।
সখবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির;
উঠ বীরজারা, বাঁধো কুন্তল, মূছ এ অপ্রদনার।

সেথা গিয়াছেন তিনি
করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা বস্মে বস্মে কোলাকুলি হয়;
খলে খলে ভীম পরিচর,

দ্রুতটির সহ গজ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সখবা অথবা—ইত্যাদি।

সেথা নাহি অনুন্নর নাহি পলারন—

সে ভীম সমর মাঝে;

সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,

মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে

গভীর আন্তর্নাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

সখবা অথবা—ইত্যাদি।

যেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা;
যেথা হয় ত ফিরিতে জিনিয়া সমর;
হয় ত মরিয়া হইতে অমর;
সে মরিয়া জোড়ে ধরিয়া হাসিয়া
তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী!
মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক!
প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।
মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে
এসেছেন?
প্রহরী। না মহারাণী! তিনি এ যুদ্ধে
পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।
মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে-
ছেন? কি বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত
হ'য়ে ফিরে এসেছেন?
প্রহরী। মহারাজ।
মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ
পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি
শব্দ! ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার
স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন!
কর্তব্য শৌর্ষ্যের কি এতদূর অধোগতি
হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত
হ'য়ে ফিরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্র-
চূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে; হ'তে পারে।
তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে
মরে' পড়ে' আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি।
যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়।
সে তাঁর আকারধারী ফোন ছদ্মবেশী। তাকে
প্রবেশ কর্তে দিও না! দুর্গস্বার রুদ্ধ কর।—
গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

যেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে
সব জ্বালা, ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিভ্রম্য প্রান্তর। কাল—রাতি।

ঔরঞ্জীব একাকী।

ঔরঞ্জীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে।

একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—
ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত
যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার
হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!
মোরাদ। দারার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়-
সোয়ার আর এক শত কামান।
ঔরঞ্জীব। তবে সংবাদ ঠিক!
মোরাদ। ঠিক: প্রত্যেক চরের ঐ একই-
রূপ অনুমান।
ঔরঞ্জীব। [পাদচারণা করিতে করিতে]
এষে—না—তাই ত!
মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে
সেনানিবেশ করেছেন।
ঔরঞ্জীব। ঐ পাহাড়?
মোরাদ। হাঁ দাদা!
ঔরঞ্জীব। তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী
—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরঞ্জীব। চূপ! কথা কোয়ো না! আমাকে
ভাবতে দাও! এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা
থেকে! আর এক শত কামান!—আচ্ছা তুমি
এখন যাও মোরাদ। আমরা ভাবতে দাও।

[মোরাদের প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। তাই ত! এখন পিছোলে
সর্বনাশ, আক্রমণ করলে ধ্বংস—এক শত
কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'।
হুঁ [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঔরঞ্জীব! এবার তোমার
উত্থান না পতন! পতন? অসম্ভব। উত্থান?
কিন্তু কি উপায়ে? কিছুর বন্ধতে পাচ্ছি না।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। তুমি আবার কেন?
মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েরস্তা
খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছেন।
ঔরঞ্জীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে
নিরে এসে। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মোরাদ। তাই ত! শায়েরস্তা খাঁ আমাদের
শিবিরে কি জন্য! দাদা ভিতরে ভিতরে কি

মতলব আঁটছেন বৃষ্টি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহস্তা হবে, দেখা যাক! [পরিক্রমণ]

ঔরঞ্জীবের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সৈন্যে রওনা হ'তে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি! এই রাত্রে!

ঔরঞ্জীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমন থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ করব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চলে যাবে! দারা সন্দেহ করবেন না। তাঁর আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে!

ঔরঞ্জীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির।

কাল—প্রাত্

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরঞ্জীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শূনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রায় কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশ লক্ষ মদ্রা।

জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি; কিন্তু তার পরেই শূন্য—বৃষ্টি সন্ধ্যা সাতাশটা অশ্ব বোঝাই করে' মদ্রা-মদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাক্তারি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী! কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরঞ্জীব ও মোরাদ বিজয়গর্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরঞ্জীব সন্ধ্যাট্।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরঞ্জীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরঞ্জীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বৃষ্টিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চূপ্! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দাগি সাহাজাদা! সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত পলায়িত!—এই সন্ধ্যাট্ সাজাহানের পত্র। [পত্র দিলেন]

জয়সিংহ। [পত্রপাঠপূর্বক] তাই তুমি কুমার!

সোলেমান। সন্ধ্যাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্তে লিখেছেন। আমি একগেই যাবো। তাঁর ডাক্তার আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনার কুমার আরও ঠিক খবরের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর কি হতে পারে? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট্ অথর্ষ! তাঁর আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না! কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরঞ্জীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্তে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।

সোলেমান। কি! ঔরঞ্জীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমেই দাঁড়ায় বটে!

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হলে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমর্চিত আজ্ঞায় কি করে কোনো কাজ করি! লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমর্চিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুদ্ধি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমানের প্রস্থান।]

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বল করে রেখেছি!

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কন্ঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

জয়সিংহ। চূপ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা এখনও ঔরঞ্জীবের পক্ষে একেবারে হেল্ছি না। একটু অপেক্ষা কর্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় একপাও নড়তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট্ আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কর্ছি দিলীর খাঁ। দারার পুত্র আমি করবোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরঞ্জীবের কতখানি শোঁর্ষ্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কন্ঠক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ!—দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্ৰীত হয়ে থাকবো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি—[জানু পারিতলেন]

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোরে যাচ্ছি। আর শপথ কর্ছি যে, যদি সাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা! আমি এই মুহুর্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান।]

জয়সিংহ। তাই ত! এক ফোঁটা চোখের

জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল
তুমি বুঝলে না। আমি কি কৰ্ব্ব; আমার
অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা
করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে
ঔরংজীবের অপেক্ষা করছি। সে আমার পুত্র,
আমার উদ্ভূত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার
গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা? এত শঠ, এত
মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তাঁর
শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ়
ভক্তি দেখালে; বলল যে, সে মহাপাপ করেছে;
আর সঙ্গে সঙ্গে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও
ফেলল; বলল যে দারার পক্ষে ক্ষমতামূল্য
ব্যক্তির নাম জানতে পারলে সে নিঃশঙ্কচিত্তে
পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ
নেবে। আমি সরলভাবে তাঁর সে কথায়
বিশ্বাস করে' তাকে অভাগা দারার হিতৈষী-
দের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পুত্র সে হস্ত-
গত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্তে
পারে না। না না না! আমি এ কথা বিশ্বাস
কৰ্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই
দুর্গে। আমি কোশলে তাকে আপনার চক্ষুর
সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা, সে আমার
পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই।
আসুক, সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব।
তাতেও যদি সে বশ না হয়—তা হলে তাঁর
কাছে, পিতা আমি—তাঁর সম্মুখে নতজানু
হয়ে আমাদের প্রার্থনিকা মেগে নেবো!
বলবো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের
বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালো-
বাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি
আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিকার অপমান
নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার
পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুন্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আস্‌বার
জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম—

মহম্মদ। কে বলল! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে'
আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেলেন।
আমি ত যতদূর জানি, তাঁর এখানে আস্‌বার
কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন
মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্তে।

সাজাহান। সে কি! না তুমি পরিহাস
করছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুন্দা, এ সত্য কথা!

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই
বন্দী কর্ব্ব।

বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পণ্ড প্রহরীর প্রবেশ

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিক-
গণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে
হ'লো।

বাঁশী বাজাইলেন। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে
ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের
দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্তে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব
দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে
যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ
স্বপ্নেও ভাবি নি—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুন্দা

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো,
যে আমি তোমার হস্তে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুন্দা। তবে
আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পারছি

নে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন?
আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি
আমার পোত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি
খুলে? একি! একদিনে কি সংসারের নিয়ম
সব উল্টে গেল! একদিন যার রোষ কষায়িত
চক্ষু দেখে ঔরঞ্জীব ভয়ে অর্ধেক মাটির
মধ্যে সের্ণিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের
হাতে—সে বন্দী! জাহানারা! কৈ! এই ষে!
একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়ছে, কথা বার
হচ্ছে না: চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির
শূন্য-দৃষ্টি নিগত হচ্ছে; গন্ডদুর্গট ছাইয়ের
মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জাশ্তে পারলে
কেমন করে! আমি শূদ্ধ তাই ভাবছি!

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই
শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম বসে
নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব! ভেবেছো এই
কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তা'কে পদাঘাত
করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু
আমি সাজাহান। এই, কে আছে! নিয়ে
এসো আমার বর্ম আর তরবারি।—কৈ,
কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুন্দা, আপনার দেহরক্ষীদের
দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায় এক্ষণে আমার
এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের
কাজ কর্ব।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ
মাত্র।

সাজাহান। ঔরঞ্জীব! না, আজ সে
কোথায়, আর আমি কোথায়! তবু যদি
জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার
আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্তাম,
তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়-
ধ্বনিতে ঔরঞ্জীব মাটিতে নুয়ে পড়তো!
একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই
না!—মহম্মদ! আমার একবার মৃত্ত করে'
দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুন্দা, আমার দোষ দেবেন
না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার
পিতা না? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন
অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার
আজ্ঞাবহ হবে!—মহম্মদ! এসো! দুর্গম্বার
খুলে দাও।

মহম্মদ। মাজ্জানা কর্বেন ঠাকুন্দা!
আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ,
আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ,
স্থবির। আর কিছু চাই না। শূদ্ধ একবার
মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার
ফিরে আসবো শপথ করছি। দেবে না—দেবে
না?

মহম্মদ। ক্ষমা কর্বেন ঠাকুন্দা—আমি
তা পার্বো না।

গমনোদ্যত

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! [কিঞ্চিৎ
চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও
শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া] দেখ মহম্মদ!
এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই
কোরাণ স্পর্শ করে' আমি শপথ করছি যে
বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই
মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো!
কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি
আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু
সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে,
এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার
তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে
পারে, তা হ'লে শূদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময়
দৃষ্টিতে শত ঔরঞ্জীব ভস্ম হ'য়ে পড়ে'
যাবে।—মহম্মদ! আমার মৃত্ত করে' দাও।
তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ
করিছি মহম্মদ! শপথ করছি! আমি শূদ্ধ
এই কপট ঔরঞ্জীবকে একবার দেখাবো।
মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুন্দা মাজ্জানা কর্বেন।

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়।
আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ
করে' শপথ করছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়।
শপথ করছি—দেখ, একদিকে তোমার পিতার

আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—
বেছে নাও এই মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আমি পিতার আজ্ঞার
অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে'
দেখ। ভাল করে' বিবেচনা কর—ভারতের
অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ
কথা শুনবো না। প্রলোভন বড়ই অধিক।
হৃদয় বড়ই দুর্বল। ঠাকুর্দা মার্জনা
কর্বেন।

[প্রস্থান।

সাজাহান। চলে' গেল! চলে গেল!
জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে!

জাহানারা। ঔরঞ্জীব! তোমার এই পুত্র!
যে তার পিতার আজ্ঞা পালন কর্তে একটা
সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার
পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাকে ছলে
বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!—পিতা
সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না;
বৃকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের
হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো
না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তারা সব
শিশু-শয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে
মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে
জোরে কষাঘাত কোরো। তাদের সারা-জীবনটা
চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ
হয় তারা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত
হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের
বৃকে ব্যথা লাগে ত বৃক ভেঙ্গ ফেলো, চোখে
জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো;
আন্তর্নাদ কর্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুটি
ধোরো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে
বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে
কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মত বসে দস্তে
দস্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে
না। পাপী মদমূর্খের মত অলিন্দে একবার
ঈশ্বরকে 'দরামর' বলে ডাকলে কিছু হবে

না! উঠুন, দলিত ভুজ্জের মত ফণা বিস্তার
করে' উঠুন; হতশাবক ব্যাল্লীর মত প্রমত্ত
বিক্রমে গর্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্রান্ত
জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত
কঠিন হোন; হিংসার মত অন্ধ হোন;
শয়তানের মত ক্রুর হোন। তবে তার সঙ্গে
পার্শ্বন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক!
আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির
মত জ্বলে' উঠি', তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়!
আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চূরে
দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত
তাকে এসে গ্রাস কর'। আমি যুদ্ধ নিয়ে
আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত; এক-
বার সাম্রাজ্য তোমপাড় করে' দিয়ে চলে যাই
—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে
না। খধুপের মত একটা বিরাট জ্বালায় উর্কের
উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছাড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরার ঔরঞ্জীবের শিবির। কাল—রাত্রি।
দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে
ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ! সুরার স্রোতে
ভাস্ছো। নর্তকীর হাব-ভাব তার উপরে
তুফান তুলে' দিয়েছে। তুমি ডুববে! আর
দেরী নাই। মোরাদ, তোমাকে দেখে আমার
মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! সাহাজাদীর
প্ররোচনার ঔরঞ্জীবকে ছলে বন্দী কর্তে
গিয়েছিলেন। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ!
—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই যে
জাহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দাদা এখনও নেওরাজ পড়ছেন
নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন! ইহ-
কালটা তাঁর ভোগে এলো না—কি ভাবছো
দিলদার?

দিলদার। ভাবছিলাম জাহাপনা, যে মাছ-
গুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাকতো
তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাকতো, তা হ'লে সে ত পাখীই হোত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবি নি। তাই গোলে পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কি মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদু'টো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় নাকি!

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাবতে সুরু করে তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশু'গুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তাদের মুখ যদি পিছন দিকে হোতো তা হ'লে ত সেইটেই সম্মুখ দিক হোত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তা হ'লে লেজই, কুকুরকে নাড়তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরঞ্জীবের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। এই যে এসেছো ভাই, তোমার বিদুষককে সঙ্গে করে এনেছো দেখছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বরস্যাও চাই, নর্তকীও চাই!

ঔরঞ্জীব। তা চাই বৈকি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নর্তকী এসে উপস্থিত হ'লো। আমার ত তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত মক্কা'র চলেছি। তবে ভাবলাম তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্তে পারবে!

আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোয়ার ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম!

প্রদান

মোরাদ। দেখি! [ঢালিয়া পান করিয়া] বাঃ! তোফা! বাঃ দিলদার কি ভাবছো! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবিছিলাম জাঁহাপনা, যে সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছন দিকে হাঁটে না বলে'?

দিলদার। না। কারণ তা'দের চোখ দু'টো সম্মুখ দিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তা'দের সম্মুখ দিকে হাঁটাও যা পিছন দিকে হাঁটাও তা—একই কথা!

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরি করে! [পান] তুমি একটু খাবে না?

ঔরঞ্জীব। না, জানোই ত আমি খাই না। কোরাণের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাতি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরাণের সব নিষেধ মানতে গেলে সংসার চলে না। [পান]

দিলদার। হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বৃদ্ধি থাকত, ত সে কি বৃদ্ধিমান জানোয়ারই হোত। তা হ'লে হাতীর উপর মাহুত না বসে, মাহুতের উপর হাতী বসতো! অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহখানাকে—মায় শাড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—ওঃ।

ঔরঞ্জীব। তোমার বিদুষকটি বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্তকীরা কৈ?

ঔরঞ্জীব। ঐ যে ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তা'দের ডেকে নিয়ে এসো না!

মোরাদ। একগই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্মুখে কিছতেই পিছপাও নয়।

[প্রস্থান।

দিলদার। “অন্ধ জাগো”—[বলিয়া তাঁহার
অনুগমন করিতে উদ্যত]

ঔরঞ্জীব তাহাকে বাধা দিলেন

ঔরঞ্জীব। দাঁড়াও কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা। আমি
সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরঞ্জীব। তুমি কে, ঠিক করে বল!
তুমি তো শূন্য বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো
গাটকাটা, ধাম্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা
হচ্ছে খোসামুদী, বাদরামি, জোচ্ছোরী,
পেজোমীর একটা ঘন্টা। আমি শামুকের চেয়ে
কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের
চেয়েও লম্পট!

ঔরঞ্জীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই!
তুমি কি কাজ কর্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্তে পারি না। হাই
তুলতে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পন্ড
কর্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুদ্ধিতে
পারি—আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরঞ্জীব। থাক — বঝেছি। তোমাকে
আমার দরকার হবে! কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

নস্টকীদের সহিত মোরাদের পুনঃ প্রবেশ

মোরাদ। বাহবা!—এ তোফা! চমৎকার!

ঔরঞ্জীব। তবে তুমি এখন ক্ষুণ্ণ কর।
আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর
কথাবার্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কি না? বলেছি
ত ও একটি রত্ন। তা বেশ ওঁকে নিয়ে যাও।
আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ
পেয়েছি।

[দিলদারের সহিত ঔরঞ্জীবের প্রস্থান।

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ গান।

আজি, আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমার করিতে সব দান!

আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বধু উপহার,
সুধার আধার ভারি, তোমার অধরে ধরি—

কর বধু কর তায় পান।

আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।

ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,

ভেসে আসে পাঁপিয়ার তান;

আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল;
সে মরণ স্বরণ সমান।

আজি তোমার চরণতলে লুটায় পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি
তোমার নিধান;

আজি সব ভাষা সব যাক্—নীরব হইয়া যাক্;
প্রাণে শূন্য মিশে থাক্—প্রাণ।

মোরাদ শূন্যতে শূন্যতে সুবাপান করিতে
লাগিলেন ও ক্রমে নির্দ্রিত হইলেন

নস্টকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরঞ্জীবের
প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাস-
ঘাতকতা?—[উঠিলেন]

ঔরঞ্জীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্তে
স্বিধা করো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল

ঔরঞ্জীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার
পুত্র সুলতান আর শায়স্তা খাঁর জিম্মায়
রাখবে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি
তোমায় একবার দেখবো।

ঔরঞ্জীব। নিয়ে যাও।

[সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। আমার হাত ধরে' কোথায়
নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই
নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে
বসালে! কেন—তুমিই জান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য উঠেছে। যেমন সেই
প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল রক্ত-

বর্ণ! আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি
ক্রীড়াময়ী কলস্বরী; যমুনার পরপারে বৃষ্ণ-
রাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পদ্মপোঙ্কদল; যেমন
আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই।
কেবল আমিই বদলিছি—[গাঢ়স্বরে] আমি
আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী—নারীর মত
অসহায়, শিশুর মত দুর্বল। মাঝে মাঝে
ক্রোধে গর্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের
মেঘের গর্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র।
আমার নির্বিষ আক্ষালনে আমি নিজেই ক্ষয়
হয়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট্ সাজাহানের
আজ—এ কি অবস্থা! [একটি স্তম্ভের উপর
বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া
রহিলেন]—ও কি শব্দ! ঐ! আবার! আবার!
—এই যে জাহানারা।

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ
আবার!—শুনছিস? [সৌৎসুক্যে] দারা কি
সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্বে আগ্রায় ফিরে
এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার
নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।—কি জাহানারা।
চোখ ঢাকছিস যে! বদলিছ মা—এ দারার
বিজয় ঘোষণা নয়—এ নতুন এক দঃসংবাদ!
তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। জানি, দর্ভাগ্য একা আসে
না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ
না করে' যাবে না। বল কি দঃসংবাদ কন্যা!
ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরঞ্জীব আজ সম্রাট্ হ'য়ে
দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই
উৎসবধর্নি।

সাজাহান। [যেন শূন্যে পান নাই এই
ভাবে] কি! ঔরঞ্জীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে
বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কি বলছে! আমি
জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরঞ্জীব
—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শূন্যে
ভুলেছো। এ কি হ'তে পারে। ঔরঞ্জীব—
ঔরঞ্জীব এ কাজ করতে পারে না। তার

পিতা এখনও জীবিত—একটা ত বিবেক
আছে, চন্দুলজা আছে!

জাহানারা। [কম্পিত স্বরে] যে ব্যক্তি
বৃষ্ণ পিতাকে ছলে বন্দী করে'—জীবন্তে এই
গোর দিতে পারে, সে আর কি না করতে পারে
বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য্য
কি! আশ্চর্য্য কি! এ কি! মাটি থেকে একটা
কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ
হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বদলি।—ঐ—ঐ
—না আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত
সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—
হাসছে! কিছ হই নি ত।—আশ্চর্য্য।
[কিছক্ষণ স্তম্ভ থাকিয়া] জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। [গদগদস্বরে] তুই বাইরে কি
দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই
চলছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী
স্বামীর ঘর কচ্ছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা কচ্ছে?
গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—
যে বাড়ীগলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায়
লোক চলছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে
এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই
চলছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ
মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না? —সত্য কথা? —তা'রা
বলছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বলছে
না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজা-
হানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখা?'—
চে'চাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব, ঔরং-
জীবকে কারারুদ্ধ কর্ব, আগ্রায় দুর্গপ্রাকার
ভেঙ্গে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার
সিংহাসনে বসাবো?'—বলছে না? বলছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে
ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত!
তা'রা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য্য
না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ
পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে
তা'রা পূর্ব্ববৎ নিজের কাজ করে' যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে
যেতে পার্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহা-

নারা! একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস্?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট বলে' মানতো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে—যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শূদ্রাশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহ-খানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সম্মুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়ী নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই “জয় সম্রাট সাজাহানের জয়” বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্ত্রীর অথর্ষ মূর্ত্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে?

সাজাহান। এতদূর? এতদূর!—[গম্ভীর-স্বরে] যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি, তার সর্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখে না। এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন? সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নিলজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুৎকারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বন্ধ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছিড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতনার মরুভূমির প্রান্তদেশ।

কাল—স্বপ্রহর দিবা।

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্ব নিদ্রিত জ্বরংউল্লীসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমা-দের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখেছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখেছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি! জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধু ধু কচ্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। [রুদ্রভাবে] হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও দেখ! বাছা মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বৃষ্টি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাবছো!

নাদিরা। আমার জন্য বলছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমরাও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তার উপর বেচারীর শূষ্ক তালু দেখছি—কথা সরছে না—দেখছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর — তাই মর — তোমরা মর—

আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হয়ে যাক—তাই যাক!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না। কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখতে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো। আর তাঁর এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁর প্রকান্ড জোচ্ছোরি বের করে দেখাবো। আমি মর্ষ্ব: কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ষ্ব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বন্ধুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা করবার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা কর্তে পাচ্ছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙে। এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ—[পিড়িয়া গেল]

নাদিরা। বাছা আমার! [তাহাকে গিয়া ক্লোড়ে লইলেন]

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি, এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছন্ন না। আমি তোমাদের বধ করে মর্ষ্ব! [জহরতের দিকে চাহিয়া] ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মর্ষ্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ষ্ব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। [সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত] তবে।

নাদিরা। মর্ষ্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাম্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্ষ্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মর্দিত করিয়া রহিলেন

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্ষ্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্তে পার্তাম।

দারা। [দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন] ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব-জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিস দুটি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

গোরক্ষক ও গোবক্ষক-রমণী প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কর স্বর [চক্ষু খুলিয়া] কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আন্ছি এখনি! একটু সবুজ কর বাবা!

[প্রস্থান।

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুকছে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। [ক্ষীণস্বরে] বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান
গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের
বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের
দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল!
—এ আমার স্ত্রী!

দারা। তাদের এত দয়া। মানুষের এত
দয়া! এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখন
মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তারা কি সব
শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ
বাবা। অন্যথাকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায়
নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে
জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা।
কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে
তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস
করি না, এসো বাবা—

[নিষ্ক্রান্ত।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মন্ডুগের দর্গ-প্রাসাদমণ্ড।

কাল—জ্যেৎস্না রাত্রি।

পিয়ারা বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিন্দু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিন্দু।
ভান্দুর কিরণ দেখি।

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে
খুঁজে সারা।

পিয়ারার গীত চলিল

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িন্দু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনবে বুঝ-
লাম যে তুমি এখানে।

পিয়ারার গীত চলিল
লছিমি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারান্দু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

পিয়ারার গীত চলিল
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্দু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চললাম!

পিয়ারার গীত চলিল
জ্ঞানদাস কহে, কান্দুর পীরিত,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন
দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে
পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি
একটা কথা শোনার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্তনটা
মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজ-
বরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্তনটা
মাটি করে! আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি
যুদ্ধের সংবাদ শুনতে হবে! তার উপর না
জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই
মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না!
তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই
শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। [থতমত খাইয়া] তবেই ত মাটি
করেছে।

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলে-
মান মন্ডুগের দর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা
জানো?

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তার বাপ দারা তাকে ডেকে
পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয়
নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরঞ্জীবের
দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুনবে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার
ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা করবে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বলছি,
নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল করব। সারা-
রাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন
ঘুমাও। আপোষে মেটাও!

সুজা। তা হলে আমার বক্তব্যটা শুনবে?

পিয়ারা। শুনবো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি।
বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন,
বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে
পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি
প্রস্তুত হ'য়ে নেই। [চেহারা ও পোষাক ঠিক
করিয়া লইয়া] এখানে একটা উঁচু আসনও
নেই ছাই। ষাক্—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনবো।
বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে
দস্তখত দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখত দারার
জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার করছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছ' করছি না।
বলে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরঞ্জীবের হাতে
দারার পরাজয় হয়েছে শুনছে?

পিয়ারা। শুনছি।

সুজা। কার কাছে শুনলে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে!
আর ঔরঞ্জীব বিজয় করবে আগ্রায় প্রবেশ

করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও
কারারুদ্ধ করেছে!

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরঞ্জীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে
নামবে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরঞ্জীবের সঙ্গে যদি আমার
যুদ্ধ হয়—ত সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ
হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই
প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ
কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বলছো তা আমি
বুঝতে পারছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বলতে কি সেটা
আমিও বড় একটা পারছি নে।

সুজা। দূর—তোমার কাছে পরামর্শ
চাওয়াই ব'খা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি
বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা
মন্স্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মন্স্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমার স্পষ্ট লিখেছে
যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ করবে না।

পিয়ারা। তা কি করে' করবে?

সুজা। কেন করবে না? আমার কন্যার
সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন
কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্তে চার
না।

পিয়ারা। তা ত চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে তার পিতৃশত্রুর
কন্যাকে সে বিবাহ করবে না!

পিয়ারা। তা কি করে' করবে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে
এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে
না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই
বদ্বতে পারছি নে।

পিয়ারা। আমিও পারছি নে!

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপ-
দেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বদ্বেছো? কেমন করে বদ্বলে?
হ্যাঁগা কেমন করে বদ্বলে? কি বদ্বিধ?

সুজা। এখন কি করি! ঔরঞ্জীবের সঙ্গে
যুদ্ধ। তার সঙ্গে তার বীর পুত্র মহম্মদ।
মহা সমস্যার কথা। তাই ভাবছি। তুমি কি
উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ
শুনবে? শোন ত বলি?

সুজা। বল, শুননি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই,
যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমা-
দের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্য-
শ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কিত
অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য!
আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বাসিয়ে
রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-
সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে
দাঁড়িয়ে—করে কর, বন্ধে বন্ধ—বিহঙ্গমের
ঝঙ্কার শুননি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর
বন্ধ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর
দিয়ে আমাদের মিলিত মৃগ-দৃষ্টির নৌকা
ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক
নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময়
শান্তিময় স্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক
স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে
পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না
নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে
কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো
না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে!
একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে,
তার উপর—না, দারার প্রভু বরং মান্তে
পার্তাম। ঔরঞ্জীবের—আমার ছোট ভাই-এর
প্রভু—কখন স্বীকার কর্ব না—না কখন না।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা!
বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ
না কর্তে, যুদ্ধ কর্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্ব।
তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি
নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল—প্রাত্ন।

সিংহাসনারূঢ় ঔরঞ্জীব। পার্শ্বে মীরজুমলা,
শায়স্তা খাঁ ইত্যাদি। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ,
জয়সিংহ ও দেহরক্ষী, সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—
সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে
আমার সৈন্য সাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে
আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ
যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!
আপনি নর্মদায়ুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করে-
ছিলেন বলে' আমার অপ্ৰীতিভাজন নহেন।
মহারাজের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা
মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার
অপ্ৰীতিভাজন হোক্ কি প্রীতিভাজন হোক্,
তাতে তার কিছুমাত্র যায় আসে না! আর
আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী
হ'য়ে আসি নাই।

ঔরঞ্জীব। তবে এখানে আসা মহারাজের
উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে
জিজ্ঞাসা করা যে, কি অপরাধে আমাদের
দয়ালু সম্রাট্ সাজাহান আজ বন্দী; আর কি
স্বপ্নে আপনি পিতা বর্তমানে তাঁর সিংহাসনে
বসেছেন।

ঔরঞ্জীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমার এখন
মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার

ইচ্ছে! আমি জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছি মাত্র।

ঔরঞ্জীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর করছে।

ঔরঞ্জীব। কিরূপ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হলে বদ্ববো জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছুর নাই।

ঔরঞ্জীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বদ্ববন; তাতে ঔরঞ্জীবের কিছুর যায় আসে না। ঔরঞ্জীব তার কার্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরঞ্জীব। দাঁড়ান মহারাজ! আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি করবেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মন্ত্র কর্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার কর্তব্য আমি কর্ব।

ঔরঞ্জীব। বিদ্রোহ করবেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব— যদি পারি।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধরে' পরীক্ষা করছিলাম যে আপনার স্পর্শ কতদূর উঠে। পূর্বে শুনছিলাম, এখন দেখছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারতসম্রাট্ ঔরঞ্জীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতায় ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরঞ্জীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বদ্ববো, নন্দাদায়ুধে ঔরঞ্জীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নন্দাদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীন-বল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শত্রু মিলিত নিশ্বাসে ঔরঞ্জীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার

বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরঞ্জীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব কর্বেন জাঁহাপনা!

ঔরঞ্জীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরঞ্জীবেরও ধৈর্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট্! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে রাখতে পারেন! যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জানবেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্শ!

যশোবন্ত। স্তম্ভ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য-শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে— তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—

সাবধান কাফের!

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরঞ্জীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন
যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্শ এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত! কে ভারত সম্রাট্?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট্—বাদশাহ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা, ভারতের সম্রাট্ ঔরঞ্জীব নয়। ভারতের সম্রাট্ শাহানশাহ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। [মুখ উন্মত্ত করিলেন]—কি ঔরঞ্জীব! তোমার মূখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে।

ঔরঞ্জীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরঞ্জীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্তে পাচ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরঞ্জীব, তোমাকে মহা রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্তে।

ঔরঞ্জীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরঞ্জীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরঞ্জীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফাকিরি করিচ্ছ—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ করো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝল্লা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙে চুরে চলে' যাও। শূন্য এদেরই কিছু কর্তে পার না!

ঔরঞ্জীব। মহম্মদ! এ উম্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও!—এ—রাজসভা, উম্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা! দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরঞ্জীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়-তানই হোক।

ঔরঞ্জীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জনা কর্বেন পিতা। সে স্পর্শ আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রুঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্বা না!

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরঞ্জীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রুঢ় ব্যবহার কর্বার আজ্ঞা দিচ্ছ! ভগ্নি, অন্তঃপূরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার শোভা পার না। তোমার স্থান অন্তঃপূরে।

জাহানারা। তা জানি ঔরঞ্জীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাশ্য ভূমিকম্পে হম্মারাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসুখ্যম্পর্শ্যরূপা মহিলা

যে—সেও নিঃসঙ্কেচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যান্য-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ভিক্ষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রংগমণ্ডে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বৃষ্টি কুটাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাস্ত, আজ ধর্মের নামে চলে' যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শূন্য অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শূন্য চাবুকে চলেচে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট্ সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্শে তার সিংহাসনে তার পুত্র ঔরঞ্জীবকে বসিয়েছো আমি জাম্তে চাই।

ঔরঞ্জীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাইরে বাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও! আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও! আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কেচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন!

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মন্থোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরঞ্জীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে। এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত করেছে, যে তার বিজয়-দৃপ্তি

তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্মের অস্পর্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ধ্বংসে স্নেহ দয়া ভক্তির বন্ধের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?— বলা! তোমরা ঔরঞ্জীবের ভয় কচ্ছ? কে ঔরঞ্জীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে ওখান রাখতে পারো; ইচ্ছা করলে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ করলে পারো। তোমরা যদি সম্রাট সাজাহানকে এখনও ভালো বাসো, সিংহ স্তম্ভের বলে তাকে পদাঘাত করলে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলা সমস্বরে “জয় সম্রাট সাজাহানের জয়!” দেখবে ঔরঞ্জীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরঞ্জীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মনুষ্যের আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম! সভাসদগণ! পিতা সাজাহান রত্ন শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হলে আমার দারিদ্র্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্বেও সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট হোন, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বসতে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সূজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে সিংহাসনে বসতে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে করুন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কা যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা

হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্মহীন হোক, আমি আজই মক্কা যাব। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তম্ব রহিল

ঔরঞ্জীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখলাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কাই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কা চলে যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ করলে পারব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পারব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!— চল মহম্মদ! মক্কা যাবার জন্য প্রস্তুত হও— বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট ঔরঞ্জীবের জয়—

ঔরঞ্জীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জানলাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্যাদা করবেন না।

ঔরঞ্জীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

জাহানারা। ঔরঞ্জীব!

ঔরঞ্জীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নিব্বাক হয়ে ছিলাম; তোমার ভৌতিক দেখছিলাম। যখন চমক ভাঙলো তখন সব হারিয়ে বসে আছি! চমৎকার!

ঔরঞ্জীব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আগ্রার নামে শপথ করছি, যে আমি ষতদিন

সম্রাট্ আছি, তোমার আর পিতার কোন
অভাব হবে না!

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুরায় ঔরঞ্জীবের শিবির। কাল—রাত্রি।
ঔরঞ্জীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া
দেখিতেছিলেন

ঔরঞ্জীব। কিম্বিত। না গজ দিয়ে ঢেকে
দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিম্বিততে আমার
দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উহু! আচ্ছা এই
গজের কিম্বিত—চেপে দেবে। তার পর—এই
কিম্বিত। এই পদ। তার পর এই কিম্বিত।
কোথায় যাবে! মাৎ। [সোৎসাহে] মাৎ
[পরিষ্করণ]

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি
উজীর সাহেব!

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা!

ঔরঞ্জীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি।
তার পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত
সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের
অম্বারোহী। এই তিন কিম্বিততে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরঞ্জীব। তার উপর এবার তত নির্ভর
করি না। তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে—
আমাদের আর সৃজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট
না কর্তে পারে! তার পশ্চাৎ থাকবে তোমার
কামান! আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে
থাকবো! বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ
যশোবন্তের রাজপুত্র সৈন্যের উপর। তারা
যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে পিছনে তোমার
কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্। আমরা
জয়লাভ কর্ব। তবে কাল প্রত্যুষে প্রস্তুত
থাকবেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা শব্দ
পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে
সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব
শেষে আক্রমণ করবে। শব্দ প্রস্তুত থাকবে।
এই দেখ নন্না। [মহম্মদ দেখিলেন]

ঔরঞ্জীব। বদ্বলে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরঞ্জীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যুষে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। সৃজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত!
বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার
ছত্রভঙ্গ কর্তে পারলে হয়।—এই যে মহারাজ!
দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া
কুর্নিশ করিলেন

ঔরঞ্জীব। মহারাজ! আপনাকে একবার
ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে
সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরঞ্জীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরঞ্জীব। আপনি যে ইতস্ততঃ করছেন।

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরো-
ভাগে থাকবে কথা ছিল।

ঔরঞ্জীব। আমি মত বদলেছি। তিনি
থাকবেন আপনার দক্ষিণ পাশে!

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরঞ্জীব। আপনার পশ্চাতে। আমি
আপনার বাম পাশে থাকবো।

যশোবন্ত। ও! বদ্বোঁছ! জাঁহাপনা আমায়
সন্দেহ করেন।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ * চতুর। মহারাজের
সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে
এনেছি, তার কারণ এ নয়, যে মহারাজকে
আমরা পরমাশ্রয়ী জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি
এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ
আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সেটা বেশ জ্ঞানেন
বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবি নি।
জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা
অহংকার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে
জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরঞ্জীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুলছেন: কিন্তু সাবধানে জাঁহাপনা। এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত করবেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান!

ঔরঞ্জীব। মহারাজ! ঔরঞ্জীবের সম্মুখে ভ্রুকুটি করে' কোন লাভ নাই! যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন করবেন। নৈলে জানেন ঔরঞ্জীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন করব না।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরঞ্জীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বন্ধু কাজ করবেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বন্ধু কাজ করবেন!

ঔরঞ্জীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরঞ্জীব!

ঔরঞ্জীব। যদি তোমায় এই মনুষ্যের আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরঞ্জীব, এই দুর্দর্দনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইচ্ছিতে ত্রিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝলসে উঠে! আর এ দুর্দর্দনেও রাজপুত—রাজপুত!

[প্রস্থান]

ঔরঞ্জীব। লক্ষ্যপ্রস্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি। তাদের বশ কর্তে আপনি পটু;

কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরঞ্জীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হার্কিমির বাইরে!

[প্রস্থান।]

দিলদার। দিলদার! তুমি সোধিয়েছিলে ছুঁচ হয়ে—এখন ফাল হয়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদুষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরঞ্জীব ও মীরজুমলার পুনঃপ্রবেশ

ঔরঞ্জীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্তে পারে!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরঞ্জীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্ত দেখেছি! আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর।

ঔরঞ্জীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরঞ্জীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।]

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরঞ্জীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হতে কখন দেখি নি!—ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়!—ওঃ! ভায়ে ভায়ে বিবাদ কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীরসাহেব! আমি এইটে কোন রকমেই বন্ধুতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু। কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তাঁরা করেছে। এরা রাখে দাঁড়ি সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে [তাও সম্মুখে রাখবে না]। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সূখে আছে বলতে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভু স্বীকার করবে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। [যাইতে যাইতে] কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। [যাইতে যাইতে] হাঁ ঠিক।
[নিস্কান্ত।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুরায় সূজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা।
সূজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পদুমমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন

পিয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলার
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু
করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে
সুন্দলিত স্বরে পাঁপিয়া;
তখন দুর্লিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে,
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি
কুসুমকুঞ্জবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাথা নহে শুধু
বকুল কুসুম কুড়ারে;

আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জুড়ারে;
আছে, সবার উপরে মাথা তায় বঁধু
তব মধুময় হাসি গো;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার,
তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সূজার গলায় দিলেন

সূজা। [হাসিয়া] এ কি আমার বরমালা পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে? আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারণে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কি আজ্ঞা হয়? [জানু পাতিলেন]

সূজা। এ একটা বেশ নতুন রকমের ঢং করেছে ত পিয়ারা! আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সূজা। শোনো! আমি একটা ভাবনার পড়েছি!

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্তে পারি।

সূজা। [মানচিত্র দেখাইয়া] দেখ পিয়ারা—এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এইখানে ঔরঞ্জীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সূজা। এখন এইরকম ভাবে আছে; কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে বলা যাচ্ছে না!

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সূজা। ঔরঞ্জীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে। তা হলে ত বড় সহজ কথা নয়।

সূজা। তুমি কিছু বোঝ না।

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো!—কেমন করে' জানলে? হাঁ গা—বল না কেমন করে' জানলে? আশ্চর্য্য! একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পরিত্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।—ঠিক বলেছো! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টা করি নে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুন্দর। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝুংকার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দোর! যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগেই এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপূঙ্গুর্দলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পূঙ্গুর্দল আমার চরণে দান কর!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ

বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্তে পারলাম না।

পিয়ারা। চুপ্! আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এই রকম করে' বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকম ভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খুঁটানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বন্ধে তাও অন্ধকার করে' ফেলে।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী—ভন্ড। ঔরঞ্জীব গোঁড়া মুসলমান—ভন্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভন্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মানো না—ভন্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্ম্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্মাট হতে চাই।

পিয়ারা। এইটেই ভন্ডামি।

সুজা। ভন্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভু স্বীকার কর্তে রাজি ছিলাম: কিন্তু আমি ঔরঞ্জীব আর মোরাদের প্রভু মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভন্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভন্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম?

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভন্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবী কর্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্দিক ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবী বেশী!

সুজা। সে ত আর সন্ধ্যাটের পুত্র নয়।
পিয়ারা। হতে কতক্ষণ!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐ রকম
তর্ক কর্বে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঁধিত কারা এ।

এ যে যেতে বাজে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি
করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ
সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন
মর্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি।

দারা। আশ্চর্য! যে দারা একদিন সেনা-
পতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর
হতে নগরে প্রতাড়িত হয়ে আজ পরের দুয়ারে
ভিখারী; আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরং-
জীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে
নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ
কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ
জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ করে সৈন্যে ঔরং-
জীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জন-
কতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে [তাকে আর
সৈন্য বলা যায় না] হরিম্বারের পথে লাহোরে
আমার উদ্দেশ্যে আসছিল! পথে ঔরংজীবের
এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে
নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা
পৃথ্বীসিংহের স্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—
কাদ্ছ?

নাদিরা। না প্রভু।

দারা। না কাদো। কিছু সঙ্কনা পাবে।—
যদি কাদতেও পার্শাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ
কর্বে?

দারা। কর্বে। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে,
ঔরংজীবের প্রভু স্বীকার কর্বে না। যুদ্ধ
কর্বে। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ
করে তার সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি
যতদিন না পিতাকে কারারুদ্ধ কর্তে পারি,
যুদ্ধ কর্বে। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্বে যে!
আমার এ সংকল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—
কি কর্বে!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার
ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই
প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্বে বল, যখন আমার হাতে
পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না
প্রভু! আমি তোমারই জন্য বলছি। একবার
আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ নাথ—এই
অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই
শূন্যায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার
পছন্দ না হয়—কি কর্বে!

নাদিরা। আমি কি তাই বলছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমা-
দের কি! তোমরা কেবল অনুযোগ কর্তে
পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিষয়, দুঃখে
বোঝা!

নাদিরা। [ভগ্নস্বরে] নাথ! সত্যই কি
তাই! [হস্তধারণ]

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকি-সুদর
ভালো লাগে না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান।

নাদিরা। [কিছুক্ষণ চক্ষু বস্ত্র দিয়া রহি-
লেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন] দয়াময় আর
কেন!—এইখানে যবানিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য
হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভাগ ছেড়ে এসেছি, পথে
—রোদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন
কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ
স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—
[কণ্ঠরুদ্ধ হইল] তবে আর কেন! আর কেন!

সব সইতে পারি, শব্দ, এইটে সইতে পারি
নে। [ক্রন্দন]

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কি? তুমি কাঁদছ মা!
নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদছি না—ওঃ,
সিপার! সিপার! [ক্রন্দন]

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত
দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদছে কেন? কে তোমার
হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও
ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া
তাহার বক্ষে মূখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।
নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উম্মিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদছে কেন,
সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত কখন
দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর,
তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি!
অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখছি, যে তোমার
অধরে সে হাসিটি দুর্দর্শনের বন্ধুর মত লেগেই
আছে—আজ এ কি মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ।
আজ আমার দেবতা বিমূখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার
অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বৃষ্টিতে
পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার
কিচ্ছি! ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি
জান্তে, যদি বৃষ্টিতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা
দিবারাত্র জ্বলছে—তা হলে আমার এই
অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম,
যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হলে
এত কঠিন হতে পার্বে না!

সিপার। [অক্ষুণ্ণস্বরে] তোমায় যে আমি
দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমার কিছু
বলেন নি! আমি বড় বেশী অভিমানিনী—
আমারই দোষ।

বাদীর প্রবেশ

বাদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন,
খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাদী। শূনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই।

[প্রস্থান।

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো
সিপার।

[বাদীর সহিত সিপারের প্রস্থান।

দেখা যাক—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দীগ যুবরাজ?

দারা। বন্দীগ সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমার স্মরণ
করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার
আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব! সে দিন গিয়েছে
সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্তে এসেছি।
আজ্ঞা কর্ব এখন—ঔরঞ্জীব।

সাহা নাবাজ। ঔরঞ্জীব! তার আজ্ঞা
আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ
ঔরঞ্জীব ভারতের সম্রাট।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট ঔরঞ্জীব?
সে স্বার্থত্যাগের মন্থোস পরে বৃন্দ পিতার
বিপক্ষে বৃন্দ করে, স্নেহের মন্থোস পরে
ভাইকে বন্দী করে, ধর্মের মন্থোস পরে
সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট? আমি
বরং এক অন্ধ পশুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে
তাকে সম্রাট বলে' অভিবাদন কর্তে রাজি
আছি: কিন্তু ঔরঞ্জীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরঞ্জীব
আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরঞ্জীব যদি আমার
জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই
পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত ত আমি
তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্তাম! অধর্মকে
কখনো বরণ কর্তে পারি না—আমার জীবন
থাকতে না।

দারা। কি কর্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ
কর্ষ। পূর্বে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হ'ছি।
আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরঞ্জীবের
সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য
সংগ্রহ ক'ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের
কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্তে স্বীকৃত
হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই
সাহাজাদা। আসুন—আপনি আজ আমার
অতিথি—সন্ধ্যার জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তার
মনোনীত সন্ধ্যাট। আমি একজন বৃদ্ধ রাজ-
ভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সন্ধ্যাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব।
জয়লাভ না কর্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব!
বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে' পাথের কিছ
সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমার আশ্রয়
দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ
থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি
যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! আমি মহৎ নই
—আমি একজন মানুস। আর আমি যা ক'ছি
একটা মহা স্বার্থত্যাগ ক'ছি যে তা মানি না।
সাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু
সাহস করে' বলতে পারি যে, জেনে অধর্ম
করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা
করি নি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো
কেন?

[উভয়ে নিষ্কান্ত।

জহরৎ উম্মিসার পুনঃ প্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্মণ্য আমি।
পিতার কোন কাজেই লাগি না। শূন্য একটা
বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার
এই অবস্থা দেখছি, কিছ কর্তে পাচ্ছি না।
মাঝে মাঝে কেবল উষ্ অশ্রুপাত।—কিন্তু
আমি যাহোক একটা কিছ কর্ব, একটা কিছ
—যা পূর্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসম-
সাহসিক—তার মত ভয়ঙ্কর।—দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের
প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে
শেষে এই দূর পার্বত্য কাশ্মীরে আসতে
হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম।
নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ। যেন একটা
কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা
অলস সৌন্দর্য্য। স্বর্গের একটি অঙ্গুরা যেন
মর্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা
ছাড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে
কপোল রেখে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে
আছে। এ কি সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আসছে। ঐ যে এক-
খানি সঞ্জিত নৌকায় কয়টি সঞ্জিতা নারী
নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আসছে।
—কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সঞ্জিত তরণীর উপর সঞ্জিতা
রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা ব'য়ে যায়—

ছোট মোদের পানসীতরী সগোতে কে যাবি আর।
দোলে হার—বকুল ব'নিখ দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেলছে তরী দুলছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ার।
যাত্রী সব নতুন প্রেমিক, নতুন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে যুগের ঘোর,
বাঁশীর ধনি, হাসির ধনি উঠছে ছুটে

ফোয়ারায়।

পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্বে ঐ বদছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
কছে নদী কুলধনি, বইছে মদ মধুর বায়।

১ নারী। সুন্দর য়বা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্ছ না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হত-ভাগিনী নারী। কি জন্য?

১ নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছ্! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি! জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ছ নারী?

১ নারী। কেন! আমরা কি ভালোবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিথবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্যন্ত বিক্রয় করে,—তাঁরা ভালোবাসবে কেমন করে? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বন্ধবে মা!

১ নারী। তবে আমরা কি কখন ভালো-বাসি না?

সোলেমান। বাসো — তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হাঁরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হন্দ-মন্দ ভালোবাসতে পারো—কৌকড়া চুল, পটল-চেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পোষ শূনেছো, বন্ধ হইয়েছো। এ ত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা।

২ নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ নারী। আজ এ. হেন অসময়ে?—চল।—যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিম্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতল-স্পর্শ।

[গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান।

সোলেমান। কি আশ্চর্য্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অস্বাসম্ভব গঠন, ঐ কিম্বর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুর্ৎসিত।

পরিভ্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথবীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরঞ্জীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়ন্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুন্নয় কর্ছলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকার হই নি।

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘু-চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ছ, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বন্ধে-ছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, য়বা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ। কোন দোষকালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরঞ্জীবের শিবির।

কাল—রাতি।

ঔরঞ্জীব একাকী

ঔরঞ্জীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! থিঞ্জুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাতে আমার মহিলাশিবির পর্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চলে' গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সজ্জার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠবে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কৰ্ব্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কৰ্ত্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করে' ছিলেন?

ঔরঞ্জীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ উঠছে যেন।

ঔরঞ্জীব। আমার সর্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরঞ্জীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যুষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যে রূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরঞ্জীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরঞ্জীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরঞ্জীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভান্ডার শিবির লুট করে'ই ক্রান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরঞ্জীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নাই। মহারাজই নিজের সর্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আনছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরঞ্জীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উম্মত ব্যবহার মার্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বলবো?

ঔরঞ্জীব। বন্ধে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বদ্বিঘ্নে বলছি!

ঔরঞ্জীব। হাঁ বলবেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জর সুবা দান কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জানবেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্বে।

ঔরঞ্জীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু! আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরঞ্জীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লী যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হোন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। 'শুদ্ধ আপনার খাতিরে' অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত্র জাতি

বড় সরল, আর ঔদার্যের বশ! আমি সে বিদ্যা-টাও অভ্যাস করছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ। সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা করছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—[ঘাড় নাড়িলেন] কম কথা নয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমার ডেকেছিলেন?

ঔরঞ্জীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সূজার অনুসরণ করবে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা।

ঔরঞ্জীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরঞ্জীব। তবে।

মহম্মদ। আমার একটা আঞ্জি আছে পিতা!

ঔরঞ্জীব। কী!—চূপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছি; কিন্তু এ সংশয় আর বন্ধে চেপে রাখতে পারি না। ঔষ্ণতা মার্জনা করবেন।

ঔরঞ্জীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরঞ্জীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রক্ষ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরঞ্জীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপ বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরঞ্জীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বস্তুমানে?

ঔরঞ্জীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! [বলিয়াই মূখ নত করিলেন]

ঔরঞ্জীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কুট। এ বয়সে তা বুঝতে পারবে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরঞ্জীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। [কম্পিতস্বরে] না পিতা। আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরঞ্জীব। তবে।

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি; কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জরিত হয়েছি।

ঔরঞ্জীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখতে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে' তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পাল ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্তি না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরঞ্জীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরঞ্জীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস; কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব থম্ব হরে' যায়।

ঔরঞ্জীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না

বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমার রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে, কর্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোন্ট্রথেন্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি বিবেক বর্জন করে সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পারবেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জন না করলে সগে যেত।

ঔরঞ্জীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরঞ্জীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরঞ্জীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন— আজ আর বুঝতে পাচ্ছেন না। একদিন পার্বেন বোধ হয়।

[প্রস্থান

ঔরঞ্জীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছুর নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বুঝা রক্তপাত!

যখন ঔরঞ্জীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরঞ্জীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হতে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না ঔরঞ্জীব বীর বটে! সেদিন

আমি তাকে নর্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখে-ছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রকৃষ্টি-কুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিম্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।—ঔরঞ্জীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুরার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরঞ্জীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে' না এসে সজ্জার সগে যোগ দিতাম তা হলে খিজুরা-যুদ্ধে সজ্জার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট সাজাহানকে মৃত্যু করে দিতাম!—কি ভ্রমই হয়ে গিয়েছিল।

জয়সিংহ। কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট দারা হোন, সজ্জা হোন বা ঔরঞ্জীব হোন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরঞ্জীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুরা-যুদ্ধে তাঁর সগে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তাঁর সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভান করলে, এমন ত্যাগের অভিনয় করলে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি করলে যে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম! ভাবলাম—‘এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!’ এমন ভোজবাজী খেলে—যে সর্ব-প্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, “জয় ঔরঞ্জীবের জয়!” তাঁর সেদিনকার জয় নর্মদা কি খিজুরা-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অমুভূত; কিন্তু সেদিন খিজুরা-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কুট, খল, চক্ৰী, ঔরঞ্জীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুরা-ক্ষেত্রে আপ-
নার প্রতি রুঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে
যথার্থই অন্ততন্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমার বিশ্বাস কস্তে
বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্
তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা
ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে,
আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে
গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না।
তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন
না, ঔরঞ্জীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে
তিনি আপনাকে গুজ্জর রাজ্য দিবেন—এই-
মাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতি-
শোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয়
কর্ষেন—ঔরঞ্জীবের বিদ্বেষ। আর হাত
গুদিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা
প্রকাণ্ড উর্ষ্বর সুবা—গুজ্জর। বেছে নেন।
আপনার সর্বস্ব দিয়ে প্রতিহিংসা নিতে চান—
নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শূন্য কেনা বেচা
—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও
মুসলমান, ঔরঞ্জীবও মুসলমান। আপনি
যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ কস্তে যেতেন
ত আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপ-
নার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত
কস্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে
আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই
বা কি লাভ!

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের
জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ,
বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি
মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য
ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরঞ্জীবের প্রভু
মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভু
স্বীকার কস্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি
বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জাতির দূর্ষাক্য
সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাগ করি
না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে
কম দামে বেশী পাবো সেইখানেই যাবো। ঔরং-
জীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধুব সম্পৎ
ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হু!—আচ্ছা মহারাজ। আপনি
বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখ-
বেন।—এ শূন্য সাংসারিক কেনা বেচা! আজ
আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত
প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম।

[প্রস্থান।

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন।
হিন্দুর প্রাণ বড়ই শূন্য, বড়ই হিম হয়ে
গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না।
“স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত
প্রজা ত হ'তে পারি।” ঠিক বলেছে জয়সিংহ! কার
জন্য যুদ্ধ কস্তে যাবো। দারা আমার কে?—
নর্মদার প্রতিশোধ খিজুরায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ!
আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে এই
অপৌরুষ—সমভার নিষ্টির আধারের মত এই
আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ
বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছে। একে
প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরঞ্জীবের পক্ষ
হ'য়ে তার শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম
প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো।
এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত-
জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই
এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ করবার আগে আমি
ঔরঞ্জীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।
মহামায়া। আর তার পশ্চাতে তার
সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপ-
হরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া
কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিষ্ঠ

ভৎসনা শব্দবার জন্যই কি তোমার বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন!

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভাগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। [ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া] হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠছে বৃষ্টি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সঞ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রোপ্য দিবে সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নার আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালো-বাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালো-বাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল অনর্দম্বন্দন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালো-বাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তার জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব স্থান হইলে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয়

যেন আমি অন্ধ হইলে যাই! রাজপুত্র-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হইলে যাচ্ছে দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমার এত ভালোবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া।—চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরি-শ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বাজুস্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতশ্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কচ্ছে! ঐ ঘৃষ্ণুর ডাক শোন; আর সপ্তে সপ্তে ডাবো যে এইস্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরভেদ যমজপুত্র; মহেশ্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্ল তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখে দিলে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শব্দ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।]

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌন্দর্য্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! [চারণবালক-গণের প্রবেশ] গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিলে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিলে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে!
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি,

পাখীর ডাকে জেগে—

এমন দেশটি—ইত্যাদি—

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূস্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎকেশ আকাশ তলে মেঘে।

এমন ধানের উপর চেউ খেলে যায়

বাতাস কাহার দেশে।

এমন দেশটি ইত্যাদি—

পদ্পে পদ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাছে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পদ্পে পদ্পে খেয়ে—
তারি ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে

ফুলের মধু খেয়ে!

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ

কোথায় গেলে পাবে কেহ?

—ওমা তোমার চরণ দু'টি বকে আমার ধরি

আমার এই দেশেতে জন্ম—

যেন এই দেশেতে মরি—

এমন দেশটি ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।
পিয়ারা গাহিতেছিলেন

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!

কান্নের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক মধু শ্যাম নামে আছে গো,

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জ্বপিতে জ্বপিতে নাম অবশ করিল গো,

কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেনছ পিয়ারা, যে দারা ঔরং-
জীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে
দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জম-
কালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি।

সুজা। নর? বৃদ্ধ বোম্বা নিজের জামাই-
এর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্মের
খাতিরে। সোভানারা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেসাবৎ' পর্যন্ত
বলতে রাজি আছি। তার উপরে উঠতে রাজি
নই।

সুজা। বশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার
সঙ্গে সৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না।
দারাকে সাহায্য কর্তে স্বীকৃত হ'লে শেষে
কিনা পিছ হটলে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা?
এতে আশ্চর্য্য হবার কিছ্ছ নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাবলাম
বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুরা-যুদ্ধে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক
সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার
আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য
হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ
পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি
—যে আগে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল, তবে আশ্চর্য্য
হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের
পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তার বাপের
পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তার মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের
জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ
করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপ্কেছে,
ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার
হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে
মরেছে! এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে
ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও ত সবাই
করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু
আশ্চর্য্য! সে বাহোক্ কিন্তু মহম্মদ আর
আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গ-
দেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা
নাই। আমি যত তোমার ভুলিয়ে রাখতে চাই,
তুমি ততই শিব্পা তোলো। রাস মান্তে
চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে।
তার উপরে—

বাদীর প্রবেশ

বাদী। এক ফকির দেখা কর্তে চার
জাহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?
বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার,
এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।—
পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমার তাড়িয়ে
দিচ্ছ। বেশ। আমি যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—
একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে'
সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগী সাহাজাদা! সাহাজাদার
একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ] এ কি!
তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহা-
জাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বৃন্দ
টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে
করে'—উঃ—খুব ফকির করেছেন। সম্মুখ
থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—
উঃ! বাপ্কা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তীর মাছে' কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা
সুজা সুলতানকে বলতে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন
তাকে ভুলে দেখিয়ে ফেলবেন না সাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান
সুজা; মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা
পুরুষের মত রেখেছেন। শূন্য—বেশী
চালাকী কর্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন
যা' বলছি ঠিক বদ্বতে পারছেন। আর—যদি
সুলতান সুজা হন, ত' যা' বলছি তা'র এক
বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত
আমি এখনই করি—তুমি বিগ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজে।

[দিলদারের প্রস্থান।

সুজা। এ ত মহাসমস্যার পড়লাম!
বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপর
ঔরঞ্জীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছেন, কিন্তু
যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা করিচ্ছি।
ভাগ্যস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই
যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। [পড়িয়া] এ কি! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছো
না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' তাঁকে পত্র
লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার
বিরুদ্ধাচরণ করেছো, সে অন্যান্য তোমার
শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরি-
শোধ করবে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি
নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্তে পারলাম না! তুমি
আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ করিচ্ছি—

সুজা। না, তের হয়েছে—আমি সম্মুখ
যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে
শত্রু পুষ্তে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুনতে চাই না। যাও,
এখনি যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান।

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি
বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়!
তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই
পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলিচ্ছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে! বেটা মতলব ফেঁদে
এসেছিল। তোমাকে এখনি বলছিলাম না যে,

এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে।
জলের মত সাফ হয়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ী
থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—খন্য
ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পালো না।
ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। [পত্র পড়িয়া] তোমার মাথা
খারাপ হয়েছে! হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বদ্বতে পাচ্ছ
না? ঔরঞ্জীবের ছল। এইটে বদ্বতে পাচ্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বদ্বতে পাচ্ছ নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো—
ঔরঞ্জীবের সঙ্গে বন্ধ কৰ্ত্তে। হেলে ধৰ্ত্তে পার
না, কেউটে ধৰ্ত্তে যাও। তা' আমাকে একবার
জিজ্ঞাসাও করলে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!
চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা
ত তুমি বললে না—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত। তা হলে ভারি ভুল হয়ে
গিয়েছে বলতে হবে। যা' হোক শোন এক
ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি!
আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি! দিয়ে মেয়েকে
তার সঙ্গে শব্দরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ
নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বদ্বিয়ে
বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া
ভাল। বোঝ না—চল বোঝাইগে।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।

শ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহের দরবার-কক্ষ।

কাল—রাতি।

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহরৎ!

জহরৎ। দেখুছো!

সিপার। কি!

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর
মত বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত; হত্যাকারীর
মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক
গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারীর
মত এক গৃহস্থের স্বারে পদাহত হয়ে আর
এক গৃহস্থের স্বারে মর্শ্চিভিক্ষা কুড়িয়ে
বেড়াচ্ছি।—দেখুছো?

সিপার। দেখুছি; কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পদরুধ তুমি—স্থির
স্বরে বলুছো “উপায় কি” আমি যদি পদরুধ
হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। [ছোরা বাহির করিয়া] এই ছোরা
নিয়ে গিয়ে দস্য ঔরঞ্জীবের বদ্বকে বসিয়ে
দিতাম।

সিপার। হত্যা?

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা; চম্কে উঠলে যে?—
হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি
বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ করবে না—যাও।

সিপার। কখন না। হত্যা করব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখুছো—মা মর্ছেন!
দেখুছো—বাবা উম্মাদের মত হয়ে গিয়েছেন।
বসে' বসে' দেখুছো!

সিপার। কি করব!

জহরৎ। কাপদরুধ!

সিপার। আমি কাপদরুধ নই জহরৎ!
আমি বদ্বন্ধেতে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে
বসে' বন্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু
হত্যা করব না।

জহরৎ। উত্তম!

[প্রস্থান।

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি! কোন
উপায় নাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাতি।

খটনাগের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা
অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ
করেছে—ঈশ্বর আমার পরিত্যাগ করেছেন।

একা তুমি আমার এতদিন পরিত্যাগ কর নাই।
তুমিও আমার ছেড়ে চলে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো
নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত
হ'লে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দঃখের সঙ্গিনী
হ'ওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের
স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চললাম—সিপার
—বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি
না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয়
কোন দঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই,
রোগ তাপ নাই, শ্বেষ শ্বন্দন নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা
—চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা।
তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর
দঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দঃবার মৃত্যু
থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর
যত্ন করতেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও
ভালোবাসবো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তার চেহারা ভাল নয়। এখনই
সে তার এক চাকরকে ফিস্‌ফিস্‌ করে' কি
বলছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা
চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় করল মা!
আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা!
জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি,
তার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তার
নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা
ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার
পদতলে পড়ে' তার' প্রাণাভিষ্কা চেয়েছিল,
তখন সে চেহারা এক রকমের: আর এ আর
এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ
ভাষা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দঃবার
বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা!
দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়! তবে মাঝে
মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার
কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব
যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময়
নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে
গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙে—
আর দেখা হ'লো না—ঈশ্বর! [মৃত্যু]

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম
স্তম্ভ।

সিপার। মা! মা!

দারা। দীপ নিৰ্ব্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া উদ্ধারদিকে
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চারিজন সৈনিকসহ
জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে
কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমার বন্দী করবে জিহন
খাঁ!

সিপার। [দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া]
কার সাধ্য?

দারা। সিপার তরবারি রাখো!—এ বড়
পবিত্র মূহুর্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও
নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—
পৃথিবীর সুখদঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে
একবার চারিদিকে স্তরে শেষ দেখা দেখে
নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তাকে
সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পৌঁছে নি!
তাকে ত্যক্ত করো না—আমায় বন্দী কর্তে
চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজায় বোধ হয়।

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শব্দে পাচ্ছ না ত!
তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠবে,
তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্তে!

জিহন। একে শব্দে দিলে বাঁধো। যদি

কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্তে
স্বিধা কর্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমার
বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি
এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে
আস্ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা
কর্ত। অন্যে হয়ত ভাবতো যে এ কত বড়
কৃতঘাতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি,
সে আমার কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ
কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি
জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের
ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফর্দিয়ে
কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস
কর্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন
স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ,
কর্তব্য—জোচ্ছোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন
বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে
ধর্মের অঙ্ককার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম যা
কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে,
ভীল কোল মন্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর
জিহন খাঁ, আমার বন্দী কর।

সিপার। তবে আমারও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়ি না সাহাজাদা!
সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘাতার
দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ
পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখ-
খানি দেখতে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ
পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না! বাইরে চল!
এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড়
অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন
কর্ছ! নীরবে সহ্য কর্ছ ঈশ্বর! হাত দু'খানি
গর্দিয়ে বেশ এই সব দেখ্ছো।—চল জিহন
খাঁ, বাইরে চল।

সকলে ষাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই
জিহন খাঁ! রাখ্বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর
মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে
সম্রাট পরিবারের কবর ভূমিতে যেন তাকে
গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে

দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি।
নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্লাম
না—দেবে কি?

জিহন। যে আঞ্জে যুবরাজ! এ কাজ না
কর্লে আমার প্রভু ঔরঞ্জীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!
দারা। তোমার প্রভু ঔরঞ্জীব! হু—আমার
আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—[ফিরিয়া]
নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার
শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তম্বয়ের উপর
মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে
কহিলেন—

চল জিহন খাঁ!

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার
মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল
দারা। [রুদ্ধভাবে] সিপার!

[সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল।
সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ।
যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দন্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘন-
তার পুরস্কার স্বরূপ গুজ্জর প্রদেশ পেয়ে
সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহা-
মায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার
মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হতে পারে, তবে,
তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি! দারার
সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা
অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে;
আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তি-
চক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিকৃত।
আর তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা
তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার
দিতে পার্ন্তেন, বেদ্রাঘাত কর্তে পার্ন্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁ'র কোন মূল্য নাই? ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ষার সম্বন্ধ নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা করিছ' তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুত্রনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বলছে যে ঔরঞ্জীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তাঁ'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর', আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্ছে না! আশ্চর্য্য রটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও, তোমার নতুন প্রভু ঔরঞ্জীবের কাছে যাও।

[সরোষে প্রস্থান।

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দঃসংবাদ কন্যা। আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাথরের দিকে পালিয়েছে। সৃজা বন্য আরাকান রাজার গৃহে সপরিবারে ডিক্কুক!

মোরাদ গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী। আর কি দঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দঃসংবাদ যে আমিই আপনার নিকট রোজ দঃসংবাদের বশ্তা বহে' আনি; কিন্তু কি কর্ষ বাবা! দঃসংবাদ একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে!

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বল্ছিচ্ছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অস্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তাঁ'র পুত্র সিপারকে এক কংকালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তাঁদের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তাঁদের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুত্রীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তাঁদের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখলে? তাঁরা কি পাষণ?

জাহানারা। না বাবা! পাষণও উত্তপ্ত হয়। তাঁরা পাঁক। ঔরঞ্জীবের ভাড়া করা বন্দুক-গুলি দেখে তাঁরা সব দ্রুত; যেন একটা যাদু-করের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুলতে সাহস কর্ছে না। কাঁদছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরঞ্জীব দেখতে পার।

সাজাহান। তার পর।

জাহানারা। তার পর ঔরঞ্জীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তাঁ'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরঞ্জীবের অন্তঃপূরে।

সাজাহান। ঔরঞ্জীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ষ জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ণে তা জানি না—কিন্তু
—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মূখ
ঢাকাছিস্ যে! তা—কি সম্ভব!—ভাই কি
ভাইকে হত্যা কর্ণে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ! শব্দে
পেয়েছে!—বাবা আপনি কি কর্ণে! কি
কর্ণে!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ কর্ণে!—
আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরঞ্জীব দারাকে হত্যা
কর্ণে না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে
আস্‌তো না; কিন্তু আপনি সে কথা তার মনে
করিয়া দিলেন! কি কর্ণে! কি কর্ণে!
সর্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরঞ্জীব ত এখানে নাই! কে
শব্দেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত
আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে।
আজ সব যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে?
আপনি ভাব্‌ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না,
ঔরঞ্জীবের পাষণ হৃদয়! ভাব্‌ছেন এ বাতাস?
তা নয়, এ ঔরঞ্জীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ
প্রদীপ নয়—এ তার চক্ষের জ্বলাদ দৃষ্টি! এ
প্রাসাদে, এ রাজপুত্রে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার
আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা?
না, নেই! সব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব
খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার
ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি
দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ণে
পারি।—তাকে তার হত্যা কর্ণে যাচ্ছে। আর
আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরু-
পায়। চোখের উপরে এই দেখ্‌ছি অথচ খাচ্‌ছি,

ঘুমোচ্‌ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু কর্ণে না!—
দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে
লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হ'লেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে
পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়ে-
ছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ণে
কি করে'?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে'
গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে'?' ঠিক
বলেছি। তবে—তবে—আচ্‌ছা একবার
ঔরঞ্জীবকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌ নে
জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্‌বে না।
নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে
হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম। সেদিন মূখোমূখি
হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ণে পারি নি; সেই
জন্য আমার পর্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম
নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে'
দেখ্‌তাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেবো লাফ?

লাফ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হ'য়ে
যাচ্‌ছি নাকি!—না না না। আমি পাগল হব না!
ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই
অসহায় সাজাহানকে দেখে ঈশ্বর! তোমার দয়া
হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী
করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন
কাঁপতো—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যা-
চার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার
নিয়মে সৈছে? সৈতে পাচ্‌ছে! আমি এমন কি
পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের
পুত্র—ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে
মূখোমূখি পাই তা হ'লে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি,
যে এ মর্মস্তুদ দৃশ্য তোমার দেখতে হচ্ছে না।
বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে'
গিয়েছো।—জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্বাদ করি—

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

[এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন
জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরঞ্জীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন
ঔরঞ্জীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড।—এ
কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!—আমি
কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত
কর্ষ কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরঞ্জীব। [চমকিয়া] কে!—দিলদার!—
তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়
আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি
যদি এখানে না থাকতাম, তা হলেও এ হত্যা—

ঔরঞ্জীব। [কম্পিত স্বরে] হত্যা!—না
দিলদার, এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট্ স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরঞ্জীব। বল!

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে
উঠলেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতা-
সের উচ্ছ্বাসের মত বোঁরিয়ে এলো। কেন
জাঁহাপনা! সত্য কথা বল্‌বো?

ঔরঞ্জীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু
চান।

ঔরঞ্জীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরঞ্জীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা
যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করিচ্ছিল, তখন
তাঁরা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না।
তখন তাঁরা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি
কম্পনা করিচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে
তাদের গৃহিণীদের নতুন অলঙ্কারের ফর্দ

করিচ্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর
আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার
বিচার! জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব
ধাম্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব
বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর
করে' মানুষের বাকরোধ কর্তে পারেন, তাকে
গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু
কালোকে শাদা কর্তে পারেন না। সংসার
জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে যে বিচারের ছল করে'
আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার
সিংহাসনকে নিরাপদ করবার জন্য।

ঔরঞ্জীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি
সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে!
তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো।
আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও
শায়ের্তা খাঁকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান।

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তাঁর জন্য সিংহাসন
দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক, এ
মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—[ছিঁড়িতে উদ্যত]
না, এখন না। শায়ের্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে
এ মহত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়ের্তা
খাঁ।

শায়ের্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন
সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড
হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে
দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে'
আসছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে
দেবার জন্য আমার হাত স্ফুস্ফু করছে।
আমায় দেন।

ঔরঞ্জীব। কিন্তু তাঁকে মার্জনা করোঁছি।
শায়ের্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে
মার্জনা!—আপনার প্রতিশ্রুতব্দী।

ঔরঞ্জীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে
মার্জনা করবার পরম গৌরব অনুভব করিচ্ছি।

শায়ের্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় কর্তে
আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্তে হবে।

ঔরঞ্জীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন
অধিকার করোঁছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা
কর্ষ।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে' সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তাঁরা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তাঁরা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরঞ্জীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পারবেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মৃত্যু করে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝছেন?

ঔরঞ্জীব। বুঝছি।

শায়েস্তা। তার উপর বন্ধ সন্মিতিও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরু মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরঞ্জীব। হুঁ, [পরিক্রমণ] না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়ে-ছেন জাঁহাপনা।

ঔরঞ্জীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা করবেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইসলাম ধর্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখবেন। ধর্মের মর্যাদা রাখবেন।

ঔরঞ্জীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই। [দস্তখৎ]

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাতেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরঞ্জীব। আজই!

শায়েস্তা। [মৃত্যুদণ্ড ঔরঞ্জীবের হস্ত হইতে লইয়া] আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

প্রস্থানোদ্যত

ঔরঞ্জীব। রোস দেখি। [দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ] আচ্ছা যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরঞ্জীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরঞ্জীব। রোস দেখি! [দণ্ডাজ্ঞা পুন-রায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ] আচ্ছা—যাও। [জিহন আলির প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। [আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন, তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে কহিলেন] না কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না চলে গেছে।—শায়েস্তা খাঁ!

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরঞ্জীব। কি কল্যাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বৃদ্ধিমানের কাষাই করেছেন।

ঔরঞ্জীব। কিন্তু যাক—

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শায়েস্তা। ঔরঞ্জীব! তবে তোমারও বিবেক আছে?

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরাবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি।

সিপার একটি শয্যাব উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব দঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ধনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাঢ়বস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শূতে পাই নি—সে দঃখ আমার বন্ধে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দঃখ তোর দৈন্য অবমাননা আমার বন্ধে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখছি, আর

আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট ঔরঞ্জীবের সভাসদ।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্তে কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্তে আসতাম ত, এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! [ভগ্নস্বরে] ভগবান!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদছে! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদবো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্ষত ভেঙ্গে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শূন্য হয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য মলিন হয়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হয়ে' যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি। দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা, মূর্খ ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায্য; যে

গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখই তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তাঁরা একই নিয়মের দুইটি দিক!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাসতে পারে কে? মর্তে' চায় কে? আমি মর্তে' চাই না!

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে' যান। কেউ সন্দেহ করবে না। আসুন, দু'জনে বেশ পরিবর্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্তে' চাই। মর্তে' আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক করবে!

দারা। তুমি মর্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্তের একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা। মর্তে' আমি বড় ভালোবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বলবো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্তের একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি!—না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্তের এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না, সাহাজাদা!

পদধারণ

দারা। আমি তোমার মর্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'উন সাহাজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার! তুমি এখন

অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য—
আমরা করি!

দারা। ঔরঞ্জীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে
নিশ্বাস ফেলবার জন্য আমাকে আধকাঠা
জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুণ্ডে
ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়,
খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে
পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন
আলি! আমি সন্ন্যাসের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সন্ন্যাসের এই আজ্ঞা
যে, আজই রাত্রিকালে সাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড
তাকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড
তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে!
—এ মুণ্ডের এত দাম আগে জানতাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না
নিয়ে যেতে পারলে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি করবে
জিহন খাঁ! উত্তম! তবে আমায় বধ কর। যখন
সন্ন্যাসের আজ্ঞা।—আজ কে সন্ন্যাস, কে প্রজা!
—হাসছো?—হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না
হলেই বা তোমাদের কি যায় আসে। [দিল-
দারকে। একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই
আমার কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল।
আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার
রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সন্ন্যাসের আজ্ঞা! কাজীর বিচার!
আমি কি করব সাহাজাদা?

দারা। সন্ন্যাসের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা
বটে! তুমি কি করবে! যাও বন্ধু! তোমার
সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্তে পার্লাম
না যুবরাজ। তবে এই বৃদ্ধি দয়াময়ের ইচ্ছা!
বদ্বতে পাচ্ছ না: কিন্তু বৃদ্ধি এর একটা
মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এর একটা মহৎ পরিণাম
আছে। নইলে এতখানি নিশ্চিন্ততা এতখানি
পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ!
তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই
আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বদ্বিছ না:

কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি
দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন ত
যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে দু'দিন
পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু!
তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে
তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহু-
দিনের পুঁবাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে
আমাদের শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন
আলি।

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ
জিহন সশ্বেত করিল

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার!
সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। [উঠিয়া। বাবা!—একি! এরা
কা'রা বাবা!—আমার ভয় কচ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্তে এসেছে।
তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে
জাগাইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস!
[আলিঙ্গন] এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ
হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের
সম্মুখে আমায় বধ করবে! একে অন্য ঘরে
নিয়ে যাও।

জিহন। [একজন ঘাতককে] একে ঐ ঘরে
নিয়ে যাও।

সিপার। [একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত
হইয়া] না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে
বধ করবে! কেন বধ করবে! [ঘাতকের হাত
ছাড়াইয়া আসিল] বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে
যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া
ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে' কি করবে
বৎস! আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্তে
পারবে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ করবে।
তুমি সে দৃশ্য দেখতে পারবে না।

ঘাতকস্বয় চন্দ্র মর্দুহিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া
যাইতে আসিল

সিপার। [চীৎকার করিয়া] না, আমি
যাবো না। আমি যাবো না।

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বন্ধিয়ে
বলছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি করবে
না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। সিপার দারার
কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। [সিপারের হাত ধরিয়া]
সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার!
আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও
আমাকে ছাড়িস্ নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে,
অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বোড়িয়ে-
ছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি
যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বন্ধু ছ'রি মন্তে'
গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায়
প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বন্ধুর
মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলাম, আমায়
ছাড়িস্ নি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—
[বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙিয়া গেল।
তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা
কহিলেন]—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে
ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—
ক্লন্দন

দারা। কি কর্ব! উপায় নাই বৎস! আমায়
আজ মন্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে
আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে
ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে।
[চন্দ্র মর্দিলেন] যাও বৎস! এরা আমাকে
বধ করবে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য
তুমি দেখতে পারবে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে
যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার
অবাধ্য হও নি! কখনও ত—[চন্দ্র মর্দিলেন]
যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই
শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা
শুনবে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা
ডাকিলেন—'সিপার!'

সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বন্ধু ধরে' নেই।
[বন্ধে আলিঙ্গন] ওঃ—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের
সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। [উদ্ধতমুখে বন্ধে হাত দিয়া]
ঈশ্বর! পূর্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম!
ওঃ যাক্, হয়ে' গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য
কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ
করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

[ঘাতকবন্দের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন।

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে
নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ ঐ মৃত্যুর
আন্তর্নাদ।

[নেপথ্যে। ও! ও! ও!]

জিহন। যাক্ সব শেষ!

সিপার। [কক্ষান্তরে হইতে] বাবা! বাবা!
[দরজা ভাঙিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]
ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল
জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি
সম্মাটের কাছে নিয়ে যাবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাত্ন।
ময়ূর সিংহাসনে ঔরঞ্জীব। সম্মুখে মীরজুমলা,
শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিল্লীর খাঁ
ইত্যাদি

ঔরঞ্জীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে
গুজ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে
আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে
এসেছি।

ঔরঞ্জীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ!
ঔরঞ্জীব দরবার কাউকে বিশ্বাস করে না।
তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে
মাড়বার-রাজকে সম্মাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার
শ্রিতীয় সদ্ব্যোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বদ্বোর্ছি; যে ছলেই হোক বা শক্তিবলেই হোক, জাঁহাপনা! যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্তে যাওয়া পাপ।

ঔরঞ্জীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরঞ্জীব। উত্তম মহারাজ!—উজীরসাহেব! সুলতান সূজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে।

ঔরঞ্জীব। উজীরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরঞ্জীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরং জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা।

ঔরঞ্জীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে: কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরঞ্জীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহা-সুখে বর্ণিত হ'লাম।—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী করলেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সৈন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তাতে কুমার আমাদের পরি-ত্যাগ কর্তে বাধ্য হ'লেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশ মত বললাম যে, “কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায়

ক্ষত্রধর্মের অন্যথা হবে না।” শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বদ্ব'লাম না।

ঔরঞ্জীব। অভাগা কুমার! তার পর!

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন: কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সৈন্যে গিয়ে—তাঁকে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে' থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নাই। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞা-পালন কর্তে আমি বাধ্য!

ঔরঞ্জীব। তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

ঔরঞ্জীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শূন্যলম জিহন খাঁরই প্রজারা তাঁকে হত্যা করেছে!

ঔরঞ্জীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ
এই যে কুমার!—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছে যে?

সোলেমান। সম্রাট্—[বালিতে বালিতে স্তম্ভ হইলেন।

ঔরঞ্জীব। বল, কি বল্ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাই নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরঞ্জীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তাতে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরঞ্জীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ, কর্বে না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সন্ন্যাসী! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছুর কব্জি চান। সন্ন্যাসীর মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য কব্জির প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য তাঁর মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরঞ্জীব কব্জি তা জানি। তাঁর প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁর দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সন্ন্যাসী—তবে—

ঔরঞ্জীব। ক্ষুধা হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওঃ! মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এত বড় দুঃখ হতে পারে!

ঔরঞ্জীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ করব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহত্যার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সন্ন্যাসী! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ করলে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মৃঠো ধুলার মত ফেলে দিতে পারতেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেনি, যার একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁর মুখপানে চাইতে পারবেন?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি!

ঔরঞ্জীব। তবে তাই হোক। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আঞ্জা দিলাম!—নিয়ে যাও। [অবতরণ] আল্লার নাম কর সোলেমান।

বালকবেশিনী জহরৎ উম্মিসার প্রবেশ
জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরঞ্জীব।

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উম্মিসা!!!

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ করব। ছেড়ে দাও—
দাও!!

সোলেমান। সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও—
হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্শ্বাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা—
মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো! ছেড়ে দাও, ঐ—ভন্ড, দস্য, ঘাতক—

মর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরঞ্জীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও
তোমায় আমি বধ করব না! শায়স্তা খাঁ, একে
গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার
কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ
দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাতি।

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নির্যাত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে
এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার
আশ্রয়ে এনে ফেলবে তা কে জানতো!

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে
তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জাঁকালো রকম কিছুর
একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে?
শুনবার জন্য হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি!

সুজা। বর্ষের রটিয়েছে যে আমি চম্পশ
জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয়
কর্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তির
খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা
দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিস্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আঞ্জা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আঞ্জা দিয়েছে!

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কি কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্বে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্তে নেই বুঝি? আগে বলতে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো! আর এক কথা শুনবে? শোনো যদি, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সম্বাঙ্গে আগুন ছুটবে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বল শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তম্ভ হ'য়ে' রৈলে যে, কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সম্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি—আজ করলাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস করছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মদখে পরিহাস করছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গদমরে মরে' যাচ্ছে! তোমার মদখে হাসি চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বললে আমার চোখে জল! এই নাও, [চক্ষু মর্দুছিলেন] আর নেই।

সুজা। এখন কি করবে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমায় ভালো-বাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি করব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না! ঔরঞ্জীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাবছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। [ক্ষণেক ভাবিয়া] কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি করব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝতে পারছি না! আত্মহত্যা কর্তে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সৎগে যাই?

সুজা। সুখে মর্তে' পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্তে' যাবে কেন!

পিয়ারা। না তাই হোক।—কাল প্রভাতে আমাদের নিস্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চিল্লশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরব। আর পুত্র কন্যারা—তা'রা নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করবে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ; কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তন্মিল্ল উপায় কি! তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা করবে! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো.

বীরের মত মর! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য
প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহ জীবনের এই
শেষ মিলন রাত্রি?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও
—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে
বসে' থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই,
শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—
স্বর্গ মর্ত্যে নেমে আসুক! ঝঙ্কারে আকাশ
ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ
অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও। তোমার প্রেমে
আমাকে আবৃত করে' দাও। রোস, আমি
আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ
সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক! মৃত্যু—
যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের
সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে
জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয়
না; যে স্তম্ভতা এখানে আর ভাঙে না। মৃত্যু—
মন্দ কি! একদিন তো আছেই। তবে দিন
থাকতে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ
নির্ব্বাণেশ্বর শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায়
জ্বলে' উঠুক, এই গান তারম্বরে আকাশে
উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক: আজিকার সুখ
বিপদের মত কে'পে উঠুক, আনন্দ দুঃখের
মত কে'পে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে
মরে' যাক! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি।
বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ
সাজাহান ও জহরৎ উম্মিসা

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে?
আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তা'কে
পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব?—
তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাখাই, ঔরংজীব ভয়ে
কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক: ত ঝড়
ওঠে: যদি বলি বে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে।

মেঘগজ্জন

জহরৎ। উঃ কি গজ্জন! বাহিরে
পশুভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে
এই অন্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই
যুদ্ধ চলেছে। [মেঘগজ্জন] ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি,
ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা
আসছে—তা'রা আসছে।—যুদ্ধ কর্ব! রণ-
বাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা
আসছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের
দূত! আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট্
সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহরৎ। ঠাকুন্দা, উত্তেজিত হবেন না!
চলুন, আপনাকে শূইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তারা
দারাকে বধ কর্ব।—কাছে আসিস্ না
খবন্দার!

জহরৎ। ঠাকুন্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের
নিশ্বাসে বিষ আছে; সে নিঃশ্বাস বন্ধ জলার
বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে
দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোসনে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুন্দা! রাত্রি গভীর। শোবেন
আসুন।

সাজাহানার প্রবেশ

সাজাহান। কি করণ দৃশ্য! পিতৃহারা
বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ধনা দিচ্ছে। অথচ
তা'র নিজের বৃদ্ধের মধ্যে ধুধু করে' আগুন
জ্বলে যাচ্ছে। কি করণ! দেখে যাও
ঔরংজীব! তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে
যে?

সাজাহান। মেঘের গজ্জনে ঘুম ভেঙে
গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বকছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

সাজাহান। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে
বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুন্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত

ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি!
[ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত
দু'খানি মাখিয়া] এখনও গরম—ধোঁয়া উঠছে।

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে,
এখনও শোন্ নি?

সাজাহান। ঔরঞ্জীব! আমার পানে
তাকিয়ে হাস্ছো! হাস্ছো!—না দু'রাখ্যা!
তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত যোড়
করে' দাঁড়া!—কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা!
ক্ষমা নাই! আমার পুত্র বলে' ক্ষমা কৰ্ব্ব
ভেবেছিস্?—না! তোকে তুষানলে দক্ষ কৰ্ব্বার
আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শোন্ গে যান!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

হাত ধরিলেন

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হ'য়ে
ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কৰ্ব্ব না। বিচার
করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্
গে যান।

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য,
মারে নি? তবে এ কি দেখ্লাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড়
দুঃস্বপ্ন! যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ!
কাঁদাছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়!
—ও—হো—হো—হো—হো—!

মেঘগঞ্জর্ন

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই
কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব ক্ষেপে গিয়েছে,
জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে
গিয়েছে!—উঃ কি ভয়ংকর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন্।
আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বদ্বতে
পেরেছি, বদ্বতে পেরেছি!—বাইরে ও সব কি
হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে'
যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গঞ্জর্ন! ঐ
শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের
হুঙ্কার! মৃদু-মৃদু-হুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি

জলপ্রপাতের মত নেমে আস্ছে। আর ঝঞ্জা
সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে!
পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কৰ্ব্ব। ও
তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের
বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড়
হইছিস্। আর মান্বি কেন!—ওর যেমন কর্ম্ম
তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কৰ্ব্ব ও? রাশি
রাশি গৈরিক জ্বালা উন্মন কৰ্ব্ব? কবুক,
সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে
তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্রতরঙ্গ
তুলে ক্রোধে ফুলে উঠবে! উঠুক, সে তরঙ্গ
তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছাড়িয়ে
পড়বে; তার অন্তর্নির্ভুক্ত বাষ্পে সে ভূমিকম্পে
কে'পে উঠবে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে
নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কণ্ঠে
পাৰ্ব্ব না—অথর্ব বড়ী বেটি! ও বেটি কেবল
শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প
দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর
বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা!
ও কিছু কণ্ঠে পাৰ্ব্ব না—দে বেটারা!—মা,
একবার গজ্জর্ উঠতে পারো মা? প্রলয়ের
ডাকে ডেকে, শত সূর্যের প্রভায় জ্বলে উঠে,
ফেটে চোঁচির হ'য়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে
একবার ছটকে যেতে পারো মা?—দেখি, ওরা
কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি
হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!
মেঘগঞ্জর্ন

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি
ভয়ংকর!

সাজাহান। ইচ্ছা কচ্ছে জাহানারা, যে এই
রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে
একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল
ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে
ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কচ্ছে যে আমার বুকখানা
খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কচ্ছে
যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে
বার করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার
গঞ্জর্ন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গঞ্জর্ন

কচ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বন্ধ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছে! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো?

মেঘগঞ্জর্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত।

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনছেন মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁরও শেষ হ'লো!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না! কেউ বলে তিনি সম্ভ্রীক জলমগ্ন হ'ন, কেউ বলে তিনি সম্ভ্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হ'লে তাঁর পরিবারের আর কেউ রৈল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনছেন?

মহম্মদ। শুনছেন। কাল সারারাত্রি কে'দেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পাচ্ছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় দুঃখ! পিতা-মাতার উদ্দেশে বোরিয়োছিলে; আর দেখা হ'লো না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্তে! কোথায় আমায় সান্ধনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা। যদি এই বন্ধের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ধনা হয় ত বল আমি ছুঁরি এনে এইক্ষণেই আমার বন্ধে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ। এ দুঃখে সান্ধনা নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাঁও!

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মৃক স্থির-মূর্ত্তি! বন্ধের উপর বাহু বন্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ষ্বাক! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাবতে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আন্তর্নাদ উঠে, অর্মানি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দুটি মূর্ত্তিত করে', দুই হস্ত মর্দন কচ্ছ! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্তে চাচ্ছে, তবু বাক্সফূর্ত্তি হচ্ছে না!—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে
চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্শ্ব না। তাই তার অর্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই। মহৎ, উদার, বীর। তোমায় ক্ষমা কর্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ! আমি শূন্য হত-ভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোন বিম্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার!

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বোঁটত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। [উচ্চৈঃস্বরে] আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরঞ্জীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিস্তুর ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আসছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। [সোল্লাসে] তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরঞ্জীবের বাহিঃকক্ষ। কাল—স্বপ্রহর রাত্রি।

ঔরঞ্জীব একাকী

ঔরঞ্জীব। যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত—[বাহিরের দিকে চাহিয়া] উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্তে পাচ্ছি না। রাগে তন্দ্রায় ঢুকে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, [দীর্ঘনিশ্বাস] উঃ কি স্তম্ভ! এত স্তম্ভ কেন! [পরিভ্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির?—সুজার রক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ!

যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার। আমায় ঘিরে নাচ্ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধর্মশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে; দারারও মূণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কি সব!—ওঃ! [চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া] যাক! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত রুইছে! মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরঞ্জীব। [চমকিয়া] দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরঞ্জীব। এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরঞ্জীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জান্তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়? সয় না।

ঔরঞ্জীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃন্দ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্যুপরি এই দ্রাতৃহত্যা! এত বড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরঞ্জীব। কে বলে আমি দ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুটি টিপে মারতে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধর্নি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠবে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরঞ্জীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে

তুমি দিলদার যে ঔরঞ্জীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরঞ্জীব? আমি মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরঞ্জীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সূধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরঞ্জীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরঞ্জীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রোঁপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব করছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চললাম সন্ধ্যাট।

গমনোদ্যত

ঔরঞ্জীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পারবে না ঔরঞ্জীব!—আমি চললাম। তবে একটা কথা বলে যাই। মনে ভাব্ছো যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরঞ্জীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্ছো উঠ্ছো, সত্যসত্য তুমি ততই পড়্ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখবে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছে, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠবে। মনে রেখো।

[প্রস্থান।

[ঔরঞ্জীব নর্তাশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিম্দ্। কাল—অপরাহ্ন।

জাহানারা, জহরৎ উম্মিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উম্মিসা! ঔরঞ্জীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য মনোহর পাশ্চ দেখেছো কি মা।

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রুর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর।—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নিশ্চাক হয়ে যাই যে, মানুষ এমন হাসতে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কহিতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের বিম্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় করতে পারে—যখন ভিতরে নতুন শয়তানী মতলব করছে।—বালহারি!

জহরৎ। ঠাকুন্দাকে এই রকম বন্দী করে রেখেছেন অথচ রাজকার্যে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা করছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁর ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুন্দা আসছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উম্মিসা! ঔরঞ্জীব এ রকম সব পাছে চুরি করে নেয়—তাই আমি পরে পরে বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! [জহরৎকে] আমাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে যাচ্ছে।

সাজাহান। [সহসা গম্ভীর হইয়া] কিন্তু খব্দার! বিয়ে করিস্ নি। [নিম্নস্বরে] ছেলে হলে তোকে কয়েদ করে রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না!

জাহানারা। দেখছো মা। এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উম্মাদের মত করুণ দৃশ্য বৃষ্টি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছাড়িয়ে পড়ে রয়েছে!—উঃ বড় করুণ!

[চক্রে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সাজাহান। আমি উম্মাদ নই জাহানারা!

গর্দাছিয়ে বলতে পারি—চেষ্টা করলে গর্দাছিয়ে
বলতে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙে
গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে
আছি, তাই আশ্চর্য্য! দারা, সূজা, মোরাদ—
সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও
রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরঞ্জীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—
যে সম্রাট!

জাহানারা। [আশ্চর্য্য] তাই ত, ঔরং-
জীব!

ঔরঞ্জীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ!
দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার
মৃগুর দিয়ে গর্দাড়ে করে' ফেলবো।

গমনোদ্যত

ঔরঞ্জীব। [সম্মুখে আসিয়া] না পিতা,
আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ
কর্ত্তে এসেছো! পিতৃহত্যাটা আর বাকি থাকে
কেন! হ'য়ে যাক্।

সাজাহান। বধ কর্বে! আমায় হত্যা
কর্বে! কর ঔরঞ্জীব! আমাকে হত্যা কর!
তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায়
দেবো; আর—মর্ষীর সময় তোমায় এই অন-
গ্রহের জন্য আশীর্বাদ করে' মর্ষ। এই লোল
বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দাও।

ঔরঞ্জীব। [সহসা জান্দু পাতিয়া]
আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্বে'ন না
পিতা! আমি পাপী। ঘোরতর পাপী। সেই
পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন
পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোর্টরগত চক্ষু,
এই শূঙ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ। সত্য,
শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ।

জাহানারা। ঔরঞ্জীব! ভূমিকার প্রয়োজন
নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ
জানে। নতুন কি শয়তানী মতলব করে'
এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরঞ্জীব। পিতার মার্জনা।

জাহানারা। মার্জনা! এটা ত খুব নতুন
রকম করেছে ঔরঞ্জীব!

ঔরঞ্জীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তম্ভ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বল।
কি বলতে চাও ঔরঞ্জীব?

ঔরঞ্জীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু
আপনার মার্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ-হাসি হাসিলেন

ঔরঞ্জীব। [একবার জাহানারার পানে
চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন] যদি এ
প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন
আমার সঙ্গে; আমি এই দশেড প্রাসাদ দুর্গের
দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার
সিংহাসনে সর্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট বলে
অভিবাদন করি। এই আমার রাজমুকুট
পদতলে রাখলাম।

এই বলিয়া ঔরঞ্জীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের
পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে'
যাচ্ছে।

ঔরঞ্জীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণবয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র!

ঔরঞ্জীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু
মর্দিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরঞ্জীব!

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র
আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে।
আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে
বাপের মন! এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভূতে
বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা করিছিলি! এক
মুহুর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল।

ঔরঞ্জীব। আসুন পিতা — আপনাকে
আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে
মক্রায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত
করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হ'য়ে
বসতে চাই না। আমার সম্বা ঘনিয়ে এসেছে—
এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা
মুকুট তোমার! আর মার্জনা! ঔরঞ্জীব—

ঔরঞ্জীব! না সে সব মনে কর্ব না!
ঔরঞ্জীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা
করলাম।

চক্ৰ ঢাকিলেন

জাহানারা! পিতা! দারার হত্যাকারীকে
ক্ষমা!

সাজাহান! চুপ! জাহানারা! এ সময়ে
আমার স্নেহে আর ঘা দিস্ নে। তাদের তো
আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে
কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলোছি।
শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিছিস্ ত—
একদিন সুখী হতে দে! তুইও ঔরঞ্জীবকে
ক্ষমা কর মা।

ঔরঞ্জীব! আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী!

জাহানারা! চাইতে পাচ্ছ? পিতার মত
আমার স্থাবিরত্ব হয় নি। রাজদস্য! ঘাতক!
শঠ!

সাজাহান! তোর মত মাতৃহারা জাহানারা
—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর। ওর মা যদি
এখন বেঁচে থাকতো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা?
—তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে
জমা রেখে গিয়েছে! কি জাহানারা? তবু
নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার
দিকে—দেখ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ
আকাশের দিকে—দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে
দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কি সুন্দর!
আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তুতীভূত প্রেমাত্ম, ঐ
অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর-
কাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শূদ্র মন্দির,
ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কি
করণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরঞ্জীবকে ক্ষমা
কর—আর ভাবতে চেষ্টা কর্ যে—এ

সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্—সে তত খারাপ
নয়। জাহানারা!

জাহানারা! ঔরঞ্জীব! এখানে তোমার
জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরঞ্জীব—আমার এই
জীর্ণ মৃদুর্ষ পিতার অনুরোধে আমি
তোমায় ক্ষমা করলাম।

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জ্বরৎ উন্মিসার প্রবেশ

জ্বরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা কার নাই
ঘাতক! পৃথিবী শূন্য যদি তোমায় ক্ষমা করে,
আমি কর্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ
দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি
তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের
ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার
আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে
ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ষতভার
যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভি-
শাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়-
বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার
পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার
করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি
দীর্ঘকাল বাঁচো, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ কর;
যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়;
যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে
তোমায় নিষ্ক্রেপ করে, যাতে মর্ষার সময়
তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক
কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরঞ্জীব ও জাহানারা তিনজনেই শির
অবনত করিলেন

ঘর্নিকা পতন

মেবার-পতন

পুরুষ-চরিত্র

রাণা অমরসিংহ (মেবারের রাণা)। সগরসিংহ (অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত)। মহাবৎ খাঁ (মোগল-সেনাপতি, সগরসিংহের পুত্র)। অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র, মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়)। গোবিন্দসিংহ (রাণা অমরসিংহের সেনাপতি)। অজয়সিংহ (গোবিন্দসিংহের পুত্র)। হেদায়েৎ আলি খাঁ, আব্দুল্লা (মোগল সৈন্যাধ্যক্ষস্বয়)। মহারাজ গর্জসিংহ (মাড়বারের অধিপতি)। হুসেন (হেদায়েৎ আলির অধীন কর্মচারী)।

স্ত্রী-চরিত্র

রাণী রুক্মিণী (রাণা অমরসিংহের স্ত্রী)। মানসী (অমরসিংহের কন্যা)। সত্যবতী (সগরসিংহের কন্যা)। কল্যাণী (মহাবৎ খাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শালম্বরপতি গোবিন্দসিংহের কুটীর।
কাল—মধ্যাহ্ন।

গোবিন্দসিংহ ও তাঁহার পুত্র অজয়সিংহ
দাঁড়াইয়াছিলেন

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ কর্তে এসেছে, এ কথা রাণা কার কাছে শুনেনেছেন অজয়?

অজয়। তা জানি না পিতা।

গোবিন্দ। রাণা কি বলেন?

অজয়। রাণা বলেন যে, তাঁর ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি কাল প্রভাতে সভাগৃহে তাই সামন্তদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ। আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য?

অজয়। মন্ত্রণা করা।

গোবিন্দ। সন্ধি সম্বন্ধে?

অজয়। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। সন্ধির মন্ত্রণা ত পুরুষে কখন করি নাই অজয়! পণ্ডবিংশতি বৎসর ধরে 'যুদ্ধই করে' এসেছি। আমি জানি—তরবারের ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হেঁষা, মৃত্যুর আর্ত-ধ্বনি। এই এত দিন দেখে এসেছি; শত্রুর সঙ্গ সন্ধি দেখি নাই। কি করে' সন্ধি করে তা ত জানি না অজয়!

অজয় নীরব রহিলেন

গোবিন্দ। [মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে

লাগিলেন। পরে আবার কহিলেন]—রাণা সন্ধি কর্তে চান কেন, কিছুর বলেছেন?

অজয়। রাণা বলেন যে, এই কয় বৎসরে মেবার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; কেন ধনধান্যপূর্ণ সুশ্যামল রাজ্যে আবার রক্তস্রোত বহান।

গোবিন্দ। তাই মোগলের পাদুকা যেচে নিয়ে শিরে বহন কর্তে হবে? জানি! যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার করলো। তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূর নয়! সে মহাপুরুষ মরবার সময় বলেছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। মোগলও ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হ'য়েছে।—এবার যাবে। সব যাবে।

অজয়। রাণাও তাই বলছিলেন যে, এখন মোগলের শক্তি সংহরণ করা মেবারের পক্ষে অসম্ভব: তবে আর বৃথা রক্তপাত কেন?

গোবিন্দ। তোমারও কি সেই মত অজয়? দাস হব বলে, কি যুপকাঠে গলা বাড়িয়ে দেবো?—অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দসিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় করবে না। মেবারের যে রক্তধ্বজা সপ্তদশ বর্ষ ধরে, সহস্র ঝঞ্জা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করে' মেবারের গিরি-প্রাকারে সদর্পে উড়েছে—আজ সে শূন্য

মোগলের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে নেবে যাবে?
কখনও না।—বলগে রাণাকে, আমি যাচ্ছি।

[অজয়ের প্রস্থান।

অজয়সিংহ চলিয়া গেলে গোবিন্দসিংহ দেওয়াল
হইতে তাহার কোষবন্ধ তরবারিখানি লইলেন;
তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন, পরে
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

“প্রিয় সঙ্গী আমার! দেখো, তুমি আমার
হাতে থাকতে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান
না হয়। প্রিয়তম! এতদিন তোমায় ভুলে
ছিলাম, তাই বন্ধু তুমি এত মলিন! ক্ষুব্ধ
হোয়ো না বন্ধু! এবার তোমায় এই মেবার-
যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে’ নিয়ে যাবো। মোগলের
সদ্যঃ উষ্ণ রক্ত পান করাবো। আমায় ক্ষমা কর
প্রার্থনিক। আমায় আলিঙ্গন কর—”

বন্ধু তরবারিখানি রাখিলেন। পরে তাহাকে ধীরে
ধীরে উঠাইয়া ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন।

পরে কহিলেন—

“না, হাত কাঁপে। বন্ধু আর তোর
মর্যাদা রক্ষা কর্তে পারি না। বড়ই বৃদ্ধ
হয়েছি।”

গোবিন্দ তরবারি রাখিয়া বসিলেন, দুই হস্তে
মাথার দুই দিক ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁর
চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পরে কহিলেন—

“ঈশ্বর! ঈশ্বর! কি কল্পে!”

পরে উঠিয়া আবার তরবারি লইলেন। এমন সময়
তাহার কন্যা কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন
কল্যাণী। বাবা? ও কি?

গোবিন্দ। দেখ্ কল্যাণী—

কল্যাণী। না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা।
আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন?
তোমার ও মূর্ত্তি দেখলে আমার ভয় করে,
রেখে দাও বাবা!

গোবিন্দ থামিলেন। পরে তরবারির অগ্রভাগ
ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে সন্মুখে
চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—

“দেখ্ কল্যাণী, কি ভয়ংকর! কি সুন্দর!
এ কি চায় জানিস্?”

কল্যাণী। কি?

গোবিন্দ। রক্ত।

কল্যাণী। কার?

গোবিন্দ। মুসলমানের।

কল্যাণী। কেন মুসলমানের প্রতি তোমার
এই আক্রোশ বাবা?

গোবিন্দ। কেন? তোর জন্মভূমি মেবারকে
জিজ্ঞাসা কর—কেন? এই সপ্তদশ বর্ষ ধরে’
এই স্বাধীন রাজ্যটুকু গ্রাস করবার জন্য সে
জাতি পুনঃ পুনঃ রাক্ষসের মত ধেয়ে এসেছে;
আর শৈলাপহত সমুদ্রতরঙ্গের মত পুনঃ পুনঃ
পদাহত হয়ে ফিরে গিয়েছে। কি অপরাধ
করেছে এই মেবার? যখন ক্ষমতামদক্ষিণ হয়,
তখন সে আর ন্যায়ের বাধা মানে না। তখন এই
তরবারিই তাকে রোখে।—কিন্তু হয়, আজ
বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন

গোবিন্দ। কি! কাঁদিস্ কল্যাণী? ভয়
পেয়েছিস্? এই নে তরবারি কোষবন্ধ কর্লাম!
ভয় কি! [কথাবৎ কার্য্য] যা মা—ভিতরে যা।
আমি আসছি।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। যদি জান্তে বাবা! যদি বদ্বতে!—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের পথ। কাল—অপরাহ্ন।
সত্যবতী ও চারণের দল গাহিতেছিল

গীত

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট্ দৈন্য দুঃখে, তাহার
শৃংগের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবান্ন
সে রূপবাহি পশ্চিমীর,
কাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া স্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
রঞ্জিত করি কাগার তাঁর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অমৃত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে
স্লেচ্ছ রাজার গঞ্জনার
হরিয়া আনিল কন্যা কাহার
বিজয় গর্বে বাম্পা বীর।

মেবার পাহাড়—উঁড়িয়ে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চাশির—
তুচ্ছ করিয়া স্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জ বিহগ গাইছে
গুঞ্জারি স্তব যাহার শ্রীর;
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুর্ভাভিন্দ্র পবন ধীর।

মেবার পাহাড় উঁড়িছে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চাশির—
তুচ্ছ করিয়া স্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
ধুম্র যাহার তুঙ্গ শির,
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন তাঁর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর।
শৌর্যে স্নেহে ও শূন্যচারিতে
কে সম মেবার সুন্দরীর!
মেবার পাহাড়—উঁড়িয়ে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চাশির—
তুচ্ছ করিয়া স্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

এই সময়ে অজয়সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

সত্যবতী। তুমি একজন রাজসৈনিক?

অজয়। হাঁ মা! আমি একজন মেবারের সৈন্যাধ্যক্ষ।

সত্যবতী। দাঁড়াও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যা শুনোছি, তা কি সত্য?

অজয়। কি মা?

সত্যবতী। যে, মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে?

অজয়। করে নি। তবে রাণা যদি সন্ধি না করেন ত আক্রমণ করবে। রাণা যুদ্ধ করবেন কি সন্ধি করবেন, সেই কথা জানবার জন্য মোগল সেনাপতি দূত পাঠিয়েছেন।

সত্যবতী। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

অজয়। আমরা রাণার আজ্ঞাবহ। যুদ্ধ কি সন্ধি সে রাণার ইচ্ছা অনিচ্ছা।

সত্যবতী। রাণা যুদ্ধ করবেন কি সন্ধি করবেন, সে বিষয় কিছুর জান?

অজয়। না। তবে রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করতে পিতাকে ডেকে আনবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যবতী। তোমার পিতা কে?

অজয়। মেবার-সেনাপতি গোবিন্দসিংহ।

সত্যবতী। ওঃ! সেনাপতি গোবিন্দসিংহ তোমার পিতা! তাঁর কি ইচ্ছা অবগত আছ?

অজয়। তাঁর ইচ্ছা যুদ্ধ করা।

সত্যবতী। উত্তম; যাও।

[অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন।

সত্যবতী। সন্ধি! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি করবার কল্পনাও কর্তে পারেন! হাতে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে। তোমরা সকলে ঐ তরুতলে আমার অপেক্ষা কর। আমি আসছি!

[চারণের দল ও সত্যবতী বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত।
সিংহাসনারূঢ় রাণা অমরসিংহ; তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ; গোবিন্দসিংহ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন

জয়সিংহ। রাণা! যখন মোগল-সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্তব্য কি, সে বিষয়ে রাজপুত্রদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। আমরা যুদ্ধ করবো।

রাণা। জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব। ক্ষত্রিয়-শৌর্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত্র ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর! তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈব শক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথা থেকে এসেছিলেন

কোথায় চলে' গেলেন, কেউ জানে না। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না, স্বীকার করি। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণও কৰ্বেন, আশা করা যায়। প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?

রাণা। কৃষ্ণদাস, সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসরে মেবারবাসীরা ধনী, সুখী, সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কর। কর দিব রাণা? কাকে? কে মোগল? কোথা থেকে এসেছে? কি স্বপ্নে তারা ভগবান রামচন্দ্রের বংশধরের কাছে কর চায়?

রাণা। শঙ্কর! সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তি স্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখা শ্রেয়, না—কর না দিয়ে তা হারান ভাল? তুমি কি বিবেচনা কর গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন

—“আমি কি বিবেচনা করি রাণা? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এ সব কিছু বুঝি না। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা কাকে বলে, আমি তা জানি না। আমি শুদ্ধ দুঃখ জানি। বাল্যকাল হ'তে দুঃখের সঙ্গ আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত! রাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গ অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে বসে' দারিদ্র্যের রত অভ্যাস করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। কি সে সুখ! পরের জন্য দুঃখভোগ—কি সে সুখ। কর্তব্যের জন্য দারিদ্র্যভোগ কি মধুর! প্রভাতসূর্যের কনক-রশ্মি যেমন মেহে দরিদ্রের কুটীরের উপর এসে পড়ে, তেমন স্নেহে এসে বুঝি আর কোথাও পড়ে না।—রাণা, আমার কি দিনই গিয়েছে!”

জয়সিংহ। বল গোবিন্দসিংহ। চূপ কল্পে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দ। কি আর বলবো জয়সিংহ। তার পর—তার পর, সেই মেবারে সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙে সন্তোষের নাট্যভবন নির্মিত হ'তে দেখেছি। সেই মহাত্মার মন্দির চূর্ণ করে' তারই প্রান্তরে ঐশ্বর্যের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। তাঁর সেই মহৎ, তাঁর সেই কর্তৃ-পবিত্র, তাঁর সেই জয়ধ্বনি মধুরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি। আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে! আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্লিয়মাণ গৌরব মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণনেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।

কেশব। তুমি জীবিত থাকতে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দ। আমি! আমি আজ আর কি কৰ্বে' কেশব রাও? আজ আর আমার সেদিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। এই জরা-বিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধরে রাখতে পারি না। এই পঞ্জরের ক্ষীণ অস্থি ক'খানা আর এই লোল দেহকে খাড়া করে' তুলে রাখতে পাচ্ছে না। নিদাঘের সূর্যোজ্জ্বল দিবালোকে আর এই ছায়া-ধূসরিত জগৎকে দীপ্ত কর্তে পাচ্ছে না। তবু এখনও ইচ্ছা করে রাণা—যে, আবার সেই পর্বতে অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্য আবার বনে বনে কে'দে কে'দে বেড়াই। ঈশ্বর! দুঃখ সহিবার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিলে!

গোবিন্দসিংহ নীরব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রাণা কহিলেন

“কিন্তু গোবিন্দসিংহ, সমস্ত আর্ষ্যবর্ত মোগল-সম্রাটের কাছে শির নত করেছে। আজ রাজ-পুতানার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবার এই বিপুল বিশ্ববিজয়িনী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কৰ্বে? কি বল গোবিন্দসিংহ?”

গোবিন্দ। রাণা! আমার যা বক্তব্য ছিল, তা বলেছি। আর আমার কিছু বক্তব্য নাই।

রাণা। সামন্তগণ! আমার বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিষ্ফল। আমরা মোগল-সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি কর্বো। মোগল-দূতকে ডাক দৌবারিক।
[দৌবারিকের প্রস্থান।

গোবিন্দ। রাণা প্রতাপ! রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গ থেকে যেন এ কথা শুনতে না পাও। বজ্র! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল! মেবার! মোগল-প্রভু স্বীকার করবার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।

মোগল দূতের প্রবেশ

রাণা। মোগল দূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি কর্তে প্রস্তুত।

বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন

সত্যবতী। কখন না। সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।

গোবিন্দ। কে তুমি মা! এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা! এ কার মৃদু গম্ভীর বজ্রধ্বনি শূন্যে?

রাণা। সত্য, কে আপনি?

সত্যবতী। আমি একজন চারণী! আমি মেবারের গ্রামে উপত্যকায় তাঁর মহিমা গেয়ে বেড়াই। এর চেয়ে আমার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

সামন্তগণ। আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদকুঞ্জে শূন্যে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।

গোবিন্দ। এ কি! আমার দেহে কি নব-যৌবনের তেজ ফিরে এল। এ কি আনন্দ! এ কি উৎসাহ!—সামন্তগণ, প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙে ফেল এ সব খেলনা।

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তল খন্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া মারিলেন। আয়নাখানি চূর্ণ হইল। গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

“সামন্তগণ! অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও। [রাণাকে ধরিলেন] আসুন রাণা।”

রাণা। গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি!—মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ কর্বো। আমার অস্ত্র প্রস্তুত কর্তে বল।

সত্যবতী। জয় মেবারের রাণার জয়!

সকলে। জয় মেবারের রাণার জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ। কাল—প্রভাত।
সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দুল্লা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন
মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি হ'য়ে গিয়েছে?

আব্দুল্লা। হাঁ জনাব।

মহাবৎ। হেদায়েৎ? আপনি নিশ্চিত জানেন?

আব্দুল্লা। নিশ্চিত জানি। সম্রাট তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েছেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি!—তা হবে। আজকাল ত গুণের পুরস্কার হচ্ছে না—গুণের তিরস্কার হচ্ছে। আজ এই আর্দ্র আবর্জনার যত ছত্রাক ফুড়ে বেরুচ্ছে।

আব্দুল্লা। সত্য কথা জনাব। হেদায়েৎ আলি খাঁ হ'লেন খাঁ খাঁনান—কারণ তিনি সম্রাটের ভগ্নীর পুত্র। আর—

মহাবৎ। তা হোন, আপত্তি ছিল না; কিন্তু একটা বিরাট সৈন্য চালনা করা!—তার শালা এনায়েৎ সঙ্গে যাচ্ছে?

আব্দুল্লা। সম্ভব।

মহাবৎ। এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। সম্রাট বোধ হয় হেদায়েৎকে নামে সেনাপতি করে' পাঠিয়েছেন। প্রকৃত সেনাপতি এনায়েৎ!

আব্দুল্লা। তবু যে নামেও সেনাপতি হবে, তার অন্ততঃ এরকম হওয়া চাই যে, সে বন্দকের আওয়াজে ভয় না পায়।

মহাবৎ। যাক্—এবার মেবার যুদ্ধে যা হবে, তা গোড়াগুঁড়িই বোঝা যাচ্ছে।

আব্দুল্লা। আপনাকে মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য সম্রাট ডেকেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ সায়েদ সাহেব।

আব্দুল্লা। আপনি এ যুদ্ধে গেলেন না যে?

মহাবৎ। মেবার আমার জন্মভূমি। সম্রাট

আমায় বঙ্গ, দার্কিণাত্য, কাবুল, যে দেশ জয় কর্তে পাঠান না কেন, আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু মেবার জয় করার প্রস্তাবটা আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

আবদুল্লা। সে কথা সত্য—মেবার যখন আপনার জন্মভূমি। তবে আজ যাই খাঁ সাহেব। বেলা হ'ল।—আদাব।

মহাবৎ। আদাব।

[আবদুল্লা প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। এ উত্তম। হেদায়েৎ আলি খাঁ সেনাপতি, এ একটা তামাসা মন্দ নয়। ধ'রে বেঁধে ভিক্ষুককে নিয়ে জরির আসনওয়ালার ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া যায়, সে কতকটা এই রকম হয় বটে। [নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মোগল-শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর ও তাঁহার অধীন কর্মচারী হুসেন শিবির প্রান্তে গল্প করিতেছিলেন

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয়-করা—হুসেন—হেঃ—দু'খানা মোরস্বা খাওয়ার চেয়েও সোজা।

হুসেন। জনাব! কাজটাকে যত সহজ মনে করছেন, সেটা তত সহজ নয়। এই সাত শ' বৎসর ধরে' মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই জনপদ সমানভাবে মাথা খাড়া করে' রয়েছে; কেউ তার মাথা নোয়াতে পারে নি—স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত নয়।

হেদায়েৎ। আকবর! হেঃ—তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না তাই। হেঃ—সে সময় যদি খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর থাকতেন! তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না, হুসেন।

হুসেন। কেন জনাব—মানসিংহ?

হেদায়েৎ। মানসিংহ আবার সেনাপতি! হেঃ—তা হ'লে—

খানসামার প্রবেশ

খানসামা। খানা তৈয়ারি খোদাবন্দ।

হেদায়েৎ। তা হ'লে আমার এই খানসামা জাফর মিঞাও সেনাপতি।—কি বল জাফর মিঞা?

খানসামা। খানা তৈয়ারি।

হেদায়েৎ। যুদ্ধ কর্তে পারিস্?

খানসামা। এজ্ঞে মর্গীর কোপ্তা।

হেদায়েৎ। তা জানি, মর্গীর কোপ্তা যে তৈরি করেছিচ্, তা বেশ করেছিচ্। কিন্তু তা বলছি না! যুদ্ধ, যুদ্ধ।

খানসামা। কাবাব? আজ্ঞে—ভেড়ার।

হেদায়েৎ। বন্ধ কালা! তা বেশ বলেছিচ্—এবার আমরাও এদিকে ভেড়ার কাবাব বানাবো। যা—যাচ্ছি।

[খানসামার প্রস্থান।

হেদায়েৎ। হুসেন! এবার ভেড়ার কাবাব বানাবো।

হুসেন। কোন্ ভেড়ার?

হেদায়েৎ। কোন্ ভেড়ার আবার! এই রাজপুত! তারা ত একটা ভেড়ার পাল।

হুসেন। মাফ কর্বেন জনাব, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলেম না।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখ-বার আছে! এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে! এখন “মশায়” কি করেন দেখা যাক্।

হেদায়েৎ। হুসেন! তুমি বড় অসম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহার কর্ছ। মনে রেখো, আমি সেনাপতি। ইচ্ছা করলেই তোমার মূন্ডটা কেটে দিতে পারি।

হুসেন। আজ্ঞে তা জানি। জনাব সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ আমি সেনাপতি। সেটা সর্বদাই মনে রেখো।

হুসেন। তা রাখবো। তবে মেবার জয়টা—

হেদায়েৎ। আবার মেবার জয়! হুসেন! তুমি আমার নেহাৎ বন্ধ ব'লেই বলছি—এই মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ।

হুসেন। তা হ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি বলতে হবে।

হেদায়েৎ। বিশেষ বড় নয়। যাও, আমি এখন খেতে যাই।

হুসেন প্রস্থানোদ্যত হইল, হেদায়েৎ তাহাকে
ডাকিয়া কহিলেন

হাঁ, আর শোন হুসেন, সর্ব্বদা মনে রেখো যে
আমি সেনাপতি।

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। যাও।

[হুসেন প্রস্থান করিল।

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয় করা।
—হেং—গোটা দুই পটকা আওয়াজ করলেই
কে কোথায় দৌড় দেবে এখনি। এদের সঙ্গে
আবার যুদ্ধ!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের উদয়-সাগরের তীর।

কাল—প্রভাত।

মেবার-রাজকন্যা মানসী একাকিনী বেড়াইয়া
বেড়াইয়া গাহিতোছিলেন

গীত

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে
এসেছি তোদের কাছে,
হৃদয়-ভরা প্রেম ল'য়ে আজ
এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব,
আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মূখের হাসি,
কেবল তোদের ভালবাসা।
নাহিক আর বিরস হৃদয়
নাহিক আর অশ্রুশিশি,
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম,
হৃদয়ে জড়ায় হাসি,
ভাঙা-ঘরের শূন্য ভিতে
শূন্যি না আর যে ভালোবাসে
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন
প্রাণ ভরে দীর্ঘশ্বাসে;
আর যেন রে প্রাণের মতন
কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নতুন বাতাস
উঠেছে আজ মধুর আলো—

এক অন্ধ বালকের সহিত একটি ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখারিণী। ভিক্ষা দাও মা—

মানসী। এসো মা। এটি কি তোমার
ছেলে?

ভিখারিণী। না, আমার বোনের ছেলে।
বাছা জন্মান্ধ। বাছার মা নেই।

মানসী। বাপ আছে?

ভিখারিণী। সে দেশান্তরে গিয়েছে?

মানসী। আহা। আমায় ছেলোট দেবে?

ভিখারিণী। ও যে আমায় ছেড়ে থাকতে
পারে না মা!

মানসী। আচ্ছা তবে তোমারই কাছে থাক্।
ওকে রোজ রোজ আমার কাছে নিয়ে এসো।
এই ভিক্ষা নাও।

ভিক্ষা দান

ভিখারিণী। জয় হোক মা।

[বালকের সহিত ভিখারিণীর প্রস্থান।

মানসী। কি মধুর ভিখারিণীর ঐ “জয়
হোক”। জয়ভেরীর চেয়ে প্রবল, মাতার
আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম
উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর।

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। মানসী!

মানসী। অজয়! এসো। আমি বড় সুখী!
আমার এ সুখের ভাগ তুমি কিছু নাও।

অজয়। এত সুখ কিসে মানসী?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ;—শরতের নদীর
চেয়েও পরিপূর্ণ! এক ভিখারিণী আমায়
আশীর্ব্বাদ করে' গিয়েছে।

অজয়। তোমায় কে না প্রাণ খুলে আশী-
র্ব্বাদ করে মানসী! নিত্য পথে ঘাটে আমি
মেবারের রাজকন্যার স্তুতিপাঠ শুনি।

মানসী। শোন? আমি একদিন শূন্যে পাই
না কি অজয়?

অজয়। একদিন ঘরের বাহিরে গেলেই
শূন্যে পাবে।

মানসী। আমি ত বাহিরে যাই। আমি
এখানে একটা অতিথিশালা খুলেছি অজয়।
সেখানে গিয়ে আমি প্রত্যহ নিজের হাতে
তাদের খাদ্য দিই। নিজের হাতে না দিলে যে
দিয়ে তৃপ্ত হয় না।

অজয়। তোমার জীবন ধন্য মানসী!—
মানসী, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে
এসেছি।

মানসী। কেন? কোথায় যাবে?

অজয়। যুদ্ধে।

মানসী। ও!—কবে যাবে?

অজয়। কাল প্রত্যুষে!
 মানসী। কবে ফিরে আসবে?
 অজয়। তা জানি না। ফিরে আসবো কি না, তাই জানি না।
 মানসী। কেন?
 অজয়। যুদ্ধে যদি হত হই?
 মানসী। ও! [মুখ নত করিলেন]।
 অজয়। মানসী! যদি আর না ফিরি!
 মানসী। তা হ'লে কি হবে?
 অজয়। তোমার দুঃখ হবে না?
 মানসী। হবে।
 অজয়। এত উদাসীন! মানসী, তুমি জানো কি?
 মানসী। কি জানি অজয়?
 অজয়। যে আমি তোমায় ভালবাসি—
 তোমায় কত ভালোবাসি।
 মানসী। তুমি আমার ভালোবাসো, তা আমি জানি।
 অজয়। তুমি আমার ভালোবাসো না?
 মানসী। বাসি।
 অজয়। না। তুমি আর কাউকে ভালো-
 বাসো!
 মানসী। মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি।
 অজয়। নিষ্ঠুর!
 মানসী। কেন অজয়! তোমায় ভালোবাসি বলে' কি আমার আর কাউকে ভালোবাসতে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে রাখতে চাও? কি স্বার্থপর!
 অজয়। এত বালিকা কি তুমি মানসী!
 মানসী। তুমি আমার ভৎসনা করছ? আমার কি অপরাধ অজয়? আমি মানুষ-মাত্রকেই ভালোবাসি, এই অপরাধ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।
 অজয়। তোমায় দণ্ড দেবো—আমি?
 মানসী। হাঁ, তুমি দণ্ড দাও। অজয়! আজ তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। এ যুদ্ধে তুমি যত বেশী হত্যা কর্তে পারবে, সকলে তত উচ্চৈঃস্বরে তোমার কীর্তি গাইবে। আর আমি যত বেশী ভালোবাসি, আমার কি তত অপরাধ?
 অজয়। ভালোবাসো মানসী। তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করে

নাও। আর আমি কোন কথা কইব না—মুঢ় আমি। আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে' রাখতে চাই! আমায় ক্ষমা কর।—বিদায় দাও মানসী।

মানসী। এসো অজয়। অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ। তার মধ্যে যতদূর পার, আপনাকে পবিত্র রেখো।

[অজয়ের প্রস্থান।

মানসী। যাও অজয়, যুদ্ধে যাও। আমার শূভেচ্ছা তোমাকে বর্মের মত ঘিরে থাকুক।—
 আর যারা এ যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে! তাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যারা কি ঠিক এইরকম আগ্রহে ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কচ্ছে না? এর কত প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। কত সাধনা ব্যর্থ হবে। এর কি কোন প্রতিবিধান নাই?—

মানসী ক্ষণেক সজল নেত্রে উম্মর্দীদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল;
 সহসা করতালি দিয়া কহিলেন—

“বেশ! আমার কাজ আমি কর্বো, যারা যুদ্ধে মর্বে, তাদের আর কিছুর কর্তে পার্বো না। কিন্তু যারা আহত হবে, তাদের ত শূশ্রূষা কর্তে পারি। আমি তাই কর্বো।—কেন! কি আপত্তি! বেশ! তাই কর্বো।”

রাণী রুশ্বিণীর প্রবেশ

রাণী। শূনেছ মানসী?

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার পিতা যে যুদ্ধে গিয়েছেন?

মানসী। শূনেছি।

রাণী। যুদ্ধ—মোগলের সঙ্গে!

মানসী। শূনেছি মা।

রাণী। বেশ বল্লে? খুব উদাসীনভাবে বল্লে, “শূনেছি মা।” যেন এ ননী খাওয়ার মত একটা মোলায়েম সংবাদ! জান, যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে?

মানসী। সম্ভব।

রাণী। সম্ভব কি? নিশ্চয়। বিশেষ, সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ—এবার সব গেল।

যারা যুদ্ধে গিয়েছে তারা ত মর্বেই, আর যারা যায়নি—তাদেরও কি হয় বলা যায় না।

মানসী। তা আমি কি কর্বে মা?

রাণী। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। বিয়ে হবার আর অবকাশ হবে না। এত গোল-যোগের মধ্যে কখন বিয়ে হয়?

মানসী। নাই বা হ'ল।

রাণী। নাই বা হ'ল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?

মানসী। বেশ হবে।

রাণী। ও মা তাও কি হয়? মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে চলে? যোধপুরের রাজার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করিছিলাম। তা আর বিয়ে হবে না। সব মর্বে। সব গেল—ভেস্বে গেল! বিয়েটা হ'য়ে যাওয়ার পর যুদ্ধটা করলেই হ'তো। তা রাণা শুনলেন না।

মানসী। মা তুমি ব্যস্ত হোরো না। আমি বিবাহ করবার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্বে ঠিক করিছি।

রাণী। কি?

মানসী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।

রাণী। সে কি?

মানসী। হাঁ মা! বলিছিলে না মা' যে যুদ্ধে অনেক লোক মরে? যারা মর্বে, তাদের আর কিছুর কর্তে পার্বে না। তবে যারা আহত হবে, তাদের সেবা কর্বে।

রাণী। সর্বনাশ ক'রেছে! অজয় বৃষ্টি তাই তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে?

মানসী। না, তাঁর কোন দোষ নাই মা। অজয় যাচ্ছেন বধ কর্তে! আমি যাবো রক্ষা কর্তে!

রাণী। না। তাও কি হয় কখন?

মানসী। বেশ হয়।

রাণী। তোমার যাওয়া হবে না।

মানসী। মা, নিশ্চিত থাক। আমি যাবো। আমাকে জান ত, কর্তব্য যখন ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুনবার অবকাশ পাই না—যাও মা, আমি যাত্রার উদ্যোগ করি।

রাণী। কার সঙ্গে যাবে?

মানসী। অজয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে।

রাণী। যা ভেবেছি তাই। রাণা ঠিক এই

সময়ে চলে' গেলেন। এখন বোঝায় কে যে তার ঠিক নাই।

মানসী। পিতা এখানে থাকলে এ প্রস্তাবে তিনি আপত্তি কর্তেন না। আমি তাঁকে জানি। তাঁর দয়ার হৃদয়।

রাণী। তিনিই ত তোমাকে কোন কাজে বাধা না দিয়ে এই রকম ক'রে তুলেছেন। গেল। সব গেল। সব গেল। আমি জানি একটা কিছুর গোলযোগ ঘটবেই ঘটবে।

মানসী। মা, তুমি কিছুর চিন্তিত হয়ো না মা। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, আমি যতদূর লাঘব করতে পারি, কর্বে।—যাও মা, কোন চিন্তা নাই।

রাণী। এবার কলিকাল পূর্ণ হ'ল।

[প্রস্থান।

মানসী। এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতি আমার অন্তরের কোণে উঁকি মাচ্ছিল, এখন তার পূর্ণ মহিমায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহে স্নুথের কি ক্ষুদ্র আয়োজন!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা।

হেদায়েৎ আলি ও তাঁহার সঙ্গী হুসেন শিবিরান্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন। বাহিরে যুদ্ধের কোলাহল হইতেছিল। দ্বারদেশে দুইজন সৈনিক মস্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিল।

হেদায়েৎ। হুসেন! মেবার-সৈন্য আন্দাজ কত হবে ঠিক কর্তে পেরেছ?

হুসেন। আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার হবে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—কৈ? রাজপুতেরা এখনও ত পালাচ্ছে না?

হুসেন। না জনাব।

হেদায়েৎ। সকাল থেকে যুদ্ধ কর্বে। এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না। তারা যুদ্ধটা কর্বে মনস্থ করছে যেন।

হেদায়েৎ। তারা যুদ্ধ কিছুর জানে বোধ হচ্ছে।

হুসেন। তাই ত দেখিছ জনাব।

হেদায়েৎ। ঐ রাজপুতদিগের সমরধ্বনি।

আমাদের সৈন্যরা কৈ কোন রকম শব্দ-টব্দ কচ্ছে না ত? তারা যুদ্ধ কচ্ছে ত?

হুসেন। কচ্ছে বৈ কি। আপনি একবার বেরিয়ে দেখলে হত না? আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ, আমি সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বয়ং আর শিবিরের বাহিরে যাবার দরকার হবে না! আমার শালা এনায়েৎ খাঁ একাই এদের হারাতে পারবে। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো কি হুসেন!

হুসেন। তা বটেই ত জনাব। ঐ আবার রাজপুত্রের যুদ্ধানিনাদ! ঐ আবার—জনাব! বড় সর্বাধিক বোধ হচ্ছে না।

হেদায়েৎ। হচ্ছে না নাকি? একবার বাহিরে গিয়ে দেখবে?

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। না, তুমি থাক। ছেলোবেলা থেকেই আমার একা থাকাটাই অভ্যাস নাই। খারাপ অভ্যাস।

হুসেন। খারাপ অভ্যাস বলতে হবে বৈ কি।

হেদায়েৎ। ঐ আবার।

হুসেন। এবার আরও কাছে।

হেদায়েৎ। বল কি?

হুসেন। একটু বেতর ঠেকছে যেন জনাব।

হেদায়েৎ। ঠেকছে না কি? [হুসেনকে ধরিলেন।]

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। খোদাবন্দ! সৈন্যাধ্যক্ষ সামশের হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ!

হুসেন। আর আর সৈন্যাধ্যক্ষ?

সৈনিক। যুদ্ধ কচ্ছে।

হেদায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ বেঁচে আছে ত?

সৈনিক। আছেন জনাব।

হুসেন। আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।]

হেদায়েৎ। তাই ত হুসেন। সত্যই ত কিছু বেতর!

হুসেন। তাই ত দেখছি। সেদিন যখন

জনাব বলেছিলেন যে, মেবার জয় একটা তুড়ি বকাজ, বান্দা বলেছিল মনে আছে, তাহলে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি! এখন দেখছেন জনাব, সে গরীবের কথা—ঐ আরও কাছে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

হুসেন। না, কিছু বলা যাচ্ছে না!

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ?

সৈনিক। হজুর! আমাদের সৈন্যরা বাঁ দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে।

হেদায়েৎ। সে কি?

হুসেন। ঐ বুঝি তার কোলাহল?

সৈনিক। হজুর!

[প্রস্থান।]

হুসেন। সেনাপতি! আপনি একবার শিবিরের বাইরে যান। আপনাকে দেখলেও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আশ্বস্ত হবে। বাহিরে যান—আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। আর সেনাপতি, হুসেন।

হতাশাবঞ্জক অঙ্গভঙ্গি করিলেন

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। খোদাবন্দ, এনায়েৎ খাঁ হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ—বলিস্ কি! তা কখন হয়!—ঐ—ঐ রাজপুত্রের জয়ধ্বনি!—নিতান্ত কাছে।

হুসেন। আপনি একবার বাহিরে যান।

হেদায়েৎ। আর সময় কৈ? ঐ শুনছ?

হুসেন। শুনছি। কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। আরও কাছে।

চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সর্বনাশ!

হেদায়েৎ। তা ত জান্তাম। আর কিছু?

হুসেন। আবার কি হবে? সর্বনাশের উপর আবার কি হবে?

সৈনিক। আমাদের সৈন্যরা সব পালিয়েছে। রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

হেদায়েৎ। ও হুসেন। এলো বুঝি।

নেপথ্যে "পালাও, পালাও!"
হেদায়েৎ। কোন্ দিকে?
হুসেন। এই দিকে।

[পলায়ন।

হেদায়েৎ বিপবীত দিকে পলাইতে উদাত। এমন
সময় একটি গর্দূল লাগিয়া ভূপতিত হইলেন।
বাজপুত্র-চতুষ্টয়ের সহিত মেবারপতাকা হস্তে
অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। জয় মেবারের রাণার জয়!

সৈন্যগণ। জয় মেবারের রাণার জয়!

হেদায়েৎ। [হস্তম্বয় তুলিয়া।] দোহাই
আমায় মেরে না। আমি এখনও মরিনি—
আমায় মেরো না, বন্দী কর।

অজয়। তুমি কে?

হেদায়েৎ। আমি মোগল-সেনাপতি।

অজয়। মোগল-সেনাপতি! সেনাপতি এ
সময় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে শিবিরে যে?

হেদায়েৎ। এ্যাঁ—আমি—এ্যাঁ, এর একটা
বেশ ভাল কৈফিয়ৎ আছে। ঠিক মনে হচ্ছে
না।—আমায় মেরো না, বাঁচতে দাও।

অজয়। বাঁচো! এই শশকের প্রাণ নিয়ে
এসেছ মেবার জয় কর্তে? ভয় নাই! মাঝে মাঝে
এই মেবার জয় রাজপুত্রনাথ বিঘোষিত হোক।

হেদায়েৎ। তা হোক—আপত্তি নাই।

[সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রস্থান।

হেদায়েৎ। প্রাণে বেঁচেছি — পিপাসা,
পিপাসা—

দৃশ্যান্তর

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অন্ধকার রাত্রি।

স্তূপীভূত আহত ও হত মনুষ্য ও অশ্বের দেহ।
মানসী ও কতিপয় সৈনিক সেই স্থানে বিচরণ
করিতেছিলেন, কোন কোন সৈনিকের হস্তে মশাল
ছিল

মানসী। দেখ, তোমরা ক'জন ঐদিকে
যাও! আমরা এদিক দেখছি।

কয়েকজন রাজপুত্র সৈনিক চলিয়া গেল

মানসী। উঃ, চারিদিকে কি হত্যা! কি
আন্তর্নাদ!—এ কি করুণ দৃশ্য! পরমেশ!
তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষ্যে মানুষ্য
থায়! এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে
যাবে না? মানুষ্য নির্ব্ববাদে মানুষ্যকে হত্যা

কর্ছে আর তুমি তাই নীরব হয়ে—দাঁড়িয়ে
দেখছ দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ করে বিশ্ব
পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর
এখনও তুমি গলা টিপে ধর্ছ না! উঃ! এ কি
ভীম, করুণ মর্মাভেদী দৃশ্য! এই হতদের
সত্বপ! এই আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার ধনি।
উঃ—আর দেখা যায় না।

১ আহত। উঃ কি যন্ত্রণা!

মানসী। কোথায় বেদনা সৈনিক? আহা
—বেচাৰী বেচাৰী আমার।

১ আহত। এইখানে, এইখানে। কে তুমি?
মানসী। কথা ক'রো না—

এই বলিয়া আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন। এক
সৈনিককে ইঙ্গিত করিলেন। সে একটা পাত্র দিল।
মানসী সৈনিককে কহিলেন—

"কোন ভয় নাই সৈনিক! ঔষধ খাও।"

প্রথম সৈনিক ঔষধ খাইল। সন্নিহিত দ্বিতীয়
আহত সৈনিক আন্তর্নাদ করিল। মানসী দ্বিতীয়
আহতের কাছে গিয়া কহিলেন—

"স্থির থাক। তোমার শত্রুস্বার জন্য বন্দো-
বস্ত করিছি।

এই বলিয়া এক রাজপুত্র সৈনিককে সংকেত
করিলেন। সে বাহিরে গেল। মানসী দ্বিতীয়
আহতকে কহিলেন

"স্থির থাক, আসছি।"

তৃতীয় আহত। ওঃ—মৃত্যু—মৃত্যুই আমার
ভাল। ওঃ—কি যন্ত্রণা!

"এখনও শ্বাস আছে। সৈনিক একে দেখো।"

হেদায়েৎ। পিপাসা — পিপাসা—ওঃ কি
পিপাসা!

মানসী হেদায়েৎ খাঁর কাছে গিয়া এক সৈনিকের
কাছে একপাত্র জল নিলেন ও হেদায়েৎ খাঁকে
দিলেন—

"এই নাও, জল পান কর।"

হেদায়েৎ। [জল পান করিয়া] আঃ
বাঁচলাম, হে আল্লা!

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। এ অন্ধকারে কে তুমি?—মেবারের
রাজকন্যা?

মানসী। কে অজয়?

অজয়। [নিকটে আসিয়া] হাঁ, মানসী।

মানসী। অজয়! সৈনিকদের বল, আহত-
দের সেবায় আমার সাহায্য কর্তে। আমার
লোক কম।

অজয়। তারা কি কর্বে মানসী?

মানসী। তারা আহতদের বহন করে'
আমার সেবা-শিবিরে নিয়ে যাবে।

অজয়। নিশ্চয়। সৈনিকগণ! বাহন আন।
[সৈনিকদিগের প্রস্থান।

মানসী। কি আনন্দ অজয়!

অজয়। কি জ্যোতিঃ মানসী!

মানসী। কোথায়?

অজয়। তোমার মূখে।—এই বিকট আতর্-
নাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুব লীলাক্ষেত্রে,
এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে,
এ কি জ্যোতিঃ! কীটকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের
উপর প্রভাসসূর্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-মেঘান্তরিত
স্থির নীল, আকাশের মত, দূঃখের উপর
করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি!—একটা সৌন্দর্য
একটা গরিমা!—একটা বিস্ময়! মানসী!

হাত ধরিলেন

মানসী। অজয়!

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজপথ। কাল—প্রত্যুষ।
চারনদলের প্রবেশ, পশ্চাতে অমরসিংহ, গোবিন্দ-
সিংহ, অজয়সিংহ ও অন্যান্য সামন্তগণ ও সৈন্য
গীত

জাগো জাগো নরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি,
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ষ,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ষ
এসেছে মেবার ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পদ্প সৌধমণ্ডে—দাঁড়াইয়া সারি সারি,
আরো যারা পড়ে আছে সমর-ক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটি
বিন্দু-অশ্রুবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ।

কাল—প্রভাত।

রাজা সগর ও তাঁহার দৌহিত্র অরুণ

সগর। এটা ভৌতিক ব্যাপার বলতে হবে
অরুণ—অমর মোগল সৈন্যকে মেবারযুদ্ধে কচু-
কাটা করেছে।

অরুণ। ধন্য রাণা অমরসিংহ!

সগর। অমর ছেলেবেলায় শুনোছি অত্যন্ত
বেমক্কা রকম সৌখিন আর উড়ো মার্কাণ্ডে
ছিল। সে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে—

অরুণ। দাদামশায়! মহর্ষি বাল্মীকি
প্রথম বয়সে দস্যু ছিলেন।

সগর। মহর্ষি বাল্মীকিটা কে? তুলসী-
দাসের ছেলে না?

অরুণ। মহর্ষি বাল্মীকির নাম শুনেন নি
দাদামশায়! সে কি! তিনি একজন মহর্ষি
ছিলেন।

সগর। ছিলেন নাকি! তাঁকে কখন দেখেছি
বলে মনে হচ্ছে না তা।

অরুণ। দেখবেন কি! তিনি ত ত্রেতাযুগে
জন্মেছিলেন!

সগর। কি যুগে?

অরুণ। ত্রেতাযুগে!

সগর। ও! তবে আমার জন্মবার আগে।
কিন্তু নাম শুনোছি।—রসিক পুরুষ এই
বাল্মীকি!

অরুণ। সে কি দাদামশায়! তিনি যে
রামায়ণ লিখেছিলেন।

সগর। লিখেছিলেন নাকি?—রামায়ণ বেশ
বই।

অরুণ। ছিঃ দাদামশায়! রামায়ণ পড়েন
নি? ভগবান্ রামচন্দ্র আমাদের পূর্বপুরুষ
ছিলেন। তাঁর বিষয়ে কিছ্ জানেন না?—ছিঃ!

সগর। আরে পড়বো কি! আমার যুদ্ধ
কর্তে কর্তেই জীবনটা কেটে গেল। পড়বার
সময় পেলাম কৈ?

অরুণ। আপনি যুদ্ধ করেছিলেন নাকি?

সগর। উঃ, কি যুদ্ধ!—তোরা তখন জন্মাস
নি। উঃ—

অরুণ। কার সঙ্গে?

সগর। এ্যাঁ, ঐটেই ঠিক মনে হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ করেছিলাম যে, তা ঠিক মনে আছে। তখন তোর মা—

অরুণ। আমার মা কোথায় দাদামশায়?

সগর। কেউ জানে না কোথায়। একদিন সকালে উঠে “মেবার মেবার” বলে’ চের্চিয়ে উঠলো। তারপর সন্ধ্যার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অরুণ। আর আমার বাবা?

সগর। সে ত চিরদিনই একটু ক্ষেপাটে ছিল। সে তাব পরে মহারাজ গর্জসিংহের গুজরাট-যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল।

অরুণ। আমার মা বোধ হয় মেবারে।

সগর। সম্ভব।

অরুণ। দাদামশায়! আপনি মেবার ছেড়ে এখানে কেন এলেন? দেখুন দেখি, আপনার ভাই প্রতাপসিংহ দেশের জন্য জীবন দিলেন।

সগর। তাই এত অল্প বয়সে মারা গেল।—বেচারি!—আমি মানা করেছিলাম। আমার দোষ নাই।

অরুণ। এখনও শূন্তে পাই যে চারণ কবিবা পথে-ঘাটে তাঁর কীর্তি গেয়ে বেড়ায়।

সগর। বলি, মরে ত’ গেল? সে ত আর এ গান শূন্তে পাচ্ছে না? আমার বেশ মনে আছে, যে একদিন—তখন প্রতাপ আর আমি ছেলেমানুষ—একদিন একটা বেজীর সঙ্গে একটা সাপের লড়াই হয়। আমি বললাম যে বেজী জিতবে। প্রতাপ বিশ্বাস করলে না। বেজী সাপের মাথা লক্ষ্য করে’ একবার এদিক্ একবার ওদিক্ লাফাচ্ছে। আর সাপ ফোর্স্ ফোর্স্ করে ফণার সাপট মাচ্ছে’। শেষে দাঁড়ালো এই যে বেজীর কামড় বসলো সাপের মাথার উপর, আর সাপের কেবল মাটিতে মাথা কোটাই সার হ’ল। ভায়া হে! বেজীর বাবসাই হ’ল সাপ মারা। সাপ পার্শ্ব কেন? তাই আমি বেজীর পক্ষ নিয়েছিলাম; আর প্রতাপ নিয়েছিল সাপের পক্ষ। এখনও তাই।

অরুণ। কিন্তু এই মেবার যুদ্ধে দাদামশায়!—

সগর। ভায়া হে, ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে’

যায়, ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে ‘মুসলমান করে’ আবার লড়বে। হিন্দুরা সে বকম ত আর মুসলমানগুলোকে হিন্দু কর্বে’ না। মুসলমানকে হিন্দু কর্বে’ কি! যারা একবার ফেরে পড়ে’ মুসলমান হয় তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।

অরুণ। কি বকম?

সগর। এই দেখ না, তোর মামা মহাবৎ খাঁ কেমন সাঁ করে’ মুসলমান হ’ল। ওদের আব্দুল্লা ঐ বকম সাঁ করে’ হিন্দু হোক্ দেখি? তা হবার যো নাই।

অরুণ। তবে আপনি মুসলমান হ’লেন না কেন দাদামশায়—

সগর। ঐ জায়গাটায় দাদা সাহসে কুলোলো না। আমার ছেলেটার সাহস অসীম। সে শ্বিধাও কর্লে না। তবে আমি তার জন্য কাজটা অনেক এগিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাহস করে’ মোগলের পক্ষ না হ’লে মহাবৎ খাঁ সাহস করে’ মুসলমান হ’তে পার্ভ না।

অরুণ। উঃ! কি সাহস!—দাদামশায়, আপনার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল। যিনি হিন্দু হ’য়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক্।

সগর। রামায়ণ!—সব গাঁজাখুঁরি।

মোগল-সৈন্যাপক্ষ সায়েদ আব্দুল্লাব প্রবেশ

সগর। এই যে আবদুল্লা সাহেব! আদাব! আবদুল্লা। বন্দে গি রাণা।

সগর। রাণা কে?

আবদুল্লা। রাণা আপনি।

সগর। সে কি! কোথাকার রাণা?

আবদুল্লা। মেবারের রাণা।

সগর। কি বকম! মেবারের রাণা ত অমর-সিংহ।

আবদুল্লা। আজ সম্রাট্ আপনাকে মেবারের রাণাপদে নিযুক্ত করেছেন।

সগর। সে কি!

আবদুল্লা। তাঁর আদেশ, যে আপনি কাল চিতোরে যাত্রা করুন।

সগর। চিতোরে? কেন?

আবদুল্লা। সেই আপনার রাজধানী।

সগর। আর অমরসিংহের রাজধানী রৈল তবে উদয়পুর?

আবদুল্লা। সে ত আর রাণা নয়। সম্রাট্ তাকে পদচ্যুত করেছেন।

সগর। সে ছাড়বে কেন?

আবদুল্লা। তার ছাড়তে হবে।

সগর। আমায় কি গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে হবে না কি?—না সাহেব, আমি রাণাপদ চাই না।

অরুণ। কেন? আপনি ত এখনই বল- ছিলেন যে যুদ্ধবিদ্যাটা আপনার খুব জানা আছে, কেবল যুদ্ধ কর্তে কর্তে আপনার জীবনটা কেটে গেল।—করুন এখন যুদ্ধ!

সগর। অরুণ, তুই কি বলছিস?—না সায়েদ সাহেব, আমি যুদ্ধ কর্তে পার্বে না! যুদ্ধ পাছে কর্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্বি- বাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। যুদ্ধ যদি কর্তে হবে, ত নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে' তার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্তেই বা যাবো কেন? এ রকম ত কোন কথা ছিল না?

আবদুল্লা। আপনার যুদ্ধ কর্তে হবে না। যুদ্ধ যা কর্তে হবে, তা আমরাই কর্তে। আপনাকে শুদ্ধ অনুগ্রহ করে' মেবারের রাণা হয়ে চিতোরে বসতে হবে।

সগর। অমর যদি চিতোর আক্রমণ করে?

আবদুল্লা। তা কর্তে না। এতদিন করল না, আর আজ কর্তে?

সগর। এও কি একটা প্রমাণ হ'ল সায়েদ সাহেব? একটা মানুষ আগে কখন মরেনি বলে সে কি কখনও মরে না? তুমি তা হ'লে সেদিন যে বিয়ে করলে, তবে বিয়ে করোনি?

আবদুল্লা। কেন?

সগর। কারণ আগে ত কখন বিয়ে করোনি। এও কি একটা প্রমাণ?—হাস্টিস্ যে অরুণ?—সাপে আগে কখন কামড়ায় নি বলে' যে কখন কামড়াবে না, এটা কি রকম করে সাবাস্ত হয়, তা জানি না।

আবদুল্লা। আরে মশায় ভড়কাবেন কেন?

সগর। আরে মহাশয় ভড়কাব না কেন? এতে কেউ না ভড়কে থাকতে পারে?—না—

আমি সমস্ত ব্যাপারের উপর চটে গিয়েছি। আমি রাণা হতে চাই না।

আবদুল্লা। তা আপনি সম্রাটের কাছে চলুন ত, আপনার যা বক্তব্য তাঁর কাছে গিয়ে বলবেন।

সগর। আচ্ছা চলুন সাহেব। কিন্তু এ অত্যন্ত নীচ কাপুরদুষের কাজ—মুঠোর মধ্যে আমায় পেয়ে—শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া! তাব পর যদি কি হবে কে জানে। কৃতঘ্নতা। ঘোবতর অবিচার—চল অরুণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।
মানসী একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিখিল জগৎ সুন্দর সব পূর্লকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পূর্ণাভরিত, দর্শনিক কলরব-মুখরিত
গগন মৃগ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অর্মানি নববির্কশিত পূর্ণিত বন পলকে
হাস—উজল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে
কহ—স্নিগ্ধ অময়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার,
শুদ্ধ শীর্ণ সারিৎ পূর্ণ নবযৌবনহরষে।
কেশে তব নৈশ নীল অরুণভাতি বরণে;
অঙ্গ ঘাঁবি' মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে।
কুসুমহাবর্জিত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্তসরসে।

অজয়সিংহের প্রবেশ

মানসী। কে? অজয়?

অজয়। হাঁ, আমি অজয়।

মানসী। এতদিন আস নাই কেন? অসুস্থ ছিলে?

অজয়। না।

মানসী। আমি বাবাকে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি তোমায় কিছুর বলেন নি?

অজয়। না মানসী। তুমি এখানে একা বসে যে?

মানসী। গান গাচ্ছিলাম—আর ভাব-ছিলাম।

অজয়। কি ভাবছিলে?

মানসী। ভাবছিলাম যে মানুষ বড়ই দীন। মেবার যুদ্ধে আমার একটা মহা শিক্ষা

হয়েছে—সে শিক্ষা এই যে মানুষ বড় দুর্বল! এক তরবারির আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হয়ে নড়ে পড়ে। যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে রয়েছে, তারা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর্তে পারে? কি অজয়, আমার মূখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে।

অজয়। তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখছি—সে দিন যা দেখেছিলাম।

মানসী। কোন্ দিন?

অজয়। সেই রাত্রিকালে—সেই মেবার যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই দিন, সেই খানে, সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমাকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণ দেখেছিলাম, সেই দিন আমার উন্মূখ প্রেম একটা অসীম হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে গেল।

মানসী। হতাশা কেন, অজয়।

অজয়। শূন্যে কেন? আমি বুঝলাম যে, তোমাকে আমার ধবধব চেষ্টা কবা বৃথা। বুঝলাম যে, তুমি এ জগতের নও, যে তুমি শরীরী মাংস, একটা স্বর্গের কাহিনী। ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভাষ সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে গড়েছিলেন পাছে সেই আত্মার অনাবৃত তীর্থ জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রংগমণ্ড হ'ত প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটা পবিত্র চাঁদ হ'ত, জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সংগীত হ'ত, ত সে মহানার্টকের নায়িকা হ'ত—তুমি। আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি। মানসী! সে ভক্তির বিনিময়ে তোমার এক বিন্দু করুণা চাই, দিবে কি? [এই বলিয়া অজয় মানসীর হাতখানি ধরিলেন। এই সময়ে রাণী প্রবেশ করিলেন ও ডাকিলেন। “অজয়সিংহ!”

অজয় হাত সবাইয়া লইলেন

মানসী। কি মা?

রাণী। অজয়, আমার কন্যার সহিত এরূপ নিভৃত আলাপ কবার অধিকার তোমাকে আমি দিই নাই।

অজয়। মার্জনা কর্বেন রাণী মা।

মানসী। কিসের জন্য মার্জনা অজয়?

রাণী। মানসী! তুমি রাজকন্যা, মনে রেখো। যাও, ঘরের ভিতরে যাও।

[মানসী চলিয়া গেলেন।

বাণী। অজয়! তুমি গোবিন্দসিংহের পুত্র! তোমাকে আমরা প্রায় আমাদের পরিবার-ভুক্ত বিবেচনা করি। কিন্তু এটা তোমার মনে বাখা উচিত, যে মানসী এখন আর ঠিক কাঁচ মেয়েটি নয়, আর তুমিও ঠিক কাঁচ ছেলটি নও। এখন থেকে এই কথাটি মনে করে মানসীর সঙ্গে দেখা কোরো। আমার বিবেচনায় তার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করাই ভাল।

অজয়। যে আঞ্জো।

অজয় অভিযান করিয়া চলিয়া গেলেন

বাণী। বেশ গুঁড়িয়ে বলেছি। অজয়ের সঙ্গে যদি আমার মানসীর বিষে হ'ত, বেশ হ'ত। কিন্তু তা কখন হয়? তা হয় না। তা হ'তেই পারে না।—[এই বলিয়া বাণী স্থির-প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পরে কাঁহিলেন। —“নাঃ। তা যখন হবার যো নেই, তখন তা হাব ভেবে কি হবে।”

রাণী অনর্ধসংহ প্রবেশ করিলেন

বাণী। রাণী!

রাণী। রাণী! এই যে আমি তোমায় খুঁজিছিলাম!

বাণী। রাণী! তুমি মানসীকে ভৎসনা করেছ?

বাণী। ভৎসনা? কে? না।

বাণী। সে কাঁদছে।

বাণী। [সাবিস্ময়ে। কাঁদছে?

রাণী। যাও, দেখ দেখি কাঁদে কেন?

বাণী। ন্যাকা মেয়ে! আমি কাঁদবার কোন কথা বলেছি—তুমি মেয়েটাকে ত দেখবে না। মেয়েটার যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সে এক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে

রাণী। সাবধান রাণী! মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো—মানসী—কে তা জান?

রাণী। কে আবার?

রাণী। ও যে কে, আমি জানি না। আমি ওকে এখনও চিন্তে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে, আমি বুঝতে পারিছ না।

রাণী। নেও! এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।—যাই, দেখি মেয়েটা কাঁদে কেন। জ্বালাতন করেছে। [প্রস্থানোদ্যত]

রাণা। আর দেখ রাণী—

রাণী ফিরিলেন

রাণা। দেখ, মানসীকে 'কখন ভৎসনা কোরো না। স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্তে নেমে এসেছে। অভিমান করে চলে যাবে।

রাণী অঙ্গভঙ্গী স্বারা হতাশা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণা বেদীর উপর বসিলেন; পরে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

“এ জীবন একটা স্বপ্ন। ঐ আকাশ—কি নীল, স্বচ্ছ, গাঢ়। তার নীচে ধূসর মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে—অলস, উদার, মল্লধর! প্রকৃতি জীবন-সমুদ্রের মত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে, পড়ছে। এই অলস সৌন্দর্য্য কদাচিৎ ভীম আকার ধারণ করে। আকাশে মেঘ গঞ্জর্জন করে। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড় ষ'য়ে যায়।—তারপরে আবার সব স্থির।”

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। কে গোবিন্দসিংহ! এ সময়ে হঠাৎ? গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ করবার জন্য নতুন মোগলসৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক মেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না করে ছাড়বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ করবেন না?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে?

গোবিন্দ। সে কি রাণা! মোগল এবার তবে নিশ্চিন্তে এসে মেবার অধিকার করবে!

রাণা। মন্দ কি? যখন তার এত আগ্রহ!—

গোবিন্দ। রাণা সত্য সত্যই কি যুদ্ধ করবেন না?

রাণা। না—একবার করেছি—করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে—

রাণা। প্রয়োজন? আমি বদ্বতে পাচ্ছি যে তা নিষ্ফল! মেবার যুদ্ধে আমরা অনেক রাজপুত হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে করবে,—সে সৈন্য কৈ?

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মাটি ফুড়ে উঠবে মহারাণা!

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শূন্যলাম, মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্তে এসেছে। দেখলাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত—উদাসীন। ভাবলাম, রাণার বদ্বি এখন ঘুম ভাঙে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙাতে এলাম।

রাণা। চারণী! আমার আর যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নাই! এবার সন্ধি করবে।

সত্য। সে কি মহারাণা! এ মেবার জয়ের পর সন্ধি? এই মহৎ গৌরবের শিখর হতে এক ঝাঁপে গভীর অপমানের কূপে নেমে যেতে হবে?

রাণা। মেবার জয় চারণী! আমরা মেবারে জয়লাভ করেছি বটে—কিন্তু জান কি দেবী?—জান কি, যে এই মেবার যুদ্ধে আমরা অর্ধেক সৈন্য হারিয়েছি; কত যে বীরের রক্ত দিয়ে আমরা সে জয় ক্রয় করেছি?

সত্য। কিছু দুঃখ নাই রাণা! বীরের রক্তই জাতিকে উর্ধ্ব করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।

রাণা। কিন্তু আমি দেখছি, যে আর একটি যুদ্ধ করলেই হবে না—এ সময়ের অন্ত নাই। এই মর্দুটমের সৈন্য নিয়ে বিশ্বজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিবুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্য। উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্ধ্ব। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ তলে লুটতে পড়ে। স্বর্গ হতে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হলে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্তে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোন্টি শ্রেয়ঃ—অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ষার ভয়ে আমার রক্ত দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে সে রক্ত নয়—আমার যথাসর্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্মাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রু-করে সঁপে দেবো? তাবা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' বাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পারবেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে! আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই!

বাণা। চারণী! তুমি কে? তোমার বাকো গজ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গ-ভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্যের মত ভাস্বর, জল-প্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শূন্য চারণী নও।

সত্য। কে আমি? শূন্য তবে কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নাই। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা—সত্যবতী!

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা!—সে কি?

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা করছে। আমার পিতা আজ তাঁর দ্রাত-পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য চিতোর দুর্গে কল্পিত রাণা হ'য়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবারবাসীদের উত্তেজিত করে' বেড়াচ্ছি; তাদের বলে' বেড়াচ্ছি, যে, এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন বাণা—আজ পর্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই।

রাণা। জানি ভগিনী।

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভাগ, পিতা পুত্র ছেড়ে, তার কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে

বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুকুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!—[বলিতে বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মর্দাছিলেন।]

রাণা। শান্ত হও ভগিনী! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্তে পার, সে দেশের রাজা, তাব ভাইও—তার জনা প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের সায়েদ আবদুল্লাব শিবির।
কাল—বাগ্নি।

আবদুল্লা, হুসেন ও হেদায়েৎ কথোপকথন করিতেছিলেন

আবদুল্লা। এ দেশটায় বড় বেশী পাহাড়। হেদায়েৎ। হাঁ জনাব।

আবদুল্লা। তুমি যেবার হটলে, সেবার রাজপুত্রেরা কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করিছিল?

হেদায়েৎ। আমি ত হটিনি।

আবদুল্লা। হটনি কি রকম? তোমায় বন্দী করে' নিয়ে গেল। আবার বল্ছ হটনি! হটা আবার কাকে বলে?

হেদায়েৎ। বন্দী কবে' নিয়ে গেল কি? আমি চালাকির সহিত ধরা দিলাম।

আবদুল্লা। চালাকির সহিত ধরা দিলে বৃষ্টি?

হুসেন। হাঁ জনাব। উনি চালাকির সহিত ধরা দিলেন। যখন রাজপুত্রসৈন্য এসে পড়লো, তখন আমাদের সৈন্যবা ভেবে চিন্তে খাপ থেকে তরোয়াল বার করল। পরে তাবা তবোয়াল খাপ দুটোই নিজের নিজের বিছানায় রাখলো। রেখে সকলেই বেশ ধীবভাবে নিজের নিজের গোঁফ চুম্বরে নিলো। পরে—খানাটা তৈবী কি না? না খেয়ে যেতে পারে না।—খানাটা খেলো। তার পরে খানা খেয়ে চুল আঁচড়ে আবার গোঁফ চুম্বরে নিলো। তখন দেখা গেল যে রাজপুত্র-সৈন্য আমাদের শিবিরের দরজায় এসে উপস্থিত। তখন আমাদের সৈন্যেরা বলে, “এস”

বলে' যুদ্ধ কর্তে' গেল। কিন্তু আগে যে তরোয়াল আর তার খাপ পাশাপাশি রেখেছিল, তাড়াতাড়িতে তরোয়াল বলে' ভুল করে' তারা সব সেই খাপগুলো নিয়ে ছুটলো।

আব্দুল্লা। সবাই একরকম ভুল করলে বৃষ্টি -

হেদায়েৎ। দৈব! দৈবের কথা কখন বলা যায় না।

আব্দুল্লা। তাবা আব এক কাজ কর্তে' পান্ত।

হেদায়েৎ। কি -

আব্দুল্লা। তাবা খানা খেয়ে উঠে তরোয়াল আব খাপ দু'টো দু'পাশে বেখে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পান্ত।

হেদায়েৎ। শত্রু যে এসে পড়লো, কি কর্তে'।

আব্দুল্লা। তা বটে। ঘুমিয়ে নেবার সময় ছিল না। তার পর তুমি কি করলে?

হেদায়েৎ। আমি আর কি কর্তে'?

আব্দুল্লা। বল্লে বৃষ্টি, "এই নাও হাত দু'খানা বাঁধ, গলাটা বাঁচিও!"

হেদায়েৎ। না, তা বর্লিনি, তবে তারই কাছাকাছ একটা কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না।

আব্দুল্লা। যাক্ বিশেষ এমন জাঁকালো রকম নিশ্চয় কিছ্, বর্লিনি, যা ভুলে গেলে উদ্দু-সাহিত্যের কিছ্ ক্ষতি-বৃষ্টি হয়। কথাটা হচ্ছে, তার পর তুমি ধরা দিলে?

হেদায়েৎ। হে—আজ্ঞে সেনাপতি। ঐ একেবারে ঠিক অনুমান করেছেন। তবে ধরা দেবার আগেই এক বড়ো সৈনিক, কাউকে নিশ্চয় ভুল করে,' আমার উপর দিয়ে এক গর্লি চালিয়ে দিল।

আব্দুল্লা। তার পর শত্রুতে পাই, রাণার মেয়ে তোমার সেবা করেছিলেন।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব, রাণার মেয়ে বীর-কন্যা,—বীরের মর্ষ্যাদা বৃষ্টি। তার উপর এই চেহারাখানা জনাব—

হুসেনকে কুনো দিয়ে সঙ্কত

হুসেন। হাঁ, চেহারাখানা একটা দেখবার মত জিনিস বটে!

হেদায়েৎ। চেহারার মত চেহারা কি না!— হুসেন?

হুসেন। আলবৎ।

আব্দুল্লা। তাই দেখে রাণার কন্যা বৃষ্টি—

হেদায়েৎ। সে আর কি বল্বে জনাব!

আব্দুল্লা। তিনি খুব সুন্দরী?

হেদায়েৎ। উঃ!

আব্দুল্লা। তিনি তোমায় কি বল্লেলেন? হেদায়েৎ। সাহস পেলেন না জনাব!—

সাহস পেলেন না। একবার প্রাণেশ্বরের "প্রা" পর্যন্ত উচ্চারণ করেছিলেন, "ণে"র টানটাও যেন দিয়েছিলেন, সেটা ঠিক হলফ করে' বলতে পারি না। মিথ্যা কইব না। কিন্তু আমি এমনি কটমটিয়ে তাকালাম, তার অর্থ "আমি সে ধাতুর লোক নই," যে তিনি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন, আর সাহস হ'ল না।

আব্দুল্লা। তার পব?

হুসেন। তাব পর রাণা ভয়ে সেনাপতিকে ছেড়ে দিলেন।

হেদায়েৎ। নৈলে একবার দেখ্তাম।

আব্দুল্লা। বটে? হেদায়েৎ আলি তুমি বীর বটে!

হেদায়েৎ। না এমন আর কি বিশেষ। তবে যুদ্ধ বিদ্যাটা পযসা খরচ ক'বে শেখা গির্যেছিল জনাব!

আব্দুল্লা। উঃ! পাহাড়গুলো রাতে কি কালো দেখাচ্ছে। এদেশে সবই পাহাড় বৃষ্টি?

হেদায়েৎ। দু'টো চারটে নদীও আছে জনাব!

আব্দুল্লা। কাল সকালে ভাল করে' দেখা যাবে।

দবে কামানের ধর্নি

আব্দুল্লা। ও কি?—

হেদায়েৎ। হুসেন—

হুসেন। জনাব! মোগল-সেনাপতির আক্রমণের অপেক্ষা না করে' বৃষ্টি রাণা এবার স্বয়ংই এসেছেন।

আব্দুল্লা। সৈন্যদের সাজতে বল, হুসেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের দুর্গাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।
একটি শয্যা শায়িত অবদুর্গসিংহ। অপব শয্যা
শূন্য। রাজা সগর্বসিংহ দুর্গমধ্যে পাদচারণা
করিতেছিলেন

সগর। এ আমায় চিতোরের দুর্গে এক
বকম কয়েদ করে রাখা। এই এমন বেজায়
পুবানো পাথর, আর সব মান্দাতার আমলের
পুবানো গাছ, এক একটা যেন এক একটা
ভূত। রাত্রে যখন বাতাস বয়, তখন সেটা বেশ
কটব পাওয়া যায়। যখন অন্ধকার হয়, তখন যেন
সে আলোকিতবাব মত কালো আর ঘন। নক্ষত্র
অন্ধকারে ঘো নাই। যা হোক, এখানে এসে
একটা উপকার হয়েছে এই যে এখানে এসে
বামাশয়খানা একবার পড়া গেল, বেশ বই। আর
চারণ চারণীদের মুখে আমার পূর্বপুরুষের
কথা অনেক শোনা গেল। তাঁরা বঁচি ছিলেন
বটে না সে বিষয়ে কোন বকম সন্দেহ করলে
আব চলছে না। কিন্তু আবে আমার ভয় করছে
যেন। তাই ত' এই নিতেনে দুর্গ। আর বাইবে
এই ঝড়' প্রহরী প্রহরী।

প্রহরীর প্রবেশ

দেখ্ খুব সাবধানে পাহারা দিবি কেউ
না গোক' ও বাবা! ওটা আবার কি -
প্রহরী। কে -

সগর। ঐ আবার এ এ আবার মবেছে
বে।

প্রহরী। ও ঝড়ের ঝাপটা।

সগর। তোমাদের দেশের ঝড়ের ঝাপটাটা
একটু বেশী দেখাছি। খুব ঝড় হচ্ছে
বুঝি।

প্রহরী। আজ্ঞে রাণা।

সগর। আর রাণা! এখান বেছোরে প্রাণটা
গেল! ওবে তোদের দেশে অন্ধকার কি বকম
খুব অন্ধকার?

প্রহরী। আজ্ঞে।

সগর। এত বেশী অন্ধকার না হলেও
চলতো। তোরা জেগে থাকিস। আর বাইবে
গোটাকতক আলো জ্বাল। অন্ধকারকে তাড়া
কব। এত অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না। আর
তোরা চারিদিকে সদলবলে তরোয়াল বের

কবেই থাকবি। কেউ এলেই দিবি কোপ।
দেখিস্, ভুলে যেন আমার ঘাড়ে কোপ
দিসনে!— যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সগর। অরুণ ঘুমোচ্ছে। উঃ! কি ঘুমটাই
ঘুমুচ্ছে। ও যদি একবার এপাশ ওপাশ করে
উঃ আও করে, তা হলেও বুঝি জেগে আছে।
না আজ ঘুম হবে না। এই দুর্গে আমার
পূর্বপুরুষেরা থাকতো। তাদের যে খুব
সাহস ছিল, তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।—
প্রহরী।

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। জেগে আছিস্ ত বাবা! দেখিস্
যেন ঘুমোস্ নে। আর মাঝে মাঝে দুটো
একটা হাঁক ডাক দিস বাবা, যাতে বুঝি যে
তোরা জেগে আছিস্— যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সগর। অরুণ! অরুণ!

অরুণ। দাদা মশায়!

সগর। বেচ আছিস্ ত?— আচ্ছা ঘুমো!
আজ বাতটা একটু সজাগ ঘুমোস্ দাদা!
আমার ভয় বচ্ছে।

অরুণ। ভয় কি দাদা মশায়! ঘুমোন!

অপব পাশের ফিরিয়া নির্দ্রত

সগর। বেশ! তোমার আর কি? বলে
খালাস। এদিকে— ঐ আবার—প্রহরী! প্রহরী!
এ যা ঘুমিয়েছে—ঐ—ঐ—প্রহরী! অরুণ!
অরুণ!

অরুণ। কি? ঘুমুতে দেবেন না দাদা
মশায়!

সগর। ও কি শুনছিচ্ছিস্?

অরুণ। ও কড়। [পাশের ফিরিয়া
শুইলেন।

সগর। আর ও কখন ঝড় হয়! ঝড়ে
কখন কথা কয়! ও যে কথা বলছে! [সভয়ে]
ও! ও! ও!

অরুণ। কি দাদা মশায়!

সগর। ঐ ভূত!

অরুণ। সে কি দাদা মশায়—কৈ?

সগর্বসিংহ হাঁ করিয়া দূবে অঙ্গুলি-নির্দেশ
কবিলেন

অরুণ। কৈ আমি ত কিছু দেখছি না! দাদা মশায়, আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন।

সগর। [দূরে লক্ষ্য রাখিয়া] আমি আস্তে চাইনি। আমায় তারা জোর করে পাঠিয়েছে। না, আমি রাগা নই—রাগা অমর-সিংহ, আমায় বধ কোরো না—আমায় বধ কোরো না।

অরুণ। দাদা মশায়! দাদা মশায়!

সগর। ও কে! চিতোরের রাগা ভীমসিংহ! জয়মল! প্রতাপ!—না, আমি কাল এ দুর্গ ছেড়ে যাব। অমন করে আমার পানে চেয়ো না! এরা কারা, এরা কারা—মেরো না, মেরো না।

এই বলিয়া সগরসিংহ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। অরুণ তাঁহাকে ধরিলেন। প্রহরী প্রবেশ করিল

অরুণ। জল আন প্রহরী! দাদা মশায় মর্চ্ছিত হয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন।
মানসী ও কল্যাণী

মানসী। আমি এখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছি, কল্যাণী! তাতে এরই মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। আহা বেচারীরা কি দুঃখী!

কল্যাণী। আপনার জীবন ধন্য।

মানসী। আমার প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও।

কল্যাণী। আপনাকে কি এ কাজে কেউ বাধা দেন?

মানসী। বাবা বাধা দেন না, আর সবাই দেন। বলেন—রাজকন্যার এ সব শোভা পায় না। যেন রাজকন্যার সুখী হ'তে নাই।

কল্যাণী। এ কি বড় সুখ?

মানসী। বড় সুখ কল্যাণী। পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী ক'রবার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। হিংস্র জন্তুর মত সে চেষ্টা নিজের সন্তানকে নিজে ভক্ষণ করে।

কল্যাণী। দাদাও তাই বলেন। তিনি

আপনার শিষ্য কি না। তিনি প্রায়ই আপনার নাম করেন।

মানসী। করেন?

কল্যাণী। তিনি আপনাকে পূজা করেন বলেই হয়। তিনিও আমায় বলেছেন—“তুমি তাঁর আত্মার হরিন্দ্বারে গিয়ে মাঝে মাঝে তীর্থস্থান ক'রে এসো।”

মানসী। তিনি নিজে আর আসেন না কেন? তাঁকে আস্তে বোলো কল্যাণী। আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখতে ইচ্ছে করে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজকুমারী! এক ছবিওয়ালী এসেছে।

মানসী। ছবি বিক্রয় করে?

পরি। হাঁ।

মানসী। নিষে এসো।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

মানসী। তোমার দাদা সমস্ত দিন কি করেন?

কল্যাণী। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁকে দেখি না। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন—অমুক রোগীর সেবা কর্তে গিয়েছিলেন, কি অমুক আর্ন্তকে সান্না দিতে গিয়েছিলেন। এই রকম একটা কিছু বলেন।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ

মানসী। তুমি ছবি বিক্রয় কর?

ছবিওয়ালী। হাঁ, মা।

মানসী। দেখ তোমার ছবিগর্দল।

ছবিওয়ালী মোট নামাইয়া ছবিগর্দল বাহির করিতে লাগিল। মানসী ইত্যবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তোমার বাড়ী কোথায়?”

ছবিওয়ালী। আগ্রায়।

মানসী। এতদূর এসেছ ছবি বিক্রয় কর্তে?

ছবিওয়ালী। আমরা সব জায়গায়ই যাই মা।

মানসী। এ ছবিটা কার?

ছবিওয়ালী। সম্রাট আকবর-সাহার!

কল্যাণী। সম্রাট আকবর-সাহার! দেখি,—
উঃ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

মানসী। কিন্তু তাতে যেন একটা স্নেহ
আর অনুকম্পা মাখান।—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহারাজ মানসিংহের।

কল্যাণী। এ মুখখানিতে যেন একটা
বিষাদ আর একটা নৈরাশ্য আছে।

মানসী। একটু চিন্তাকুল বটে। কিন্তু তার
সঙ্গে বেশ একটু আত্মমর্যাদা আছে দেখেছ?
—এটা?

ছবিওয়ালী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের।

কল্যাণী। কি দাম্ভিক চেহারা!

মানসী। সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রতিভাও
আছে।—এটি কার চেহারা?

ছবিওয়ালী। এটি মোগল-সেনাপতি খাঁ
খানান হেদায়েৎ আলিখাঁর। কি সুন্দর চেহারা
দেখুন রাজকুমারী!

মানসী চেহারাখান স্কণেক দেখিয়া হাস্য
কবিতা উঠিলেন

কল্যাণী। হাসছেন যে!

মানসী। দেখ কি নিষ্কর্ণের মত চেহারা।
আর চেহারার সে কি ভীষণমা! ঘাড়টি বাকান,
কোঁকড়া চুল, মধ্যে সিঁথি—রমণীমত যতদূর
পুরুষের চেহারা করে তোলা যায়—তাই।—
একে বর্ষর, মূর্খ, অহঙ্কারীর মত দেখাচ্ছে।
—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহাবৎ খাঁর।

মানসী। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর? দেখি।
[স্কণেক দেখিয়া] প্রকৃত বীরের চেহারা। কি
উচ্চ ললাট কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! এমন তেজ, দৃঢ়-
পণ, ঔদার্য, আত্মাভিমান প্রায় একত্রে লক্ষিত
হয় না। কি কল্যাণী! একদৃষ্টে দেখেছ
কি?

কল্যাণী। “না”।—এই বলিয়া শিব নত
কবিলেন।

মানসী। ওগুর্লি কার ছবি?

ছবিওয়ালী। বাদশাহের ওমরাওদের।

মানসী। যাক্, আমি এই আকবরের,
জাহাঙ্গীরের, মানসিংহের, আর মহাবৎ খাঁর
ছবি ক'খানি নিলাম।—দাম কত?

ছবিওয়ালী। যা দেন।

মানসী অঞ্চল হইতে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা বাহিব
করিয়া তাহাকে দিলেন

—“এই নাও।”

ছবিওয়ালী। মুদ্রার উপর রাণা অমর-
সিংহের মূর্তি না?

মানসী। হাঁ।

ছবিওয়ালী। আপনার ছবি একখানি পাই না?

মানসী। আমার ছবি নাই।

ছবিওয়ালী। কখন কেহ নেয নাই?

মানসী। না।

ছবিওয়ালী। তবে আমি নেই যদি অনু-
মতি করেন।

মানসী। আমার ছবি? কেন?

ছবিওয়ালী। এমন করুণা-মাখান মুখ
আমি কখন দেখি নাই। আমি ভাল আঁক্তে
জানি না, তবে এ মুখখানি বোধ হয় আঁক্তে
পার্বী।

মানসী। না—কাজ নাই।

ছবিওয়ালী। কেন বাজকুমারী!— কি
আপত্তি?

মানসী। না—আপত্তি আছে।—তুমি এখন
তবে এসো।

ছবিওয়ালী। আচ্ছা তবে আমি আসি
রাজকুমারী।

মানসী। এসো।

[ছবিওয়ালীর প্রস্থান।

মানসী। এত মনোযোগের সহিত কার
চেহারা দেখেছো কল্যাণী?

কল্যাণী। না। [ছবিগুর্লি উল্টাইয়া
মানসীর হাতে দিলেন।

মানসী। আমি সে ছবিখানি বার ক'বে
দেবো? বাছিয়া একখানি ছবি কল্যাণীকে
দিয়া।—এইখানি না? নেও এ ছবিখানি—এত
লজ্জা-সংকোচ কিসের জন্য, কল্যাণী? তিনি
ত তোমার স্বামী।

কল্যাণী। [অধোবদনে] তিনি বিধম্মী।

মানসী। এই কথা? ধম্ম কল্যাণী! যেমন
সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই বকম সব
ধম্ম সেই এক ধম্মের সন্তান। তবে তাদের
মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না!
পৃথিবীতে ধম্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে,
আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

কল্যাণী। তাঁকে ভালোবাসায় আমার পাপ নেই?

মানসী। ভালোবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত, তাকে ভালোবাসায় তত পুণ্য! যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্যের কিরণ উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়ে নি। তার উপরে মহাবৎ খাঁ অধাশ্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজ-বাজিতে পাপী হয়ে গেলেন?

কল্যাণী। আজ হতে আপনি আমার গুরু।

মানসী। প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই; প্রেমের রাজ্যে পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন বাবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ-উচ্ছ্বাসিত সৌন্দর্য্য! মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর। কি দেখছেন কল্যাণী!

কল্যাণী। —[এতক্ষণ নিব্বাক বিস্ময়ে মানসীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মানসী' আকস্মিক প্রশ্নে যেন তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন—] “রাজকুমারী! আপনার হৃদয়খানি একটি সঙ্গীত—” [পরে কহিলেন] “আজ বিদায় হই রাজকুমারী! কাল আবার আসবো, যদি অনুমতি করেন।”

মানসী। এসো কল্যাণী। কাল আবার এসো। আর অজয়কে আসতে বোলো।

কল্যাণী প্রস্থান করিলে পবে মানসী গাহিলেন—

গীত

প্রেমে নর আপন হারায, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন দানে প্রেমের হয় না
ক্ষয়।

প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জ কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পার্থী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিলে সাগর
জলে,

প্রেমে কঠিন পাষণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্য আসে নেমে, মর্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগনভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়!

রাণীর প্রবেশ

রাণী। মানসী!

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন।

মানসী। কেন মা?

রাণী। তোমার বিবাহের ত একটা দিন স্থির কর্তে হবে—তোমায় জিজ্ঞাসা কর্তে চান। আমার কথা তাঁর গ্রাহাই হ'ল না।

মানসী। আমার বিবাহ?

রাণী। যোধপুরের রাজপুত্র কুমার যশো-বন্তসিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের যে সব ঠিক। তবে বিবাহের দিন-স্থির কর্তে মহারাজের কাছে লোক যাচ্ছে।

মানসী কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাণী। সে কি! কাঁদ কেন?

মানসী। না, কাঁদছি না।—মা, আমি বিবাহ কর্তে না।

রাণী। বিবাহ কর্তে না? সে কি?

মানসী। পরিণয়েব গন্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখবো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়!

রাণী। তা কি হয়—কুমারী হয়ে কি আর থাকা চলে!

মানসী। কেন চলবে না মা!—বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য কর্তে পারে, আর বালিকা কুমারী ব্রহ্মচর্য্য কর্তে পারে না? আমি ব্রহ্মচর্য্য কর্তে আমি বাবাকে গিয়ে বলছি।

[প্রস্থান।

রাণী। এ কি রকম! মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? যাবে না? রাণা ত দেখবেন না। যা ভয় করছিলাম—এই যে রাণা আসছে। আজ বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবো।

রাণার প্রবেশ

রাণা। রাণী! মানসী কোথায়?

রাণী। সে ত তোমার কাছেই গেল না? রাণা, মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

রাণা। ক্ষেপে গেল?

রাণী। গেল বৈ কি। বলে সে বিবাহ কর্তে না। বলে যে সে ব্রহ্মচর্য্য কর্তে।

রাণা। ও! বদ্বোছি।

রাণী। আমি বলিছিলাম যে মেয়েটাকে

একটু শাসন কর। করলে না। তাই সে এ রকম অশায়েস্তা হয়েছে।

রাণা। রাণী! তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারছ না।

রাণী। খুব পারছি!—ক্ষেপে গেল।

রাণা। এ ক্ষেপার্মি তোমার থাকলে রাণী, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্তাম।

রাণী। নেও! 'এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।'

রাণা। রাণী! আমি যে খুব বুঝতে পারছি, তা নয়। তবে এটা বুঝছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছুর।

রাণী। তা যদি—

রাণা। কোন কথা ক'য়ো না রাণী। দেখে যাও। শূদ্র দেখে যাও।

[প্রস্থান।

রাণী। হয়েছে! মানসীর এ ক্ষেপার্মি পৈতৃক। আমার ভবিষ্যৎটা খুব উজ্জ্বল বলে' বোধ হচ্ছে না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর।

কাল—মধ্যাহ্ন।

একখানি ছবি দেওয়ালে লম্বিত ছিল। তার কিয়দূরে দাঁড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ-হস্তে কল্যাণী ছবিখানি দেখিতেছিলেন

কল্যাণী। প্রিয়! প্রিয়তম আমার! আমার যৌবননিকুঞ্জের পিকবর! আমার সুসুপ্তির সুখ-জাগরণ! আমার জাগ্রতের সোনার স্বপ্ন তুমি! তুমি আমার জগৎকে নতুন বর্ণে রঞ্জিত করেছে; আমার সামান্য জীবনকে রহস্যময় করে' গড়ে' তুলেছ' প্রভাতের সূর্য্য তুমি—কনক চরণক্ষেপে আমার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করেছ। হৃদয়ের বাজা তুমি—এসে আমার হৃদয়ের সিংহাসনখানি অধিকার করেছ। আশা তুমি—আমার জীবনের নৈরাশ্যকে মুখ তুলে চাইতে শিখিয়েছ। হে চির-মধুর! হে চির-নতুন! স্বামী আমার, দেবতা আমার, চির-জীবনের তপস্যা আমার!—[এই বলিয়া কল্যাণী সেই চিত্রকে পুষ্পের অঞ্জলি দিলেন।

গোবিন্দসিংহ ইতিমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার সেই পূজা দেখিতে-ছিলেন। এখন গম্ভীরস্বরে কল্যাণীকে ডাকিলেন -] "কল্যাণী!"

কল্যাণী [ফিরিয়া] বাবা!

গোবিন্দ। ও কার চিত্র?

কল্যাণী। আমার স্বামীর।

গোবিন্দ। তোমার স্বামী?—মহাবৎ খাঁ?

কল্যাণী। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। এ চিত্র এখানে?

কল্যাণী। আমি আজ ঐ চিত্রটিকে এখানে উদ্ভেদ টাঙ্গিয়েছি—তাঁকে পূজা কর্বে' বলে'।

গোবিন্দ। পূজা কর্বে' বলে'?

কল্যাণী। হাঁ বাবা, পূজা কর্বে' বলে'!—কেন বাবা, তাতে কি অপরাধ? বাবা, ক্রুদ্ধ হবেন না। [পদতলে পিড়িলেন]

গোবিন্দ। মহাবৎ খাঁ তোমার কে?

কল্যাণী। [উঠিয়া] মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী।

গোবিন্দ। তোমায় বার বার বলি নাই কন্যা, যে তোমার স্বামী নাই?

কল্যাণী। পূর্বে তাই বুঝেছিলাম! এখন বুঝেছি, যে আমার স্বামী আছেন।

গোবিন্দ। স্বামী আছে? বিধর্মী মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। বাবা! আমি ধর্ম জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহবন্ধনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে, সেদিন আমরা দুইজন এক হয়ে-ছিলাম। কার সাধ্য আর সে বন্ধন ছিন্ন করে।

গোবিন্দ। মহাবৎ যখন হ'য়ে যে বন্ধন স্বয়ং ছিন্ন করে নাই?

কল্যাণী। না তিনি মুসলমান হ'য়েও আমায় গ্রহণ কর্তে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দ। গ্রহণ কর্তে চেয়েছিলেন! যখন হ'য়ে তারপর গোবিন্দসিংহের কন্যাকে গ্রহণ করা না করা মহাবৎ খাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা? কল্যাণী! মহাবৎ যে দিন হিন্দুধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল, সেই দিন সে তোমায় পরিত্যাগ করেছিল।

কল্যাণী। না, তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই।

গোবিন্দ। পরিত্যাগ করেন নাই? এখনও তোমার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নি।—তবে শোন। তুমি মহাবৎ খাঁকে পত্র লিখেছিলে?

কল্যাণী। লিখেছিলাম।

অজয়সিংহের প্রবেশ

গোবিন্দ। হা অদৃষ্ট! [স্বীয় ললাটে করাঘাত করিলেন] মহাবৎ সে পত্র ফেরত পাঠিয়েছে—আর তার উপর এই কটা কথা লিখেছে এই মাত্র—“কল্যাণী, আমি তোমায় গ্রহণ কর্তে পারি না।” এই অপমানটুকু যেচে না নিলে চলছিল না? এই নাও সে পত্র। [পত্র ফেলিয়া দিলেন। কল্যাণী আগ্রহসহকারে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সোৎসুক্যে দোঁখতে লাগিলেন।]

গোবিন্দ। কি অজয়! সংবাদ ঠিক?

অজয়। হাঁ সংবাদ ঠিক পিতা। মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে।

গোবিন্দ। এবার সেনাপতি কে?

অজয়। সাহাজাদা পরভেজ।

গোবিন্দ। কত সৈন্য?

অজয়। প্রায় লক্ষ।

গোবিন্দ। যাক্—এবার সব যাবে। মেবারের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিচ্ছিল—এবার সে যাবে! কি কল্যাণী! অধোবদনে রৈলে যে?

কল্যাণী। আমি কি বলবো বাবা?

গোবিন্দ। এখনও কি মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। শতবার। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে স্বামীকে ত সকল স্ত্রীই পূজা করে। প্রকৃত সাধবী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা-দু'খানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই,—যার পতিভক্তি অন্ধ-কারে চন্দের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্ষ্বতের মত দৃঢ়, বিবর্তনে ধুবতারার মত স্থির;—যার পতিভক্তি সর্বকালে, সর্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ;—সেই সাধবী স্ত্রী। মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা;—তা তিনি

আমায় পায়ে রাখুন বা নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।

গোবিন্দ। একই কথা? কল্যাণী! তুমি আমার কন্যা না?

কল্যাণী। হাঁ পিতা। আমি আপনার কন্যা। আপনার গৌরব আমি অক্ষুণ্ণ রাখবো। বাবা! আজ আমি একটা গরিমা অনুভব করিচ্ছি। আজ আমি দেখাবার একটা মহৎ সুযোগ পেয়েছি, যে আমি তাঁর সাধবী-স্ত্রী। আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলিচ্ছি।—আর আমায় রাখে কে?—[কল্যাণীর স্বর আবেগে কাঁপতে লাগিল।]

গোবিন্দ। উৎসর্গ! তোমার এই কুলটা প্রবৃত্তিকে উৎসর্গ বল কন্যা!

অজয়। বিবেচনা করে' কথা কইবেন পিতা! আপনি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে কি বলছেন, আপনি জানেন না। নইলে যা অতি মহৎ, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র, তাকে আপনি এত কুৎসিত মনে করছেন কেন আমি বদ্বৃতে পারিচ্ছি না।

কল্যাণী। [সগর্বে] দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!

গোবিন্দ। আমি একশতবার বলি নাই অজয়, যে, কল্যাণীর স্বামী নাই?—যে সে বিধবা?

কল্যাণী। আর আমিও প্রয়োজন হয়ত একশতবার বলতে প্রস্তুত, যে জীবনে-মরণে মহাবৎ খাঁই আমার স্বামী!

গোবিন্দ। এই মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?—এই ঘৃণ্য, নীচ, অধমাদম—

কল্যাণী। পিতা! মনে রাখবেন যে তিনি আপনার ঘৃণ্য হলেও আমার পূজ্য।

গোবিন্দ। পূজ্য? এই জাতিদ্রোহী বিধব্মণী মহাবৎ খাঁ গোবিন্দসিংহের কন্যার পূজ্য—হা অদৃষ্ট!

কল্যাণী। পিতা! আমি পিতা বদ্বি না, জাতি বদ্বি না, ধর্ম বদ্বি না। আমার ধর্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম শাস্ত্রকারেরা আমার জন্যে লেখেন নি। পিতা! নারী যখন একবার কাঁপিয়ে পড়ে—সে অমৃতের সমুদ্রেই হউক, আর গরলের সমুদ্রেই হউক—সেইখানেই তার

জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল। মহাবৎ খাঁ হিন্দু হোন, মুসলমান হোন, নাস্তিক হোন, তিনি আর আমি একই পথের পাঁথক। তার সঙ্গে যদি এর জনো নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। তবে তাই যাও। যথা ইচ্ছা যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ করলাম।

অজয়। সে কি পিতা! আপনি কি কচ্ছেন? কল্যাণী আপনার কন্যা-

গোবিন্দ। আমার কন্যা নাই—যাও কল্যাণী! তোমার স্বামীর কাছে যাও।

কল্যাণী। পিতার আজ্ঞা শিবোধার্য্য। তবে আমায় বিদায় দিউন পিতা! [কল্যাণী গোবিন্দসিংহকে প্রণাম করিলেন]

অজয়। পিতা! বিবেচনা করুন। এরূপ অন্যায় কচ্ছেন না! কল্যাণী নারী। যদি সে ভ্রম করেই থাকে, অপরাধ করেই থাকে, তাকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ। পুত্র! কল্যাণী নরকে যেতে চায়। যাক্! আমি তাতে বাধা দিতে চাই না।

অজয়। তার সে নরক নয় পিতা। যেখানে প্রেমের পুণ্যলোক, সেইখানেই স্বর্গ।—হেলায় এ বড় হারাবেন না। আপনি কি কচ্ছেন, আপনি জানেন না।

গোবিন্দ। বেশ জানি অজয়!—কল্যাণী! যে অস্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান নাই। তোমার ধর্ম যদি “পতি”—আমারও ধর্ম “দেশ”। যাও—[পশ্চাৎ ফিরিলেন]

কল্যাণী। যে আজ্ঞা পিতা।

চলিয়া যাইতে উদাত

অজয়। দাঁড়াও কল্যাণী। পিতা! তবে আমাকেও বিদায় দিউন।

গোবিন্দ। [সম্মুখে ফিরিয়া] সে কি অজয়?

অজয়। আমি এই অবলা বালিকাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমিও এর সঙ্গে যাব।

গোবিন্দ। তোমায় আমি গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করি নি অজয়।

অজয়। আমিও তার অপেক্ষা করি নাই, পিতা! কল্যাণী নারী। আপনি তাকে তার পুণ্যের জন্য গৃহ হ'তে দূর করে' দিয়ে তাকে এই হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে ছেড়ে

দিচ্ছেন। এ সময়ে যদি তার স্বামী থাকতো, ও সে তাকে রক্ষা করতো। তার স্বামী কাছে নাই, কিন্তু তার ভাই আছে। সে তাকে এ বিপদে রক্ষা করবে—এসো কল্যাণী! আজ আমার ভাই ও ভগ্নী এ অকূল বাত্যাবিষ্কৃৎ সংসার-সমুদ্রে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিলাম। দেখি কূল পাই কি না! পিতা, প্রণাম হই। [প্রণাম। অজয় ও কল্যাণী চলিয়া গেল। গোবিন্দসিংহ প্রস্তুতবর্ম্মান্তবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—চিত্তোরের সন্নিক্ত অবণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

সগরসিংহ ও অরুণসিংহ একটা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। দূরে একটি পাহাড়ের পর্বপাবে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল

সগর। আমার এ রাজ্যে একটুকুও থাকবার ইচ্ছা নাই। চিত্তোর দুর্গটা যেন একটা জেল-খানা;—পুরানো, সেংসেংতে, আর অন্ধকার। আর এর চারিদিকে পাহাড়, আর গাছ; জন-মানব নেই। আর এত বড়ো গাছও কোথাও দেখিনি। আমি আগ্রায় ফিরে যাবো, অরুণ।

অরুণ। আমার কিন্তু এ জায়গা বেশ লাগে, দাদা মশায়। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্বপূর্বের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। অতীত গৌরব-কাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না, দাদা মশায়?

সগর। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো! ওরে কুস্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত, অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্ নে। মর্ষিব।

অরুণ। কেন দাদা মশায়? আমার কাছে বর্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুস্মাটিকা ঘিরে আছে। অতীত যেন—ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর। মরেছে! যা ভেবেছি তাই! যত বড় হচ্ছে, তত মায়ের আকার ধারণ কচ্ছে।—ওরে ওরকম করিস্ নে। ঐ ক'রেই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন?

সগর। হাঁ দাদা। সেই ত হল তার কাল।

সে "মেবার" "মেবার" করে ক্ষেপে বোরিয়ে গেল।

অরুণ। আমি তাঁকে খুঁজে বার করবো।

সগর। এই জঙ্গলের মধ্য থেকে? দাদা, এই জঙ্গলের মধ্যে যদি সূর্য্য ডুবে থাকতো, তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হ'ত। তেব মা তো মা।

অরুণ। না দাদা মশায়! আর আমি আগ্রায ফিরে যাব না, আপনি যাবেন ত যান। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। যখন আমার মা এই দেশে তখন এই আমার ঘর। আগ্রায এত দিন আমি নিব্বাসিত ছিলাম।

সগর। যা ভেবেছি তাই! আগ্রায বাদ্‌সার নতুন সাদা পাথরের বাড়ী দেখিস্ নি বুক্ চল্ তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ। আমি তা দেখতে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নিষ্কর্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর। আগ্রায় আটাত্তোরটা মস্‌জিদ আছে। একেবারে নতুন ঝক্‌ঝক্‌ কচ্ছে।

অরুণ। দাদা মশায়! আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ-মস্‌জিদের চেয়ে আমার দেশের একটি ভগ্নমন্দির প্রিয়তম। মোগলের পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকাস্ন খাওয়া ভাল!—দাদা মশায়! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে? তারা, আপনাকে নিত্য স্বর্ণ-মুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধুলো মিশে আছে! তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উর্পকি মাচ্ছে। আমার কাছে দাদা মশায়, পরের দত্ত স্বর্ণ-ভান্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। বেঁচে থাক বাপ্! এই কথার মত কথা!

সগর। কে সত্যবতী! এ কি স্বপ্ন! না—সত্যবতীই ত! তুমি এখানে মা!

সত্য। যে দিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে

ঘর ছেড়ে বোরিয়েছিলাম, তখন বৎস, তোর ছোট হাত দু'খানির বন্ধন ছিড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াই, তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর বোধ হয়! তুই এখানে এসেছিস শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি ছুটে তোকে দেখতে এলাম। এতক্ষণ অন্তরাল থেকে তেব সুধাবাণী শুনছিলাম, ভাবছিলাম—এ কি মন্তের সঙ্গীত! এও পৃথিবীতে আছে! তাব'পবে শেষে আব লুর্কিয়ে থাকতে পাবলাম না!—পুত্র আমার! সর্বস্ব আমার!

সত্যবতী হাত বাড়াইলেন

অরুণ। মা! মা!

সত্যবতীকে জড়াইয়া ধাবলেন

সগর। সত্যবতী! মা আমার! আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখলিনে! আমি কি অপরাধ করেছি?

সত্য। কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা বুক্‌বার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হত-সর্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন;—যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির বিচূর্ণ, তীর্থ অপ-বিগ্র, নারী জাতিকে লাঞ্চিত, আর তার পুরুষ-জাতিকে মনুষ্যহীন করেছে; যে মোগল, দর্পে সফীত হ'য়ে এখন রাজপুতানার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে, তাব শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে আপনি সেই মোগলের কুপাদত্ত স্পর্ধায় আপনার ভায়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপ-সিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত কর্তে বসেছেন! তব, বলছেন কি অপরাধ! যাক, পিতা, আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি।—এসো পুত্র! এ অন্ধকারে, এ দুর্দ্দিনে তুমিই আমার সহযাত্রী—আজ হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পেয়েছি! এস পুত্র!

অরুণকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত

সগর। যাস্নে সত্যবতী, যাস্নে অরুণ। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। আমার আজ চোখ

ফুটেছে। আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত কৃপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম! আয় মা, আমার বন্ধুকে আয়।

সত্য। সে কি পিতা! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে, যে এক মূহুর্তে, এক সঙ্কে, আমার পিতা ও পুত্র ফিরে পাবো! সত্য! সত্য!

সগর। সত্য সত্যবতী! আমি আগে বন্ধুতে পারিনি। আমায় তুই ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

সত্য। বাবা! বাবা!

সত্যবতী এই বলিয়া নতজানু হইয়া পিতৃপদে
প্রণতা হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের সভাগৃহ। কাল—প্রভাত।
সামন্তগণ দাঁড়াইয়া কথাবার্তা করিতেছিলেন

জয়সিংহ। এই কামানের যুদ্ধ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

গোকুলসিংহ। পরভেজের রসদের পথ বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ভূপতি। তিনি এই বন্যপথের অস্তিত্ব বোধ হয় অবগত ছিলেন না।

গোকুল। কিন্তু পালাবার পথটা বেশ জানতেন।

জয়। আজ মেবারের গৌরবময় প্রভাত। দেখ কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়ভূমি উদ্ভাসিত।

ভূপতি। এই সুন্দর মারুত, এই বিজয়-বার্তা ভারতময় রাষ্ট্র করুক।

রাণা অমরসিংহের প্রবেশ

সকলে। জয় রাণা অমরসিংহের জয়!

রাণা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন
রাজকবি কিশোরদাস প্রবেশ করিলেন ও রাণার
জয়গীতি গাহিলেন

গীত

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস'

ধরা অসীম প্রতাপে
তব শৌর্যে যক্ষ রক্ষ অসুর নর—বিভূবন কাঁপে।

তব মহিমা গায় জয়গান
করে মেঘ মৃদঙ্গ গঞ্জর্ন;
করে আরাতি আকাশে রবিশশী, টলে মহীধর তব
পদদাপে।

রাণা। কিশোরদাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ জুড়ে দিও।

কিশোরদাস। কি মহারাণা?

রাণা। "সবই যাবে তব পাপে।"

জয়। কেন রাণা?

রাণা। [ঈষৎ হাসিয়া।] কেন?—জিজ্ঞাসা কর্ছ?—দেখে নিও।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মেবারের রাণার জয় হউক।

রাণা। কে? ভগিনী সত্যবতী? [সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।]
—"এসো বোন।"

সত্য। মহারাণা! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই মেবারের বিজয়গাথা শুনছিলাম। শূন্যে শূন্যে চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুজলে ভরে এলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। লঙ্কাজয়ের পর মহারাণার পুর্বপুরুষ ভগবান্ রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার পর গান থেমে গেল। বোধ হ'ল যে, কোন্ দেবী এসে তাকে তাঁর আভা দিয়ে নিজের স্বর্গ-রাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন! আমি স্বপ্নোচ্ছিতের ন্যায় জেগে উঠলাম।

রাণা। গান এই রকমেই থেমে যায়—সত্যবতী। সব গানই একটা আনন্দ কোলাহলের মত উঠে; আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসে মিলিয়ে যায়।

সত্য। সে কি রাণা! এই আনন্দের দিনে, আপনার এই নিরানন্দ চাউনি, এই বিরস আনন কেন? রাণা! আপনি আপনার এই নৈরাশ্য, প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আজ মেবারের গৌরবময় দিন।

রাণা। গৌরবের দিন বটে। একটা নতুন সংবাদ সত্যবতী। আমরা এ কামানের যুদ্ধ জিতিনি।

সত্য। আমরা জিতিনি? সে কি!—তবে মোগল জিতেছে?

রাণা। না রাজপুত্রই জিতেছে। কিন্তু আমরা—যারা এখানে এই জয়োৎসব করছি, তারা এ যুদ্ধে জিতিনি। যারা এ যুদ্ধে জিতেছে, তারা সব সমরক্ষেত্রে পড়ে আছে। প্রকৃত যুদ্ধ জয় তারা করে না সত্যবতী,—যারা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি কর্তে কর্তে যুদ্ধ হ'তে ফেরে; আসল যুদ্ধজয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে!

সত্য। সে কথা সত্য রাণা। তাদের কীর্তি অক্ষয় হউক—রাণা, শূভ সংবাদ আছে।

রাণা। কি সংবাদ সত্যবতী?

সত্য। রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোর দুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নিশ্চিন্দে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।

রাণা। চিতোর দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন! কি বলছ সত্যবতী! এ কি সত্য! এ কি হ'তে পারে!

সত্য। এ কথা সত্য, রাণা!

রাণা। তিনি যে হঠাৎ এ দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিলেন? সম্রাটের আজ্ঞায়?

সত্যবতী। না। তিনি সম্রাটের আজ্ঞা নেন নি। তাঁকে সম্রাট চিতোর দুর্গ দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সে দুর্গ অর্পণ কর্তে পারেন। পিতা অন্তত-চিত্তে এই দুর্গ রাণাকে দিয়ে—আগ্রায় ফিরে গিয়েছেন।

রাণা। সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কর। স্বর্গীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁর পুত্রের বাহুবলে নয়, তাঁর মাতার দানে। দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।

সত্য। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

সামন্তগণ। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গ্রাম্যপথপার্শ্ব একখানি অন্ধভগ্ন কুটীর।
কাল—সায়াক্ষ।

কল্যাণী ও অজয় সেই পথে আসিতোছিলেন

কল্যাণী। আর হাঁটতে পারি না দাদা!

অজয়। আজ এই গ্রামেই আশ্রয় নেবো।

এই কুটীরটি গ্রামের বাহিরে। বোধ হয় দোকান। দবোজা নাই। ভিতরে অন্ধকার।

কল্যাণী। ডাক দেখি।

অজয়। কে আছ? ভিতরে কে আছ?—কোন উত্তর নাই। কুটীরটি পরিত্যক্ত বোধ হচ্ছে।

কল্যাণী। আজ এইখানেই থাকি। আর হাঁটতে পারি না।

অজয়। বেশ। তুমি তবে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে আলো নিয়ে আসি।

কল্যাণী। যাও, আমি আর এক পাও মড়তে পারি না। আমি বড় ক্ষুধার্ত হয়েছি দাদা!

অজয়। আমি কিছু খাবার নিয়ে আসছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

কল্যাণী। শীঘ্র এসো দাদা, একা আমার ভয় করে।

অজয়। আমি যত শীঘ্র পারি আসবো, ভয় কি! এখানে জনমানব নাই।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। কখন পথ হাঁটি নাই। তাই পথ হেটে আসতে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এতেই আমার কি আনন্দ! এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখে দৈন্যে আমি যেন একটা অসীম গর্ভ অনুভব করছি। নদী যেমন অপ্রতিহতগতি উত্তাল-তরঙ্গে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, আমি সেই রকম উদ্দাম-উল্লাসে আমার স্বামীর কাছে চলেছি। অথচ জানি না যে তিনি দাসীভাবেও আমায় তাঁর পায়ে স্থান দেবেন কি না।—কে তুমি?

ফকির-বেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। আমি রাজপুত্র। কোন ভয় নাই মা! আমি দেখছি, আপনি রাজপুত্র নারী। আপনি এখানে একা যে মা?

কল্যাণী। আমার ভাই একটা বাতি আর কিছু খাদ্য আনতে এখানে গিয়েছেন।

সগর। উত্তম। তবে তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। এই স্থানে মুসলমান সৈন্যের কিছু দৌরাখ্যা, আজ চার পাঁচ জনকে এখনি এই স্থানের নিকটে দেখেছি। তোমার ভ্রাতা ফিরে আসা পর্যন্ত আমি তোমায় রক্ষা করবো।

কল্যাণী। আমায় রক্ষা করুন!—আমার ভয় কচ্ছে।

নেপথ্যে। এই কুণ্ডে ঘরে?

নেপথ্যে। হাঁ এইখানেই। [দ্বারে আঘাত]

কল্যাণী। কেও?—দাদা! দাদা!

দস্মাগণের প্রবেশ

১ দস্মা। এই যে! এই যে!

৩ দস্মা। ধর্।

১ দস্মা। [কল্যাণীকে ধরিতে উদ্যত হইলে কল্যাণী দূরে সরিয়া গেলেন, কহিলেন—] “রক্ষা কর, রক্ষা কর।”

সগরসিংহ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—

“সাবধান!”

১ দস্মা। এ কে?

২ দস্মা। যেই হোক—মার একে।

সগরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ভূপাতিত হইলেন

কল্যাণী। দাদা! দাদা! দাদা!

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। ভয় নাই কল্যাণী! আমি এসেছি।

এই বলিয়া অজয়সিংহ ক্ষিপ্ৰহস্তে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দস্মাগণ ভূপাতিত হইল। অবশিষ্ট দস্মাগণ পলায়ন করিল

অজয়। এদের সব শেষ করেছি।—

আপনি কে?

কল্যাণী। ইনি আমার রক্ষা কর্ত্তে এসে আহত হয়েছেন।

সগর। তোমরা কে?

অজয়। আমি গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহ। ইনি আমার ভগ্নী কল্যাণী।

সগর। সে কি! মহাবৎ খাঁর স্ত্রী কল্যাণী!

অজয়। হাঁ বীরবর, আপনি কে?

সগর। আমি সেই মহাবৎ খাঁর পিতা—সগরসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

মাড়বারপতি গজসিংহ, পারিষদ হরিদাস, গজরাজ পুত্র অমরসিংহ ও দূতবেশে অরুণসিংহ

গজসিংহ। দূত! বল মেবারের মহারাণাকে, যে আমি এ বিবাহে সম্মত হইতে পার্লাম না।

আমি সম্রাটের বিদ্রোহীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখতে চাই না—কি বল হরিদাস?

হরিদাস। অবশ্য। অবশ্য।

অরুণ। বিদ্রোহী কিসে মহারাজ? মেবার এখনও মোগলের পদানত হয় নাই। যে স্বাধীনতা সে এতদিন রক্ষা করে' এসেছে, সে স্বাধীনতা রক্ষা করবার চেষ্টা করার নাম বিদ্রোহ নয়।

গজ। এরই নাম বিদ্রোহ। সমস্ত রাজপুতানা অবনত-শিরে মোগলের প্রভু স্বীকার করে, কেবল একা মেবার মাথা উঁচু করে থাকবে?

অরুণ। বৃকোঁছ। মহারাজের হিংসা হচ্ছে! সব পর্বত-শিখর হাতে গৌরবময় রশ্মি নেমে গিয়েছে, শুদ্ধ যে এখনও মেবারের পর্বতের চূড়া ঘিরে থাকবে—সেটা মহারাজের সহ্য হচ্ছে না। সব রাজপুত্ররাজের শির উলংগ, কেবল মেবারের রাণার মুকুট যে তাঁর মাথায় থাকবে, এ দৃশ্য মহারাজের চক্ষুঃশূল হ'তেই পারে!—তবে মহারাজ! এ গৌরব থেকে ত রাণা আপনাদের বঞ্চিত করেন নি। আপনারা নিজেরাই নিজের বঞ্চিত করেছেন, এ রাণার দোষ নয়।

গজ। দূত! তোমার সাহস আছে। মহারাজ গজসিংহের সম্মুখে এ আত্মপক্ষার কথা আর কেহই কইতে পার্ত না। রাণা যদি এমন মূঢ়, উদ্ভত, উন্মাদ হন, যদি মনে করেন, যে তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত্র নিয়ে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, সে উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে।

অরুণ। সত্য বলেছেন মহারাজ! এ উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে। এ উন্মাদ হবার শক্তি আপনার নাই। মহারাজ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

গজ। দূত! তুমি অবধ্য, নহিলে—

অরুণ। এতটুকু মনুষ্য আপনার আছে। দূত অবধ্য এ কথা শিখেছেন কোথায় মহারাজ? আপনার মুখে এত বড় নীতি, এত বড় কথা!

গজ। দূত! আমার ধৈর্যের সীমা আছে। যাও, রাণাকে বলগে এ বিবাহে আমি অসম্মত। যাও—

অরুণ। যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলে' যাই মহারাজ!—আমি শুনোছি, আপনি বার বার সম্রাটের পক্ষ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেছেন, গুজ্জর জয় করেছেন। বোধহয় এবার মেবারেও আসবেন। আমি সেই নিমন্ত্রণ করে' গেলাম!

[প্রস্থানোদ্যত।

গজ। উত্তম, তাই হবে! দাঁড়াও দূত! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

অরুণ। কি? আমার বন্দী কবে'ন?

গজ। হাঁ দূত! অমর! দূতকে বন্দী কর।

অমর। সে কি পিতা! এ ও দূত! দূতের উপর অত্যাচার ক্ষত্রধর্ম নয়।

গজ। ধর্মধর্ম তোমার কাছে শিখতে আসিনি অমরসিংহ! আমাব আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

অমর। আমি এ অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন কর্তে স্বীকৃত নই।

গজ। স্বীকৃত নও? উদ্ভত বালক! শোন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু যদি অবাধ্য হও, ত ভবিষ্যতে এ রাজ্য তোমার নয়—এ রাজ্য আমার কনিষ্ঠপুত্র যশোবন্ত সিংহের।

অমর। আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বসবার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই—জানবেন। মোগলের পাদুকা শিরে বহিবার জন্য আমার কোন আগ্রহ নাই।

গজ। উত্তম! তবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে রাজ্য হতে নিস্করাসিত করলাম। যাও।

অমর। এই মূহুর্তে।

[প্রস্থান।

গজ। [ক্ষণেক পরে] যাও দূত! তোমায় বন্দী কবে'না।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি।

মহাবৎ একাকী

মহাবৎ। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি বটে, তবু তাকে এখনও মনে পড়ে। এখনও সেই প্রেমবিহীন চল চল কিশোর মূখখানি

মনে আসে। তখন মনে হয় কি রক্ত হারিয়েছি। কেন তার পত্র ফেরত পাঠিয়ে দিলাম? এত উচ্ছ্বাসের, এত নির্ভরের বিনিময়ে—আমার সেই তাচ্ছিল্য, সেই অবজ্ঞা, অনর্চিত, অপৌরুষ হয়েছিল। তখন কল্যাণীর পিতার প্রতি ক্রোধে তার উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম—এখন বদ্বতে পাচ্ছি। যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকত, ত করষোড়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্তাম।—কে?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। খোদাবন্দ! মহারাজ গজসিংহ হৃজুরের সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। গজসিংহ! যোধপুরের রাজা?

দৌবারিক। খোদাবন্দ!

মহাবৎ। এখানেই নিয়ে এসো—

[দৌবারিকের প্রস্থান।

মহাবৎ। মহারাজ গজসিংহ আমার ভবনে!—এই কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক—এই যে মহারাজ!

গজসিংহের প্রবেশ

গজ। আদাব।

মহাবৎ। বন্দেগ! মহারাজ গজসিংহ, এ দীনের ভবনে কি মনে করে'? কোন সংবাদ আছে?

গজ। সম্রাট আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহাবৎ। সম্রাটের অনুগ্রহ!—মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য বোধ হয়?

গজ। হাঁ খাঁ-সাহেব!

মহাবৎ। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁকে এ বিষয়ে আমার অভিমত জানিয়েছি; তথাপি বারবার তিনি আমাকে এরূপ সম্মানিত কচ্ছেন কেন, মহারাজ?

গজ। মেবারের রাণার কাছে এই বারংবার মোগল-সৈন্যের পরাজয়ে সম্রাট অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। এবার তিনি আবার আপনাকে অনু-রোধ কর্তে বাধ্য হয়েছেন। একা আপনিই তাঁকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর্তে পারেন। আপনি তাঁর ভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। কে বল্লে?

গজ। সকলেই জানে।

মহাবৎ। হুঁ—[কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন]

গজ। খাঁ-সাহেব! এবার আপনি মেবার-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি। জানি—আপনি রাণা অমর-সিংহের ভাই। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে আপনি সে মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম ত্যাগ করেছেন। মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থ আপনি মুসলমান হ'য়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ স্বেধ কেন?

মহাবৎ। [অর্ধস্বগত] যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত।

গজ। সে জন্মভূমি কি আর কখনও আপনাকে নিজের কোলে তুলে নেবে? যান দেখি আপনি আবার মেবারে। বন্ধুভাবেই যান। মেবারবাসী আপনার প্রতি তর্জনি নিদ্দেশ করে' বলবে—“ঐ প্রতাপসিংহের ভ্রাতৃপুত্র—বিধর্মী মুসলমান হয়েছে।” বৃদ্ধগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে। যুবকগণ রোষরক্তিম-নয়নে আপনার পানে চাইবে। নারীগণ গবাক্ষম্বার হ'তে আপনার প্রতি অভিশাপবর্ষি করবে। কোন আশা নাই খাঁ-সাহেব, যে, কোন দিন কোন কারণে রাজপুত্র আবার আপনাকে ভাই বলে' নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন করে নেবে।

মহাবৎ। হুঁ—[ভাবিতে লাগিলেন।]

গজ। আপনার ভবিষ্যৎ মোগলের সঙ্গে জড়িত। তার উন্নতির সঙ্গে আপনার উন্নতি, তার পতনের সঙ্গে আপনার পতন। ভেবে দেখুন খাঁ-সাহেব।

সন্ন্যাসীবেশে সগরাসংহের প্রবেশ

সগর। মহাবৎ!

মহাবৎ। এ কি! পিতা! এখানে! এ বেশে!

সগর। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। সে কি পিতা!

সগর। আশ্চর্য্য হচ্ছে, মহাবৎ!—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! দেশ, জাতি, ধর্ম

জলাঞ্জলি দিয়ে, ইহকাল হারিয়ে, চিরজীবনটা বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হ'য়ে জীবনের সন্ধ্যাকালে ফিরে দাঁড়িয়েছি, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়েছি কেন, জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। না পিতা—

সগর। ফিরে দাঁড়িয়েছি, কারণ এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনিয়েছি। কি গভীর! কি করুণ! কি গদগদ!—মায়ের সে আহ্বান! মহাবৎ!—তুমি তা কল্পনাও করতে পারো না—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আব তোমায় বলতে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

মহাবৎ। আমার পাপের!

সগর। হ্যাঁ, তোমার পাপের। আমি স্বজন ছেড়ে, সেধে মোগলের দাস হয়েছিলাম। তুমি তার উপর উঠেছ। তুমি ধর্ম পর্যন্ত ছেড়েছ। তোমার পাপের সীমা নাই।

মহাবৎ। পিতা! আমার পাপ কোন্ জায়গায় আমি বৃদ্ধিতে পাচ্ছি না। আমার যদি এই বিশ্বাস হয়, সে ইসলাম-ধর্ম সত্য—

সগর। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ! তোমার এই বিশ্বাস কিসে হ'ল পুত্র? কোরাণ পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম। হিন্দু-ধর্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের; ব্যাস, কর্ণিল, শঙ্করা-চর্কের সেই ধর্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? মুর্থ অনঙ্কর হ'য়ে এত ধর্মধর্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল! যে ধর্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্মের চরম বিকাশ সর্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ করতে যে ধর্ম নিষেধ করে; সেই ধর্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ!—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জান না।

মহাবৎ। পিতা। আমি বিস্ময়ে নিস্বাক হ'য়ে গিয়েছি, যে আপনি আজ—

সগর। যে আমি আজ ধর্মের ব্যাখ্যা করতে বসেছি! আশ্চর্য্য হবারই কথা! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই, সেই পাষণ্ড আমি এই হয়েছি;—

যে সংসারে অর্থ ছাড়া কিছুর বন্ধন নাই, সে ধর্মের জন্য সম্ম্যাস নিয়েছে! কিন্তু মহাবৎ খাঁ! এমন হৃদয় নাই যেখানে উচ্চ প্রবৃত্তির একটি তারও উঁচু সুরে বাঁধা নাই। একদিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলিপ্রহত হ'য়ে সহসা বেজে ওঠে, অর্মানি এক মূহুর্তে সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে দেয়। আত্মা তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের নির্ম্মক নির্ম্মুক্ত হ'য়ে অনন্ত আকাশের দিকে ছুটে চলে যায়। এ কথা কল্যাণী সেদিন বলেছিল।

মহাবৎ। কল্যাণী!

সগর। হাঁ, কল্যাণী সেদিন সে কথা বলেছিল। সে কথাটা এখনও আমার কানে সঙ্গীতের স্মৃতির মত বাজছে। জান মহাবৎ, যে কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন!

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন? — কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে, যে কল্যাণী এখনও তোমার—এক বিধর্ম্মীর পূজা করে।

মহাবৎ। তার সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হ'ল পিতা?

সগর। একটি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভগ্নকুটীরে।

মহাবৎ। এই আপনার উদার—অত্যাচার—হিন্দুধর্ম্ম পিতা!—মুসলমানের প্রতি তার এত ঘৃণা, এত তার দম্ভ, এত তার মুসলমান-বিশ্বেষ, যে কল্যাণীর প্রতিভক্তির পুরস্কার নির্ব্বাসন! প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার কথা বলেছিলেন না পিতা! হাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বা—কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয়, একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বা।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। পিতা! আজ থেকে হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পার শেষরেখা হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিলাম। আজ থেকে আমি প্রতি শিরায়, মঞ্জায়, স্নায়ুতে মুসলমান!

সগর। মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। যান পিতা! মহাবৎ খাঁ কম কথা কয়। আর সে যখন প্রতিজ্ঞা করে সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান পিতা! আর কোন উপদেশ, যুক্তি, আদেশ নিষ্ফল।

প্রস্থানোদ্যত

সগর। তোমার এতদূর অধোগতি হয়েছে মহাবৎ—তবে মর! এই অন্ধকূপে মর, পচ। স্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী কুলাঙ্গার!

[প্রস্থান।

[সগরসিংহ চলিয়া গেলে মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—] “এত বিশ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এঁদের উদার—অত্যাচার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম, আর যাই হোক, তার এ মহত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বন্ধু করে' আপনার করে' নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না। এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! এতদূর স্পর্ধা! এই অহঙ্কার যদি চূর্ণ করতে পারি!—মহারাজ! আমি মেবার যুদ্ধে যাব। সম্রাটকে বলুন গে যান।”

গজসিংহ সবিষ্ময়ে চাহিলেন

মহাবৎ। মহারাজ! আশ্চর্য্য হচ্ছেন? কেন জানেন?

গজ। কারণ আপনি সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয় মহারাজ। আমি যাব হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বা। তার উচ্ছেদ কর্ব্বা। যান, সম্রাটকে বলুন গে যান।

[গজসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, মহাবৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জাহাঙ্গীরের সভা। কাল—প্রভাত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সভাসদ, হেদায়েৎ-আলি খাঁ

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মরলেও যাবে না।

এত অপদার্থ পরভেজ! হারলে কি বলে!

হেদায়েৎ। জাহাপনা। আমি এ বিষয়ে

শপথ কর্তে পারি যে সাহাজাদার হারবার
আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তোমরা সবাই
অপদার্থ।

হেদায়েৎ। আজ্ঞে জাঁহাপনা! ঠিক অনু-
মান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তুমি যুদ্ধে হেরে
বন্দী হয়ে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে
এলে! আব্দুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে।
তুমি যুদ্ধে মর্তে পারলে না?

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা, আমার বরাবরই সেই
ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে
বিষয়ে আপত্তি করলেন।

জাহাঙ্গীর। চুপ—

সগরসিংহের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। এই যে রাজা সগরসিংহ।—
সগরসিংহ!—

সগর। সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে মেবারের রাণা করে'
চিতোর-দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর-
দুর্গে রাণা অমরসিংহের হাতে সমর্পণ করে
এসেছো?

সগর। হাঁ সম্রাট!

জাহাঙ্গীর। কার হুকুমে?

সগর। কারো হুকুমের অপেক্ষা রাখি নি
সম্রাট।

জাহাঙ্গীর। তবে?

সগর। আমি বুদ্ধলেম যে চিতোর ন্যায়তঃ
রাণা অমরসিংহের।

জাহাঙ্গীর। বুদ্ধলে?

সগর। হাঁ সম্রাট! আমি শুনলাম যে
সম্রাট আকবর ন্যায়যুদ্ধে চিতোর অধিকার
করেন নি। তিনি ছলে জয়মল্লকে বধ করে-
ছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তোমার এত ন্যায়-অন্যায়
বিচার কবে থেকে হ'ল রাজা?

সগর। যেদিন থেকে আমি একটা নতুন
আলোক দেখলাম!

জাহাঙ্গীর। নতুন আলোক দেখলে
বিশ্বাসঘাতক!

সগর। হাঁ সম্রাট। নতুন আলোক

দেখলাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা
যবনিকা উঠে গেল। সেই রামায়ণের যুগ থেকে
মেবারের একটা গৌরবময় অতীত আমার
চক্ষের সামনে দিয়ে ভেসে গেল।—বাম্পা-
রাওয়ার বিজয় কাহিনী, সমরসিংহের আত্ম-
বলি, চণ্ডের ত্যাগ, কুম্ভের শৌর্য্য—এর একটা
মহামাহিম অভিনয় দেখলাম। হঠাৎ একটা
কুর্বাটিকায় সেই দীপ্ত রংগমণ্ড ছেয়ে এলো।
আর সেই কুর্বাটিকার মধ্য দিয়ে প্রতাপসিংহের
—আমারই ভাই প্রতাপসিংহের—থুঙ্গ ঝলসাতে
লাগলো। আমার মনে ধিক্কার হ'ল!

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। ধিক্কার হ'ল, যে সেই বংশেরই
আমি সেই গৌরবকে ধ্বংস করবার জন্য তার
আততায়ীর সঙ্গে একটা নারকীয় ষড়যন্ত্রে
যোগ দিয়েছি। তবু আমার মনকে বোঝাবার
চেষ্টা করলাম যে, উচিত কাজ করছি। তার
পরে একদিন দেখলাম—কি দেখলাম
জাঁহাপনা, সে অপূর্ব দৃশ্য!—

তিনি প্রায় গর্বে কাঁদিয়া ফেলিলেন

জাহাঙ্গীর। কি, শূনি!

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়,
ইতিহাস নয়। দেখলাম যে আমারই কন্যা—এই
অধম মোগলের-উচ্ছৃঙ্খলভোজীরই কন্যা, সেই
দেশের জন্য চীরধারিণী, বনচারিণী, সম্রাসিনী
—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য
মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ
দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো, কণ্ঠ
রুদ্ধ হ'ল; একটা লজ্জায়, গর্বে, স্নেহে,
ভীতিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি আর
পারলাম না! আমার ভ্রাতৃপুত্রের হাতে চিতোর-
দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহাঙ্গীর। মর্বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে
এসেছ সগরসিংহ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মর্তে বড় ভয়
কর্তাম! কিন্তু সেদিন আমি এক নব মন্তে
দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব-মন্ত সগরসিংহ?

সগর। ত্যাগের। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য
আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম
ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির
জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর

একটি দেবতা ঈশ্বর। আমি এত দিন স্বার্থের রাজ্যে বাস করছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্যে দেখলাম। সে রাজ্যের রাজা বৃন্দ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুরূপ, পুরস্কার আত্মবলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই বাজ্যের রাজা হলাম। যে হস্তে কখনও তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধরলাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খজাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। তার পর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে এলাম। আগে মর্তে বড় ভয় কর্তাম। কিন্তু আর ভয় করি না। যে প্রাণভরে ভালোবাসতে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মর্তে ভয়।

জাহাঙ্গীর। উত্তম, তবে তাই হোক।—
প্রহরী—

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। প্রহরী কেন জনাব!—জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই করি।—এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন ও ভূতলে স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া কহিলেন—। “এই বস্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।”

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাতি।

রাণা অমরসিংহ একটি বেদী উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। উদয়সাগরের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। সন্নিহিত একটি বৃক্ষের উপর একটি কোকিল ডাকিতেছিল। রাণা চন্দ্র মর্দিত করিয়া তাহা শুনিতোছিলেন। কিয়দ্দূরে রমণীগণ “হোরি” উৎসবে নৃত্যগীত কবিতোছিলেন

নৃত্য-গীত

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী,
আর কি ঘবে রইতে পারি?

কুঞ্জ পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিক ঝিক
যমুনা ঐ নীলবারি।
রাধাব নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কে'দে কে'দে;
শত ভাঙা মূর্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে,
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ও সে) কেমন চতুর দেখবো আজি—
কেমন চতুর বংশীধারী।

অমর। এরা সব হোরি খেলায় মত্ত। এদের পদতলে যদি এখন ভূমিকম্প হয়, তাও বোধ হয় এরা টের পায় না। এই ত সংসার! মানুষকে এই সব পদতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নইলে কে এ মরুভূমিতে থাকতে চাইত! সংসার একটা প্রকান্ড ছলনা।—এই যে মানসী!

মানসীর প্রবেশ

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়ছে।

বাণা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে। এই উদয়সাগরের তীরে খানিক বসলে মন শান্ত হয়।—মানসী!

মানসী। বাবা!

রাণা। মানসী! তোমার বোধ হয় না, যে সংসার একটা প্রকান্ড ছলনা?

মানসী। ছলনা?

রাণা। হাঁ, ছলনা। মানুষ পাছে ভেবে অমব হয়, সংসার তাই তার মনকে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত করে' রেখেছে।

মানসী। আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবে পারি না, বাবা।

রাণা। এই জ্যোৎস্না দেখ! এই জলকল্লোল শোন! এই স্নিগ্ধ বায়ু অনুভব কর! সংসার তাকে এই সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখবার জন্য তার পায়ে জড়িয়ে, জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এ সংসার ত্যাগ করবো মা! মানসী! সংসার মায়া!

মানসী। যদি মায়া হয় ত সে বড় মনোহর মায়া! সত্য বটে, এই বহিঃপ্রকৃতি বড় সুন্দর।

সে আমাদের বড় ভালবাসে। যখন আমরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাই অর্মানি বর্ষা মৃদুগম্ভীর গজ্জনে এসে তার বারিরাশি ছাড়িয়ে দেয়। যখন দারুণ শীতে জজ্জর হই, অর্মানি নববসন্ত এসে তার সুগন্ধ মন্দ-মারুতে শীতের কুস্বাটিকা বন্ধন খুলে দেয়। যখন দিবার জ্যোতিতে ক্রান্ত হই, অর্মানি রাত্রি মাতার মত এসে ব্যাখিত মস্তকটি তার ক্রোড়ে তুলে নেয়। কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়।

রাণা। কোথায় তার শেষ মানসী?

মানসী। মানুষের চিন্তা-জগতে। দেখছো ঐ হৃদ বাবা?

রাণা। দেখছি মা।

মানসী। ওর উপর চন্দের শয়ান রশ্মি লক্ষ্য করছ?

রাণা। কিচ্ছ।

মানসী। ওকে ধরতে পার?

রাণা। কাকে?

মানসী। ঐ জ্যোৎস্নাকে, ঐ বারি-কল্লোলকে। যখন অন্ধকারে এই বারিবক্ষ ছেয়ে আসবে, বাতাস থেমে যাবে: তখন এ সৌন্দর্য্য, এ সঙ্গীত কোথায় যাবে?

রাণা। কোথায় যাবে মা?

মানসী। ঠিক জার্মি না। তবে লুপ্ত হবে না। সে থাকবে ছাড়িয়ে পড়বে। বিবহীর স্মৃতিতে, কবির স্বপ্নে মাতার স্নেহে, ভক্তের ভক্তিতে, মানুষের অনুকম্পায় ছাড়িয়ে পড়বে। মানুষের যা কিছু সুন্দর, পার্থিবীর এই 'রশ্মি, সুগন্ধ, ঝঙ্কার, তাই নিত্য, নিয়ত গড়ে তুলছে। নৈলে এই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়?

রাণা। মানুষের সুন্দর কি কিছু আছে মা? আমি যখন অল্পেব একটি গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্ব-জগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুপ্ত নয়নে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদের বর্ণিত করিচ্ছি।— এত লোভ এত ঈর্ষ্যা এত দ্বেষ।

মানসী। সে তার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাকলে মানুষের অনুকম্পার স্থান রৈত কোথায়? কার দুঃখ দূর করে', কাকে টেনে তুলে মানুষ সুখী হোত? সংসার অধম বলে' কি তাকে ছাড়তে হবে বাবা? না। মানুষ বড়

দুঃখী, তার দুঃখ মোচন কর্তে হবে। সংসার বড় দীন, তাকে টেনে তুলতে হবে।

রাণা। তুমি বোধ হয় সত্য বলেছ মা। আমার মস্তিষ্ক আজ বড় উত্তপ্ত হয়েছে। ভাবতে পারিচ্ছি না।

নেপথ্যে। মানসী—মানসী!

মানসী। যাই মা। বাবা ঘরে এসো— অন্ধকার হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

রাণা। একটা স্বর্গের কাহিনী। একটা নীহারিকা। একটা জগতের সারভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখণ্ডও নাই, জগৎ নিস্তম্ভ। কেবল উদয়সাগরের উপর দিয়ে একটা সঙ্গীতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোর স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান করছে। এই কল্লোল তানের কলহাস্য। গাছগুলির পাতা জ্যোৎস্না-লোকে নড়ছে, যেন বাতাসের সঙ্গে খেলা করছে—এই মধুর-ধর্মান তাদের ক্রীড়ার কলরব। আমার বোধ হয়, অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

বাণী। বাণা—

বাণা। চুপ বাণী। আমি স্বপ্ন দেখছি।

বাণী। জেগে, জেগে! এবার আমি হার মেনেছি।

বাণা। যাক, মোহ ভেঙে গেল—কি হয়েছে বাণী?

বাণী। বাকীই বা কি!—মেয়েগুলো আজ-কাল তাদের বাপ-মায়ের কথা শুনছে না। সেদিন গোবিন্দসিংহের মেয়ে আর ছেলে বাপের এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আবার কাল—

বাণা। যাক, থেকে গেল। আবার সেই দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির ককর্শ-ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণ।

বাণী। কলিকালে মেয়েগুলো হ'ল কি! আমাদেরও একদিন ছেলে বয়স ছিল।

রাণা। সেটা বৃষ্টি সত্যযুগে? বাণী। আমি চিরকাল দেখে আসছি, যে মা-গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়ে-গুলো জন্মায়—সব কলিযুগে। সে কথা যাক। আমরা এখন কি কর্তে হবে?

রাণী। মানসীর বিয়ে দেবে ত দাও নৈলে তার আর বিয়ে হবে না।

রাণা। আমারও তাই বোধ হয় রাণী, যে মানসীর বিয়ে হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি।

রাণী। হয়েছে! তোমারও ঐ দশা! হবে না!—যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

রাণা। আমি তবুও স্বপ্ন দেখি। তুমি স্বপ্নও দেখ না।

রাণী। এখন কি হবে?

রাণা। তা জানি না রাণী! দেখা যাক্ কি হয়।

রাণী। দেখা যাক্! কি দেখবে? যোধপদুর থেকে ত লোক এখনও ফিরে এলো না। সত্যবতীর পুত্রকে দত্ত করে' যোধপদুরে পাঠান গেল, কৈ ফিরে এলো না ত!

রাণা। অরুণ ফিরে এসেছে রাণী।

রাণী। এসেছে! বিয়ের দিন কবে স্থির হ'ল?

রাণা। মহারাজ আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ে দেবেন না।

রাণী। কেন?

রাণা। মহারাজ শুনলেম আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

রাণী। কেন?

রাণা। কারণ এক দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধে আমার জয় আর মোগলের পরাজয়।

রাণী। আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম, যে মানসীর বিয়ে হবে না। জানি বিয়ে হবে না। এত গোলযোগে কখন বিয়ে হয়?

রাণা। আমারও তাই বোধ হয়।—মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি—সব ভ্রম!

রাণী। কি ভ্রম!

রাণা। যোধপদুরের রাজপুত্রের সঙ্গে মানসীর বিয়ের প্রস্তাবটাই ভ্রম; এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে বসে ভ্রম। আমার তো বিয়ে করা ভ্রম। আমার রাজ্য, আমার জীবন—সব ভ্রম।

রাণী। আর আমার যদি বিয়ে না কর্তে, বোধ হয় তাও একটা ভ্রম হোত।—কি, হাসলে যে!

রাণা। আর শুনছে রাণী, যে, মহারাজ আগ্রায় গিয়েছেন?

রাণী। না।—কেন?

রাণা। বোধ হয় সম্রাটকে আবার মেবার পুনরাক্রমণের জন্য উত্তেজিত কর্তে।

রাণী। আবার?—এই! তুমি হাস্ছ যে। এ কি হাস্বার বিষয়?

রাণা। এমন হাস্বার বিষয় আর পাবে না রাণী। তুমি হেসে নাও।

রাণী। আমারও তোমার সঙ্গে পাগল হ'তে হবে?

রাণা। রাণী! বড় সুখবর।—কেউ থাক্বে না।—সব যাবে।

রাণী। তা সে যাই হোক—আমি শূন্যে চাইনে। এ বিয়ে হওয়া চাইই।

রাণা। কি রকমে?

রাণী। মাড়বার আক্রমণ কর।

রাণা। রাণী! তুমি যে ক্ষত্র-নারী এত দিন পরে তার একটা প্রমাণ দিলে! রাণী, শক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। যোধপদুরের মহারাজের যে মোগলভক্তি আছে, আমার তা নাই। আমার নিজের শক্তি মাত্র;—তাও নিভে আস্ছে।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হ'য়ে সহ্য কর্বে?

রাণা। কর্বে বৈ কি? তবে নীরব হ'য়ে সহ্য কর্তে হবে না। একটা আত্মনাদ কর্বে।—দেখ আহা! প্রস্তুত কি না?—কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্তে পারেন না, মানুষ ত ছার।—যাও!

রাণী। কিন্তু তাতে তোমার অপরাধ কি?

রাণা। অপরাধ! আমার অপরাধ—যে আমি মহারাজের একই জাতি! রাণী! যদি একজন আরোহীর দোষে নৌকা ডোবে, সেই দোষীর সঙ্গে নির্দোষী সহযাত্রীও জলমগ্ন হয়।—যাও।

[রাণীর প্রস্থান।

রাণা। আকাশ কি কালো!

[প্রস্থান।

মানসীর পুনঃপ্রবেশ

মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে।

অজয়! চলে যাবার আগে একবার দেখাও করে' যেতে পার্তে। শূদ্ধ একখানি পত্রে— শূদ্ধ ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা না জানিয়ে "জন্মের মত বিদায়"টি এসে নিয়ে যেতে পার্তে। অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি! না। তোমার জন্য আমি শোক কর্বে না—চন্দের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?

গীত

অলঙ্কিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার
উজলি মধুর ধরা বিকাশি' মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে;
চলে' যায় অর্নি সে হয়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গঢ়তর,—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম গন্ধ, যায় না ক' কুহুম্বর;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায় গীতরব;
শুকায় সৌরভ; যায় সব সুধা বসুধার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির।
কাল—প্রভাত।

মহাবৎ খাঁ, পরভেজ ও মহারাজ গর্জসিংহ দাঁড়াইয়া
কথাবার্তা করিতেছিলেন

মহাবৎ। সাহাজাদা! আর বিলম্ব কর্বে ন
না। আপনি এই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে
চিতোর দুর্গ অবরোধ করুন।

পরভেজ। উত্তম সেনাপতি!

[প্রস্থান।

মহাবৎ। আর মহারাজ! আপনি মেবারের
গ্রামগুলি একধার থেকে পুড়োতে আরম্ভ
করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাহুবীচার
না করে হত্যা কর্বে ন। আপনি সব চেয়ে সে
বিদ্যে দক্ষ, তা জানি। কেবল দেখবেন, নারী-
জাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।—
সাবধান।

গর্জসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি
মেবারে রাজপুত্র রাখবো না।

মহাবৎ। তা জানি মহারাজ! রাজপুত্রের
প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে
না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত
আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন
ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে

স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত
আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়!
মহারাজ, রাজপুত্র জাতির উচ্ছেদ আপনার
মত আর কেউ কর্তে পার্বে না জানি। তাই
এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান—এই আদেশ
পালন করুন মহারাজ।—যান।

গর্জসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! [প্রস্থান।

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত্র! মেবার! সাব-
ধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ
সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ।
কাল—রাতি।

রাণা অমরসিংহ ও সত্যবতী

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?
সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর
সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

রাণা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে
কহিলেন]—“আমি পুর্বেই বলি নাই
সত্যবতী?”

সত্যবতী। কি?

রাণা। যে যাবে—সব যাবে। সমস্ত রাজ-
পুত্রানা গিয়েছে। মেবার একা শির উঁচু করে
থাকবে? এও কি বিধাতার নিয়মে নয়! এবার
মেবারও যাবে।—কি সত্যবতী! মাথা হেঁট
করে' রইলে যে? এ ত আনন্দের কথা!

সত্যবতী। পরম আনন্দের কথা রাণা?

রাণা। পরম আনন্দের কথা নয়? বিছানায়
শুয়ে মেবার আর কত দিন ধরে' মৃত্যুযন্ত্রণা
ভোগ করবে? এবার তার যন্ত্রণার অবসান
হবে।

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্বে ন
মা?

রাণা। যুদ্ধ কর্বে না? যুদ্ধ কর্বে বৈ
কি! এবার সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত
এ সব ছেলেখেলা হচ্ছিল! এবার একটা মহা
আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে
লড়াই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শূনলাম
যোধপুরের মহারাজ গর্জসিংহ এসেছেন।

রাণা। ও! বটে! তিনি তা হ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন? আমি তাই ভাবছিলাম, যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন যে নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য করবেন না?

সত্যবতী। সেই রাজপুত্র কুলাঙ্গার—

রাণা। কে বললে!—ও কথা বোলো না। তিনি পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। আমরাই—মেবার-বংশের আমরাই কুলাঙ্গার—এতদিনে একটা ঈশ্বর মানলাম না। “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!”—গজসিংহ! বেশ! খাসা নাম। একাধারে গজ আর সিংহ! শ'ড়ও নাড়ে, কেশরও নাড়ে। তোফা!

সত্যবতী। রাজপুত্র হ'য়ে রাজপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন!

রাণা। তা না হ'লে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভূঙ্গী না এলে চলে না!—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না!

সত্যবতী। হা হতভাগা মেবার! [চক্ষু মর্দিলেন]

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরী করেছিলেন, তখন তাঁর ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তাঁর নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশিলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়—সে এই রকম করেই যায়। যখন জাত নিজীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। এই যে গোবিন্দসিংহ! কি সংবাদ গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। রাণা, মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাণা। দিচ্ছে নাকি? উচিত কার্য কচ্ছে!

গোবিন্দ। উচিত কচ্ছে রাণা? আমরা এর প্রতিশোধ নেবো।

রাণা। নিশ্চয়। নৈলে মেবার ধ্বংস পূর্ণ হবে কেন?

গোবিন্দ। রাণা অবশ্য যুদ্ধ করবেন?

রাণা। করবো বৈ কি! যুদ্ধ করবো না? কয়জন রাজপুত্র-সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় এক লক্ষ হবে না? হোক না। কি যায় আসে!

গোবিন্দ। রাণা—[বলিয়া মস্তক হেঁট করিলেন]

রাণা। কি গোবিন্দ! তুমিও মাথা হেঁট করেছ? উঠ, জাগ বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহে গৃহে মণ্ডলবাদ্য হোক। প্রতি সৌধশিখরে রক্ত নিশান উড়ুক। উদয়পুরের দুর্গে একবার ভাল করে মেবারের রক্তধ্বজা উড়িয়ে দাও। ভাল করে দেখে নাও। দুর্দিন পরে আর দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। রাণা, আমরা যুদ্ধ করবো। আমরা মর্বারে কিন্তু দুঃখ এই যে, তবু মাকে বাঁচাতে পারবো না।

রাণা। দুঃখ কি? মা কারো মরে না? আমাদের মা মরবে। মা কারো চিরদিন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মর্বারে।

গোবিন্দ। তাই হোক রাণা।

রাণা। তাই হোক। এসো গোবিন্দসিংহ, মর্বার আগে একবার প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করে নিই। [আলিঙ্গন] যাও, গোবিন্দ! মর্বার আয়োজন করগে।

[গোবিন্দসিংহের প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ

রাণা। কে, রাণী! উৎসব কর! উৎসব কর!

রাণী। মানসীর বিয়ে?

রাণা। মানসীর নয় রাণী, মেবারের বিয়ে।

রাণী। মেবারের বিয়ে? তুমি কি বলছো রাণা? মেবারের বিয়ে?

রাণা। এবার ধ্বংসের সঙ্গে মেবারের বিয়ে।

রাণী। সে কি?

রাণা। বড় মজা। এবার ডাইয়ে ডাইয়ে

লড়াই! উৎসব কর। স্ফূর্তি কর। এবার বিয়ে
—বিনাশ।—ধ্বংস!

[প্রস্থান।

রাণী। এবার দস্তুরমত ক্ষিপ্ত। আমি
পূর্বেই বুঝেছিলাম।—শেষে সমস্ত পরিবারটা
ক্ষেপে গেল। তাই ত এখন উপায় কি?

মানসী। মা, বাবার কি হয়েছে! বাবা ঠিক
উল্মাদের মত কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছুটে
বেড়াচ্ছেন! বাবার কি হয়েছে মা!

রাণী। আর কি! ক্ষেপে গেছেন! চল
দেখিগে।

[প্রস্থান।

মানসী। এই মহাবৎ খাঁ রাজপুত্র! এই
মহারাজ গর্জাসিংহ রাজপুত্র! এত ঈর্ষ্যা! এত
দেষ' হা রে অধম জাত! তোমার পতন হবে
না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ
—আর কে রক্ষা করে!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ।

কাল—সায়ান্ন।

অরুণ ও সত্যবতী হাঁটুয়া যাইতেছিলেন

সত্যবতী। অরুণ!

অরুণ। মা!

সত্যবতী। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ। না মা।

সত্যবতী। আজ আমরা এই গ্রামে আশ্রয়
গ্রহণ কর্বে।

অরুণ। এখানে কি প্রয়োজন মা?

সত্যবতী। গ্রামবাসীদের ডাকতে হবে।

অরুণ। কোথায়?

সত্যবতী। যুদ্ধে। মেবারের বীরকুল
নিঃশেষ হয়েছে। আবার নতুন বীরকুল সৃষ্টি
কর্ত্তে হবে। পূজার নতুন আয়োজন কর্ত্তে
হবে। চল যাই, সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ

১ গ্রামবাসী। এমন সুন্দর দেশ এবার
গেল।

২ গ্রামবাসী। এবার মহাবৎ স্বয়ং
এসেছে। এবার আর রক্ষা নাই।

৩ গ্রামবাসী। মহাবৎ খাঁ কি খুব যুদ্ধ
কর্ত্তে জানে?

২ গ্রামবাসী। উঃ!

৪ গ্রামবাসী। কোথায়! হ'ন্দ! সে যুদ্ধ
শিখলেই বা কবে? আমি ত সোদিন তাকে
হ'তে দেখলাম।

২ গ্রামবাসী। হ'তে ত একদিন সকলকেই
কেউ না কেউ দেখে।

৪ গ্রামবাসী। তুমি ত বাপু বড়
তার্কিক!

৩ গ্রামবাসী। ঐ দেখ, ঐ গ্রামে বৃষ্টি
আগুন লাগিয়েছে!

অন্য সকলে। কৈ?

১ গ্রামবাসী। ঐ যে ধোঁয়া উঠেছে—

৪ গ্রামবাসী। ওটা মেঘ।

২ গ্রামবাসী। মেঘ বৃষ্টি - মাটি থেকে
উপর দিকে ওঠে? না, মেঘ ঘোরে? দেখছ না,
ওটা পাক খাচ্ছে?

৪ গ্রামবাসী। তবে ওটা ধুলো।

২ গ্রামবাসী। ধুলোর বৃষ্টি কালো রং
হয়?

৪ গ্রামবাসী। তুমি ত বড় বেশী
তার্কিক বাপু?

১ গ্রামবাসী। ঐ—ঐ গ্রামবাসীদের চিৎ-
কার শুনছ না?

অন্য সকলে। হাঁ, হাঁ।

৪ গ্রামবাসী। গান গাচ্ছে। না হয় গাধা
ডাকছে।

২ গ্রামবাসী। দু'টো আওয়াজই প্রায়
একরকম শব্দে—না পাঁড়িঁজ?

১ গ্রামবাসী। ঐ জনকতক গ্রামবাসী
চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকে ছুটে আসছে।

৩ গ্রামবাসী। তাদের পিছনে সৈন্যরা
গুলি চালাচ্ছে।

নেপথ্যে। দোহাই সাহেব! মেরো না,
মেরো না।

১ গ্রামবাসী। আহা—হা—বেচারীরা—

অজয় ও কল্যাণীর প্রবেশ

অজয়। গ্রামবাসীগণ! দাঁড়িয়ে রয়েছ কি?
ঐ গ্রামবাসীদের বাঁচাও?

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্বে মহাশয়!

অজয়। তোমরা শব্দ দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখবে?

৪ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্বে? —চল পলাই। এদিকে আসছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ? তা হবে না। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদেরও পাল্লা আসছে! তোমাদেরও ঘর পড়বে।

১ গ্রামবাসী। সে যখন পড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাকতে মরি কেন? চল, ঐ এসে পড়লো; পাল্লা পাল্লা।

[অজয়, কল্যাণী ভিন্ন সকলের পলায়ন।

অজয়। ঐ যে আন্তর্নাদ আরও কাছে এসেছে। ঐ বন্দকের শব্দ! কল্যাণী, তুমি একটু সরে দাঁড়াও—আমি এদের রক্ষা করবো।

কল্যাণী। পার ত এদের রক্ষা কর দাদা!

অজয়। রক্ষা করতে পারব কি না জানি না কল্যাণী। তবে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারবো। আমি মানসীর কাছে যে মহামন্ত্র শিখেছিলাম, আজ তার সাধনা করবো। ঐ আসছে!

এই বলিয়া অজয় তরবারি নিষ্কাশিত করিল। উদ্ভ্রম্বাসে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। তাহাদের পশ্চাতে মৃত-তরবারি হস্তে কয়েকজন মোগল-সেনানীর প্রবেশ

গ্রামবাসী। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

অজয়ের পদতলে পড়িল

অজয়। [আক্রমণকারীগণকে] খব্দার

১ সৈনিক। চূপ রও!

তরবারি উত্তোলন। অজয় তাহাকে তরবারির এক আঘাতে ভূশায়িত করিলেন

অন্যান্য সৈনিক। তবে মর কাফের।

সকলে মিলিয়া বৃন্দ করিতে লাগিল। একে একে মোগল সৈনিকগণ ভূশায়িত হইতে লাগিল। পরে আর একদল সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল

অজয়। আর রক্ষা নাই। পাল্লাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তুমি মর্বে, আর আমি পাল্লাবো দাদা!

অগ্রসর হইয়া আসিল। এই সময় একজন মোগল-সৈনিকের গর্দীর আঘাতে অজয় ভূপতিত হইল

কল্যাণী। [ছুটিয়া আসিয়া] দাদা—দাদা

২ সৈনিক। এ কে? ধর একে!

৩ সৈনিক। না রে! সেনাপতির আদেশ

—নারী জাতির উপর কোন রকম জুলুম না হয়।

অজয়। আমি মরি কল্যাণী—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। [মৃত্যু]

কল্যাণী। দাদা—দাদা—কোথা যাও!

অজয়ের মৃত দেহের উপরে পড়িলেন

৪ সৈনিক। কোথা যাবে বেটী! একদিন যেখানে সকলেই যায়!

কল্যাণী। আমি শোক করব না! ক্ষত্র-বীর! তোমার কাজ তুমি করেছ। আন্তর্নাদ প্রাণ দিয়েছে—আর এরা! শয়তানের দূত এরা! —রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ এরা! যারা বিনা অপরাধে পরের ঘর জ্বালিয়ে দেয়; নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে—এদের যেন নরকেও স্থান না হয়।

১ সৈনিক। আমাদের দোষ দিলে কি হবে বিবিসাহেব। আমাদের সেনাপতির হুকুমে ঘর জ্বালাচ্ছি, মানুষ মাচ্ছি।

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতি কে?

২ সৈনিক। সেনাপতি কে জান বিবিসাহেব! সেনাপতি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ।

৩ সৈনিক। চল চল, যাওয়া যাক্।

কল্যাণী। মহাবৎ খাঁ? তাঁর এই হুকুম! —অসম্ভব।

৪ সৈনিক। চল্ চল্।

কল্যাণী। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

১ সৈনিক। যাবি! কোথায় যাবি!

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতির কাছে।

২ সৈনিক। তোকে নিয়ে গিয়ে শেষে আমরা কি—

৩ সৈনিক। তাই তো, শেষে কি বিপদে পড়বো!

৪ সৈনিক। এ স্বেচ্ছায় যাচ্ছে। চল্, একে নিয়ে চল্।

১ সৈনিক। আচ্ছা চল।

কল্যাণী। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজসভা। কাল—প্রভাত।

রাণা, গোবিন্দ ও সামন্তগণ

রঘুবীর। রাণা, যতদিন সম্ভব আমরা যুদ্ধ করেছি। আর সম্ভব নয়।

রাণা। না রঘুবীর! আমরা যুদ্ধ করবো। কোন বাধা মানি না। সৈন্য সজ্জিত।

কেশব। কোথায় সৈন্য রাণা! সমস্ত মেবার কুড়িয়ে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর্তে পারি কি না সন্দেহ। এই নিয়ে কি লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব!

রাণা। অসম্ভব কিছদু নয়। কেশব রাও, আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ লক্ষ!

জয়সিংহ। মহারাণা শুনুন, এখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাণা। তা হবে না। যখন সন্ধি কর্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিতে পারি না।

কেশব। কিন্তু—

রাণা। কথা কযো না। আর উপায় নাই। প্রাণ দিতে হবে। কি বল গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।

বাণা। ঠিক বলেছ গোবিন্দসিংহ। প্রাণ দিব, মান দিব না!

রঘুবীর। মহারাণা!

রাণা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না রঘুবীর। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধরজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও, প্রস্তুত হও।

রাণা অমরসিংহ ভিন্ন সকলে চলিয়া গেলেন।

তখন রাণা শূন্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন—

মেবার—সুন্দর মেবার! আজ তোমার এ কি সৌন্দর্য্য দেখছি মা! এ ত কখন দেখি নাই। তোমায় তারা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে—ছিন্ন-বসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! এ কি সৌন্দর্য্য মা! আজ এতদিন পরে তোমায় চিন্লাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্য-কিরণ তোমায় ছেয়েছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশের প্রান্ত হতে এ কি অপদর্শ অগণ্য আলোক উদ্ভাসিত দেখছি!—এ কি জ্যোতিঃ! এ কি নীলিমা! এ কি নীরব মহিমা!!

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত।

মহাবৎ খাঁ ও মহারাজ গজসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন গজ। রাণা যুদ্ধে সসৈন্যে এসেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ মহারাজ! কিন্তু একা ফিরে গিয়েছেন। তাঁর পঞ্চ-সহস্র সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র সমরক্ষেত্রে পড়ে।

গজ। এই পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে এসেছিলেন! আশ্চর্য্য স্পন্দনা!

মহাবৎ। স্পন্দনা বটে!—মহারাজ শুনবেন তবে! আমি আজ একটা গোরব অনুভব করছি!

গজ। কর্ণারই ত কথা খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। কেন করছি, আপনি কম্পনাও কর্তে পারেন না! কেন করছি জানেন?

গজ। কেন?

মহাবৎ। এই বলে গোরব অনুভব করছি, যে আমি ধর্ম্ম মসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত্র; এই মনে করে, যে আমি এই অমরসিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চ-সহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে মন্তেই এসেছিল। এই নিভীকতা, এ স্বদেশ-প্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে এক রাজপুত্রেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত্র!

গজ। সে সত্য কথা সেনাপতি!

মহাবৎ। আর আপনি পতিত হ'লেও আপনিও এই রাজপুত্র। আপনিও গর্ব করুন; আর লজ্জায় মাথা হেঁট করুন, যে কি হতে পারেন, আর কি হ'য়েছেন। আমার ত কথাই নাই। তবে আমার এক সন্তুনা যে আমি রাজপুত্র নাম ঘুচিয়েছি। আমি রাজপুত্র ছিলাম; আপনি এখনও রাজপুত্র।

গজ। রাণা এ যুদ্ধে নিহত কি বন্দী হ'য়ে নাই?

মহাবৎ। বড় ক্লোভ হ'ছে মহারাজ—না? তাঁকে বধ কর্তে কি বন্দী কর্তে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। এরূপ শত্রু পৃথিবীর গোরব! এ গোরব ক্ষুণ্ণ কর্তে চাই না!

গজ। আমি এখন আসি সেনাপতি।

[গজসিংহের প্রস্থান:]

মহাবৎ। আসুন মহারাজ। দূরে প্রধূমিত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। দূরে গ্রামবাসীদের দূরত্বে অস্পষ্ট হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোমাদের ধর্মের গৌরব নিয়ে মর হিন্দু-জাতি। তোমার দম্ভ, তোমার বিস্বেষ, তোমার স্পর্ধা, চূর্ণ করেছি কি না! তোমার—

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

মহাবৎ। এ কে?

১ সৈনিক। জানি না খোদাবন্দ। পথে দেখলাম।—নারী স্বেচ্ছায় এসেছে।

মহাবৎ। কে আপনি?

কল্যাণী। কে আমি, তা শুনে আপনার কোন লাভ নাই, মোগল-সেনাপতি!

মহাবৎ। আপনি এখানে কি চান?

কল্যাণী। আমি এখানে আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি।

মহাবৎ। কিসের বিচার?

কল্যাণী। আপনার এই সৈন্য বিনাদোষে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

মহাবৎ। আপনার ভাইকে হত্যা করেছে! কি রকমে?—সৈনিকগণ!

২ সৈনিক। খোদাবন্দ! আমরা গ্রামবাসীদের বধ করছিলাম। এই নারীর ভাই তাদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে লড়ে মারা গিয়েছে।

মহাবৎ। [কল্যাণীকে] এ কথা সত্য?

কল্যাণী। হাঁ সত্য! আপনার সৈন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ করছিল; আমার ভাই তাদের রক্ষা করতে যান। এরা তাঁকে বধ করেছে।

মহাবৎ। তবে যুদ্ধে বধ করেছে।

কল্যাণী। তবে তাই। এরা আমার ভাইকে যুদ্ধে বধ করেছে।

মহাবৎ। এদের অপরাধ নাই দেবি! আমার এরূপই আজ্ঞা ছিল—তোমরা বাহিরে যাও সৈনিকগণ!

[সৈনিকগণ বাহিরে গেল।

কল্যাণী। আপনার আজ্ঞা নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্তে?

মহাবৎ। হাঁ, ঐ আজ্ঞা ছিল।

কল্যাণী। গ্রাম পুড়িয়ে দিতে?

মহাবৎ। হাঁ দেবী।

কল্যাণী। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি?

কল্যাণী। আমার স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আপনার স্বামী?

কল্যাণী। হাঁ, আমার স্বামী। প্রভু! চেয়ে দেখুন দেখি, আমায় চিন্তে পারেন কি না! আমি আপনার পরিত্যক্ত স্ত্রী কল্যাণী!

মহাবৎ। কল্যাণী! কল্যাণী! তবে এরা তোমার ভাই অজয়সিংহকে বধ করেছে?

কল্যাণী। হাঁ মোগল-সেনাপতি! আমি যেদিন আপনাকে লক্ষ্য করে' আমার প্রেমকে আমার জীবনের ধুবতারা করে', আমার ক্ষুদ্র তরীখানি অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেদিন আমার ভাই অজয় সানন্দে স্বেচ্ছায় আমাকে বাঁচাবার জন্য এ মহাযাত্রায় আমার দুঃখের সহযাত্রী হয়েছিল। পথে আপনার এই মুসলমান বনদস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্তে অজয় সাংঘাতিক আহত হয়। আমি তখন সেই নিজ্জর্ন পরিত্যক্ত কুটীরে—নিঃসহায়া আমি বহুদিন তার সেবা করে,—গ্রামে ভিক্ষা মেগে তাকে খাইয়ে, ভাইকে বাঁচাই। আমার এ হেন ভাইকে আপনি কেড়ে নিলেন। তবে আর কেন প্রভু! আমাকে বধ করুন।

মহাবৎ। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী।

কল্যাণী। গ্রামবাসীদের এ সব হত্যা আপনার আজ্ঞায় হয়েছে?

মহাবৎ। হাঁ, আমারই আজ্ঞায় হয়েছে কল্যাণী। আমি সৈন্যকে রাজপুত্র জাতির উচ্ছেদ কর্তে আজ্ঞা করেছিলাম।

কল্যাণী। ভগবান এ কি কর্লে! এই আমার আরাধ্য-দেবতা! আমি এই ঘাতকের স্মৃতি বক্ষে ধরে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলাম! আমার কি মরণ ছিল না? ভগবান! আজ একদিনে, এক ক্ষেপে, স্বামী আর ভাই—দুই-ই হারালাম! আজ আমার মত অভাগী কে!—ওঃ!

মুখ ঢাকিলেন

মহাবৎ। জ্ঞান কল্যাণী, আমি কি জ্ঞান—

কল্যাণী। কিছু জ্ঞান চাই না প্রভু! আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আমি এতদিন আপনার পূজা কর্তাম, আজ আমি আপনাকে পরম শত্রু জ্ঞান করি! আমি মোগলকে তত শত্রুজ্ঞান করি না, যেমন আপনাকে করি! মোগল-সেনাপতি! মোগল আমাদের কেউ নয়। তাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়—কাফের বধ কর্তে। কিন্তু আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধর্মনীতে বিশুদ্ধ রাজপুত্ররক্ত, আপনি তুচ্ছ রোপ্যের লোভে, বিদ্বেষে, স্বজাতির উচ্ছেদ-সাধন কর্তে বসেছেন। কি বলবো প্রভু—আপনি মোগলের উপরেও বাড়িয়েছেন। তারা চায় মেবার জয় কর্তে। তারা এই নিরীহ গ্রাম-বাসীদের ঘর জ্বালাতে চায় নি। আপনি তাদের সে ঘরটুকু পূর্ণ কচ্ছেন। আপনি তাদের ধর্মের উচ্ছ্রষ্ট খেয়ে, আপনার এই হিংস্র সৈন্যদের—এই ঘৃণিত মাংসলোলুপ নর-কুকুরদের এই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন! আপনি মেবারকে শ্মশান করেছেন। হাহাকারে তার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। মোগল তা চায় নি।—ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার দণ্ড-বিধিতে কি কোন শাস্তি লেখে নি! এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়ছে না!

মহাবৎ। জ্ঞান কল্যাণী! আমি এ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—তোমার জন্য!

কল্যাণী। আমার জন্য? মিথ্যা কথা।

মহাবৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী! যেদিন শুনলাম তোমার পিতা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় তোমায় নিস্বাসিত করেছেন, সেই দিন, সেই মূহুর্তে আমি মেবারের বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ করেছি।

কল্যাণী। সত্য! তাই-ই যদি হয় তবে কোন ধর্মমতে আপনি একের অপরাধে একটা জাতির উচ্ছেদসাধন কর্তে বসলেন?

মহাবৎ। তাতে আশ্চর্য্য কি কল্যাণী! একা রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয় নাই? আর এ মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ তোমার পিতার একার নয়। তোমার পিতা সমস্ত

মুসলমান জাতির প্রতি সমস্ত হিন্দুর বিদ্বেষ উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র, আমি হিন্দুর সেই জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি।

কল্যাণী। সে প্রতিহিংসা যদি কেউ নিতে চায় স্বেচ্ছসেনাপতি, ত যারা জাতিতে মুসলমান তারা নিতে পারে। আপনি যখন স্বয়ং মুসলমান হয়েছিলেন, তখন হিন্দুর এই মুসলমান বিদ্বেষ জেনে মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার এই অবস্থা আপনার নিজের সৃষ্ট—প্রভু! বৃথা কেন নিজের মনকে প্রবোধ দেন যে, আপনি একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্তে বসে-ছিলেন। আপনার মধ্যে মুসলমান যেটুকু, তা আপনাকে এ প্রতিহিংসায় চালিত করে নি, আপনার মধ্যে গর্ষী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনাকে প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।

মহাবৎ। [অর্ধস্বগত] সে কি! সত্য না কি!

কল্যাণী। আপনি সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষে মেবারের সর্বনাশ কর্তে বসেছেন। এই আপনার ধর্ম! এই আপনার শৌর্য্য! এই আপনার মনুষ্যত্ব! হা ডগবান, কি কর্তে! আমার এ কি কর্তে! এত দিন আমি আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে ভূমিতলে গড়াচ্ছে।

মহাবৎ। কল্যাণী—

কল্যাণী। না, আর না। আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার স্ত্রী। আমি একদিন গর্ষ কর্তে বলে-ছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক করে? কিন্তু এখন দেখছি, আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে; আর তার চেয়েও বেশী—আমাদের দু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের টেউ ব'য়ে যাচ্ছে। নিস্বর্ম দেশদ্রোহী রক্ত-পিপাসু জল্লাদ!—ওঃ—ঈশ্বর, ঈশ্বর! এই নীচ, হিংস্র দ্রাতৃহস্তাদের—এই দু'মুঠো উচ্ছ্রষ্টের কাণ্ডালদের বিকট অট্টহাস্যধ্বনি শুনতে শেষে যেন তোমাতেও বিশ্বাস না হারাই।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—রাতি।

মানসী একাকী গান গাহিতেছিলেন

গীত

কত ভালবাসি তায়-বলা হোলো না।

বড় ক্ষেদ মনে বয়ে গেল—বলা হোলো না।

হৃদয়ে বাঁহল ঝড়—বাষ্প বোধিল ম্বর,
মনের কথা মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।

যদি ফুটিল না মূখ কেন ভাঁঙিল না বুক—
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হোলো না।

রাণাব প্রবেশ

মানসী। এই যে বাবা! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ বাবা?

রাণা। হাঁ মানসী!

মানসী। কি! হয়েছে বাবা!—এ কি মর্দুতি! কি হয়েছে বাবা!

রাণা। চূপ। কথা কস্ নে। আমি একটা—
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেছি অদ্ভুত!
অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!

মানসী। কি হয়েছে—যুদ্ধ—

রাণা। না, এবার আর আমাদের যুদ্ধ হ'লো না, মানসী!—যুদ্ধ ক্ষেত্রে শূন্য একটা অগ্নির ঝড় বয়ে গেল, আর আমার সৈন্য সব পুড়ে গেল।

মানসী। সে কি!

রাণা। আমি কিছু বঝতে পারলাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়; সে যেন একটা উল্কা বৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বজ্জলাম! আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা হুৎকম্প চ'লে গেল—আমার মস্তিস্কের ভিতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উড়ে গেল। আর কিছু বঝতে পারলাম না। পরে সন্প্রোথিতের মত চোখ খুলে দেখলাম, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নাই! চারিদিকে রাশি রাশি শব! উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!

মানসী। বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়েছে। বোসো, আমি তোমার সেবা করি।

রাণা। আমি সেই শ্মশানে একাকী বিচরণ কর্তে লাগলাম। আমাকে কিন্তু কেউ বধ করলে না।

মানসী। এ যুদ্ধে তুমি পরাজয় স্বীকার করেছ?

রাণা। স্বীকার না করলেও বড় যায় আসে না। যুদ্ধ তর্ক নয় যে, হার স্বীকার না করলেই জিত। এ স্থূল, কঠিন, প্রত্যক্ষ সত্য—বড় প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমায় তারা বধ করলে না কেন? আমি সে মহাশ্মশানে চেঁচিয়ে ডাকলাম “মহাবৎ খাঁ—গজসিংহ—” কেউ এলো না। কেউ এলো না কেন মানসী?

মানসী। ক্ষুধা হোয়ো না বাবা—

রাণা। আর একটা কথা বঝতে পারছি না, যে মহাবৎ যুদ্ধে জয়ী হ'য়েও বিজয়গর্বে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ করছে না কেন! এখন ত তার এসে এ দুর্গ অধিকার করলেই হ'ল।

মানসী। বাবা, হেরেছ হেরেছ, তার দুঃখ কি? এক পক্ষের যুদ্ধে পরাজয় ত হবেই।

রাণা। ঠিক বলেছ মা! এক পক্ষের ত পরাজয় হবেই। তবে আর দুঃখ কি?—কোন দুঃখ নাই মানসী। তবে তারা আমায় বধ করলে না কেন?

রাণাব প্রবেশ

রাণা। রাণী! মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কিছু জান?

রাণী। কি রাণা?

রাণা। আমায় তারা বধ করলে না কেন?

রাণী মানসীর দিকে চাহিলেন

রাণা। শোন রাণী! সেই গভীর নিশীথে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই স্তূপীকৃত হত্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে একা আমি।—কি সে দৃশ্য! রাণী তুমি তা কল্পনাও কর্তে পার না। উপরে নিশ্চল উলঙ্গ নক্ষত্ররাজি আর নীচে অগণ্য শবরাশি! তাদের দুইয়ের মধ্যে আর কিছু না, কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। আমার বোধ হ'ল যেন আমি এ জগতের কেহ নই। যেন আমিও মরে গিয়েছি; যেন আমি একটা জীবন্ত জাগ্রত মৃত্যু। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তরবারি বাহির করে' আক্ষালন করলাম। সে কেবল সেই নৈশ আর্দ্র বায়ু কেটে চলে গেল।—ডাকলাম “মহাবৎ!” সে ধ্বনি চারিদিক বৃথা খুঁজে ফিরে এলো। তারপর যখন [ভগ্নম্বরে] যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পানে আবার চেয়ে দেখলাম—সেই

নক্ষত্রের আলোকে—যে আমার সোনার রাজ্য একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙে ছাড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, [নিম্নস্বরে] তখন সেই মহাশ্মশানের উন্মত্ত বায়ু যেন মৃত সৈন্যদের দেহমুণ্ড আত্মার ভারে ভারি বোধ হ'তে লাগল। বহু-কণ্টে টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সে নিশ্বাস আকাশে না উঠে নিজ ভারে মাটিতে পড়ে' গেল। আমার বোধ হয়, এত অন্ধকার না হ'লে সেখানে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত।

রাণী। যা হবার তা হয়েছে। আর এখন ভেবে কি হবে? আমি গোড়াগুঁড়িই বলে-ছিলাম।

রাণা। ঠিক বলেছিলে রাণী! মেবার মরে' গেল, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। তাকে স্কন্ধে করে' এখানে এনেছি।-দেখবে এসো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ। কাল—রাতি।

দুইজন পরিচারিকা কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল

১ পরিচারিকা। আহা বৃদ্ধ গোবিন্দ-সিংহের বড় দুঃখ!—এক ছেলে।

২ পরিচারিকা। কিন্তু সে যা হোক্ চারণী-ঠাকুরগুণ সেই মড়া ঘাড়ে করে গোবিন্দ-সিংহের বাড়ী টেনে নিয়ে এলেন কেন, তা তিনিই জানেন।

১ পরিচারিকা। ঠুর সব বিদ্বুটে কান্ড। যেন হাতে আর কোন কাজ ছিল না।—সেখানে লোক জমেছে অনেক?

১ পরিচারিকা। উঃ! আঙ্গনা ভরে' গিয়েছে। গোবিন্দসিংহ বাড়ীতে নাই। ঠাকুর-গুণের ছেলে অরুণসিংহ তাঁকে ডাক্তে গেল। দেখলাম যে সেই আঙ্গিনায়—সেই শবের কাছে ঠাকুরগুণ একা দাঁড়িয়ে। দূরে লোকজন।

১ পরিচারিকা। অন্ধকার?

২ পরিচারিকা। অন্ধকার বৈ কি। দূরে ঘরের মধ্যে—একটা আলো মিটমিট করে' জ্বলছে—ও কি! ও কে!

১ পরিচারিকা। কৈ?

২ পরিচারিকা। ও কে?

১ পরিচারিকা। আমাদের রাজকুমারী!

ও কি মর্দু! চোখ কপালে উঠেছে। গা থেকে আঁচল খসে মাটিতে লোটাচ্ছে। দুই হাতে মূঠো বাঁধা।

২ পরিচারিকা। ঐ যে রাজকুমারী এই দিকে আসছেন। চল আমরা যাই।

[উজরের প্রস্থান।

বিপরীত দিক হইতে মানসীর প্রবেশ

মানসী। চলে' গেছে! অজয় জন্মের মত চলে' গেছে! আমার একবার না বলে' বিদায় না নিয়ে জন্মের মত চলে' গেছে!—এ কি সত্য! ওঃ! আমার মাথা ঘুচ্ছে। আমার চক্ষের সম্মুখে শত পীতবিন্দু মাটি থেকে উদ্ভূত উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা তরল জ্বালা ছুটে যাচ্ছে! আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে' গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' গিয়েছে! আমি কোথায়! ওঃ—[ক্ষণেক নিশ্চল হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে আবার কহিলেন]—নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলি নাই। যখন সেদিন অজয় আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হ'য়ে—আমার মুখপানে দীন-নয়নে চেয়ে ছিল, আমার শব্দ একটি সক্রমণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে ম'রে যাচ্ছিল তবু আমার মুখ ফোটে নি। তাই আমার অজয় অভিমান করে' গিয়েছে। আমার সেই গর্ষ চূর্ণ করে', পদতলে দলিত করে' চলে' গিয়েছে! অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আর সময় নাই! আর সময় নাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন। কাল—রাতি।

ঝড় বহিতছিল। অজয়সিংহের মৃতদেহ। অদূরে সত্যবতী ও চারিজন বাহক দণ্ডায়মান। গোবিন্দ-সিংহ একদৃষ্টে মৃতদেহের দিকে চাহিলেন।

শেষে কহিলেন—

গোবিন্দ। এই আমার পুত্র অজয়সিংহের মৃতদেহ! কোথায় দেখলে সত্যবতী!

সত্যবতী। রাস্তার ধারে।

গোবিন্দ। কি রকম করে' তার মৃত্যু হ'ল সত্যবতী?

সত্যবতী। যারা তার চারি পার্শ্ব দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে শুনলাম যে, মহাবৎ খাঁর সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করছিল। অজয়সিংহ তাদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আর কল্যাণীকে সৈন্যেরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য! সত্য! অজয়! পুত্র আমার! আমার ক্ষমা চাইবার অবকাশ দিলি নে? আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলাম! তাই তুই গৃহ ছেড়ে চলে' গেলি তবু আমি কথাটি কই নি। কেন তোকে ডেকে ফিরালাম না! কেন যেতে দিলাম!—অজয়! প্রাণাধিক আমার! ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলি না! এত অভিমান! এত অভিমান! আমি তোর বড়ো বাপ! অজয়—অজয়!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখ কি? অজয় আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা বলেছ সত্যবতী! অজয় আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে। আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে। দুঃখ কি!—আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে। যাও সগৌরবে এর দাহ করগে, যাও!

মুখ ঢাকিলেন, বাহকগণ অজয়সিংহের দেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

গোবিন্দ। দাঁড়াও! আর একবার দেখে নেই। সর্বস্ব আমার! বৃদ্ধের সম্বল! অন্ধের যশিষ্ঠ! প্রিয়তম বৎস আমার! একবার!—না, না, দুঃখ কিসের? সত্য বলেছ সত্যবতী। অজয় আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে।—মেবার! রাক্ষস! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হ'ল না—তুই ত যেতে বসেছিস্! তবে সব না খেয়ে যাবি নে! আমার সোনার সংসার! না! না! কে বল্লে আমার অজয় মরেছে। মরে নি ত। ঐ যে আমার পানে চাইছে। ঐ যে এখনও বেঁচে আছে!—অজয়! অজয়!

গোবিন্দসিংহ অজয়ের মৃতদেহের পানে ধাবিত হইলে সত্যবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! শোকে উন্মত্ত হ'য়ে না। তোমার পুত্র আর নাই!

গোবিন্দ। নাই! পুত্র নাই! সত্য বটে; পুত্র নাই! এ আমার দ্রাবি—অজয়! অজয়! আমার সর্বস্ব! [মুখ ঢাকিলেন]

সত্যবতী। তুমি বীর। পুত্রশোকে এত অধীর হওয়া তোমার কি শোভা পায় গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। কি বলছ সত্যবতী, আরও চোঁচিয়ে বল। শুনতে পাচ্ছি না। আমার ভিতর একটা ঝড় বইছে। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। ওহো হো হো হো!

নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পিতা! পিতা!

গোবিন্দ। কে ডাকলে? কল্যাণী না? সর্বনাশী—দেখ্ তোর কীর্তি! আমার অজয়কে তুই খেয়েছিস্ রাক্ষসী! দে, তাকে ফিরিয়ে দে।

কল্যাণী। বাবা—এই যে দাদার মৃতদেহ!—দাদা! দাদা! দাদা!

কল্যাণী অজয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন

গোবিন্দ। সরে' যা, আমার অজয়কে স্পর্শ করিস্ না। সরে' যা ডাইনি—

এই বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিলেন

কল্যাণী। [উঠিয়া] বাবা, আমি সত্যই ডাইনি। আমার বধ কর। কে আমার নাম রেখেছিল কল্যাণী?—বাবা! আমি তোমার গৃহে অকল্যাণের শিখা—মেবারের ধূমকেতু—পৃথিবীর সর্বনাশ। আমার বধ কর! এ সর্বনাশীকে জগৎ হতে দূর কর। আবার সব ফিরে পাবে। আমার বধ কর! বধ কর!

গোবিন্দের সম্মুখে জান্দু পাতিলেন

গোবিন্দ। আমার অন্তরে এ কি হচ্ছে! এ যে একটা নরকের দাহ—একটা পিশাচের নৃত্য! আর যে পারি না! আর যে পারি না জগদীশ!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখে অধীর হ'য়ে না। সগৌরবে তোমার বীর পুত্রের দাহ কর। তোমার পুত্র আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে!

গোবিন্দ। সত্য কথা! সত্য কথা! অজয় আন্তরিক্যে প্রাণ দিয়েছে, আর দুঃখ কবে' না। ক্ষমা কর মা!—এ ত আমার গৌরবের

কথা—তবে—[ক্রন্দনস্বরে] বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি
সত্যবতী! বড় বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী। বাবা—

গোবিন্দ। [কম্পিতস্বরে] আয় কল্যাণী!
আমার বৃদ্ধকে আয় মা! আয় আমার গৃহ-
প্রতাড়িতা, পতিপরিভ্রান্তা, মাতৃহীনা, অভা-
গিনী কন্যা আমার! আমি সতী-সাধবীর
অমর্যাদা করেছিলাম, তাই আমায় ঈশ্বর এই
শাস্তিবিধান করেছেন।—যাও, তোমরা মৃতদেহ
দাহ করগে।

বাহকগণ মৃতদেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে বেগে
আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা মানসী সেখানে প্রবেশ
করিয়া কহিলেন—

মানসী। দাঁড়াও! আমি একবার দেখে নি।

সত্যবতী। এ কি! রাজকন্যা!

মানসী। অজয়! প্রিয়তম! জীবনসর্বস্ব
আমার! স্বামী আমার!

সত্যবতী। সে কি রাজকন্যা—তোমার
স্বামী!

মানসী। তবে শোন সবাই! কখন বলি
নাই, আজ বলি।—এই অজয়সিংহের সঙ্গে
আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারে
নি—আমি নিজে জান্তে পারি নি। নীরবে,
নিভূতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত
হয়েছিল।—প্রিয়তম! কোথা যাও। দেখ, আমি
এসেছি—আজ আমি আর তোমার সে প্রগল্ভা
গুরু নহি; দীনে দয়াময়ী রাজকন্যা নহি;
আজ আমি তোমার প্রেমভিখারিণী দুর্ভলা
রমণী! আজ আমি পথের দীনতম ভিখারিণীর
চেয়েও দীন! অজয়! তোমায় কখন বলি নাই
যে, তোমায় কত ভালবাসি! আমি আগে
বৃদ্ধকে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর।

সত্যবতী। আহা, রাজকন্যা শোকে উন্মত্ত
হয়েছেন! শান্ত হও মানসী! অজয় আত্ম-
রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—

মানসী। সত্য কথা। এই রকম করেই প্রাণ
দিতে হয়। প্রিয় শিষ্য আমার! আজ তুমি
আমার গুরুর স্থান অধিকার ক'রেছ। তোমার
গরিমার রশ্মি পরলোক ছাপিয়ে পৃথিবীর
গায়ে লেগেছে। মর্ত্যে হয় ত এই রকম করেই!
—বৃদ্ধ গোবিন্দ! বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি, যে,
এ হেন পুত্রের গৌরব কস্তে পার! ধন্য আমি!

যার এই স্বামী।—গোবিন্দসিংহ! এ আমাদের
গর্ব কর্বার সময়, শোক কর্বার সময় নয়।

গোবিন্দ। [শূঙ্ককণ্ঠে] রাজপুত্রী! অজয়
আত্মরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। কিসের দুঃখ?
[ভগ্নস্বরে] অজয় দেশের জন্য—

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ আর কথা কহিতে
পারিলেন না। গৃহ-প্রাচীরের উপর দক্ষিণ বাহু
রাখিয়া তাহার উপর মূখ ঢাকিলেন। একটা নিরুদ্ভ
ক্রন্দনের আবেগে তাহার জীর্ণ দেহখানি
আলোড়িত হইতে লাগিল।

মানসী। বৃথা! বৃথা! বৃথা! ভিতর থেকে
একটা প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা
ছাপিয়ে উঠছে! আর পারি না—অজয়!
অজয়!

কল্যাণী। এ সব কি! কিছ, বৃদ্ধকে
পার্ছি না। এ স্বর্গ না মর্ত্য! এরা দেবতা না
মানুষ! এ জীবন না মৃত্যু! আমি কে—ওঃ—
মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন

সত্যবতী। কল্যাণী! কল্যাণী!

গোবিন্দ। মেয়েটা মছে! মর্ত্যে দেও!
এক সঙ্গে সব যাব—পুত্র, কন্যা, আমি, মেবার
—সব যাব—পুত্র গিয়েছে—কন্যা গিয়েছে: ঐ
মেবার—আমার সাধের মেবার—সেও ডুবছে—
ডুবছে—ঐ ডুবলো—আমিও নাই।

সত্যবতী। মাত্রা পূর্ণ হ'ল!—এখন একটা
প্রলয় হোক—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের পশ্চিমপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির।
কাল—সায়াক্।

মহাবৎ শিবিরের বাহুদর্শে দাঁড়াইয়া মেবার
পাহাড়ের উপর অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা দেখিতে-
ছিলেন; পরে কহিলেন—“যাক্, অস্ত গেল।”

এমন সময়ে মহারাজ গজসিংহ প্রবেশ করিয়া
কহিলেন—

গজ। খাঁ-সাহেব—

মহাবৎ। মহারাজ!

গজ। যুদ্ধে জয় লাভ ক'রেও আপনি
সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ কর্ব্বেন না কেন?

মহাবৎ। তার কারণ আমায় কি এখন
মহারাজকে দিতে হবে?

গজ। না, একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা

কর্চ্ছলাম মাত্র—শুনেছেন খাঁ-সাহেব, এবার মেবারের নারীগণ অস্ত্র ধবেছেন।

মহাবৎ। নারীগণ অস্ত্র ধবেছেন।—নারীগণ।

গজ। হাঁ, দেখা যাক, তাঁরা যুদ্ধ কি বকম কবেন। এবার এ যুদ্ধের মধ্যে একটু কোমল ভাব আসবেই। এবার যুদ্ধ আমি যাব।

মহাবৎ। মহাবাজ, বাজপুত্র নারী নিয়ে, রাজপুত্র আপনি এরূপ ঘৃণ্য পবিহাস কর্তে পারেন। আপনি কি সত্যই বাজপুত্র না

গজ। মহাবৎ খাঁ

মহাবৎ। যান-যান এট শৌখাটুকু ভাবি-যাতে আপনাব দেশের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

[গর্জাসংহেব প্রস্থান।

মহাবৎ। এই সব মহাঝাবা হিন্দুধর্মেরি ধরুজা উড়াচ্ছেন। হিন্দু। তোমরা সাম্রাজ্য হারিয়েছ সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব-টুকুও হারিয়েছ।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

মহাবৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। সাহাজাদা সসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহাবৎ। এসেছেন?—আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

মহাবৎ। সৈন্য নিয়ে আসবার আৰ প্রয়োজন ছিল না। মেবার ধরুংস আমি সম্পূর্ণ করছি। তবে আমি মোগল সৈন্য নিয়ে উদয়-পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্তে চাই না। সে কাজ সাহাজাদা—মোগল, স্বয়ং কবেন। আমার কাজ এইখানে শেষ।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

মহাবৎ। কে তুমি বৃন্দ?

গোবিন্দ। আমি মেবারের একজন সামন্ত।

মহাবৎ। এখানে কি মনে করে?

গোবিন্দ। বলছি, হাঁফ নিতে দাও।

মহাবৎ। তুমি কি রাণা অমরসিংহের দূত! সন্ধির প্রস্তাব এনেছ?

গোবিন্দ। তার পূর্বে যেন আমার শিরে বজ্রঘাত হয়!

মহাবৎ। তবে তুমি এখানে কি চাও?

গোবিন্দ। মর্তে চাই। বৃন্দ হয়েছি; মর্তে চাই। যুদ্ধ করে মর্তে চাই।—তবে সামান্য সৈনিকের হাতে মর্বার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা—তোমার হাতে মর্বার।—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মর্বার।

মহাবৎ। বৃন্দ! তুমি কি বাতুল!

গোবিন্দ। না মহাবৎ, আমি বাতুল নই। তুমি ভাবছ যে, আমি পারি যদি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ কর্তে এসেছি। হা ঈশ্বর! 'সে শত্রু আমার যদি এখন থাকত' না মহাবৎ খা, আমি জানি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার সঙ্গে আজ আৰ পার্বে না। তবে মর্তে পার্বে। আমি তোমার হাতে মর্তে চাই।

মহাবৎ। এ অত্যন্ত অদ্ভুত ইচ্ছা।

গোবিন্দ। কিছু না আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধে স্বর্গীয় মহাবাণা প্রতাপসিংহের পার্শে দাঁড়িয়ে করছি। এ দেহে অনেক ক্ষতের চিহ্ন আছে। আমার শেষ ক্ষত তোমার খজাঘাতে হোক।

মহাবৎ। তাতে তোমার লাভ?

গোবিন্দ। লাভ বিশেষ নাই। তবে তুমি ধর্ম যবন হলেও জাতিতে রাজপুত্র, আৰ তুমি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতৃপুত্র। তোমার হাতে মরার একটা গৌরব আছে।

মহাবৎ। আপনি কি সালুস্বাপতি গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ? হাঃ—চিনেছ মহাবৎ খাঁ? এখন বৃদ্ধিতে পাচ্ছে, যে কেন মর্তে চাই? মহাবৎ খাঁ! আজ তুমি মেবার জয় কবেছ মেবার ধরুংস করেছ। তবে তোমায় উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্তে দিব না। মেবারের আৰ সৈন্য নাই। তোমার আৰ যুদ্ধ কর্তে হবে না। মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগলবাহিনীর গতিরোধ কর্তে। আমায় বধ না করে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্তে পার্বে না। অস্ত্র নাও।

[তরবারি নিষ্কাশন।

মহাবৎ। বীরবর! আমি সে দুর্গে প্রবেশ কর্তে চাই না।

গোবিন্দ। চাও, না চাও, সমানই কথা।—নাও; অস্ত্র নাও!

মহাবৎ। শুনুন—

গোবিন্দ। না, শূন্তে চাই না। শূন্তে চাই না। আমার অন্তরে একটা দাবাঙ্গিন জ্বলছে। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই—আমি মর্ত্তে চাই। আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই। বাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই—আর তার হাতে মর্ত্তে চাই, যে আমার জামাই হ'য়েও আমার পুত্রহস্তা—আমার দেশের সন্তান হ'য়েও যে পবেব গোলাম—আমাব ধম্মের হ'য়েও যে মুসলমান—আমাব বাজার ভাই হ'য়েও যে তাব শত্রু। অস্ত্র নাও নাও।

মহাবৎ তববারি নিষ্কাশন করিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাকে কখনও বধ করবো না।

গোবিন্দ। কোন কথা শূন্তে চাই না। নিজেকে রক্ষা কর।

মহাবৎ। সালুস্বাপতি—

গোবিন্দ। আমায় বধ কর—বধ কর

মহাবৎ। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করলাম।

গোবিন্দ। ছাড়ছি না মহাবৎ, অস্ত্র নাও। আমি আজ মর্ত্তে এসেছি মর্ত্তে। অস্ত্র নাও। আমি ছাড়বো না।

। আক্রমণ করিতে উদ্যত।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দ-সিংহকে গুলি করিলেন, গোবিন্দসিংহ পরিত্যক্ত হইলেন

মহাবৎ। এ কি! কি করলে মহারাজ!

গজ। বধ করোঁছি।

মহাবৎ। জানেন উনি কে?—

গজ। কে? একজন দস্যু।

গোবিন্দ। দস্যু আমি নই মহারাজ! দস্যু তোমরা! পরের রাজ্য লুণ্ঠ কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ। মহাবৎ খাঁ! যাও, এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ করবে না। নিজের মাকে ধরে' মোগলের দাসী করে' দাও। সন্তানের কার্যা কর। অজয়! কল্যাণী—

মৃত্যু

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ।
কাল—রাত্রি।

একজন দুর্গরক্ষক রাজপুত্র-সৈনিক ও পুরবাসীগণ কথোপকথন করিতেছিল

১ পুরবাসী। রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়েছেন কেন সৈনিক?

সৈনিক। কেন তা জানি না। শূন্যলাম, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে সম্মাটকে পত্র লিখেছিলেন। তাই সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদুত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এর্নোঁছিল। শূন্যেছি তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগলদুত ফিরে গেলে রাণা তার পরদিন—আজ প্রত্যুষে উঠে ঘোড়ায় চড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।

২ পুরবাসী। তাব পর?

সৈনিক। তাব পর কি হয়েছে তা জানি না।

৩ পুরবাসী। রাণা এখনও ফিরে আসেন নি?

সৈনিক। না।

৪ পুরবাসী। তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে?

সৈনিক। কেউ যায় নাই। তিনি একা গিয়েছেন।

১ পুরবাসী। ও কে?

২ পুরবাসী। আমাদের রাণা নয় ত?

৩ পুরবাসী। তাই ত! ও কে? রাণা ত না!

৪ পুরবাসী। রাজার মত পোষাক কে লোকটা জানেন সৈনিক?

সৈনিক। উনি যোধপুরের মহারাজ গজ-সিংহ।

১ পুরবাসী। ঐ সেই রাজা, না, যে, মহাবৎ খাঁ'ব সঙ্গে মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে?

সৈনিক। হাঁ।

২ পুরবাসী। জাতিতে রাজপুত্র?

৩ পুরবাসী। রাজপুত্র হ'য়ে রাজপুত্রের শত্রু।

সৈনিকদল সহ মহারাজ গজসিংহের প্রবেশ

গজ। সৈনিক, দুর্গের দ্বার বন্ধ ?

সৈনিক। হাঁ, মহারাজ!

গজ। দ্বার খোল। এখন এ দুর্গ আমাদের।

সৈনিক। প্রভুর বিনা আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার খুলতে পারি না মহারাজ।

গজ। প্রভু! তোমাদের প্রভু এখন রাণা অমরসিংহ নয়, তোমাদের প্রভু আমি।

সৈনিক। আপনি! সেটা জানতাম না। তবুও আমাদের রাণা অমরসিংহের বিনা আজ্ঞায় দুর্গদ্বার খুলতে পারি না।

গজ। সৈনিকগণ! এর কাছ থেকে চাবি কেড়ে নাও!

সৈনিক। প্রাণ থাকতে নয়।

তরবারি বাহিব করিল

গজ। তবে একে বধ কর—

১ পুরবাসী। [অন্য পুরবাসীকে।
দাঁড়িয়ে দেখেছে কি—মারো।

সকলে মিলিয়া গজসিংহকে আক্রমণ করিল

গজ। সৈনিকগণ—

গজসিংহের সৈনিকগণ পুরবাসীদের আক্রমণ করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মোগল-সৈন্য-পরিবৃত্ত রাণা অমরসিংহ আসিয়া কহিলেন—

অমরসিংহ। সৈনিকগণ—অস্ত্র রাখ।

রাজপুত্র-সৈনিকগণ মোগলসৈন্যগণকে দেখিয়া
অস্ত্র রাখিল

রাণা। মহারাজ গজসিংহ! এখানে তোমার প্রয়োজন?

গজ। আমি এই দুর্গে প্রবেশের অধিকার চাই।

রাণা। রাজ-অতিথি! রাণা অমরসিংহ যথোচিত অতিথি-সৎকার কর্বে।—মোগলের কুক্কুর! তোমার যোগ্য অতিথি-সৎকার এই। [পদাঘাতে গজসিংহকে ভূপাতিত করিলেন] সাহসী সৈনিক, দুর্গদ্বার খোল। [দুর্গদ্বার খুলিলে তিনি মোগল-সৈনিকদিগকে কহিলেন] তোমরা যেতে পার।

রাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ
হইল

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মেবারের গিরিপথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

সত্যবতী ও তাহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ
চারণীগণের গীত

(১)

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোব
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পবাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর?
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গবিমা হাষ!
ঘন মেঘরাশ, ঘোঁরিয়া আকাশ,
হানিয়া তঁড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
বস্তু নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা এ ঘোব লজ্জা
—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার;

(২)

গাহে নাকো আর কুঞ্জ তাহার
পিকবর আজ হরষগান,
ফোটে নাকো ফুল আসে না আকুল
ভ্রমর কবিত্তে সে মধুপান,
আর নাহি বয়, শিহরি মলয়,
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ;
মেবার নদীর ম্লান দুটি তীব
—করে নাকো আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৩)

মেবারের বন বিষাদ মগন;
আঁধার বিজন নগর গ্রাম,
পুরবাসী সব মলিন নীরব;
বিষাদ মগন সকল ধাম;
নাহি করে আর খর তরবার
আসফালন সে মেবার বীর;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি,
ব্রহ্ম মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৪)

এ ঘন আঁধার! কিবা আছে তার!
সান্ধনা আর কে করে দান
চারণ কবির বিনা সে গভীর
অতীত মেবার মহিমা গান!
গেছে যদি সব সুখ কলরব,
অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ধনা সুখে
শুন্যে মেবার ধ্বনিয়া যাক্।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

সৈনিকগণের সহিত হেদায়েৎ আলির প্রবেশ
হেদায়েৎ। কে তুমি?

সত্যবতী। আমি চারণী।

হেদায়েৎ। তুমি পথে ঘাটে এই গান গেয়ে
বেড়াচ্ছ?

সত্যবতী। হাঁ সৈনিক! আমার ব্যবসাই
গান গাওয়া।

হেদায়েৎ। তুমি এ গান গাইতে পাবে না।
অরুণ। কেন সৈনিক?

হেদায়েৎ। আজ এ দেশ তোমাদের নয়;
এ দেশ মোগলের।

সত্যবতী। মোগলের জয় হোক। যতদিন
মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি।
এখন মেবার একবার যখন অবনতিশিরে
মোগলের প্রভু স্বীকার করেছে, তখন
মোগলের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ নাই।
তবে তাই বলে' কাঁদতেও পাবে না?—মোগল-
সৈনিক! জগতে সবারই মাকে ভালবাসতে
আছে, কেবল কি হতভাগ্য মেবারবাসীরই
নাই?

হেদায়েৎ। না, গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। আমরা গাইব, দেখি কে রোখে;
গাও মা।

হেদায়েৎ। এ গান গাও যদি, তোমায়
আমাদের বন্দী কর্তে হবে।

সত্যবতী। কর বন্দী সৈনিক! আমাদের
বন্দী কর। আমরা তোমাদের কারাগারে বসে'
এই দুঃখের গানে তার গভীর অন্ধকার
ধনিত কর্বে—গাও পুত্র!

হেদায়েৎ। উত্তম! তবে তুমি আমার
বন্দী।

অগ্রসর

অরুণ। খব্দার। [তরবারি বাহির করি-
লেন] মাকে স্পর্শ করিস্ না, যদি প্রাণে
মায়া থাকে।

হেদায়েৎ। উদ্ভত বালক! অস্ত রাখ।

অরুণ। কেড়ে নাও।

সৈনিকগণ অরুণকে আক্রমণ করিল। অরুণ যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! তোমার মাকে
রক্ষা কর।

একজন সৈনিক ভূপতিত হইল

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! প্রাণ থাকতে
অস্ত ছেড়ে না। এই ত চাই—ওঃ—কি আনন্দ!

হেদায়েৎ আলি পরে অরুণকে স্বয়ং আক্রমণ
করিলেন। অরুণসিংহ পিছাইয়া বসিয়া যুদ্ধ
করিলেন। সৈনিকগণ ও হেদায়েৎ তাঁহাকে ঘিরি-
লেন। সত্যবতী, পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া
ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মর্দিত করিলেন। এমন সময়ে
মহাবৎ খাঁ পশ্চাৎ হইতে সৈন্যে আসিয়া
কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হও হেদায়েৎ আলি।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্ষান্ত হইল
লজ্জা নাই হেদায়েৎ আলি, দুইজন মোগল-
সৈনিক মিলে একজন বালককে আক্রমণ
করেছ! তার উপর তোমারও তরবারি বাঁধ
কর্তে হ'ল! ধিক!—তুমি প্রাণ দিয়ে তোমার
মাকে রক্ষা কর্তে গিয়েছিলে। ধন্য তুমি! এই
রক্ষা করেই ত প্রাণ দিতে হয়! বেঁচে থাক
বৎস!

সত্যবতী এতক্ষণ সম্বন্ধ মৃষ্টিম্বয় স্বীয় বক্ষোপরি
রাখিয়া সর্গোরবে তাঁর আনন্দে অরুণের মুখের
উপর চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মহাবৎ
খাঁর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া
আসিয়া শির নত করিলেন। মহাবৎ সত্যবতীর
দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ডাকিলেন—

মহাবৎ। ভাগিনি!—আর কি বলব
তোমাকে! তোমাকে ভগ্নী বলে ডাকবারও
অধিকার রাখি নি। তবে—আর কি বলব!
আমায় ক্ষমা কর, ভাগিনি!

সত্যবতী। ভগবান—এ কি কর্লে! আমার
ছোট ভাইটি আমাকে ভগ্নী বলে ডাকছে!
তবু আমি তাকে আমার বৃকের মধ্যে টেনে
নিতে পারিচ্ছি না!

অরুণ। ইনি কে মা?

সত্যবতী। ইনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ
খাঁ।

মহাবৎ। আমি তোমার মামা।

সত্যবতী। চল বৎস। আমরা যাই।

মহাবৎ। কোথা যাবে? আমায় ক্ষমা করে
যাও।

সত্যবতী। তুমি কি পাপ করেছ, তা জান
মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জানি আমি নিজের হাতে নিজের

ঘরে আগুন দিয়েছি; আর পৈশাচিক উল্লাসে তার উৎকৃত ধূমরাশি দেখেছি।

সত্যবতী। শূধু তাই কি!

মহাবৎ। আর কি? মুসলমান হয়েছি? আমি স্বীকার করি না যে আমি তাতে কোন পাপ করেছি।—যা'র যা বিশ্বাস। তবে—

সত্যবতী। উত্তম!—এসো বৎস!

মহাবৎ। দাঁড়াও। তাই যদি হয়, তা হলে সে পাপ কি এত ভয়ানক যে, সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে? ভগ্নি! আমি জানি, যে নারীর হৃদয় পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলাভূমি, প্রীতির নন্দনকানন। আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর, যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষণ করে' দিতে পারে? একবার এক মূহুর্তের জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শূধু মনে কর, যে তুমি মানুষ, আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী—আমি ভাই। মনে কর সেই শৈশবকাল, যখন তুমি আমার কোলে করে' বেড়াতে, আমার গণ্ডদেশ চুমায় চুমায় ভরে' দিতে, আমাকে কোলে করে' জড়িয়ে থাকতে। মনে কর—আমরা সেই দুই মাতৃহীন ভাই-ভগ্নী!—দিদি!

সত্যবতী। ভগবান—

মহাবৎ। দিদি—

সত্যবতী। আর পারি না। যা হবার তা হয়েছে।—ছোট ভাইটি আমার! যাও আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় ক্ষমা করেন। যাও ভাই! তুমি আর আমার কাছে মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নও! তুমি শূধু আমার সেই ছোট ভাই মহীপৎ।—যাও ভাই।

মহাবৎ। তবে এসো দিদি।

প্রণাম করিলেন

সত্যবতী। আয়ুস্মান্ হও ভাই!—চলে এসো বৎস!

হেদায়েৎ। কোথা যাবে? আমরা তোমায় বন্দী করবো।

মহাবৎ। কারও সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে আমার ভগ্নীর একটি কেশ স্পর্শ করে।—যাও ভগ্নী!

হেদায়েৎ। তুমি আর সেনাপতি নও মহাবৎ খাঁ! এখন আমরা তোমার কথা মানি না। সেনাপতি এখন সাহাজাদা খুদুম।

সাজাহানের পবেশ

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি স্বয়ং সে আজ্ঞা দিচ্ছি! যাও মা! নিঃশব্দে ঘরে যাও। হেদায়েৎ। কিন্তু এ নারী পথে ঘাটে বিদ্রোহের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে সাহাজাদা।

সাজাহান। আমি দূর হতে সে গান শুনছি। সে এক হতাশায় গভীর দুঃখের গান।

হেদায়েৎ। এতে যদি রাজ্যে অশান্তি হয় সাহাজাদা?

সাজাহান। সে অশান্তি দমন কর্তে মোগলসম্রাট জানে। হেদায়েৎ আলি খাঁ! মেবারে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে, তার কোন সম্ভান তার মায়ের নাম গাওয়ার জন্য যদি এই বিপুল মোগলসম্রাজ্য একখণ্ড শরতের মেঘের মত উড়ে যায় ত যাক্। মোগল সম্রাজ্য এমন বালুর ভিত্তির উপর গঠিত নয় হেদায়েৎ। সে সম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত! মোগলসম্রাট কখন কোন সঙ্গত, ন্যায্যোচিত ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় যাপ্য দিবে না। তার জন্য যদি তার এ সম্রাজ্য দিতে হয়—দিবে। বদলে হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞা সাহাজাদা?

সাজাহান। গাও মা! দুঃখ তা নয় যে তুমি এই গান গেয়ে বেড়াও; দুঃখ এই, যে, সে গান শুনবার লোক আজ মেবারে নাই। গাও মা, কোন ভয় নাই। আমি শুনবো। আমি তোমার মায়ের অতীত গরিমার সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে কাঁদতে জানি।—গাও মা! গাও বালক! আমিও সে গানে ষোগ দিব! গাও হেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ।

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

সম্ভ্রম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—সন্ধ্যা।

মানসী একাকী

মানসী। আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদুগভীর

অনাদি সংগীত শব্দতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর। মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অব্যাহত নীলিমা দেখতে পাচ্ছি—শতগুণ নিম্মল। আমার কর্তৃবাপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রসারিত দেখাচ্ছি।

কল্যাণীর প্রবেশ

মানসী। কে, কল্যাণী?

কল্যাণী। হাঁ রাজকুমারী।

মানসী। আবার রাজকুমারী! তোমাব সঙ্গে আমার এক নতুন সম্বন্ধ হয় নাই?—এই আবার কাঁদছে কল্যাণী! ছিঃ বোন।

কল্যাণী। আর কাঁদবো না। কিন্তু বোন—আর যে সৈতে পারি না। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। আমায় সান্ধনা দাও।

মানসী। তোমার সমস্ত দুঃখভার আমাকে দাও, আর আমার সুখ তুমি নাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমার সুখ!

মানসী। হাঁ, আমার সুখ! দুঃখ আমাকে পিষে ফেলবে ঠিক করে এসেছিল—তা সে পারে নাই, পার্শ্বও না। আমি দুঃখকে হিংস্র জন্তুর মত বেঁধে বশ করে নিজেদের কাজে লাগাবো। দুঃখ আমার বড় উপকার করেছে কল্যাণী। এতদিন আমি সুখের রাজ্যে বাস করে এসেছিলাম—দুঃখের রাজ্য দূর থেকে একটা কুর্কটিকার মত দেখেছিলাম। আজ সেই রাজ্যে বাস করে এসেছি। শত্রুকে জেনেছি, চিনেছি। আর সে আমায় অসতর্ক অবস্থায় পাবে না। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।

কল্যাণী। ধন্য তুমি বোন!

মানসী। তুমিও ধন্য হবে কল্যাণী!

কল্যাণী। কেমন করে বোন?

মানসী। এ কাজে আমার সহায় হও। এসো, আমরা দুইজন মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক।—আমার সহায় হবে?

কল্যাণী। হব।

মানসী। বেশ। তবে দেখ, সান্ধনা পাও কি না। এ ব্রত যার তার কিসের দুঃখ?

কল্যাণী। উত্তম! সেখানেই আমার ব্যর্থ-প্রেম পূর্ণ হোক।

মানসী। তুমি মহাবৎ খাঁকে এখনও ঘৃণা কর?

কল্যাণী। বোন! সেদিন গর্ভ করে' তাঁকে তাই বলে' এসেছিলাম। কিন্তু বুঝে দেখেছি যে, তাঁকে ঘৃণা করবার শক্তি আমার নাই। বাল্যকালে যাঁর স্মৃতি ধ্যান করে' বড় হযেছি; যৌবনে যাঁকে জীবনের ধুবতারা কবে' বোঝেছি ছিলাম, এ হতাশাব অন্ধকারে যাঁর চিন্তা আমাব অন্তরে রাবণের চিতার মত অবিরত ধু ধু করে' জ্বলছে, তাঁকে ঘৃণা কর্তে পার্শ্ব না। সে কেবল কথার কথা।

মানসী। তাব প্রয়োজন নাই কল্যাণী! তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ধনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না, যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করে সুখী।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। মানসী! তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন।

মানসী। বাবা ফিরে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে?

সত্যবতী। না, রাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুদরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশকুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা?

সত্যবতী ক্ষণেক নি-তম্ব থাকিয়া কহিলেন—

সত্যবতী। মানসী! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্ন্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না! সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ম্মান নেন। মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

মানসী। বাবা কি করবেন?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ

করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনবাস করবেন।—আজ মেবারের পতন হ'ল মানসী।

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল? না মা, তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! ষতদিন স্নোত বয়, জল শুষ্ক থাকে। কিন্তু সে স্নোত ষখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজার্তিবিশ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম—আজ প্রাণ-হীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' কন্দন কলে' কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ধনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ধনা আছে। সে সান্ধনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্, যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্জার অন্ধকারে ধর্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুদ্র নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্বা তাকে ভুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্! দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুস হোক্।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এই জাতি আবার মানুস হবে!

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা এই অথর্ষ আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে; যেদিন তারা যা উচিত বা কর্তব্য বিবেচনা করবে, নিভয়ে তাই করে' যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো প্রকৃষ্টির দিকে প্রক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পৃথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্মকে বরণ করবে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছু কর্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনাই গড়ে' আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপ-সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নিস্বর্ণ-প্রদীপ কোলে করে', চিরজীবন হাহা-কার কলে'ও কিছু হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।
রাণা অমরসিংহ একাকী

রাণা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গম্ভীরন করছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মূখ ঢাকছে। মেবারের হৃদ স্কোভে তটতলে আছড়ে পড়ছে। মেবারের কুল-দেবতারা রোবে মূখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার—রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল।—ওঃ!
[পাদচারণা করিতে লাগিলেন]—এই যে মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

রাণা। বন্দেগি খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক।

রাণা। মোগল-সেনাপতি! তোমার শূন্য হত্যার বিদ্যাই জানা আছে, তা নয়। দেখছি তুমি ব্যঙ্গ কর্তেও বেশ পটু। 'মেবারের রাণার জয় হোক'ই বটে!

মহাবৎ। না রাণা, আমি ব্যঙ্গ করি নাই।

রাণা। কর না কর, বড় যায় আসে না।— যাক, মহাবৎ খাঁ, আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন।

রাণা। বিনয়ী বটে! শোন। আমি এমন একটা কাজ কর্তে তোমায় ডেকেছি, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কর্তে পারে না।

মহাবৎ। আদেশ করুন।

রাণা। মহাবৎ খাঁ, আগে আমার পানে চাও দেখি; বল দেখি তুমি আমার কে?

মহাবৎ। আমি আপনার ভাই।

রাণা। ভায়ের উচিত কাজ হয়েছে। তোমার পিতামহের প্রপিতামহের মেবার তুমি মোগলের পদদলিত করেছ। তার বক্ষের রক্তে তোমার হাত দখখানি রঞ্জিত করেছ।

মহাবৎ। আমি সন্ন্যাসের নিমক খেয়েছি রাণা।

রাণা। সে কতদিন থেকে মহাবৎ খাঁ? যাক তোমার কাজ তুমি করেছ। তার জন্য তোমার সঙ্গে বাণীবতন্ডা করা বৃথা। যে বিধর্মী, যে মোগলের উচ্ছৃঙ্খলভোজী, তার পক্ষে এ কাজ অনর্চিত হয় নি। সে নিজে একটা অনিয়ম; উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের উদ্ভব, তার এ কাজ অনর্চিত হয় নি। তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয় নি। তার সঙ্গে মেবারের রাণারও শেষ কর। এই নাও, তরবারি।

তরবারি দিতে গেলেন

মহাবৎ। রাণা—

রাণা। প্রতিবাদ কর' না। শোন, আমাকে বধ কর! তাতে তোমার কালিমা বেশী বাড়বে না। আর তোমার কোন অপ্রিয় কাজ কর্তে আমি তোমাকে বলছি না। আমি জানি, তুমি আমার রক্তপান কর্তার জন্য আকুল পিপাসায়

ফেটে মরে' যাচ্ছ। তোমার ঐ দক্ষিণ হস্ত আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলবার জন্য উদ্যত আগ্রহে কাঁপছে। এই নাও সে হৃৎপিণ্ড। আমায় বধ কর।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ এত হীন নহে! আমি মেবারতুমি তরবারির আঘাতে ও অগ্নিদাহে শ্মশান করেছি সত্য। তবু আমি অন্যায় যুদ্ধে করি নি। ন্যায় যুদ্ধে করেছি!

রাণা। ন্যায় যুদ্ধ! একে ন্যায় যুদ্ধ বল মহাবৎ? একটি ক্ষুদ্র জনপদের মর্শ্চিম্যে সেনার উপরে একটা সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর ভার; একটা স্ফর্লিঙের উপর সমুদ্রের তরঙ্গপ্রপাত; শিশুর আত্মার উপর নরকের দঃস্বপ্ন। ন্যায় যুদ্ধ! যাক—তুমি জিতেছ। এখন সে কাজ শেষ কর। এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখো যেন তার অপমান না হয়।" আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হয়ে যাক।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা; সে জল্পাদ নয়।

রাণা। তবে যুদ্ধ কর। তোমার অস্ত্র নাও!

নিজে তরবারি নিলেন

মহাবৎ। রাণা, আমি মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাণা। সে কবে থেকে মহাবৎ? অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—আজ মেবারের শ্মশানের উপর মৃত মাতার শব স্কন্ধে করে', আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি।

মহাবৎ। রাণা শুনুন।

রাণা। কোন কথা শুনবো না। ভীরু..... স্লেচ্ছ...কুলাঙ্গার! যুদ্ধ কর। দেখি তোমার কি শৌর্য্য কি বীর্য্য দেখে সমস্ত ভারত মহাবৎ খাঁর নামে কম্পমান! অস্ত্র নাও—ছাড়বো না। অধম! নরকের কীট! শয়তান!

মহাবৎ। উত্তম রাণা—তবে তাই হোক [তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন] সাবধান রাণা! মহাবৎ খাঁর প্রতিশ্রুতী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—

উভয়ে তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

রাণা। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—যা
জগতে কেউ কখন দেখে নি। পৃথিবীতে প্রলয়
হোক।

এমন সময় আলুলায়িত কেশ বিস্ময়বসনা মানসী
আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন

মানসী। এ কি পিতা! এ কি—[মহাবৎ
খাঁর দিকে চাহিয়া। ক্লান্ত হোন!

রাণা। দূরে চলে' যাও মানসী! এ যুদ্ধে
বাধা দিও না।

মানসী। ক্লান্ত হোন পিতা! সর্্বনাশ যা
হবার হয়েছে। সে সর্্বনাশ আর নিজের
দ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্বেন না। এ শোকের
সাম্বন্ধনা হত্যা নহে—এর সাম্বন্ধনা—আবার মানুষ
হওয়া।

রাণা। মানুষ হওয়া—সে কি রকম করে'
মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ
বর্জন করে'। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা
বিশ্বপ্রেমে ধোঁত করে' দিয়ে।—গাও চারণীগণ,
সেই গান যা তোমাদের শিখিয়েছি—“আবার
তোরা মানুষ হ”।

রাণা অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁ এক অপূর্ব দৃশ্য
দেখিলেন। গৈরিকবসনপরিহিতা চারণীর দল
গাহিতে গাহিতে সেখানে প্রবেশ করিল। মানসী
সেই গানে নিজে যোগ দিলেন।

চারণীগণের গীত

কিসের শোক করিস ভাই

—আবার তোরা মানুষ হ'।

গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই

—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

পরের 'পরে কেন এ রোষ,
নিজেরই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ
—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই
হতাশময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায় তোলা
ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপন্ন,
পরকে নিয়ে আপন কর;
শত্রু হয় হোক্ না, যদি
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ,
তাহারে কর হৃদয় দান।

মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—
তাহারে দূর করিয়ে দে—
সবার বাড়া শত্রু সে
—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা
পরস্পরে রাঙায় চোক;
পুণ্যসেনা নিজেরে কর্
পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম যথা সৈদিকে থাক,
ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ভূবিয়া যাক
—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

রাণা। মহাবৎ!

মহাবৎ। অমর!

রাণা। তোমার কোন দোষ নাই। আমা-
দেরই দোষ। ক্ষমা কর।

মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই!

আলিঙ্গনবন্ধ

যর্বানকা পতন

সমাজবিভ্রাট

ও

কল্ক অবতার

পদ্য- ও শ্লোক-চরিত

রাজা বিমলেন্দু। নবাহিন্দু ও রাজার বয়স্য বিধুভূষণ (বৈজ্ঞানিক), নিধিরাম (ডাক্তার), নীলমণি (উকিল), হারাধন (মুন্সেফ)। গোঁড়াহিন্দু কুঞ্জনাথ (সম্পাদক), চতুরানন (বক্তা)। পণ্ডিত শিরোমণি, চুড়ামণি, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিরত্ন, ন্যাযরত্ন, বাচস্পতি। গঙ্গারাম (ব্রাহ্ম)। মিষ্টের দাস (বিলেতফেরত)। গোবর্ধন (মিষ্টের দাসের পিতা)। অন্যান্য নবাহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতগণ। ইন্দু ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। বসুমতী। শীতলা, মনসা, ওলা ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। যক্ষকন্যাগণ ও কনণ্ঠেবল। বানব ও বানরীগণ। ব্রহ্মা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্মা। চোঁড়াদার ও ঘোষণাকারী। কল্ক, বৃহস্পতি, ধর্ম ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

পদ্যগুলি পড়বার নিয়ম

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন 'সমাজ' কথাটি স—মা—জ এরূপ না পড়িয়া সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছন্দে ছন্দে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।

গল্পের আভাষ (Plot)

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাজ-বিভ্রাট দেখিয়া পণ্ডিতগণ গোঁড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন; অপর দিকে বিলেতফেরত ও নবাহিন্দুগণ এক স্লেচ্ছাচারী রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন সদৃশিক সর্বভুক্ পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যানিধি। পণ্ডিতগণ ও গোঁড়াগণ যে দিন রাজাকে স্লেচ্ছাচারী হইতে সংপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাগানবাড়ীতে আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্যানিধি ও রাজা, বিলেতফেরত ও নবাহিন্দুগণের সহিত খানায় বাসিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ খানিক রাজা ও বিলেতফেরতের সহিত বচসা করিয়া, শেষে সেই সর্ম্মিততে যখন বিদ্যানিধিকেও দেখিলেন, তখন পরাজয় অনিবার্য দেখিয়া রণে ভগ্ন দিলেন। গোঁড়াহিন্দুগণ তাহাতেও হতাশ্বাস না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। পণ্ডিতরা খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্তনে বাস্তব, এমন সময় শুনিলেন যে, রাজা বিলেত যাইতেছেন। এইখানে সমাজ-বিভ্রাট শেষ! এদিকে ইন্দুদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, মনসাদি দেবদেবীগণ হিন্দুধর্ম-প্রচার সত্ত্বেও উপযুক্ত পূজা না পাইয়া, যক্ষগণ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, বানব-বানরীগণ রম্ভাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ও বসুমতী পাপের ও অনাচারের ভারে ব্যথিত হইয়া, ব্রহ্মাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা কল্ক-অবতার হইবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষ্ণু কল্করূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও তাঁহার কাছে পণ্ডিত, গোঁড়া, নবাহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরতের বিচার হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। গ্রন্থখানির দেখান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য। কারণ, হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট

যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বিষ্ণু বাবু ও দীনবন্ধু বাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন “ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না” এরূপ রহস্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগর্ভিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা ‘রাগের কথা’। অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে ‘পাষণী’, শ্যামকে ‘লম্পট’ বলেন অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগর্ভি কি নিরীহ।

বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেতফেরত এই সম্প্রদায়ের চিত্রই অপেক্ষাপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথা কাহারও মখে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শব্দ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা বলা হইতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে।

স্থান ও পোষাক

প্রহসনের স্থান কলিকাতা। দৃশ্য ও পোষাক সমস্ত আধুনিক।

প্রস্তাবনা

পাঠিকা ও পাঠক! আমার এই নাটক—
প্রহসনই বলুন, পাছে ‘না মিষ্টি না টক’
কোন এক রূপসী এ কথা বোলে, করেন
রসিকতা;
প্রহসনই বলুন—তা’তে দিবনাক আটক;
—কথা নিয়ে মিছে তর্ক,—আপনাদের কাছে
এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র।
হইয়াছে অঙ্কিত তা’তে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্য নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ,
লক্ষ্য করে তাঁরে করা ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ।

নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা; হোয়ে’ পড়ে সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালভাবে, তা’লেই চুকে যাবে;
কেন নেবেন উড়োতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে;
বিবাদ বিসংবাদ যতই করেন ততই বাড়ে।

বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফের্ত, ও
ব্রাহ্মকে,
বেয়োর কত পদ্য গদ্য,—নানা কথাও রটে;
তা’তে তারা মারা যায়?—না তা’তে তারা চটে?

এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, না মদ
খেয়ে পাওয়া দুষ্কর (প্রবাদ); যদি তা না
খাওয়া যায়,
(যেহেতু সে স্বাস্থ্যনাশক), আমোদটাও তার
পাওয়া যায়,
মন্দই কি? না হয় একটুকু কাহার
চড়ই দিলাম, কিংবা দুটো গালই দিলাম,
যা হয়,
ভাল, বন্ধুভাবে;—সে কি মোরে’ যাবে?
—বন্ধুভাবে চড় কি গালে কাহারই বা অর্দুচি?
বেশ আমোদ হোল একটা বিনা বেশী খরচে।

শ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন,
পড়ুন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অন্ত;
দশ জন ডেকে নিয়েও আসুন; উপরন্ত,
—বইয়ের কোণা, ধার, মলাট করুন সব
তদন্ত;
দেখতে পান. কি না কোন স্থানে একটা শব্দ,
অন্যায়, কি শ্বেষবান্ মত অভিযুক্ত।
আমার মত (সে যাই হোক)—এ নাটকেতে
দেখান,
উদ্দেশ্যই নয়। “তবে এ জায়গায় এ কেন?”
“অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা?”
—হ্যাঁ—এ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা।

হ'তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্নের বহুতরো;
তার একটি এই—যে হাসতে গেলে ভাই,
(এ নাটকের উদ্দেশ্যটা অনেকটা তাই)

'এটা বাচালতা,' 'ওটা মিছে কথা,'
এ রকম 'বাহুবিচার' কণ্ঠে কিছ্‌ নাই;
দরকার হয়ত একটু রং দেওয়াই চাই।

মানুষের কি রকম একটা গাঙ্গীর্যের যে
অভাব,
ঘুমোচ্ছে কেউ গিয়ে (তার) নাকে কাটি দিয়ে
অর্থাৎ একটু কণ্ঠ দিয়েও হাসা তার স্বভাব।

কিন্তু তাই বোলে কারুর কাণ মোলে
দেওয়া উচিত?—স্ত্রীর বোনরা তাহাই ছাড়েন
কৈ?

যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই।

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন
নিহিত দৃষ্টিমি এ,—যে কেউ যদি ঘুমিয়ে
নাক ডাকায়;—কিংবা যদি কেউ বর্ষার কাদায়
পিছলে প'ড়ে বেশ একটু গোলযোগ বাধায়;

(আর) দৈবদুর্ভাগ্যপাকে যদি কেউ থাকে
উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফাঁকে।

কিংবা কোন ছেলে সারাদিন খেলে,
গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে,
গুরুম'শায় বলেন যখন "বল্‌ত হতভাগা—
বল্‌ত দোঁখি—না বল্‌তে পারিস্‌ ত আগা
থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পিটোব—বল্‌ত রে
'শিবের বাহন কি?—'কিছ্‌ মনস্থ না কোরে,
সে যদি শুধু একটা দেরির ওজোর সুরু

কণ্ঠে গিয়ে, গেঙগরে গেঙগরে বলে—

"আ—আজ্ঞে গুরু—
গুরু—ম—শায়—" অর্মানি যা'রা একটু দৃষ্টি
ছাত্র,

আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিয়পাত্র,
চোঁচয়ে হেসে ওঠে; সে হাসির চোটে
গুরুত নেই অথচ তাঁর দোষ নেই মোটে।

এই সব নিয়ে যদি কেউ গিয়ে
গল্প বানায়; তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোষবান্,—
যে সে এই মতাবলম্বী, ও মতে আকোশবান্।
শুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙা মদ্যে)
মত প্রকাশ কণ্ঠে গেলে কণ্ঠে কি আর পদ্যে?

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটকখানি
সনাতন প্রথাত্যাগী—প্রায় পদ্যের মতন;
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নতন'।

আবার মিত্রাক্ষরও কিছ্‌ নতনতরো;—
অক্ষরের বিপর্যয় গর্মিল হোল এ—
এ ছত্রটা তেরোয়, এটা বিশে, সেটা ষোলয়;
পূর্বতন প্রথা হ'য়েছে অন্যথা
এরূপে,—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।

"গদ্য কি পদ্য আগে বেশ চৌন্দয়
চেনা যেত: কি প্রকার হোল আবার অদ্য এ?
বেল্লিকামি বেয়াদবি, বে-আক্কেলি সদ্যঃ এ;
এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কাণের উপর
বিশ্বাস!"

হয়ত বল্‌তে পারেন কেউ ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক
নিঃসন্দো";

থাক্‌লেই বা একটুখানি বেল্লিকামির গন্ধ।"

এর উত্তর এও—"যেটা অভিনয়ে
সেটা কতক গদ্যের মত তৈরি করাই শ্রেয়ঃ;
নিশ্চেষ্ট ও কড়া ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়,
আবশ্যিক নেই কথায়, থিয়েটারে যাত্রায়।

তবে গদ্য থেকে দেখবেন প'ড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক—অর্থাৎ শুনতে একটু
মিষ্ট;
যেখানে তা হয়নি তা সে আমার দূরদৃষ্ট।"

আবও একটি কথা "নাটকের প্রথা
নয় যে কণ্ঠের গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত
ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা;—এও একটা মস্ত
বেয়াদবি" হোতে পারে—কেউ এরূপ ক'তে
পারে—

কিন্তু বোধ হয় তাঁরা একটা জানেন নাক যে
'আদবেই'
আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক 'বেয়াদবি।'

এই যেমন, একা ভাবা স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই;
(হয়ত কারো' কারো' কারণ নেই এরূপ
হ'বারই;
কারো কারো আছেও ত, আর মরা বাঁচাও ত

অনেক সময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে) —
কেউ আবার এরূপ স্বপ্ন দেখে দিনে দ্ব'পরে।
এখন তার চোঁচিয়ে ভাবতেই হবেঃ কিংবা

সেই

স্বপ্ন ব্যস্ত কস্তেই হবে, এব'প কড়ার নেই।
(আর) দীনের মতে তারে লেখা যেতেও
পাবে,
বিশেষ যখন প্রাসঙ্গিক করে কিছ' ব্যাখ্যা:—
না দেন ত নাই দিলেন এর নাটক আখ্যা।

পাঠক ও পাঠিকা, কল্লাম এ যা টীকা,
দিবেন আমার 'মোফে.' হাসি রাখেন চেপে,
ভালই; না রাখেন যদি আরো ভালো, কারণ
আমারও সেই উদ্দেশ্য—তায় করি না নিবারণ।
শুধু এক কথা শেষে বোলে হই বিদায়
(লাখ কথার এক কথা):—হবেন নাক নিদয়
এ দীনের প্রতি: তাঁবেদার অতি
বেচারী; আর আপনারা গরীবের মা বাপ:
এ বালক নাটকখানি কস্ব'ন না 'কাবাব'।

প্রথম অভিনয়

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শিরোমণির বহির্বাটী। কাল—প্রভাত।

দক্ষিণ জানু উ'চু করিয়া তদুপরি দক্ষিণ বাহু
প্রসারিত রাখিয়া শিরোমণি, ও সম্মুখে উপুড়
হইয়া চুড়ামণি আসীন

শিরো। [হতাশভাবে চুড়ামণির মূখের দিকে
তাকাইয়া] সমাজ আর টে'কে না যেরূপ
গতিক দোঁখ।

চুড়া। [মাথা নাড়িয়া] ঠাঃ কোনমতেই না—
কেমন করেই টে'কে ?

একে বহিছে ইংরাজ শিক্ষার খরতর স্রোত;
তদুপরি প্রবল বাত্যা—থাকে না আর পোত।

শিরো। বিষম সঙ্কট। [নস্য গ্রহণ]

চুড়া। শুধু সঙ্কট?—বাত্যাবিঘর্নিত
জীমূত-পটলযোগে—প্রলয় উপস্থিত।

শিরো। উপায় ?

চুড়া। [নস্য লইয়া] উপায় আর কি?—

মহাকলির আবির্ভাব;

ইষ্টদেবের নাম জপ; যত দিন এ পাপ

না ঘুচান অবতীর্ণ হয়ে দেব কল্কি:
ঘুচাতে এ মনুষ্যের সাধ্য কি.—বল্ কি—

বিদ্যানিধির প্রবেশ

বিদ্যা। [উচ্চৈঃস্বরে] কৈ শিরোমণি মশায়
কৈ?—বাঃ এই যে। [চুড়ামণিকে ঠেলিয়া]
কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে হে ?
কথা নেই যে।

শিরো। [মাথা হেঁট করিয়া]

আর কি ভাই মাথা ম'ড়ু—

সমাজ টে'কে না।

তাই ভাবছি ভাই,

আর সমাজ টে'কে না

দীর্ঘ নিশ্বাস

বিদ্যা। ঐ বটে তা বটে।

তবে কস্ব'ন নাক রোষ,

এ ত—ওর নাম কি—সব

আপনাদেরই দোষ।

উভয়ে। [সাগ্রহে] কিসে কিসে ?

বিদ্যা। কিসে? এ ত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ

গড়াচ্ছে,—দেখুন দেখি, এমন সুখাদ্য

কুক্কট—তা ছেড়ে কিনা

শুক'নো পাঁটা আহার!—

কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি—এ দোষটি কাহার ?

শিরো। ও যে ম্লেচ্ছে খায়, ভাই—

কুক্কট ও পেয়াজ

খেলে যদি হিন্দু তবে পড়ুক না

নেওয়াজ,

চুড়া। মুসলমান হতে তবে বাঁকি রইল

কি আর ?

বিদ্যা। [হাত নাড়িয়া] কি আর ? তোমার

মাথামু'ড়ু!—শোন বলি এয়ার,

মুরগী মানুষের খাদ্য করেছেন যে ব্রহ্মা,

প্রমাণ তার দিব খুব চওড়া ও লম্বা।

চুড়া। ওঁ বিষ্ণু! বিদ্যানিধি তুমি নিশ্চয়

যবন,

অথবা খেয়েছ তুমি, তাহাদের লবণ।

শিরো। আচ্ছা শুনুনই দেখি—কি দেয় ও

প্রমাণ—

বিদ্যা। [মাদুর চাপড়াইয়া]

প্রমাণ!—প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান;

প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি,
সব পাখীর। দেন নি কি?
চুড়ামণিকে ধাক্কা দিলেন
চুড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যানিধি,
বটে বটে।
বিদ্যা। [মুখ নাড়িয়া] কেন?
মাদুরে টোকা দিতে লাগিলেন
চুড়া। [মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া]
বোধ হয় উড়িবার জন্য।
বিদ্যা। [উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
চুড়ামণিকে প্রণাম করিয়া]
চুড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।
আচ্ছা—পাখা দিয়াছেন মুরগীরও;—নয়?
দেন নি কি?—বলুন ত দাদা মহাশয়!
[শিরোমণিকে]
শিরো। [একটু বিমনা হইয়া] অবশ্য
অবশ্য।
বিদ্যা। তবে পারে না কেন উড়তে?
বলুন দেখি কেন?
কঠিন সমস্যাসূচক ঘাড় নাড়িলেন
উভয়ে। কেন?
বিদ্যা। [মাথা ঘুরাইয়া] হঃ হঃ—পাল্লেন
নাক ফুড়তে
এই প্রশ্ন দাদা মহাশয়—হঃ হঃ—চুড়ামণি,
সোজা কথা—এর উত্তর—ওর নাম কি—
ননী?
খাওয়ার মত সোজা—তবে বলি,
বলি এ—
এ—এ—এটি বিধাতার সঙ্কেত; বাঃ তলিয়ে
বুঝছেন না? তিনি দিলেন মুরগীরে
এ লক্ষণ,
অর্থ—[সভাঙ্গ] মানুষ তারে কাট এবং
কর ভক্ষণ।
উভয়ের হাস্য
বিদ্যা। নইলে সব পাখী ওড়ে—
মুরগী পাখা থেকেও
উড়তে পারে না কেন? বোঝাতে হয়
একেও?
চুড়া। [নস্য লইয়া] কিপ্তং কুট বটে।

বিদ্যা। দেখুন আরো মিতীয়তঃ,
কুক্কুরের মাংস কেন বিধি কল্পেন অত
রসাল ও মধুর?
শিরো। [আশ্চর্য] হ্যাঁ! সে কি তুমি তবে
খাও বুঝি।—
বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] তা কি বলছি—
জানি অনুভবে।
বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি পণ্ডিতের
প্রবেশ
বিদ্যা। [হাত বাড়াইয়া]
আসতে আজ্ঞা হোক হেঁ হেঁ।
স্মৃতি। বসতে আজ্ঞা হোক,
বাচ। কি হচ্ছে সব?—বিদ্যানিধি
লাল কেন চোখ?
এই যে শিরোমণি মহাশয়—একবারে কোণে?
কচ্ছেন কি? [উত্তর না পাইয়া]
এতই যে চিন্তাকুলমনে?
বিদ্যা। কৰ্ণের আর কি? কেন দেখ করেন
এঁকে?
ইনি ভাবছেন সমাজটা টেকে কি না টেকে।
স্মৃতি। কেন? সমাজে হয়েছে কি?
বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] নাঃ হবে আর কি,
তবে কি না, যায়।—তা সে গেলেই বা
কর কি?
ন্যায়। যাবে কি হে? কত ধর্ম এল
গেল আবার,
এ ধর্ম কি যায় বাপু—এ ধর্ম কি যাবার?
অন্যান্য পণ্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও স্মৃতি-
সূচক ঘাড় নাড়িলেন
বিদ্যা। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মিছামিছি আর
[বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া]
নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেকেন না এবার,
জানেন? রাজা—ওর নাম কি—
বিমলেন্দ্র রায়,
আস্চে দুর্গেগাঁসবে—হঁ হঁ—সন্তমী
পুজায়,
দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ংকর খানা :
খাদ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা;
আস্চে শ্যাম্পেন—
[দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি হেলাইয়া]
নোমরস কোথায় বা লাগে?
এমন সুধা দেখিনি কেউ আর্য্যাবস্তে আগে।

সকলে। [সাগ্রহে। বটে বটে, তা'লেই ত
সংকট এবারে,
বাচ। চল যাওয়া যাক্ গিয়ে
বোঝাইগে তাঁরে—

হরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকসম্মিত, গলদেশে
মালাসুশোভিত, গুন্ডাদাড়িবিবজ্জিত, নামাবলী
উত্তরীয় পবিধেয়ী গোবর্ধনের প্রবেশ

শিবোর্মণিকে সাত্ঠাঙ্গ প্রণাম

শিরো। এই যে শিষ্য যে। কি হে গোবর্ধন
দাস।

দীর্ঘজীবী হও।

গোবর্ধন। [দন্তহীন কম্পতম্ববে।

গুরো, আজ সর্বনাশ,

অভয় দেন, অভয় দেন।

শিরো। কেন? হ'য়েছে কি?

গোব। আর হ'য়েছে কি?

গুরো! আঁধার জগৎ দেখি;

আমার বৃদ্ধের এক পুত্র হরির দাস

নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল। পরে কত মাস

কোন খোঁজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাস।

পরে এক দিন চিঠি এল হঠাৎ—কি না—

লম্পট

বুড় বাপের টাকা ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট!!!

এত দিন তা ভাঙিনি; ওঃ দয়াময় হরি!—

কাল যে সে বাড়ী ফিরছে: এখন কি করি?

কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

সকলে। এ্যাঁ এ্যাঁ বল কি গো!

আশ্চর্য্য পরস্পরের মুখাবলোকন

গোব। আর মাথামুঁড়ু গুরো!

কি বলবো! বৃদ্ধ বয়েস—যজ্ঞেশ্বর খুড়ো

ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে,

—দীনবন্ধু—গুরো আপনি

শাস্ত্রফাস্ত্র খুলে,

কোরে দিন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে

প্রায়শ্চিত্ত কোরে টোরে উঠতে পারে জাতে।

—হরি হে দীনবন্ধু—দুর্গা—শিব শিব।

মালা জপন

শিরো। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দিব।

যেত যদি রেঙ্গুন মেঙ্গুন, খেত ঘরে বসে'
যা খুঁসী তাই, দেখা যেত; কিন্তু শিষ্য

দোষ এ

একটু বিশেষ গুবুতর;—বিলেত যাওয়া;

আর

বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পার:—

এব প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না দেখে সেটা:—

আচ্ছা ক্লাঙ্গার'—এমন ভালো মানুষের

বেটা

এমনও হয়।

গোব। [উত্তিয়া। দেখবেন গুরো এর

ব্যবস্থাটা

দিতে পারে, যথাসাধ্য একশটি পাঁটা,

বিশটা মো'ষ গুণে মায়ের পায়ে নিবেদিব;

আর আপনাদের জানেন সবই,—

দুর্গা—শিব—

দেব প্রতি জনে, জানেন আমার কথা খাঁটি,

এক এক শ টাকা আর রূপোর থালা বাটি।

সকলে। [হর্ষে, পরস্পরের মুখে সহর্ষে

চাহিয়া]

নারায়ণ! [মুখ অবনতকরণ]

শিরো। আচ্ছা যাও, দেখবো ভালো কোরে,

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা—এখন যাও ঘবে:

[গোবর্ধনের প্রস্থান।

বিদ্যা। বৃদ্ধা বৈশ্যা তপস্বী এই—

কত যে এ'র পেটে—

সকলে। যাক্ যাক্ দরকার কি আর

ও সব কথা ঘোটে:

স্মৃতি। শিরোর্মণ ভায়া,

একটা শীকার পেলে ভালো,

কিছু গাঁটে আসবে।

শিরো। হাঁ হাঁ শীকারটা জাঁকালো

বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে,

প্রায়শ্চিত্ত কৰ্ণে নাই বা যদি বলে' ফেলে।

বাচ। তা'লে কৰ্ণ একঘরে।

বিদ্যা। করে' ভারি লাভ হে।

ফিরে এসে রোস্ট চপ্ বৈশী করে' খাবে।

শিরো। তা বটে। এখন ও সব একঘরে করে

লাভ নাই। ইংরেজমূলুক, খাটে না ত

জোর হে:—

বলতে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে,—

হিন্দুয়ানির অবস্থাটা, বলবে সব বৈদ্যে,

দাঁড়িয়েছে খারাপ; দেখ, আসল পাপ সব
বাদ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে;—
আরও সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর
ক্রোধে;
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।
মুরগী, পেঁয়াজ, দাড়ি রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ
মুসলমানী বোলেই ত—যারা কুর্ভাব্দা
তারা এ সব মানবে কেন' [চিন্তা]
চুড়া। [হতাশভাবে নস্য লইয়া]

কটুপ্রশ্ন, কটু!
শিরো। আমার বোধ হয় হিন্দুয়ানির
একটু ছোট ছোট
দরকার হচ্ছে। এই দেখুন বিলেতযাত্রা এ ত
লক্ষণটা ভাল নয়: দু এক জন যেত
না হয় যেত;—সবাই গেলে কাকে নিয়ে
থাকি:

তাইলই একঘরে হ'ল যারা রৈল বাকি।
চুড়া। হা হতোহস্মি [নস্যগ্রহণ]
তবু আর্ষ্য ঋষিগণের কথা—
আর সত্যযুগের সব সনাতন প্রথা—

নস্যগ্রহণ

বাচ। আচ্ছা, আপাততঃ এক পরামর্শ আছে;
ভূতনাথ খুব গোঁড়া হিন্দু, বক্তা, তার কাছে
যাওয়া যাক্। সে যদিও নব্যহিন্দুদলে
আমাদের হয়ে দু'কথা বুদ্ধিয়ে বলে।

পণ্ডিতদের গীত

ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই:—
ঐ ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য হ'ক, শূদ্র হ'ক—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে;
যবে গন্ডুশে সাগরজল করিলাম পান;
সবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান;
যবে শ্বিজপদাঘাতচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া। *
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই:—

* ক্রন্দনটি 'ই' নিশ্বাস ফেলিয়া ও 'য়া' নিশ্বাস
টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

ঐ গেয়েছিলনু যেই দিন সামবেদ গান;
ঐ রচোছিলনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ;
ঐ লিখোছিলনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা;
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গোব্রাহ্মণে কর্তে চায় জবাই।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
ঐ সে দিন নাই রে ভাই আর সে দিন
নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সেদিন আর নাই;—
ঐ উঠে গেল যাগযজ্ঞ কলিকালের ফেরে;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সর্বাধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরে জেলে দিতেও করে নাক শ্বিধা;
আর আমরাই তাদের করি
নর্তাশিরে 'সেলাম'—
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—
এবার আমরা গেলাম।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
[ক্রন্দন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অমরাবতী। কাল—রাতি।

ইন্দ্র বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। চারিদিকে দেব-
দেবীগণ যথাস্থানে আসীন। সম্মুখে নর্তকীগণ
নৃত্যগীত করিতেছে। পার্শ্ব চিত্ররথ দন্ডায়মান

অপ্সরাগণের গীত

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
নিয়ে আয় তোব নৃতন হাসি, গানের পাতা,
গানের ফুলে।
বলে, পিড়ি' প্রেমফাঁদে তারা সব হাসে
কাঁদে রে;
মোরা শূধু কুড়োই হাসি সুখনদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে
মধুবিষে রে;
মোরা শূধু বেড়িয়ে বেড়াই—নেচে গেয়ে
প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি, তারার কিরণ,
চাঁদের হাসি রে।
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় উড়িয়ে দে
এই এলোচুলে।

ইন্দ্র। বাহবা—বেড়ে! [সুধাপান] বেড়ে!
[সুধাপান]

রম্ভা। [হাসিয়া] প্রভু 'বেড়ে' ঐ গানটা না
সুধাটা?

ইন্দ্র। এই সুধাটা অবশ্য বেশী 'বেড়ে'!

আহা, আজকাল কি সোমরসই আর্ষ্য ঋষিগণ তৈর কচ্ছেন।

চিত্রবথ। প্রভু!—এটি সোমরসও নয়, আর্ষ্য ঋষিদিগের তৈরও নয়।

ইন্দ্র। তবে এ কি?

চিত্র। এ বিলাতি মদ, নাম—Rum.

ইন্দ্র। উর্বশী! এ কি ইংরাজী সুরা?—হ'তেই পারে না।

উর্বশী। না, তাও কি হয় প্রভু!—বময়তি ইতি রম্ (Rum). ইংরেজরা শুধু আর্ষ্য ঋষিগণের মদগল্লোব নাম ইংবেজী করে' নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন champagne, কি না সোমপানীয় অর্থাৎ সোমমদ্যম্। Beer বীরার অপভ্রংশ বৈ আর কি? Medeira আর মাদিরা একই; আর Sherryও দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা কবেন।

সকলে। বাঃ বাঃ কি গবেষণা! বাঃ—

চিত্রবথের প্রতি হৃৎশোষী দৃষ্টিনিষ্কম্প। যাহাতে
চিত্রবথ একেবারে মুষড়ে গেলেন

ইন্দ্র। আমি ত তাই বলি। ঋষিরা নইলে কি কেউ এমন মদ্য তৈর কর্তে পারে। অতএব যখন ঋষিদিগের মান্য অক্ষুণ্ণ রৈল, তখন নর্তকীকুল, পুনরায় গাও—

অপ্সরাদিগের নৃত্য ও গীত

প্রেম যে লো মাথা বিধে জানিতাম কি তায়
তা হ'লে কি পান করে' মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল বয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

ইন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা। আহা! আর্ষ্য ঋষি-
গণ কি স্বর্গটাই করেছিলেন! মরে' আছি,
বুঝলে উর্বশী—মরে' আছি।

উর্বশী। হ্যাঁ, তা বটেই ত।

বেগে বসুমতীর প্রবেশ

বসু। দেব! ধরাতলে ঘোর বিশৃঙ্খলতা।
একটা উপায় বিধান করুন, উপায় বিধান
করুন,

ইন্দ্র। [চমকিয়া] কেন? কি হয়েছে?
কি হয়েছে?

বসু। প্রভো, প্রথমতঃ পান্ডিতেরা আমাকে
যাহোক্ বাসুদিকর স্কন্ধের উপর থাক্‌বার
একটা ব্যবস্থা করে' দিইছিলেন। বাসুদিক কিন্তু
আজ মোটে সে কথা আমলই দেয় না। বলে,
আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে
তার স্কন্ধ আমার কোন প্রকার মৌরশী দাবী
নাই। সে ত পালিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে
আমি এখন শূন্যে ঝুলছি।

ইন্দ্র। [বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে] ঝুলছি
কি বকম!

বসু। আজ্ঞা হাঁ ঝুলছি—এক অলঙ্কিত
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে শূন্যে ঝুলছি—এখনকার
বিজ্ঞান এই বলছে। শুধু তাই নয়, আবার
সূর্য্যদেবের চারিদিকে ঘুরছি শূন্যে পাই।

ইন্দ্র। সেটা একটু অসুবিধাকর বটে।

মস্তক কণ্ডুয়ন

গ্রহগণ। [উঠিয়া] প্রভু, আমরা গ্রহগণ
আমাদেরও সেই দুন্দর্শা! বিজ্ঞান বলছে,
আমরাও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছি। হয় এর
কিছু প্রতিবিধান করুন—নয় আপনার
চাকরিতে ইস্তফা [হাত দিয়া ইস্তফা
দিলেন]। আমরা ঘুরব, আবার এখানে
হার্জিরও দেব, এ ত পেরে উঠিনে।

চন্দ্র। [উঠিয়া] আর আমি হলেম চন্দ্র,
আমাকে কিনা ঐ অপদার্থ বসুমতীটাকে পরি-
ক্রমণ কর্তে বলে। আমি ইন্দ্রের সুধা-ভাণ্ড
বহন করি—আমাকে কি না একটা মেয়ে
মানুষের আঁচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরন্তু
বলে, আমি একটা মরা উপগ্রহ মাত্র, এ অপমান
অসহ্য:—অসহ্য।

দেবদেবীগণ। [উঠিয়া কোলাহল করিয়া]
আব আমাদের 'মিথ' (myth) বলে' উড়িয়ে
দিতে চায়। আমরা এই আপনার স্বর্গ ছেড়ে
চললাম [উত্থান]। এই রইল আপনার অমরা-
বতী, করুন আপনি রাজত্ব।

ইন্দ্র। আরে রোস রোস, ব্যস্ত হও কেন?
কি বলছি, মোটেই আমার মাথার মধ্যে
সে'ধোচ্ছে না।—কে উড়িয়ে দিতে চায়?

সকলে। এই বৈজ্ঞানিকগণ; আবার কে?

ইন্দ্র। বৈজ্ঞানিকদল কারা?

বসু। তারা একদল নতুন দ্বিহস্তপদ-
বিশিষ্ট অদ্ভুত জাতি। আর বলতে ভয় হয়

প্রভু, তারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত কর্বার প্রস্তাব
কচ্ছে। বলছে, আপনি এ স্বর্গশাসনে
অযোগ্য। তারা এ কথাও বলছে যে, আপনি
একটি সুন্দর খাদ্য।

ইন্দ্র। [সভয়ে]—এ্যাঁ—আমি—খাদ্য?—
কাব খাদ্য?

বসু। ‘আপনি’ অর্থ, আপনার রাজ্য।
অতএব আপনি যখন খাদ্যই, তখন অপরের
খাদ্য না হয়ে বৈজ্ঞানিকগণের খাদ্য হলে
আপনার নাম অনেকটা বজায় থাকবে। তাই,
আপনার হিতৈষিতাপ্রণোদিত হয়ে—

ইন্দ্র। [উঠিয়া সক্রোধে] বজ্র কোথায়?
বজ্র!—

বজ্রের প্রবেশ

বজ্র। আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্বেন। আমি
আর নেই।

ইন্দ্র। [সাস্চর্য্যে]। সে কিরূপ! নেই!—

বজ্র। কৈ আর আছি। বৈজ্ঞানিকেরা
বলছে যে, আমি যে, বিদ্যুৎও সে। আমি
চল্লুম।

প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। শোন শোন! না হয় তুমি বিদ্যুৎই—

বজ্র। না আমি কিছই না। বদ্বলেন না,
বিদ্যুৎই আছে, আমি নেই।

ইন্দ্র। সে কি! আচ্ছা বিদ্যুৎ কোথায়?

বজ্র। Franklin সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে
তাকে ধরে’ নিয়ে গিয়েছে। সে এখন Eden
Gardens-এ আলো দিচ্ছে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে,
দেখি—এর প্রতিবিধান আছে কি না। বজ্রও
আমাকে ত্যাগ কল্লে।

বায়ু। [সব্যংগস্বরে] আর এক বজ্র নিয়ে
কর্বে কি? বৈজ্ঞানিকেরা যে Maxim
gun করেছে—মিনিটে ৫০০ বার আওয়াজ
হয়।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] এ্যাঁ—

অগ্নি। “এ্যাঁ” কি?—ঘুমোও, তুমি নাকে
সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও—কেবল দিবারাত্র
রম্ভা আর উর্ষশী—উর্ষশী আর রম্ভা—
ঘুমোও—

ইন্দ্র। আচ্ছা দেখছি ব্রহ্মাদেবের কাছে
গিয়ে—

বায়ু। তাঁর কাছে যাবে কি, বৈজ্ঞানিকেরা
তাঁকেই বড় মানছে!

ইন্দ্র। [একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া]
এ্যাঁ—

যম। বেটা সম্পদে শূদ্ধ সম্ভাগ আর
বিপত্তৌ মধুসূদন। বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ
আক্রমণ কল্লেই মার দৌড়; বজ্রও গ্যাছে এখন
কর্বে কি। বেটাকে দু’ঘা দিয়ে দেব নাকি।

অগ্নি। হ্যাঁ মার বেটাকে। বেটা কাপুরুষের
চরম।

ইন্দ্র। ও মা বলে কি সব, বজ্র কোথা।

পলাষনোদ্যত

সকলে। মার বেটাকে—

ইন্দ্র। ওরে বাবা রে

পলায়ন

সকলে। মার মার মার

[পশ্চাৎধাবন ও নিষ্কান্ত।

নর্তকীদিগের গীত

ঐ যায় যায় যায়,—

পড়ে এ, কলির ফেরে সবই যে রে—

ভেগে চুরে ভেসে যায়।

ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ;

ঐ যায়, দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে

যায় রে মিথ্ (myth)

ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,

শ্রীগোরাঙ্গ ভেসে;—

আছেন এক ঈশ্বর মাঠ; দিবারাত্র টানাটানি

তাঁরেও শেষে।

ঐ যায় ৮৪ নরক সন্ত স্বরগ—এক সগে মিশি;

ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, ব্যাস, নারদ

ঋষি;—

ঐ যায় গোপীর মেলা, বজ্রের খেলা,

সগে শ্যামের বাঁশরীটি;—

রৈল শূদ্ধ আপিস, থানা, হোটেলখানা,

রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।

ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদমন্ত্র, শাস্ত্র ফাস্ত্র

পুড়ে;

ঐ যায় গীতামর্ম্ম, ক্লিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম

উড়ে;

রৈল শূদ্ধ ডারউইন, মিল, আর গেটে শিলার—

ছেলের খরচ মেয়ের ‘বিয়া’;

রৈল শূদ্ধ ভার্য্যার স্বন্দর, ড্রেনের গন্ধ,

জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

[নিষ্কান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভূতনাথের বহির্স্বর্গাটী। কাল—বৈকাল।

ভূতনাথ, চতুরানন ও বাধা, শ্যাম, হরি ইত্যাদি
গোঁড়া হিন্দুগণ একটি ফরাসে নানারূপে উপ-
বিষ্ট। সম্মুখে হুঁকা, গুড়গুড়ি ইত্যাদি

চতু। [হাই তুলিয়া।] কাজ নেই, কস্ম
নেই,—কাঁহাতক কাটে বসে' আর হাই তুলে?—
সময়টা হাঁটে ঠিক যেন সন্ধ্যোপোকা। বসে'
কিই বা করি।—

'তা না না না' করিয়া গানের সুর কবণ

ভূত। 'করা'—তাই ত। তামাক দে রে
তাকিয়াটা হবি সারিয়ে দেও ত—[তাকিয়া
গ্রহণ।] তামাক দে রে—

হরি। [সস্মিতমুখে, বোধ হয় তিনি গত
বাজি জিতিয়াছিলেন।] আর একবার হবে?

চতু। [বিবকৃতভাবে।] কি? পাশা-কত
খেলবো?

হরি। কি আর কবে' তবে।

বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন

চতু। [সুর করিয়া।] এস এস বন্ধু এস,

আধ ফরাসে বোসো;
কিনিয়ে রেখোছ কল্‌সি দড়ি,
[তোমার জন্যে হে।]

তুমি হাতি নও, ঘোড়া নও

যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি।

তুমি চিৎড়ে নও বন্ধু, তুমি চিৎড়ে নও

যে খাই দধি গুড় মেখে;

যদি তোমায় লেজ একটা দিত বিধি,

তোমা হেন গুণনিধি,

চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

শ্যাম। এস বাপধন এস—ভাবিছিলাম বাবা,

সময় কি রকম কাটে—

বিদ্যা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা?—

পরিনন্দা কর না হে আধ্যাত্মিক ভাবে

সময়টা সন্ধ্যাতক্ বেশ কেটে যাবে।

ধূমপান

ভূত। [নিশ্বাস ছাড়িয়া]

এলে 'গইছি পরিনন্দা করে' করে' নিয়ত;

গুড়গুড়িটা বিদ্যানিধি একবার সারিয়ে

দিও ত।—

বিদ্যানিধি তদ্রূপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়া

ভূতনাথের ধূমপান

বারিক আছে কে আর এই দুনিয়ার পারে

অন্ততঃ তিন শ বার পাঠাইনি যারে

জাহান্নামে—

হরি। হ্যাঁ একটা কথা গিইছিলাম ভুলে।

সকলে। [বাগ্‌ভাবে।] কি? কি?

হরি। [হাসি চাপিয়া।] ভাবি মজা!—বল্‌ব?

চতু। বল না হে খুলে।

হরি। [গুটভাবে।] ফিবেছে বিলেত থেকে

গোবর্ধনের ছেলে।

[বিদ্যানিধি ভিন্ন সকলে।]

বটে বটে' বাস তাবে দেও জাতে ঠেলে।

ভূত। গোবর্ধনকে শুদ্ধ।

হরি। [কবুণাপ্রকাশক স্বরে।] কেন,

বেচারিব কি দোষ?

ভূত। দোষ? সম্‌হ দোষ—ওঠ—

উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন

বিদ্যা। [চাদর ধাবিয়া টানিয়া।]

আরে বোস বোস; বাস্ত কেন?

ভূত। [ক্রুদ্ধ স্বরে।] কর তারে একঘরে—

উপবেশন

চতু। [উর্ভোজিত স্বরে।] পুড়োক্ কোট

পেণ্টেলুন

হর্ষে তাঁহাব প্রায় চক্ষু জল আসিল

শ্যাম। গোবর থাক্—

অগ্রসব হইলেন

বাধা। [অগ্রসর হইয়া: সে শারীরিক ক্রিয়ায়

একটি হুক্‌কার পতন।] মাথা মূড়োক্—

ভূত। ঘোল ঢালক্—

তাঁহাব গায়ে আগুন পড়িয়াছিল, ঝাড়িলেন

চতু। আর হোক্ সব ব্রাহ্মণদের ডাকা—

দেক রূপোর থালা আর এক এক শ টাকা।

ভূত। তা ত দেবেই।—নেব কি হে

না করে' জখম—

শ্যাম। কব দলাদলি—

ফবাস চাপড়াইলেন

রাধা। [তাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া]

একটু পাকাপাকি রকম—

ভূত। হেঃ সময় কাটা?—ফুঃ—এও নিয়ে

ভাবে?

এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

হরি। দু দশ দিন?—একটি মাস

কেটে যাবে বেশ!

চতু। এক মাস কি? একটি বছর—এর শেষ
না দেখে ছাড়া হবে না—

[ফরাস চাপড়াইয়া] বিদ্যানিধি তুমি,
দুনিয়ার খবর রাখ জুড়ে ভারত ভূমি,
রাখনি ক বাড়ীর পাশে জবর খবর হেন!

বিদ্যা। [তিনি এতক্ষণ প্রতি বস্তুর পানে
তাকাইয়া মূর্চক হাসিতেছিলেন] রাখনি
কি তবে এটা ভূয়ো খবর।

ফরাসে টাকা দিতে লাগিলেন

সকলে। [বিদ্যানিধির দিকে মুখ নাড়াইয়া]
কেন?

বিদ্যা। [বিজ্ঞভাবে] কেন আর? তোমাদের
এ মিছে গণ্ডগোল;
সে ছেলে কি তেমন?

ঢালবে তার মাথায় ঘোল!
অবিলম্বে—ওর নাম কি—তোমাদের মাথায়
ঘোল ঢালবে—ঘোল খাওয়াবে—

পেলে পরে হাতাষ।

সকলে। [ভীতস্বরে] সে কি গো!

বিদ্যা। [আত্মবিশেষত্ব বৃদ্ধাইতে আগাইয়া
বসিলেন]

একবারে সে তেরিয়া মেজাজ,
তার পূর্বকার 'ইস্কুল ফেরে'ডরা' আজ
সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্তে যেই;
সে বল্লে 'বাবু লোক কো বোলো. ফুরসৎ
নেই';

ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্থূল,
লাগিয়ে দিয়েছে—বুড়ো বাপকে বলে
'ফুল'.

কারণ, সে বল্ছিল "বাবা প্রায়শ্চিত্ত করে'
আমার সোনার ঘরের ছেলে ফিরে এস
ঘরে।"

—শিরোমণি গিইছিলেন—বোল্লেন কত
বোঝায়—

কোরে দিল 'হুট', ছেলে বুঝি বড় সোজা
এ?

প্রায়শ্চিত্ত—ওর না কি—বল্লে—“আমি আগে
ছিলাম যে এ সমাজে ঘুম হয় না সে রাগে।”

ভূত। এঃ ছেলেটা গোপ্পায় গেছে;

চতু। [তাকিয়া হেলান দিয়া] একবারে অজ্ঞ।

বিদ্যা। অজ্ঞ না হে—ম্যাজিস্টর—কবে হবে
জজ।

সামলাও আগে—ওর নাম কি—

নিজের নিজের শির,
কবে চেয়ে দেখবে নেই, তখন চক্ষুঃস্থির
আর কি—হেঃ—প্ [চুমকুড়ি]
সকলে। [ভীতস্বরে] কেন?

বিদ্যা। কেন আবার? তুলিয়ে

কোন দিন দেবে কারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে;
সকলে স্ব স্ব মস্তকে হাত দিয়া তাহার অস্তিত্ব
বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন

বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্ত কর্বে—ওর নাম কি—

নিয়ে লাঠি

বাগান বাড়ীর জিনিস পত্তর—

সিন্দুক, তক্তা, পাটী,
তোষক, বালিশ, বাসন-কুসন

ফেলে দিচ্ছে টেনে;
বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিস এনে
ঘর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে।

প্রায়শ্চিত্ত!—ভাল যে সে করে নি মেম
বিয়ে।

শ্যাম। [দ্রু কুণ্ঠিত করিয়া]—

তবেই ত, ফস্ক গেল সব মতলব সবার,
রাধা। ফস্ক গেল শুধু!—

আর কথাটি নেই কবার;

ভূত। [হতাশ হইয়া শূইয়া পড়িয়া]—

নেও কি কর্বে কর।

ফুরিয়ে গেল হুজুগ—

এখন সবাই নিজে নিজে

নিজের কর্ম্ম বুঝুক;

গুড়গুড়িব এতক্ষণ অনাদৃত নল মুখে দিয়া
টানিলেন ও নিশ্বাস কলিকা হেতু ধূম না
পাইয়া ফেলিয়া দিলেন

হরি। কেন? গোবর্ধনকে তবে কর না

একঘরে।

বিদ্যা। বাপের পৃথক সাবেক বাড়ী

আছে যে সে, হরি;

হরি। একটা কিছুর করা চাই ত—

নইলে কি করি।

ভূত। [পুনর্বার ভুলিয়া নল মুখে

করিয়া ও রাখিয়া]—

না না ওটা রেখে দেও, ওটা গেছে ফেসে;

আর কেউ কিছুর জানো!—না সে

ছেলে সর্ব্বনেশে,

বোঝা গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী
পার হ'য়ে,
চায় না প্রায়শ্চিত্ত কর্তে। সহানুভূতি
কর হয় এ
বিলেত ফের্তার সঙে?—গেছে
একবারে ব'য়ে—
চতু। আসে এরা সব এক এক
জানোয়ার হ'য়ে।
ভূত। রোস না হে দিচ্ছি একটা
'আর্টিকেল' ঝেড়ে!
গোঁড়া হিন্দুগণ। হাঁ হাঁ দেও একটা—বেশ
বলেছ হে,—বেড়ে!

শিরোমণি আদি পণ্ডিতগণের প্রবেশ

শিরো। ওহে ভূতনাথ বাড়ী আছ?
ভূত। এই যে আসুন।

সকলের যথারীতি প্রণাম

শিরো। [সকলকে যথারীতি আশীর্বাদ
করিয়া] বিদ্যানিধি কোথ্ থেকে?
বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] এই আমার
অন্নপ্রাশন—

এদের নিমন্ত্রণ কর্তে এইছিলাম আমি।
স্মৃতি। নিজেই যে—
শিরো। না না এখন রাখো ফাজ্লামি—
আমরা এলাম জান্তে যে কি কোন
উপায় আছে
যাতে এই দুর্বিপাকে হিন্দুধর্ম বাঁচে!
বাচ। তোমরা ত সব ইংরাজীতে

এক একটি জজ,
বিদ্যা। আর হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানে এক একটি অজ;
শিরো। চূপ কর বিদ্যানিধি—বোধ হয় কি
কারো,
হিন্দুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে
পারো?
ভূত ও চতুরানন। [একত্রে সাগ্রহে] এখনই
এখনই; শূধু এই—
চুড়া। সাধু সাধু। [নস্যগ্রহণ]
বিদ্যা। বেঁচে থাক বাপধন বেঁচে থাক যাদু।
এমনি একটা ব্যাখ্যা দেবে যাতে অমনি
সটাং
নব্য হিন্দু—ওর নাম কি—হয় চিৎপটাং।

ভূত। আমি প্রচার কর্ব চক্‌মকি, সাজি-মাটি,
বল্ব গহিত সাবান আর দেশলাই-কাটি।
যত সব, বিলেত-ফের্তাদের গাল, দেব ঝেড়ে,
বিদ্যা। অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিশ' না আসে
তেড়ে।

চতু। আমি বল্ব এ জগতে আমরাই ধন্য,
আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অন্য সব বন্য।
বিদ্যা। [ঘাড় নাড়িয়া] ইতে যদি হিন্দুধর্ম
না বাঁচে, নিঃসন্দ,
হিন্দুধর্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ।
চতু। এ বিষয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর
থেকেই—

আল্‌মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া খুলিয়া
দেখিতে লাগিলেন
স্মৃতি। হুঃ আসল শিক্ষা যা সে বলে একেই
বিদ্যা। [মাথা কাৎ করিয়া] বইখান ধরেছ
বাবা বেশী কাৎ করে,
দেখ আধ্যাত্মিকতাটা গড়িয়ে না পড়ে।

শিরো। আচ্ছা, তবে এখন আসি [উত্থান]
বাচ। দেখ সবাই দেখ,
হিন্দুধর্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ!
[পণ্ডিতদের প্রস্থান।]

চতু। এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।
ভূত। আমারও কাগজে অনেক
লিখবার জিনিস হ'ল,
হরি। কাগজও বেশ কাট্‌তি হবে।
ওঠা যাক্ চল।
[নিষ্কান্ত।]

বিদ্যানিধির গীত

বলি ত হাসব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে;
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয়
প্রায় ক্ষেপে; [হাস্য]
পাহারা-তাড়াহত থতমত অণ্ডলস্থ স্ত্রীর;
ও' ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে,
দেশোদ্ধারে ধায়,
তখনও হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে
ওঠে দায়। [হাস্য]
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে—
একটু ইংরাজি পড়ে, কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে—
কোর্টে এক-ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ডায়;
তখন আমি হাসি জোরে গুচ্ছ ভরে' ছেড়ে
প্রাণের মারা! [হাস্য]

নিরে কেউ বৈদ্যাতিকী পকু টিকি ভাগবত পড়ে;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে;
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাশণ্ড পরে হরির মালা;
তখন ভাই নাই স্কেপে, হাসি চেপে
রাখতে পারে কোন্—[হাস্য ও দৌড়]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কলিঙ্গা স্ট্রীট। কাল—প্রভাত।
মনসা, শীতলা ও ওলা আসীনা

শীতলা। এবার ভোজ!
ওলা। দস্তুর মত ফলার!
মনসা। কৈ? আমি ত কিছুই দেখি নে।
শীতলা। আমি ত নিঃশ্বাস ফেলবার
অবসর পাই নে।
ওলা। নিঃশ্বাস!—আমি মর্ষীর অবসরটুকু
পাই নে।

মনসা। সেটা দঃখের বিষয়। তা এ আর
বেশী দিনের জন্যে নয়। কল্কাতায় যে
ডাক্তারের ধর্ম।

শীতলা ও ওলা। [একত্রে] তারা কর্ষে
কি?

মনসা। কর্ষে আর কি!—তবে কল্কাতা
সহরে এত রকম 'প্যাথি'র অধিষ্ঠান হ'য়েছে
—কল্কাতায় যে মানুষ বে'চে আছে, এইটেই
বিস্ময়ের কথা।

শীতলা ও ওলা। হঃ—তারা কর্ষে কি!
মনসা। নব্যহিন্দু যে ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক
হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কলেরা হ'লে ওলা-
বিবিকে পূজো দিয়ে মরা অপেক্ষা, তবু
ডাক্তার ডেকে বাঁচবার চেষ্টা করাই লোকের
এক রকম রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওলা। এ্যাঁ—সে কি গো!
মনসা। আর ডাক্তাররা 'ভ্যাক্সিনেশন্'
নামক এক প্রকার ঔষধ বের করে' বসন্ত লোপ
কর্ষার চেষ্টা ক'রছে।

শীতলা। সে কি বল!
মনসা। আমাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ
দেখতে হচ্ছে।

শীতলা ও ওলা। সে কি?—তবে
উপায়?

মনসা। উপায়—হিন্দুধর্ম প্রচার। কিন্তু
হিন্দুধর্মটা সাবেক আকারে পুনর্বার খাড়া

করা শ্রেয়ঃ নয়! ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেরূপ
নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইরূপই
ঘুমোন। তাঁদের জাগিয়ে কাজ কি?

শীতলা ও ওলা। [বিজ্ঞভাবে] ঠিক।
মনসা আর আজ তাঁদের খোঁজ খবরই বা
রাখে কে। তাঁরা যদিও হলেন আমাদের ওপরে,
কিন্তু তাঁদের চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই
বেশী ডরায়।

শীতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে
যেমন পূর্লিশকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঐ রকম।
ওলা। কিংবা যেমন রোদের চেয়ে লোকে
তন্ত বালিকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঠিক ঠিক।—সেই রকম। তাই
বলছি তাঁদের ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি
তাঁদের পূজো করেই, ত করুক, কিন্তু আমা-
দের প্রাপ্য দক্ষিণাটি পেলেই হোল।

উভয়ে। চল তবে হিন্দুধর্ম প্রচার করা
যাক্।

মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও
ডেকে নিয়ে সব আসি।

[প্রস্থান।

শীতলা। বেশ বলেছে মনসা।
ওলা। বেশ বলেছে ভাই!

ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বিড় ইত্যাদি বাজনা সহ নানা
মর্তাদেবদেবী লইয়া মনসার পুনঃ প্রবেশ

মনসা। এই বার চল আমরা হিন্দুধর্ম
প্রচার কর্ত্ত বেরুই।

সবাদ্য গীত; গাইতে গাইতে গমন

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো কার্ত্তিক গণপতি;
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী;
আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, ষম;—
ঐ সবই আছে;—হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম।—
[কোরাস্] ছেড়ো নাক এমন ধর্ম

ছেড়ো নাক ভাই;
এমন ধর্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম নাই।
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্

তড়ালাক্ ডুম্।

ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম কীর,
আর শ্রীরাম, বৃন্দা, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর;
হ'ন নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার;
দাদা বেছে নেও—মনোমত ষিনি হন ষাঁর।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

আছে বানর, কুমীর,
 ময়ূর, পেঁচা, গাই;
 আর তুলসী, অশথ, বেল, বট, পাথর—
 কি এ ধর্মের নাই?
 দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক';
 সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—
 কিছুর যায় নি ফাঁক।—
 ছোড়ো নাক [ইত্যাদি]
 হয় ত্রিভুবন স্তম্ভ শূনে গান্ধীবের শব্দ,
 আর হনুমানের বগলেতে সূর্য্যামামা জন্ম,
 আর গোপীসহ কুঞ্জ কেলি করেন কানাই;
 দাদা অশ্রুত আদি,—বীররস—তোমার
 বল না কি চাই?
 ছোড়ো নাক [ইত্যাদি]
 যদি চোর হও, ডাকাত হও—গণ্ডগায় দেও ডুব;
 আর গয়া, কাশী, পুরী যাও—পূর্ণিমা হবে খুব;
 আর মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব;
 আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও;—এর
 গুণ কত কইব।
 ছোড়ো নাক [ইত্যাদি]
 [নিষ্কান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রাজার বহির্বাটী। কাল—রাত্রি।

চেয়ারে বিধুভূষণ, নিধিরাম, নীলমণি ও হারাধন
 ও অন্যান্য নব্যহিন্দু আসীন। সম্মুখে টেবিলে
 ডিনারের আয়োজন। নেপথ্যে মধ্যে পুজার বাজনার
 শব্দ পাওয়া যাইতেছে

নব্যহিন্দুগণের গীত

যদি জানতে চাও আমরা কে
 আমরা Reformed Hindoos
 আমাদের চেনে নাক যে
 Surely he is an awful goose.
 কেন না আমরা Reformed Hindoos.
 It must be understood
 যে একটু heterodox আমাদের food;
 কারণ, চলে মঝে মাঝে 'এ'টা 'ও'টা 'সে'টা
 যখন we choose—
 কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি If you think.
 তা'লে you are an awful goose.
 আমাদের dress হবে English কি Greek
 তা এখনো কষ্টে পারি নি ঠিক;
 আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবেরা বলে সব
 superstitious ও obtuse—
 —কিন্তু টিকিতে electricity-নেই if you think,
 তা'লে you are an awful goose
 আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
 এ নয় English কি Bengali;

করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে
 conversationএ use—
 কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
 তা'লে you are an awful goose.
 মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
 আমরা নবাবী করি বেশ;
 আর among friends সব মূর্খস্বাদিগে করি
 খুব hate ও abuse—
 কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
 তা'লে you are an awful goose,
 আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
 কোন ধর্মের ধারি না ধার;
 করি hoot alike the Hindoos,
 the Buddhists,
 the Mohamedans, Christians & Jews—
 কিন্তু বিয়েয় পৈতেয় হিন্দু নই if you think,
 তা'লে you are an awful goose.
 About female education,
 ও female emancipation,
 আর infant marriage আর
 widow-remarriage
 আমাদের খুব enlightened views;
 কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
 তা'লে you are an awful goose,
 You are not far wrong
 if you think
 যে আমরা করি একটু বেশী drink;
 কিন্তু considering our evolutionএর state
 আমাদের morals নয় খুব loose;
 আর about morals we care a hang
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose,
 From the above দেখতে পাচ্ছেন বেশ
 যে আমরা neither fish nor flesh;
 আমরা curious commodities,
 human oddities
 denominated 'the Baboos';
 আমরা বক্তৃতায় বুদ্ধি ও কবিতায় কাঁদি
 কিন্তু কাজের সময় সব চন্দ-চন্দ-s
 আমরা beautiful muddle,
 a queer amalgam
 of শশধর, Huxley, and goose.

বিদ্যানিধির প্রবেশ

বিধু। কি হে বিদ্যানিধি, তুমি এত
 দেবী করে!
 নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয়
 আফিঙের ঘোরে

হারা। ও সব ছাড় নিোধ—
গাঁজা গুলি চরস্
এ সব চেয়ে হুইস্কি সোডা
শতগুণে সরস;
বিদ্যা। তা আর বলতে!—তবে কি না
নানান্ দলে মেশা,
তাই কাজেই কণ্ডে হয় নানান্ রকম নেশা;
গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান
বাজার প্রবেশ

রাজা। এই যে সব। কতক্ষণ?—
বিদ্যানিধি গুরু,
কিট গ্লাস পার কল্পে?
নিধি। এই সবে সুরু—
হারা। এখনও নতুন কি না ক্রমে বোতল
সবে।

বিধু। ক্রমে ও এক জন পাকা হুইস্কিখোর
হবে।

রাজা। দাস কোথায়? তাঁকে কাল ত
invite করে' এইচি।

নীল। তা—ই—ত—[মস্তক কন্ডুয়ন]

বিধু। তা তার সঙ্গে দ' একবার ত খেইচি।

নিধি। তা কেই বা টের পাবে?—বেশ খাওয়া
যাবে বৈকি।

হারা। বিদ্যানিধি সহায় যখন, তখন আর
ভয় কি?

বিদ্যা। হু আজকাল তাদের সঙ্গে
কেই বা খায় না—

বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খানা
খেলে 'জাত' যায় না।

রাজা। তার স্ত্রীটি, বিদ্যানিধি,
দেখতে বড় খাসা।

বিধু। তাই তাঁর বাড়ী তোমার এত
ঘন যাওয়া আসা।

রাজা। কিন্তু মিসেস্ দাস একটু বেশী
bashful যেন।

হারা। আমাদের introduce করে'
দেয় না কেন?

দাসের প্রবেশ

রাজা। এই যে দাস—[অভিবাদন]
বোস; না না,—এস, আমার এই

দ' এক বন্ধুর সঙ্গে
introduce করে' দেই—
দাসের সকলের সঙ্গে অভিবাদন
রাজা। [নেপথ্যে চাহিয়া] এই জলদি খানা
লে আও—
[নেপথ্যে] বহুত আচ্ছা—হুজুর।
ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খানা খাইতে
আরম্ভ; নেপথ্যে পূজার বাজনা
দাস। [কাণে হাত দিয়া]
ওঃ কি barbarous

এই বাজনা এ সব পূজোর!
বিলেত হ'লে এরে public nuisance
বলে' নালিশ চলত—Well Rajah do
you dance?

রাজা। ভাল partner পেলেই আমি
খুব ভাল নাচি।

বিধু। ভাল partner পেলে আমরাও
নাচতে রাজি আছি।

দাস। [বিধু বাবুকে] Well, আপনারা
শুনি তালগাছ সমান

Reformed কিন্তু তার দেন কৈ প্রমাণ?

বিধু। কেন?—টিকি নেই; এত মুরগীর
প্রভাব;

কোট পেপেন্টেলুন—তবু সংস্কারের অভাব!
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এ সব নিয়ে

অনিবার
Speech দেই এমন কি প্রায়ই
প্রতি শনিবার—

বিদ্যা। অমন অমন 'লেক্চর'—হুঃঃঃ
শুনি আমি ঢের,—

নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে' পরের স্ত্রীকে বে'র।

নিধি। সে আর বেশী দিন নয়; স্ত্রীরা এখন
খুজে

নিজের নিজের পোর্টলাপ'র্টলি নিচ্ছে বেশ
বুঝে।

হারা। দুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে'
ভাই—

স্বামীদের তাড়িয়ে না দিলে বে'চে যাই—
রাজা। এতদূর না কি?—

বিদ্যানিধি,—খাচ্ছ কৈ?
বিদ্যা। এই যে খাচ্ছ বৈকি—এই খানসামা

—ঐ

—ওর নাম কি—শ্যাম্পেন আর এক গেলাস
ঢালো;
বিধু। যাই বল, বিদ্যানিধি লোক অতি
ভালো।
নীল। ভাল বোলে!—বলতে গেলে
এ ত ও'রই জোরে
খাচ্ছ আমরা এই সব এত সাহস করে'।
নিধি। তাইতেই ত ও'রাকে এ দলে
মিশিয়ে নেওয়া।
বিদ্যা। [সগর্বে] খাও দেখ, কে কি বলে;
নেই' কিছু পরওয়া।'
নীল। শুনছি চতুরানন না কি আজকাল
ভারি
হিন্দুয়ানী প্রচার কচ্ছে, কাল মহা জারি
করে' বলেছে যে সব যারা মূর্খগণের
তাদের হুকুম তামাক খাবে না।
দাস। [ব্যঙ্গস্বরে] উঃ, কি কঠোর!
নীল। আর, বিলেত-ফেস্তা আর ব্রাহ্মদের
নাম ধরে'
ভূতু অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে।
বিদ্যা। আরে দূৎ—ওর নাম কি—এ মূর্খ
বিপাকে
আর কি ও পচা তাদের হিন্দুয়ানী থাকে!
কেন ভয় কর; যত পার খাও ছাই,
তার পর আমি আছি—কুছ পরওয়া নাই।
[নেপথ্যে সিঁড়ি হইতে]
হরিশবাবু বাড়ী আছেন!
বিদ্যা। [চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া]
মরেছে রে—ঐ
তারাই আবার [ক্রন্দনস্বরে]
ও সাহেব কোথায় লুকোই।
বিদ্যানিধি টেবিলের নীচে লুকোইতে গেলেন,
তাহার লম্বা শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না; তিনি
মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন
নীল। লুকোবে কি তুমি? তুমিই আমাদের
ভরসা।
বিদ্যা। [দোঁড়াদোঁড়ি] বল বৃদ্ধি ভরসা,
সব কারে পড়লেই ফরসা।
[নেপথ্যে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন?
দরওয়ানের সহিত তর্ক
বিদ্যা। [বিকৃত স্বরে] না গো বাড়ী নাই—
হারা। [চেঁচাইয়া] হ্যাঁ আছেন।

[হারাধনের কন্যা ছিল না]
নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ
বিদ্যা। [হারাধনকে] লুকোই কোথা
বলে' দে না ভাই!
হারা। কেন? তুমি ওই কোণে কেস্ট ঠাকুর
হয়ে'
দাঁড়াও না;—বাঁশ নেও।
[একটি কালো ছড়ি দিয়া] সময় যায় বয়ে,
শীগর্গর যাও—এসে পড়ল পিঁড়ির
দল ও—
বিদ্যা। [সন্দেহ স্বরে] এত বড় কেস্ট
ঠাকুর হয়?
হারা। নাই বা হ'ল।
আমরা সবাই বলব এই কেস্ট ঠাকুরখানি
সম্প্রতি indent করা—বিলাতি আমদানি।
বিদ্যানিধি অগত্যা লাঠিটা লইয়া সদূর কতক
অন্ধকার কোণে কুষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় ত্রিভুজে
দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য, নীলমণি, বিধু ও
নিধিরাম বিশেষ আরাম অনুভব করিতেছিলেন না,
তথাপি নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলেন
নীল। এটা একটু বেশ uncomfortable
নয় কি?
নিধি। তা' যখন বিদ্যানিধি আছে, তখন ভয়
কি?
রাজা। এ আবার এক গেরো—
এরা কেন আবার?—কি দায়!—
[দাসকে] ওহে এদের দু'ঘা দিয়ে
করে' দিও বিদায়!—
দরওয়ানটাই এদের—কেন দু'ঘা দিলে নাক।
দাস। আসুক না, তুমি চুপ করে' বসে' থাক।
পিঁড়িতগণসহ শিরোমণি ও স্বীয় গুণগ্রাহিগণের
সহিত ভূতনাথ ও চতুরাননের প্রবেশ
শিরো। [আসিয়াই আক্রমণ সূরু করি-
লেন; তিনি রাজার পানে চাহিয়া কঠিনস্বরে
কহিলেন] দেখ বাপু তুমি একটু বেশী
বাড়াবাড়ি
সূরু করেছ এ—দেখ—সে দিন সাহেব
বাড়ী
প্রকাশ্যতঃ খেলে, আবার আজ পূজোর দিন
দিচ্ছ খানা—
দাস। [খাইতে খাইতে] এসব খাওয়া অন্যান্য,
বুঝিয়ে দিন।

চতু। আমি দিচ্ছি—শুনুন, ও সব নয়ক
সাত্ত্বিক খাদ্য।

দাস। [মুখ খিঁচাইয়া]
আরে দ্বং সাত্ত্বিক খাদ্য, না সব তোমার
শ্রাম্ধ।

সাত্ত্বিক আহার করে' কবে' সবই
এক এক জন—

হাউয়ার্ড, সক্রটীস্, হার্বাট স্পেন্সার,
নিউটন;

ধর্ম্ম, বিজ্ঞান জগতে যা—এঁদেরই এক-
চেটে;—

তাই দ্বং তিন হাজার বছর খেটে খেটে খেটে
শেষে কল্লেন কি না ঠিক—যা সব অতি
bosh—

যে হাঁস খেলে দোষ নেই, মৃগী খেলে
দোষ;

প্যাঁজ খাওয়া দোষ, আর হিং খাওয়া নয়;
চীন গেলে ধর্ম্ম থাকে, বিলেত গেলে
যায়:—

ভূত। [উঠিয়া গম্ভীরস্বরে]
ইংরাজ পড়ার দোষ!—মহাশয় আপনি

আজ
বোলে ফেল্লেন 'হিন্দু মূর্খ'—কিন্তু জগৎ

শুদ্ধ
মানে, ভক্তি করে, পূজে—চৈতন্য ও বুদ্ধ
সমাজে যা করে,

পুনরুপবেশন

শিরো। ও সব তর্ক ছেড়ে দেও [মোলায়েম-
ভাবে]

ভুল হ'ক—সেটা বাপু থাকা উচিত ধরে'।
স্মৃতি। [রাজাকে] দেখ বাপু, তোমার

বাপ ছিলেন সমাজের মাথা,

তোমার কি উচিত তারে করা ফাঁতানাতা?

ভূত। আর আমাদের এই সমাজটাকে কাঁদান?

চতু। আর সমাজেতে শুধু জোড়াপটকে
বাধান?

ন্যায়। আর কভু চলবে নাও সমাজেতে এ ত—

দাস। চলবে নাই বা কেন?—

মড়াকাটাও চলেছে ত,

স্বীদের রেলভ্রমণ, স্বামীশিক্ষাও চলে'

গেছে;—

পাঁওরুটি—, বিলাতি নৃগ, পেশ্বাজ চলেছে।

সীলোন, রেংগুন গেলে এখন
জাত যায় না কারো,

বিলেত যাওয়া, মৃগী কেন চলবে না—
রাজা। [জড়িত স্বরে] হ্যাঁ, আরো

কত কি—নিজেই চলবে,
তোমরা নাই বা চালাও;

এখন পোর্টলাপ-দুর্টলি বাঁধ;—
আর কেন—পালাও—

চুড়া। [বিধুকে] ওহে বাপু, ঐ কোণে
ঐ জিনিসটা কি?

বিধু। ওটি কেণ্ট ঠাকুর। [নিধিকে চোখ
টিপলেন]

চুড়া। [সাগ্রহে] সত্যি?—বটে?—
সত্যি না কি—

হারা। হ্যাঁ, এ কেণ্টঠাকুরখানি বিলাতি
আমদানি—

ও আবার বাঁশী বাজায়;—বলতে কি হানি
কল টিপে দিলে আবার নাচেও—

চুড়া। [সকৌতুহলে] সত্যি?—নাঃ—
আচ্ছা টিপে দেও দেখি—

হারাধন গিয়া সজোরে বিদ্যানিধির পশ্চাভাগে
চিম্টি দেওয়ায় বিদ্যানিধি—নিরুপায় হইয়া মস্তক
এদিকে ওদিকে ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে
লাগিলেন

চুড়া। [সস্মিত ও প্রীতস্বরে] সত্যিই ত বাঃ,
কই বংশী বাজাল না—

হারাধন পুনর্বার গিয়া বিদ্যানিধির কানে কানে
কি কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়া দিলেন।
বিদ্যানিধি—তাড়াত্তে গলায় বাঁশীর সুর করিতে
লাগিলেন; ও সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে
তাকাইলেন

চুড়া। [মাথা নাড়িয়া] বংশী নয় খুব
সুস্বরা—[নস্যগ্রহণ]

—কিন্তু বাঁশীটা যে বাপু উল্টো দিকে
ধরা—

হারা। কলিকালে সব, মশয়, উল্টোই
ত হবে—

চুড়া। [এ ব্যাখ্যায় তুণ্ট হইয়া]
বটে বটে। সত্যিই ত! ঠিকই বটে তবে—

[নস্যগ্রহণ]

হারা। আবার পেটে খোঁচা মাগ্নে কোঁৎ
করায় কলে;

বলিয়া গিয়া বিদ্যানিধির পেটে সজোরে খোঁচা
মারিলেন ও বিদ্যানিধি অগত্যা কোঁৎ করিলেন

আবার নাক ধরে' টান্লে "রাধা রাধা"

বলে।

বলিয়া বিদ্যানিধির নাক ধরিয়া সজোরে টানিলেন,
বিদ্যানিধি নাকি সুরে "রাধা রাধা" ডাকিয়া
উঠিলেন

চুড়া। [অতি বিস্মিত] বাঃ, এটা ভারি
মজার কেষ্টঠাকুর বটে—

অতি সুন্দর [নস্যগ্রহণ] দেখি গিয়া
একটু নিকটে।

চুড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন
ও তাহার কলকৌশল পরীক্ষার মানসে তাহার
মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন; তাহাতে বিদ্যা-
নিধি হঠাৎ মুখ সূচলো করিয়া চুড়ামণির মুখে
অগ্রসারিত করিলেন; চুড়ামণি বিদ্যানিধির এই
আকস্মিক অভাবিতপূর্ষ শারীরিক প্রক্রিয়ায়
ভীতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন; এবং বিদ্যা-
নিধি তৎক্ষণাৎ পূর্ষবৎ স্বীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ
করিলেন। চুড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া পুনর্বার
বিদ্যানিধির মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন ও
তাহাতে বিদ্যানিধির পূর্ষ অগ্গভাঙের
পুনরাবৃত্তি হইল। চুড়ামণি পুনর্বার হটিলেন।

হারা। দেখছেন না এর মুখে

চুম্বক পাথর আছে।

চুড়া। সত্যি? পাশ দিয়েই তবে

যাই ওর কাছে—

তিনি এবার বিদ্যানিধির দক্ষিণ দিক্ দিয়া তাহার
নিকটবস্তী হইলেন; তাহার স্কন্ধের নিকট
পংহুঁছিবামাত্র বিদ্যানিধির মুখ তন্মুখে সূচলো
হইয়া ফিরিল। চুড়ামণি পিছাইয়া বামদিক্ দিয়া
অগ্রসর হইলে, তাহাতে বিদ্যানিধির মুখ পূর্ষবৎ
ভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে সবেগে বামে ফিরিল।
চুড়ামণি মহা বিপদগ্রস্ত; একটু ভাবিলেন; পরে
বিদ্যানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে
ফিরাইলেন; কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে দুন্দান্ত
নাসিকা পুনরায় তাহার দিকে পূর্ষবৎ ফিরিল।
চুড়ামণি ত অবাক্। হারাধনের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে
তাকাইলেন

হারা। [চুড়ামণিকে] আপনার নাকে লোহা
আছে নাকি?

চুড়া। কেন?

হারা। চুম্বক পাথরটাকে টান্ছে

বেশী জোরে যেন।

চুড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা সবার নাকেই
লোহা আছে তবে?

মিত্র। লম্বা নাকে বেশী আছে।

চুড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা হবে।

চুড়ামণি এখন সম্মুখে আসিয়া নিজের নাক নীচু
করিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরের দক্ষিণ পা দেখিতে
ব্যাপৃত হইলেন। তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা
তাঁহার দিকে প্রসারিত হইল; চুড়ামণি ভয়ে
পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে
চাহিলেন। পরে গিয়া ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে
বাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম
পদ যথাস্থানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার
উপস্থিত। বিদ্যানিধি ছাড়ি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে
চুড়ামণির চুড়া পাকড়াইয়া ধরিয়া তাহার ঘাড়ে
চাড়িলেন। চুড়ামণি ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচাইয়া পড়িয়া
গিয়া মুছেঁপকান্ত হইলেন। বিদ্যানিধি তখন
উঠিয়া নিজমূর্ত্তিতে পিণ্ডিতদের কাছে গিয়া
দাঁড়াইলেন।

চুড়া। [আশ্বস্ত হইয়া] বিদ্যানিধি বটে!

সেটা আগে বলতে হয়।

শিরো। [কঠিন স্বরে] তুমি নদেয় যাও নি—
বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] আমি মূর্গীখোর
নয়। অর্থাৎ খেলেও—ওর নাম কি হজম
করি নাকি?

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার

ফাজলামি রাখ।

বিদ্যা। [নিরুপায়ভাবে] তবে বল্বে

এক কথা? আর্ষ্যর্ষিগণ নাকি,

মূর্গী গরু খেতে কিছুরেখেছিলেন বাকি?

শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য,
আর যুদ্ধ বৃথা; তাই তাঁহারা চম্পট দিবার উদ্যোগ
দেখিতে লাগিলেন

স্মৃতি। [হতাশভাবে রাজাকে] না হয়
খেলেনই; কিন্তু মুসলমান, হাড়ি, এই এ
সব রাঁধুনি কেন?

রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই, কিন্তু
ব্রাহ্মণেতে মূর্গীটুর্গী রাঁধে না যে।

মদ্যপান

ন্যায়। আর হাড়ি? [এটি নেপোলিয়ানের
শেষ উদ্যোগের "যা থাকে কপালে" ভাবে]

রাজা। মুসলমানে শয়র রাঁধে না যে—

স্মৃতি। এ সবই খান বৃষ্টি—বিলেত-ফেরত

দলে

মিশে এখন বৃষ্টি ও সব গুলোই চলে?

শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানে আসাই
ভালো দেখায় নাক।

রাজা। [জড়িত স্বরে] বাবা, ফিরে যাও
বাসায়
কেন গোলযোগ কর?—এ সব মিছে সাধা;
ক্ষণিক আমাকে এসে কেন দেও বাধা?

শিরো। চল চল; এ সব স্লেচ্ছ, যবন;
চল চল!

চুড়া। হা হতোস্মি।
নস্যগ্রহণ
অন্য পন্ডিভেরা। চল তবে; দূর্গা দূর্গা
বল—

[পন্ডিভদের ও গোঁড়াহিন্দুগণের প্রস্থান।
রাজা। বাঁচা গেল!—আঃ—তোমরা
তাড়িয়েছ খাসা।

কেন এদের মিছামিছা দেখে কস্তে আসা।
দাস। I say রাজা। তুমি এদের শিক্ষা
দেবার জন্যে বিলেত যেতে পার?
বিধু। না না, সেটা বড় অন্যায়।

দাস। কিসে?—ব্রুটস্ শব্দ এক principle-
এর জন্যে ছেলের বধের হুকুম দিল—আর
এইটে অন্যায়!

নিধি। আমাদের দেশেও দশরথ মরতে মরতে
রামকে পাঠাল বনে সত্য রক্ষা কস্তে।

বিধু। দশরথের কার্যটি বড় ভালো হয় নি।
নিধি। কেন?

বিধু। কেন?—মূর্খ দশরথ—রামচন্দ্র হেন
সুপুত্রকে—গোবেচারী,—কোন দোষ নাই—
দিলেন বনবাস;—হ'ল সত্যরক্ষা ছাই!

[রাজাকে]

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো হয় নি—
এক নীলু ঢুলো না—

বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ব্রুটসের তুলনা?
ব্রুটস্ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার
করে, দিলে ছেলের দণ্ড—এর সঙ্গে
কি ছার—

রাজা। এ কি নীলমণি—ও নীলু—রাত কত
—নাক ডাকে যে।

নীল। [চমকিয়া] কৈ? [সকলের হাস্য]

এখন নাকডাকা এত গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু
এই দৌর্ভাগ্যটুকু কেহ স্বীকার করিতে চাহে না।
রাজা। চোক যে জবাফুলের মত!

হারা। তবে যাবার আগে সব এক
এক প্লাস ঢালো।

সকলে সুরাপাত্ত পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান
করিয়া উঠিলেন
দাস। হ্যাঁ হ্যাঁ I say রাজা—well!

কি বল্ছিলাম ভালো—
বিলেত চল না হে একটা সব সহরময়
হুলস্থলস্ হয়ে যায়—এরাও জন্ম হয়।

রাজা। বটে! বটে! কি বল হে বিদ্যানিধি?
বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] হ্যাঁ তা
ওর নাম কি—তবে যদি পন্ডিভেরা—না

না—
বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী।
রাজা। মন্দই কি একবার না হয়

বিলেত ঘুরে আসি।
আরও এই পন্ডিভগলোও জ্বালিয়েছে
ভারি;

তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কস্তে
পারি।
[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যক্ষদেশ। হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন।
কাল—জ্যেৎস্না রাত্রি।

যক্ষকন্যারা বিহার করিতেছেন
সবাদ্য যক্ষকন্যাগণের গীত
নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারক'গগ রে
হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব কুঞ্জ রব, নীরব ভব রে;
সুন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন,—স্লাবিত বন রে;
নন্দন বন, তুল্য গহন—মোহিত মন রে।

একজন কনষ্টেবিলের প্রবেশ

কনষ্টেবিল। [স্বগত] এ সব ত আচ্ছা নাচ-
আওলি হয়, মগ্র সাহাব ত বহুৎ স্কাপা
হোত হয়। [প্রকাশ্যে] এই মাইয়া লোক
সব, এ দুপদুর্ রাতমে কাহে হল্পা করতা
হয়—হামরা সাহাবকা ডেরাকা এস্তা
নগীজমে। সাহাবকো নিদ যানে দেগা
নেই?

১ যক্ষকন্যা। কে এ উল্লুক আবার এ সময়
এসে বিড়ির বিড়ির বক্তে আরম্ভ করলে।

২ য-ক। এ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কবিভূত।
 ৩ য-ক। দেখেছ, বেটার পাগড়ী থেকে জুতা পর্যন্ত সব গদ্য।
 ৪ য-ক। বোধ হচ্ছে, এ খাম্বাজ রাগিণী মোটে বোঝে না।
 কনস্টেবিল। এই, চুপ কর্কে খাড়া রহিল কাহে রে? তোমরা হুঁস নেই হয়। এ জায়গাকা নস্‌দীক্ সাহাবকা তাম্বু হয়।
 ১ য-ক। কে তোর সাহেব?
 সিপাহী। [সগর্বে]। কমিশনর সাব, জান্তা নেই।
 ২ য-ক। রেখে দে তোর কমিশনর সাব।
 সিপাহী। [সশ্চর্যে] আরে!—ডরতা নেই! তোমলোক জাহান্নম যানে মাগ্‌তা?—আর হিঁয়া সাবকা ডেরা হয়—সমজ্‌তা নেই?
 ৩ য-ক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কল্পে কেন? সে কি মর্বার আর জায়গা পেলে না?
 সিপাহী। [অতি বিস্ময়ে] কেয়া? জান্তা নেই সাব হিঁয়াকা রাজাকো সাথ্ লড়নে আয়া?
 ৪ য-ক। কেন, আমাদের রাজা তোদের কি করেছে?
 সিপাহী। কি করেছে!—কি আবার কর্বে!—সাব এ মলুক লেনে মাগ্‌তা। তোমারা রাজা কুছ কাম্‌কা নেই, ইস্‌কা ওয়াস্তে! আওর কেয়া? লড়াইকা খবর নেই রাখ্‌তা?
 ৫ য-ক। হাঁ হাঁ জানি, জানি! আচ্ছা তুই যা, আমরা বাড়ী যাচ্ছি, রাতও হয়েছে; [অন্য যক্ষকন্যাগণকে] চল—[গমনোদ্যত]
 সিপাহী। আরে গোসা কাহে—থোড়া দারু পিও—চিল্লানেসে ফয়দা কেয়া?—দারু পিও—হামকো সাথ্ থোড়া পিয়ার করো—হম কুছ নেই কহে গা। [অগ্রসর হইল]
 ১ য-ক। মর্ উল্লুক!
 ২ য-ক। আবার দাঁত বের করে হাস্‌চে।
 ৩ য-ক। এ যে যায় না; দু'ধা নিয়ে দেও না।
 ৪ য-ক। নেও বেটার তলওয়ার কেড়ে—
 ৫ য-ক। মার বেটাকে—
 সকলে অগ্রসর হইয়া তাহার তরোয়াল কাড়িয়া লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল

সিপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব!—এ কেইসে তামাসা!—আরে ছোড়—ছোড়—দাড়ি ছোড়—তরোয়াল দেও।

ক্রমে যক্ষকন্যাগণ সিপাহীকে গুরুতর প্রহার আরম্ভ করায় 'উরে বাবারে এত সব মাইয়া লোক নেই, মাইয়া লোককা বাবা' ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া, সিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি ফেলিয়াই উদ্ধর্যাসে দৌড় দিল

১ য-ক। বেটা বীর ত ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্তে এসেছে।—চল—

সকলে গৃহাভিমুখিনী

২ য-ক। কিন্তু এ দেশ কি সত্যই সাহেবেরা নিতে এসেছে?

৩ য-ক। হ্যাঁ নিতে এসেছে, আর নেবেও যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা ভারি পরাক্রান্ত জাতি। শূন্য ছি তারা অমরাবতী একরকম দখল করে বসে' আছে। আর ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার কাছে চম্পট দিয়েছেন।

৪ য-ক। দৌড় ত তাঁর চিরাভ্যস্ত! হয়! এমন সুন্দর অমরা আজ অনাথা।

৫ য-ক। আমাদের অবস্থায় শীঘ্রই সমান শোচনীয় হবে। তার জন্য চিন্তা কর্তে হবে না।

[নিষ্ক্রান্ত।]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজার বাগানবাটী। কাল—রাতি।

বিধু, নিধিরাম, হারাধন, নীলমাণি, বিদ্যানিধি দণ্ডায়মান ও রাজা উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরার বোতল ও গ্লাস ইত্যাদি

নব্যহিন্দুগণ ও বিদ্যানিধির গীত

আমরা পাঁচটি এয়ার—

আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।

আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্দু খেলার;—

কিন্তু পার করি শূন্য বোতল গেলাস

আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্র্যান্ড মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন

মোদের রাণী,

আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে

কাহারো হানি;

আমরা, রাখিনে কাহারও তলা; আমরা

করিনে কাউকে কেয়ার,

এ ভবমাঝে সবই ফক্সা—জেনোঁছ
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন,
কেন, তুমি হ'লে নাক কবি হলো সেকুপীয়ার?
আর সে সব কথা কাজ কি বলে';—

আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিলে তাড়িয়ে দৈত্যে
বল দেখি দাদা?—

কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর
দৈত্য খেত সাদা।

এ ভবারণের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর?
এ জীবনের যা সার বৃকোঁছ,—

আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি,
মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে'

দুশ্ব, ননী, ছানা;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু
পেয়ার;

শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য
গঙ্গারামের প্রবেশ

হারা। কে গো এয়ার কোথা থেকে—
বল দেখি নাম!

গঙ্গা। আমার নাম গঙ্গারাম।
বিধু। নিবাস কোন্ গ্রাম?

গঙ্গা। সাবেক নিবাস 'উলো'।
বিধু। হ্যাঁ!—উলো—[নিধিকে] নিধি, সে
কি!

নিধি। [গঙ্গাকে] আচ্ছা বাপু, তোমার
গ্রামের জেলা বল দেখি!

গঙ্গা। জেলা?
হারা। নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেয়ে।

নীল। একটা উজ্বুক এল আবার কোথা থেকে,
কে এ?

রাজা। যা হ'ক শূনি এখানেতে মশয়ের
কি কাজ আছে?

গঙ্গা। [বসিয়া] এলাম আমি হে', হে'—
রাজা বিমলেশ্বরের কাছে।

রাজা। কেন মশয়, আমি কোন দোষ ত
করিনি—

বিদ্যা। [স্বগত] এ দেখাছি সেই স্বাক্ষরাতা—
এ'রে বেশ চিনি,

গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া বসিয়া মদ্যপান
রাজা। কি চান শীঘ্রের বলে' ফেলুন।

কাণ পেতে আছি—
নীল। হ্যাঁ হ্যাঁ শীঘ্রের সেরে ফেলুন—

তাতে আমরাও বাঁচি।
গঙ্গা। মহারাজের সঙ্গে—হে' হে'—

আলাপ কর্তে এলাম—
হারা। না হয় সেটা পরে হবে—

এখন তবে—সেলান্ন
স্বার দর্শাওন

গঙ্গা। [না দেখিয়া, রাজাকে] হে' হে' কবে
আসা হোল?—

রাজা। —হে' হে' দিন চারিক [উম্মনা]
গঙ্গা। হে' হে' কুশল শারীরিক এবং

পারিবারিক?
রাজা। হে' হে'—আজ্ঞে খুব ভাল—হে'

হে'—তবে কিনা
শূলের ব্যারাম—এমন কি বাঁচি কি বাঁচি

না—
এই রকম! [অধিকতর উম্মনা]

গঙ্গা। পরিবার?—হে' হে'—
রাজা। [অধীর]—হে' হে' তিনি ভালো;

তবে—
তার কাল হয়েছে এই দুই বছর হবে।

সকলের হাস্য

গঙ্গা। ছেলোপিলে—
রাজা। [আরও অধীর] তারাও ভালো—

কি বল্ছিলাম ছাই—
অ—অর্থাৎ—আমার কোন ছেলোপিলে

নাই—
বিধু। 'অর্থাৎ' কি রকমে বুঝবেন বুঝিয়ে

না দিলে?
হারা। তবে "অর্থাৎ" এর গানটা গাও

সবাই মিলে—

নব্যাহিন্দুগণের গীত

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন ভাই
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন
তাঁহার সভায়;

অ—অর্থাৎ আস্তেন নিশ্চয় তানসান
বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দঃখের বিষয় তখন তানসান
জন্মাননিক মোটে।
[কোরাস্] তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
ধিনতাকি,—মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায়
চড়ে' রেলের গাড়ী;
আর হৃদগলি ব্রিজ পার হয়ে উঠলেন
বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়,
কিন্তু রেল পূল তখন হয় নি।
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—
উজ্জয়িনী।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক এলেন তানসান রাজার কাছে
দেখাতে ওস্তাদি;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—
পিয়ানো ইত্যাদি;—
অ—অর্থাৎ আন্তেন নিশ্চয়, কিন্তু হলো হঠাৎ
দৃষ্টি,
যে হয় নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি!
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,
মেও এ'ও এ'ও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মন্ত্রার'
রাজা গেলেন ভিজ্জে;
আর গাইলেন এমন দীপক,
তানসান জ্বলে উঠলেন নিজে;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজ্জে,
তানসান উঠতেন জ্বলে';
কিন্তু রাজা গেলেন দিগ্বিজয়ে
আর তানসান এলেন চলে'।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের
গীতি বাদ্য;
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ
করেন তাঁহার শ্রাম্ধ;
অ—অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাম্ধ—
তাঁর ত হয়ে গ্যাছে কবে?
আর তানসান মূসলমান, তাঁর শ্রাম্ধ
কেমন করে' হবে?
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এ'ও এ'ও।

[নিষ্কান্ত।

গঙ্গা। [তথাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়া]
হ্যাঁ হ্যাঁ—তা—তা
মহারাজ আপনি যে সুন্দর লোক
পাওয়া দুষ্কর এমন একটি বোধ হয় খুঁজে
নরলোক

আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না।
রাজা। ভাল লোকটা কিসে
দেখলেন আমায় সেটা শুন।
গঙ্গা। তা দেখছি;
অতি উদার লোক, নেইক অলঙ্কার লেশ;
আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ;
কারু রাখেন নাক তক্কা—সমাজের ধার
ধারেন নাক একরকম;—অতি পরিষ্কার।
ব্রাহ্ম হন না, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে।
রাজা। কিন্তু সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ে
নি যে—

নিধি। আচ্ছা বল দেখি ব্রাহ্ম ধর্মটা
কি রকম?
গঙ্গা। ধর্মটা? ধর্মটা অতি উচ্চ এবং নয়
কম

নীতি অঙ্গে—“একমেবাদ্বিতীয়ম্”—তা
সেওয়া—
নিধি। সে ত তোমাদের হিন্দুধর্ম থেকেই
নেওয়া—

গঙ্গা। এ ত—হে' হে'—হিন্দুধর্মের
সারটুকুই নিয়ে—
নীল। তা যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম-টাম দিয়ে
কান্ড-মান্ড দরকার কি? হিন্দুই বল
না হে—

গঙ্গা। হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ
তাহে,—

বিধু। ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক নয়?

গঙ্গা। দেখলেন কিসে?

বিধু। কিসে? সবতাতেই।

তফাৎ উনিশ আর বিশে।

হিন্দু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়ে মাটি;
তোমরা না হয় পূজ, দিয়ে ভাষা পরিপাটি।
তোমরা পিতার 'চরণ' ধোরে
কাদ নাক ছড়ায়?

তারা না হয় মাটিতে সে চরণটা গড়ায়।
তারা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে,
তোমরা না হয় ভজ সেটা মনে গড়ে নিয়ে।

ভজ—কেউ চোখ বঁজ্জে, কেউ চোখ মেলি—
তারাঁ না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি।
তফাৎটা কোথায়? [মদ্যপান]

গঙ্গা। মশায় তফাৎ আছে—
নিধি। আছে

আর একটু—তোমার পিতা
ঢালা বিলাতি ছাঁচে।

আর হিন্দুর পিতামাতা
অন্যায়রূপে দেশী।

নীল। তোমাদের খরচ কম,
আর তাঁদের খরচ বেশী।

মদ্যপান

হারা। আরও একটু তফাৎ আছে,
বোল্লেন না ক সেটা।

গঙ্গা। কি প্রকার? [স্বগত] এ ত দেখছি
বাধে ভারি লেঠা।

হারা। বোল্লেন না যে ব্রাহ্মগণ
ভজেন চোখ বঁজ্জে।

আর হিন্দু চোখ খুলে দেবতারে পূজে।
অর্থাৎ—যখন হিন্দু পূজেন ঢাক

ঢোলে জাঁকিয়ে;
আমার ব্রাহ্মভ্রাতা পূজা দিচ্ছেন

নাক ডাঁকিয়ে।

সকলের হাস্য

গঙ্গা। না তা আপনারা যদি করেন তামাসা;—
নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলাও

খাসা;

সোজা ধর্ম—কারো মনে দিও না ক কষ্ট:
কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্পষ্ট—

ঈশ্বর ভালো কিম্বা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ,
এ সব ভেবে কেন মিছে ক্বিধে বাড়াও

স্বিগুণ,

গরম গরম ফুল্‌কো লুচি খাও
গ্যাসের আলোয়;

যদি সঙে থাকে মদুরগীর কারি,
আরো ভালই।

মজাফরপুর্দির লিচু, পাকা আঁব বোম্বাই,
ভাল খাজা কাঁটাল, আর মসুরমান রম্ভায়।

রাতে মিলে দশজনে খাও টপাটপ—
রোস্ট আর কাট্‌লেট, স্টুর্ড আর চপ,

মেজাজ হবে ঠান্ডা, দেহে হবে শক্তি;
আর ঈশ্বরে বাড়বে বৈ কম্বে না ক ভক্তি;

আর বেড়ে যাবে তোমার পরমায়ু ছোট;
কেন মাথা ঘামাও ভায়া—যাও এখন ওঠ।

হরি। কেন তর্ক কর বাবা,
খাবে এক গেলাস?

খাবে ত খাও নইলে উঠে যাও
‘খার্ড কেলাস’—

নীল। আমাদের আমোদের উপর কোরো না ক
Trespass, বাবা যদি আইনের ভয় রাখ;

করে’ দেব ৪৪৮ ধারায় নালিশ—
তখন শোবার জন্য পাবে একটু শস্ত

বালিশ।

হারা। [এক গেলাস মদ্য দিয়া] নেও খাও।
গঙ্গা। কি ও?

হারা। বাবা বৃন্দ্বি কর পালিশ।
কেন তর্ক কর, বাবা, ঢক্ করে’

গিলে ফেল;

আর আমাদের সঙে ফক করে’ মিলে ফেল।
এ সংসারে সার হ’চ্ছে পরের উপকার,

তাই করে’ দিচ্ছি তোমায় ভবসিদ্ধি পার।
নেও—এস—[মদ্য প্রদান]

গঙ্গা। [ধার্মিকভাবে] আচ্ছা কিইবা হবে
একটু খেলে, দেখাই যাক্ না সে কি

রকম। [গেলাস লইয়া পান।]
হারা। এই নাকি ছেলে।

এখন একটা গান ধর—গাও—
কর্ত্তাভজা হয়,—

তরজা হয়, কবি, টপ্পা—যা হয়—
যাতে মজা হয়—

বাবা খিয়েটারের গান জানো?
গঙ্গারাম উক্ত গানে অনভিজ্ঞতা-প্রকাশক ঘাড়

নাড়িলেন
—ভালো, না জানো

নাই জানো—পাঁচালি?—যাত্রা?—
বাবা বেয়ালা বাজান?

শোন যদি মতির দলের, বল্বে
“বাঃ বাঃ আ মরি! মরিরে!”

কণ্ঠে বেহালার সুর অনুকরণ করিতে করিতে
রিত্তহস্তে বেহালা বাজান অনুকরণ

বিদ্যা। [মদ্যালস স্বরে] বেঁচে থাক—
শনে যেন না মরি;

হারা। সত্যি কথা বলতে কি আঃ—

কিবে যাত্রা মতির?

—আহা সেই গানটা জানো?—

[সুর করিয়া] 'হে গতি অগতির'

একটা তুমি গাও না হে, গঙ্গারাম ভাই—

গঙ্গা। কি গাইব? [চিন্তা]

ভাল, একটা আত্মা বিষয় গাই

সুর করণ

বিধু। ও কি হচ্ছে গঙ্গারাম?—ও যে—

না গঙ্গা না রাম—

নিধি। গানটা একটা ভাই, আমরা করি

একটু আরাম

হারা। পড় বাবা গঙ্গারাম—গঙ্গারাম পড়

[চুমকুড়ি]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!—

গঙ্গারাম—পড় [চুমকুড়ি]

বিদ্যা। [উঠিয়া] গঙ্গারাম—আমার

প্রাণের গঙ্গারাম—এস,

এস ভায়া উড়ি; [উচ্চতর স্বরে] উড়ি

[উড়িতে উদ্যত] প্রাণকান্ত মেসো

বলিছিলে “খেয়ো না ক মদ, যদি টলো”—

গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্ছ—যাই বলো,

টল্ছ;—নয়?—দেখি আমি স্বর্গ মর্ত্য

পাঠাল,

আমার কাছে মিছে কথা? ভায়া তুমি মাতাল
হোয়েছো,—আর খেয়ো না! দেখ

শোন বলি;

[টলিতে টলিতে] আমি খাই বটে,

কিন্তু কদাপি না টলি।

আমি মাতাল হই নি;—দেখ দাঁড়াই

এক পা তুলে,

এক পা তুলিয়া দণ্ডায়মান

দুপা তুলেও পারি; [তৎচেষ্ঠা ও পতন]

এ্যাঁ পড়ে' গিইছি ভুলে,

হেস না ক; ফের দাঁড়াই

পুনঃ তৎচেষ্ঠা ও পতন

এ্যাঁ এ কি রকম—

[উঠিয়া] পশ্চাৎভাগটা দেখিছি

এবার হয়েছে বেশ জখম?

তা পা যা হক্—মাথা ঠিক—

দেখ বাপধন—নয়?

আন ভাটিকাব্য সব করে' দেব অম্বয়।

তুমি পার?—বোধ হয় না;—

কর দেখি ভাই—

—“নিরাকরিক্ বসিক্”

গঙ্গারাম অক্ষমতাপ্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন

তা না পার নাই-ই—

তাই ত বাপু!—পাণিনি পড়া বিদ্যে—

এ কি যে সে—

গঙ্গারাম ভায়া—তোমার নাকটি ত বেশ হে।

একটু টেনে দেই

গঙ্গারামের নাসিকা আকর্ষণ

গঙ্গা। বাপ্ রে মলাম [চীৎকার]

বিদ্যা। [তন্দ্রাজড়িত স্বরে] মরে কে যায়—

কি চীৎকার—গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায়

খেয়েছ; আর খেয়ো না—

যাও, শোও গে যাও—

হারা। কিংবা যদি ভাল চাও—একটা গান গাও।

গঙ্গা। [নিরুপায়ভাবে] আপনারা গান

আমি যোগ দেব'খনি!

হারা। আচ্ছা তাই-ই সই [অন্য সকলকে]

গাও—ধর নীলমণি!

সুর করিয়া শেষে গীত ধরিলেন

—এ কি হেরি সর্বনাশ।

রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্বনাশ।

তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার

ধুব এ বিশ্বাস। এ কি [ইত্যাদি]

যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,

সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,

ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ [ওরে]

ভালো দুজোড় তাস। এ কি [ইত্যাদি]

ওরে আমি যদি তুই হইতাম,

পোর্টম্যান্টর ভিতরে নিতাম

বস্কিমের খানকতক [ওরে]

ভালো উপন্যাস। এ কি [ইত্যাদি]

হারা। গাও না সঙ্গে—ওঠ না সব [গঙ্গারামকে]

ওঠ না হে ভাই।

সকলে। [উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে]

রাম তুই হবি বনবাস, এ কি [ইত্যাদি]

হারা। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে
চিঠি লিখিস প্রতি ডাকে,
আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হ'লে [ওরে]
দুই এক ডোজ খাস্।
সকলে।— এ কি [ইত্যাদি]

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—ময়দান। কাল—বিকাল।

গোড়া হিন্দুগণ ও পণ্ডিতগণ কেন্দ্রে স্থিত।
চারি দিকে মহতী জনতা ভূতনাথের লিখিত
বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে

ভূতনাথ। আর্ষ্যঋষিগণ—ছিলেন

আর্ষ্য ঋষি যারা—

বল প্রাণের ভ্রাতৃগণ কি না জান্তেন তাঁরা?
ধরণী যে মহী; তড়াগ নদী; আকাশ ব্যোম;
নক্ষত্র যে তারা; সূর্য্য রবি; চন্দ্র সোম;
সবই জান্তেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে।
—এই অনাদৃত—তোমার নিজের

শাস্ত্রেই পাবে।

শ্যাম। সাবাস্—সাবাস্।

রাধা। বেশ—বাঃ!

চুড়া। [সহর্ষে বারংবার নস্য লইয়া] সাধু!
সাধু!

বিদ্যা। [উচ্চস্বরে] বলিহারি! [জনান্তিকে]

আর এক ছিলম টেনে নাও যাদু।

ভূত। ভূ-বিদ্যাবিৎ কি জানে যে ছিল না এ দেশ?

টেলিগ্রাফ? রেল? ষ্টীমার?

জলের কল? গ্যাস?

স্প্রিংয়ের গাড়ী? ঘড়ি? ফনোগ্রাফ?

টেলিস্কোপ?

সবই ছিল—কালে কালে হয়েছে সব লোপ।

২ শ্রোতা। ঐ গুলোই লোপ কল্পে!—

আর দিলে রাখি'

গরুর গাড়ী, চরকা, ঘানি, কর্পিকল,

আর ঢেঁকি।

ভূত। [বিরক্ত হইয়া] আঃ ধর নাই ছিল।

হিন্দুধর্মের কাছে কি

এরা লাগে?—এ গুলোয়

আধ্যাত্মিকতার আছে কি?

এগুর্লি বিজ্ঞানের কোশল, বিজ্ঞানেরই

ফিকির,

শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যা টিকির।

চতু। ও যে আমি বল্বে হে [ভূতনাথকে
টানিতে লাগিলেন]

—বস না হে ছাই

আমাকেও একটুখানি বল্বে দিও ভাই।

ভূত। আরো বলি, দেশী ময়লা

অশ্ধকারও ভালো—

এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো।

অনিচ্ছায় উপবেশন

শ্যাম। ওঃ কি ভাষা!

সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন

রাধা। কি তেজ!

সবেগে দুহাতে মস্তক কন্ডুয়ন

২ শ্রোতা। [১ শ্রোতাকে জনান্তিকে]

না, কথাগুলো ঠিক

চুড়া। [সোল্লাসে] গভীর গভীর [নস্য গ্রহণ]

স্মৃতি। চমৎকার। [নস্য গ্রহণ]

বাচস্পতি। অলৌকিক।

চতু। [উঠিয়া] হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিক যা

অন্য ধর্ম নহে,

চুরি করা দোষ কি আর কোন শাস্ত্রে কহে?

শ্বেষ, হিংসা ছেড়ে—উচিত দয়া, ধর্ম শেখা,

এ সব আর্ষ্য ঋষিগণই বুদ্ধোচ্ছলেন একা;

সতীত্ব যে ধর্ম শূদ্ধ—হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা।

করতালি ও জলপান

আমিষাশী যেই জাতি, আর্ষ্যঋষিদের কাষ,

তাদের আধ্যাত্মিকতা কি বৃদ্ধাবে সে আজ?

ভাইগণ তোমরা যাজ্ঞবল্ক্য, কর্পিকল, খনা

জানকী;

মনু, ব্যাস, দুর্গাবতী—এদের কথা

জান কি?

না ভাই তোমরা ইংরাজীজ্ঞ—

তোমরা সবাই জান বেকন ও

মিল্, মিল্টন, আর্ষ্যঋষিদের

পুরাণ কথা মানিবে কেন!

২ শ্রোতা। ভারি বল্বেছে।

চতু। গুর্টিকত নব্যহিন্দু দুর্ভাচার আজ

ভাঙ্গিতে উদ্যত এই পবিত্র সমাজ।

ভাই—ছাড় স্লেচ্ছাচার ও মর্গী পেশাজ

ঘাটা—

ধর কচু, কলা, শাগ—হন্দ না হয় পাটা।

৪ শ্রোতা। আর মাঝে মাঝে মিষ্টি
 বারাঙ্গনার ঝাঁটা।
 শিরো। [কুপিত হইয়া] কে তুই?
 ৪ শ্রোতা। আমি যে হই সে হই—
 এঃ যেন মহারাজ,
 —মুর্গীই যদি ছাড়ব ত জীবনে কি কাজ।
 শিরো। মুর্গী এতই মধুর?
 ৪ শ্রোতা। [মুখ খিঁচাইয়া]
 তোমার কচুর চেয়ে ভালো।
 অন্য শ্রোতার। শত গুণে ভালো
 হাজার, লক্ষ গুণে ভালো।
 ১ শ্রোতা। হিন্দুয়ানির প্রশংসাতে
 খুব রাজি আছি;
 কিন্তু মুর্গী—আঃ—মুর্গী ছাড়লে কি
 বাঁচি!
 চতু। ওহে শোন সেটা নয় যে
 আধ্যাত্মিক আহার।
 ৪ শ্রোতা। দৃং [চলিয়া গেল]
 চতু। আধ্যাত্মিকতাই যে হিন্দু ধর্মের বাহার।
 ২ শ্রোতা। বাহার নিয়ে ধুয়ে খাওগে,—
 চল সব চল—
 অন্য সকলে। বোঝা গেছে বৃন্দ বৈশ্যর
 তপস্বীর দল ও।
 [শ্রোতাদিগের প্রস্থান।
 শিরো। [হতাশভাবে]
 না এ মিছামিছি—ওহে মুর্গী চালিয়ে
 নেও হে।
 চতু। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া]
 হা হতোস্মি!—স্মৃতিরঙ্গ নস্যদানটা
 দেও হে।
 শিরো। তবে শাস্ত্র এই রকম খাড়া করা যাক্
 যে মুর্গীকে হাঁস বলে' যার খুসী থাক্।
 সকলে। [স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে]
 ঠিক্ ঠিক্।
 শিরো। আর মুর্গীর ডিম—কেউ তারে
 হাঁসের ডিম বলে' খেতে চায়—খেতে পারে।
 বিদ্যা। [সহর্ষে] বাঃ বাঃ। আর বাঁকিগুলো?
 শিরো। [একটু চিন্তা করিয়া] গো আর শূরর
 বোধ হয় খাওয়া যেতে পারে—
 দিয়ে ঘরের দুয়োর;
 কিংবা হোটেলতে বসে—মার্কন্ড পুরাণেও

এইরূপই লেখে; মনুসংহিতার এক স্থানেও
 এ বিধান আছে।
 বিদ্যা। [স্বীয় ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে]
 কেয়াবাৎ! কি শাস্ত্রজ্ঞান! আঃ—
 ন্যায়। কি ধীশক্তি!
 চতু। কি গভীর গবেষণা! [নস্যগ্রহণ]
 অন্য সকলে। বাঃ!
 শিরো। আপাততঃ বিলেতফের্তা ব্রাহ্ম ফ্রাহ্ম
 'হ'ল
 একঘরে। বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল।
 স্মৃতি। কিন্তু সে গুড়েও বাঁলি!
 এদিকেও দুর্ঘ্যোগ;
 শূন, রাজা কচ্ছেন, এবার বিলেত
 যাবার উদ্যোগ।
 পন্ডিদেরা সকলে। সে কি? সত্যি না কি?—
 [বিদ্যানিধিকে]
 বিদ্যা। না না [স্মৃতিরঙ্গকে] তামাসা বোঝ না?
 হরি। না সে তামাসা নয় বড়—
 আমারও তাই শোনা।
 ভূত। সত্য না কি? হ্যাঁ
 শেষে কিনা বিলেত!
 শ্যাম। চীন নয়, ব্রহ্ম নয়, কাবুল নয়—
 বিলে—এ—ত্!!
 রাধা। তাও রেলও নয়,—জাহাজে চড়ে—
 বি—লে—এত্!!
 চতু। হা ব্যাস—হা মনু—ওঃ—দয়াময় হরি!
 উন্মত্তের ন্যায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন
 ভূত। হে বসুধে মিবধা হও—আমি প্রবেশ করি।
 পতন ও মূর্ছা
 হরি, শ্যাম ও রাধা। হা হা ভূতনাথ মূর্ছায়—
 ধরুন ওঁকে ধরুন।
 ধরার্থী করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন
 বিদ্যা। [পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে
 ভূতনাথের মাথা ধরিতেছেন এইরূপে]
 আহা হা হা—দেখি—দেখি
 [পন্ডির্তদিগকে]
 সরুন মশায় সরুন।
 [নিষ্কান্ত।

নবম দৃশ্য

স্থান—ব্রহ্মালয়। উচ্চে দূরে নিৰ্ব্বা-প্রপাত।
কাল-প্রভাত।

ব্রহ্মা চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন
সরস্বতীর দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়া গীত

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমাব ?

বিষাদের রেখা কেন বা আননে?

নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়
ও মূখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।

ধীবে ধীবে রবিপানে, চাহিয়ে বিষন্ন প্রাণে
পড়িছ ঢালিয়া পশ্চিম প্রাণগণে।

এই ছিলে হাসি হাসি ঢালি কর সুধারামি
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে।

লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

ব্রহ্মা। সরস্বতী, তুমি এখন বীণা ছেড়ে
আবাব বেহালা ধুলে কেন ?

সর। এখনকার 'ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা।
মেয়েদের বেহালা বাজান লোকে ভাবি পছন্দ
কচ্ছে।

ব্রহ্মা। কিন্তু, আমার কাছে মেয়েদের বেহালা
বাজানোর দৃশ্যটা মনোরম বোধ হয় না। কি
একটা অশুভ পদার্থকে নাকের নীচে বাঁ হাত
দিয়ে ধরে' ডান হাত দিয়ে এক গাছ ছিড়ি
নাড়ার চেয়ে, বীণায় হেলে স্বর্ণবলয়নিষ্কণসহ
বামহাতের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর
ঈষৎ বক্রভাবে সঞ্চালন দেখতে বেশী ভাল
বোধ হয়। তাহাতে শরীরের ও হাতের মাধুর্য্য
যেন বেশী পরিষ্ফুট করে' তোলে।

সর। কিন্তু 'ফ্যাসন' মাফিক চলতে হবে
ত।

ব্রহ্মা। তাও বটে।—তা সে যা হোক তুমি
এখন একটা ছাঁকা ভৈরবী গাও দেখি।

সর। তা পারবো না। এখন শুদ্ধ রাগ-
রাগিণী গাওয়া 'ফ্যাসন' নয়। মিশ্র ভৈরবী
বলেন ত একটা গাই।

ব্রহ্মা। [চটিয়া] তবে এখন কি খিচুড়ি
ফ্যাসন হয়েছে? আচ্ছা না হয় মিশ্রই গাও।

সর। [বেহালার কান মোচড়াইতে আরম্ভ
করিলেন।]

ব্রহ্মা। একটা চার বিষয় গান জানো ?

সর। তা আর জানি নে!

ব্রহ্মা। তবে তাই গাও।

বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাই না;
শুদ্ধ বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।
তার সঙ্গে দুখান সবভাজা থাকে আর্পিতকর নয় তা'
শুদ্ধ বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে

প্রাতে এক প্যালা চা।

[তান, যাহাতে ব্রহ্মা যোগ দিলেন] চা—চা—চা
—প্রাতে এক প্যালা চা।

শ্যাম্পেন, ক্রীবেট পোর্ট স্যোরি আর খাও
যার খুসী যা;

শুদ্ধ কেড়ে কুড়ে নিও না আমার প্রাতে
এক প্যালা চা।

অসাব সংসাব কেবা বল কার—

দারা সূত বাপ মা;

অসাব জগতে যাহা কিছুর সার—

প্রাতে এক প্যালা চা।

[পূর্ব্ববৎ তান] চা—চা—চা—

প্রাতে এক প্যালা চা।

ব্রহ্মা। [মুগ্ধ হইয়া] বাঃ চমৎকার! এটি
বড় চমৎকার গান।

[তান করিয়া] চা—চা—চা—আহা।

শশবাস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ

ব্রহ্মা। কি হে ইন্দ্র, কি মনে করে? এত
বাস্ত কেন ?

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে] প্রভো
আজ মহা বিপদ!— আমাকে স্বর্গচ্যুত কর্তে
চায়।

ব্রহ্মা। আবার দৈত্যরা এসেছে বুদ্ধি। কেন
তোমার বজ্র সহায় আছে ত।

ইন্দ্র। এ সব দৈত্য বজ্রে নিরস্ত হ'বার নয়
শুন্তে পাই।

ব্রহ্মা। দৈত্যেরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে
বুদ্ধি।

ইন্দ্র। না, কসেব বলেছে।

ব্রহ্মা। তাতেই তুমি পালিয়েছ? তুমি তা
হ'লে ত দেখছি ভারি বীর। [হাস্য]

ইন্দ্র। আজে না। আমার দেবতারাও
বিদ্রোহ করেছে এবং আমাকে ধরে' বেশ দু ঘা
দিয়ে দিয়েছে; আর বজ্রও চম্পট।

ব্রহ্মা। [সাম্ভ্রম্য] বল কি! সরস্বতী আর
এক 'কপ' চা ঢাল ত। [সরস্বতী তাহাই
করিলেন]

ইন্দ্র। আর এই দৈত্যেরা আমাকে মানা

দূরে থাকুক, আপনাকেও মানে চাচ্ছে না। বলছে যে আপনার অস্তিত্ব শূন্য ঋষিদিগের মস্তিষ্কে।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান]

শীতলা মনসা আদি মর্ত্য দেব-দেবীগণের
প্রবেশ

শীতলা। [দূর হইতে সাস্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ব্রহ্মন্ ধরাতলে আমাদের পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমাদের সেখানে আর কেউ মান্ছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি।

ক্রন্দন

ব্রহ্মা। সে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি।

মনসা। দেশে এত রকম 'প্যাথি' সৃষ্টি হয়েছে যে, সব মানুষগুলো তারাই মেরে ফেলে; আমাদের পূজা দিবার জন্য আর কেউ রৈল না। [ক্রন্দন] এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলেই লোকে আমাদের হুটু কোরে দিচ্ছে।

ব্রহ্মা। [বিস্ময়াভিভূত] বল কি!

যক্ষ ও যক্ষবালাদের প্রবেশ

১ যক্ষ। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রজাপতে! আমরা অসুর কর্তৃক রাজ্য হইতে প্রতাড়িত।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান] যক্ষরাজ কোথায়?

২ যক্ষ। তিনি অসুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অসুরেরা তাঁহাকে ফাঁসিকাঠে লম্বমান কর্ষার অসুবিধাকর প্রস্তাব করেছে।

ব্রহ্মা। বল কি?

বানর ও বানরীগণের প্রবেশ

১ বানর। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রভো! ধরাতলে চিরপূজ্য বানরজাতি আজ তাহাদের বংশোদ্ভূত সন্তানগণ কর্তৃক পরাজিত, পরাভূত ও গুলীকৃত। একটা যা হোক ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম।

বসুমতীর প্রবেশ

বসু। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] চতুর্মুখ, আমি আর পাপের ভার সহিতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা তার উপর

বাসুকিও পালিয়েছে। আমি একা আর কত সহিব।

ব্রহ্মা। সে কি বসুমতি!

বসু। হ্যাঁ প্রভো, আমি ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়াছিলাম ত তিনি নিজেই রাজ্য হ'তে প্রতাড়িত। [ইন্দ্রকে দেখিল] এই যে তিনিও এখানে।

ব্রহ্মা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্বকর্মা'কে।

এক জনের বহির্গমন

ব্রহ্মা। এ্যাঁ, হোল কি!—[চা-পান] সরস্বতি, এবার চা'টা একটু তেত হ'য়ে গিয়েছে।

সর। দেখি [ব্রহ্মার কপ্ হইতে একটু পান করিয়া] হ্যাঁ, tannic acid হয়ে গিয়েছে, আর খাবেন না।

কল্কিপূরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে বিশ্বকর্মা'র প্রবেশ

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্মা ধরাতলে এখন কলিকালের কোন ভাগ?

বিশ্ব। [গম্ভীর স্বরে, পদস্বতক হইতে মূখ তুলিয়া] এখন কলিকালের শেষভাগ।

ব্রহ্মা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পূরাণ থেকে পড় দেখি!

বিশ্ব। [পদস্বতকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে] কলিকালের শেষভাগে নব্যহিন্দু নামক এক প্রকার মনুষ্যজীব জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা বাক্যে অপরিমিত বলশালী ও কার্যে অচিন্তিতপূর্স্বরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শক হইবে। তাহারা ইংরাজী পড়িবে, তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক পরিবে; কদাচিৎ গোপনে ইংরাজী খাদ্য খাইবে; অর্ধ ইংরাজী কহিবে; মসীযুদ্বে কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইবে না; ও বাক্যুদ্বে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে।

হিন্দুধর্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া 'ব্রাহ্ম' নামধারী কতিপয় যুবক 'হিন্দু' নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং তাহাদিগের মনে মনে এরূপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন ধর্ম প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিলেতফের্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদগুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে সাহেব-দিগের ষোল আনা মাত্রায় অনুবর্তী হইবে। তাহারা ধৃতি চাদর নির্বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট্ কোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বুল চর্ষণ, গুড়গুড়াড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতি-নীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে এবং কেবল 'কুলি' সম্প্রদায়ের সহিত এড়া ভাষায় বাঙালা বা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী 'স্ল্যাং' (slang) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে; ছাঁড় ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে এবং পদম্বয় যতদূর সম্ভব ম্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-চর্চা ছাড়িয়া দিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এবং নীতি ও ধর্ম অপেক্ষা খাদ্যে ও ভ্রমণে অধিক মনোযোগ দিবে—অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি, নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আহার ও ম্লেচ্ছ-দেশভ্রমণ অধিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত শূদ্র তাহাদিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না; ও তাহারাও তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে—হিন্দুধর্মের প্রধান্য ও অবান্তর ধর্মের হীনতা জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে ও নব্য সম্প্রদায়কে সভ্য ও অসভ্য দুই প্রকার গালিই অকাপণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম হইবে 'গোঁড়া'। ইহারা টিকি রাখিবে ও কুকটভঙ্গন পরিত্যাগ করিবে।

স্বর্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবি-শ্বাস জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মন্ত্রী-দেব-দেবী উদ্ভূত হইয়া নিরক্ষর অপগন্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায়স্বরূপ হইবে। ক্রমে সর্ব দেব-দেবীতে অবিশ্বাস জন্মিবে এবং জগতে 'স্বার্থ'-পূজা প্রধান পূজা বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমে সমাজে সর্ব প্রকার খাদ্য চলিবে; ও রাজা মহারাজারা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিবে;

তখন বিলাতযাত্রা আর দৃশ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বিধবা-বিবাহ সমাজে চলিবে; বহু-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যাইবে। হিন্দুসমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের শেষ হইবে।

ব্রহ্মা। ধরাতলে সমাজ এখন এই রকম হয়েছে নাকি?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

ব্রহ্মা। বোঝা গেছে; কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। আমি যাচ্ছি—বিষ্ণুকে কল্ক-অবতার হ'তে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ী যাও।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

ক্রমে সরস্বতী ভিন্ন অন্য সকলের সোল্লাসে

প্রস্থান সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত

কেন আর এ ভাঙাঘরে মারিস্ তোদের সিঁধকাটি?
ছিন্ন তরুর মূল হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি?
বিষে জ্বর জ্বর প্রাণে কেন হানিস্ বিষ বাণে?
পাপের বন্যাভরা দেশে আনিস্ নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে মারিস্ কুঠার মায়ের
বুকে?

দু'দিন গেলে দিস্ রে ফেলে—

পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি!

দ্বিতীয় অভিনয়

প্রথম দৃশ্য

স্থান নবরচিত কল্কদেবের বিচিত্র আদালত।

কাল—স্বপ্রহর বেলা।

বিরাট জনতা।

সম্মুখে চেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—

কল্কদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে;

সকলের তাঁর কাছে আজ বিচার হবে;

ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তুত হও তবে;—

চুপ করে বসে থাক, করো না ক গোল;

সকলেরই ডাক হবে—[চেঁড়াদারকে]

বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধর্নি

যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,

করেছেন যারা হিন্দুসমাজ-বিভ্রাট,

দেবেন তাঁদের সাজা দেব কল্ক সম্রাট্,

—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর

লাট।

নয়ক' এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,
এবার শাস্তি শুল বাবা। [চে'ড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধরনি

বিলেতফেস্তা-চয়, দেখবে কি হয়;
বড় পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে চুরোট

খাওয়া নয়!

চোখ ব'জ্জে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্যহিন্দু—নুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয়।
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর কোল—
নেও এবার ঠেলা সব—[চে'ড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধরনি

গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্ছ কি ছাই!
ছেলে-বেলায় খাদ্য ব'ঝি মনে নাই ভাই?
পাণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাই।
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিচয় নাই—
হাজার নাড়ু টিকি, হাজার বল হরিবোল,
রক্ষা নাই কোন দিকে—[চে'ড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

দামামাধরনি

এই বঙ্গদেশ আজ হবে পেষ :
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলযোগ বেশ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ;
তাই এসেছেন কলিক—ব্রাহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কলিকদেবের আগমনের রোল;
নিজের নিজের পথ দেখ—[চে'ড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামাধরনি ও উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ময়দানের বিরাট তাম্বুর অভ্যন্তর।
কাল—প্রভাত।

সিংহাসনারূঢ় কলিকদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অনুচর-
বর্গ। 'মন্ত্রী' বৃহস্পতি, কলিকদেবের দক্ষিণ পাশে
আসীন। সম্মুখে অভিযোগী ধর্ম দণ্ডায়মান
কলিক। [গম্ভীর স্বরে]—

হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্য প্রধান দোষী
কে কে?
তাদের দেখা যাক্ নিয়ে এস একে একে।

ধর্ম। [করজোড়ে] সমাজ ভাঙ্গার জন্য,
প্রভো, দেব, দয়্যাসিন্দু!
বিলাত-ফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পাণ্ডিত,
নব্যহিন্দু—

এই পণ্ড সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি।
কলিক। আচ্ছা, নব্যহিন্দুদলে বোলাও প্রহরী।

প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি,
হারাধন, ও পশ্চাতে বিদ্যানিধিকে হে'ছড়াইতে
হে'ছড়াইতে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ;

বিদ্যা। আমায় কেন টান—আমি
নব্যহিন্দু নই, বাবা
হারা। তুমি নব্যহিন্দুর বাবা,

আমরা যাই হই, বাবা
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলাধু'ও নও কম;
ফাউল খাবার রান্ধস, আর মদ খাবার যম।

বিদ্যা। আহা যদি রাজার সঙ্গে
বিলেত যেতাম চলে'
পড়তে হ'ত না—ওর নাম কি—
এ বিষম গোলে।

নব্যহিন্দুরা কলিকদেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন

ধর্ম। এ'রাই নব্যহিন্দু—ওরফে
Reformed Hindoos ;

এ'রা বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভূজ,
বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্দেশ ভীষ্ম,
প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মপদ্মধী, ও কার্যে অদৃশ্য।
কাগজ এ'দের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এ'দের অসি;
রণবাদ্য হুঙ্কারব; রক্তপাত মসী।

এ'দের পরাজয় শূন্য গৃহিণীর গালি;
এ'দের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি।
এ'দের ধর্ম জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি,—
—যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি।
এ'রা মেয়ের বিয়েয় হিন্দু, ব্রাহ্ম চোখ

বোঁজায়,
নাস্তিক ফাউল খাবার সময়—ই'তে যাই
বোঝায়;

এ'রা খান—গৃহে ভাত, পূজা-গৃহে পাঁটা,
বন্ধুগৃহে 'ফাউল', এবং বেশ্যাগৃহে ঝাঁটা;
নব্য হিন্দুদলে প্রভু করিলাম পেষ—
দাঁড়ি গর্ব, মূখ সর্ব, খর্ব—

বন্দীগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

বৃহ। বা এ'রা ত অপরূপ!—কারো এক ছুট,
কারো ধূতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ
'বুট';
কারো ধূতির উপর ঝোলে
একটি পিবাণ মোটে;
কারো সেটি অর্ধ ঢাকা
দীর্ঘ চায়না 'কোটে';
বিলাতি পিরাণ 'কোট' কারো চারু অঙ্গে:
দেখি আবার 'নেকটাই', কাপড়ের সঙ্গে:
কাল্ক। বা এ'রা ত বেশ!—এরা শাস্ত্র-টাস্ত্র
জানে?
[বৃহস্পতিকে]—জিজ্ঞাসা কর ত এরা
'কোন ধর্ম মানে?'
বৃহ। ভো—ভো—নব্যহিন্দু—তোমরা
কোন শাস্ত্র জানো?
কোন ভাষায় কথা কও
কোন ধর্ম মানে?
বিধু। ধর্ম?—হোঃ ধর্ম!
pooh ধর্ম কর্ম কার?
আজ কাল ত ধর্ম কর্ম করে কর্মকার;
রাজমিস্ত্র, সূত্রধর এবং চর্মকার।
ধর্ম?—হোঃ! তাই যদি মান্বে তবে
Ganot
হুম্বোল্ড, লাপ্লাস্, অর ডারুইন পড়া
কেন?
জলে ফেলে দিলেই হয়।
বৃহ। ধিক্—অহো ধিক্
শর্তাধিক্—কে তুমি হে?
বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক—
Physical Science—এর আমি Lec-
turer—
নাম বিধুভূষণ—ধর্মের ধারি নাক ধার।
বৃহ। ধর্ম নেই ত সমাজ থাকে কেমন কোরে
পাগল।
বিধু। The iron law of necessity, the
beautiful struggle
For existence—এই ধর্ম—the sur-
vival of the fittest—
কাল্ক। [হতাশভাবে বৃহস্পতির মুখের দিকে
তাকাইয়া] এ কি বলে।
বৃহ। [বিধুকে] রাখ হে ও সব
তুমি সমাজতঃ কি হে?

বিধু। সমাজতঃ—হিন্দু।
সমাজতঃ আবার কি!
বৃহ। বেশ! তা যদি হও বিধু।
তবে হিন্দু-ধর্মও মানো—
বিধু। মোটেই না—আমার
বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যাকে ইচ্ছা।—
শ্যামার,
দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের অস্তিত্বে;
কি বরুণ
অগ্নি, বট, পাথর,—যাকে খুসী বিশ্বাস
করুন—
শীতলা কি মনসা—কিংবা তেলাপোকা
ইন্দুর,
ছাবপোকা,—যত আছে দেব দেবী হিন্দুর;
একেশ্বর মানুন; ভূত মানুন, নাই মানুন;
কিংবা নেন থিয়সফিণ্টদের আইন কানুন;
কিংবা নাই' নেন; দুনিয়ার বদ্মায়েসী
বাড়ান
ধাম্পাবাজি, চুরি করুন; স্ত্রীকে মারুন,
তাড়ান;
বিয়ে কোরে দশ বিশ গন্ডা বাঁধা
বেশ্যা রাখুন;
তবু বেশ চলে যাবেন।—অর্থাৎ যদি না খান
গো, মুরগী, শূয়র, পে'য়াজ;—
বিশেষ কুংড়ো সিদ্ধ
বৃধবারে রাতে খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ;
টিকি রাখেন আরো ভালো,
না রাখেন, নাই—
কিন্তু একটু বয়স হোলে সেটা শৃদ্ধ চাই।
কাল্ক। সে কি! এরূপ হিন্দুধর্ম পেলে
কোথা থেকে?
বিধু। পণ্ডিতেরা শিক্ষা দেন তাঁদের
পুঁথি দেখে।
কাল্ক। [ধর্মের দিকে তাকাইয়া] সত্যি!
বিধু। না হয় জিজ্ঞাসুন পণ্ডিতদের
ডেকে—
কাল্ক। লোকাচার মানো?
বিধু। মানি বটে প্রকাশ্যতঃ
এক ঘ'রে না হবার জন্যে দরকার যত।
মুরগী যদি খাই—I would tell a lie,
As soon, ও as easily as would
eat a pie,

তার উদ্দেশ্য নয়ক কাউকে ফাঁস দেও
বিশেষ;
উদ্দেশ্য—not to hurt society's pre-
judices এটা একটা white lie কারণ
society সব জানে;
জিজ্ঞাসুন বিদ্যারত্নে—আছেন ঐখানে।
বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাকাঢাকি কেন ?
বিধু। কি জানেন? societyটা অবিকল যেন
Old father; বলে ডেকে নব্যহিন্দু
দলেব
Headদের, “বাবা জুতো মারো।
মেরো না সকলের
সম্মুখে। মারবে ত জানিই।
এখন হইছি বৃদ্ধ ;
না তাড়িয়ে দিও দুটি আলোচাল সিদ্ধ;
আর মাঝে মাঝে—মেরো Dawson
বাড়ীর জুতো,
আস্তে, পীটে—ঘরে বোসে।”
Society বস্তুতঃ
এক রকম reasonable, আমরাও তাই
তাকে তাচ্ছিল্য না কোরে ঘরে বসে' খাই।
কল্ক। তোমার ওসব ফাজ্লামি এখন
দেও রেখে;
বোঝা গেছে—[প্রহরীকে] আচ্ছা
এখন গিয়া বসাও একে
নিয়ে এস দেখি,—ওই লোকটা বলে কি।
বৃহ। কে হে তুমি?
নিধি। আমি ডাক্তার!
বৃহ। আচ্ছা এস দেখি;
তুমি ধর্ম-টর্ম মানো?
নিধি। আমি ধর্ম মানি।
বৃহ। সে কিম্বধ বল, যদি বলতে নাই
হানি।
নিধি। আমার ধর্ম—Humanitarianism,
কল্ক। উঃ—বাপ—
অর্থটা কি কুমীর, না বাঘ, না কি সাপ?
নিধি। ওর অর্থ এই—কি না বিশ্বপ্রীতি—
কল্ক। বা—রে?
এত বড় কথাটা কি ঐটুকু ভারি?—
সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে।
নিধি। The greatest good of the
greatest number মানে

বেশী লোকের যেইটেতে বেশী উপকার
তাই ধর্ম।—
কল্ক। | স্বগত | মন্দ নয় অর্থ কথাটার।
যা হোক হিন্দুধর্ম বিষয় তোমার কি
মন্তব্য?
নিধি। হিন্দুধর্ম অতি Foolish ;
অতীব অসভ্য
কল্ক। | সার্তিবিস্ময়ে | কেন?
নিধি। দেখুন medically, vegetable চেয়ে
Meat ঢের digestible। না,—রোজ এক-
ঘেয়ে
কুমড়োঘণ্ট, শাগচচ্চড়ি। থোড়বিড়ি খাড়া,
আর খাড়া বিড়িথোড়।—হায়! এ জাতটা
মড়া
হোল—মশায়, বলব কি, কেবল না খেয়ে;
ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার!!! তার
চেয়ে
খেতো যদি ছাতু কিংবা পশ্চিমে চাপাটি
যেত তবু পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাঁটি।
না, কি?—শুধু ঘি আর ভাত,
সন্দেশ আর মূড়ি,
Starch আর fat খেয়ে বাড়াচ্ছেন ভুঁড়ি।
আরো দেখুন sea breezeটা সব চেয়ে
খাঁটি।
না, সমুদ্র একবারে পার হলেই—মাটি।
তাই বৃষ্টি নদীতেই টানুক গিয়ে দাঁড়!
না আধারে বসে' সবাই যত ধর্মের ষাঁড়
দাবার বড়ে টেপা—আর হাতে হুকো ধরা
আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা;
তাই না হক বাড়ীটাই হোক একটু ভালো!
তা সে এমন—যেন বাঘ বাতাস আর
আলো;
জানালাটা বড় করা যেন একটা পাপ,
গিন্নীদের দেখা যাবে—কি ভীষণ বাপ!
আরে! Ventillation Indiaর hot
climateএ
Essentialএ বৃষ্টিটাও নাই তাদের পেটে
অর্থাৎ brainএ (ভুলিছিলাম)—
দেখুন দিখি ছাই
এই কি ভুল notion—পেটে বৃষ্টি!!!
আরে ভাই,
Anatomy জাননাক; Physiologyর ধার

ধার নাক; Microscopeটা ভাব বধির
খেল্ কি! Chemistry, Physicsএর ব্যাপার
দেখলে ভাব ভোল্কি:
Hygiene বোঝ নাক; আছ চিরকাল ধোরে
পাঁচন আর হরিতকী; অম্নি ফক্ কোরে
খাবার ব্যবস্থা দিলে, কল্লে ধর্ম সেটা,
হয় নাক হি'দুয়ানি, না মানিলে যেটা।
এই মশায় হি'দুয়ানি, পিণ্ডতের রচা—
শ'টুকোঃ চিম্‌সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ—
মান্বে বলুন কেবা তাঁদের এই হি'দুয়ানি
Nineteenth Centuryব. বিদ্বান ও
জ্ঞানী।

বহ। তবে—হি'দু নও -
নিধি। না, সে সমাজতঃ মানি,
কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ,
তখন যায় আসে নাক what I profess ;
সব তারি থাকা ভাল ভেতর আর সদর,
এই যে দেখছেন আমার এই, সুগোল
ও নধর
চেহারাটি—তারো যদি উল্টে দেখেন ভিতর,
দেখবেন সেটা কিরূপ বীভৎস, ও কি
ইতর!

কল্ক। আচ্ছা ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও
গিয়ে।
মাথা ঘামিয়েছ কভু স্বর্গ নরক নিয়ে?
নিধি। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধোঁয়াটে।
তবে—কটপ্লেট, চপ্ ও ক্যারি—ডবসি'ধুর
ঘাটে
অনেকটা এনে দেয় স্বর্গের আভাষ;
আর ঝাঁঝা থিদেতে,—নিরম্বু উপবাস
যারে বলে, সেই নরক—এই সোজাসুজি,
স্বর্গ—ও নরক—আমি যত দূর বদ্বি।

কল্ক। না হে না, তুমি ত দেখি
অতীব বোল্কি!
মানুষ মরলে কি হয়—সেটা জানো কিছ
ঠিক?

নিধি। তা ঠিক জানি।
কল্ক। বল দেখি মানুষ মরলে কি হয়?
নিধি। আড়ষ্ট হয়।
বহ। না না তার পরকালে কি হয়?
নিধি। পরকালে? হয় উপোষ না হয় ভাল
খানা।

কল্ক। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক—
গ্যাছে জানা।
আচ্ছা ওকে ডাক, যে ঐ কি ভেবে মনে
নু'কিয়ে নু'কিয়ে গিয়ে হাসছে এক কোণে।
হারাধন আজ ঘটনাক্রমে মদিরায় 'চুর' হইয়া
আসিয়াছিলেন
বহ। তোমার নাম কি?
হারা। [হাসিয়া] হিঃ হিঃ—হারাধন—গোসাই
বহ। হাস কেন?
হারা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হাসি কেন?—
মশয়—
নীল। হারাধন আদালতে জবাব দিও না
হেসে,
আদালতে হাসতে আছে? fine
হবে শেষে।

বহ। তুমি কেহে আবার?
নীল। [সগর্বে] হাইকোর্টের উকিল আমি।
বহ। এখন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজলামি—
[হারাধনের প্রতি] নাম কি তোমার?
হারা। হারাধন!
বহ। বয়স?
হারা। দেড় কুড়ি।
বহ। পেশা?—
হারা। [হাই তুলিয়া] বাবা হাই তুলি—
আর দেই তুড়ি—
করি মনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই,
রাতে এসে কখনও বা দূ এক dose খাই;
তুমি বাবা কি কর? হিঃ—হিঃ—হিঃ—
কল্ক। —ফের হাসি?

অমন যদি কর তবে তোমায় দেব ফাঁসি।
বহ। উত্তর দেও। God মানো?
তোমার হাসি রাখ।
হারা। [গম্ভীরভাবে] না বাবা goddess
'মানি—God মানিনাক।
বহ। কিরূপ তোমার দেবী? কিরূপ
আকৃতি।
হারা। নিরাকার; সচ্চিদানন্দ, বোতলেতে
স্থিতি—

কল্ক। নিরাকার তিনি?
হারা। [পদ্বর্ষবৎ] তিনি নিরাকারই, তবে
ধরেন আকার যাতে ঢাল তাঁতে যবে।
কল্ক। [সবিস্ময়ে] সে কি রকম?

হারা। [বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া]
 —এই ঢাল বোতলেতে যখন,
 নধর বোতলাকৃতি মা আমার তখন
 বোতল দেখাইয়া
 গেলাসেতে ঢাল যখন গেলাস-আকৃতি
 দেখাইলেন
 পেটে ঢাল [খাইলেন] বাস্ বাবা
 বাহুল্য বিস্মৃতি
 কলিক। [সবিস্ময়ে বৃহস্পতির পানে চাহিয়া]
 বলে কি এ?—বৃহস্পতি 'হুইস্কি'
 এরই নাম ?
 হারা। একটু খেয়ে দেখ বাবা: না হয় তার
 দাম নেবনাক; খাও বাবা, রাগ কেন?—
 আমাদের mission
 প্রত্যেকে অন্ততঃ ১০ জন convert করা
 ফি সন্। খৃষ্টান পারে, ব্রাহ্ম পারে
 [মোটে লাইসেন্স না নিয়ে।
 যত ভালমানুষের ছেলে দিতে বানর
 বানিয়ে;
 আমরা পারিনাক? নেও, খাও বাপধন এস;
 গিলে ফেল নাম কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ।
 গ্লাস ও বোতল কলিকদেবের সম্মুখে রাখিলেন
 জনৈক প্রহরী। বল্ছিহিস্ কি রে গণ্ডমুখ।
 অর্বাচীন—আ মর
 স্বয়ং বোসে কলিকদেব এষে জানিস, পামর?
 হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন
 হারা। হলেই বা! কথাটা কি বলোছি অমন্দ?
 ইঃ রাগ দেখ—ছাড়—তোর মুখে গন্ধঃ—
 প্রহরী! আমার না তোর মুখে?
 মাতালের ডিম।
 হারা। মাতাল কিসে? তুই মাতাল।
 [সজ্বোরে] মাতালের ডিম।
 ফিরিয়া যাইতে উদ্যত
 কলিক। ছেড়ে দাও ওকে এখন; ক্রমে শাস্তি
 ওর
 বিধান করিছ; বেটা মাতাল বদ্‌ম্যেস
 খোর!

হারা। আমি বদ্‌ম্যেস?
 offer কল্লাম গেলাস মদ্যর:
 গাল দেও? কলিক তুমি বেজায় অভন্দর—
 চিরকাল ধেনো খেয়ে মরেছ ত খালি.
 দিলাম যদি খাঁটি মদ তাতে দাও গালি—
 কখন ত হয়নি তোমার ভন্দরদলে মেশা,
 কখন করনি একটু উঁচু রকম নেশা.
 তুমি খাও ধেনো, তোমার শ্বশুর খান ভাঙ,
 ইতে আর কত হবে? তাই সব বিদ্যেয়
 চতুরাং,
 —বৃহস্পতি! তোমার কাছা খুলে গ্যাছে.
 ভাই—[হাস্য]
 বৃহ। | শশব্যস্তে | কৈ? | কচ্ছ ঠিক করিতে
 বাস্ত |
 হারা। ঐ যে নীচে পড়ে।—কাছার ঠিক নাই
 মোকন্দমা কন্তে এলে বাবা; যাও, যাও—
 —ধেনো খেয়ে কত হবে?—নেও, বাবা
 যাও—
 গেলাস প্রদান
 বৃহ। আবার?
 কলিক। [প্রহরীকে] দেও ত ওরে সজ্বোরে
 কান্দুটি
 প্রহরীর তদ্রূপ করণ ও ইত্যবসরে কলিকদেবের
 লুকাইয়া দৃ-টোক পান
 কান ধোরে দশ বার করাও ছুটাছুটি।
 হারা। [দৌড়াইতে দৌড়াইতে]
 কেন বাবা?—এমনই কি!
 তোর ধেনো খাগে যেয়ে
 হুইস্কি খাবিনে ত' খাসনে,—
 [উচ্চৈঃস্বরে] ছেড়ে দেনা লাগে যে—
 সকলের হাস্য
 বিদ্যা। লাগছে নাকি? আমি ভাবিছিলাম
 বৃদ্ধি আরাম হচ্ছে:
 তুমি কলিকর বোনাই কি না
 তাই তামাসা কচ্ছে—
 হারাধন নিষ্কৃতি পাইয়া চারিদিকে
 তাকাইয়া উকিলকে
 হারা। দেখ ভাই বেইজ্জৎটা কল্লো—শুদ্ধ রাগে
 নীল। হ্যাঁ, ইতে ৩৫২ ধারা বেশ লাগে—
 কলিক। [সক্রোধে] নিয়ে এস উকিলটাকে।
 দেখি কিরূপ সেটা

বৃহ। এস দেখি উকিল ভায়া দেখি তুমি কার
বেটা

নামটা কি?

নীল। লোকে ডাকে নীলমণি ঘোষ—

বৃহ। বাপের নাম?

নীল। [ভাবিয়া] মশয়, যদি না থাকে দোষ
তবে বলি, বাপের বিষয় চাক্ষুষ evidence
পারিনাক দিতে। তবে শোনা কথা [hence
আদালতে অগ্রাহ্য] যে নীলাম্বর ঘোষ
আমার পিতা। এ বিষয়ে—করিবেন না রোষ
আমার পিতার জ্বানবন্দি নেওয়া হয়

যেন—

বৃহ। বাস্, নীলাম্বর ঘোষ। জাতি?

ভাব কেন?

নীল। জাতি? জাতি? তা—যদি না ভাবেন
দৃশ্য,

ও বিশ্বাস করেন—ত আমি জাতিতে

মনুষ্য।

কলিক। [হাস্য] অবিশ্বাসের কারণ?

নীল। সত্য কথাটা কি—

আমরা সর্পজাতি। তবে দিয়ে ফাঁকি

টাকি—

আর বিধাতার চখে ধুলো টুলো দিয়ে,

হয়েছি, মনুষ্য জাতি

কলিক। [বৃহস্পতিকে]—হ্যাঁহে—বলে কি এ?

আর এক ঢোক পান

বৃহ। আচ্ছা পেয়া?

নীল। [ভাবিয়া] পেয়া? পেয়া?—

বল্লেই বা কি ক্ষতি

মল্লেলের ঘাড়ভাঙা—নাম ওকালতি।

বৃহ। পেয়া উকিল। বল এখন

তোমারে শূধাই;—

ঈশ্বরে বিশ্বাস? কি কর না?—তাই।

নীল। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

বৃহ। তাঁর কিরূপ আকার?

নীল। শূদ্রবর্ণ, গোলাকার, অবিকল, টাকার
মত।

বৃহ। সে কি প্রকার?

নীল।—অর্থাৎ কি না—টাকাই ঈশ্বর।

কলিক। টাকাই ঈশ্বর!!!

নীল। প্রভু! টাকাই ঈশ্বর।

—স্বর্গে নীচ হয় উচ্চ, বোকা বুদ্ধিমান,
পাপী, সাধু; ঘৃণ্য, প্রিয়; গোমর্খ বিদ্বান;
বৃদ্ধ যুবা;—আমরা একটি দেখেছি

চাক্ষুষ,

আদালতে আমলাদের মাঝে মাঝে ঘৃষ
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। যাহা অসম্ভব,
মিছে কথা কওয়ার মত হয় সাধ্য সব।

কোন কোন জজেরও—এমন কি প্রকাশ্যে
গোল গোঁফ বিস্ফারিত হ'য়ে যায় হাস্যে;—
মোকদ্দমার যে pointটা যাচ্ছে নাক

বোঝা;

হ'য়ে যায় হাস্যকর রূপে সোজা!

প্রকাশ্যে অভোজ্য-ভোজীর বোঝা যায় না

দোষ,

বেদ্রাঘাতেও পশ্চিমতদের আশ্চর্য্য সন্তোষ;—
কলিক। আচ্ছা ওসব রেখে দেও;

তুমি ত হে হিন্দু?

নীল। কি জানেন, অবিকল যে রকম বিধু;
জানিওনে, পোষায়ও না ধর্ম নিয়ে

খোঁজা;

সুবিধাই ধর্ম, আমার এত মত সোজা।

আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা।

—বিলেতেও যাইনি, ভূতেটুতেও পাইনি,

আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কটলেট্‌ও খাইনি;

আমি বিধুবাবুর মত তরু ফরুও করিনে;

Herbert Spencer কি ভাগবতও

পাড়িনে;

এ্যা এ্যা বাড়ীও যাই—এ্যা এ্যা গুলোও

খাই—

তবে গন্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই?

সমাজ চোখ বুদ্ধে, আছে নাক গুজে,

কেন তাকে খোঁচাখুঁচি—সব জানে,—বুদ্ধে।

তবে রাখিনাক টিকি—সভ্যরা সব চটে,

আর একটুখানি চক্ষুসজ্জা;—সেটাও বটে।

বুদ্ধলেন কি না। যতদূর দরকার তা চেয়ে

কেন বেশী ভন্ডামী। গুটিকতক মেয়ে

পার করা নিয়ে বিষয়; হ'য়ে গেলে সেটা,

চুকে গেল সব, আর ফুরিয়ে গেল লেঠা;

তার পর—বুদ্ধলেন কি না—আর কোন

বেটা

হিন্দুয়ানির ধার ধারে, রাখেই বা তরু;

হিন্দুয়ানিও অচিরাৎ পাইবেন অরু—

কলিক। বোঝা গেছে—প্রকাশ করিছ ক্রমে
অভিপ্রায়।

পান

[প্রহরীকে] এখন নিয়ে এস দেখি ব্রাহ্ম
সম্প্রদায়ে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ

ধর্ম। হায় হায় আস্চেন ঐ সব

ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।

বেশ-ভুষার পারিপাট্য, চাকচিক্য নাই;
নির্বিব্রোধী, নির্বিলাসী, নিষ্কাম, নিরেট;
প্রমাণ—বোতামহীন কাফ, বোতামহীন
প্লেট।

এঁরা অতি অনূতপ্ত—অতি শূদ্ধ রুচি:

প্রমাণ—খান কাঁচা গোলা, সরপর্দার ও

লুচি:—

সুবিধা থাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস;

আর, সেবন করেন কভু সিমলার বাতাস;

এঁরা পরেন গরদ, মাথেন চন্দন এবং

আতর;—

কিন্তু মনে এঁরা অতি দীন, অতি কাতর।

ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম পেষ—

চসমাদাড়িবান্ লুচিপ্রাণ,

বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

কলিক। আচ্ছা তোমাদের মধ্যে প্রধান কে বল।

ব্রাহ্মগণ। সবাই স্ব স্ব প্রধান।

কলিক। [সাস্চর্য্যে] সে কি রকম হ'ল?

[গঙ্গারামকে] তুমি নিশ্চয় সর্বপ্রধান—

প্রশ্ন করি বল।

কি প্রকার তোমাদের ধর্ম?

গঙ্গা। [চক্ষু মর্দিত করিয়া] পরিষ্কার—

আমাদের একব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার,

সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী;

কলিক।

শূদ্ধ এই?

তোমাদের ধর্মেতে কি আর কিছ্ নেই।

গঙ্গা। আবার কি?—পরব্রহ্ম ওঁকার মহান্,

নিত্য, সত্য, পূর্ণ প্রভু, সর্বজ্ঞানবান্—

কলিক। এ ত হিন্দু ধর্ম। কেন তোমরা

সকলে

হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বোলে!

গঙ্গা। নামে কি যায় আসে?

বৃহ। নামে?—মতেতে না যত

চটায়, নামে তত চটায়—এই যদি ধরি

তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীলা সুন্দরী,

রাখ দেখি তার নাম 'গলগন্ড বেওয়া'

হাজারই অসরা হোক্—তার বিয়ে দেওয়া

সৌখীন সমাজে হয়ে ভয়ঙ্কর লেঠা;

প্রথমতঃ নাম শূনেই পালাবে সব বেটা।

আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা—রায়

অর্মান বরের হুড়াহুড়ি—যায়গা পাওয়া

দায়;

হোক্ না সে কদাকার—টেরা এবং বোঁচা,

অর্ধেক বাঙালী—প্রেমে মূর্ছা যাবে চোঁচা

না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে

হেসে

হয়ত এক কবিই তারে ফেলবে ভালবেসে।

বিদ্যা। আরো—যেমন;—থিয়েটরে actress

হলো রাণী

অর্মান stall এ ঘেঁষা-ঘেঁষি,

কেমনই না জানি।

—অভিনেত্রী দেখে আসা যাক—এই রকম

অথচ হয় ত act কল্লেন [দেখাইয়া]

যেন বক্ বকম্।

বৃহ। ওঁকি হলো?

কলিক। [স্বগত] এটা একটা হতভাগা

কে রে?

বিদ্যা। ওটা—ওঁর নাম কি—প্রভু মিলোতে

না পেরে—

কলিক। এ কে? [ধর্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

ধর্ম। ইনি বিদ্যানিধি—একজন পাকা

রাসিক লোক:

সর্বনেশা-পক্ষপাতী এবং সর্বভুক্

ভোজই হোক্—খানাই হোক্—

খাবার পেলেই নাচেন।

শাকেও আছেন, মাছেও আছেন,

ভুতুড়িতেও আছেন।

কলিক। ইনি পণ্ডিত না?

ধর্ম। হ্যাঁ ইনি নামে বটে পণ্ডিত

কিন্তু সব দলেই আছেন—

সর্বগুণে মণ্ডিত

বৃহ। [গঙ্গারামকে] না হয় 'ব্রাহ্ম হিন্দু'

ধর্মই নাম দেও ছাই!

হিন্দুধর্মের শান্ত শাখা বৈষ্ণব শাখা নাই?

না হয় আর একটা তাতে ব্রাহ্মশাখা হ'ল।
 না হয় ধর্মটাকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্ম' বল।
 গঙ্গা। [চিন্তা করিয়া] 'হিন্দু' বল্লেই যেন
 সে জাতীয় ধর্ম হয়,
 ব্রাহ্ম ধর্ম কোন বিশেষ জাতিবন্ধ নয়;
 ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার:
 সব জাতির এ ধর্মেতে সমান অধিকার।
 কল্কি। [স্বগত] এরা সবাই এক এক জন
 মন্দ তর্কিক নয়,
 আমার বৃদ্ধি এদের কাছে ঘোল খেতে হয়—
 [গঙ্গারামকে] আচ্ছা বোস।
 বিলেতফের্তা নিয়ে এস এখন।
 [এক জন প্রহরীর প্রস্থান।
 বিদ্যা। [সহর্ষে] হ্যাঁ সে জীবটা একবার
 কি রকম দেখুন।
 প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্য বিলেতফের্তাসহ
 মিষ্টার দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ
 ধর্ম। হায় হায় আস্চেন সব
 বিলেতফের্তা ভাই—
 সমাজ ভাঙার জন্য এ'রা প্রধানতঃ দায়ী।
 খেয়েছেন অনামিক অখাদ্য প্রচুর;
 রেংগুন, ব্রহ্ম পার হয়েও গেছেন বেশী দূর:
 হ্যাট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী,
 টেবিলে ভক্ষক—এ'রাই প্রধানতঃ দায়ী।
 অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুখোর সেরা,
 পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে' এ'রা।
 এ'দের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেতা,
 'একঘরে' হয়েও এ'রা বহুঘরের নেতা।
 এ'দেরই বক্তৃতায় প্রায় 'টাউন হল' ফাটে;
 এ'রাই নিৰ্বাচিত হন 'লেজিস্লেটিভ'
 হাটে।
 বিলেতফের্তার দলে প্রভু করিলাম পেষ;
 বৃদ্ধিহীন, অর্ধাচীন, দীন—
 বন্দিগণ। আহা বেশ।
 বৃহ। ভো ভো বিলেতফের্তার দল
 ধর্মটম্ম মানো।
 কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো?
 দাস। Waltz নাচতে জানি, Billiards
 জানি।
 Tennis জানি।
 ইংরাজি গান জানি ও হ্যাভানা
 চুরোট টানি।

বৃহ। বাঙলা গান?
 দাস। বাঙলা tunes—oh by gad!
 So horrid, monotonous nasal and
 sad.
 বৃহ। বাঙলা তামাক ছাড় কেন সেটা
 কিসে মন্দ।
 দাস। সস্তাঃ, ঠান্ডাঃ, দেশীঃ, গন্ধঃ।
 কল্কি। যাক্ হিন্দুধর্ম বিষয়—
 তোমার মতটা কি?
 দাস। [নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি
 রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া
 দেখাইয়া]
 This much,
 কল্কি। [সবিস্ময়ে] ও কি!
 দাস। ধর্ম টম্ম'র খোঁজ নাহি রাখি;
 তবে old কৃষ্ণের বিষয় কিছ, কিছ, জানি:
 পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখানি।
 বৃহ। মনে আছে বইখানার দু একটা
 শ্লোক?
 দাস। না, তবে যা বৃদ্ধি—কৃষ্ণ অতি
 পাকা লোক
 ছিলেন। Political economy পড়া ছিল।
 আর যদিও তাঁর amours একটু অশ্লীল
 (বোধ হয় পড়ে' জয়দেবের
 diction)
 But I have read worse things in
 Reynolds' fiction
 And, I trust যে জয়দেব ছিলেন,
 Reynolds ভায়ার
 সমান great or even a much
 greater liar.
 আমার কৃষ্ণের উপর আছে respect
 immense, আর
 In Philosophy, he would lick
 Herbert Spencer
 আর politics চাই—আমার বিশ্বাস যে,
 He would beat, Bismark or
 Gladstone any day.
 কল্কি। [বৃহস্পতিকে] কি বলে এ?
 অধিকাংশই গেল না ক বোঝা,
 ফেঁদে ফেঁদে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজ
 বিষয়।

বৃহ। হচ্ছে না সে কথা,
এখন রাখ সব ব্যাখ্যান ও;
শ্রীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে' মানো?
দাস। তা মানি না; মানি তাঁর বুদ্ধি বড়
ছিল সাফ, আর
He was a great politician
ও ফিলসফর।
And a wee bit Spooney on the
fair sex—হাঁ মানি এ
বিদ্যা। [না বুদ্ধিয়া]—
• কেন গোলযোগ কর যা মানো না তা নিয়ে—
বৃহ। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে'
'হুট'
কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট?
দাস। সমাজ 'হুট' করিনি ক,
বিলেত গিইছি বটে।
And I care a hang
যদি সমাজ তাতে চটে।
সে যা বলে শুনতে হবে?—সমাজ যদি তবে
উঁচু দিকে চাইতে মানা করে, শুনতে হবে।
আমরা reasonable men,
আমরা sheep নই;
যে না বুদ্ধে দশ জনে যা বলে, তাহাই সই।
কি কারণ আছে, সমাজ কি কেউ বুদ্ধিয়ে
দিন,
যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর sin;
যখন কোনই কারণ নেই, এ rule সমুদয়
চাষায় মানতে পারে বটে, উদ্ভলোকে নয়।
বৃহ। আগে কারণ ছিল—
দাস। বাস্ এখন ত নেই, তবে,
Time এর সঙ্গে সমাজকে
মিলে চলতে হবে।
কোন জিনিষ unchangeable
আছে পৃথিবীর
Circumstances change কচ্ছে,
সমাজ রবে স্থির?
বৃহ। রোস রোস অত বেশী হও না অধীর?
সমাজও চিরদিন এক থাকি নি ত বণ্ডে;
ক্রমেই পরিবর্তন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে।
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাজে কি
সবে?
সমাজকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে হবে।

দাস। Excuse me বৃহস্পতি;
বলছেন, কি তবে
যে এক সঙ্গে ত্রিশ কোর্ট বিলেত যেতে
হবে?
বৃহ। না না ক্রমে যাও—
দাস। Aden, প্রথম বছরে?
পরের বছর Suez পরে Gibraltar,
পরে—
বৃহ। না না যাও সমাজের নিয়ে অনুমতি—
দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি?
ভাটপাড়া মত দিতে পারেন,
নবম্বীপ দেবেন না;
পিসে ঘরে নিতে পারেন, মেসো ঘরে
নেবেন না।
পঞ্চাশ জন কর্তা আজ হয়েছে যে দেশে।
বৃহ। [ভাবিয়া] প্রায়শ্চিত্ত কল্পে না ক
কেন ফিরে এসে?
দাস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত?
theft murderও করি নি।
কারুর wife seduce করে' নিয়েও
আসি নি—
তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই
আসল এ Sin গুলোর জন্য।
প্রায়শ্চিত্ত চাই।
মদুর্গী আর শুকর খেলে, বিলেত গেলে
চলে',
কিংবা বাপ Cholera কি বাজ পড়ে'
মলে'।
এ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ যে কি পাইনেক
খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তের value বা কি উঠিনিও
বুঝে—
এ Society মানবে কে? Priestরা
সব চোর,
আর এ Societyও আজ
rotten to the core.
কাল্ক। [হতাশভাবে] আচ্ছা, এখন আন দেখি
হিন্দুধর্ম রক্ষকে।
বৃহ। [প্রহরীকে] ডেকে আন আসতে
চায় গোড়া হিন্দুর পক্ষে কে?
[প্রহরীর প্রস্থান]

চতুরানন ও ভূতনাথ অন্য গোড়া
হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ
ধর্ম। এ'রাই সব আধুনিক হিন্দুধর্মের
রক্ষক,
এ'রা বাল্যে পাটাহারী, যৌবনে গোভক্ষক,
বাম্ধকো তপস্বী; এবং পরি' হরি মালা,
সুন্দর করেন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের পালা।
যতই ঘরেতে কন্যা বাড়ে এ'দের ক্রমে,
ততই হিন্দুয়ানিটা আসে এ'দের জন্মে,
এ'দের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে,
ভিন্ন সময় প্রকাশ এ'রা হন নানাবেশে;—
এ'দের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা,
শেষে চৈতন্য;—করেন তখন ধর্ম—

আলোচনা।

এ'রা শাস্ত্রজ্ঞানে চুটু বটে; কিন্তু তার
গুঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে এক এক টিটিকার।
এ'রা ঘটান—'গীতা' এবং 'স্পেন্সর'
কোরে পাঠ
বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল বিদ্রাট
হিন্দুধর্ম-রক্ষকগণে করিলাম পেষ
ধর্মশব্দ, অশ্ব-অশ্ব, ডাউ—

বন্দীগণ।

আহা বেশ।

ব'হ। ভো ভো ধর্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন
ধর্ম?

[সকলে] সনাতন হিন্দুধর্ম, সনাতন
হিন্দুধর্ম।

ব'হ। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেতে তোমরা কি জানো?

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখতাকাতাকি
করিতে লাগিলেন

চতু। সত্যি কথা—শাস্ত্র-ফাস্ত্র বড় এক খানও
পাড়িনিক; সংস্কৃতের জ্ঞানও অস্পষ্ট;—
তবে, ফরাসেতে বসে, বিনে বেশী কষ্ট'
পাছাড়িয়ে গোফ মোড়া দিয়ে হুকো টেনে,
গীতার দ্ব এক পাত উল্টে,

পূরাণ একটু জেনে,

যত দূর হয়—দেশের হিন্দুয়ানী রাখি;
অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য সময় দেওয়া ফাঁকি;
আর আমরা বার করেছি 'আধ্যাত্মিক'

এক শব্দ,

যার কাছে মূর্খগীভক্ষী হিন্দুরা খুব জন্ম
ব'হ। তুমি তা খাও না?

চতু। [মাথা চুলকাইয়া] এ'রা যখন দাঁত
ছিল শক্ত,
মেয়েও হয়নি এতগুলো; গরম ছিল
রক্ত;—

খেতাম নাক বল্পে মিছে কথা বলা হয়;
এখন খাইনে—বলতে পারি এ কথা নিশ্চয়।
ব'হ। প্রচার কর হিন্দুয়ানী কি রকম সুন্দর।
চতু। বলি, 'হিন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ',
বিদ্যা। কেউ সেটা বদ্বল নাক এইটেই
যা দুঃখ;

ব'হ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ
সম্বন্ধে?

চতু। একেবারে চটে' যাই তার নাম গন্ধে—
ব'হ। কেন?

চতু। এও কি একটা কথা—

তাদের আপনাদের পাপে,

তাদের স্বামী যদি মরে—সেই মনস্তাপে
তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাঁদা;
তাদের উচিত নিষ্কাম হ'লে স্বস্ত্যচর্যা সাধা;
তাদের উচিত যে যা দেবে খাওয়া তাই
নিয়ে;

তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের সেবা করা
গিয়ে;

পূণ্যাখ্যাদের বাতাস করা, তাদের চুল বাঁধা,
ঝাঁট দেওয়া, বাসন কুসন মাজা, ভাত রাঁধা—

ব'হ। পুরুষেরা বিয়ে করে দশবার যে—
চতু। তা জানি,

তাতে তাদের ধর্মের কিন্তু হয় নাক হানি।
পুরুষ বিয়ে করে বোলে—এও কি একটা
প্রমাণ

হোল মশয়? পুরুষ আর স্ত্রীলোক
কি সমান?

পুরুষের গোফ আছে; স্ত্রীলোকের আছে?
স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে?
বিদ্যা। বটে; এমন—ওর নাম কি—

ক্ষমা সহকারে

মনিবের পদাঘাত হজম করতে পারে?
বেশ্যার বিরস বাক্যগুলি ফিরে রাত দুপূরে
বয়ে' এনে ঝাড়তে পারে সতী স্ত্রীর

উপরে?

এমন সুন্দর ঘোঁট করতে পারে জোঁট হ'লে?
বোতল পার করতে পারে? কি কোন সময়ে

পদ্রুশের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে?
 দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসোয়ার গোড়ে
 প্রবেশ কল্লৈ তখন লক্ষ্মণ সেন
 যেমন ছাড়তাকে
 —চম্পট দিলেন কচুবনে, স্ত্রীলোক হ'লে
 পার্ত্ত কি?
 বোধ হয় না; দাঁত-কপাটিই যেত
 তার লেগে,
 অন্ততঃ পলা'তে পার্ত্ত না সে অত বেগে।
 কল্কি। [সহাস্যে] তুমি চুপ কর
 সবতা'তেই ফাজ্লামি
 বিদ্যা। [কু'কড়িয়া] না না যেটা সত্যি কথা
 তাই বলছি আমি।
 কল্কি। আচ্ছা, দেখি [ভূতনাথকে] তুমি কে হে?
 ভূত। [গম্ভীররবে] স্বদেশহিতৈষী।
 বৃহ। বয়স?
 ভূত। ঐ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী।
 বৃহ। কি কাজ কর?
 ভূত। প্রতি হস্তা দিবারাহ ধরি'
 খেটে খেটে ধর্ম রাখি—দেশ উদ্ধার করি—
 বৃহ। শূনি—তুমি দেশ উদ্ধার কর
 কেমন করে'
 ভূত। [গম্ভীর স্বরে] কলমের জোরে
 প্রভু কলমের জোরে—
 একখানি সান্তাহিক ভালো কাগজ চালাই—
 বিদ্যা। সময় বুঝে লিড়ি এবং সময় বুঝে
 পালাই—
 ভূত। আমি একজন ভয়ঙ্কর বীর
 মসীযুদ্দের—
 বৃহ। [সাস্চর্য্যে] কলমের জোরে কভু
 দেশ হয় উদ্ধার!
 গ্রীস রোম কি মসীযুদ্দের হ'ল বলীয়ান?
 কতলোক দেশের জন্য দিয়ে গেল প্রাণ—
 ভূত। তা সে শীতের দেশে বোধ হয়
 পরে' জুতোমোজা
 দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া অনেকটা সোজা।
 এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা
 সোজা ব'লি—প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা—
 কল্কি। বোঝা গেছে—হিন্দুধর্ম মানো?
 ভূত। মানি বৈ কি।
 দেখুন আমি দেখতে ঠিক হিন্দুর মত
 নই কি?

সেই রকম চেহারা—সেই রঙের বাহার;
 সেই রকম ভূঁড়ি করে' আধ্যাত্মিক আহার;
 সেই গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব,
 গলায় মালা, মাথায় টিকী,
 বলুন কিসের অভাব?
 কল্কি। হিন্দুধর্মটা যে রাখ, কি রকম শূনি!
 বিদ্যা। [সকৌতুহলে] হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ
 শূন্য কি বলেন উনি!
 ভূত। গালি দেই সভা ও বিলেতফের্ত্তাকে।
 বিদ্যা। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে
 ম'রে থাকে—
 [বৃহস্পতিকে] শূন্যলেন উনি এই রকমে
 হিন্দুয়ানী রাখেন—
 জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি
 খেয়ে থাকেন
 কি না?
 বৃহ। [ভূতনাথকে] গুলি খাও?
 ভূত। নাঃ।
 বিদ্যা। গাঁজা, চরস?
 ভূত। না না—
 বিদ্যা। মিছে কথা কইলে ভাই?—
 আমরা কি নেই জানা?
 একসঙ্গে—ওর নাম কি—আমরা
 সব খেইছি—
 আমার সামনে মিছে কথা?—ছিঃ
 ভূত—এইঃ ছিঃ।
 কল্কি। বোঝা গেছে—[স্বগত] তা দোষ কি,
 আমার শ্বশুর খানও।
 [প্রকাশ্যে] আচ্ছা—এখন দেখি
 সব পণ্ডিতদের আনো।
 প্রহরীর প্রস্থান ও পণ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ
 ধর্ম। এ'রা সেই আর্ধ্যাশ্বির বংশধরগণ।
 রচিছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন।
 এ'রা দীর্ঘ টিকীশালী; নামাবলিধারী;
 ধূম্রপায়ী; ফোঁটাবান্; ও দৃশ্য ফলাহারী।
 এ'দের অমায়িক ভূঁড়ি সগোরবে দোলে,
 নন্দের নন্দন যথা যশোদার কোলে।
 জীবনের সারকর্ম—এ'রাদের জ্ঞান—
 নস্য নেওয়া; কড়িবাধা হ'কোয় ধূমপান;
 কভু পৈতে কাণে দেওয়া;—এবং তা ছাড়া—
 ফোঁটা কাটা;—আর মাঝে মাঝে
 টিকী নাড়া।

পৃথিবী যে সভ্যতর হয় রোজ রোজ,
এঁদের কার্য্য নহে রাখা তাঁর খোঁজ।
এঁদের কার্য্য অতি সোজা—দু একটা
শ্লেোক।
পাণিনি মুখস্থ কোরে—এঁরা জ্ঞানী
লোক।
এঁদেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান;
বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম গড়াগড়ি যান,
হোল বেদ নীতি স্মৃতি—ফোঁটা আর
টিকী;
মুরগী আর প্যাঁয়াজ, তুড়ি, হাঁচি ও
টিকটিকী।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে এই করলাম পেষ—
গোলাকার টিকী মালা সার—
ন্দিগণ। [সমস্বরে।] আহা বেশ।
হু। এরাই পণ্ডিত?—[স্বগত] ইঃ কি
জবর ফোঁটা—
বুকে, নাকে, হাতে, কাণে
সরু এবং মোটা;
গায়ে জবর নামাবলি—গলায় আবার মালা;
আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্—
শাস্ত্র জানে? বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা;
দেখে হচ্ছে বোধ—এরা ভয়ঙ্কর চাষা।
(প্রকাশ্যে) ভোঃ পণ্ডিতপুঞ্জ—তোমরা
শাস্ত্র ফাস্ত্র জানো?
সকলে। জানি। হাঁ তা আর জানিনে?—হঃ
বেদ পুরাণ—ও—সব মুখস্থ।
কল্ক। দুটো শ্লেোক বলত বেদ থেকে।
চুড়া। ন্যায়রত্ন বল ত হে একটা ভাল দেখে।
ন্যায়। শ্লেোক?—তাই ত—অ’হঃ—বল নাহে
শিরোমণি!
শিরো। শ্লেোক?—বেদ থেকে—আঃ হচ্ছে না
যে মনে—
শ্লেোক? [মস্তক কন্ডুয়ন]
কল্ক। দেখ যদি বেদ গিয়া থাক ভুলে
একে একে তোমাদের চড়াব সব শুলে।
বিদ্যা। [লক্ষ্য দিয়া] ওরে বাবা—
ও শিরোমণি—বলে কিগো? বাবা,
এবার দেখছি সবই তোমরা
জাহান্নমে যাবা।
এতদিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেলা;
নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেলা।

] বলি ও তর্কচণ্ডু
আয় না চলে’ কাছে;
বল্ না একটা শ্লেোক,
তর্ক। আর মনে কি ছাই আছে?
বিদ্যা। বলি ও স্মৃতিরত্ন ও চুড়ামণি চাচা,
একটা শ্লেোক বোলে ভাই এইবারটি বাঁচা।
কল্ক। তোমাদের মধ্যেতে কে
পণ্ডিত প্রধান?
বৃহ।—অর্থাৎ চাল-কলা-টলা সব
কে বেশী খান?
সকলে। ঐ শালা। [পরস্পরকে দেখাইতে
লাগিলেন, পরে চুড়ামণিকে দেখাইয়া] না
না মহাশয়—ঐ কালো বৃড়ো
যার মাথায় সবার চেয়ে দেখুচেন
লম্বা চুড়ো।
কল্ক। [হাসিয়া।] বটে চুড়ামণি! তুমিই
প্রধান সবার?
চুড়া। কোন্ শালা প্রধান, প্রভু,
ধর্ম-অবতার।
কল্ক। হাঁ তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লেোক
বলতে হবে।
চুড়া। শ্লেোক?—আচ্ছা শ্লেোক বলি দু একটা
তবে।
“খনা বলে চাচি
বাড়ী থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁচি।
বেরিও না বাবা;
বেরও যদি একেবারে জাহান্নবে যাবা।”
সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ।
কল্ক। বা শাস্ত্র। [ন্যায়রত্নকে] তুমি একটা
শ্লেোক বল দেখি,
ন্যায়। [নাক চুলকাইতে চুলকাইতে]
শ্লেোক?—তাই ত—বলি একটা
উদ্ভূটি শাস্ত্র থেকে
“জীবনের সার বস্তু টিকী,
খনা বলে রাখ আর নস্য নেও দেখি,
পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ,
দেখবে বৃদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাফ।”
বিদ্যা। সাবাস্ সাবাস্ বেঁচে থাক
মোর বাপ্।
কল্ক। [সহাস্যে] দেখ তোমাদের ধর্মের
নতুন ব্যাখ্যান
শুনে, একেবারে আমার ঠান্ডা হ’ল প্রাণ।

ভেবেছিলাম শাস্তি দিব—কাউরে শূন্যে তুলে
আছাড় দিব; কাউরে বা চড়াইব শূলে;
গদাঘাতে কারো কৰ্ম মস্তক বিচূর্ণ,
—কিন্তু দেখছি সব ঘোর হাস্যরসপূর্ণ,
তাই ভেবে চিন্তে সবায় করিলাম মাফ
অতএব তোমরা একটা দিতে পার লাফ।

সকলের সোপাসে লক্ষ্যপ্রদান ও নৃত্য

ধর্ম হক্, সত্য হক্—যেটুকু তার মধ্যে
হাস্যকর আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে
হাস্য কিছ্ মন্দ নয়—ধর্ম তায়

কি ক্ষয়ে যায়?

তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায়
হাসি মানেই গাল নয়—এরূপ হাস্য

মন্দ কি!

সকলে। বটেই ত বটেই ত, তাতে আবার
মন্দ কি?

কল্কি। সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটু খানি হাস্যকর বেশী
—তার বিষয় বলতে গেলে প্রহসনই

হয়ে যায়।

সকলে। হলেই বা প্রহসন তাতেই বা কার
বয়ে যায়।

কল্কি। বিলেতফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোঁড়া,
পণ্ডিত হাঁদা—

যেন সব বানর, মক্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা।
বানর যেন লক্ষ্মরম্ভা—দিয়া লক্ষ্য যোজন
পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে' করিছেন

ভোজন।

মক্কটটি লক্ষ্য দিতে অসমর্থভাবে—
কছেন কিচির্মিচি—অর্থ—

“আচ্ছা দেখা যাবে—

লক্ষ্য দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ওসব আমরাও কতক পারি—

আমরাও জানি।”

কুকুর নীচে বথা কছেন ‘ভেউ
ভেক্ ভেক্’—

ও’রা দাঁত খিচোন, অর্থ—“কেন কর
দেক্”।

বিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে কছেন
‘মেউ মেউ’

তার অর্থ “মাছ ত কৈ দিলে না ক কেউ”।

গম্ভীর ঘাস খেতে খেতে, কাণ তুলে চাচ্ছেন,
অর্থ ব্যাপারখানাটা কি?—আবার

ঘাস খাচ্ছেন।

সমাজটা ত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই;
কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ
নাই,

সকলেই সমান নিজের আহারিট খোঁজেন
আর ভালো আহারিট কি,—

তাও বেশ বোঝেন।

তথাপি এ দিন রাত সদাই খিচির খিচির,
ঘুস্ ঘুস্, ফিস্ ফিস্ এবং কিচির মিচির,
আমার ‘রায়’ তোমরা এখন ওসব

গিয়ে ভুলে,

একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে।

সকলে কোলাকুলি করিলেন

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টিকে থাকে
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।

খাওয়া শোওয়া, পরা নিয়ে কেন ঘৃণাঘৃষি
সেটা কর বাড়ী গিয়ে যার যেমন খুসী—
জাতি রাখতে চাও—থেকো

এই সত্য ধরি’—

ভুলো নাক মনুষ্যত্ব স্বদেশ ও হরি।

—এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে
যাতে বদ্বৎ দলাদলি করা ছেড়ে দিলে।

সকলের গীত

নাঃ এ জীবনটা কিছ্ নাঃ
শুধু একটা ঙ্গে আর একটা উঃ আর একটা আঃ
এ ছাড়া জীবনটা কিছ্ নাঃ।

সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি,
এ সব কোরো নাক, খাসা বোসে থাক

ভায় ছাড়িয়ে দিয়ে পাঃ

আর বল ‘জীবনটা কিছ্ নাঃ।’

কেন চটচটি আর রোষারোষি,
আর গালাগালি আর দোষাদোষী?
কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি
আর বসে’ গোফে দাও তাঃ,—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগালি,
ছেড়ে রোষারোষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,

আর সবাইকে বল ‘বাঃ’
নইলে জীবনটা কিছ্ নাঃ।

ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,
আর চুলোচুলি আর লাথাল্যাথি,
আর গদুতোগতি, আর জুতোজুতি,—
কর চুমোচুমি—সার যাঃ.

হ'য়ে মদুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,
হ'য়ে খোলাখুলি, কর কোলাকুলি;
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ;—
নইলে জীবনটা কিছ্ নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ-রাঙারাঙি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙাভাঙি,

প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই টাই'
আর সদাই 'বাপরে মাঃ';—
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মদুহুদুহু 'হায়!—উহু—উহু'
প্রাণের সার বাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
তা নইলে জীবনটা কিছ্ নাঃ।

যবনিকা পতন

বিরহ

পুরুষ-চরিত্র

গোবিন্দচরণ মদুখোপাধ্যায়—(কৃষ্ণনগরের কিষ্কিন্ধ্য বিষয়সম্পন্ন পণ্ডিত; বয়স একোনপঞ্চাশৎ, বর্ণ 'হাফ আখড়াই' গোছ—'হাফ' গোর—শিরোদেশে টাক ও টিকি, গদ্যদাড়িবিবলিত; চেহারা সুন্দর;—দীর্ঘ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটি বড় না হইলেও আয়ত ও তীক্ষ্ণ, হাস্যময় ওষ্ঠ, বিভক্ত চিবুক; একহারা, বিবাহের পর একটু 'গায়ে পুরুষ' হইয়াছিলেন); ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(গোবিন্দের ভায়রাভাই, হুগলি কলেজের উত্তীর্ণ 'গাড়ুয়েট' [বি. এ.] ও নবনিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; বয়স পঞ্চবিংশতি; বর্ণ সুগোর; সুপুরুষ)। রামকান্ত ওরফে বেচারাম ঘোষ—(গোবিন্দের ভ্রাতা; বেংটে, কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল)। গদাধর, পীতাম্বর, বংশীবদন, ছবিওয়ালা, অর্জুন ও নিতাই ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

নির্মলা—(গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী; বয়স ঊনবিংশতি, বর্ণ শ্যাম, দীর্ঘ অতি স্থূল ও প্রশস্ত দেহ, ক্ষুদ্র ললাট, আয়ত চক্ষু, প্রশস্তস্থূলাধরা, দীর্ঘকেশী; পায়ে মল পরিতেন ও গায়ে প্রচুর পরিমাণে গহনা পরিতেন)। চপলা—(নির্মলার ভগিনী ও ইন্দুভূষণের নবোঢ়া স্ত্রী; অন্ডার গাড়ুয়েট; সুরূপা, কৃশাঙ্গী, গোরী, দীর্ঘপক্ষুনেত্রী, হাস্যময়ক্ষুদ্রোষ্ঠী; কামিজাদি ও জুতা-মোজা পরিতেন)। গোলাপী—(একটি চামার কন্যা)। চাঁপা, জুই, বেলা, মালিকা, দামিনী, যামিনী, প্রমদা ও সারদা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বাহিবাটী।

কাল—দেড়প্রহর দিবা।

ফরাসে বসিয়া গোবিন্দ ও তাহার বন্ধুদ্বয়—বংশী, গদাধর ও পীতাম্বর আসীন। গোবিন্দের কোলে বাঁয়া, পার্শ্ব ডাহিনে, পীতাম্বরের হস্তে বঙ্গবাসী, গদাধরের হস্তে হুঁকা ও বংশীর মূখে চুরোট

গদাধর। তুমি কিন্তু বেশ গোবিন্দ বাবু! তোমার একবারে দেখাই পাবার যো নেই।

বংশী। আমাদের ঘরে স্ত্রী আছে। আমরাও একদিন নতুন বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু গোবিন্দ বাবু! তুমি যে রকম বিয়ে করে' চললে, এ রকম চলানটা কখন চলাই নি। [পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া] কি বল ভায়া?

গোবিন্দ। [সস্মিত মূখে, তবলায় চাঁটি দিতে দিতে] কি রকম?

গদাধর। কি রকম আর! যেমন দেখছি। প্রথমতঃ বিয়ে কল্পে তা আমাদের একবার বল্লে না! আমরা কি তোমার স্ত্রীটিকে কেড়ে নিতাম?

বংশী। না, রসগোল্লার মত টপ করে' গালে পুরে দিতাম? [পীতাম্বরকে] কি বল?

গদাধর। তার পর, না হয় না বলে' কয়ে বিয়েই কল্পে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ করে' যে বন্ধু-বর্জন কত্তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি? সম্ভ্যার পরে ত দেখা পাবার যো নেই, কিন্তু সকালেও কি বেরোতে নেই?

বংশী। না কেউ ছোট একটা মাথার দিবা দিয়ে বলেছে, বেরিও না? কি বল পিতু? তুমি যে কথাই কও না হে?

পীতাম্বর। তৃতীয় পক্ষ যে! সেটা যে তোমরা ভুলে যাচ্ছ! [এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাসী পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া] তার ওপরে আবার শুনোছি, গোবিন্দের তৃতীয় পক্ষটি ভারি সুন্দরী।

গোবিন্দ। [তবলায় চাঁটি দিতে দিতে] সেটা ঠিক শুনোছ,

[যেন] চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসম্ভ্রুযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃত্য নু।
স্ত্রীরঙ্গসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যঃ॥
গদাধর। কি রকম!

গোবিন্দ। [তবলা রাখিয়া] এই তোমরা কেউ অপর দেখেছ? নিশ্চয়ই দেখনি। সংস্কৃতও বোধ না।—[চিন্তিত ভাবে] তবে কি রকম করে' আমার নবোঢ়ার রূপ বর্ণনা

করি? [সহসা] সরভাজা খেয়েছ অর্বিশ্য?
সকলে। হাঁ হাঁ।

গোবিন্দ। আমার স্ত্রীটিও ঠিক তাই!
[আবার নিশ্চিত ভাবে তবলা নিলেন]

পীতাম্বর। বাঃ! সব জলের মত সাফ
হয়ে গেল! [বংশী ও গদাধরকে] এখন ওঠ।
সরভাজার সঙ্গে রমণীর রূপের তুলনা আজ
পর্যন্ত কোন কবি করেন নি।

গোবিন্দ। বুঝলে না? সরভাজা যেমন
থেতে, আমার স্ত্রীটি সেই রকম দেখতে।

গদাধর। তা হোক, আমরা তাতে লোভ
কিচ্চিনে। এখন আজ রাতে কি তোমার দর্শন
পাওয়া যাবে?

বংশী। না রূপসী, বিদূষী, ষোড়শীর
অনুর্মতি চাই। বল না হয় তোমার হয়ে বাড়ীর
ভেতর গিয়ে আমরাই সেটা নিয়ে
আসি। [সস্মিত মুখে পীতাম্বরের প্রতি
চাহিলেন]

পীতাম্বর। তুমি, যাবে কি যাবে না?
একটা ঠিক করে' বলো।

গোবিন্দ। আমার পৃষ্ঠচর্মের প্রতি কিছু
মায়ী রাখি। যদি আজ রাতে যাই, ত কাল
পীঠের চামড়াখান মেরামত করবার জন্য একটা
জুতো সেলাইওয়ালা ডাকতে হবে।

পীতাম্বর। তবে যাবে না?

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে,
মাথা নাড়িয়া] উঁহু হুকুম নেই। হুকুম পাই
ত যাব। আর তোমরা কেন দেরী কর? স্নানাদি
কর গে যাও। আর সন্ধ্যাকালে যেখানে যেতে
চাও যেও, যা খুসী কোরো! আমাকে এখন
অন্ততঃ দিন কতকের জন্য তোমাদের দল
থেকে বাদ দাও। তৃতীয় পক্ষ ত কেউ কর নি,—
জানবে কেমন করে' তার মজাটা?

পীতাম্বর। তা এতক্ষণ বল্লই হ'ত।
আমি গদাকে বলেছিলাম যে, তুমি আস্তে
পার্শ্ব না, উচ্ছন্ন গিয়েছ তা এরা তবু ধরে'
বেঁধে নিয়ে এলো। চল!

[তিন জনের প্রস্থান।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, এরা সব কোথেকে
শুনলে যে আমার স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী?
ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। আমার স্ত্রীটিকেও
এসে পর্যন্ত কারো বাড়ী পাঠাইনি সেই

ভয়ে। গুমর ভাঙা হবে না। স্ত্রীটিকে বিয়ের
আগে পাউডার ফাউডার মাখিয়ে, গহনা ফহনা
পরিয়ে জাঁকালো বোম্বাই সাড়ি ফাড়ি জড়িয়ে
একরকম যা হোক দেখিয়েছিল। তার পরে
দেখি, ওমা!—যাক্, গতানুশোচনায় ফল নেই।
এ বৃদ্ধ বয়সে এক রকম হ'লেই হ'ল। কেবল
ভাবি, পৃথিবীতে বিয়েতে পর্যন্তও কি ফাঁকি
চলে? বাপ! অমন অন্ধকারের মত রঙকেও
ঘসে' মেজে আলতা দিয়ে পাউডার মাখিয়ে
এক রকম চলনসই করে' তুলেছিল! বাবা!
কালো বলে' কালো! যা হোক্, আমার কালোই
ভালো।

তবলা বাঁয়ার বাদ্যসহকারে গুণ গুণ স্বরে

কালোরূপে মজেছে এ মন!

ওগো সে যে মিশমিশে কালো,

সে যে ঘোরতব কালো অতি নিরুপম।

কাক কালো ভোমরা কালো,

আমরা কালো তোমরা কালো,

মুঁচি মিস্তি ডোমরা কালো;

কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ।

ওগো সেই কালো রঙ।

অমাবস্যার নিশি কালো,

কালী কালো, মিশি কালো।

গদাধরের পিসী কালো;

কিন্তু তার চেয়েও কালো এ কালো বরণ। ওগো—

নির্ম্মলার প্রবেশ

গোবিন্দ। [তাঁহাকে দেখিয়া, সভয়ে পৃষ্ঠ-
বৎ সুরসংযোগ]

ওগো সে শ্যাম বরণ।

নির্ম্মলা। বেশ! বেশ! এতক্ষণ এয়ারদের
সঙ্গে বসে' বসে' মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম বকে'
এমন তাকিয়া ঠেশ দিয়ে, উঁচু দিকে মুখ করে'
ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছে!

গোবিন্দ। [সকাতরে] গান গাচ্ছি—

নির্ম্মলা। ও! তা বলতে হয়! তা বেশ!
বসে' বসে' সমস্ত দিনটা গান গাও না। আর এ
দিকে আমি সারাটা দিন খেটে খেটে—

গোবিন্দ। কার্টিটি!—একেবারে জ্যোৎস্না-
ময়ীর মৃদুমৃদুমৃগালকল্পা! তবে ও অঙ্গ-
লতিকা 'কুব্যাভির্বিবলন্তা' হ'লে পৃথিবীর
বড় ক্ষতি ছিল না।

নির্ম্মলা। তা তুমিই কেবল দেখ মোটা!

সে দিন হরের মা বলে' গেল 'ওমা এমন কাহিলও হয়েছ মা!'

গোবিন্দ। আর বলে' বোধ হয়, মগখানেক চাউলও আদায় করে' নিয়ে গেল।—তা' হবে, কি রকম করে' বুঝবে বল? তোমার মোটা কি কাহিল হওয়া সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা। ও শরীরে সের দশেক মাংস হ'লেই বা কি, আর গেলেই বা কি!

নির্মলা। বটে! তা তুমি ত আমায় মোটা দেখবেই। আমি কুৎসিত, আমি মোটা, কালো, তা ত দেখবেই দেখবেই!

গোবিন্দ। না না, রাম! তাও কি হয়? এরূপ অশাস্ত্রীয় রকম আমি তোমায় দেখতে যাব কেন? তুমি হলে' আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—বিশেষতঃ আমার এই বৃন্দ [জিব কাটিয়া] প্রৌঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপটায় গোয়ালঘরও প্রাসাদ! এস প্রিয়ে! তুমি একবার আমার বামপার্শ্বে বস। আমি একবার তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন, তাকে না নিরীক্ষণ করে' আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

গীত

[কীর্তন—“এস এস বৃন্দ এস” সুর।]

এস এস বৃন্দ এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি [তোমার জন্যে হে]
তুমি হাতি নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়া পিঠে চড়ি।
তুমি চিড়ে নও বৃন্দ তুমি চিড়ে নও।
যে খাই দধি গুড় মেখে [বৃন্দহে]
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

নির্মলা। [সরোষে] দেখ, হ'তে পারে যে আমি মদ্রুখুখু সুরুখুখু মানুষ। কিন্তু যেমন কোরেই বল, আর সুরেই বল বা বেসুরেই বল, গাল দিলে সেটা বুঝতে পারি। আর তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমার গালগুলো খুব সংস্কৃত না হলেও খুব লাগ-সই—

গোবিন্দ। তা আর বলে। একবারে মর্ম-স্পর্শী! কালিদাসের উপমা কোথায় লাগে!

শ্রীহর্ষের পদলালিত্য তার কাছে লজ্জা পায়। ভারবির রচনাও তার সঙ্গে তুলনায় অর্থহীন ঠেকে! [সহাস্যানুদনে নির্মলার করধারণ করিয়া] প্রিয়ে! আমার একটা গাল দাও না, আমি শূনে ধন্য হই! নীরব রৈলে কেন! প্রাণেশ্বর!

নির্মলা। অকর্ম্মার টিবি, হাবাতে, হত-ছাড়া মিসেস!

গোবিন্দ। [চন্দ্র মৃদুিত করিয়া, শ্লথ হস্ত-পদ সহকারে] বাঃ বাঃ কি মধুর? কি গভীর অর্থপূর্ণ! কি প্রেমময় সম্ভাষণ? বিনিশ্চেতুং শক্যে ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! [শ্লথ-ভাবে অবস্থিত]

নির্মলা। [তাঁহাকে ক্ষণেক দেখিয়া] সং! [মুখ বন্ধ করিলেন] নাও, এখন রঙ্গ রাখো। ও পোড়ার মুখে দুটো ভাত গুঁজতে হবে? না, হবে না? কি কথা নেই যে? বলি ও ডেকরা অলম্পেয়ে!

গোবিন্দ। [জিহ্বা দ্বারা কথার রসাস্বাদন করিয়া] আহা! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! যার ঘরে এরূপ স্ত্রী, তার আর কিসের অভাব?

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তিনয়নয়োঃ
কি মিঠে আওয়াজ! যেন কর্ণে শত বেগু-
বীণামুরজমন্দিরা বাজিয়ে দিয়ে গেল গা! যার
কথা এত মিঠে সে নিজে না জানি কি মিষ্টি!
যেন সরপূরিয়া! প্রিয়ে শোন—এ—একবার
আমার এ—এই কানটা মলে দাও ত, সর্ব
শরীর শীতল হোক!

গীত

[রামপ্রসাদী সুর]

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশমিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গহনাগুলি'
মিষ্টি চুড়ির ঠন্ঠনিটে;
যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে
স্বামীর ভিটে।

নির্মলা। গয়না দিয়ে ত আর রাখলে না, তাই হাতে কগাছি সোনার চুড়ি বৈ আর কিছু নেই। ও পাড়ার বিধুর বোর কত গহনা। তা তার স্বামী ভালবাসে দেবে না কেন?

গোবিন্দ। গীত

প্রিয়র—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তার
কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে।
আর সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ
চিনির ছিটে:

নির্মলা। যত বড়ো হচ্ছেন তত রংগ
বাড়ছে!

পৃষ্ঠে ছোট একটি কীলপ্রদান

গোবিন্দ। গীত

আহা—প্রিয়র হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন
গিটে গিটে।

নির্মলা। [গোবিন্দের পৃষ্ঠে চড়। মরণ
আর কি?

গোবিন্দ। গীত

আহা—প্রিয়র হাতের চাপড়গুলি আহা যেন
পুলিপটে।

নির্মলা। বটে! তবে দেখি এইটে কি
রকম। [কানুটি প্রদান।

গোবিন্দ। গীত

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
প্রিয়র হস্তের কানুটিটে:
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মাননী—
আহা যখন পড়ে পীঠে।

নির্মলা। তবে হবে না কি একবার? বড়
পীঠ সদুড়সদুড় কচ্ছে। তবে বাড়ুনটা আন্তে
হ'ল।

[প্রস্থান।

গোবিন্দ। না না, কর কি? এঃ—আজ
রসিকতাটা একটু বেশী দূর গড়ায় দেখছি!—
এই যে! সত্য সত্য একগাছ বাড়ুন নিয়ে আসে
দেখছি।

বাড়ুন হস্তে নির্মলার পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দ। না না, তামাসা রাখো! ছিঃ
ওকি! [বাড়ুন ধরিতে উদ্যত]

নির্মলা। কেন?—“মিষ্টি সব চেয়ে তার
এইটে” না?

গোবিন্দ। কথাতে কথাতে—চল্ছিল বেশ।
কথাটা সব সময় কাজে পরিণত করা কি
ভালো? এই ধর তুমি যখন বল,—আমি আজ
গলায় দাড়ি দিয়ে মর্ষ, আমি কি অমনি ছুটে

গিয়ে তোমাকে খুব মজবুত এক গাছ দাড়ি
এনে দেব?

নির্মলা। তা বলা তোমার বড় আশ্চর্য্য
নয়। তোমার মনের কথাও তাই। আমি ম'লেই
ত তুমি বাঁচ।

গোবিন্দ। আহা! তাও কি হয়? প্রাণে-
শ্বরী তা'লে আমায় ভাত রেখে দেবে কে?

নির্মলা। বটে! আমি তোমার রাধুনী
বামনী কি না? কাল থেকে কোন্ শালী আর
রাশ্মাঘরে ঢোকে--

গোবিন্দ। আহা। চট কেন? বলি, রন্ধন
কার্যটা ত মন্দ নয়। দ্রোপদী যে দ্রোপদী, তিনি
স্বয়ং রাধুতেন। নল রাজা ইচ্ছে করলে এক জন
প্রসিদ্ধ বাবুর্চি হতে পারেন। সীতা রাধুতে
জানতেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি
কর্বেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে, তাঁরে বনবাসে
পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা,
সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা
ভালবাসি। এমন রসনাপরিতৃপ্তকর, উদরস্নিগ্ধ,
কারী, চিত্তরঞ্জক কার্য আর আছে?

নির্মলা। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানা
শব্দে চাইনে। কাল থেকে তুমি নিজে রেখে
খেও। “ভাত রেখে দেবে কে!” বটে! এক
নিষ্কর্মার সেরা, কুড়ের সম্ভার, ষাট বছরের
বড়ো—

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম! আমার বয়স
এখনও ৫০ পেরোই নি।

নির্মলা। এক চুল-পাকা, গাল-তোবড়ান,
কলপ-দেওয়া, আমসির মত চিম্লে, মাধাতার
পুরোগো—

গোবিন্দ। এত পুরোগো তবু ত হজম
কর্তে পাচ্ছ না; নতুন হলে, বোধ হয় উদরাময়
হতো! আর এই বড়ো পুরোগো নইলে
তোমাকেই বা আর কোন্ এক পঞ্চবিংশতি-
বর্ষীয় গন্ধর্ষ, যক্ষ বিয়ে কর্তে আসবে বল?
অমন নধর, নিটোল, বাণিশ করা—

নির্মলা। ফের! তোমার কপালে আজ
এটা নিতান্তই আছে দেখছি। [বাড়ুন কুড়াইয়া
প্রহার] তবে এই—এই এই—এই [পুনঃ পুনঃ
প্রহার]

গোবিন্দ। ওরে বাবারে মেরে ফেলে গো!
চিং হইয়া পড়িয়া চীৎকার

গোবিন্দের ভাগিনী চিন্তা ও ভূতা রামকান্তের
প্রবেশ

উভয়ে। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গোবিন্দ। [চিন্তাকে সকাতরে] আমাকে
মাচ্ছে। [উঠিয়া বসিলেন]

রাম। তাই ত, মা মা-ঠাকুরদুগ যে বাবুর
পীঠে আর কিছ্ রাখেনি ক। মেরে পোম্বা
উড়িয়ে দিয়েছে।

চিন্তা। হাঁ লা বউ! এই দুপুর বেলা
দাদাকে মাচ্ছিস্ কেন?

গোবিন্দ। হাঁ, জিজ্ঞাস কর ত এই
অসময়ে—

নির্মলা। বেশ করেছি মেরেছি। তোমার
ভাতে কি? আমার স্বামীকে আমি মেরেছি,
তোমার ত স্বামী নয়।

গোবিন্দ। অ্যাঁ—তা বেশ করেছে, ওর
স্বামীকে ও মেরেছে।

রাম। আহা পীঠের হাড়গোড় চুরমার
ক'রে দিয়েছে গা!

চিন্তা। [নির্মলাকে] দুপুর বেলা শুধু
শুধু মাচ্ছিস্?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, এই দ্বিপ্রহরে কোথায়
স্নানাদি ক'রে, একটু বিশ্রামাদি কর্ব না—

নির্মলা। ও যদি আমার হাতে মার
খেতে ভালবাসে।

গোবিন্দ। বটেই ত! আমি যদি আমার
স্ত্রীর হাতে মার খেতে ভালবাসি [চিন্তাকে]
তোমার ভাতে কি?

রাম। আহা হা পীঠটা—[চতুর্দিকে
পরিভ্রমণ করিয়া পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ]

চিন্তা। [সহাস্যে] তুমি মার খেতে ভাল-
বাস! তবে এখনই চেঁচাচ্ছিলে কেন? তুমি
সারাটা দিন পড়ে' পড়ে' মার খাও না, আমার
কি? এই নাও বৌ বাকারিটা নাও, খুব সাধ
মিটিয়ে মারো। [একগাছ বাকারি ভূমি হইতে
তুলিয়া প্রদান]

নির্মলা। আমি মাচ্ছ না। তোমার কথায়
আমার স্বামীকে আমি মাচ্ছ না কি?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, তোমার কথায় মাচ্ছ না
কি? কখন মাচ্ছ না।

চিন্তা। এখনি যে মাচ্ছলি?

নির্মলা। আমার যখন খুসী হয়, তখন

আমি মারি। তোমার যখন খুসী হয়, তখন
আমি মারিনে। ও ত তোমার স্বামী নয়,
আমার স্বামী।

গোবিন্দ। হ্যাঁ, ওরই ত স্বামী।

চিন্তা। [সহাস্যে] বাবা! তোর সম্পত্তি-
জ্ঞানটা দেখছি খুব টন্টনে! তোর স্বামী
নিয়ে তোর যা খুসী কর্ ভাই! খাও দাদা,
পড়ে' পড়ে' সমস্ত দিনটা মার খাও!

[প্রস্থান।

রাম। বাবু! আগে ডাক্তার ডাক্ব না
আগে পুলিশ ডাক্ব?

গোবিন্দ। তোর কিছ্ ডাক্তে হবে না,
তুই যা ফাজিলের সম্ভার!

[রামকান্তের প্রস্থান।

নির্মলা। [সান্ত্বিত] স্ত্রী নিজের
স্বামীকে মাচ্ছ, তাও লোকে সহিতে পারে না;
চোক টাটায়। আমারও যেমন কপাল! নিজের
স্বামীকে যখন খুসী মাচ্ছ পাব না!
[ক্রন্দনোপক্রম]

গোবিন্দ। [স্বগত] এ-এ — মুস্কিল
বাধালে দেখছি। [প্রকাশ্যে] খুব মাচ্ছ,
দুশো মাচ্ছ; সকালে একবার মাচ্ছ, আবার
বিকালে একবার মাচ্ছ। আর যদি দরকার হয়
ত রাতে শতে যাবার আগে আর একবার মেরো।
লোকের ভারি অন্যায়! কে'দ না, মারো পীঠ
পেতে দিচ্ছি! ফের মারো।—ওগো! নীরব
রৈলে কেন? একটা কথাই কও না। [সুর
করিয়া] প্রিয়ে চারুশীলে! মৃগ ময়ি মানম-
নিদানম্।

নির্মলা। যাও, বিরক্ত করো না। আমি
নিশ্চয়ই আত্মহত্যা কর্ব, বিষ খেয়ে মর্ছ,
গলায় দড়ি দিয়ে মর্ছ, ছাদ থেকে পড়ে মর্ছ।

গোবিন্দ। এমন কাজটি করো না। আমার
অপরাধটা কি? উপড় হয়ে পড়ে মার
খেয়েছি; এই অপরাধ।

নির্মলা। আর চেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ হাজির
কল্পে!

গোবিন্দ। কেমন মজা হ'ল!

নির্মলা। মজা ত ভারি? যাঁড়ও ত
চেঁচার। মজা হয় কোথায়?

গোবিন্দ। ওই যে পাড়ায় চেঁচার, সেই
পাড়ায়।

নির্মলা। সকলের সম্মুখে বললে “আমাকে মাচ্ছে।”

গোবিন্দ। তাতে তোমার গোরব কত বাড়িয়ে দিলাম যে, আমি হেন স্বামী তোমার কাছে নিরাপত্তিতে মার খাই!

নির্মলা। ঠাকুরঝি নতুন এয়েছেন। তিনিই বা কি মনে কলেন? যেন আমি এই রকম তোমাকে মেরেই থাকি।

গোবিন্দ। না, রাম! মাচ্ছে কেন! পীঠেব ধুলো ঝেড়ে দাও!

নির্মলা। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাব। তোমার বোনকে নিয়ে তুমি থাক। আমার এত সহ্য হয় না। আমার হাড় জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছে। [বসিয়া চখে কাপড় দিয়া।] আমার যেমন কপাল! নইলে এ-এত পাত্র থাকতে কি না শেষে এই ঘ-ঘরে বিয়ে হয়! [ক্রন্দন] ক-কত ভালো পাত্র মিলেছিল [ক্রন্দন] চা-চাতরার জমীদারের লোকেরা এসে বা-বাবাকে সা-সাধাসাধি। তা আ-আমার মা নাই বলে’ আমার ভা-ভালোটা কেউ দেখলে না গো [ক্রন্দন] বাবা ম-মুখ্য কুলীন শূনে গ-গলে’ গেলেন! এ-এক বড়ো, তিন কাল গিয়েছে, এক কাল আছে, দুটোকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে এসেছে,—এমন এক কুড়ে সম্বন্ধে স্বাক্ষণপাণ্ডিতের সঙ্গে কি না শেষে!—আবার তাকেও আমি ইচ্ছেমত মার্তে পাব না! তার উপরে তাঁর রোখ কত! আমি তাঁর রাধুনী বামনী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ করা জুতো। [ক্রন্দন] এ-এক বছর না যেতেই এই, পরে আরো কত কি এ পোড়া কপালে আছে গো। ওগো মাগো, কি ‘হ’ল গো! [প্রবল বেগে ক্রন্দন]

গোবিন্দ। না না, ওটা—শোন—ওগো— [স্বগত] আঃ কি বলি—[ব্যস্তভাব]

নির্মলা। [সরোদনস্বরে] আমি রাধুনী বামনী, আমি মোটা হাতী, আমি বার্নিশ-করা জুতো।

গোবিন্দ। ওটা—হে’ হে’। এতক্ষণ প-পরিহাস করছিলাম। পরিহাস বোঝ না? আহা! নিতান্ত ছেলেমানুষ! কি করে’ বদ্ববে বল? এখনও গাল টিপলে মায়ের দুধ বেরোয়। আমারই অন্যায়ে। এমন সরলা, বালিকার সহিত

এরূপ রূঢ় পরিহাস করাটা ভালো হয় নি! ওগো—

নির্মলা। যাও, তোমার রংগ আমার ভাল লাগে না।

গোবিন্দ। [সবিনয়ে] .আহা শোনই না।

নির্মলা। যাও, বিরক্ত করো না।

গোবিন্দ। [হাস্যচেষ্টাসহ] প-পরিহাস বোঝ না। তুমি আমার সর্বস্ব, তোমাকে আমি রূঢ় বাক্য বলতে পারি? ওগো একটা কথা কও—[জানু পাতিয়া সুরসংযোগে] ‘বদাস যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতি-মিরমতিঘোরম্।’

নির্মলা। যাও বলছি। ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। [সুরসংযোগে] ‘ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম্!’ [কর ধারণ]

নির্মলা। যাও! [গোবিন্দের হাত দূরে নিক্ষেপ]

গোবিন্দ। [সুর করিয়া] ‘স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।’ [চরণ ধারণ]

নির্মলা। স্ত্রী নিজের স্বামীকে মার্তে পাবে না—এমন কপাল ক’রেও এসেছিলাম!

গোবিন্দ। খুব মাচ্ছে। এই নাও মারো [বাড়ুন প্রদান] পীঠ পেতে দিচ্ছি। আর দুই এক ঘা দাও, আমি তা খেয়ে মানব-জন্ম সফল করে’ নিই।

নির্মলা। যাও, তোমার সব সময়ে তামাসা ভালো লাগে না!

গোবিন্দ। সত্যি বলছি প্রিয়ে, তোমার হস্তের সম্মাজ্জনী সংঘর্ষণে যে রূপ শীঘ্র আমার পৃষ্ঠদেশ ও মেধা পরিষ্কার হয়, গত দুই পক্ষের কারো হাতের সম্মাজ্জনীতে সেরূপটি হয় নি। না, আমি পরিহাস করছি। তোমার হাতে কি একটা গুড় গুণ আছে।

নির্মলা। যাও, তোমার আর রংগ কস্তে হবে না। কালই আমি বাপের বাড়ী চলে’ যাব!

[অভিমনে প্রস্থান।]

গোবিন্দ। এ ত ভারি বিপদ! আমি যতই স্নিগ্ধ হই, প্রিয়া আমার ততই উষ্ণ হন! আমি যদি গরম হই, তাতে বোধ হয় উনি বোমার

মত ফেটে চোঁচির হয়ে যান! এই চিন্তা আসা থেকে যেন ও'র মেজাজটা আরও রুদ্ধ হয়েছে এমন আবদারও দেখিনি। মার্শ্ব আমি তাতে কাঁদতেও পাব না।

চিন্তা ও রামকান্তের পুনঃপ্রবেশ

চিন্তা। বসে' বসে' কি ভাবছ দাদা? খাওয়া দাওয়া কর্তে হবে না? বৌ ত ঘরে গিয়ে দরয়ার দিলে?

রাম। মদই কবিরাজের কাছে যাইয়ে গন্ধমাদন ত্যাল নিয়ে আইছি। পীঠে মাখিয়ে পীঠটা ডলে' দেব?

গোবিন্দ। তুই এখন যা! দেখ্ দেখ্ চিন্তা, আমি যে কি কর্ব, ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে। দেখ্‌লি ত!

চিন্তা। তুমি দাদা কখনও স্ত্রী বশ কর্তে পার্ব না। অত ভালো মানুষটি হলে' কি হয়?

গোবিন্দ। কি কর্ব? তাকে ঠেঙাব?

চিন্তা। ঠেঙাতে হবে কেন? একটু কড়া হও দেখি। মেয়েমানুষের জাত একটু রাশ আল্‌গা দিয়েছ কি অমনি পেয়ে বসেছে। একটু রাশ কড়া করে' ধর, অমনি মাটির মানুষটি। আমি নিজে মেয়েমানুষ জানি ত সব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এবার তোর বদ্বিধিতেই চলে' দেখি। কি কর্ব বল দেখি? ও ত বাপের বাড়ী চলে' যাবে বলে' ভয় দেখিয়ে গেল।

চিন্তা। তুমি চুপ করে' বসে থাক'। যাক্ না দেখি একবার।

গোবিন্দ। যদি সত্যি সত্যিই যায়?

চিন্তা। যায় যদি, তিন মাসের মধ্যে আপনাই ফিরে আসবে। আর একেবারে শূদ্রে যাবে। আর যেতেই কি পার্ব! এখন নাও খাও দেখি।—ওঠ!

[প্রস্থান।

রাম। মদই গন্ধমাদন ত্যাল আনিছি—

গোবিন্দ। যা বেটা ফাজিল, ষড়ামার্ক পাঞ্জি!

[রামকান্তের প্রস্থান।

গোবিন্দ। যাক্‌ই না দিন কতক। মদই কি! বন্ধুদের সঙ্গে আবার দুদিন বেড়িয়ে

চাঁড়িয়ে বেড়াই। তার পর ফিরে আসবে 'খনি। ও'র মেজাজটা নরম হওয়া অন্ততঃ আমার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে আবার আসছেন—

নির্ম্মলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। বোনের সঙ্গে যুক্তি করা হচ্ছিল।

গোবিন্দ। [স্বগত] এবার কড়া হতে' হবে! নরম হওয়া হবে না। দেখি তাতেই কি হয়। [প্রকাশ্যে] আড়াল থেকে শুনছে বদ্বি? শুনলাম, তুমি গিয়ে ঘরে দরয়ার দিলে, যেন আমি তোমার পিছন পিছন তোমাকে ধর্তে গিইছি। তা যাও না তুমি বাপের বাড়ী একবার দেখি। [স্বগত] এবার খুব কড়া হইছি।

নির্ম্মলা। যাব না ত কি! তোমার বোন বদ্বি বদ্বিয়েছে যে, আমি যেতে পার্ব না। আর গেলেও ফিরে আসব? তা এই দেখ যাই কি না। আমার সঙ্গে রামাকে দাও, আমি কালই চলে' যাব। তুমি আনতে লোক পাঠিও না বলছি। আর নিজে যদি ফিরে আসি ত আমি নীলরতন চাটুর্ঘ্যের মেয়েই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন]

গোবিন্দ। আর আমি যদি আস্তে লোক পাঠাই ত আমি রামকমল মদুর্ঘ্যের নাতিই নই। [পশ্চাৎ ফিরিলেন]

নির্ম্মলা। আঃ! দিন কতক হাড় জুড়ায়—

গোবিন্দ। আঃ! দিন কতক হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—

নির্ম্মলা। বেশ!

গোবিন্দ। উত্তম!

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

যাক্।—এবার খুব রাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়। দেখা যাক্ কি গড়ায়। যাই, স্নানাদি করিগে; কিন্তু কাজটা ভালো হলো না বোধ হচ্ছে। মোট এক বছর বিয়ে—যা হোক্, একবার 'বজ্রদার্পি কঠোর' হতে হচ্ছে। তার পর না হয় আবার 'মদুর্ঘ্য কুসুমদার্পি' হওয়া যাবে।

[নির্ম্মলাস্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণানদীর একটি নিভৃত ঘাট।
কাল—প্রত্যুষ।

হাঁসখালির রূপসীবন্দ ঘাটে সমবেত,—কেহ জলে,
কেহ স্থলে। তাঁহাদের আরও বিশেষ পরিচয়
প্রদান অনাবশ্যক।

জুই। সে ভাই তোদের মিছে কথা।

মল্লিকা। সত্যি, ভাই, মাথার দিবিয়া!

চাঁপা। তা হবে না কেন? আজকালকার
মেয়েদের ত দশাই ওই।

চামেলি। তা সে বেশ করেছে। ওর
সোয়ামী ফেরার! ওঁকি বইসে' বইসে' বিচালি
কাটবে নাকি? এই আর্টাট বছর সে পোড়ার-
মুখোর দেখা নেই। ও হ'ল ষোল বছরের
সোমন্ত মেয়ে, ওরই দোষ দেই কেমন
ক'রে বল্। [বেলাকে। হাঁ ভাই! তুই
বল্‌না।

বেলা। [বিজ্ঞভাবে] তা ভাই, তা বলে' ও
রকম পাড়া শূন্য লোকের সঙ্গে এ কীর্তি করে'
বেড়ানটা মোদের কাছে ভালো ঠেকে না।
গেরোস্থ ঘরের ত মেয়ে!

চাঁপা। ঢের ঢের দেখলাম এই বয়সে।
কিন্তু এমন বেহায়া মেয়েমানুষ হিজগতে
কোথাও দেখলাম না। ওর বাপ ত ওকে
তাড়িয়ে দিয়েছে। তা এখানে এসেও কি—সেই
কান্ড!

জুই। হ্যাঁ ভাই! ওর বাপ ওরে বাড়ী
থেকে তাড়ালে কেন?

চাঁপা। সে এক কেলেকারি!—ওর বাপ
দেখলে যে ওকে বাড়ী রাখলে কি আর জাত
থাকে? তাই ওকে তার বড়ী মামীর বাড়ী
রেখে দিয়েছে—

বেলা। মামীই কি স্বীকার হয়! তবে
গোলাপীর বাপ বড় মানুষ, তাকে টাকা দিয়ে
স্বীকার করায়।

মল্লিকা। সেই অবধি মেয়েটা কেমন
বিগ্ড়ে গিয়েছে।

বেলা। তা হবে না-ই বা কেন? মেয়ে
মানুষ ত পাহাড়ের ওপরের ভেঁটা। রইল ত
রইল! কিন্তু যদি একবার গড়ালে ত একেবারে
নীচে পর্যন্ত না গাড়িয়ে আর থাকে না।

নেপথ্যে গান

চামেলি। ঐ যে গোলাপী আসছে। আবার
গান হচ্ছে।

চাঁপা। ঈঃ আসছে দেখ না! মরণ আর
কি! যমেও নেয় না!

জুই। তোরা যা বলিস্ ভাই, কিন্তু এক-
বার দেখ দিখি, রূপে একবার দশ দিক আলো
করে' আসছে। মুখখানি যেন গোলাপ ফুল।

মল্লিকা। ও গোলাপের মত দ্যাখতি বলে'
ওর বাপ নাম রেখেছিল গোলাপী।

চামেলি। গোলাপী ঠিক আমার নাকটা
পেয়েছে। ওর মা আমার কি রকম মাসী হয়
কি না।

চাঁপা। যখন এখানে এইছিল, তখন আমার
সঙ্গে খুব ভাব ছিল। আমরা যখন পথ দিয়ে
যেতাম, লোকে বলত যেন দুইটি পরী
[মল্লিকাকে। মর্—হাস্‌ছিস—যে—

গাইতে গাইতে গোলাপীর প্রবেশ

[ভৈরোঁ—রূপক]

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাস' মধুর সম্ভাষি'
যমুনার বাঁশী বাজে,

ঐ কানন উছলি' রাধে রাধে, বলি—
যায় চলি বন-মাঝে।

পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি;

ঐ যমুনায় এসে, নয় এলোকেশে
নিভুতে জ্যোছনারাশি।

ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কুলে,
উছলে যমুনা-বারি;

সখি ঘরা করে' আয় যাই যমুনায়
হেরিতে মরলীধারী।

ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে,
জাগিল পূর্বে ভাতি;

ঐ কুঞ্জে গীত উঠে, কুঞ্জে ফুল ফুটে—
সখিরে পোহাল রাতি।

গোলাপী। কি! ফুলের কুঁড়ি সব। ঘাটে
যে বাগান বসিইছিস্‌ লা। কিলো চাঁপা, মুখ-
খান ভার ক'রে রইছিস্‌ কেন?

চাঁপা। নে তোর আর রংগ কর্তে হবে না।

গোলাপী। কেন কি হয়েছে? এ বয়সে
রংগ কর্ব না ত কি তোর মত যৌবন পেরিয়ে
গেলে রংগ কর্ব না কি? [পাঠক বদ্বিষাছেন
বোধ হয় যে, চাঁপা গোলাপীর উপর কেন এত
অসন্তুষ্ট।]

চাঁপা। মরণ আর কি!

গোলাপী। সে ত এক দিন সকলের
আছেই। আরো তার জনোই ত আজ যত পারো
হেসে নেও। ঐ কে বলিছিল—

গীত

[মিশ্র কিংকিট—আড়খেমটা]

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয়;
কার কি জানি কখন সম্বোধ্য হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন ক দিন রয়।
আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যার সে কিন্তু ফেরে নাক আর
পিয়ে নেও যত মধু তায়।
আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ;
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু দণ্ডেই সুখ;
হারায়ো না হেলায় সেটুকু—
—ভাল বাস ভুলে ভাবনা ভয়।

মল্লিকা। হ্যাঁলা গোলাপী! তোর এখানে
রংগ কর্ত্ত আসা না জল নিতি আসা? তোর
যে বেলা আর হয় না। নাইবি? না, গান গেয়ে
নেচে কুঁদে চলে' যাবি?

চাঁপা। ও কি রূপের গরবে কিছুর দেখতে
পাচ্ছে?

গোলাপী। বিধাতা রূপ ত আর সকলকে
দেন না। যাকে দিয়েছেন, সে একটু গরব
করবে বৈ কি।

বেলা। রূপ ত পিরুদীপের আলো, নিজের
পোড়ে, দশ জনকে পোড়ায়। আবার তেল
ফুরোলে কি বাতাস এলেই দপ করে' নিভে
যায়।

গোলাপী। চাঁপার একটা সুবিধে আছে—
নিভবার ভয় নেই।

চাঁপা। [বিরক্তি সহকারে] মোর নাওয়া
হয়েছে—মুই উঠি।

চামেলি। রাস না, এক সাথেই উঠিছ। হ্যাঁ
লা গোলাপী! তোর সোয়ামীর খবর টবর কিছুর
পেলি?

চাঁপা। হ্যাঁ তার আবার খবর! সে পোড়ার-
মুখে নিঃশব্দ মরেছে।

গোলাপী। তোমার মুখে ফুলচন্দন
পড়ুক। তালে আমি একটা বিয়ে করি।

মল্লিকা। সে সাধ আবার কবে থেকে হ'ল?
গোলাপী। হবে না কেন? তোরা সব
কলে কলে ছাপিয়ে উঠিছিস, আর আমি এই
ভরা ভর্ত্তি ভান্ডর মাসে শূন্যে থাকব না
কি? আমার সাধ যায় না?

মল্লিকা। মোদের চেয়ে তোর দুষ্কটা
কিসের? মোরা সব নদীর মত এক এক খালের
মধ্যেই চলিছ, আর তুই বিষ্টির জলের মত
সবজায়গাই সমান ছাড়িয়ে পড়িছিস। অমন্দটা
কি?

গোলাপী। মন্দ কি কিছুর? তবে কি না
নদী থেকে উঠে মধ্যে মধ্যে ছাপিয়ে পড়া—
আরও ভাল না? দশ জনের দশটা কথা শূন্যে
হয় না। বিপদে আপদে একটা সোয়ামী আছে,
ভয় নেই।

বেলা। গোলাপীর সঙ্গে কথায় কার
পারবার যো নেই।

গোলাপী। আর সত্যি ভাই, আমার একটা
লোকের কান ধরে' খাটাতে বড় সাধ যায়।
তালে তোরা একবার দেখুতিস্ যে, সে কি
রকম দিন রাত আমার পায়ের তলায় পড়ে'
থাকত!

মল্লিকা। একটা সোয়ামী ছিল, তাকেই
ধরে রাখতি পারি বড়! আবার তোর পায়ের
তলায় পড়ে থাকবে!

গোলাপী। তখন আমার বয়স কি? আট
নয় বছর বৈ ত নয়। তখন আমার হাসিতে কি
মুন্ডো গড়াত? না' লাখি মাল্লি অশোক ফুল
ফুটত? সে এখন একবার আসুক না, দেখি
সেই কত বড় আর আমিই কত বড়!

চাঁপা। তোরা ত ভাই উঠবিনে। মুই উঠি।
বেলা হ'ল।

অন্য রূপসীরা। চল্ ভাই মোরাও যাই।
সকলের উত্থান

গোলাপী। যা' না। আমি কি বসে'
থাকতে বলিছি? আমি এখন আধ ঘণ্টা ধরে'
দাঁতে মিশি দেব। তার পর আধ ঘণ্টা ধরে'
সাবান মাখব। আমার ত বাড়ীতে জুজুর ভয়
নেই।

চাঁপা। মুখে আগুন! এমন হতচ্ছাড়ীকেও
ওর মামী ঘরে রেখেছে গা।

[গোলাপী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।]

গোলাপী। আহা! কি হাওয়াটাই বছে! পোড়ারমুখীরা আমায় ত দিন রাতই গাল পাড়ছে। অথচ যে আমার এ হেন যৌবন আর রূপ বৃথাই যাচ্ছে, তা ত ওরা চখে দেখে না। কেবল দিন রাত আমার দুর্নাম রটাচ্ছে। কেন? না, আমি একটু হাসি বেশী।—তা হাসিটা আমার স্বভাব। আর সেটা ত মন্দ কাজ নয়! আর গান গাই—গাইতে জানি, তাই গাই। তার বাড়া আর ত কিছু করিনে। তা যদি দেখতিস, না হয় বলতিস। তোদের মধ্যে যে কেউ কেউ স্বামী থাকতেই—না, সে সব বলে' আর কাজ কি? তবে আমার সঙ্গে তোরা লাগিস্ কেন পোড়ারমুখীরা? আমি কি তোদের কারো নামে কিছু রটাতে গিইছি, না কারু পাকা ধানে মৈ দিইছি? যাক্, সে সব ভেবে কি হবে? এখন ওঠা যাক্। ঐ কে আবার এদিকে আস্ছে দেখছি। উঃ! আমার পানে তাকাচ্ছে দেখ, যেন পেলেই এক্ষণই টপ করে' গালে পুরে ফেলে। আঃ কি হাওয়াটাই আজ হ'চ্ছে। সাথে বলে বসন্তকাল ঋতুরাজ!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।]

[কালাংড়া—খেমটা]

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয় বায়,
পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমর ছোটে,
কুঞ্জ কুঞ্জ কোকিল গায়;
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের
নুপুড় পায়—
বলে—আজি আমি রাজা, পথ ছেড়ে দাও
আজি আমায়,
না মানিলে ফুলশরে হৃদে বিধে চ'লে যায়।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। গিইছিলাম মূই মা ঠাকুরদুগকে রাখ্তি। ফিরে আস্তি পথে কি রতনই দেখ্লাম রে। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দ্যাখিছি কিন্তু এ একেবারে মেয়ে মানুষের ট্যাক্কা। এর সাথে মোর যদি বিয়ে হয় ত মূই এর একবারে গোলাম হ'য়ে থাক্তাম। মেয়েটা গেল কোথা? সাঁ করে তাকিয়ে সাঁ করে চলে গেল। আর কি গানই গাইলে গা? যেন কুইনিনে জ্বর ছাড়লো! মেয়েটার খোঁজ নিতি হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্বাটী। কাল—প্রভাত।
গোবিন্দ এক কোণে হুঁকা বামহস্তে ধরিয়
দক্ষিণহস্তস্থ কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন।
চিন্তা দন্ডায়মানা

চিন্তা। দিন কতক চোক নাক কান বৃজে থাক না। দেখো, দু মাসের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

গোবিন্দ। যখন তোর বৃদ্ধিতে সুন্দর করোছি, তখন তোর বৃদ্ধিতেই চলে' দেখি।

চিন্তা। একটা কথা—কোন রকমে—আকার ইঙ্গিতেও তাকে জান্তে দিও না যে, তুমি তার বিরহে মনকষ্টে আছ। বরং তাকে দেখাতে হবে যে, তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। নেও, এখন খেতে এস। কত বেলা হ'ল।

গোবিন্দ। যাচ্ছিখুনি, তুই বাড়ীর ভিতর যা এখন। [চিন্তার প্রস্থান] যাচ্ছি ত দিন রাতই। বোন নইলে কেউ খাওয়াতে জানে না। দিন রাত ঘি, আর দুধ; তাই শরীরটিও দিন দিন গোলাকৃতি হ'চ্ছে।—এ আবার আসে কে?

ইন্দুভূষণের প্রবেশ

—এ যে ইন্দু যে! বলি কোথেকে? সব ভালো ত? আমার সম্বন্ধী—অর্থাৎ ভগিনীপতি বিধুর শরীর ভালো? তার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হই নি। তোমার সঙ্গেও—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার সঙ্গে যে আমার ডবল সম্বন্ধ হয়েছে হে। ওদিকে তুমি আমার ভগিনীপতির ভাই, আবার এ দিকে তুমি আমার শালী চপলাকে বিয়ে করেছ। এঃ! তোমাকে যে আমার মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছে হে—এস এস—[ব্যস্তভাবে]

ইন্দু। এই আমি শ্বশুরালয় অভিমুখে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে' যাই!

গোবিন্দ। বেশ! বেশ! ভালোই করেছ। বোস বোস, তামাক।—হ্যাঁ! তামাক খাওনা? বল কি?

ইন্দু। আপনার বাড়ীর সব মণ্ডল?
[উপবেশন]

গোবিন্দ। হ্যাঁ মঙ্গল। আমার গৃহিণী এখন তাঁর বাপের বাড়ীতে, তা জানো বোধ হয়?

ইন্দ্র। কেন হঠাৎ বাপের বাড়ীতে?

গোবিন্দ। [স্বগত] কি বলি [প্রকাশ্যে] কেন মেয়েকে কি তার বাপের বাড়ীতে যেতে নেই? আর সত্যি কথাটা কি জানো,—বোলো না যেন তাকে গিয়ে,—বেঁচেছি দিন কতক! স্ত্রীদের মধ্যে মধ্যে তাদের বাপের বাড়ীতে না পাঠালে পেরে ওঠা যায় না। রাম যে সীতাকে কেন বনবাস দিয়েছিলেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পারছি।

ইন্দ্র। তবে আপনি তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহ কল্লেন কেন?

গোবিন্দ। [কলিকাতে সজোরে ফুঃ দিতে দিতে] কুগ্রহ!—এই রামা!—গ্রহেতে পড়ে' কত লোকে কত রকম করে' উচ্ছন্ন যায়, আমি বিয়ে করে' উচ্ছন্ন গিইছি। কোথেকে বার বছরের বোলে এক মহিষমর্দিনী ষোড়শী নিয়ে এলাম! আরও আগে দুবার বিয়ে করিছি—কিন্তু এমন জ্বরদস্ত গুরুদশায় স্ত্রী আর পুরুষ কখন দেখিনি!—কথাগুলো যেন তাকে বোলো না।—বাবা! সংযম আর কি শিক্ষার মাঝখানেই পড়েছিলাম। সকল রকম সং নেশা, আর সকল রকম সং স্ফুর্ন্ত জীবন থেকে জমা খরচ কাটতে হইছিল।

ইন্দ্র। কেন?

গোবিন্দ। নইলে কেঁদে কেটে কুরুক্লেত্র। আরে! নবোঢ়া ষোড়শীর অশ্রুবিন্দু মোচন করবার জন্য কোন রসিক যুব বা পুরুষ—এ্যা—তা সে যুবাই হোক—আর প্রৌঢ়ই হোক—শুধু রসিকতার খাতিরে তার ডান হাতখান কেটে ফেলতে না পারে? কিন্তু সহিষ্ণুতার যে একটা সীমা আছে, তা আমি এত দিন কোন নবোঢ়াকে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কর্তে দেখিনি। [ধূমপান]

ইন্দ্র। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতে আমার বেশ মেলে।

গোবিন্দ। তাও ত বটে। তুমিও নতুন বিয়ে করেছে কি না। কেমন ঠিক না। হাঃ হাঃ হাঃ!—হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী চপলাকে আমি কখন যে দেখিছি, তা মনে হয় না।

ইন্দ্র। [স্বগত] ছোটটিকে দেখলে কি বড়টিকে বিয়ে কর্তেন? [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, সে এত দিন কলিকাতার ইস্কুলে পড়ত কি না।

গোবিন্দ। তাও বটে। পাশ-টাশও করেছে শুনছি।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, গতবার ফাস্ট আর্টস্ পাশ করেছে! তা তাঁর আর কিছ্ শেখা হোক না হোক, জ্যেষ্ঠামিটা বিলক্ষণ শিখেছেন।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ!—পাশ-করা মেয়ে-মানুষগুলো ঐ রকমই হয়। হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর কাল চিঠি পেলাম যে, চপলা আমার একখানা 'ফটো' চেয়েছে! আমি এখানকার ছবিওয়ালা শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যকে ডাক্তে পাঠিইছি। তার এখনই আসবার কথা আছে।—কিছ্ জলখাবার আন্তে দিতে হচ্ছে।—বড় ক্ষিধে পেয়েছে। কি রেটে গজিইছি, দেখ্ছ বোধ হয়। আমার স্ত্রী বোধ হয় ভেবেছেন যে, তাঁর বিরহে আমি একেবারে শীতকালের পদ্মার মত শুকিয়ে যাব। তা যে যাইনি, তা এ 'ফটো' পেলেই দেখতে পাবেন। তুমি এসবগুলো তাকে বোলো না যেন!—তুমি শীগ্গির স্নানাদি কর। আমার স্নান হয়েছে। কাপড় দিতে হবে বটে!—এই রামা, রামা!—বেটা ঘুমিয়েছে। বেটা কেবল ঘুমোয়। তোমার এখন দুদিন যাওয়া হচ্ছে না। দিন ১০।১৫ থেকে যেতে হবে।—এই রামা! ওরে বেটা কুড়ের সন্দার হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া শুরুর গাধা নছার!

চক্ষু মর্দুহিতে মর্দুহিতে রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। বেটাকে গাল না দিলে উত্তর দেয় না। ঘুমোচ্ছিল বুঝি?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। এজ্ঞে!—বেটার বল্তে লজ্জা করে না?—বেটা আহাম্মক বেহায়া পাজি।

রাম। [গমনোদ্যত]

গোবিন্দ। বেটা, যাস্ যে! যাচ্ছিচ্ কোথা?

রাম। আপনি তেতক্ষণ গাল দাও, মর্দুই আর একটু ঘুমিয়ে নেই। কাল রাতে ভালো ঘুম হইনি, ভারি মশা।

গোবিন্দ। বেটার আঙ্গুষ্ঠ দেখ!—ঘুম হই নি! বেটা নবাব। নিশ্চয় বেটা গুলি খায়। গুলি খাস্ না?

রাম। এজ্ঞে!

গোবিন্দ। আবার বলে এজ্ঞে! বেটা যদিই

বা খাস্, তা আমার সম্মুখে স্বীকার কর্তে লজ্জা করে না? সটাং বল্ল এজ্জে!

রাম। তা মর্নিবের সামনে কি মিথ্যে কইতে পারি।

গোবিন্দ। উঃ! বেটা ত ভারি সত্যবাদী। শোন্, একটা কাজ কর্। পার্শ্ব?—হাই তুল্ছিচ্ছ্ যে!—পার্শ্ব?

রাম। এজ্জে, না।

গোবিন্দ। আবার বলে 'না!' কাজ পার্শ্বনে ত আছিচ্ছ্ কি জন্যে? বেটা গুলি-খোর! দেখাচ্ছ্ মজা। লাঠিগাছটা গেল কোথায়?

রাম। এজ্জে কি কর্তি হবে বলেন না।

গোবিন্দ। বেটাকে লাঠির ভয় না দেখালে বেটা কি কোনমতেই কাজ কর্তে চাইবে? শোন্, শীগ্গির যা, আট পয়সার খুব ভালো কচুরি, আট পয়সার সিঙাড়া, দশ পয়সার সন্দেশ, আট পয়সার ব'দে আর পাস্ যদি এক পোয়া সরভাজা নিয়ে আয়। আগে এ'র স্নান কর্বার সব উদ্যোগ করে' দে। ভালো ফুলল তেল দে। কাপড় দে। দেখাচ্ছিস নে, আমার ভায়রাভাই এসেছে? আবার বেটা হাঁ করে' দেখিচ্ছ্ কি! শীগ্গীর যা। কাপড় তেল দিয়েই দৌড়ে এই পাশের দোকানে যা, আর দৌড়ে আস্ বি—যেন এখানেই ছিলি। যা—

রাম। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] যদি পাশের দোকানে ভাল সন্দেশ না পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। তা'লে খুব দূরের একটা দোকান থেকে, খারাপ সন্দেশ নিয়ে আস্ বি। যা রোজই করে' থাকিচ্ছ্।

রাম। পচা নাক'লে আন'ব?

গোবিন্দ। পচা নাক'লে আন'বি কি রে। যা ভালো পাস। যা দৌড়ে, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।

রাম। ভালো খারাপ সন্দেশ ম'ই কমনে পাব?

গোবিন্দ। ভারি বদমায়েস চাকর! তোকে ভালো খারাপ সন্দেশ আন্তে কে বল্লে! যা ভালো পাস নিয়ে আস্ বি।

রাম। আপনি এই বল্লে খারাপ সন্দেশ নিয়ে আয়, আবুর এই বলো যে, যা ভাল পাস্ নিয়ে আয়!

গোবিন্দ। আরে মোলো। এ আবার জেরা আরম্ভ কল্লে! যা বল্ছি—যা শীগ্গির, নইলে ভালো হবে না। লাঠিগাছটা গেল কোথা?

লাঠি লইয়া পশ্চাৎদিক ও রামকান্তের পলায়ন

গোবিন্দ। [পুনরুপবেশন করিয়া সকাতরে] চাকর-বাকর মানে না।

ইন্দ্র। তাই দেখাচ্ছি। আপনি যে 'নাই' দেন।

গোবিন্দ। ওদের নিয়ে কি করি, ভেবে উঠতে পার্ছি'নে। গৃহিণী গিয়ে অর্বাধ—ঐ যে কি সব বাস্তবায়ন নিয়ে বোধ হয় ছবি-ওয়ালো আসছে। এঃ. এত বেলায়! তা যাও তুমি স্নান করে' নেও, আমি ততক্ষণ ছবি তুলে নেই। বেলা হয়েছে: একে ক্ষুধাতিশয়া, তাতে আবার খানিক ভোগান। "গন্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ!" যাও শীগ্গির, স্নান করে' নেও।

ইন্দ্রভূষণের প্রস্থান ও ছবিওয়ালার প্রবেশ

গোবিন্দ। এই যে আস'ন আস'ন, বস'ন।

ছবিওয়ালো। আপনি কাল ডেকে পাঠিয়ে-ছিলেন, তাই এলাম।

গোবিন্দ। বেশ কবেছেন। এই রামা—না, সে ত বাজারে গিয়েছে—কে আছিচ্ছ্ তামাক নিয়ে আয়—ও বি, বি।

ছবিওয়ালো। না না ম'শায়! আমি দেরি কর্তে পার্শ্বা না। এক্ষণই রাজবাড়ী যেতে হবে। বেলা কর্তে পার্শ্বা না।

গোবিন্দ। একটু বস'নই না।

ছবি। না না, আপনি শীগ্গির ঠিক ঠাক' করে' নেন।—[যন্ত্র ঠিক করিতে করিতে] আপনার এখানে ভালো চেয়ার আছে—নেই? তা দাঁড়িয়েই বেশ হবে'খন।

গোবিন্দ। কেন, ফরাসে বোসে?

ছবি। ফরাসে বোসে কি ফটো তোলা যায়? আপনারা ত এ বিষয়ে কিছুই জানেন না! যা বলি শুন'ন! বস'ন—আমি পেছনের কাপড়খানা টাঙিয়ে দেই [কথাবৎ কার্য] আপনি এই জায়গায় দাঁড়ান! আপনি কি এই রকম খালি গায়ে চেহারা নেবেন? তা বেশ, আপনার ইচ্ছা।

রামকান্তের জলখাবার লইয়া প্রবেশ
গোবিন্দ। এই যে! এতক্ষণ দেরী!

[রামকান্তের প্রস্থান।

মহাশয়! একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হয় না। জল-
খাবারটা এয়েছে, খেয়ে নিই। বড় ক্ষিদে
পেয়েছে।

ছবি। না না, রৌদ্র চ'ড়ে গেলে ভাল
চেহারা উঠবে না!

গোবিন্দ। তবে নাচার! [জলখাবারের
প্রতি বিষণ্ণভাবে দৃষ্টি]

ছবি। ভয় কি? আপনার জলখাবার ত—
কেউ এখন থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না!
[গোবিন্দকে ধরিয়্যা দাঁড় করাইয়া] রসুন,
আমি একবার দেখে নিই [যন্ত্র ঠিক করিতে
বাস্ত] অত ফাঁক করে' নয়। না না, কাছা-
কাছিও নয়। হাঁ, এই বাঁ হাতটা কোমরে কেন?
আপনি ত নাচতে যাচ্ছেন না?

গোবিন্দ। নাচতে হবে না ব'ঝি?

ছবি। না!—বাঁ হাতটা ওরকম ঝুললে
চলবে না। না না, পিছন দিকে নয়! ও কি!
বাঁ হাতটা ভুঁড়ির উপর রাখলেন যে! লোকে
ভাববে, আপনার উদরাময় হয়েছে, তাই পেটটা
চেপে ধরেছেন।

গোবিন্দ। পেটে উদরাময় না হোক,
বিরহানল হয়েছে।

ছবি। [সবিস্ময়ে] পেটে বিরহানল।

গোবিন্দ। আমার বিরহানল পেটেই জ্বলে
থাকে।

ছবি। বটে [ফোকস্ করিতে বাস্ত] ও
কি? বাঁ হাতটা ফের পেছনে কেন? আবার
সম্মুখ দিকে ঝুলিয়ে রাখলেন? না না,
ঝুললে চলবে না। হাঃ হাঃ হাঃ! বাঁ
হাতটা শেষে ব'ঝি মাথায় দিলেন? হাঃ হাঃ
হাঃ!

গোবিন্দ। তবে কি হাতটাকে কেটে
ফেলতে বলেন? হাতটা রাখি কোথা? এক
জায়গায় ত রাখতে হবে।

ছবি। তাও ত বটে! আচ্ছা রসুন। এই
খামটা ধরে দাঁড়ান দেখি। এ—এ—এইবার
বেশ হয়েছে। আর ডান হাতটা কোথায়
রাখবেন?

গোবিন্দ। আমিও তাই ভাবছি। এদিকে

ত কাছে থাম নেই। আপনাকে ধরে
নাকি?

ছবি। না না। তা কি হয়! আমি যে ছবি
তুলব। আপনার ডান হাতে একগাছ ছড়ি
নিতে পারেন ত।

গোবিন্দ। যদি কিছু নিতেই হয়, তবে
ঐ সন্দেশের রেকাবিটা নেই না কেন? কিংবা
রেকাবিটা নেই বাঁ হাতে, আর ডান হাতে
একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেতে সুরু করি।

ছবি। সে কি রকম?

গোবিন্দ। এই—আমি সন্দেশ খাই, আর
আপনি ছবি তুলুন। দুই কাজই একসঙ্গে
হয়ে যায়। আর হাত দুটোরও যা হয় এক
রকম সঙ্গতি হয়।

ছবি। [সন্ধিগ্ধভাবে] সে ভালো দেখাবে
না।

গোবিন্দ। বেশ দেখাবে। আর আমার
ইচ্ছে যে, ঐরকম করে' চেহারা তুলি। আপনার
ত তাতে কোন ক্ষতি নেই।—

ছবি। আপনি ত আচ্ছা লোক দেখছি।
তা নেন। আপনার যেমন মজির্জ,—রেকাবিটা
বাঁ হাতে এমনি করে' ধরুন। ডান হাতে
সন্দেশটা তুলুন দেখি।

গোবিন্দ। “কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্? তেন
হি অয়ং সুগৃহীতো জলঃ”—[সন্দেশভক্ষণ]

ছবি। [যন্ত্রমধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিতে
দেখিতে] তাই বলে' আপনি সত্যিই সন্দেশ
খেতে সুরু করছেন না। সন্দেশটা মুখে
তুলছেন, এই মাত্র কর্ত্তে পারেন। মুখ নড়লে
চেহারা উঠবে না। আপনারা এ সব জানেন না,
যা বলি, তা করুন। রসুন, আপনার মাথাটা,
ঠিক করে' নেই। মাথাটা তুলুন দেখি—অত
উঁচু নয়, অত নীচু কেন? একেবারে যে হেঁট
হয়ে পড়লেন। না না, অত সোজা না। মাথাটা
ডান দিকে বোঁকাচ্ছেন কেন?—না না, বাঁ
দিকেও নয়। এঃ! আপনার মাথাটা নিয়ে কি
করি ভেবে উঠতে পারছি'নে।

গোবিন্দ। কেন? মাথাটা কেটে ফেলে
হয় না?

ছবি। আরে মশায়, বলেন কি! মাথা কেটে
চেহারা নেব কিসের?

গোবিন্দ। কেন? ভুঁড়ি। ঐ ভুঁড়ি

জন্যেই ত চেহারা তোলা; মাথা কেটে ফেলে
চেহারা তোলার কোন বিঘ্ন হবে না।

ছবি। না না, তাও কি হয়। মাথা কেটে
ফেলে কারুর চেহারা আমি এত দিন নিই নি।
আর তা পার্শ্বাও না! ও কি! পেছন ফির্লেই
কেন?

গোবিন্দ। [বিরক্তিসহকারে] তবে মাথাটা
নিয়ে আমি কি কর্ব বলুন না? উঁচু নয়,
নীচু নয়, সোজা নয়, বেঁকা নয়, পেছনেও
ফির্লেই না, তাই ত বলছিলাম যে, মাথাটা
কেটে ফেলে সব আপদ চুকে যায়।

ছবি। ব্যস্ত হবেন না! ঠিক করে' দিচ্ছি
[মাথাটা ধরিয়ে ঠিক করিয়ে] এ—এই বাঃ।
বেশ হয়েছে। একটু হাসুন দেখি। অত
হাসলে চলবে কেন? দাঁত বের কর্বেন না।
অত গম্ভীর হলেন যে?

গোবিন্দ। তবে কি করব? হাস্ব অথচ
দাঁত বের কর্ব না? আজ আমি ভারি জ্বালায়
পড়েছি দেখছি।

ছবি। [চিন্তা করিয়ে] “আচ্ছা, একটা
কোন বেশ আনন্দের কথা মনে করুন
দেখি। হাঁ এইবার বেশ হয়েছে। কি মনে
করেছেন বলুন দেখি।

গোবিন্দ। আমার গৃহিণীর হস্তে সম্মা-
জ্জর্নীর কথাটা ভাবছি।

ছবি। [ফোকস্ করিতে করিতে] সেটা
আপনার পক্ষে খুব আনন্দের কথা হ'ল!
আমাদের পক্ষে ত সেটা তত আমোদের বোধ
হয় না।

গোবিন্দ। ভিন্নরুচির্হী লোকঃ। আমার
স্ত্রীর মত আপনার যদি সম্মাজ্জর্নীসম্ভালন-
সুদক্ষা, লম্বা চোঁড়া, স্থূলমধ্যাঙ্গ, তৃতীয়
পক্ষের স্ত্রী থাকতো ত আপনারও তাঁর হস্তে
সম্মাজ্জর্নীর ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসংগত ও
অতি উপাদেয় বোধ হ'ত—মশায়, কথাগুলো
ফটোতে উঠবে না ত? তাঁর কাছেই ছবি
যাবে।

ছবি। না না, ভয় পান কেন? নেন, একটা
সন্দেশ ডান হাতে তুলুন। নড়বেন না। ঐ
রকমই রাখুন। মূখটা সন্দেশের দিকে একটু
সন্দেশভাবে—হ্যাঁ, বাঁ হাতে রেকার্ডটা এই
রকম। আর একটু হাসি হাসি মুখ করুন

দেখি। হ্যাঁ, হাতটা আর একটু—এই। ডান
পাটা এই রকম। নড়বেন না। বেশ হয়েছে।
স্থির থাকুন। নড়বেন না। [যন্ত্রের মূখের
ঢাকনি খুলিয়ে বন্ধ করিলেন] ব্যস্, হয়ে
গিয়েছে! এখন আপনি সন্দেশ খেতে পারেন।
দিন দশেকের ভেতরে আপনার চেহারা পাবেন।
[যন্ত্র গুছাইতে গুছাইতে] যদি ভালো না
উঠে থাকে ত আর এক দিন এসে নিয়ে যাব।
তবে আমি এখন যাই।

[যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাপ্। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর
ছাড়ল। [উপবেশন] প্রিয়া আমার চেহারা
পেলে কি খুসীই হবেন! আঃ খাওয়া যাক্।
এই রামা। এক গেলাস জল নিয়ে আয়
শীগ্ঘার।

ইন্দুভূষণের প্রবেশ

গোবিন্দ। কি ইন্দু! স্নান হলো? এস.
একটু জলযোগ করা যাক্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
পা ধ'রে গিয়েছে। আঃ [উভয়ে আহারে
প্রবৃত্ত] বাপ্‌রে, পেটে কি বিরহই জ্বলেছে।
খাও না।

[বিশ্বকট—আড়া]

তোমারই বিরহে সই রে
দিবার্শি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু
[আর] ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বলব আর—পরিত্যাগ
[এখন] একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছ
[আব] পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।
এখন সকালবেলা উঠে তাই,
হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কড়ু দুখান সরপুঁরি—
[আর] দুঃখের কথা কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমাব
কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বৃষ্টি
[আমার] ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!
[এখন] বিকেলটা যদি হয়
সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন
প্রাণটা আর বাঁচে কে?
কে যেন সদাই এ প্রাণের
পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—

[তাই] রাতে দু'চার এয়ার ডেকে
 [এ দারুণ] বিবাহের বোঝা বই।
 [এখন] ভাবি ও বিধুবয়ানে
 ঘুম আসে না নয়ানে,
 রাস্তির আর মধ্যাহ্ন ঝিল্ল
 চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
 বিবাহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
 এতদিনে বুকলেম প্রিয়ে
 [আমি] তোমা বই আর কারো নই।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হুগলীর একটি ঘাটের সমীপবর্তী পানের
 দোকান। কাল—গোধূলি।

গোলাপী একাকিনী বসিয়া পান সাজিতে
 সাজিতে গান গাহিতেছিল
 [সুর মিশ্র—খেমটা]

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
 মেরি সাথ বৈঠকে হিয়া নিরিবিলি;
 রহা এতো দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইৎ—
 ইসি খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ!
 দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্ কৈন্ কাম?
 আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

আরে রাম! রাম! রাম!
 ইসনে থোড়াসে গুয়া আওর চুগা খুস্ বো;
 কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
 বে ফয়দা জান যো ইসি খিলি নেই খায়;
 আরে ৎ! ৎ! ৎ! আরে হায়! হায়!

গোলাপী। এঃ! ভারি মেঘ করে' এল যে।
 আজ আর আমার পান কিন্তে কেউ আস্ছে
 না। খিলি বিক্রি করে' কি আমার চলে?
 মামীটা দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। বলে—
 এমন স্বভাব-চরিত্রের মেয়ে সে বাড়ীতে
 রাখতে পারে না। নিশ্চয় সেই পোড়ামুখী
 চাঁপার এই কাজ। সে মামীর কাছে আমার নামে
 দিবারান্ত্রই লাগাচ্ছিল কি না। যদি বিদেশে
 এলাম চাকরি কর্তে, তা ছাই চাকরিই কি
 জুট্লে! একটা বাড়ীতে যদিই বা কত চেষ্টা-
 চরিত্রের করে' ঢুকলাম ত তারাও দিলে
 তাড়িয়ে। কেন না, গিন্নি এক দিন শুনলেন
 যে, আমি গান গাচ্ছি, আর কার সঙ্গে কবে
 একটু হেসে কথা কইছি,—সত্যি কথাটা—তার
 কর্তাটাই এক দিন আমার সঙ্গে একটু বেশী
 রসিকতা কর্তে গিইছিলেন, গিন্নী তা টের
 পেইছিলেন। থাক্—অদ্ভুটে যা আছে, তা
 হবে। এঃ! আবার বৃষ্টি নাম্লে দেখছি, কি

করি?—এখন পানের দোকান খুলিছি, পরে
 আরো কি কর্তে হবে কে জানে! ঈশ্বর জীবনটা
 দিইছিলেন, সেটা সং কি অসং যে উপায়েই
 হোক, রাখতে ত হবে। বাঃ! এ আবার কে
 আসে। মাথায় পাগড়ি, পরণে শাড়ীই বোধ
 হচ্ছে, আবার পায়ে জুতো। মেয়েমানুষ কি
 পুরুষমানুষ বোঝা যাচ্ছে না!

চপলার প্রবেশ

চপলা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বৃষ্টি।
 এই জায়গায় একটুখানি অপেক্ষা করে' নেই—
 বৃষ্টিটা থামুক। একটা স্ত্রীলোক দেখছি এক
 কোণে বসে' রয়েছে। এর সঙ্গে ভাব করে
 নেওয়া যাক। [প্রকাশ্যে] দেখ মেয়েমানুষটি!
 তোমার সঙ্গে আমার ভারি ভাব।

গোলাপী। তা ত হবেই! দরকার পড়লে
 সকলেই ভাব কর্তে আসে। আবার দরকার শেষ
 হয়ে গেলে একেবারে ভুলেও যায়। বাইরে বৃষ্টি
 কি না, তা এখন আমার সঙ্গে ভাব বৈ কি!

চপলা। [স্বগত] স্ত্রীলোকটি মুখরা
 [প্রকাশ্যে] কেন, আমার সঙ্গে ভাব কর্তে
 তোমার আপত্তি আছে?

গোলাপী। সে তুমি মেয়েমানুষ কি
 পুরুষমানুষ, না জানলে বলি কেমন করে?

চপলা। কেন, সেটা কি এখনো ঠিক করে'
 উঠতে পার নি?

গোলাপী। কৈ আর পেরেছি? শাড়ী-পরা
 পুরুষমানুষ আমি এত দিন পর্যন্ত দেখি
 নি। আবার জুতো পায় দেওয়া আর মাথায়
 পাগড়ি পরা মেয়েমানুষ দেখাও আমার ভাগ্যে
 আজ পর্যন্ত ঘটে' ওঠে নি।

চপলা। [স্বগত] আবার রসিকা
 [প্রকাশ্যে] এ রকম পোষাক দেখনি? এ
 নব্যাদের পোষাক। আমি এক জন নব্যা।

গোলাপী। নব্যা পুরুষ না নব্যা
 স্ত্রীলোক?

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! নব্যা পুরুষ! আকা-
 রান্ত শব্দ কখন পুরুষ হয়?

গোলাপী। হবে না কেন? বাবা মামা দাদা
 কাকা সবই ত আকারান্ত, আর তারা পুরুষ
 বলেই ত আমার এত দিন জ্ঞান আছে।

চপলা। [স্বগত] আবার কতক শিক্ষিতা!

[প্রকাশ্যে] তা বটে, কিন্তু ওগুলো ত সংস্কৃত শব্দ নয়! তা যা হোক, তোমার বাবা দাদা কি কাকা কেউ নেই?

গোলাপী। আছে শুনতে পাই।

চপলা। কেন? তারা তোমার খোঁজ নেয় না?

গোলাপী। নেয় কি না নেয়, তোমার তা জেনে দরকার আছে বলতে পার?

চপলা। আহা, চট কেন?

গোলাপী। [কতক মোলায়েম] সমস্ত দিনটা চাকরির ধান্দায় ঘুরে কিছ্ হলে না, ইতে মেজাজটা কি খেজুর গুড়ের কলসী হয়ে থাকবে?

চপলা। তুমি চাকরি করবে না কি?

গোলাপী। পেলেই করি।—পাই কই?

চপলা। তুমি কি কাজ জানো?

গোলাপী। এই নাচতে জানি, গাইতে জানি। কিছ্ কিছ্ লেখাপড়াও জানি, পাড়া-গাঁয়ে পাঠশালায় পড়েছিলাম, তার পর বাড়ী বসেও পড়িছি। অন্য কাজের মধ্যে ছোট-খাট সব কাজ কর্তে পারি,—যেমন চিঠিখান ডাকে দেওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, —এই রকম ছোট-খাট কাজ।

চপলা। তবে বেশ হয়েছে। আমি ঠিক ঐ রকম লোক একটা খুঁজছিলাম। আমি সম্প্রতি স্বামীর বাড়ী যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?

গোলাপী। তা—তা রাখলেই থাকি।

চপলা। আমার কাছে তোমার বড় কাজ কর্তে হবে না। আসল কাজের মধ্যে আমাকে বেশ ভাল মেজাজে রাখা।

গোলাপী। [লজ্জিতভাবে] তা থাকব, তবে মাইনেটা—

চপলা। সে ঠিক করে' দেব। দেখ, কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। আমার নাম চপলা। আমি এখানে এখন আমার বাপের বাড়ীতে আছি: সে বাড়ী কোথায় জানো? বড়বাজারে চাটুর্ষ্যদের বাড়ী বসে সকলেই চিনিয়ে দেবে। আমার বাপ নীলতরন চাটুর্ষ্য, এখানকার জমিদার। বৃষ্টি থেমেছে। আমি যাই। [গমনোদ্যত] বড়বাজারে বাবু নীলতরন চাটুর্ষ্যের বাড়ী, মনে থাকবে?

গোলাপী। [সসম্ভ্রমে উঠিয়া] হ্যাঁ, থাকবে।

চপলা। আচ্ছা। কাল সকালে দেখতে পাবে যে, আমি নিজের দরকার শেষ হলেই ভুলে যাইনে।

[প্রস্থান।

গোলাপী। এরেই বলে কপাল। পড়তে না পড়তে উঠিছি। এখন প্রদীপ জ্বালা যাক্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হৃদগলীতে নীলতরন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহান্তঃপুরের ছাদ। কাল—সন্ধ্যা।

চপলা, নিম্মলা ও ভট্টপল্লী ইহাতে আগতা তাঁহার বন্ধুদ্বয় দামিনী ও যামিনী আসীনা

দামিনী। আহা, এই সৌধচুড়ার কি শোভা!

যামিনী। আহা!

দামিনী। উপরে নিম্মদৃষ্ট- সান্ধ্য নীলা-কাশ।

যামিনী। পদতলে মঞ্জুরিতকিশলয়দল-শ্যামলা ধরিত্রী।

দামিনী। আহা, কি মধুরই বা মলয়-পবন।

গীত

[আলেয়া—ঝাঁপতাল]

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে,
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—
বা জানি কেন এত সুধা মলয়-বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে' করে ভালোবাসে।

যামিনী। আর কোকিলকুজনই বা কি মধুর।

গীত

[গোড়-সারং—ঝাঁপতাল]

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে।
ও কুহু, কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে!
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু, কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বৃষ্টি “এসেছি আমি ওগো এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হতে নামি,

সঙ্গে লয়ে শ্যামল ধরা, পদ্পিত স্দগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মধু তব সন্নিধানে।
মধুরতর মিলন-গাথা গেয়েছে কবি শত;
গায়নি কেহ বিরহগান পাখী রে তোরই মত।
—কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
—ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজন-প্রাণে।

দামিনী। অ হ হ! [গদগদভাবে অব-
স্থিতি।]

যামিনী। সখি রে! [তম্বৎ]

নির্মলা। [চপলাকে] তুমি একটা গাও
না সহচরী!

যামিনী। হাঁ হাঁ—একটা বসন্তবিষয়ক।

নির্মলা। ওর গলা আছে বেশ, তবে গান
বড় শিখিনি।

দামিনী। একটা গাও স্বজন।

যামিনী। হাঁ, একটা বসন্তবর্ণনা জানো?

চপলা। জানি বৈ কি। তবে বর্ণনাটি
আপনাদের মনোমত হবে কি না বলতে পারি
নে!

দামিনী। [ভাবী গানের রসাম্বাদন
করিতে-করিতে] আহা!

চপলা। আচ্ছা গাই। বর্ণনাটি কিন্তু একটু
মারাত্মক।

গীত

[বসন্ত—একতারা]

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্
বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—
সখি রে এল বসন্ত।

দামিনী। বাঃ, বেশ। আরম্ভটি খাসা।
বসন্ত রাগ দেখাছি।

যামিনী। সুন্দর! তবে 'টেঁকা' কথাটা—

চপলা। শূনে যান, আরও আছে।

গীত

বহিছে মলয় আকুলি, বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় তাই বিরহিণীগূলি
—কেমনে হবে জীবন্ত।

দামিনী। বসন্তে বিরহ শাস্ত্রসিদ্ধ। তবে
বাস্তায় ধূলো ওড়ার উল্লেখ না কল্পেও চলত।

যামিনী। অন্ততঃ কোন কবি আজ পর্যন্ত
সেটা করেন নি।

চপলা। কিন্তু কথাটা সত্য কি না?

গীত

ঝর্ ঝর্ ঝর্ কুল্ কুল্ কুল্ কুল্
বহে ঘাম সব গায়ে—
ভন্ভনে মাছি দিনের বেলায়
শন্শনে মশা রায়ে—

দামিনী। বসন্তে ঘাম বহার কথা
কালিদাসের ঋতুসংহারে ত নেই।

যামিনী। আর কোকিল ভ্রমর এ সব
থাক্তে মশা আর মাছির কথা আনাটা কি
ভালো হয়েছে সখি?

চপলা। ভ্রমর ও কোকিল আস্ছে। ব্যস্ত
হবেন না।

গীত

ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু,
গুঞ্জরে অলি মদুহু মদুহু মদুহু,
বাঁচনে বাঁচনে উহু উহু উহু—হি হি
হু হু হা হা হন্ত।

দামিনী। এটুকু মন্দ নয়।

যামিনী। হ্যাঁ, তবে ভাষাটা একটু
উচ্ছৃঙ্খল।

চপলা। শূনে যান না; শোনার পর সমা-
লোচনা কর্বেন।

গীত

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর কে
আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দূটো পেড়ে আন্ সখি
গুড় দিয়ে রাধি অম্বল।

[দামিনী ও যামিনীর সবিষ্ময়ে পরস্পরের
প্রতি দৃষ্টিপাত।]

স্মরণে যে ধারা বহে—রসনার
কি করি কি করি বাঁচা হ'ল দায়,
ভাঁড়ার ঘরটা আর তবে অরি
করে' আসি লো তদন্ত।

দামিনী। বসন্তবর্ণনাটি উত্তম নয়।

যামিনী। নাঃ—এ সব সম্পূর্ণ শাস্ত্র-
বিরুদ্ধ।

চপলা। কিন্তু স্বভাবসঙ্গত।

গীত

দেখ সখি দেখ বাজারেতে
বুঝি ঘি দুধ হইল সন্তা;
কিনে আন্ খেয়ে লঘু করে' নেই
বিরহের ভারি বস্তা।

দামিনী। সখি সখি!

যামিনী। এ কি? এ যে অলঙ্কার-শাস্ত্রকে
বধ করা!

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া গাহিয়া
চলিলেন।]

হোরি যে বিশ্ব শূন্যায়, নে, খেয়ে নিয়ে
শুই বিরহশয়নে,
পাড়ি গো অর্ধ-মুদিত-নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

দামিনী। সখি, থাক্ আর গাইতে হবে
না।

যামিনী। হাঁ, আর কাজ নাই। ক্ষান্ত
হও।

চপলা। আর এক কলি মাত্র আছে।

গীত

নিয়ে আয় সখি বরফ—নিহিলে মরি
এ মলয়-বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল নাক পতি
আজ যে মাসের ২৭এ—
নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই—
বিরহের এত জ্বালা—মরে' যাই।
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস, লো ভাই
বাহির করিয়ে দন্ত।

দামিনী। এ গান বসন্তের অবমাননা।

যামিনী। বিরহের অপবাদ।

চপলা। [সহসা] উহু, উহু! [বক্ষে
হাত দিয়া উর্ধ্বমুখে] মরি যে!—

দামিনী ও যামিনী। কি হয়েছে সখি?

চপলা। [চীৎ হইয়া পড়িয়া] ভয়ঙ্কর
বিরহ সখি ভয়ঙ্কর বিরহ! শাস্ত্রে বিরহের
কি কি অবস্থা আছে বল, শীগ্গির শীগ্গির
সেরে নেই। আমার প্রাণুকান্ত যে কখন এসে
পড়েন ঠিক নেই।

দামিনী ও যামিনী। সমাশ্বসিহি! সমা-
শ্বসিহি!

চপলা। [উঠিয়া] আঃ—বাঁচলেম। কই
কান্ত কই? পতি কই? বল সখি কি কর্ত্তে
হবে বল—এখন আমি মূর্ছা যাব? না
হাস্ব? না কাঁদব? না সন্দেশ খাব?

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। ছোট দিদিমণি! আপনি এক-
বার বাহিরে আসুন ত।

চপলা। কে—ডাকলে?—উঃ—গোলাপী?
বরফ এনেছ?—চল—যাই—ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান।

দামিনী। তোমার ভণ্ণীটি সত্যই চপলা।

যামিনী। একটু অধিক মাত্রায়।

নির্ম্মলা। ওর হাসি তামাসা ঠাট্টা করাটাই
স্বভাব।

দামিনী। বসন্তের এরূপ বর্ণনা! যাকে
জয়দেব বর্ণনা করেছেন—ললিতলবঙ্গলতা-
পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।

যামিনী। মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-
কুর্জিতকুঞ্জকুটীরে।

দামিনী। আহা! এই ত বসন্ত।

যামিনী। আহা! এই রকম বসন্তেই ত হয়
বিরহ।

দামিনী। এই সময়ে তুমি তোমার প্রাণ-
পতিকে ছেড়ে আছ কেমন করে' সখি?

যামিনী। সত্য, সহচরি!

হাসিতে হাসিতে চপলার প্রবেশ

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

নির্ম্মলা। [চমকিয়া] কি লা?

চপলা। হিঃ হিঃ হিঃ—

নির্ম্মলা। হাসিস্ কেন চপলা?

চপলা। হোঃ হোঃ হোঃ—

নির্ম্মলা। হেসে যে গাড়িয়ে পড়িল।
হয়েছে কি?

চপলা। ফিরিছে।

নির্ম্মলা। কে?

চপলা। মিসেস।

নির্ম্মলা। কোন্ মিসেস।

চপলা। স্ত্রীলোকের আবার ক'টা করে'
মিসেস থাকে! সেই মিসেস—সাধু ভাষায় মনুষ্য
যে আমাকে বিয়ে করে'—সাধু ভাষায় পাণিগ্রহণ
করে' কৃতার্থ করেছে। এক কথায় আমার স্বামী
—হোঃ হোঃ হোঃ।

[হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া প্রস্থান।

দামিনী। [গম্ভীরভাবে] সখি! আমরা উঠি।

যামিনী। হাঁ উঠি।

নির্ম্মলা। কেন? কেন?

দামিনী। সখি, মনে বড় আঘাত পেইছি।

উত্থান

যামিনী। হৃদয়ে বড় আঘাত পেইছি।

উত্থান

নির্মলা। কেন? কেন ভাই?

দামিনী। যখন আমরা প্রেমের চিন্তায় মগ্ন, তখন এইরূপ তোমার ভগ্নীর হৃদয়হীন উচ্চ-হাস্য!

যামিনী। এই প্রেমের অবমাননা!

নির্মলা। না না, বোস ভাই, চপলের ঐ রকম স্বভাব, সব বিষয়েই হাসি তামাসা।

দামিনী। আর তার উপরে স্বামী প্রতি এরূপ অবজ্ঞাপূর্ণ বিশেষণপ্রয়োগ! মিসেস! কোথায় বলবে কান্ত, নাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়-দেবতা—না মিসেস।

যামিনী। কোথায় বলবে জীবনবল্লভ, হৃদয়সর্বস্ব, প্রেমকান্ডারী, হৃৎসরোজসুৰ্য্য—না মিসেস! না সখি! আমরা যাই।

নির্মলা। না না, বোস না ভাই—ওর কথা ধর্তে আছে?

দামিনী। কখন না।

যামিনী। [বক্ষে হাত দিয়া] ওঃ—

[উভয়ের প্রস্থান ও গোলাপীর প্রবেশ।

গোলাপী। [নির্মলাকে] আপনার জন্যে ছোট জামাইবাবু এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন যে, নিজে একটু পরে আসছেন।

নির্মলা। [সাগ্রহে] কৈ কৈ? [পত্র লইয়া খুলিয়া পঠারম্ভ ও গোলাপীর প্রস্থান।]

নির্মলা। তা ত! কথাগুলো ত বড় ভাল ঠেকছে না। কি জানি কেন, আর আমার এখানে একদণ্ডও থাকতে মন সর্ছে না। দেখি, তার পরে কি লেখে। [পাঠ] “আমার মানসিক অবস্থার নাকি ছবি তোলা যায় না, তাই পাঠাইতে পারিলাম না। আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা তোমার অনুজ্ঞামত প্রেরিত ছবিতে কথঞ্চিৎ বর্ণিতে পারিবে।”—কৈ ছবি ত পাঠায় নি।

চপলার প্রবেশ

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ। এমন কালি বর্নিল মেখে এয়েছে যে চেনবার যো ছিল না। মূখ ধুঁচ্ছিল, আর আমি এক চিলিম্‌চি জল তার মাথায় ঢেলে দিইছি।

নির্মলা। চপল, চিঠিতে লিখেছে যে ছবি পাঠিয়েছে। তা কৈ—ছবি কৈ? জিজ্ঞাসা করে' আর ত।

চপলা। যেতে হবে কেন? ঐ যে, অশ্বখ-বৃক্ষের ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হই-তেছে।

ইন্দ্রভূষণের প্রবেশ

ইন্দ্র। [চপলাকে] বেশ! সুন্দর অভ্যর্থনা হৃদগলী জেলায় বৃষ্টি মাথায় ঘোলা জল ঢেলে আদর করে?

চপলা। মাথা ঠান্ডা করে' দিলাম।

ইন্দ্র। তা বেশ! [নির্মলাকে] কি দিদিমণি। গোবিন্দবাবুর চিঠি পড়ছেন?—এ যে দিস্তে খানিক।

চপলা। গাধার মোট কি না, অল্প হলে ত ডাকেই পাঠাতে পারতেন।

ইন্দ্র। কি কৃতজ্ঞতা! আমি চিঠিখান বয়ে' নিয়ে এলাম, তার বিনিময়ে আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা?

চপলা। সে আর বানাতে হবে কেন?

ইন্দ্র। কি রকম!

চপলা। বলি' সে ত গাড়াগুড়িই আছ!

ইন্দ্র। বাঃ, পতিভক্তির পরাকাস্তা!

নির্মলা। সেখানে সব কেমন দেখলেন? তারা সব ভালো!

ইন্দ্র। তারা মানে তিনি, আবার তিনি মানে গোবিন্দ বাবু। “ভালো আছেন?” তা আর বলে' কাজ কি? আপনি এসে অবধি তাঁর শরীরের পরিধি ষেরূপ দিন দিন শূন্যপঙ্কের চন্দ্রকলার মত পরিবর্ধিত হচ্ছে, তাতে শীঘ্রই তাঁর ষোলকলা পূর্ণ হবে। ভয় নাই। তা ভয় নেই-ই বা কেমন করে বলি।

মন্তক কণ্ডুয়ন

চপলা। কেন?

ইন্দ্র। না, আর কিছ্‌ নয়, তবে তাঁর মধ্য-দেশ ষেরূপ ক্রমাগত বেলুনের মত স্ফীতি হচ্ছে, তাতে, যদি তিনি ফেটে না যান ত শীঘ্রই আকাশমার্গে উড়ান হবেন।

নির্মলা। তোমার তামাসা রাখ দিখি।

ইন্দ্র। তামাসা!—তবে এই দেখুন তাঁর

ছবি। [পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি ছোট ফটো নিম্মলায় হস্তে দিলেন]

নিম্মলা। [ছবি সাগ্রহে লইয়া ক্রণেক দেখিলেন ও পরে তাহা স্বতঃই তাঁহার হস্ত হইতে স্থলিত হইল।]

চপলা। কৈ দেখি! [ছবি কুড়াইয়া লইয়া] এই গোবিন্দবাবুর চেহারা নাকি? এ কি অসভ্য রকম চেহারা! খালি গায়ে!—হাঃ হাঃ হাঃ, আবার হাসি হচ্ছে! আবার এক হাতে একটা রেকাবি, আর এক হাতে একটা বুদ্ধি সন্দেশ মূখে দেওয়া হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ, ভারি মজার লোক ত। আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে যে।

ইন্দ্র। [নিম্মলাকে] কি দেখলেন। যে আপনার বিরহে তিনি ছিন্নমূল মাধবীলতার মত শূন্যে যান নি।

নিম্মলা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও কেন?

[সবেগে প্রস্থান।]

চপলা। দিদিমণি অত দুঃখিত হ'লেন যে?

ইন্দ্র। বোধ হয় তাঁর স্বামী তাঁর বিরহে মোটা হয়েছেন দেখে। স্ত্রীরা ভাবেন যে, তাঁরা নইলে স্বামীদের চলে না। তা যে চলে, তাই শূন্য আমি দেখাচ্ছিলাম।

চপলা। তবে তুমি বিয়ে কর্তে গিয়েছিলে কেন? তোমাকে ত আর বাপ মায়ে ধরে' বিয়ে দেইনি।

ইন্দ্র। পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার ক্লেপে। সে বিয়ে কর্তার আগেই। একটা ক্রুদ্ধবেণীসম্বিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোলগাল মেলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধি শূন্য হারিয়ে সে একটা কাজ করে' ফেলে, যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর্তে হয়।

চপলা। তা বটে, তবে সে ক্লেপামীটা স্ত্রী থাকলেই যায়, স্ত্রী মলেই আবার হয়। গোবিন্দবাবুই তার দৃষ্টান্ত। বরং স্বামী নইলে স্ত্রীর কতক চলে।

ইন্দ্র। কিসে?

চপলা। কিসে? স্ত্রী বার বছরে বিধবা হলেও আবার বিয়ে না করে থাকতে পারে।

আর পুরুষ ৬০ বছরেও স্ত্রী মলেই আবার বিয়ে না করে' থাকতে পারে না।

ইন্দ্র। তবে তোমরা প্রথমবারেই বা বিয়ে কর কেন?

চপলা। টাকা রোজগার কর্তার জন্য একটা স্বামী দরকার, তাই। [কাছে গিয়া ইন্দ্রের বক্ষস্থলে তর্জনী দিয়া মৃদুস্বরে] মোট বইবার জন্য প্রতি ধোপানীরই একটি করে' গাধা থাকে।

ইন্দ্র। এই গাধাদেরই বুদ্ধিতে তোমরা দু' মূটো খেতে পাও। আমরা নইলে কি তোমাদের চলে সোনার চাঁদ?

চপলা। বটে! আমাদের বুদ্ধিতেই তোমরা করে' থাক। শ্রীকৃষ্ণের সারথি না থাকলে অজ্ঞানের সাধ্য কি যে যুদ্ধ কর্তেন। আমরা নইলে তোমাদের কি চলে দস্তমাণিক?

ইন্দ্র। তার দৃষ্টান্ত গোবিন্দবাবু। তাঁর চলছে কেমন করে' মাণিকজোড়?

চপলা। তাঁর বাড়ীতে কি স্ত্রীলোক একে-বারেই নেই?

ইন্দ্র। তাঁর ভগ্নী আছেন বটে!

চপলা। দেখলে, ফটিকচাঁদ।

ইন্দ্র। তিনি নইলে কি আর গোবিন্দবাবুর চলত না।

চপলা। তবে দেখবে গোপালধন?

ইন্দ্র। কি?

চপলা। পনের দিনের মধ্যে দিদিমণিকে নিতে লোক আসবে।

ইন্দ্র। দেখি।

চপলা। তা'লে স্বীকার করবে যে, বুদ্ধিতে তোমাদের হার?

ইন্দ্র। হ্যাঁ। আর দিদিমণিরও একটু উপকার হয়।

চপলা। গোবিন্দবাবুকে কিছু বলে' দিতে পাবে না।

ইন্দ্র। না, আমি তাঁকে কিছু বলব না।

চপলা। আর তোমারও একটু কাজ কর্তে হবে। আমি নিজেই কর্তাম, যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ থাকত।

ইন্দ্র। কি?

চপলা। বেশী কিছু নয়। সদৃশ্বেশ্যে দুই একটা সাদা মিছে কথা!

ইন্দ্র। তথাস্তু। তবে—

চপলা। এখন চল নীচে [যাইতে যাইতে]
যা' বলি কর দেখি। তার পর দেখো, যা
বলিছি তা হয় কি না। হাঃ, পুরুষ মানুষ-
গলোকে এই কড়ে' আঙ্গুলের ওপরে করে'
ঘুরাতে পারি।

ইন্দ্র। [যাইতে যাইতে স্বগত] আমাকে
ত পার।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দের বহির্বাটী। কাল—সন্ধ্যা।
ডাইনে বাঁয়া সহকারে গোবিন্দ একাকী ফরাসে
উপবিষ্ট

গোবিন্দ। [তবলাতে চাঁটি দিতে দিতে]
আজ বাদলার দিনে কেউ যে এ-মুখো হচ্ছে
না। লোকগুলোর কি বাড়ী থেকে বেরবার
নামটি নেই! ইরির জন্যে ত লোকে বিয়ে করে।
এ সময়ে প্রিয়র নথ-আন্দোলন মনে পড়ছে,
আমার প্রাণটা হা হুতাশ করে' উঠছে। বৃষ্টি-
বাদলার দিনে একটা স্ত্রী বিশেষ দরকার।—
এই রামা! বেটা ঘুমোচ্ছে—ওরে হতভাগা
গুলিখোর, ষড়মার্ক, মন্দোফরাস, হাড়ি
ডোম—

নেপথ্যে। এজ্ঞে যাই।

গোবিন্দ। [ডেঙুচাইয়া] এজ্ঞে যাই। এক
ছিলাম তামাক নিয়ে আর—শীঘ্যর। কি যে
করি, ভেবে পাইনে—ঐ যে গোকুল ভায়া ছাতি
মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। ওহে গোকুল ভায়া এস
এস।

নেপথ্যে। না না, ওপাড়ায় বিশেষ দরকার
আছে।

গোবিন্দ। আরে দুত্তর দরকার।—একটা
গান গেয়ে যাও।

নেপথ্যে। আমি গাইতে জানি না।

গোবিন্দ। তবে একটু নেচে যাও।

নেপথ্যে। না না, বাড়ীতে ব্যারাম।
ডাক্তারখানায় যাচ্ছি—

গোবিন্দ। এঃ চলে গেল।

[রামকান্তের প্রবেশ ও হুঁকা দিয়া প্রস্থান।]

গোবিন্দ। কি করা যায়! স্ত্রীটা ফটো
পেয়েও এলো না। এদিকে আমার বৃদ্ধিদাত্রী
বোনটিও চলে' গেল। বলে' গেল যে বসে থাক
না, স্ত্রী তিন মাসের মধ্যেই' চলে' আসবে।
তা ত আর আসবার কোন লক্ষণই পাওয়া
যাচ্ছে না। একখান চিঠিই বা লিখল কৈ?—
ঐ যে বংশী যাচ্ছে—ওহে বংশী! একবার এস
না এদিকে।

নেপথ্যে। না না, দরকার আছে—

গোবিন্দ। ঈঃ—একেবারে হন্ হন্ করে'
চলে' গেল! এ বাদলার দিনে কোথায় একটু
কাজের লোকের মত দু' ছিলাম তামাক খাবে,
তাস পিটবে, একটু হুইস্কি খাবে, দুটো
খোসগল্প করবে—না সব কুড়ের মত ছাতা
মাথায় দিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া করে' বেড়াচ্ছে।
নাঃ, হুইস্কির বোতলটা আনান যাক্।—এই
রামা, এই বেটা কুড়ে গাধা।

রামকান্ত। [প্রবেশ করিয়া মুখ
খিঁচাইয়া] কি—

গোবিন্দ। “কি?” বেটা যেন নবাব! ফের
যদি ও রকম উত্তর দিবি ত লাঠি দিয়ে তোর
হাত ভেঙ্গে দেব। যা শীঘ্যর হুইস্কির
বোতলটা নিয়ে আর একটা গেলাস।

[রামকান্তের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ এবং
বোতল ও গেলাস দিয়া পুনঃ প্রস্থান।]

গোবিন্দ। [বোতল খুলিয়া মদিরা
ঢালিতে ঢালিতে] একটু কোম্পানীর উপকার
করা যাক্! [সুর করিয়া] “সন্ধ্যায় একটু
হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।” এঃ
পীতাম্বর যে; আবার সঙ্গে গদাও যে—এস
এস ভায়া, এস বাবাজি!

পীতাম্বর ও গদাধরের প্রবেশ

গোবিন্দ। হুইস্কির গন্ধ অত দু'র থেকে
পেয়েছ? আচ্ছা নাক বাবা! কি, পীতু, সব
ভাল ত? বলি শশীর খবর কি? তার ভায়ের
স্ত্রীটা না কি মারা গিয়েছে। এই রামা—
হরিতারণ শ্বশুরবাড়ী এসেছে শুনলাম। তাকে
ধরে' নিয়ে আসতে পারেন না? সে এবার ভারি
মুটিয়েছে। গদা!—শ্যামচাঁদের মাছ খেতে
খেতে কাঁটা গলায় বেঁধেছিল যে তা গিয়েছে?
এই রামা! দুটো গেলাস নিয়ে আর! গোলাপ-

বাবুর বড় মেয়েটি বিধবা হয়েছে।—আহা!
তার বয়স কত? ১৫।১৬ বছর হবে না?—
সিন্ধেশ্বরের কোন খবর টবর পেলে?

পীতাম্বর। তুমি একাই যে সব কয়ে'
ফেল্পে হে।

গোবিন্দ। আরে সমস্ত দিনটা কথা কইতে
না পেয়ে পেট ফেপে মরি আর কি। তোমরা
এলে, একটু কথা কয়ে' বাঁচলাম। এই রামা—
বেটা নিশ্চয় ফের ঘূমিয়েছে! এই যে—

[রামকান্তের প্রবেশ ও দুটি
গেলাস রাখিয়া প্রস্থান।

গোবিন্দ। [মদিরা ঢালিতে ঢালিতে]
আমার সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে, জল দিয়ে
খেতে হবে। এ বাদলার দিনে চারিটি চাল
ভাজতে বলব? [পূর্ণ পাত্র উভয়কে প্রদান।]

পীতাম্বর। আমরা বেশীক্ষণ বস্ব না।
কাজ আছে। [পান]

গোবিন্দ। আচ্ছা যা হোক—পৃথিবী
শুদ্ধ লোকের এক দিনেই কাজ! তবলাটা
রয়েছে একটা গান ধর না হয়।

গদা। না না—দেবী হয়ে যাবে। [পান]

গোবিন্দ। আরে বসই না।

পীতাম্বর। না না আর না। এখন উঠি।

গদা। বাড়ীতে উত্তম-মধ্যমের ভয় আছে
ত। [উত্থান]

গোবিন্দ। সকলেরই ঐ দশা?

গদা। আরে হাড় জ্বালাতন করেছে।
একটু যেতে দেবী হ'লেই কে'দে কেটে একটা
হাঙ্গামা বাধায়।

গোবিন্দ। তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে
পার না?

পীতাম্বর। আরে তা'লে কি আর ঘর-
সংসার চলে।

গদা। আর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতেই
রাখব ত বিয়ে না কল্পেই চলত।

গোবিন্দ। তা একটু পরে যেও'খনি।
একটু বসো না।

পীতাম্বর। না না—আমার বাড়ীতে
রাখুনী স্বাক্ষণী পালিয়েছে। স্ত্রীরও অসুখ—
শয্যাগত। দেখি, এ পাড়ার হরের মাকে যদি
পাই। [উত্থান]

গদা। আমারও ঐ পালিয়েছে। বেহাই

এয়েছে।—তাই পাঁটার মাংস আন্তে যাচ্ছি—
উত্থান]

গোবিন্দ। পাঁটার মাংসের সের কত করে?
গদা। আট আনা করে! আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। সব শালাই সমান। দেখি
খাবারের দেবী কত। এই রামা—ফের ঘূমিয়েছে
নিশ্চয়। জ্বালালে। ওরে ষণ্ডামার্ক, চোর,
বজ্জাত, হারামজাদ।

রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। ফের ঘূমোচ্ছিলি?

রাম। ঘূমোব কেন? আয়েস কচ্ছিলাম।

গোবিন্দ। [সাস্চর্য্য] আয়েস কচ্ছিলি।
মনিবের সম্মুখে বলতে লজ্জা করে না! আর
তুই কি দিবারাত্রই আয়েস কর্ব? এদিকে
আমি ডেকে ডেকে সারা!

রাম। অমন ডাক্তি নেই। রক্ত-মাংসের
ধড় ত। সকাল থেকে খ্যাটে খ্যাটে—

গোবিন্দ। বটে! সকাল থেকে কি খেটে-
ছি' বল।

রাম। এই তামাক ত সাজ্ছিই সাজ্ছিই।
তার পর বাজার করা।

গোবিন্দ। তোর আর কাল থেকে বাজার
কর্বে হবে না।

রাম। ম'ই কর্ব না ত কে কর্ব?

গোবিন্দ। কেন! ঐ কর্ব।

রাম। ঐ বাজার কর্ব! তবে মোরে আর
মাইনে দিয়ে রাখা কেন? ম'ই বৈসে বৈসে
ম'নিবের মাইনে খাতি পার্ব না। একটা ত
ধরম আছে।

গোবিন্দ। বেটা এখনি বলে 'খেটে খেটে
সারা' আবার ব'লে বসে বসে মাইনে খেতে
পার্ব না। তোর বসে' বসে' খেতে হবে না।
তুই তামাক সাজ্ছি।

রাম। আর বাজার কর্ব ঐ! তা'লে ঐই
বাড়ীর গিন্নী হ'ল। আর ম'ই হলাম চাকর।

গোবিন্দ। তুই চাকর নয় ত কি ম'নিব?
আর ঐই বাড়ীর গিন্নী হ'ল কিসে? গিন্নীতে
বুঝি বাজার করে?—যা দেখে আর খাবারের
দেবী কত—হাঁ, আর আজ কি যে বাজার করি,
তার ত হিসেবটাও দিলি নে।

রাম। আপনি যে খাচ্ছিলেন।

গোবিন্দ। তোর জন্যে কি আমি খাবও না? আর সারাদিনই কি বসে' বসে' খাচ্ছি?

রাম। তা বৈ কি। আর তার পরে যে সব দু'পরাটা বিকেলটা ঘুম দিলে! আর মনুই ঘুমোলেই যাত দোষ।

গোবিন্দ। বেটা, তুই আর আমি সমান?— কি কি বাজার করিল বল।

রাম। [টাক হইতে হিসাব বাহির করিয়া] এই আলু দু' সের, ১১৫,—

গোবিন্দ। কাল যে দু' সের এনিছিল! ফুরিয়ে গেল?

রাম। তা ফুরোবে না? আপনি ত কচি খোকাটি নও যে দিন এক সের আলুতে হবে!

গোবিন্দ। কচি খোকায় বড়ি দিন এক সের ক'রে আলু খায়—আচ্ছা, তার পর?

রাম। ঘি এক সের—২৥৫

রুইমাছ এক সের—১৥৫

বেগুন ৪টে—১/১০

ময়দা এক সের—১/১০

গোবিন্দ। পাঠার মাংস আনিস্ নি?

রাম। আন্ব না কেন! পাঠার মাংস দু'সের ২।

গোবিন্দ। এক টাকা ক'রে পাঠার সের! কাল যে পনর আনা করে' এনিছিল—

রাম। বাজারের দর কবে বাড়ে কবে কমে, তার কিছু ঠিকেনা নিশেনা আছে?

গোবিন্দ। দর যে কখন কমল, তা ত দেখলাম না—বাড়ছেই।

রাম। আপনার খাওয়াও যে বাড়ছেই।

গোবিন্দ। খাওয়া বাড়ছে বলে' দর বাড়বে? বেটা আমাকে গাধা বোঝাচ্ছে। এখনি গদা বলে' গেল, পাঠার মাংসের সের ৥০ করে'! কাল থেকে আমি নিজে বাজার যাব। বেটা আমাকে কেবল ঠকাচ্ছিস্ বোধ হচ্ছে। যা বেটা, বেরো বাড়ী থেকে [তাড়া করায় রাম উদ্ভ্রম্বাসে পলায়ন করিল] বেটা আমার পেয়ে বসেছে।

ধোপানীর প্রবেশ

ধোপানী। কাপড়গুলো গুণে নেবা না? কতক্ষণ বসে' আছি।

গোবিন্দ। আচ্ছা আজ রেখে যা; কাল সকালে আসিস্।

[ধোপানীর প্রস্থান।

গোবিন্দ। বাড়ীর হ্যাঙ্গামও ত কম নয়। আগে বোনটা ছিল, সব দেখত শুনত। তা সেও চলে' গেল। এখন আগের ডবল-খরচ হচ্ছে বোধ হয়। তবু ভাঁড়ার নিজে রাখি।

রসুই ব্রাহ্মণের প্রবেশ

রসুই ব্রাহ্মণ। বাবু যে তেল দিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গিয়েছে। আর একটু তেল বের করে' দিতে হবে।

গোবিন্দ। এই চাবি নেও [চাবি প্রদান] আবার চাবি এখনি দিয়ে যেও। [রসুই ব্রাহ্মণের প্রস্থান] নাঃ, এরা জ্বালাতন কল্পে। স্ত্রীকে নৈলে আর কোন মতেই চলে না। বিরহের প্রকৃত মর্ম এখন বুঝি।

গীত

[বেহাগ—ঝাঁপতাল]

বিরহ জিনিসটা কি,
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি।
যখন দাঁড়ায় আসি' রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফন্দ' করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়ে বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতরভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
যদিও রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না;
দু' সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি;
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি;
ভাবিরে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

নাঃ, স্ত্রীকে আন্তে লোক পাঠাতে হচ্ছে।
কিন্তু তা'লে যে সে এসে পেয়ে বসবে। কি
করি!

রামকান্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। বেটা কি চাস্?

রাম। একখানা চিঠি [চিঠি প্রদান]

গোবিন্দ। ডাকের চিঠি দেখছি। এতক্ষণ
দিস্ নি?

রাম। বেতুল হয়ে গিইছিল।

গোবিন্দ। খেতে ত বেভুল হয় না।
বেটাকে দিন কতক কেবল বেত দিতে হয়।

[রামকান্তের প্রস্থান।

এ চিঠিখানার খাম খুব বড় দেখছি। আবার
ভারি ভারি ঠেকছে। কে লেখে খুলে'
দেখি। ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও! ইন্দু।
ভায়া কি লেখেন দেখা যাক্; এঃ,
আবার কাগজে মোড়া একখানা ছবি। কার?
স্ত্রীর নাকি?—বুঝি এটা আমার ফটোর
জবাব।—দেখি। ঈঃ! এ যে মেলা লোক। দুটো
স্ত্রীলোক আর দুটো পুরুষ। ইনি ত আমার
গৃহিণী। মনুটোয়নি বরং কাহিলই হয়েছে।
যাক্, বাঁচা গিয়েছে।—এ ত ইন্দু। আর এ
মেয়েটি কে? আর এ ছেলেটাই বা কে? এঃ
এর একেবারে ইংরিজী পোষাক যে!—হাতে
ছড়ি মাথায় বিলিতি টুপি! চিঠি খানা পড়ে'
দেখি। [নীরবে পাঠ] এ্যাঁ! কথাটা ত ভালো
নয়। “ইনি আমার স্ত্রী ও আপনার স্ত্রীর
পুরাতন বন্ধু—নাম শ্রীশরৎকুমার হালদার।”
দেখি শরৎকুমার হালদার! [ছবি লইয়া
দেখিয়া] এ আবার আমার স্ত্রীরই চেয়ারের
ঠিক পিছনে—এক হাত আবার তার ঘাড়ের
ওপর!—কথাটা ত ভালো নয়। নাঃ, তাকে
আন্তে এখনি লোক পাঠাতে হচ্ছে। বন্ধুফন্ধু
রেখে দাও। এত বন্ধুত্ব ভাল নয়। একেবারে
আমার স্ত্রীর ঘাড়ে হাত! এমন ঘরেও বিয়ে
করে? উহু!—আন্তে হচ্ছে। কিন্তু একটু
কৌশল করে আন্তে হবে, যাতে আসল কারণ
টের না পায়। দেখি রামাটার সঙ্গে পরামর্শ
করে'। ওকেই পাঠাতে হবে। বেটা চোর বটে,
কিন্তু, ওর পেটে পেটে বুদ্ধি! [কাসিয়া] এই
রাম, ওহে রামকান্ত, ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্ত—
ও আমার প্রাণাধিক রামকান্তপ্রসাদ।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [মোলায়েম ভাবে] এজ্ঞে। [স্বগত]
বাবুর মেজাজ যে ভারি নরম হয়ে গেল!

গোবিন্দ। দেখ রাম, একটা কাজ কর্তে
পার বাবা!

রাম। এজ্ঞে আপনি বলুন আর পার্ব না?

গোবিন্দ। কাজটি অতি সোজা। এমন কি
সম্বেশ খাওয়ার চেয়েও সোজা।

রাম। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে]
তবে নিচ্ছ ভারি খুব সোজা।

গোবিন্দ। হ্যাঁ। তবে কি না একটু বুদ্ধি
দরকার। তা তোমার বুদ্ধি ত বেশ আছে
দেখতে পাই।

রাম। এজ্ঞে। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি
কর্তা!

গোবিন্দ। বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি
নাকি? তা বেশ। খাবে বৈ কি! আর শোন—
তোমাকে দিয়ে সে কাজটি যেমন হবে, আর
কাউকে দিয়ে তেমন হবে না।

রাম। এজ্ঞে না!

গোবিন্দ। তুমি হলে বাড়ীর পুরোন
চাকর। তোমার ক'বছর চাকরি হোল?

রাম। এজ্ঞে পাঁচ বছর কি কুড়ি বছর
হবে।

গোবিন্দ। দুর্—তোর প্রায় সাত বছর
চাকরি হোল। না?

রাম। এজ্ঞে। কষে' নেও।

গোবিন্দ। কষে' নেবো? তোমার বয়স কত
হোল বাবা?

রাম। অত কি কর্তা খেয়াল থাকে? বোধ
করি এক কুড়ি হবে।

গোবিন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ! তোর চল্লিশ
বছরের এক কাণাকড়িও কম নয়।

রাম। এজ্ঞে তা ঠিক! আপনি কত বয়সে?

গোবিন্দ। এই ৩৪ কি ৩৫ বছর হবে, না?

রাম। সে ক'গন্ডা?

গোবিন্দ। সে খোঁজে তোর দরকার কি—
তুই ত আর বিয়ে কর্তে' যাচ্ছিস্ নে—যাচ্ছিস্
নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—তা বিয়ের সাধ যায়
মলে'! তা শোন, যদি তুই আমার এই কাজটা
কর্তে' পারিস্ ত তোর বিয়ের খর্চা দিয়ে
দেব। দেখ্ পার্ব?

রাম। [সজোরে] হ্যাঁ, খুব পার্ব—

গোবিন্দ। শোন তবে। তোর মাঠাকরুণ
অর্থাৎ আমার গিন্নী—বুঝলি?

রাম। এজ্ঞে, এর আর শক্তটা কমনে। কি
বলুন বাবু?

গোবিন্দ। বুঝতে পারিনি! তোর মা-
ঠাকরুণ এখন ত তার বাপের বাড়ীতে?

রাম। এজ্ঞে।

গোবিন্দ। তাকে তোর গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

রাম। [স্বগত] তালৈই ত মোর মনস্কল। [প্রকাশ্যে] তিনি যদি না আসে?

গোবিন্দ। তা' হ'লে ছলে কৌশলে নিয়ে আসবি।

রাম। [ভাবিয়া] রাস্তা দিয়ে হে'ছড়াতে হে'ছড়াতে নিয়ে আসব নাকি?

গোবিন্দ। আরে না। বেটা বুদ্ধেও বুদ্ধে না। তাকে কোন রকমে ভিজিয়ে নিয়ে আসবি। জান্তে দিবনে যে আমি তোকে আন্তে পাঠিইছি। বুদ্ধলি? এমন একটা কিছুর বানিয়ে বলবি, যাতে সে না এসে আর থাকতে পারে না।

রাম। [ভাবিয়া] তবে বলবে যে বাবু কলেরায় মর মর!

গোবিন্দ। উ'হু। সে চালাকি বুদ্ধেতে পারবে 'মর মর' বলে হবে না।

রাম। তবে বলব, মরেছে।

গোবিন্দ। দূর বেটা। যা, তোকে দিয়ে হবে না। যদি এটা কস্তুর পাতিস বাবা, তা'লে তোকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতাম!

রাম। এ্যা—তবে বলব যে এই বশেখ মাসে বাবুর বিয়ে—

গোবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! তোকে দিয়েই হবে। বেশ! বেটার পেটে পেটে বুদ্ধি।

রাম। এজ্ঞে হ্যাঁ। কেবল সেটা তলায় পড়ে থাকে। একটু ঘাঁটিয়ে নিলেই হয়।

গোবিন্দ। ঘাঁটিয়ে নিলেই হয় বুদ্ধি! তবে তুই সকালে যাস। বেশ গুঁড়িয়ে বলবি। কথা টথা আগে থেকে বানিয়ে নিয়ে যাবি বেশ করে'।

রাম। এজ্ঞে।—বকশিশের কথা মনে থাকে যেন কস্তুরী।

গোবিন্দ। তা থাকবে।

[উভয়ে নিষ্কান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হাঁসখালিতে চূর্ণি নদীর ধারে খেয়াঘাটের দোকান। কাল—অপরাহ্ন।

রামকান্ত, নিতাই ও অজ্জর্ন নামা দুই জন হাঁসখালিবাসী উপবিষ্ট ও তামাকু-সেবনে ব্যস্ত

রাম। বল নেতাই! তোদের গায়ে যে

একটা জ্বর মেয়েমানুষ আছে, তারে চিনিস্ ভাই?

নিতাই। কে সে?

রাম। আরে মদুইও ত তাই জিজ্ঞেসা করিছিলাম। সেই যে ঐ ঘোষপুকুরের কিনারায় তার বাড়ী। বয়স বছর ১৫।১৬ হবে। নামটা শুনছি গোলাপী। যেমন নাম তেমন জ্বর দেখতি।

অজ্জর্ন। বুদ্ধিছ বুদ্ধিছ। ও সেই মাইতির মেয়ে।

রাম। কোন্ মাইতি?

অজ্জর্ন। কে জানে কোন্ মাইতি। তার ত এখানে ঘর নয়। কেন, সে তোর কি করেছে?

নিতাই। তারে দেখলি কেমন?

রাম। গীত

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই

ডোবার ধার দিয়ে,

ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায়

কাঁকে কলসী নিয়ে।

সে এমনি করে', চেয়ে গেল

শুদ্ধ মোরই পানে।

আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—

ঠিক এ—এইখানে ॥

রাম। তার রং যে বড়ই ফর্সা

তারে পাব হয় না ভরসা

নিতাই ও অজ্জর্ন। তার রং

বড়ই ফর্সা

[একত্রে]

তারে পাবি হয় না ভরসা

রাম। তার জন্যে কছে রে

মোর প্রাণ আনচান।

নিতাই ও অজ্জর্ন। তার জন্যে

করুক যতই প্রাণ আনচান ॥

[একত্রে]

রাম। ও পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি

শান্তপদরে;

—ঐ শান্তপদরে ডুরে রে ভাই,

শান্তপদরে ডুরে।

তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর,

যেন পটল চেরা;

আর গড়নিট যে—কি বলবো ভাই—

সকলকার সেরা ॥

তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি]

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁকা
পায়ে বাঁকা মল;
আর মূখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল-ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি
একরাস্তি,
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
এর আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি]
তার এলো চুলের কিবা বাহার—
আর বলবো কিরে;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—
মিথ্যে বলিনি রে;
মুই মিথ্যে কবার নোক নইরে— করিনিও ভুল,
ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই
হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি]
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
গোল গাল যে তার ঢং;
আর কি বলব মুই ওরে নেতাই!
কিবা তার রং;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল
নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি]
নিতাই। তা তার সাথে পীরিত করে' কি
হবে!
রাম। কেন ওরা ত কৈবর্ত্ত।
অজ্জ'ন। তোর তারে বিয়ে কর্ত্ত সাধ
গিয়েছে না কি? তা'ত হবার যো নেই।
রাম। কেন, ওরা কৈবর্ত্ত না?
অজ্জ'ন। কৈবর্ত্ত না, কি আর বেরাক্ষণ?
ও কৈবর্ত্ত, ওর বাপ কৈবর্ত্ত, আর ওর ঠাকুন্দা
—সেও বদ্বি কৈবর্ত্ত।
রাম। তবে ওর সাথ মোর বিয়া হবে না
কেন?
অজ্জ'ন। আরে, ওর যে একটা সোয়ামী
আছে। তুই কি ভাবিস্ যে ওর এতদিন বিয়া
হয় নি!
রাম। বটে বটে। সে কথাটা ত এতদিন
খেয়াল করি নি। ওর যে সোয়ামী আছে!
নিতাই। কোথায় ওর সোয়ামী? সে কি
আর আছে? সে নিঃশব্দ মরেছে। আজ আট

বছর সে ফেরার। বেঁচে থাকলে সে কি আর
এতটা দিন আস্ত না?
রাম। [সাগ্রহে] বটে। তবে ত বিয়া হয়।
অজ্জ'ন। আরে বিধবার কি বিয়া হয়?
নিতাই। তা হবে না কেন? ঐ সে দিন
কেটনগরে বৈকুণ্ঠবাবুর—
অজ্জ'ন। তার কি আর জাত আছে? সে
নতুন আইনে বিয়ে।
রাম। তা জাত না রৈল ত মোর এইটি।
মুই তারে লয়ে দ্যাশত্যাগী হ'তে পারি।
অজ্জ'ন। বটে! এত দূর?
রাম। আরে, তার এক চাহনির দাম হাজার
টাকা।
অজ্জ'ন। তুই ত তারে বিয়ে কর্ব্ব বলে'
ক্ষ্যাপলি,—তবে সে বিয়ে কল্পে ত।
রাম। তাও ত বটে! সেটা ত মুই এত-
দিনটা ভাবিনি। [ভাবিয়া]—তা তাকে রাজি
কর্ব্ব।
অজ্জ'ন। তা কর্ব্ব করিস্। কিন্তু তার
স্বভাব চরিত্তরটা ভাল নয় বলে' রাখছি।
রাম। তা মোর স্বভাব চরিত্তরটাই বা কি
এমন ধর্ম্মপুত্রর যুধিষ্ঠিরের মত।
নিতাই। তা সে ত আর এ গাঁয়ে নেই।
রাম। [হতাশভাবে] এ্যা—তবে সে
কোতায়?
নিতাই। সে কোতায় চলে' গিয়েছে?
রাম। তবে! [পিছন দিকে দুই হাত দিয়া
মান্দুর ধরিয়্যা চিৎ হইয়া হাঁ করিয়া রহিল।]
অজ্জ'ন। সে শূনি হুগলি গিয়েছে
চাকরি কর্ত্ত।
রাম। [সোৎসাহে উঠিয়া] বলিস্ কি!
মুইও ত সেথা যাচ্ছিরে। এরেই ত বলে
কপাল! [পরিভ্রমণ।]
অজ্জ'ন। তারে কি আর সে সহরের
মধ্যে চুড়ে নিতে পার্ব্ব?
রাম। তা দেখি কি হয়। ভাগ্গিস আজ
তোদের দেখা পাইছিলাম ভাই।
নিতাই। মুই উঠি।
অজ্জ'ন। মুইও যাই।—তবে রাম ভাই,
তুমি বসি রও, মোরা উঠি।
রাম। মুইও যাই।

[নিস্তান্ত।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভাগীরথীর একটি বাঁধান ঘাট।

কাল—বিকাল।

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। এই ঘাটে একটু বসে' নেওয়া যাক্। বাপ্, চন্দননগর কি এখানে? [ঘাটে উপবেশন] উঃ, পা ধরে' গিয়েছে। দিদিমণি বলে থাক্, এক দিন তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব' খনি। তা আমার যেমন গেরো! বল্লাম, নিজেই গিয়ে দেখে আসি। খাসা গাড়ী করে' যাওয়া যেত।—বাঃ! ঘাটে কেউ নেই দেখছি। বেশ হাওয়া হচ্ছে।

গীত

[বেহাগ—আড়খেমটা]

সে কেন দেখা দিল রে
না দেখা ছিল রে ভালো,
বিজলির মত এসে সে
কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখতে না দেখতে সে
কোথা যে গেল রে ভেসে;—
যেন কোন্ মায়া-সরসী
ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশী রে
সুন্দর জ্যাছনা নিশি—
বাজতে না বাজতে সে
জ্যাছনায় গেল রে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে
আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত আলোরই সনে
মিশালো যেন সে আলো।

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [স্বগত] হাঁ, সেই ত বটে। মোর কি কপালের জোর! বাঃ, কি চেহারা, যেন একেবারে কেণ্টনগরের বাদামে গুঁলি! আর গলাই বা কি—যেন শান্তিপূরের খয়ে মোয়া। কি করে' এর সঙ্গে আলাপ সুরু করি? [ভাবিয়া] হাঁ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] হে' গাঁ! তোমাদের এ সহরে গরু আছে?

গোলাপী। [তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হাঁ আছে। কেন?

রাম। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তাদের কটা করে' শিং?

গোলাপী। আরে মলো!—গরুর আবার কটা করে' শিং থাকে!

রাম। [সরিয়া আসিয়া] এ্যাঁ—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। [নিকটে উপবেশন]

গোলাপী। তা কচ্ছিলে ত কচ্ছিলে। অঁত কাছে ঘেঁষে বস কেন?

রাম। এ্যাঁ! [ভাবিয়া] আর বল্ছিলাম, তোমার গলাটি ত খাসা। [আরও সরিয়া আসিল।]

গোলাপী। খাসা ত খাসা। তা তোর তাতে কি বিট্কেলে মিন্‌সে?

রাম। না তাই বল্ছিলাম। মনুই ওস্তাদ মানুস কি না। সওদাগরেই রতন চেনে।

গোলাপী। আরে! এও ত বড় মন্দ নয়।—ওস্তাদ মানুস হস্ না হস্ তাতে আমার কি?—অঁত ঘেঁষে বসলে ভালো হবে না বল্ছি।

রাম। আহা, রাগো কেন ভাই? তোমার সঙ্গে ত এই নতুন দেখা নয়।

গোলাপী। তোর সঙ্গে আবার আমার কবে দেখা হোল?—আরে মোলো!

রাম। কেন সেই হাঁসখালিতে ঘোষেদের পুকুরের ধারে।

গোলাপী। [স্বগত] এ আমারে চেনে দেখছি। [প্রকাশ্যে] তা হইছিল ত—হইছিল। তা এখানে কি?

রাম। এখানে মনুই আজ আইছি—যাব নীলরতন চাটুর্ঘ্যের বাড়ী—পথে তোমায় দ্যাখ্লাম, পুরোন আলাপী নোক—তাই ভাবলাম দুটো কথা কয়ে যাই।

গোলাপী। [স্বগত] এ যে দিদিমণির বাড়ীই যাচ্ছে। [প্রকাশ্যে] সেখানে কেন যাচ্ছ?

রাম। মোদের মাঠাকরুণকে আন্তি। বাবু পেঠিয়েছে।

গোলাপী। তোর বাবুই বা কে আর তোর মাঠাকরুণই বা কে?

রাম। বাবু কে? তা জানো না! কেণ্টনগরের গোবিন্দ মনুখুয়ো! তাঁরে না জানে এমন মানুস কটা? মোর মাঠাকরুণ তাঁরই ইস্তিরি—নীলরতন বাবুর বড় মেয়ে।

গোলাপী। [স্বগত] তবে ত সত্যিই এ বড়দিদিমণির শ্বশুরবাড়ীর চাকর। [ভাবিয়া]

না, একেবারে চটান হবে না দেখছি।
রাম। ভাবছ কি ঠাকরুণ—একটা গান
শুনবা!

গোলাপী। শুননি।

রাম।

গীত

[পুরবী—আড়া]

ছিল একটি শেয়াল—

তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল—

আর সে নিজে বসে বেড়ে,

টাকা কড়ির চিন্তে ছেড়ে—

গাচ্ছিল [উঁচু দিকে মূখ কোরে]

—এই পুরবীর খেয়াল।

[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া,

হুয়া ক্যা হুয়া, রে ক্যা ক্যা ক্যা।

গোলাপী। [কাণে হাত দিয়া] বাপ রে,

মালাম! তোমার আর গাইতে হবে না।

রাম। দেখলে?

গোলাপী।—শুনলাম বটে। বেশ গান।

রাম। তবুও সেটা গাই নি।

গোলাপী। সে আবার কোন্টা?

রাম। তবে শোন। [গীত ধরিল]

তোরে না হেরে রে মোর—আন্দাজ,

হয় দিনে গড়ে—

বার পঁচিশ চাঁদপানা ঐ মূখখানি

তোর মনে পড়ে।

যেমন মূই উঠি ভোরে,—

পূবে চাই পঁচিমে চাই, কোথায়

দ্যাখিনে তোরে,

তেখন প্রাণ কেঁদে উঠে, ভেউ ভেউ কোরে;

বলতে কি—তখন রে মোর জানটা আর

থাকে না ধড়ে।

যেখন গো বেলা দুকুর—

বেড়ুল হয়ে দেখছি যেন তোরে আর

সেই পানা পুকুর;

পরে দ্যাখি শূয়ে শূয় কলে কুকুর,

তেখন মোর ডুকরে ডুকরে

পরাণ যে কেমন করে।

বিকলে নেশার ঝোঁকে,—

মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পরাণ

দ্যাখিছ তোকে

পরে আর, দ্যাখতি পাইনে সাদা চোখে—

তেখন মোর গলার কাছটা কি যেন রে

এঁটে ধরে।

রাস্তিরে ঘূমের ঘোরে,—

স্বপ্নে মূই দ্যাখি তোরে, তার পরে

ঘূম ভেঙে, ওরে—

উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস কোরে,

কলাগাছ পড়ে যেমন চৈস্তির কি

আশ্বিনের ঝড়ে।

বটে তুই থাকিস দূরে,

থাক না তুই পাবনা জেলায়

আর মূই থাকি হাজিপুরে,

তবু জান উজান্ চলে ফিরে ঘূরে,—

যেথাই র'স তোরই জন্যে মোরি মাথার

টনক নড়ে।

রাম। কেমন!

গোলাপী। বেশ!—তোমার এত পীরিত

কার সঙে হোল?

রাম। তবে বলব সত্যি কথাটা? তোর

সাথ গোলাপী, তোর সাথ। যে দিন মূই

তোরে, সেই হাঁসখালির ডোবার ধারে দ্যাখি-

ছিলাম, সে দিন থেকে [করুণস্বরে] কি

বলব গোলাপী, মূই মরে' বেঁচে আছি। তোর

যে কত তল্লাস করিছি, তার আর কি কইব

মূই। [চক্ষু মূছিল]

গোলাপী। তা আমার সঙ্গে পীরিত করে'

কি হবে? আমার যে সোয়ামী আছে!

রাম। মোর কাছে কেন আর ঢাকিস্

গোলাপী? তোর স্বামী ত দশ বছর ফেরার।

সে কি আর আছে? সে মরেছে।

গোলাপী। তা' হ'লেও বিধবার কি বিয়ে

হয়?

রাম। তা হয়, আজকাল নতুন আইনে মূই

শূনিছি। মোদের কেপ্টনগরে তা হয়েছে—কি

বলে—বিদ্যাসাগরের মতে।

গোলাপী। তা' হ'লে যে জাতে ঠেলা কৰ্বে

লোকে। নইলে তোমাকে বিয়ে কর্তে আর

কি?

রাম। [আবার করুণ স্বরে] তা করুক,

তোরে নিয়ে আমি দ্যাশত্যাগী হব গোলাপী।

গোলাপী। [সস্মিতমূখে] কেন, তোমার

এত দিন বিয়ে হইনি?

রাম। বিয়ে কোথায়? একবার কোন্

ছেলেবেলায় হইছিল—সে ভুলে গিইছি। হঃ,

সে আবার বিয়ে!

গোলাপী। কেন? সে বোঁ কোথা?

রাম। আরে রাম! সে আবার বোঁ! সে

মরেছে।

গোলাপী। কিসে মলো?

রাম। কিসে আবার। অপঘাতে।

গোলাপী। কি? বজ্রাঘাতে?

রাম। বজ্রাঘাত নয় চপেটাঘাত—[একটু হাসিল; ভাবিল ভারি রসিকতা করিয়াছে।]

গোলাপী। সে কি রকম?

রাম। এই—তা তোর কাছে আর মদুই মিথ্যে কইব কেন? তুই আর মদুই এখন ত এক জান। কেবল খড়ু আলাদা। তবে যদি তুই কাউকে না বলিস্—

গোলাপী। [সকৌতুহলে] না কাউকে বল্বে না—

রাম। তবে শোন। আমার বিয়ে হয় সূজামুটা পরগণার হিঁগুংডে গাঁয়ে—কি?

গোলাপী। না একটা পিপড়ে। তার পর?

রাম। তার পরে এক দিন কি কথায় মদুই তার রগে এক চড় দেলাম। যে দেওয়া, আর সেই সে ঘুরে পড়ল। আর যে পড়া, সেই মরা। মোর শালা বল্লে যে, মোর শ্বশুর পদলিশ ডাক্তে গিয়েছে। এই শ্বশুরেই মদুই চম্পট! কি—চমকালি যে?

গোলাপী। না না। তোমার শ্বশুরের নাম কি?

রাম। গোকুল মাইতি। শালার নাম নীল-র্নিণ।

গোলাপী। তোমার নাম?

রাম। মোর আসল নাম বেচারাম। কিন্তু সেই দিন হতে মদুই নাম ভাঁড়িয়ে হলাম রাম-কান্ত।

গোলাপী। এ কথা সত্যি?

রাম। তোর গা ছুঁয়ে বল্ছি। সে বোঁ মরেছে। মদুই পদলিশের ভয়ে ফেরার হয়ে কেষ্ঠনগরে গোবিন্দবাবুর বাড়ী নকরি নেলাম। নৈলে মোর বাপ বড়মাইনুশ। নকরি না কল্লেও চলে। কি উঠিস্ যে গোলাপী! মোরে পদলিশ ধরিয়ে দিবি না কি? না গোলাপী, মদুই তোর পায়ে ধরি, ধরিয়ে দিসনে। [এই বলিয়া সে গোলাপীর পায়ে ধরিতে গিয়া ভুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।]

গোলাপী। না না ছাড়। ধরিয়ে দেব কেন? [স্বগত] তবে ত দেখাছি এই ত আমার ফেরার স্বামী। [প্রকাশ্যে] তুমি যে আমাকে বিয়ে কর্তে চাচ্চ, তা আমি কার মেয়ে, আমার স্বভাব

চরিত্র কেমন, এ সব না জেনে এক অজানা অচেনা মেয়েমানুষকে বিয়ে কর্বা?

রাম। সত্যি কথাটা কি, মদুই শ্বশুরেই যে তোর স্বভাব চরিত্রটা ভালো নয়। তা মোরই বা সেটা এমন কি ভালো? তোরে মদুই এমনি ভালোবাসি যে ও সব ভাববার সময় নেই। তোরে মদুই সাধি না কল্লে মোর জান যাবে।

গোলাপী। তুমি এখানে মাঠাকরুণকে নিতে এসেছ। কবে ফিরে যাবা?

রাম। সত্যি কথাটা কি? মাঠাকরুণ বাড়ী থেকে রাগ করে চলি আইছে। বাবু ত তার আসার পরে আন্দাজ তিন মাস খুব নাতি খাতি নাগল। তার পর একদিন মোরে কয় 'রামকান্ত!' মদুই কই 'এজ্জে'! বাবু বলে 'রাম, তোমার একটা কাম কর্তি হবে বাবু,' মদুই কই, 'কি কাম?' বাবু কয় 'এই ইস্তিরিকে তার বাপের বাড়ী থেকে ফিকির করে' নিয়ে আসতি হবে।' মদুই ত তাতে নারাজ—সে এক দজদাল মেয়ে। মদুই তো ঘাড় নেড়ে কই 'তাই ত—সে বড় শক্ত কাম, মদুই কর্তি পার্বে না।' তার পর কি না বাবু কয় 'যদি বাবু এটি কর্তি পার ত তোমারে পঞ্চাশ টাকা বক্শিশ দেব।' তেখন মদুই কই 'বাবু—হে' হে' রামকান্তের অসাধি কি—এ ত সোজা কতা।' তার পরে মদুই এমন এক ফিকির বাবুকে বল্লাম যে, বাবু কয়, 'বেশ বেশ রামকান্ত বেঁচে থাক্ বাপু।'

গোলাপী। কি ফিকির?

রাম। তা তোরে আর কইতি কি—মদুই বল্লাম যে, মাঠাকরুণকে বল্বে যে বাবু আর একটা বিয়া কর্তি যাচ্ছে! তা'লে কি আর মাঠাকরুণ দৃন্দু নিশ্চিত হয়ে থাক্তি পার্বে?

গোলাপী। তোমার খুব বৃদ্ধি ত।

রাম। হুঁ হুঁ—মদুই এখন সেথা মাইছি। কালই বেহানে মাঠাকরুণকে বাবুর ওয়ানে নিয়ে গিয়ে বক্শিশ আদায় করে' তবে নিশ্চিত। বাবু নোক ভাল। যো কতা একবার দেয়, তার লড়চড় হবার যো নেই।

গোলাপী। তবে ত ভালো। তবে কাল আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল! সেখানে গিয়েই বিয়ে হবে খনি।

রাম। তা আর কৈতে আছে! আর মদুই

অনেক টাকা জমিইছি—গোলাপী! মোর বিয়ের পর আর নকরি কর্ত্ত হবে না।

গোলাপী। বটে, কত টাকা?

রাম। তা মই কইতি পারি না। এক মহাজনের কাছে রাখছি। সে মোর বড় দোস্ত।

গোলাপী। বটে!—তবে আর কি তুমি এখন যাও, আমিও যাই। কাল সকালে আমি কাপড় চোপড় নিয়ে নীলরতনবাবুর বাড়ীতে তৈরী থাকব।—নীলরতনবাবু বাসা বদলেছেন জানো?

রাম। তুই তাঁদের চিনিস্ না কি?

গোলাপী। চিনি বই কি?

রাম। তবে ফিকিরটা বলে' দিস্নে যেন তাদের।

গোলাপী। আঃ রাম! তাও কি হয়। আমি হব তোমার স্ত্রী।

রাম। তা নীলরতনবাবু বাসা কোতা করেছেন?

গোলাপী। ঐ নতুন বাজারে চৌরাস্তার সম্মুখে! লোককে জিজ্ঞাসা কল্লেই বলে' দেবে 'খুনি—ঐ রাস্তা দিয়ে বরাবর পশ্চিম দিকে চলে' যাও।

রাম। আচ্ছা তবে মই যাই। মনে থাকে যেন গোলাপী। [পরে সাদরে গোলাপীর গলদেশ ধারণ করিয়া] তবে গোলাপী?

গোলাপী। কি?

রাম। একটা—

গোলাপী। ছাড় ছাড় ঐ লোক আসছে। [রাম গলদেশ ছাড়িয়া দিল।]

রাম। তাই ত—তবে মই এখন যাই।

[সতৃষ্ণ নয়নে গোলাপীর প্রতি বারবার চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।]

গোলাপী। কি আশ্চর্য্য! এতদিন পরে ফেরার স্বামীর সঙ্গে এখানে কি না হুগলিতে সাক্ষাৎ!—ও এখনো জানে না যা, আমি ওর স্ত্রী। এখনো বলা হবে না। একটু মজা কর্ত্ত হবে ওরে নিয়ে। যাই ছোট দিদিমণিকে সব বলিগে যাই! ওর অনেক আগে আমি যাব' খুনি—ওরে যে ভুল রাস্তা বলে' দিইছি। লোকটা মূর্খসূর্খ বটে, কিন্তু সরল ধাতুর গনুষ। ফের প্যাঁচ নেই। আর ও যে রকম

মজেছে, ও আমার হাতের পদতুলটি হয়ে থাকবে। আমিও ঐ রকম বোকা সরল লোক ভালোবাসি। তাদের বেশ খেলানো যায়। আগে বেশ একটু ঘোল খাওয়াতে হবে। তার পরে শোধ বোধ। যাই বেলা গেল।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

কাল—সন্ধ্যা।

নির্ম্মলা, চপলা ও তাঁহাদের প্রতিবেশিনীস্বর প্রমদা ও সারদা একটি বিছানায় বসিয়া তাস খেলিতে নিযুক্ত

চপলা। [তাস কুড়াইয়া] এবার এস ত!—বিন্ত—

প্রমদা। [তাস তুলিয়া] আমারও বিন্ত—

চপলা। তোমার ও ছুটো বিন্ত রেখে দাও। কি বড়?

প্রমদা। সাহেব বড়—

চপলা। তোমার বিন্ত পেলে না। আমার বিবি বড়।

প্রমদা। পেলাম না!—আমার যে সাহেব বড়—

চপলা। হলোই বা সাহেব বড়। সাহেবের চেয়ে আজকাল বিবি বড়। বিশ্বাস না হয় কল্কাতায় গড়ের মাঠে দেখে এস গিয়ে। তোমার বিন্ত পাবে না—

প্রমদা। তোমার কথায় নাকি?—আমার বিন্ত রৈল। বলে' রাখলাম কিন্তু—

সারদা। আর তক্রারে কাজ কি? আমার হাতে ইস্তক পণ্ডাশ।—এই দেখ—[তাস দেখাইলেন।]

চপলা। [হতাশভাবে] ইস্তক পণ্ডাশ!—আচ্ছা পেলে।

সারদা। তবে ধর পণ্ডা।

চপলা। পণ্ডা ধর্বে কি? ইস্তক পণ্ডাশের কাগজে পণ্ডা হয় না।

সারদা। মাইরি!—চাঁদবদনি!—ধর পণ্ডা— [পণ্ডা ধরিলেন]

চপলা। ধর্বে?—ধর!—তুমিও ধর, আমিও ধরি। এস ধরারি করে' তুলি। [উঠাইয়া দিলেন।]

প্রমদা। এ কি ভাই জোর না কি? [পঞ্জা ধরিল।]

নির্মলা। কি করিস্ চপলা, খেলে যা না। ধরলেই বা পঞ্জা।

সারদা। দেখ দেখি!—সব রকম জ্যেষ্ঠা সওয়া যায় ভাই, মেয়ে জ্যেষ্ঠা সওয়া যায় না। লেখাপড়া শিখলে সব মেয়েই এই রকম জ্যেষ্ঠা হয় নাকি?

চপলা। আচ্ছা, তোমাদের পঞ্জা দিলাম। ভয়ই বা কি? আমরা ছক্কা ধব্ব্ব।

গোলাপীর প্রবেশ

গোলাপী। ছোট্টাদিদিমণি, একবার এদিকে আসুন ত একটা দরকারী কথা আছে।

নির্মলা। রোস যাচ্ছে।

চপলা। শুনাই আসিনে কি কথা! তোমরা ততক্ষণ তাস্ দাও। [গোলাপীকে] আচ্ছা চল্ ঐ পাশের ঘরে।

[গোলাপীর সহিত প্রস্থান।

প্রমদা তাস দিতে লাগিলেন

প্রমদা। চপলের আর সব ভালো, কেবল একটু জ্যেষ্ঠা। মেয়েমানুষ নরম সরম না হলে ভালো দেখায় না।

সারদা। তারই জন্যে ত আমি মেয়েদের অমন জুতো মোজা পায়ে দিয়ে যেখানে সেখানে হেঁটে বেরোনো পছন্দ করিনে।

নির্মলা। এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ। কি না—আমার চেয়েও চার বছরের ছোট।

প্রমদা। তোমার বয়স কত?

নির্মলা। এই ১৭ বছরে পড়েছি।

সারদা। নে ভাই আর জ্বালাস্ নে। তোর বয়স ২১ বছরের এক দিনও কম নয়। আর চপলাও ১৬ বছরের হবে। তবে দেখায় বটে ছেলেমানুষ। বয়স সকলের বাড়ছে বৈ ত আর কমছে না দিদি।

প্রমদা। হ্যাঁ, আমারই বয়স প্রায় ডেড় কুড়ি হতে চলে। অথচ সারদা দিদি ত আমাকে জন্মাতে দেখেছে বলেই হয়।

সারদা। দেখ প্রমদা, তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচা যায় না। তোর বয়স ডেড় কুড়ি হোক, আমার বয়সের কথা তুই কসনে বলছি। ছুড়ীর আঙ্গুষ্ঠ দেখ না।

নির্মলা। চপলা কোথায় গেল? [হাতের তাস দেখতে বাস্ত।]

রামকান্তের প্রবেশ

রাম। [সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নির্মলাকে] মাঠাকরুণ! পেরণাম হই।

নির্মলা। [চমকিয়া] কি রাম, কোথ-থেকে?

প্রমদা। এ আবার কে?

সারদা। [নির্মলাকে] তোর শ্বশুরবাড়ীর লোক বৃষ্টি।

নির্মলা। হ্যাঁ। [রামকে] বাড়ীর সব ভালো ত?

রাম। ভাল ত। তবে কর্তা ত রেগে একটা নতুন বিয়ে কর্তি যাচ্ছে।

প্রমদা। বলিস্ কি?

সারদা। [নির্মলাকে] এ ক্ষেপা না পাগল?

রাম। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া] তিনি ত আপনারে খবর দিতে চায় না। মূই আপনা থেকে আলাম। ভাবলাম সেটা কি ভাল হয়?

প্রমদা। বলিস্ কি? বাবুর আবার বিয়ে?

সারদা। পুরুষগুলোর কি লজ্জা সরম কান্ডজ্ঞান নেই? কবে বিয়ে?

রাম। এই দোসরা বশেখ। বাড়ীতে ঘটা টটা হবে না। কেবল বিয়ে।

প্রমদা। পাত্রী কোথায় ঠিক হোল?

রাম। মেয়েটা ঐ পাবনা জেলায় কি বলে—ঐ এক—কে যে হাকিম আছে—হ্যাঁ হ্যাঁ মহেশ ভাচার্য্যের মেয়ে। মেয়েটা দেখতে যেন মেম।

প্রমদা। বাবু আবার বিয়ে কর্তে গেল কেন?

রাম। তা মূই কি কব্ব্ব? কত মানা কল্লাম। বাবু শোনে না।

প্রমদা। সম্বন্ধ করে' দিল কে?

রাম। ঐ কে—[মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে] তার নামটা খেয়াল হচ্ছে না। সে—সে দিন তিন ঘণ্টা ধরে' বাবুকে ভজালো। বলে, বাবুর এ তিন পরিবারে ত কোন নাতি পুত্রি হ'ল না। কুল রাখে কে!—মেয়েটা শূনি

খবর ফরসা। বাবু, তারে দেখেই পদরুত ডেকে
দিন ঠিক কর—এই দোসরা বশেখ।

সারদা। আজ কোন্ তারিখ? ২০—এ
চৈত্রির না?

প্রমদা। গায়ে হলুদ এখনো হয় নি?
[নির্ম্মলাকে] তুমি দিদি কালই চলে' যাও।
কথাটা ত ভালো নয়!

নির্ম্মলা। আমি নিজে থেকে প্রাণ গেলেও
সেখানে যেতে পার্ব না। আমি গলায় দাঁড়
দেব। আত্মহত্যা কর্ব।

প্রমদা। তা স্বামীর বাড়ী ত নিজের
বাড়ী। নিজে থেকে গেলেই বা?

সারদা। তা'ও কি হয়! সেই যে ছবি
পাঠানো হইছিল? তাই দেখেই বা রেগে মেগে
বিয়ে কর্বার মতলব করেছে—কে জানে?

চপলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। দেখ্ দেখি চপল তুই কি কর্তে
কি করিল। সেই ছবি পেয়ে উনি আর এক
বিয়ে কর্তে যাচ্ছেন। এই চাকর নিজে থেকে
খবর দিতে এসেছে। তুই ত সব গোল পাকালি
ভাই। [ক্রন্দনোপক্রম]

সারদা। জ্ঞান ও সব ইন্সকুলে পড়া মেয়ে-
দের সবই বিদ্বন্টি।

প্রমদা। একটু পড়তে শিখে ভাবে যেন
সংসারে সব জানে। তুইই ত ভাই এই গোলটা
পাকালি।

চপলা। [সম্মিতমুখে] তুমি কিছ্ ভেব
না দিদিমণি; কিছ্ গোলযোগ হইনি।
[রামকে] তোমার নাম রামকান্ত?

রাম। এজ্ঞে!

চপলা। কে আছে এখানে, পদলিশ ডাক।
শীঘ্র পদলিশ ডাক।

রাম। [সভয়ে] এজ্ঞে বাবু বিয়ে কর্তে
যাচ্ছে ত মদুই কি কর্ব?

চপলা। আমাদের সঙ্গে চালাকি! তোমার
নাড়ী-নক্কর সব জানি। তোমার আদত নাম
বেচারাম—নয়?

রাম। [সভয়ে] এ—এজ্ঞে। কেমনে
জানলে?

চপলা। এত দিন ফেরার হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে
লকিয়েছিলে, বটে! তার ওপর আমাদের কাছে

মিছে কথা?—বাবু বিয়ে না? পদলিশ ডাক
বল্ছি কেউ। ফেরারী আসামী পাওয়া
গিয়েছে, ছাড়া হবে না। রোস, তোমায় চপ্
করে' খাব। এই কে আছ একে বাঁধ, আর
পদলিশ ডাক।—বাবু বিয়ে?

রাম। [কম্পিত দেহে সরোদন স্বরে] এ
—এজ্ঞে—না—না—মদুই সত্যি বল্ছি। মোরে
পদলিশে দিও না।

চপলা। এক্ষণি বল্। বাবু বিয়ে?

রাম। এজ্ঞে না।

চপলা। তবে এক্ষণি মিথ্যে বল্ছিলি
কেন?

রাম। এ—এজ্ঞে—বাবু বল্তি বলে' দিই-
ছিল।

চপলা। তোরে এখানে কে পাঠিয়েছে?

রাম। এ—এজ্ঞে বাবু।

চপলা। কেন?

রাম। মা ঠাকুরদুগকে নিতি। বাবু করে
দিল যে তোরে মাঠাকুরদুগকে ছল করে' নিয়ে
আসতে পারিস্, যাতে মাঠাকুরদুগ না জাম্ভিত
পারে যে বাবুই তারে আস্তি নোক পেঠিয়েছে?
মদুই বল্লাম, না বাবু মদুই মিথ্যে কইতি পার্ব
না। আর মাঠাকুরদুগের সাথ চালাকি কি কর্তে
পারি, তা বাবু ছাড়ে না। মদুই দ্যাখলাম, রাম
মাল্লে মরিছি, রাবণ মাল্লেও মরিছি। কি
করি? বাবু যা বল্লে, তাই কর্তি রাজি
হ'লাম।

চপলা। [নির্ম্মলাকে] নেও দিদিমণি
হল'!

নির্ম্মলা। [প্রসন্ন] বটে! আমার সঙ্গে
এত দূর চালাকি, তাকে একটু জ্বন্দ কর্তে
পারিস্ চপল?

প্রমদা। তা'লে যেমন কুকুর তেমন মদুগুর
হয় বটে।

চপলা। সে ভার আমার। তাঁকে বেশ মদুই
এক চুবনি দেওয়া যাবে' খনি! [রামকে]
দেখ্, তোরে মদুনিবের সঙ্গে একটু তোরে চালাকি
খেলতে হবে।

রাম। মদুনিবের সামনে মদুই মিথ্যে কইতি
পার্ব না।

চপলা। ভারি সত্যবাদী! তোরে মাঠাকুরদুগ
সাক্ষাতে সটাং মিথ্যে বল্দি—আর বাবু

সাক্ষাতে মিথ্যে বলতে পারিস্ নে! নইলে পদূলিশে দেব, মনে থাকে যেন।

রাম। [পদূলিশের কাম্পিত] এজ্ঞে তবে যা কর্ত্ত কও তাই কর্ব্ব।

চপলা। আচ্ছা কি বলতে হবে, পরে বলব'খন এখন যা!

রাম। [যাইতে যাইতে] গোলাপীর শেষে এই কাজ। এখানে এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আগে তার সাথে দেখা হোক্। পরে তার সাথে বদ্বোপড়া আছে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। [চপলাকে] কি করে' জব্দ করা যায়?

চপলা। ব্যস্ত হও কেন? দেখো না তোমার সামনেই তাঁরে বেশ ঘোল খাওয়াব, আর ভেড়া বানাব।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের শয়ন-ঘর।
কাল—প্রথমরাতি।

গোবিন্দ একটা টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন

গোবিন্দ। রামা বেটার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না যে! বেটা রাস্তায় নিশ্চয় মরেছে। সত্যি সত্যিই স্ত্রীর জন্যে আমার মনটা কেমন কচ্ছে। ইন্দু আজ আবার চিঠি লিখেছে যে, তার হঠাৎ জ্বর-বিকার হয়েছিল, তবে বাঁচবার আশা এখনও আছে। সত্যি না কি! যা হোক্ তা হোক্, সে এলে বাঁচি। একবার নিজেই যাব নাকি!

বালকবেশে চপলার প্রবেশ

গোবিন্দ। কে হে ছোকরা, কথাবাস্তা নেই, তুমি যে একেবারে হন্ হন্ করে' শোবার ঘরের মধ্যে চলে' আস্ছ।

চপলা। [সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া একেবারে কোণে গিয়া ছাতি রাখিয়া বিছানায় উপবেশন] এঃ, জুতোটা ভারি আঁটো হয়েছে। এই কে আঁছিস—জুতোটা খুলে দে ত—আপনার নাম গোবিন্দবাবু! ভদ্রলোক এল, পান আন্তে বলুন না। না, আমি তামাক খাই

না। উঃ! ক্ষিদেও পেয়েছে। এখানে কে আছে ঝি, ও ঝি।

ঝির প্রবেশ

চপলা। দেখ্, এক সের খুব ভালো সন্দেশ, এক পোয়া বাদামতন্তু—যেন পচা না হয়—বাজারের কচুরি আমি খাই না। ঠাকুরকে বল্ যে শীগ্গির খান কুড়িক লুচি ভেজে এনে দেয়। শীগ্গির চাই। আর আট পয়সার গোলাপী খিলি। [গোবিন্দকে—ঘরে বোধ হয় ভালো আঁব নেই?] গোটা দুই ভালো নেংড়া পাস্ যদি নিয়ে আসিস্।—নতন উঠেছে টাকায় চারটে করে'—শীগ্গির নিয়ে আয়। [গোবিন্দকে—একটা টাকা দেন ত।] বাঃ! এই বালিসের নীচে টাকা রয়েছে যে। এই নে [বালিয়া একটা টাকা বনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।]

ঝি। এ আবার কে রে? বাবুর সম্বন্ধি বদ্বি।

[টাকা লইয়া প্রস্থান।

চপলা। আপনার বাড়ীটি ত বেশ। কটা ঘর? খাসা বারান্দা আছে দেখ্ছি। [উঠিয়া পরিভ্রমণ] বাঃ খাসা খোলা ত। দক্ষিণ দিক্ এইটে না! এখানে একটা জানালা বসিয়ে নেবেন।

গোবিন্দ। [তিনি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া বালকবেশী চপলাকে দেখিতেছিলেন, এখন বাক্যযন্ত্র পরিচালনক্ষম হইয়া কহিলেন] আ—আপনার নাম?

চপলা। পশ্চিমদিকেও ছোট একটু বারান্দা আছে দেখ্ছি। ওটা কি? বাজার না? এখেন থেকে কলেজ কত দূর? কি? আমার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন। আমার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী—

গোবিন্দ। [স্বগত] চেহারা দেখেও নামটা হৃদয়নাথ হৃদয়নাথ বলেই বোধ হচ্ছে। বেশ মোলায়েম চেহারাখানি।

চপলা। আপনি বোধ হয় আমার মাথায় এত বড় পাগড়ি দেখে আশ্চর্য হছেন। এ পাগড়ি স্বয়ং আকবর সা—আকবর সার নাম অবশ্যই শুনছেন—তিনি নিজের হাতে আমার প্রপ্প্রপ্প্রপ্প্র পিতামহকে—কটা 'প্র' হলো!

৬টা ত? তাহলেই হয়েছে—অর্থাৎ আমার এক পূর্ব পুরুষকে দিয়ে যান। তার পর ১৭০৭ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁ আমার প্রপ পিতা-মহের কাছ থেকে রামনগরের যুদ্ধে তাঁরে হারিয়ে এটা কেড়ে নেয়। পরে আর এক যুদ্ধ হয়—সেটা বর্ষ রাবণপুর—সেখানে তিনি আলিবর্দীকে হারিয়ে এটা ফিরে পান। তার পর থেকে এ পাগড়ি বরাবর আমাদের বাড়ীতে আছে! একবার নবাব খাজা খাঁর এটির প্রতি লোভ হয়। তা নিতে পারেন নি।—আমার প্রপিতামহ রাজা প্রচীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে প্রতাপগড়ে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাতে তিনি হটে যান। একটা গুলী তাঁর ডান চোখে লাগে, তাতেই তিনি কাণা হয়ে যান। বোধ হয় জানেন, নবাব খাজা খাঁর এক চোক কাণা ছিল।

গোবিন্দ। | অনামনস্কভাবে। না, সেটা আমি অবগত নই।

চপলা। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। এক বেগম তিনি আমার পিতামহ রামরতন চৌধুরীকে দিয়ে যান। আর একটি বেগমের বিষয় ইতিহাসে কিছু লেখে না।—বাঃ! পান সাজা রয়েছে—যে—তা এতক্ষণ বলতে হয়! না, আপনার উঠতে হবে না—আমিই হাত বাড়িয়ে নিচ্ছি। [একটি পান লইয়া চর্ষণ] বাঃ! সর্ব্বৎও রয়েছে—পানটা আগে খেয়ে ফেললাম। আমার বাড়ী কোথায়, তা জানতে বোধ হয় আপনার কোতুল হলে হচ্ছে। সে শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন। আমার জন্ম হয় ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে। ম্যাডাগাস্কার কোথায় জানেন? ইটালি বলে' যে একটা সহর আছে, তারই ঠিক একেবারে ধারে। উত্তর দিকে।—না না উত্তরপশ্চিম কোণায়। সেখেন থেকে দেখা যায়।—আমার রং তাই এত ফর্সা। সেখানে আমার মা প্রতি বছর একবার করে' যান। সেখানে এখনও আমাদের একটা বাড়ী আছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ দীনের বাড়ীতে হঠাৎ—

চপলা। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে এইছি কেন? কেন' তাতে আপনার আপত্তি আছে? আপনার কাছে একটু প্রয়োজন আছে। বল্ছি—হাঁফ জিরিয়ে নেই আগে। যে ঘুরিছি আজ! কোথায় কৃষ্ণনগর, কোথায় হুগলি।—আপনার

শ্বশুরবাড়ী হুগলি না? আমি সেখেন থেকেই আস্ছি। আপনার শ্বশুর আমাদের তালুকদার, তা বোধ হয় জানেন?

গোবিন্দ। না, সেটা এত দিন জানা ছিল না।

চপলা। বাবা আমায় জমীদারী কাজ শেখাবার জন্য বলেছেন যে, আমায় নিজেই খাজনা আদায় কর্তে বেরোতে হবে—তাই আমি বেরিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য, দেশ দেখে বেড়ান, আর আপনার মত দশ জন ভদ্রলোকের' সঙ্গে আলাপ করা। বাবা ভারি কড়া লোক। খাজনা কারও বাকি থাকবার যো নেই। বাকি হইলেই ডিক্রি জারি। আপনার শ্বশুরালয়ে খাজনা আদায় কর্তে গিইছিলাম। তা কাল সেখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে সব খাজনা বকেয়া হয়ে গেল। বাড়ীতে এমন দুর্ঘটনা, কি করেই বা খাজনা চাই? কিন্তু এক হপ্তা পরে আবার যেতে হবে। তখন আপনার শ্বশুর খাজনা দিতে না পারলে আমার তাঁর নামে ডিক্রি জারি কর্তে হবে। বাবার ভারি কড়াকড় হুকুম। কি কর্ব বলুন!

গোবিন্দ। [উৎকণ্ঠিত স্বরে] তাঁর বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বলতে পারেন?

চপলা। তা ঠিক জানি নে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে। শুন্ছি।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—কোন'টি?

চপলা। তা জানি নে: বড়টি কি ছোটটি। যেটির বিকার হইছিল।

ঝির জলখাবার লইয়া প্রবেশ

চপলা। এই যে জলখাবার এয়েছে। ঝি, এক গেলাস জল। [ঝির প্রস্থান] এখেনে বরফ পাওয়া যায় না? তাহোক্ [আহারান্তে] কিছু মনে কর্বেন না। বাঃ, এখেনে খাসা জলখাবার পাওয়া যায় ত। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপ্ৰিয়া ফরমাজ না দিলে ভালো পাওয়া যায় না শুন্ছি। সঙ্গে দু' হাঁড়ি নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়। আজ আমি এখেনে থাকব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।—আপনার বাড়ীটা আর একটু রাস্তার ধারে হ'ত ত খেতে খেতে রাস্তার লোকের যাতায়াত দেখা যেত। ওটা দেখতে আমি বড় ভালোবাসি। [আহার শেষ

করিয়া সর্ষৎ পান করিয়া পান খাইয়া শয়ন।
আঃ, বাঁচা গেল। আমি এই খাটেই শোব'খন।
আপনি অন্যত্র শোবেন। আপনি ভারি ভদ্রলোক
দেখছি। আপনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন?
আপনার শ্বশুরের নামে ডিক্রিজারি করা বাবার
হুকুম না হ'লে সেটা রহিত কর্তাম। আচ্ছা
দেখুন, আপনার খাতিরে না হয় এক মাস কাল
অপেক্ষা কর্তে পারি। তাঁদের বাড়ীতে দুর্ঘটনা
—আর আপনার মত ভদ্রলোকের শ্বশুর। না,
মেয়েটি বৃষ্টি মরে নি। তবে মরমর বটে।

গোবিন্দ। [সাগ্রহে। তবে এখনও বেঁচে
আছে।

চপলা। হাঁ,—মরার দাখলই। কলকাতার
নয়নচাঁদ সার্বভৌমকে চেনেন। সে ভারি মস্ত
কবিরাজ। সে একবার তিন কিলে পিলে
আরাম করে' দিইছিল। আবার এক দিন চুণো-
গিলির এক ফিরিঙি রাগে তার স্ত্রীর মাথা
কেটে ফেলেছিল। পরে রাগ পড়লো নয়নচাঁদ
সার্বভৌমকে নিয়ে এল। তিনি মাথাটা কুকুর
দিয়ে খাওয়ালেন—অমনি আরাম—গোর দিতে
হলো না। তিনি নাকি এক সাপে কামড়ানর
ওষুধ বার করেছেন যে, সাপে কাউকে কামড়ালে
সে ওষুধটা সাপের মাথায় যেই দেওয়া, সেই
সব আরাম।

গোবিন্দ। [সবিস্ময়ে। বলেন কি?

চপলা। আমার ঠাকুন্দীকে একবার একটা
বাঘে কামড়িছিল। সমস্ত ধড়টা খেয়ে ফেলে-
ছিল। নয়নচাঁদ কবিরাজ এল, এসে একটা
গরুর ধড় লাগিয়ে বেঁধে কি ওষুধ লাগিয়ে
দিল, অমনি জোড়া লেগে গেল। আমার
ঠাকুন্দী দিন গেলে বরাবর এক সের দেড় সের
করে' দুধ দিয়ে এয়েছেন।

গোবিন্দ। না না, তাও কি হয়!

চপলা। আশ্চর্য্য! যার কাছে এটা বলেছি,
সেই অবিশ্বাস করেছে; কিন্তু হিন্দুভৈষজ্য
শাস্ত্রে কি সব আশ্চর্য্য ওষুধ আছে, তার ত
খোঁজ রাখে না।

গোবিন্দ। বটে! যে বাঘটা খেইছিল, সে
বাঘটা কত বড়?

চপলা। সে বাঘটা ৩০ ফুট লম্বা আর
পৌনে দশ ফুট উঁচু। ঠাকুন্দী—সেটাকে যে
গুলী মেরেছিলেন, তাতেই ওহুট মেরে পড়ে'

গিয়ে ধরা পড়িছিল। এখন সেটা কলকাতায়
চিড়িয়াখানায় আছে। ঢুকতেই ডান দিকে।

গোবিন্দ। তবে সে কবিরাজকে আনালে
হয়!

চপলা। তা হ'ত। কিন্তু তাঁকে ত আর
পারার যো নেই। তিনি হাওয়া বদলাতে এরা-
কানে গিয়েছেন। [শিষ দিলেন] [বেগে রাম-
কান্তের প্রবেশ ও ভূমিতে লুণ্ঠন।

[চপলার প্রস্থান।

রাম। [ক্রন্দন স্বরে] বাবু কি হবে!
কি হবে!

গোবিন্দ। [ব্যগ্রভাবে] কি! কি!

রাম। মোর গিন্নী ঠাকুন্দী?—ওঃ—
[সুদীর্ঘ নিশ্বাস]

গোবিন্দ। গিন্নী ঠাকুন্দী কি?—জ্বরে
মারা গিয়েছে বৃষ্টি? ওঃ! যা ভেবেছি, তাই।
ওগো, তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো!
[ভূতলে পতন]

রাম। জ্বর-টর রোগ-টোগ কিছু হইনি
গো, রোগ ত তার ছোট বোনটির—মোদের
গিন্নী ঠাকুন্দী—বাবা রে—কি হ'ল রে।—

গোবিন্দ। কি হ'ল, বল্ না শীগঘ্যর
খুলে।

রাম। তাঁর শরীর ত বেশ ছিল—কিন্তু—

গোবিন্দ। কিন্তু কি?

রাম। যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিছে
করে' বলি গো, মিছে করে বলি—সে দিন—
ওঃ—

গোবিন্দ। সে দিন কি?

রাম। তাঁর শোবার ঘরে রাতে দুয়োর
দিয়ে, আফিঙ গুলে—

গোবিন্দ। খেলে বৃষ্টি! [বসিয়া পড়িয়া।
ওগো আমার কি হবে গো! কেন মিছে করে'
বল্তে বল্লাম—

রাম। এজ্ঞে না। আফিঙ খায়নি।—তবে—

গোবিন্দ। [উঠিয়া] খাইনি; আবার তবে
কি?

রাম। আফিঙ গুলে' খানিক ভেবে চিন্তে'
সেটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল।

গোবিন্দ। তবু ভালো। অমন করে' বলে?
ভয়ে আত্মপ্রাণী শূন্যে গিইছিল। [উঠিয়া
গা ঝাড়িলেন]

রাম। কিন্তু—

গোবিন্দ। আবার 'কিন্তু' কি?

রাম। সে ঘরে আড়ায় চারগাছ লম্বা দাঁড়ি ঝুলত। যাতে বিছানা তোলা থাকত গো বিছানা তোলা থাকত—

গোবিন্দ। সে দাঁড়ি কি হয়েছে?

রাম। সে দাঁড়ি খুলে নিয়ে এক সঙেগ লম্বা করে' বেঁধে—উঃ-হঃ-হঃ—

গোবিন্দ। গলায় দাঁড়ি দিল বুঝি?
[বসিয়া পড়িয়া ক্রন্দন]

রাম। এজ্ঞে না, গলায় দাঁড়ি দেই নি—

গোবিন্দ। এ্যাঁ—দেই' নি? [উঠিয়া]
তবে কি হ'ল শীঘ্যর বল্।

রাম। সেই দাঁড়িগুলো একসঙেগ বেঁধে, তার সিঁধুক পেট্রাতে কাপড় গহনা পত্তর পুরে, সেগুলো ত কষে' দাঁড়ি দিয়ে বাঁধল। তার পর সেগুলো নৈহাটি ইন্টিশনে একখানা গরুর গাড়ী করে' কখন যে পাঠিয়েছে, কেউ জ্ঞানিত পারি নি গো—

গোবিন্দ। এ্যাঁ—[বসিয়া পড়িলেন]

রাম। তার পরে সেই যে এক বকা ছোঁড়া তাদের বাড়ী থাকত—তার চেহারাখানা বড় ভালো গো, চেহারাখানা বড় ভালো।—তার সঙেগ একেবারে—উঃ হঃ-হঃ-হঃ—বাবা রে—

গোবিন্দ। নিরুদ্দেশ বুঝি? তোরা পিছন্ন পিছন্ন ইন্টিশনে যেতে পারিলনে?

রাম। যাইনি কি? উঃ—ভন্দর লোকের ঘরে—

গোবিন্দ। গিয়ে দেখলি যে তারা নেই? ওঃ! যা ভেবেছিলাম, তাই সে হতভাগা ছোঁড়ার চেহারা দেখেই খারাপ মতলব টের পেইছি। [ক্রন্দন]

রাম। এজ্ঞে না। মোরা ইন্টিশনে গিয়ে দেখি, মা ঠাকুরগ রেল গাড়ীতে উঠলেন।

গোবিন্দ। এ্যাঁ—তোরাও উঠতে পারিলনে?

রাম। এ—এ—এজ্ঞে উঠেই ত মাঠাকুরগকে সঙেগ করে' নিয়ে আলাম। এই মাঠাকুরগ আপনি আসছে।

[একদিক্ দিয়া রামকান্তের প্রস্থান, অপর দিক্ দিয়া নিম্মলার প্রবেশ।

গোবিন্দ। [মাটিতে পড়িয়া] ওগো!

আমার স্ত্রী কোথায় গেল গো! যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে গো—

নিম্মলা। একবারে যে কে'দে ভাসিয়ে দিলে? আন্তে লোক না কি পাঠাবে না ব'লিছিলে?

গোবিন্দ। [স্বগত] এ কি সত্যই গৃহিণী স্বয়ং উপস্থিত, না স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে মতিভ্রমতি কিম্বিদমিন্দ্রজালম্। সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছে দেখছি। সব রামা বেটার বজ্জাতি দেখছি। ছোকরাটা গেল কোথায়? রামা বেটাই বা গেল কোথায়? [প্রকাশ্যে] তা এ দীনের বাটীতে যে ভবদীয় ব্যক্তির ন্যায় মহতের পদার্পণ হয়েছে—সে আমার ন্যায় হীনজনের সৌভাগ্য! তবে এ ষড়্‌যন্ত্র কেন?

নিম্মলা। তুমিই বা কম করিছিলে কি? তোমার বিয়ে না? কবে? আমরা বরণ-টরণ কর্তে এলাম। বৌ কৈ গো!

গোবিন্দ। পাত্রীটি হঠাৎ মারা গিয়েছে।

নিম্মলা। বটে!—তোমায় দেখে আতঙ্কে না কি?

গোবিন্দ। [স্বগত] আর চালাকিতে কাজ কি? কার কত দূর দৌড় দেখা গিয়েছে। [প্রকাশ্যে] আমারই হার! তোমার জিত। হলো? এই যে ইন্দু, যে, আবার ইটি কে?

ইন্দুভূষণ ও স্ত্রীবশে চপলার প্রবেশ

ইন্দু। তা গোবিন্দবাবু ঠিক বলেছেন। প্রেমের পাশাখেলায় রমণীদের চিরকালই জিত। এখন আপনার সঙেগ—আমার নবোঢ়া বুদ্ধিমতী সুন্দরী পত্নী ও আপনার শ্যালিকা চপলা দেবীর আলাপ করে' দেই। চপলা! ইনিই গোবিন্দবাবু—গোবিন্দবাবু! ইনিই—চপলা। কেমন গোবিন্দবাবু, আমার স্ত্রীটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী কি না?

গোবিন্দ। [অন্যমনস্ক ভাবে] হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু ও'র বুদ্ধিমত্তার এখনও পরিচয় পাই নি।

ইন্দু। পেয়েছেন বৈ কি? এখনই যিনি এই বিছানার উপরে হৃদয়নাথ চৌধুরী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনি ইনি ভিন্ন আর কেউ ন'ন।

গোবিন্দ। [যেন আকাশ হইতে পড়িয়া]

এ্যা—ইনি কি এ'র সহোদরা! একটু মাংসটি বিভাগ করে' নিলে হ'ত না।

ইন্দু। এ দাস তাঁর আজ্ঞাবহ। তাই তাঁর আজ্ঞাক্রমে আমি আপনাকে যথাক্রমে দুইখানি অলীক সংবাদপূর্ণ পত্র লিখেছি। মার্জনা করবেন।

চপলা। স্বামী! তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়ে থাকে যদি, তবে আমার তিনটি প্রার্থনা আমার ভগ্নীপতির সম্মুখে জ্ঞাপন করি।

গোবিন্দ। আজ্ঞা করুন। গোবিন্দচরণ মূখোপাধ্যায় কর্ণস্বয় উচ্চ করিয়া আছেন।

চপলা। প্রথমতঃ নিবেদন—আপনি—আপনার ভার্য্যা অর্থাৎ মন্ডভগ্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করুন। কারণ, আমি শপথ সহকারে বলছি যে, তিনি আপনার সতী সাধনী ও অনুরক্তা স্ত্রী।

গোবিন্দ। তথাস্তু। তবে—

চপলা। [কর্ণপাত না করিয়া] দ্বিতীয়টি এই যে, আপনার বিশ্বাসী ভৃত্য রামকান্তের সম্প্রতি অভূতোচিত ব্যবহার মার্জনা করুন।

গোবিন্দ। তথাস্তু। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—

চপলা। তৃতীয়তঃ, আমাদের বন্ধু শ্রীশরৎকুমার হাজদারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। [উচ্চস্বরে] রামকান্ত ওফে' বেচারাম, আর গোলাপী ওফে' শরৎকুমার।

রামকান্তের ও গোলাপীর প্রবেশ

চপলা। ইনিই উক্ত শরৎকুমার হাজদার, আসল নাম গোলাপী, এ রামকান্তের বহুদিন পূর্বে পরিণীতা ভার্য্যা।

গোবিন্দ। রাম! সত্যি?

রাম। এজ্ঞে, মূর্খবের সামনে কি মিথ্যে কহীত পারি—ইনিই মোর ইস্টদেবতা।

গোবিন্দ। পারিসনে বটে?—তবে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? বেটা আমার সঙ্গে চালাকি?—লাঠিগাছটা গেল কোথা!

চপলা। আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন। আর, কাকেও সাজা দিতে হয় আমাকে দেন।

গোবিন্দ। শ্যালিকার চিরকালই সাত খুন মাফ! আমি যদিও স্বভাবতই 'বল্লাদপি

কঠোরগি', তথাপি দরকার হ'লেই তক্ষণই আবার 'মৃদুগি কুসুমাদপি' হ'তে পারি।

চপলা। গোবিন্দবাবু, স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে নিজে মোটা হওয়া যদিও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার লক্ষণ বলে' আমার বোধ হয় না, তবে আমাদের বিশ্বাস, আপনার নবোঢ়া স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা আছে—সেটা প্রকাশ কর্তে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখিনে। স্ত্রী অভিমান করে, স্বামীর কাছে আদর প্রত্যাশা করে বলে'—স্বামীর কর্তব্য নয় যে, অভিমানকে পায়ে ঠেলা। দুর্বল রমণীজাতির অভিমান আর অশ্রু ছাড়া আর কি প্রহরণ আছে?

গোবিন্দ। কেন? সম্মার্জনী।

[নিম্মলাকে] কি বল?

ইন্দু। সে উনি আপনাকে নেহাৎই আপনার লোক বলেই মারেন—নইলে আমাকে ত আর মার্জনা যান নি—

গোবিন্দ। [নিম্মস্বরে মস্তক-কন্ডুয়নসহকারে] কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাত্রাটা বেশী হয়ে যায় যে—

নিম্মলা। কোন্ শালী আর তোমাকে ঝাঁটার বাড়ি মারে!

গোবিন্দ। দোহাই ধর্ম!—মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘা দিও! সেটা যে মোতাত হয়ে গিয়েছে। অমন সঞ্জীবনৌষধিরস, নিম্পীড়িতেন্দুকর-কন্দজ জিনিষ ছাড়তে আছে?

চপলা। তবে এখন এই বিরহের পালা শেষ করা যাক্—

ইন্দু। রাধিকার বিরহ নিয়ে কত কবিতা নাটক ছড়া হলো, কিন্তু এ বিরহটির বিষয় কেউ লেখে না;—এই দুঃখ। দেখি, যদি কেউ এই বিষয়ে একখান নাটক লিখতে স্বীকার হয়।

চপলা। তবে এখন মঙ্গলাচরণ করে' আপাততঃ পালাটা শেষ করাই বিধেয়।

সকলের গীত

[সুর—বাউল]

পুরোনো হোক ভাল হাজার

হায় গো এমনি কলির বাজার;

মাঝে মাঝে নতুন নতুন

নৈলে কারো চলে না।

নিতাই পোলাও কোম্মা আহার
 বল ভালো লাগে কাহার?
 আমার ত তা দু'দিন পরে
 গলা দিয়ে গলে না।
 দু'চার বর্ষ হ'লে অতীত
 চাষার জমি রাখে পতিত;
 নইলে সে উর্ষ'রা হ'লেও
 বেশী দিন আর ফলে না।
 নিতাই যদি কার্য্য না পাই
 প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই;
 যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও
 কেউ কিছ্‌ই বলে না?

ক্রমাগত টম্পা খেয়াল
 ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
 প্রতাহ অ'সরা দেখলেও
 তাতে মন টলে না।
 এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার
 ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চারবার—
 বিরহ-আহুতি ভিন্ন
 প্রেমের—আগুন জ্বলে না।

যবনিকা পতন

প্রার্থিচও

পদ্য-চরিত

উমেশচন্দ্র লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরেশচন্দ্র চন্দ্র এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র (নব্য হিন্দুগণ)।
গঙ্গারাম চম্পটি (ব্যারিস্টার)। বিনোদবিহারী চক্রবর্তী। ইন্দুমতীর দেবর (গদ্যলিখার)।

স্ত্রী-চরিত

সুকেশিনী (উমেশের স্ত্রী)। সুবোধিনী (রমেশের স্ত্রী)। সুহাসিনী (পরেশের স্ত্রী)।
সুভাষিনী (সুরেশের স্ত্রী)। ইন্দুমতী (নব্য বিধবা)। সরোজিনী (ইন্দুমতীর সখী,
সম্পর্কে ভগ্নী)। রেবেকা (চম্পটীর স্ত্রী)।

প্রস্তাবনা

CHORUS

নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর করো।
নাকগুলো কাটো, কানগুলো ছাঁটো,
পাগুলো সব উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিংবা চিৎপাত হোয়ে পাগুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো;
—নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর করো।
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্গির ধূতিচাদর নিবারণী সভা;
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে;
ধূতি-চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকলে;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো;
—নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর করো।
কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও, কিংবা খুব খানিক লেখো।

Bain Mill ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর করো।
আর কিছুর না পারো, স্ত্রীদের ধোরে মারো;
কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো
—ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক;
বি-এ. এম-এ, ঘোড়সোয়ার, যা
একটা কিছুর হোক;—
যা হয়—একটা করো কিছুর রকম নতুনতরো;
—নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর
করো।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব;
মর্ষে না হয় মর্ষে,—একটা নতুন হবে খুব;
নতুন রকম বাঁচো, কিংবা নতুন রকম মরো—
নতুন কিছুর করো একটা নতুন কিছুর করো।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উমেশবাবুর বহির্বাটী। কাল—প্রভাত।
উমেশ, রমেশ, পরেশ ও সুরেশ হতাশভাবে
আসীন

গীত

সকলে। নাঃ আর ভালো লাগে নাক
প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত
বাঙালীর সব মেয়ে।

উমেশ। না জানে নাচতে না জানে
গাইতে—

রমেশ। না জানে সৌখীনরকম চন্দ্র তুলে
চাইতে—

পরেশ। সভ্যরকম হাসতে—

সুরেশ। সভ্যরকম কাসতে—

সকলে। জানে না;—

উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি হস্তিমূর্খ যেন;

রমেশ। না পড়েছে Shakespeare না

পড়েছে Ganot;

পরেশ। Hockey Tennis খেলতে,—
 সুরেশ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে,—
 সকলে। জানে না;—
 উমেশ। Adam Smith-এর Political
 economy জানে না—
 রমেশ। Malthus-এর Theory of
 Population মানে না—
 পরেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পরতে—
 সুরেশ। Bicycles-এ চড়তে—
 সকলে। জানে না—
 উমেশ। Huxley, Tyndal, Spen-
 cer, Mill-এর ধারণা ধারে নাক—
 রমেশ। Dynamics-এর আঁকও কষতে
 পারে নাক—
 পরেশ। উল বোনা শিখতে—
 সুরেশ। নাটক নভেল লিখতে—
 সকলে। জানে না -
 উমেশ। হাড় জড়ালিয়েছে—
 রমেশ। অর্ধচন্দ্রে গেছে দাদা—
 পরেশ। যা বোলেছো—
 সুরেশ। ঠিক!
 উমেশ। দেখ দেখি এই বিলেত ফের্তাদের
 স্ত্রীগলুলোকে! Societyতে mix কর্তে
 জানে—
 রমেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পর্তে জানে—
 সুরেশ। চা খেতে জানে—
 পরেশ। খবরের কাগজ পড়তে জানে—
 উমেশ। একেই বলে স্ত্রী—
 রমেশ। আহা—
 পরেশ। বাঃ!
 সুরেশ। কেয়াবাৎ।
 উমেশ। না, যত কাঠের পুতুল—
 রমেশ। ওঁচা!
 পরেশ। জড়ভরৎ!
 সুরেশ। সং!
 সকলে। আঃ ছ্যাঃ—
 ক্ষণেক সকলে নিস্তত্ব হইয়া থাকিলেন
 উমেশ। এখন উপায়?
 রমেশ। এ জন্মটা বৃথাই গেছে,—পরজন্মে
 দেখা যাবে।
 পরেশ। আবার জন্ম হলে ত—

সুরেশ। হাঁ, যে পুণ্যের জোর—বলা ত
 যায় না—
 উমেশ। ওহে না হে না! একটা উপায়
 ভাবো—ভাবো—
 পরেশ। [ক্ষণেক চিন্তার পর] আমি
 একটা উপায় ঠাউরেছি—
 উমেশ। কি বল দেখি—
 পরেশ। [পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া] আমি
 বলছি কি, স্ত্রীলোকগলুলোকে টুটি, টিপে
 মেরে ফেলে হয় না? আবার ভাল দেখে বিয়ে
 করা যাবে।
 উমেশ। আরে তা হবে কেমন করে!
 শেষে কি খুনের মকদ্দমায় পড়বো?
 পরেশ। তাও ত বটে!
 রমেশ। স্ত্রীগলুলো যদি নিজে বৃদ্ধি
 কোরে মর্ত্ত ত অনেকটা সর্বাধা হত। তাও
 কি মর্ষে!
 সুরেশ। নেহাইৎ অর্কাবি! দেখো দেখি
 নগেন্দ্রকে please করবার জন্যে কুন্দনন্দিনী
 কেমন টকাশ কোরে মোলো।
 উমেশ। তবে কি করা যায়? কি বল
 সুরেশ!
 সুরেশ। আমি বলি divorce—
 রমেশ। আরে দত্তের divorce—হিন্দু
 আইনে কি divorce হয়?
 রমেশ। তা'লে কি আর ভাবনা ছিল?
 পরেশ। আহা ঋষিরা কি ভুলটাই কোরে
 গেছেন!
 উমেশ। তুমি একটা ঠাওরাও দেখি রমেশ।
 রমেশ। আমি বলি কি, যে আর একটা
 কোরে ভাল দেখে বিয়ে করা যাক না—শাস্ত্রও
 আছে অধিকন্তু ন দোষায়।
 পরেশ। না দাদা, আমি ত উরি মধ্যে নেই।
 উমেশ। কেন?
 পরেশ। শরীরটাকে এখনো বাটোয়ারা
 কোরে দিতে রাজি নই। তার উপর আর এক
 ভয় আছে।
 উমেশ। কি?
 পরেশ। বাবা, এক স্ত্রীতেই বাড়ীতে
 পুত্রকন্যার এক উপনিবেশ স্থাপন কর্তে
 হয়েছে। একাধিক স্ত্রী হলে' কি রাবণের বংশ
 হ'য়ে দাঁড়াবে?

সুরেশ। আরে শোন কেন? এক ঘোড়া
চালাতে পারো না, জুড়ি চালাবে—

উমেশ। তবে কি করা যায় ছাই?

রমেশ। আমি ত আগেই বলিছি, এ
জন্মটা বৃথাই গিয়েছে, পুনর্জন্ম দেখা যাবে।

পরেশ। তবেই ত।

সুরেশ। [হতাশভাবে শিষ দিলেন।]

উমেশ। এই যে মিস্টার চম্পটি আস্-
ছেন—

রমেশ। দেখ যাক্ উনি যদি কোন উপায়
বের করতে পারেন।

পরেশ। হাঁ ওঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক—

সুরেশ। বেশ কথা!

মিস্টার চম্পটির প্রবেশ

সকলে। Good morning চম্পটি
সাহেব—

চম্পটি। Good morning my friends!
—কি এখানে বোসে সব কচ্ছেন কি? What
news?

গীত

উমেশ। হা হা মশর আমরা সবাই পড়েছি
এক ভাবনার—

রমেশ। ভেবে দেখলাম আমাদের আর বেঁচে
কোনই লাভ নাই—

পরেশ। মনে ভারি দুঃখ, স্ত্রীরা গন্ডমূর্খ—

সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে
কি পাবনার—

চম্পটি। Indeed!

উমেশ। এই শুনুন চম্পটি সাহেব,
আমরা ভেবে দেখলাম যে, স্ত্রীগলোকে
টুটি টিপে মেরে ফেলা যায় না।

রমেশ। Divorceও করা যায় না—

পরেশ। আর একটা কোরে বিয়ে করাও
পোষায় না—

সুরেশ। তবে করা যায় কি!

চম্পটি। By Jupiter!—মোটো এই?
এর ত সোজা solution হয়েই রয়েছে।

সকলে। কি রকম কি রকম!

চম্পটি। এই তাদের নামে মকদ্দমা করুন,
Civil suit আনুন।

সুরেশ। দূঃ! কি solution করেন—

রমেশ। মরে' যাই—

পরেশ। স্ত্রীর নামে আবার মকদ্দমা কি!

উমেশ। না, তাও কি কখন হয়?

চম্পটি। হয় না বটে? Bombayর
High Courtএ যদিও একটা ruling আছে;
—তা তবে মকদ্দমা কোরে কাজ নেই; তবে
আর এক কাজ করুন।

সকলে। [সাগ্রহে] কি? কি?

চম্পটি। সে ভারি সোজা—ও হো হো
হো—it is as easy as to drink a peg
of whisky.

রমেশ। তবে ত এ নিশ্চয় খুবই
easy—

চম্পটি। Oh my! এ যে যতই ভেবে
দেখিছি ততই সোজা বোধ হচ্ছে।

পরেশ। বলেন কি!

চম্পটি। ভারি সোজা। — By Venus
and Adonis—You have only to
follow your nose.

সুরেশ। বটে? তার পর?

চম্পটি। Problemটা ত এই যে
আপনাদের স্ত্রীরা uneducated? এই রকম
ত?

সকলে। ঠিক ঐ রকম—

চম্পটি। Well! তা যদি হয়, ত তাদের
educate করুন।

উমেশ। তাও ত বটে—

রমেশ। এ ত ভারি সোজা!

পরেশ। এটা এতক্ষণ আমাদের কারও
মাথায় ঢুকেনি হে?

সুরেশ। কি আশ্চর্য?

উমেশ। কিন্তু মশর! এত বয়সে কি
আর তারা শিখতে পারবে?

চম্পটি। Oh my! খুব পারবে, দুশো
পারবে, পাঁচশো পারবে—আপনারা Ainsli-র
Evidence Act পড়েন নি বড়ি?

উমেশ। না।

রমেশ। মশর! educated হলে তারা
কি কি শিখবে?

চম্পটি। কি কি শিখবে? সব শিখবে।
চলতে, ফিস্তে, নাচতে, গাইতে, হাসতে,
কাসতে, flirt কতে, মূর্ছা যেতে—

পরেশ। বলেন কি! মূর্ছা যেতেও শিখবে?

চম্পটি। Of course! Ladies-রা educated হলে Hobhouse-এর মত মূর্ছা যেতেই হবে।

সুরেশ। আমার মুখ দিয়ে কিন্তু লাল পড়ছে ভাই। কি বলেন উমেশবাবু—আপনি ভাবছেন কি?

উমেশ। আমি ভাবছি যে তবে থাক্।

রমেশ। কি থাক্?

উমেশ। ঐ female education-টা আমার স্ত্রীর একেই hysteria আছে।

চম্পটি। oh dear me!—সত্যি সত্যিই কি মূর্ছা যাবে? সভ্যরকম ভাবে, সুবিধা হলে ও বিশেষ অন্য কোন কাজ না থাকলে,—এই—by way of variety—একটু মূর্ছা যাবে।

পরেশ। কি বল হে।

উমেশ। বলছি কি—যে তবে যেমন আছে থাক না। কে'চো খুঁড়তে সাপ বেরোবে? কাজ কি খুলে ঢাকনা।

সুরেশ। তুমি ত ভারি obstructive—একনি ঠিক হয়ে গেল যে শিক্ষিতা স্ত্রী নৈলে বেঁচে সুখ নাই।—আবার—বলুন চম্পটি সাহেব?

চম্পটি। তা আর বলতে — By Hercules! উমেশবাবু! যদি আপনি বিলেত যেতেন, তা'লে দেখতেন, বিলেতে কোন lady-র গদ্যে কি পদ্যে লিখতে না পারাটা ভৌতিক ব্যাপারের মধ্যে—quite a phenomenon, আর পড়তে না জানা—my goodness! সে আর বলে কাজ কি? —newspaper খাওয়াদাওয়ার মধ্যে। না পড়লে হাঁই ওঠে, গা বমি বমি করে, পেটের অসুখ হয়—এক কথায় সাফ্ হজম হয় না।

পরেশ। বলেন কি?

চম্পটি। বিলেতে lady-রা এতদূর educated হয়েছে যে, আজকাল তারা football পর্যন্ত খেলছে।

সুরেশ। [পরেশকে] আমার যে তাদের সঙ্গে একটা match দিতে ইচ্ছা হচ্ছে হে।—না উমেশবাবু আর কথাটি নেই।

উমেশ। তবেই ত!

রমেশ। আবার তবেই ত কি?

পরেশ। হং. রেখে দাও—একটা নতুন হবে ত।

সুরেশ। হং. পরে যা হয় হবে; এখন একটা নতুন কিছু করো।

বেটা বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদ। মশায় মশায় দেকেন দেকেন, আমারো মাস্করা পিইষে দিইছে।

চম্পটি। Assault? hurt? নালিশ করুন।

উমেশ। কে মাল্লে?

বিনোদ। ঐ দোকানদার।

রমেশ। কেন?

বিনোদ। এই গুর্জার লাইগো।

পরেশ। তুমি গুলি খেয়ে গুলির পয়সা দাওনি বুঝি।

বিনোদ। না। পয়সা দিই নাই।

সুরেশ। তবে মাঝেই ত।

চম্পটি। কেন মাঝে? পয়সার জন্য নালিশ করুক। Civil Suit আনুক। মাঝার right কি। চলুন ত দেখি। লোকটাকে identify কোরে, তার পরে তার নামে summon's issue করাতে হবে, চলুন ত।

বিনোদ। আইসেন আইসেন। দ্যাকেন সাহেব! আমারো মাইর্যা গুরা কৈরা দিইছে। ঐ বেটা ঐ দারিওয়ালা।

[বিনোদবিহারীর শশব্যস্তে প্রস্থান ও কোতুহল-বশে অন্য সকলের তাহার পশ্চাদগমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর বসিবার ঘর। কাল—অপরাহ্ন।

ইন্দুমতী ও সরোজিনী

ইন্দুমতীর গীত

মনের বাসনা মনে বৃষ্টিবা রয়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বৃষ্টি বেলাটি বয়ে যায়।
আসে শূন্য সমীরণ করুণ মর্মর তানে,
'আসেনি আসেনি সে' এ বারতা কয়ে যায়;
ফিরে যাই শূন্য ঘরে বিরহ হৃতাশে;
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হয়ে আসে;
ধিক ধিক এ জীবন, ধিক এ জনম মোরি;
এ যৌবন বৃষ্টি সখি, বিফল হয়ে যায় ॥

ইন্দুমতী। সখি সখি! তুমি কথা কচ্ছনা যে?

সরোজিনী। সখি! আমি বাক্শক্তিহীন হইছি।

ইন্দুমতী। কেন?

সরোজিনী। এই তোমার ভাবগতিক দেখে। বিধবা মানুষ, কোথায় পূজা আর্চনা করবে, ঠাকুর দেবতা মানবে, রত একাদশী করবে! না কেবল যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা।

ইন্দুমতী। কি করবে সখি, আমার মন প্রবোধ মানে না যে।—আমার প্রাণটা যে কি রকম করছে, তা ত তুমি বুঝতে পাচ্ছ না সখি।

সরোজিনী। [সকৌতূহলে] কি রকম বল দেখি!

ইন্দুমতী। এই কি রকম জানো? যেমন কারো গান গাইবার ইচ্ছা আছে অথচ গলা নেই, হাস্‌বার ইচ্ছা আছে অথচ দাঁত নেই, সিঁথি কাটবার ইচ্ছা আছে অথচ মাথায় চুল নেই, বাবুর্গিরি করবার ইচ্ছা আছে অথচ হাতে পয়সা নেই, আমারও তেমনি ভালবাস্‌বার ইচ্ছা আছে অথচ মনের মানুষ পাচ্ছি নে।—আমি যেন কি রকম হয়েছি।

সরোজিনী। কি রকম হয়েছো?

ইন্দুমতী। কি রকম হইছি জানো? যেমন শীতকালে আমড়া গাছে পাতা থাকে না, গ্রীষ্মকালে বেহার অণ্ডলের মাঠে ঘাস থাকে না, বর্ষাকালে কল্‌কাতার রাস্তায় রাস্তা থাকে না—অনেকটা সেই রকম। কিংবা যেমন সকাল বেলায় কুড়ে তামাক খায় আর ঝিমোয়, দুপুর বেলায় চাষা গাছতলায় ধোঁকে আর চিঁড়ে খায়; সন্ধ্যাবেলায় জ্বরো রোগী শূয়ে শূয়ে তাকায় আর কি করবে ভেবে পায় না;—এই অনেকটা সেই রকম।

সরোজিনী। তাই ত' অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়েছে বলতে হবে।

ইন্দুমতী। [সরোদনে] তাই ত সখি, আমি কি করবে? আমার মন যে বাতাসে কলাগাছের পাতার মত চঞ্চল হয়েছে, চড়ুই পাখীর মত উড়ু উড়ু করছে, নবপ্রসূত বাছুরের মত দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার কি হবে সখি?

সরোজিনী। এ রকম অবস্থায় যা হয়ে

থাকে, তাই হবে। মন উড়ু উড়ু করবে না? দিবারাত্রি খাচ্ছ দুধ আর ঘি আর পোলাও। তা আর মন উড়ু উড়ু করবে না? সাথে কি ঋষিরা আলোচাল আর কাঁচকলা হিন্দু বিধবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল? তাঁর জন্যে ত তাঁরা বিধবার চুলবাঁধা, সাজগোজ করা, গহনা পরা এ সব নিষেধ করেছিল। তা তুমি ত শুনবে না।

ইন্দুমতী। তা যদি না করবে, তবে এ বিপুল সম্পত্তি ভোগ করবে কে?

সরোজিনী। কেন? ভোগ করবার লোক ছিল না? এই ধরো আমিই না হয় তোমার হয়ে' কষ্ট কোরে সেটা ভোগ কর্তাম। ছেলেবেলায় আমার বাপ মা অভিভাবক সব মরে' গেল। এখন আমি যে সোমর্ন্ত হতে চল্লাম, তা টাকা না থাকাতে আমার বিয়েই হোল না। আর তুমি বিধবা মানুষ, তোমার টাকার দরকার কি? তা, যত টাকা পড়লো এসে কি না তোমার হাতে। বিধাতার এমনি বিচারই বটে।

ইন্দুমতী। কি সখি, তুমি বিয়ে করবে?

সরোজিনী। তা করবে না কি উপোষ করে থাকবো নাকি? তবে বিয়ে হয় না, কি করি—দায়ে পড়ে রায় মশায় হইছি।

ইন্দুমতী। তা আমি তোমার বিয়ের খর্চা সব দেবো। তুমি বিয়ে করো;—তুমি কি কাউকে ভালবাসো?—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছ কেন সখি?

সরোজিনী। একদিন ভাল বাস্‌তাম সখি।—আঃ! [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

ইন্দুমতী। কাকে? সখি, কাকে?

সরোজিনী। তু আর বলে কি হবে? সে হবার নয়।

ইন্দুমতী। কেন সখি? সে কি তোমার ভালবাসা ফিরিয়ে দেয় নি?

সরোজিনী। না সখি।—ওঃ [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

ইন্দুমতী। আহা বড় কষ্ট। তবে আর ও কথা ভেবে কাজ নেই।

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদ। বো ঠারাইন, বো ঠারাইন।

ইন্দুমতী। কি দেবর লক্ষ্মণ!

বিনোদ। আমার ইচ্ছে হইয়েছে যে আমি
বিয়ে করুম।

ইন্দুমতী। বিয়ে করবে? কাকে?

বিনোদ। সেটাই—ঠিক কইরা কইতে পারি
না। আমি এম্‌নে একটা বিয়ে করুম যে বৈসে
বৈসে খাইতে পারা যায়। কোন বর মাইনসের
মাইয়া তালাস কর না বো ঠারাইন। নইলে
পারাশুদ্ধ মাইনসের মাইর খাইতে পারি না।

ইন্দুমতী। দিলে আর কি! এমনি এক
অকস্মণ্য অপদার্থ গর্লিখোরের সঙ্গে কে তাব
মেয়ের বিয়ে দিতে যাবে?

বিনোদ। ক্যান্‌ দিব না?—বলি চ্যাহার-
খান্‌ ত দ্যাখো। যা হোক আমার ঐ রকম বিয়া
দিয়া দাও; হাজরা সায়েবের মত মজা কৈরা
বৈসে বৈসে খাম্‌।

ইন্দুমতী। বোসে বোসে ত খাচ্ছই।

বিনোদ। এয়েরে কি বৈসা বৈসা খাওয়া
কয়? গর্লির লাইগা একটা পয়সা চাইতেই
থাকি; পাই না। দশজন মাইনসেরে ডাইকা
খাওয়াতে পারি না! আমি চাই যে নিজে খাই,
পরে খাওয়াই আর গর্লি খাইয়া ভোর হইয়া
থাকি।

ইন্দুমতী। তা তোমার বিয়ের যোগাড়
তুমি কর, আমি কন্তে যাবো কেন? স্ত্রীর
টাকায় বোসে বোসে খাবে। লজ্জাও নেই?

[সরোষে প্রস্থান।

বিনোদ। বিয়ার জোগার তুমি কোর্ষা না।
তবে আমিই করুম। কারে ডর? আমার দাদার
টাকা পাইয়া তুমি মাইয়া লোক বরমাইনসি
কোর্ষেছ না? আর স্ত্রীর টাকা দিয়া আমি
বরমাইনসি করুম এতেই দোষ? কহত
বিয়াইন! কহত!—অমন কৈরা আমার দিকে
চাও ক্যান্‌।

সরোজিনী। আঃ [দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

বিনোদ। কি কও?

সরোজিনী। উঃ! [ভঙ্গীসহকারে উপ-
বেশন]।

বিনোদ। তোমার চাওনি ত বালো
ঠেকে না।

সরোজিনী। ওঃ—[প্রস্থান]।

বিনোদ। এ কি রকম হৈল? এ্যা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চম্পটি সাহেবের বসিবার ঘর।

কাল—সায়াহ্ন।

চম্পটি ও অন্য চারিজন বিলেত ফের্তা আসীন
গীত

আমরা বিলেত ফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচাব
করিয়াছি সব জুলাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখোছি বিলাতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি “বেয়ারা”—আর
মুটেদের ডাকি “কুলি”।

“বাম” “কালীপদ” “হরিচরণ”
নাম এ সব সেকলে ধরণ;
তাই নিজেদের সব “ডে” “রে” ও “মিটার”
করিয়াছি নামকরণ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিটার নামে র'টি,
যদি “সাহেব” না বোলে “বাবু” কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধূতি ও চাদর;
আমরা হ্যাট বট আর প্যান্ট কোট পোরে—
সেজেছি বিলাতি বাঁদর;

আমরা বিলাতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাসি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বুড়ই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুঁরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

মোদের সাহেবিসানার বাধা,
এই সে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেম্বার হুটি নেই ‘ভিনোলিয়া’
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেত ফের্তা ক'টার;
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবুও
সাহেব গুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁচি—
চম্পটি দেই ইংরিজি খাঁচি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙ্গালিরই মত
চম্পটে পরিপাটি।

চম্পটি। দেখ practisটা কিছতেই জমাতে পাচ্ছনে।

পাঠক। তা ত দেখছি। তা এখন কি কর্বে ঠিক করেছো?

হাজরা। Muffussil bar join কর না।

চম্পটি। তাই ভাবছি। Allahabad যাবো?

চার্কি। না হে না। কোথায় যাবে? এখানে বোসে থাকো, আর Congress join কর, আর পার ত একখানা কাগজ চালাও।

চন্দ্র। আরে যদি সে ক্ষমতা থাকতো, তা হলে কি আর এতদিনে practice হোত না?

চম্পটি। পরিশ্রম কোরে যদি খেতে হয় ত bar ছাড়বো কেন?

পাঠক। নৈলে তুমি কি বিবেচনা করেছো যে বিনি পরিশ্রমে টাকা আসবে?

হাজরা। না। উনি ভেবেছেন যে টাকা-গুলো আঙ্গুর ফলের মত গাছে ফলে রয়েছে উনি গাছ তলায় হাঁ করে শুয়ে থাকবেন আর ও'র মূখে এসে টপ্ টপ্ করে পড়বে।—

চন্দ্র। এই যেমন তোমার মূখে এসে পড়ছে।

পাঠক। হাঁ এমন দেখা যাচ্ছে যে, বিনি পরিশ্রমে টাকা রোজগার করবার পন্থা এক রকম আছে।

চম্পটি। কি রকম?

পাঠক। এই একটা বিয়ে করা—like Mr. Hazra.

চম্পটি। বিয়ে কর্ব? — তাই ত! Well!—বিয়ে কর্ব?—তা সে একরকম মন্দ নয়।

চন্দ্র। Offer yourself to the highest bidder—যা পাও।

চার্কি। না হে, এক সুবিধা আছে। মিস্টার কর্মকারের এক handsome daughter আছে। আর তিনি যে dowry offer করেছেন, তা আবার তার চেয়েও handsome. He has offered Rs. 25,000 in cash for a thoroughbred stallion.—You old chap—are not a bad one.

চম্পটি। সত্যি নাকি? By the holy prophet! তার যোগাড় কর না হে। বোলো আমি রাজি।

চার্কি। বল কি হে! সে কিন্তু bride-groomকে দশ জায়গায় যাচিয়ে নেবে।

চন্দ্র। হাঁ, দাঁতটাত দেখে নেবে বৈকি। টাকা দেবে, দেখে নেবে না?

চম্পটি। তা হোক্। বোলো হে Barkis willing.

চার্কি। Go ahead old chap! My sympathies are with you.

পাঠক। [ঘড়ি দেখিয়া] এঃ late হয়ে গেল! Come let's be off, we have got an engagement.

হাজরা। হাঁ হাঁ ওঠো। কাল এখানে dinner-এর engagement পাক্কা ত!

চম্পটি। Certainly.

অন্যান্য বিলেতফের্তীগণ। Very well then. Ta Ta.

[প্রস্থান।

চম্পটি। এরা খানা একটা পেলে হয়। নিশ্চয় এরা পূর্ব জন্মে রাক্ষস ছিল। এক একজন খায় যেন ওদের সমস্ত শরীরটাই stomach. আমি ত drink কোরে খাবার আর অবসর পাইনে। এতটুকু পেট, তা যদি খেয়েই ভরিয়ে দেবো ত drink কর্ব কোন্ জায়গাটার। কিন্তু আর যে বেশী দিন ওদের dinner যদিগিয়ে উঠতে পাচ্ছি, তা ত বোধ হয় না।—এই বেহারা—বেহারা—এই কোই হয়?

বেহারার প্রবেশ

চম্পটি। You damned rascal! জবাব নেই দেতা হয় কাহে?

বেহারা। হুজুর।—

চম্পটি। চুপ্ রহো গাধা।—যাও শুরোর! বাবুজিঁকো বোলোও।

বেহারা। ষো হুকুম।

[প্রস্থান।

চম্পটি। বাপের যা টাকা ছিল তা ত দিইছি ফুকে, এখন যা বাবুজিঁর সেটা মূখে মূখে—আঃ বিনি পরিশ্রমে যদি practice

হোত!—আগে তাই ত ভেবেছিলাম যে উঠে
দুগুণ বন্ডো আর টাকা আন্ডো। তা
case-ই পাইনে তা বন্ডো কি।—

নেপথ্যে। চম্পটি সাহেব বারি আছেন
নাকি?

চম্পটি। এঃ এ সেই গুলিখোরটা দেখছি।
জ্বালালে। এই বেয়ারা! বেয়ারা!

নেপথ্যে। চম্পটি সাহেব বারি আছেন?

চম্পটি। Come in.

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

চম্পটি। কি বিনোদবাবু যে! What
news!—

বিনোদ। আপনার কাছে আইলেম।

চম্পটি। তা ত দেখছি। কি কোন
case?

বিনোদ। আ আমাবে জিরাইতে দ্যান্।
case case কৈরা যে ক্ষেপনের যোগারে আছেন
দিখি। case ত আন্ছিই।

চম্পটি। কি case? assault! tress-
pass! theft! rioting?—ও rioting?
—এই যে [একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির
করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া সজোরে পাতা
উল্টাইতে লাগিলেন। এই যে rioting-এর
Section "Whoever..."

বিনোদবিহারী অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঙ্গলন
করিলেন

চম্পটি। Rioting নয়? তবে কি?
hurt! confinement? murder? এই
দেখুন এই Taylor's Medical Juris-
prudence-এ লিখেছে—[আর একখানি
পুস্তক পাড়িয়া পাতা উল্টাইয়া]—এই দেখুন—

বিনোদ। ক্ষান্ত করেন চম্পটি সাহেব।
এ ঐ প্রকার case নয়। এ একটা মাইয়া
মানুষ আর একটা পুরুষ মানুষের লইগে—

চম্পটি। Enticing away? adul-
tery? rape?—oh my! এই subject-এ
Snell-এর Equity বলে' একখানা খুব ভাল
বহি আছে। এই দেখুন—

বিনোদ। আহা ব্যস্ত হন ক্যান। কইতে
দ্যান না। জিরাইতেই দ্যান। ওঃ [দীর্ঘ-
নিঃশ্বাস] শোনেন, কতটি এই যে আমি বিয়ে

কর্তে চাই কিন্তু আমার বোঠারাইন ত বিয়্যা
কোর্টে দ্যান না।

চম্পটি। নালিশ করুন।

বিনোদ। নালিশ করুম কেমন কৈরা?
এতে নালিশ করুম কিসের লইগে?

চম্পটি। কেন কর্ষেন না। আপনাকে
বিয়ে কর্তে দেবে না, আপনি নালিশ কর্ষেন
না? তবে এই Civil Court, Criminal
Court রয়েছে কি জন্যে? Penal Code
তৈরি হয়েছিল কি জন্যে—Certainly নালিশ
করুন। Pontifex's Marriage Act
অনুসারে বেশ নালিশ চলে। এই দেখুন
Reginalds' law of Financial Cate-
chism-এ লিখেছে কি শুনুন।

আলমারি হইতে অন্য একখানি কেতার বাহির
করিতে উদ্যত

বিনোদ। আঃ, এত ভারি মর্স্কলে পোলাম
দিখি। আগে শ্যাষ পর্যন্ত শুনিনাই লয়েন।
বোঠারাইন কয়েন যে মাইয়া দেইখা লইয়্যা
তুমি নিজেই বিয়া কর না। কে "না"
করে।

চম্পটি। তবে নালিশ কিসের?

বিনোদ। আমিও ত সেয়েই কই।—
নালিশ কিসের?

চম্পটি। [হতাশভাবে] এঃ এতটা পরিশ্রম
বৃথা গেল। তবে তুমি এসেছো কেন?

বিনোদ। আমি ত সেইয়েই কইতে চাই,
তা ত আপনে শুনতে চায়েন না! পাতাই
উল্টাচ্ছেন পাতাই উল্টাচ্ছেন। তা—মাইয়া
দেইখা ত বিয়্যা কোর্টে পারি, তা মাইয়া
পাই কৈ?

চম্পটি। তা আমি কি কর্ষ—[বহি বন্ধ
করিয়া ও আলমারিতে তুলিতে তুলিতে]
আমি কি কর্ষ?

বিনোদ। আপনি সেইয়েই কোন সম্মান
কইরা দিতে পারেন?

চম্পটি। আরে বেটা আমাকে ঘটক
পেয়েছ? মেয়ে খুঁজতে এয়েছো Barrister-
এর বাড়ী? Dammed শুন্যোর!

বিনোদ। আরে গাইল দ্যান্ ক্যান!

চম্পটি। বেরো বেটা গুলিখোর!

বিনোদ। আরে গুলিখোর কয়েন ক্যান!

গদলি খাই ত আপনার গাইঠের পয়সা বাইর
কৈরা খাই, আপনার বাপের কি?

চম্পটি। আবার রোখ্। বেরো বেটা।—
এই বেহারা?

বিনোদ। আরে ব্যোটা ব্যোটা করেন ক্যান’—

চম্পটি। আবার তর্ক কস্তে লাগলো।
Get out! বেরো বলছি।

[একটি ফিষ্ট লইয়া ধাবমান
ও বিনোদবিহারীর পলায়ন।

চম্পটি। Case-এর সঙ্গে খোঁজ খবর নাই।
আবার বলে ঘটকালি কর।—বেটারা আমাকে
গাধা পেয়েছে [পরিষ্করণ] হাঃ হাঃ He
intends to marry rich. সকলেরই ঐ
ফন্দি। ফন্দিটা মন্দ নয়। কোন পরিশ্রম নেই
অথচ পায়ের উপর পা রেখে বোসে খাও।
আঃ!—এবার যদি Karmakar-এর মেয়েটাকে
বিয়ে কস্তে পারি; তাহলে by the holy
Gospels of St. Zachary—এক হাত মেরে
দিইছি আর কি।—বেশ!—একটা বিয়ে করা
যাক্!—তবে ইতে একটা but আছে। আমি
যে বিলেতে already একটা বিয়ে করেছি।
[চিন্তা ও মস্তক আন্দোলন] তাই ত!—তা
কিন্তু সে বিয়েটা এত দিনে null and void
হয়ে গিয়েছে। যে ডুব মেরেছি। সে wife যে
আমাকে খুঁজে নেবে, তার যো রাখিনি—যাক্
একটা বিয়েই না হয় করা যাক্। 25,000|
rupees in hard cash!—not bad. এখন
হলে হয়। হবে নাই বা কেন! এই চেহারাখানায়
সব মেরে রেখেছি [মুকুরে স্বীয় মূর্তি
অবলোকন] চেহারাখানা একেবারে নিখুঁত।
নাকটা একেবারে Grecian. চোখ দুটো—ওঃ
কি eyelashes বাবা! তারপর এই কপালটা
ওঃ—ঠিক Bismarkএর মত। আর দাঁতগুলো
—দেখি [দন্ত বাহির করিয়া] beautiful!
beautiful! [হতাশভাবে] কি চেহারাখানাই
এ দেশে পড়ে’ মাঠে মারা গেল রে!

ছিন্নবস্ত্র পরিহিত সন্তান চতুর্দিকের সহিত
রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। At last!

চম্পটি। এ কে রে! এ রেবেকা নাকি?
না তার ভূত? নিশ্চয় তার ভূত।

রেবেকা। I am sure you are Mr.
Champati.

চম্পটি। [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমি
চম্পটি ঠিকই বটে। কিন্তু তুমি,—নিশ্চয়
রেবেকার ভূত। Ghost! Ghost! Ghost!
Murder Murder!

রেবেকা। I am not a Ghost. I am
Rebecca, your married wife.

চম্পটি। Really! [কাঁপিতে কাঁপিতে]
By St. Andrews! খুব পাক্‌ড়েছো ত।
তবে how did you find out my
address, my angel?

রেবেকা। Never mind how;—you
wretch, you Scoundrel, you most—

চম্পটি। দেখ অত Superlative হঠাৎ
নাই বা হলে।—By Jove!—You have
grown quite old my beauty?

রেবেকা। [সরোদনে] And the child
died.

চম্পটি। Did it?—Poor child!

রেবেকা। Actually died of Starva-
tion.

চম্পটি। Really! Well! You
might just as well have done the
same thing; it would do you good.

রেবেকা। You cruel!—and you
once pretended to love me. [ক্রন্দন]।

চম্পটি। Don't cry—There's a dear
—The fact is I am also starving
—not mentally or morally, but
physically starving.

রেবেকা। Then why did you pre-
tend to be a Prince?

চম্পটি। Did I?—[স্বগতঃ] এঃ কি
বিপদেই পড়েছি। এখন ত এর হাত এড়াবারও
যো নেই—[প্রকাশ্যে] By the holy
Prophet!—ah! well—don't you
see?

রেবেকা। I quite see you rogue,
you liar, you beast?

চম্পটি। দেখ রেবেকা! তোমার argu-
mentsগুলো খুব convincing—এর পরে

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। এস তবে এখন আমার আঁধার ঘর আলো কর'সে; এস Come in dear!—[স্বগত] এঃ বিয়ের plan-টা মাটী করে দিলে।—সব মাটি!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—উমেশের ভিতরবাটী। কাল—সন্ধ্যা।

সুকেশিনী, সুবোশিনী, সুহাসিনী ও সুভাষিনী
প্রবেশ ও গীত

কাঁট নব ফুল কামিনী

অন্ধকার হইতে আলোকে চলিছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা মোজা কামিজ পবিতে,
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে,—

পারত পক্ষে উপর হইতে নীচে তলায় নামিনে।
গৃহের কার্য করুক সকলে খুড়ী জেঠী পিসী
মাসীতে;

আমরা সবাই নব্য প্রথায় শিখিছি হাসিতে
কাসিতে;

করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ;

করিতে নৃত্য গীত বাদ্য;

বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে
দিবস যামিনী।

ব্যবসা করিয়া চাকুরী করিয়া অর্থ আনুক পতিরা;
রাজি আছি তাহা খরচ করিয়া বাধিত করিতে
সতীরা।

বিলাতি চলন বিলাতি ধরণ

আমরা করিতেছি অনুকরণ;

যেমন সভ্য স্বামীরা তাহার চাই ত যোগ্য ভামিনী।

সুবোশিনী। আজ মিসেস্ চাটার্জির
শুখানে engagement কটা'র সময় হে?

সুহাসিনী। এই ঠিক পাঁচটার সময়।

সুকেশিনী। এখন কটা বেজেছে?

সুবোশিনী। তাই তু [সুকেশিনীকে]
তোমার husband কাছারি থেকে ফির্তে এত
দেরী কচ্ছেন কেন? তাঁকে বলে দিয়েছো যে
তিনি ফিরে এলে আমরা সেই গাড়ি করে
যাবো?

সুকেশিনী। বলিছি। সে ঠিক আসবে
এখনি। ভারি obedient husband আমার।

সুহাসিনী। তবু, আজ তাঁকে আপিস
থেকে হেঁটে আসতে বল্লেই হোত।

সুভাষিনী। ঐ যে তোমার husband
এসেছেন না! এস এস আমরা শীগ্ঘির মখে
powder মেখে নেই।

সুবোশিনী। হাঁ হাঁ চল চল।

সুভাষিনী। তুমি মাখবে না সুকেশিনী?

সুকেশিনী। আমার মখে Powder
মাখতে হয় না, তোমরা Powder মাখো।
আমি ততক্ষণ একটু Shakespeare পড়ে
নেই।

[সুকেশিনী ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান।

সুকেশিনী। [বেড়াইতে বেড়াইতে পাঠ]
To be or not to be that is the
question.—

উমেশের প্রবেশ

উমেশ। এই যে এখানে—বলি ওগো—
খাবার আছে?

সুকেশিনী। Whether it is nobler
in the mind—

উমেশ। এ আবার কি চং! বলি, খাবার
আছে?

সুকেশিনী। To suffer—

উমেশ। আপাততঃ, ক্ষিধের জ্বালায় যে
আমি suffer করছি। খাবার আছে?

সুকেশিনী। Or to take arms—

উমেশ। এ কি রকম তামাসা!—বলি—

সুকেশিনী। Against a sea of
troubles.

উমেশ। বলি আফিস থেকে খেটে খুটে
এসে Hamlet-এর soliloquy শুনলে কি
আমার পেট ভরবে? খাবার আছে?

সুকেশিনী। একটু দাঁড়াও। And by
opposing end them,—

উমেশ। হাঁ এখন end them. ও
soliloquy end কোরে এখন এদিকটা দেখ।

সুকেশিনী। To die, to sleep, to
sleep—perchance to dream—

উমেশ। এখন dream, কব্বার সময় নয়।
পেটে বাড়বাগ্নি জ্বলছে।

সুকেশিনী। Ah there's the rub.—

উমেশ। ঐ ত rub—যদি ক্ষিদেটা না
থাকতো ত আর কোন গোলই থাকতো না।
—এখন হে পরি, স্বর্গভূমি থেকে আমাদের
এ পাপ মর্ত্যভূমিতে একবার নামো।—বলি
খাবার আছে?

সুকেশিনী। [সর্চাকত] খাবার?

উমেশ। [ভঙ্গীমহকারে] হাঁ খাবার।

সুকেশিনী। ওঃ যা! ভুলে গিইছি।

উমেশ। বাঁচিয়েছো।—তার আর কি; তুমি চুল ফিরিয়ে সাঁড়ি ঘুরিয়ে, জুতা মোজা পায়ে দিয়ে, বোঁড়িয়ে বোঁড়িয়ে পদ্য পাঠ কর, আর আমি খাবি খাই।

সুকেশিনী। Byron বলেছেন যে eating with another thing or two remind us of your mortality.

উমেশ। Byron চুলোয় যাক্। এদিকে আমার ভোঁচকানি লাগ্‌বার জোগাড়—

সুকেশিনী। ভারি জ্বালাতে পড়লাম। আচ্ছা দেখ, আজ তোমার খাবার আন্তে দিচ্ছি। কিন্তু কাল থেকে তোমার নিজের খাবারের বন্দোবস্ত নিজে কোরো।—ঐ . যাঃ—চাবি কোথায় গেল? চাবি?

উমেশ। বেশ! চাবি হারিয়ে বোসে আছ? বেশ।

সুকেশিনী। তাই ত dear! চাবি?

উমেশের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন

উমেশ। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কি—চাবি কি আমার মুখে আছে?

সুকেশিনী। আগে চাবি আঁচলে বাঁধা থাকতো; এখন ত আর আঁচল নেই, বাঁধি কোথায়? রুমালে বেঁধে রেখেছিলাম, রুমাল শুদ্ধ কোথায় পড়ে গিয়েছে—রোসো, এবার সাঁড়ির একটা পকেট করে নিচ্ছি। খুব সোজা।

উমেশ। তা হবে খুব সোজা। কিন্তু আপাততঃ চাবিটা খুঁজলে বোধ হয় পাওয়া যায়।

সুকেশিনী। ও ঝি ঝি!—চাবিটা খোঁজ ত। তবে তুমি বোস। আমার মিসেস চার্টার্ডের ওখানে engagement আছে। জান ত! দেরী হয়ে যাচ্ছে। [ঘাড় দেখিয়া] এঃ already late হয়ে গেছে, আমি যাই।

[শশবাস্তে প্রস্থান।

উমেশ। [কপালে হাত দিয়া হতাশা প্রকাশ ও বহির্গমনোদ্যত]

পথে পরেশ, রমেশ, ও সুরেশের সচিত সাক্ষাৎ পরেশ। কি উমেশবাবু কপালে হাত দিয়ে যে?

উমেশ। আর ভাই সে কথা বল কেন?

রমেশ। ব্যাপারখানাটা কি?

উমেশ। উপোস।

সুরেশ। কেন?

উমেশ। এই, to be or not to be that is the questions রকম। তোমাদের কারো কাছে পয়সা টয়সা আছে?

পরেশ। এই আমার কাছে আছে। কেন?

উমেশ। দাও ত ভাই [পয়সা গ্রহণ।

রমেশ। হোল কি?

উমেশ। যা হবার তাই। to be or not to be that is the question—

সুরেশ। স্কেপ্‌লেন নাকি?

উমেশ। To be or not to be,—চল আগে কিছ্‌ জলখাবার আন্তে দিই, উদরের জ্বালা নিবারণ করি—পরে বল্‌ছি—

পরেশ। তবু শুনি না কথাটা কি?

উমেশ। কথাটা এই যে তোমাদের দশ-জনের হ্যাপায় পড়ে স্ত্রীকে education দিয়ে তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি আর কি!

রমেশ। কি রকম?

উমেশ। এই আমি এলাম সমস্ত দিন গাধার পরিশ্রম করে; বারিক খাজনার রায় লিখে, আর স্ত্রীর খাবারের জোগাড় করা চুলোয় যাক্, তিনি গেলেন engagement রাখতে। এখন এ পোড়ার মুখে দেই কি? [সুরেশকে] তোমার মুখে যে, female education education করে যে লাল পড়তো না? এই নাও female education.

সুরেশ। ও কিছ্‌ না উমেশবাবু। আমি ত ভাবছিলাম যে তাদের education-ই হয়নি। তাদের emancipation না দিলে ত education complete-ই হয় না।

উমেশ। আর কাজ নেই বাপ্! education দিয়েই যে রকম খোলতাই হয়েছে, তার উপর আর emancipation দিয়ে কাজ নেই।

পরেশ। ঘাবড়াচ্ছে কেন উমেশ? ও নিজেরা education নিয়েই সব বিগড়ে যাচ্ছে।

এবার একজন মেম্ রেখে দস্তুরমত education দিলে তবে ঠিক হবে। কি বলো?

উমেশ। কি আর বলবো? যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা প'য়ষটি। We all in the same boat. লাঙুলহীন শৃগাল একা হ'চ্ছি না এই যা satisfaction.

রমেশ। তাইত—

সু'রেশ। তার জন্যে আর বেশী দূর যেতে হবে কেন? চম্পটি সাহেবের বিলটি মেম এসেছে, তাকে দিয়েই হবে, না?

উমেশ। আহা! বেচারি কোথায় বিয়ে করে ২৫,০০০ টাকা মাস্বার ফিকিরে ছিল। বড় ফস্কেছে! যা হোক তোমাদের মতলবে আর কিছ্ না হোক তার ত একটা উপকার হবে। বেচারি বড় কষ্টে পড়েছে। তবে তাকে এখন বলে কে?

প'রেশ। সেটা তোমারই জোগাড় কর্তে হবে। কি বলো? ভাবছো যে!

উমেশ। তথাস্তু।—তবে ভবিষ্যতের জন্য আমি দায়ী নই। আমি ত দেখছি ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধকার। তবে এক আশা আছে যে যা দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে আর কতই খারাপ হবে! ভালোও বা হয়ে যেতে পারে। Shakespeare বলেছেন "desperate diseases require desperate remedies"। চল আগে কিছ্ জলযোগ ত করা যাক্।

[নিষ্কান্ত।]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর গৃহের ছাদ। কাল—সায়াহ্ন।

সরোজিনী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

সরোজিনী। তাঁকে আমি ভালবাসি। লোকে হয়ত জিজ্ঞাসা কর্বে, কি গুণে ভালবাসি। লোকে বলবে তিনি কুৎসিত, অসভ্য, গুলিখোর, অসচ্চারিত্র। তিনি আমাকে ভালবাসেন না। তবু আমি তাঁকে ভালবাসি। এই যে ইনি এই দিকে আসছেন।

সভগী উপবেশন

বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদ। [স্বগত] এই যে এইখানে বৈসে। চেহারাখানা মন্দ নয়। বোঠারাইন কন

যো বেয়ান আমর্যা বিয়ে কর্তে চায়। তা মন্দ কি! আমি এয়েরে দিয়া কাম উদ্ধার করতে পারি ত এয়েরই বিয়ে করুম।—কারে ডর? [প্রকাশ্যে] বেয়াইন ও বেয়াইন!

সরোজিনী। এই যে আপনি? — কি বলছেন।

বিনোদ। আমি ভাইবা চিন্তা শ্যাষে তোমারেই বিয়া করা সাব্যস্ত কোল্লাম।

সরোজিনী। বেশ ঠাটা শিখেছেন ত!

বিনোদ। না বিয়াইন আমি ঠাটা কর্তেছি না, তোমারেই বিয়া করুম; কিন্তু আমার লাইগে যদি বিহাইন, তুমি অনগ্রহ কৈরা বিহাইন, যদি একটা কাম করো।

সরোজিনী। কাজ? কি কাজ? বলুন আমি আপনার জন্য সব কর্তে প্রস্তুত আছি। কি বলুন।

বিনোদ। তা জানি বিহাইন, আমার বিহাইন, আমার প্রাণের বিহাইন, আমার নয়নের মাণিক্য, তুমি যদি বিহাইন, বোঠারাইনেরে বিয়া কর্তে স্বীকার করাইতে পার।

সরোজিনী। কেন? তাতে আপনার লাভ কি?

বিনোদ। সেইরে জিগাও ক্যান? আমার কাম আছে। এইরা যদি তুমি কর বিহাইন,— তা'লে—

সরোজিনী। বিধবার কি বিয়ে হয়?

বিনোদ। হইব না ক্যান? নতুন আইনে ত হয়।

সরোজিনী। তা বিধবাকে বিয়ে কোরে কে জাত খোয়াতে যাবে।

বিনোদ। তা' টাকা পাইলে সকলেই জাইত খোয়াইতে স্বীকার আছে। জাইত ত সিন্দুকের মধ্য। আর কেউ না থাকে চম্পটি সাহেব আছেন।

সরোজিনী। তিনি ত খুঁটান।

বিনোদ। হইলোই বা খুঁটীয়ান। প্রায়শ্চিত্ত কোর্স্যান।

সরোজিনী। তিনি রাজি আছেন?

বিনোদ। সেইরেইতে তোমার কোর্সে হইব। চম্পটি সাহেবের কাছে গিয়া তোমার এই কতা কৈতে হইব। শুনি যে চম্পটি সাহেবেরও টাকার বড় দরকার আছে।

সরোজিনী। [ভাবিয়া] আচ্ছা, কিন্তু পরে যেন আমাকে ফাঁকি দিবেন না।

বিনোদ। [জিব কাটিয়া] বল কি বিহাইন? তা কি আমি পারি? তুমি যদি এই কাম কোর্তে পারো, ত তোমারে বিয়া করুম, বিয়া করুম, বিয়া করুম, তিন সৈত্য কোল্লাম। এখন বিশ্বাস হয়? তবে আমি আসি।—মনে রয় যেন। [যাইতে যাইতে স্বগত।] হু হু কেমন ফান্দ কচ্ছ? চম্পটি সাহেব আমারে মাইরা খেদাইয়া দিয়া বড় ভাল কাম কচ্ছেন। আমি মাইর খাইয়া এক ভাল ব্যারিস্টারের নিকট নালিশ কোর্তে যাইয়া বালা খবর পাইছি। আমি, চম্পটি সাহেব আর বোঠারাইন দুই জনের আক্কেল দিতে পারি কিনা দেখুম— তবে যে কয়, বাঙ্গালার বৃদ্ধি নাই—হাঃ হাঃ হাঃ [নৃত্য ও প্রস্থান।]

সরোজিনী। এর মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগড়ত ব্যাপার আছে! সখীর বিবাহের জন্য ইনি এত চিন্তিত কেন? ঈশ্বর জানেন। কিন্তু চম্পটি সাহেবের কাছে যাবো কি কোরে? এরই কাছে তাঁর নাম শুনছি বটে। কিন্তু তাইত—তা প্রেমের জন্য অনেক সময় অনেক দুঃসাধ্য সাধন কোর্তে হয়। আর সখীকে বিয়ে কোর্তে রাজি করা—হু—কথায় বলে “কাঙালা ভাত খাবি? না, পাত পেতে বোসে আছি!”

গাইতে গাইতে বেগে ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। সখি ধর ধর।

সরোজিনী। কেন কেন সখি এ ভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর?

ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি—

সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো এ যে ঘেমে মরি—

ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—

সরোজিনী। উড়িতেছে চিল—উঠে কত কা কা নাম মধুর স্বর—

ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—

সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে;

ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—

সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবলতর।

ইন্দুমতী। যৌবন জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,

সরোজিনী। যৌবন কি বল পার হোয়ে ত্রিশ

ইন্দুমতী। কি করি কি করি—

সরোজিনী। ‘আহা মরি মরি—

ইন্দুমতী। উহু উহু সখি—

সরোজিনী। না যাও সর;—

ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি?—

সরোজিনী। না ভালো লাগে না তোমার ন্যাকামি।

ইন্দুমতী। সখি কোথা শ্যাম? আমি যে মোলাম—

সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

ইন্দুমতী। সখি সখি আমার কি হ’ল?

সরোজিনী। কেন সখি?

ইন্দুমতী। আমার যেন বোধ হচ্চে যে সংসার মরুভূমি;—আকাশ ধু ধু কচ্চে; চারিদিকে প্রহেলিকা না কুহেলিকা কি বলে— তাই! আমার এ কি হ’ল?

সরোজিনী। তাই ত সখি!

ইন্দুমতী। সখি! একে প্রেমের কোন্ অবস্থা বলে?

সরোজিনী। শোচনীয় অবস্থা।

ইন্দুমতী। না সখি! এ পরিহাস কব্বার সময় নয়। আমার প্রাণ যে কেমন হয়েছে, মন যেন কি রকম কচ্চে, হৃদয় যেন কিসের মত হয়ে গিয়েছে।

সরোজিনী। বটে?

ইন্দুমতী। জগৎ হাঁ হাঁ কচ্চে, আকাশ খাঁ খাঁ কচ্চে, বাতাস শাঁ শাঁ কচ্চে—আর— আর কি কচ্চে সখি?

সরোজিনী। এই, ক্ষুধাতে পেট চাঁ চাঁ কচ্চে, রোদ্দুরে মেজাজ ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, ছেলে-পিলেগুলো বাড়ীর মধ্যে মা মা কচ্চে, বাইরে গরুগুলো গাঁ গাঁ কচ্চে—

ইন্দুমতী। না না সখি! তুমি বদ্বতে পাচ্ছ না, যে ব্যাপারখানাটা কি।—আমার প্রাণ

যে আকুল হয়েছে। "আকুল" বোঝো? আমার অবস্থা। যে কি রকম হয়েছে সেটা সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সরোজিনী। তবু কি রকম হয়েছে শুন। না হয় একটু বেঁকা ভাষায়ই বর্ণনা কল্পে।

ইন্দুমতী। কি রকম হয়েছে জানো? এই সম্ভ্রমে মিষ্টি না থাকলে যে রকম হয়, পানে এলাচ না থাকলে যে রকম হয়, সারিড়র পাড় না থাকলে যে রকম হয়, গানে গিট্কারি না থাকলে যে রকম হয়, অনেকটা সেই রকম—নীরব, একঘেয়ে, ফেক্সা—কোনই মানে নেই।

সরোজিনী। অবস্থাটা বেশ ঘোরালো রকম দাঁড়িয়েছে দেখছি। তা এখন কি কর্বে ঠিক করেছে?

ইন্দুমতী। কি কর্বে ভেবে পাচ্ছিনে। এদিকে আমার যৌবন ফুরিয়ে এল, পাকা রাস্তা ছেড়ে যেন এখন মেটে রাস্তায় এসে পড়েছি, আমার হৃদয়রূপ বাড়ী থেকে ক্রমে ক্রমে যেন বাসনারূপ চূণ খসে পড়ে যাচ্ছে। আমার কি হবে সখি—আমি কি কর্বে সখি।

সরোজিনী। কি কর্বে বলবো? বিয়ে করো। একটা বিয়ে করো।

ইন্দুমতী। বিয়ে?

সরোজিনী। হাঁ সখি বিয়ে।

ইন্দুমতী। বিয়ে? সে কি বল সখি! বিয়ে?

সরোজিনী। বিয়ে নয় ত কি গুপ্তপ্রেম? সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার সখি। সে দিকে ঘেঁষো না, বিয়ে করো।

ইন্দুমতী। বিয়ে কর্বে?

সরোজিনী। কর্বে বৈ কি। এটা বদ্বতে পাচ্ছ না, এত খুব সোজা বাঙলা।—বিয়ে কর্বে।

ইন্দুমতী। হাঁ তাও ত বটে। বিয়েই ত কর্বে বটে। সেটা আমাকে এতদিন কেহ বদ্বিয়ে বলেনি। বিয়েই ত কর্বে হবে বটে। সখি, তুমি আমাকে যে কি উপকার কল্পে তা আর কি বলবো।

সরোজিনী। কেন সখি?

ইন্দুমতী। মনের কথাটা টেনে বার করেছে। আমার মনে ও প্রস্তাবটা অনেকদিন থেকে উঁকি মেঁরে যাচ্ছে, কিন্তু প্রস্তাবটা আর

একজনের কাছ থেকে এলে যেন টক্কোরে বোঝা যায়। এই যেমন খেতে বসলে, কোন একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে হলে, ইচ্ছা সত্ত্বেও চাওয়া যায় না, কিন্তু আর একজন যদি বলে 'আহা আর একটু খাও না ভাই'—সেটা অমনি চট করে বোঝা যায়। এ সেই রকম—সখি ঠিক বল্ছো। বিয়েই ত কর্বে বটে!—কিন্তু পাত্র?

সরোজিনী। পাত্র জোগাড় কর্বার ভার আমিই নিচ্ছি।

ইন্দুমতী। [সাগ্রহে।] পার্বে? — সখি পার্বে?

সরোজিনী। পার্বে হবে বৈ কি—খাতিরে পড়ে' লোকে ঢেঁকি গেলে, আর আমি একটা ঘটকালি কর্বে পার্বে না?

ইন্দুমতী। সখি তোমায় আর কি বলবো? যেমন খেতে খেতে 'বিষম' লাগে, হাসতে হাসতে ফিক ধরে, চলতে চলতে ওছোট্ট খায়, আমার সেই রকম কথা কইতে কইতে আটকে যাচ্ছে। হাঁ বিয়েই ত কর্বে বটে। তাও ত বটে,—ঠিক।

[প্রস্থান।]

সরোজিনী।—হয়েছে। পাখী শিকলি কেটেছে। তা আমি কি কর্বে? আমার দোষ কি? ও পাখী শিকলি নিজেই কেটেছে—আমি কেটে দিইনি। আমি বরং ভাল কর্ছি। একটা ভদ্ররকম কিনারা কোরে দিচ্ছি।

[নিষ্ক্রান্ত।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—চম্পটির বাসবার ঘর। কাল—প্রভাত।

চম্পটির পুত্রকন্যাগণের গীত

চম্পটি চম্পটি চম্পটি

চম্পটির দল আমরা সবে।

একটু মেশাল রকম ভাবে

আমরা কয়জন এইছি ভবে।
যদি কিছুর দেশী রং রেখেছি সাহেবি ঢং;
একটু তবু নোটিভ গন্ধ কি কর্বে তা রবেই রবে।
ইংরাজীতে কহি কথা . সেটা 'পাগার' উপদেশ;
হ্যাটা কোটা পরি কেন—কারণ সেটা সভ্য বেশ;

চক্ষু কেন চসমা সাজ?—

কারণ সেটা ফ্যাসন আজ;

—চশমা শূন্য student মহল

কোথায় কেঁ দেখেছে কবে

বংগভাষা কইতে শিখছি
 বছর দু'স্তন লাগবে আরো;
 তবে এখন ক'চ্ছি যে সে
 তোমরা যাতে বুঝতে পারো।
 টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
 কারণ সে সাহেবিয়ানা;
 খাইবা যদি শাগচচ্ছি
 টেবিলে তা খেতে হবে।
 ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে
 তৈরি মোরা হ'চ্ছি ক্রমে
 এদিকেও সংখ্যায় বাড়িছে
 বিনা কেন পরিশ্রমে,
 জানি না কি হবে শেষে,
 কোথায় বা চলিছে ভেসে,
 মাঝ শূন্য নৌকার উপর
 ভেসে যাচ্ছি ভাবগর্বে।

[প্রস্থান।

চম্পটি'র প্রবেশ

চম্পটি। নাঃ এ আর পোষাচ্ছে না,
 দেখছি। আগে একটা মানুষ, যা হয় একরকম
 ধার-টার ক'রে চোলে যাচ্ছিল। এখন with
 so many mouths to feed—by jove
 —they are quite a regiment. কি ক'র্ষ
 যে ভেবে পাচ্ছনে। কোথা থেকে একটা
 পুরোগো encumbrance আবার ঘাড়ের
 উপর এসে জুটলো।—Married স্ত্রী,
 তাড়িয়ে দেবার যো নাই। তার উপর এই
 ছেলেমেয়েগুলো আসল ধারের উপর সূদের
 মত বাড়তেই চলেছে।—নিজের ছেলে, গলা
 টিপে মেরে ফেলা যায় না। এখন এই
 wife-টাকে নিয়ে কি করা যায় কেউ বলতে
 পারো?—আচ্ছা, উমেশবাবু ত কাল এসে-
 ছিলেন—বলছিলেন যে তাঁদের wife-গুলোকে
 educate কর্তে একজন mistress চাই।
 আমার স্ত্রী যদি সেটা কর্তে পারেন, ত তাঁরা
 মাসে ২০০ টাকা করে দিতে রাজি আছে।
 By Jingo! that is a good idea. এখন
 রেবেকা স্বীকার হলে হয়! দেখি, জিজ্ঞাসা
 করি। রেবেকা রেবেকা!

রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। কি? dear!

চম্পটি। এই একটা মতলব ক'চ্ছলাম কি—

আঃ কি রকম ক'রে কথাটা পাড়ি—হাঁ শোন—
 ছেলোপিলেগুলো ত মোলো।

রেবেকা। কেন dear?

চম্পটি। এই না খেয়ে—

রেবেকা। তা আমি কি ক'র্ষ?

চম্পটি।—আমি বলছিলাম কি যে হঠাৎ
 একটা ভারি সূবিধে হয়েছে।

রেবেকা। কি রকম সূবিধা?

চম্পটি। এই রোজগারের একটা ফন্দি বা'র
 করেছি।

রেবেকা। কি রকম?

চম্পটি। এই তুমি mistress হও।

রেবেকা। [সক্রোধে] Mistress? কার?
 Never.

চম্পটি। আরে সে mistress নয়;—এ
 master, mistress—সেই mistress. এরা
 জনকতক নব্য হিন্দু মিলে তাদের wives-দের
 educate কর্তে চায়। তুমি তাদের mistress
 হও।

রেবেকা। No! I won't!

চম্পটি। Indeed you will.

রেবেকা। আর তুমি কি ক'র্ষ?

চম্পটি। খাবো।

রেবেকা। What?

চম্পটি। I will only eat darling?
 I will eat to please you.

রেবেকা। Never!

চম্পটি। Always your most obe-
 dient servant—গঙ্গারাম চম্পটি।

রেবেকা। I shall be hanged if I
 do.

চম্পটি। I shall be blowed if you
 don't. শোন dear! এ বিষয়ে Full
 bench-এর নজীর আছে।

রেবেকা। কি রকম?

চম্পটি। Phillips' Concordance of
 criminal case-এ লিখছে যে husband is
 the wife's prosperity অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর
 সম্পত্তি বিশেষ।

রেবেকা। তাতে কি প্রমাণ হয়?

চম্পটি। যে তুমি রোজগার ক'র্ষ।

রেবেকা। আর তুমি বোসে খাবে?

চম্পটি। With pleasure.

রেবেকা। Really!

চম্পটি। শোন dear I have always held among my friends that you are an angel আর আমারও তাই ধুব বিশ্বাস—যদিও তোমার wings নেই।

রেবেকা। সত্যি বলছো?

চম্পটি। By all the gods in heaven! Though to tell the truth, I am a veritable atheist.

রেবেকা। Very well! But it is no use তুমি ত মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেবে।

চম্পটি। তা দেবো। কিন্তু তুমি স্বর্গে যাবে।

রেবেকা। স্বর্গে যাবো?

চম্পটি। নিশ্চিত angles-রা স্বর্গে যায় না কি নরকে যায়? বাপ্ what a figure! What complexion—

রেবেকা। বল কি?

চম্পটি। উঃ dazzling!

রেবেকা। সত্যি বলছো?

চম্পটি। সত্যি?—তুমি আমার বকে ছুরি বিধিয়েছ, darling!

রেবেকা। কখন dear?

চম্পটি। কখন আবার? এখন—এইমাত্র! ছুরি কি Rogers-এর ছুরি; নৈলে আর ছুরি হয় না?—তুমি আমার এই heart-এ অবিশ্বাসের ছুরি বিধিয়েছো। তুমি যদি dear Macpherson's Law of Mortgage পড়তে, তা'লে আর আমাকে এত অবিশ্বাস করতে না।

রেবেকা। না dear। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব না। আ হা হা, আমার husband-এর কি কোমল প্রাণ।

চম্পটি। তবে তুমি স্বীকার?

রেবেকা। আচ্ছা স্বীকার। কিন্তু you must mend your ways.—সব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিও না।

চম্পটি। না সব উড়িয়ে দেব না।

রেবেকা। আচ্ছা darling। আমি স্বীকার হলাম। তা'লে তুমি আমাকে ভালবাসবে?

চম্পটি। ভালো?—Well I never!

আমি তোমাকে ভালবাসবো না? দেখো আমি তোমাকে তা'লে এমন ভালবাসবো—কি আর বলবো!

রেবেকা। আচ্ছা, তবে আমি যাই, এখন খাবার জোগাড় দেখিগে।

[প্রস্থান।

চম্পটি। হাঁ হাঁ হাঁ। আমাকে কিন্তু রেবেকা সত্যি সত্যিই ভালবাসে বোধ হচ্ছে; তা বাসবে না? ঈশ্বর কি চেহারাটাই দিয়েছিলেন! [মুকুরে স্বীয় মূর্ত্তি দেখিয়া] বাঃ অবিকল যেন Apollo—তবে গোঁফ আছে, এই যা। আচ্ছা গোঁফটা কামিয়ে ফেলে হয় না।—না কাজ নেই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গীত

সকলে। মোরা সবাই ঠিক করেছি যে চাকুরী করা হয়রাণী।

নাপিতানী। মূই নাপিতানী।

ধোপানী। মূই ধোপানী।

মেছুনী। মূই মেছুনী।

ময়রাণী। মূই ময়রাণী।

নাপিতানী। মোদের নকার কোরে গুজরাণে আর মন উঠে না সই।

ধোপানী। মোরা চাই শয়ন কোরে নয়ন মূদে বিভোর হয়ে রই।

মেছুনী। নাই কি উপায় চাকুরী করা বৈ—

ময়রাণী। বলি খেটে খেতে হইছিল কি তৈরি এ চাঁদ মূখখানি।

নাপিতানী। হেলিয়ে নয়ন বাঁকা অবহেলে করি ভুবন জয়।

ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর কারে করিনাক ভয়।

মেছুনী। মোদের কি লা চাকুরী করা সয়?

ময়রাণী। এখন ক'ত্তে হবে সহজ একটা নূতন উপায় আমদানী!

নাপিতানী। ঐ লো ঐ মধুর স্বরে বাজছে বাঁশী আর কি থাকা যায়।

ধোপানী। আহা বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে জন্ম হয়নি হয়।

মেছুনী। ওলো তোরা সব আসবি যদি
আয়।

ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায়
রূপের ছটায় মাতিয়ে দেবো রাজধানী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চম্পটি'র drawing room।

কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।

চম্পটি ও রেবেকা

গীত

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried
থাক্তাম যদিপিও সেটা—

চম্পটি। It would have been far
preferable, 't would have been
much better.

রেবেকা। তোমার marry করা was an
act of great mistake for me—

চম্পটি। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। It was a great mistake to
marry ধোরে একটা pauper.—

চম্পটি। The more so, Oh my
love! When you yourself had not
a copper.

রেবেকা। Tremendous, sad mis-
take, my darling! Very sad, I see.

চম্পটি। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.—

চম্পটি। I thoroughly agree.

উভয়ে। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই love-এর প্রথম stage-টাই
ভালো—whispers, hugs and kisses.

চম্পটি। The charm is not so
great as soon as you become a
Mrs.

রেবেকা। The case becomes more
complicated on the contrary—

চম্পটি। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a
thousand kisses, and be mine for
ever.

চম্পটি। চাই something more
substantial কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solo-
mon though not so rich as he—

চম্পটি। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry কোরে না হোক
কোন অন্য কার্যসিদ্ধি।

চম্পটি। But annually একাট করে'
হচ্ছে বংশবৃদ্ধি।

উভয়ে। Whatever difference of
opinion, there may be, in this
view of this case, my love!
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree.

চম্পটি। I thoroughly agree,—

উভয়ে। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree.

চম্পটি। কি বল dear?

রেবেকা। কি আর বলবো! এখন উপায়
দেখ—to make both ends meet.

চম্পটি। They will meet. ইংরাজিতে
বলছে। extremes always meet [হাস্য
উদ্দেশ্যে দন্ত বাহির করিলেন।]

রেবেকা। তুমি ভাবছো যে খুব রসিকতা
কচ্ছি। কিন্তু তাতে ত আর পেট ভরে
না—

চম্পটি। তা নিশ্চিত! বাঙালাতে বলে “শুদ্ধ কথায় চিড়ে ভেজে না।”

রেবেকা। আমাকে ত তারা এ চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিলে; তারা এখন Shakespeare পড়ছে, Herbert Spencer পড়ছে, Adam Smith পড়ছে। আমার ত অতদূর বিদ্যে নেই! আমার যতদূর বিদ্যে তা তাদের শিখেইছি, আর কি কৰ্ব্ব!

চম্পটি। তা বটে। তুমি আমার কি কৰ্ব্ব। এখন তোমার ইচ্ছে বোধ হয় যে আমি কিছু করি।

রেবেকা। তুমি কিছু কৰ্ব্ব না? তুমি man, আমি চিরকালটা রোজকার করব, আর তুমি চিরকালটা বোসে বোসে খাবে ঠিক করেছো?

চম্পটি। আমার মতলবটা কতক ঐ রকমই ছিল বটে।

রেবেকা। Shame!

চম্পটি। তুমি যদি আমাকে খেতে দিতেই না পার্বে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

রেবেকা। আমি তোমাকে খাওয়ানো!—O dear! dear!—স্ত্রী কি স্বামীকে বোসে বোসে খাওয়ানো!—

চম্পটি। আলবৎ! স্ত্রীর মত স্ত্রী হলেই খাওয়ানো।

রেবেকা। তাও আমি এতদিন সাধ্যমত করেছি। তা তুমি ত তার অর্ধেক মদ খেয়েই উড়িয়ে দিলে!

চম্পটি। তা দেবো না? আর তুমি যে স্বর্গে যাবে! তখন কি আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবে?

রেবেকা। স্বর্গে যাবো? কি রকম কোরে?

চম্পটি। এই আমাকে খাইয়ে দাইয়ে যে পুণ্য কচ্ছ, সেই পুণ্যের জোরে স্বর্গে যাবে না?

রেবেকা। Indeed!—I don't want it.

চম্পটি। তোমার যেতেই হবে।

রেবেকা। কক্ষণ স্বর্গে যাবো না। Never! ঐ—plea করে তুমি বোসে বোসে খাবে ঠিক করেছো। আমি বৃদ্ধিতে পেরেছি।

চম্পটি। পেরেছো নাকি? তোমার খুব

বৃদ্ধি তা—তা যখন, darling!—সেটা বৃদ্ধিতেই পেরেছো, তখন আর তা গোপন কৰ্ব্ব না। আমি সত্যি বল্চি, যে কাজ কর্তে গেলেই আমার মাথা ধরে।

রেবেকা। মিথ্যা কথা—It is a lie.

চম্পটি। হাঁ এটা lie বটে, কিন্তু তাই বোলে সেটা আমার সামনে বলা তোমার উচিত হয় নি।—তা যখন বৃদ্ধিতেই ফেলেছো, তখন সত্য কথাটা বলি! To tell you the truth, আমার practice হচ্ছে না—তা আমি কি কৰ্ব্ব?

রেবেকা। পড়বে না শুনবে না, effort কৰ্ব্ব না, তা practice হবে কেমন করে?

চম্পটি। এঃ! সব বৃদ্ধিতেই ফেলেছো দেখছি।

[নেপথ্যে] সাহেব বাড়ী হ্যায়?

চম্পটি। [স্বগত] এ আবার কে রে। এ যে নারী-কণ্ঠ দেখছি [প্রকাশ্যে] যাও যাও;—রান্নাটা দেখগে dear! একজন client-এর গলা শুনছি।

[রেবেকার প্রস্থান।

চম্পটি। এই বেয়ারা! খানসামা! বাবুর্জি—কে এসেছে ডেখো—এই চাপরাসী—এই কেউ যে উত্তর দেয় না। তাদেরই বা অপরাধ কি। একটা cook আছে, সেই খানসামা, সেই বেয়ারা, সেই চাপরাসী, সেই cook। বোধ হয় বাইরে টাইরে গিয়েছে। এই, come in—

সরোজিনীর প্রবেশ

চম্পটি। [স্বগত] এ কি রকম ব্যাপার?—এ ত চেহারাখানা মন্দ নয়।

সরোজিনী। আপনার নাম কি চম্পটি সাহেব?

চম্পটি। হাঁ লোকে ট বলে।—তা কি case-টা না শুনলে opinion ডিটে পাচ্ছি না। Forgery? Perjury? Chicanery? Breach of trust? Criminal misappropriation?—

সরোজিনী। আরে শুনুন না। case একটা ত বটেই। কাল বিকালে আপনি একবার আমার সখীর ওখানে গিয়ে কেসটা নিজেই শুনবেন।

চম্পটি। আপনার সখীট কে?

সরোজিনী। নবীনমাধবের বিধবা স্ত্রী।
চম্পটি। Widow! will case বৃদ্ধি?
তার বাড়ীটি কোথায়?

সরোজিনী। শ্যামবাগান রামকমল
মুখুর্ষোর গলি।

চম্পটি। সে আবার কোন্ যায়গায়?

সরোজিনী। এই চিৎপুর রোড দিয়ে
বরাবর উত্তর দিকে চলে যাবেন।

চম্পটি। [নোট বহি বাহির করিয়া নোট
নিতে নিতে] ধর, গেলাম;—টার পর?

সরোজিনী। তার পর ট্রামের আস্তাবল
জানেন ত? তারই দক্ষিণ ঘেঁসে যে গলি
গিয়েছে, তা দিয়ে ঢুকবেন।

চম্পটি। ঢুকলাম।

সরোজিনী। তার পর দক্ষিণ দিকে একটা
গলি দেখতে পাবেন, সেই জায়গাটায় বাঁয়ে
হেলবেন।

চম্পটি। শ্রীকৃষ্ণের মট!—আচ্ছা হেললাম।

সরোজিনী। তার পর একটুখানি সের্ধিয়ে
দেখবেন, ডাইনে একটা শাড়ির দোকান আর
বাঁয়ে একটা কদমগাছ।

চম্পটি। কদমগাছ? যার টলায় শ্রীকৃষ্ণ
বাঁশী বাজাটেন?

সরোজিনী। আঙে না। সে কদমগাছটা
ঠিক কলকাতায় নয়, সেটা বৃন্দাবনে।

চম্পটি। হাঁ হাঁ টা বটে।—টার পর!

সরোজিনী।—তার পর একটা কদমগাছ
বৃন্দাবনে?

চম্পটি। হাঁ বৃন্দাবনে! কদমগাছ।

সরোজিনী। কদমগাছ।

চম্পটি। [সঙ্গে সঙ্গে] গাছ—

সরোজিনী। সেই কদমগাছের পাশে একটা
ময়রার দোকান।

চম্পটি। ডোকান।

সরোজিনী। সেই দোকানের সামনে
বাগানওয়ালা বড় বাড়ী।

চম্পটি। বৃদ্ধি। আর বলতে হবে না,
কটার সময়?

সরোজিনী। এই বিকেল ৪টে।

চম্পটি। বাঃ! ঐ সময় ঠিক আমার
leisure আছে বটে।—case-টা কিসের? Will
case বৃদ্ধি?

সরোজিনী। তা সেখানেই শুনবেন
এখনি—

চম্পটি। আমার আজকাল নিঃশ্বাস
ফেলবার অবসর নেই। — টা যাবো। —
Widow-র case কিনা? টা যাবো ঠিক
যাবো।

সরোজিনী। হাঁ যাবেন, আর চেহারাখানা
একটু মেজে ঘসে' যাবেন।

চম্পটি। এঁা—চেহারা!—তার সঙ্গে case-
এর কি সম্বন্ধ?

সরোজিনী। আছে। দেখতে পাবেন।—
এখন তবে আসি।

চম্পটি। আচ্ছা—Good-bye, madam.

[সরোজিনীর প্রস্থান।

চম্পটি। এ কি রকম case বোঝা যাচ্ছে
না। Illicit love নাকি? তা খুঁজে খুঁজে
লোক পাকড়েছে ত খুব।—এই চেহারা! আর
কিছু নয়। এই চেহারাখানা নিয়ে আমি
ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। যে দেখে সেই কি love-এ
পড়ে! I am quite disgusted with this
চেহারা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইন্দুমতীর শয়ন কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

ইন্দুমতী ও সরোজিনী

ইন্দুমতী। সখি রে।

সরোজিনী। কি।

ইন্দুমতী। কি দেখলাম।

সরোজিনী। কি দেখলে?

ইন্দুমতী। সেই অপূর্ব মোহন বঙ্কিম-
ঠাট। কি চেহারা। আহা সেই মধুর গোঁফ—
যেন মদনের ফুলধনু। সেই কাণ—যেন
মুর্শিদাবাদের জিলাপি। আর সেই নাক, যেন
শ্যামের বাঁশি—কেবল বাজে না—এই যা
তফাৎ।—মরি মরি।—

সরোজিনী। কে বললে বাজে না? ঘুমে
ঘোরে একটু আধটু বাজেও বা; যদিও সে স্বর
ঠিক শ্যামের বাঁশির মত মধুর না হতে পারে।

ইন্দুমতী। সখি রে—সে স্বর আমার
কাছে রসনচৌকি।

সরোজিনী। তা'লে বর পছন্দ হয়েছে?

ইন্দুমতী। পছন্দ—সখি! তুমি নেহাইং অপ্রেমিক শব্দ পছন্দ? তার চেয়ে ঢের বেশী। চম্পটিকে দেখে আমি একেবারে সখি— একেবারে পা হড়কে, ডুবজলে;—তলিয়ে গিইছি—হাবুডুবু খাচ্ছি, আমাতে আমি আর নেই। বাস্তবিক সখি, আমি আর নেই।

সরোজিনী। সে কি? নেই কি? জলজ্যান্ত বর্তমান রয়েছে দেখছি।

ইন্দুমতী। তুমি কিছুর বঝতে পারছ না, সখি! রইছি যে দেখছে সে কেবল এই শরীরটা। তার ভেতর হৃদয় বলে' একটা পদার্থ থাকে জানো?

সরোজিনী। হাঁ কবিরা বলেন বটে।

ইন্দুমতী। সেটা নেই।

সরোজিনী। সেটা কোথায় গেল?

ইন্দুমতী। সেটা চুরি গিয়েছে।

সরোজিনী। চুরি গিয়েছে? পদলিশে খবর দেবো নাকি?

ইন্দুমতী। এঃ! তুমি বঝেও বঝবে না। কথাটা হচ্ছে এই যে, এখন চম্পটির সঙ্গে শীগ্গির বিয়ে হওয়াটা মানসিক হিসেবে নেহাইং দরকার হয়ে পড়েছে।

সরোজিনী। সেটা এতক্ষণ সোজা ভাষায় বল্লই হোত।

ইন্দুমতী। সোজা ভাষায় কবিত্ব হয় না।

সরোজিনী। কবিত্ব নাই বা হ'ল, কাজ হলেই হ'ল। এখন আমাকে কি কর্ত্তে হবে বল দেখি।

ইন্দুমতী। আমি রাধার মত বিরহিণী হয়ে বসে আছি। তুমি আর একবার আমার বিচ্ছেদতী হয়ে, চম্পটিরূপ শ্যামের কাছে যাও। আর তাঁকে গিয়ে 'আমার হয়ে বলগে, "বন্ধুয়া কি আর কহিব আমি"—

সরোজিনী। আমি তা বলতে পার্বে না, যা বলতে হয়, তুমি একথানা চিঠিতে লিখে দাও। আমি পত্রবাহিকা হয়ে যাবো। চিঠি লেখো।

ইন্দুমতী। চিঠি?

সরোজিনী। হাঁ চিঠি।

ইন্দুমতী। চিঠি! পত্র? লিপি? হাঁ চিঠিই ত লিখবো বটে।—ভাগ্যিস তুমি বললে। আমি যে কি কর্ত্ত ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সরোজিনী। না, তা পাবে কেন? তুমি একেবারে কাঁচা খুঁকিটি কিনা? কিছুর ত জানো না।—এখন যাও, শীগ্গির একথানা চিঠি লেখো গে! আমিও তৈরি হয়ে নেই। বাপ্! নিজের বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, পরের বিয়ের ঘটকালী কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণটা গেল।—চল।

ইন্দুমতী। রোস একটু কবিত্ব কোরে নেই।—চম্পটি! চম্পটি! চম্পটি—? [মুখ ঢাকিয়া] আহা কি মধুর নাম। চেহারার উপযুক্ত নামই বটে। আর টোপাকটাও ঠিক শ্যামের মত না হলেও, মন্দ নয়। আর গলার আওয়াজও ঠিক যেন—একেবারে চটী জুতো। আর নাক!—আঃ কি নাক!—চম্পটি হে তোমার পোষাক ভালো, নাম ভালো, গলার স্বর ভালো—কিন্তু সব চেয়ে ভালো তোমার ঐ নাকটা।

[প্রস্থান।

সরোজিনী। ক্ষেপেছে! — সখী আমার ক্ষেপেছে। আর সত্য কথা বলতে কি, আমিও ক্ষেপেছি কিছুর কম নয়। ভালোবাসলে সকলেই কি সমান পাগল হয়? চম্পটি যা হোক এক রকম একটা মনুষ্য; কিন্তু আমি ভালবাসি যে একটা জানোয়ারকে। বঝি, যে সে জড়, অপদার্থ, পশু, তবু তাকে ভালবাসি। ভালবাসাটা ভারি গোলমালে ব্যাপার দেখা যাচ্ছে— যাক্। সখীর বিয়ের পরই আমার বিয়ে। যাই।—না, রোস যাবার আগে আমিও একটু কবিত্ব কোরে নেই। [সুরে]—বিনোদবিহারী! আহা—বিনোদবিহারী! ওহো—বিনোদবিহারী হে— কি বলবো, বলতে বলতে গলা আটকে গেল, নইলে একটু বলতাম, ছাড়তাম না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উমেশের বহির্বাটী। কাল—সন্ধ্যা।

উমেশ ও স্নকেশিনী

উমেশ। ওগো শোনো!—বলি শুনছো? পাড়ার লোকে ত সব ঘোঁট করেছে—আমাকে একঘরে কর্বে। মেয়ে বড় হয়ে উঠলো তার বিয়ে না দিলে ত আর জাত থাকে না।

স্নকেশিনী। মেয়ের বিয়ে আবার কি?

উমেশ। সেটা ত দিতে হবে।

সুকেশিনী। দিতে হবে, সে নিজে কৰ্বে।

—পাখা কর; বড় গরম।

উমেশ। [পাখা করিতে করিতে] সে যদি না করে।

সুকেশিনী। না করে না কৰ্বে।—
রুমালটা তুলে দাও!

উমেশ। [আদিশ্চবৎ করিয়া। কৰ্বে কি না কৰ্বে—তা জানাও ত দরকার।

সুকেশিনী। সে আমাকে বলেছে যে সে বিয়ে কৰ্বে না।—দরজাটা বন্ধ কর, বড় draught আসছে।

উমেশ। [আদিশ্চবৎ করিয়া] তবে কি কৰ্বে?

সুকেশিনী। চাকরি। চেয়ারটা সরিয়ে দাও ত, পা রাখি।

উমেশ। [আদিশ্চবৎ করিয়া। চাকরি! মেয়ে চাকরি কৰ্বে?

সুকেশিনী। তার মধ্যে আশ্চর্যটা কি দেখলে? মেয়েরা যদি চাকরি না কর্ত ত চাকরাণী পেতে কোথা থেকে? বেথুন কলেজ চলতো কোথা থেকে? Miss Mary Anderson হোত কোথা থেকে?—নাঃ দরজাটা খুলে দাও বড় গরম হচ্ছে।

উমেশ। [আদিশ্চবৎ করিয়া] তবে মেয়ে চাকরি কৰ্বে?

সুকেশিনী। আমি তাকে Telegraph অফিসে চাকরি করে' দেবো। আর তার চাকরি করারই বা দরকার কি? তোমার অনেক টাকা আছে ত। তুমি রেখে যাবে, সে বোসে বোসে খাবে—জুতোর ফিতেটা বেঁধে দাও ত।

উমেশ। [আদিশ্চবৎ করিয়া] সিদ্ধান্তটা মন্দ কর নি। তবে তাতে আমার একটু আপত্তি আছে।

সুকেশিনী। হু! তোমার আবার আপত্তি—তুমি ত এক ভারি লোক!—তুমি কি আজ বেরোবে?

উমেশ। হাঁ সেই রকম ত মনে করিছি যদি অনুমতি পাই।

সুকেশিনী। আচ্ছা বেরোতে পারো। তবে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে। আমার নভেলটার আর খানিক dictate কৰ্বে।

উমেশ। আবার! — সমস্ত দিন লিখে আঙ্গুলগুলো ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

সুকেশিনী। তুমি ভারি lazy হচ্ছে। নভেলটা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। তবে নায়ক আর নায়িকা এত তফাৎ পড়ে' গিয়েছে, যে তাদের আবার একত্র করা difficult হয়েছে। এ যায়গায় যদি নায়িকাকে মেরে ফেলা যায়, তা হলে tragedy হয়, আর নায়ককে মেরে ফেললে comedy হয়। কি কৰ্বে ভেবে উঠতে পারিনি।—নভেলটা লাগছে কেমন?

উমেশ। অতি সুন্দর—তবে কিনা বন্ধে উঠতে পারছি নে।

সুকেশিনী। Idiot! — শোন দিখি, ছেলেটা কাঁদছে যেন। [কাণ পাতিয়া] হাঁঃ কাঁদছেই ত বটে। যাও, দুধ খাইয়ে এস। কাল ছেলেটাকে মেরে ফেলেছিলে আর কি! দুধ খাওয়াতেও জান না।

উমেশ। না ওটা কখন শেখা হয় নি।

সুকেশিনী। যাও ছেলেটাকে দুধ খাওয়াও গে। আমি বেরোবো।—ছেলেটা কাঁহিল হয়ে যাচ্ছে। তুমি ত দিন দিন নিজে মটোচ্ছ।

উমেশ। ঐ শ্রীচরণের আশীর্বাদে।

দ্রুতবেগে সুবেশিনী ও তৎপশ্চাৎ রমেশের প্রবেশ

সুবেশিনী। দেখ ত সুকেশিনী।

রমেশ। দেখ ত উমেশ।

উমেশ ও সুকেশিনী। কি? কি? ব্যাপার-খানাটা কি?

রমেশ। আমি বলছি, যে ও'র বল্লভবাবুর বাড়ীতে যাওয়া হবে না।

সুবেশিনী। তোমার কথায়?

রমেশ। আমার কথাটা কি গ্রাহ্যের মধ্যেই হ'ল না।

সুকেশিনী। আচ্ছা, তোমার reasons শুন। পরে যদি সঙ্গত হয় বিবেচনা করা যাবে।

রমেশ। তবে শোন, তার সঙ্গ আমার বনিবনাও নেই।

সুবেশিনী। নাই বা থাকলো, আমার সঙ্গ ত আছে।—কি বল সুকেশিনী?

সুকেশিনী। হাঁ বটেই ত।

রমেশ। তুমি আমি কি ভিন্ন?—কি বল?

উমেশ। সত্যিই ত।

সুবোধিনী। ভিন্ন নই। তুমি খেলে কি আমার পেট ভরে?—কি বল সুবোধিনী?

সুবোধিনী। Quite so.

রমেশ। তা যাও। বেশ, আমিও যেখানে খুঁসি যাবো।—কি বল উমেশ।

সুবোধিনী। বটে! তুমি আমি কি সমান।

রমেশ। হাঁ সমান।

সুবোধিনী। তুমি ত আমার ভারি অবাধ্য হচ্ছ?—কি বল সুবোধিনী?

রমেশ। আর উনি আমার ভারি বাধ্য।—কি বল উমেশ?

সুহাসিনীর প্রবেশ

সুহাসিনী। কি তুমি এখানে সুবোধিনী? আমি তোমার বাড়ী হোয়ে এলাম। কি! মিষ্টার সেনগুপ্ত যে এখানে?

রমেশ। [গম্ভীর বিরক্ত স্বরে] হাঁ তাই কি?

সুহাসিনী। লাহিড়ী আর মিসেস্ লাহিড়ী. যে চুপ।

উমেশ। কি আর বলবো দিদিঠাকরুণরা, এই আপনাদের গতিক দেখে।

সুহাসিনী। চল সুবোধিনী, চল সুবোধিনী। Late হয়ে যাচ্ছে। আমার husband বাড়ীতে। আমার আসাতে তাঁর ভারি আপত্তি। তা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।

উমেশ। বেশ করেছেন। উপযুক্ত স্ত্রীর কাজই করেছেন।

উদ্ধবাসে পরেশের প্রবেশ

পরেশ। কৈ? কৈ?

উমেশ। কে? কে?

সুবোধিনী। স্ত্রীকে খুঁজছেন নাকি? এই যে তিনি।—ভয় পাবেন না!

সুহাসিনী। কি! উদ্ধবাসে আমার পিছনে পিছনে ছুটেছো বুঝি?—একটু decencyও নেই!

পরেশ। কি কৰ্ম?—তোমরা যা করে' তুলেছো—

ক্রুদ্ধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে সুরেশ ও সুভাষণীর প্রবেশ

সুরেশ। কাঁড় নেই

সুভাষণী। আলবৎ।

সুরেশ। নেহি হোগা। যানে নেই দেগা।

সুভাষণী। চুপ্ রহো।

অন্য সকলে। কি? কি? হয়েছে কি?

সুরেশ। বল্লভবাবু'র party-তে আমার wife-কে আমি যেতে দেবো না।

সুভাষণী। আমি যাবোই।

সুরেশ। কেমন যাও দেখি।

সুভাষণী। কেমন রাখো দেখি।

পুরুষগণ। না কখন তা হবে না।

নারীগণ। Get away.

[পুরুষদিগকে ধাক্কাদিয়া ফেলিয়া নারীগণের প্রস্থান।

নব্য হিন্দুরা উঠিয়া, ধূলা ঝাড়িয়া, বিস্ময়ে হত-বুদ্ধিবৎ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন

উমেশ। তাই ত! তাই ত! ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো যে হে।

রমেশ। তা আর বোলে! দেখ দেখি, এ'রা যখন খুঁসী, সেখানে খুঁসী যাবেন। আর আমরা গেলেই যত দোষ।

পরেশ। [মরিয়াভাবে] যাক্ না! কি কৰ্মে? ভাত রেখে দেবে না? বাস! চিড়ে খেয়ে থাকবো।

সুরেশ। না হে না শব্দ, চিড়ে নয়? ঈশ্বর দৃষ্টো কাণ দিইছিলেন তা যে আর থাকে, তা ত বোধ হচ্ছে না।

উমেশ। সত্যি।—দেখ দেখি, গত শনিবার বাড়ী আসতে কতই রাত হইছিল? নটাও হবে না। তা গিয়ে দেখি আহাবের দফায় শূন্য, আর গৃহিণীও খাটের উপর লম্বা।

পরেশ। ও হে সে ত ভালো। আমার অভ্যর্থনার সরঞ্জাম একেবারে এই—[অর্ধচন্দ্র দেখাইলেন] দুরোর খুঁজে না, উঠানেতেই শূতে হোলো।

রমেশ। তোমরা ত একরকম নির্বিবাদে শূতে পেইছিলে। আমার গৃহিণী আমি ফির্বা মাত্র চোর চোর বলে' কুকুর লেলিয়ে দিলে। আমি একেবারে দৌড়।—শেষে একটা বটতলায় রান্নিযাপন।

উমেশ। [সুরেশকে] আর তোমার অবস্থা কি রকম হইছিল? তুমি যে কথা কচ্ছ না!

সুরেশ। [করুণ ভাবে মাথা নাড়িলেন।]

রমেশ। কিছ হইছিল না কি?

সুরেশ। দাদা! সে কথা আর শুনলে কাজ নেই। সে কথা শুনলে শেফাল কুকুরে কাঁদে।

সকলে। কেন? কি? কি?

সুরেশ। আর কি? একেবারে সম্মাজ্জর্নী। —এই পিঠ দেখ!—টিপো না হে, লাগে।—আস্বেত!—[পিঠ দেখাইলেন।]

উমেশ। আহা! তাই ত! তাই ত! করেছে কি?

সুরেশ। আমি বললাম “এবারটা ক্ষেমা দে”! তা সে আরও জোরে! উহু হু হু!!! [ক্রন্দন]

রমেশ। [পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইয়া] বল, কেঁদো না—

সুরেশ। আমি সেই রাতেই গিয়ে থানায় এজাহার দিয়ে এইছি।

পরেশ। বেশ করেছে।

সুরেশ। হাঁ আমি এখন ‘মরিয়া’ হইছি।

রমেশ। কিন্তু এই বিপদের একটা পথ দেখতে হচ্ছে।

উমেশ। তখন ত বলিছিলাম বাপু, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবে! তা ত শুনলে না।

পরেশ। কি করা যায় বল দেখি—আর ত পারা যায় না।

সুরেশ। চল, emigrate করা যাক্। দেশ ছেড়ে চলে যাই। ওদের আর কোন তক্কাই রাখবো না।

উমেশ। যত সব আজগুবি প্রস্তাব। চাকর ছেড়ে যাবে কোথায়? গিয়ে খাবে কি? —চল এখন বাড়ী চল। ওঁদের পায়ে টায়ে ধরে এখন একটা সন্ধি করে ফেলা যাক্।

রমেশ। হাঁ দৌষ ত আমাদেরই!

পরেশ। কি বল সুরেশ! স্ত্রীশিক্ষার আর নাম কব্বে?

সুরেশ। এই নিজের কাণ মল্ছি বাবা! আর না। পুরানো চালই দেখছি ভালো। ভাতে বাড়ে।

[নিষ্ক্রান্ত।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চম্পটি'র আপিস-কামরা। কাল—অপরাহ্ন।

চম্পটি। [পরিভ্রমণ সহকারে] চেহারা-খানা খুব যত্নসই নয়। আর যতদূর দেখা গেল, তাতে figure ত কোন রকম টের পাওয়া গেল না। আর বয়সটাও যেন একটু ওপর কোঠায় পেঁচিয়েছে—তা হোক। বাবা! লাখ টাকা, সোজা নয়। No Joke!—আমি ছাড়ছি নে। হু! Practice!—আর Practice কর্ছিনে। এই রকম পায়ের উপর পা রেখে খাবো। এই চেহারাখানার দাম সত্যি সত্যিই দেখছি যে লাখ টাকা। [মুকুরে স্বীয় মূর্তি দেখিয়া] ঈশ্বর কিন্তু চেহারাখানা খুব দিইছিলেন! মরি মরি—কি হু! আর এই গোঁফ জোড়াটা ওঃ—Grand! সকলের চেয়ে ভাল কিন্তু এই নাকটা,—একেবারে Grecian.—

সরোজিনীর প্রবেশ

সরোজিনী। এই যে চম্পটি সাহেব।

চম্পটি। এ কে, সখী যে!—এস এস। You are thrice welcome—খবর কি?

সরোজিনী। আমার সখী ত একেবারে পাগল।

চম্পটি। পাগল! কেন? What is the matter!—কি হয়েছে! Mad!

সরোজিনী। Mad fad নয়, কিন্তু quite as lad আমরাও আজকাল একটু একটু ইংরাজী পড়ে থাকি।

চম্পটি। Of course আজকাল progress-এর দিনে কি তোমরাই অশিক্ষিত থাকবে? “ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়”—তা এখন কি ব্যাপার? তবে mad নয়?

সরোজিনী। তারি দাখিলই। আপনার চেহারা দেখে ত আমার সখী একেবারে ক্লেপে গিয়েছেন।

চম্পটি। ওঃ—মোটো এই!—By Ajax! চেহারাখানা বোলে চেহারাখানা!—এ চেহারা দেখে ক্লেপবে না? তোমার সখী ত তোমার সখী। বিলাতে মেমেরা—বুঝলে সখী, খাঁটি

মেমেরা—এই চেহারাখানা দেখে কি কত্ত জানো!

সরোজিনী। কি কত্তো?

চম্পটি। শুনবে? তবে শোন—Will you believe me?—আমি রাস্তা দিয়ে যেতাম, আর রাস্তার দুধারে যত মেম—ধপাধপ, ধপাধপ, ধপাধপ।

সরোজিনী। সে কি?

চম্পটি। পড়ে যেত।—বুঝলে না?—fainted, মূর্ছা যেত।

সরোজিনী। ভয়ে?

চম্পটি। Innocent creature বুঝতে পাচ্ছ না? ভয়ে না। প্রেমে, প্রেমে।

সরোজিনী। বলেন কি?

চম্পটি। চেহারাখানা—রং একটু কালো বটে কিন্তু চেহারাখানা সখি—একবার চেয়ে দেখো।

সরোজিনী। [নিরীক্ষা করিয়া] না;—বেশ চেহারা।

চম্পটি। এঃ! মস্কল কল্লে। তুমিও প্রেমে পড়ে না যেন। আমি একা মানুষ, কতদিক সাম্লাবো।

সরোজিনী। না, আমি সাম্লে গিইছি।

চম্পটি। বেশ করেছে।—এখন তোমার সখীর খবর কি?

সরোজিনী। তিনি একখানা চিঠি দিয়েছেন।

চম্পটি। চিঠি! letter! epistle—By Damocles?—দেও দেও! এতক্ষণ দেও নি?

সরোজিনী। সময় পেলাম কৈ? আপনার চেহারার ব্যাখ্যা শুনবো না চিঠি দেব? এই নেন—[পত্র প্রদান]

চম্পটি। সখি!—তুমি ঐ চেয়ারে বোস। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়তমার সখী, সেহেতু আমারও সখী—কিছু খাবে?

সরোজিনী। আঙ্কে না। [উপবেশন]

চম্পটি। চা? roast? ডিম? roast? whisky? champagne? claret?—কিছু না? বল কি? আচ্ছা, তবে ঐখানে বোস! আমি চিঠিখানা পড়ে নেই—

সরোজিনী। পড়ুন।

চম্পটি। [পত্র পাঠ] Well! I

never!—Just the thing! বাঃ!—নিশ্চয়! সখি, নিশ্চয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? Shake hands, my dear. [হস্ত ধরিলেন]

সরোজিনী। ও কি ছাড়ুন না।

চম্পটি। তাও ত বটে। এ দেশের ও প্রথানয় বটে। Barbarous country কি সাথে বলি? তা—যাও এখন। We meet under better stars.

সরোজিনী। মনে থাকে যেন!

চম্পটি। মনে খুব থাকবে।

[সরোজিনীর প্রস্থান।]

চম্পটি। [পত্র পাঠ] যা ভেবেছি তাই! দেখি—প্রথমে “প্রিয়তম” which being translated into civilised language means—“Oh my darling!” “বন্ধুয়া কি আর কহিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি”, কি কটমট language বাবা!

এর মানে কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে। “Be you my husband”—ওঃ! সে বিষয়ে আর কথা। বাবা! লাখ টাকা। সোজা নয়! তারপরে “দাসী শ্রীচরণে”—আহা! যেন চিঠিখানাতে মধু ছাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে গা!—পিপড়ে লাগেনি ত? By Jove! it is luck!—তবে রেবেকা। তাও ত বটে!—একটা স্ত্রী যে already রয়েছে; সে না মলে’ আমার বিয়ে হয়ই বা কেমন করে? শেষে কি bigamy-র charge-এ পড়বো? এ কি হাঙ্গামাই পড়িছি! তা রেবেকা আমার জন্য মর্ত্তে প্রস্তুত হতে পারে। যে ভালবাসে! দেখি, রেবেকা কি বলে—Rebecca! Rebecca!

রেবেকার প্রবেশ

রেবেকা। What dear!

চম্পটি। রেবেকা dear, তুমি মরো।

রেবেকা। “মরো” কি রকম!

চম্পটি। অর্থাৎ die বুঝছো না dear!—Just go and hang yourself like a good girl. There’s a dear! Go.

রেবেকা। Why should I hang myself?

চম্পাটি। যদি তোমার hanging-এ আপত্তি থাকে, I would not insist on it, না হয় prussic acid খাও কিংবা railway engine-এর নীচে পড়; কিংবা dynamite দিয়ে তোমার brains উড়িয়ে দাও, and thus die a civilised sort of death; dear I have no objection to it, শুধু তুমি মরো আর বেশী কিছু করতে হবে না। শুধু মরো। তুমি যদি এটা কর dear, তা'লে I shall be infinitely obliged to you ever afterwards.

রেবেকা। I don't care, মর্তে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

চম্পাটি। আছে না কি? তাও ত বটে! By St Augustine! তা আপত্তি ত থাকতেই পারে দেখাছি।—কিন্তু তবে এখন উপায়—

রেবেকা। কিসের উপায়?

চম্পাটি। তোমার মরা যে বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে। এমনকি, তুমি না মরলে এখন যে কোন মতেই চলছে না।

রেবেকা। কেন dear? Am I a thorn in your side? আমি রাঁধছি বাড়াছি, হিন্দু স্ত্রীরই মত ঘরকন্না করছি।

চম্পাটি। তা হচ্ছে বটে।—তুমি খুব লক্ষ্মণী। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি, তুমি না মলে' dear, যে আমি লাখ টাকা lose করছি।

রেবেকা। কি রকমে?

চম্পাটি। এই আমার একটা জাঁকাল রকম বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মেয়ে হচ্ছে widow, বার্ষিক income লাখ টাকা।

রেবেকা। লাখ টাকা?

চম্পাটি। হাঁ লাখ টাকা। তুমি এখন যদি অনুগ্রহ করে মর, darling!—তা'লে আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। আর তোমাকে খুব ভালবাসবো।

রেবেকা। আমি মরে' গেলে আর আমাকে ভালবেসে কি হবে?

চম্পাটি। তা ত বটে। এত ভারি মৃৎস্কলে পড়লাম ছাই! কি বোলে যে বোঝাই!—দেখ, তুমি যদি দয়া করে' মর, তা'লে তোমার এমন জাঁকালো রকম গোর দেব—যে সে চমৎকার!

বাজি পোড়াব, acetyline lamp-এর procession কর্ব, গোরার বান্দি দেবো,—চাও ত Australian string-band আনবো।

রেবেকা। তা ত বটে। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষটা মর্ষ কেমন কোরে? আমি মর্তে পার্শ্বী না।

চম্পাটি। এঃ—স্ত্রীজাতটা কি unreasonable—কোন মতেই মর্ষ না! নৈলে যে আমি লাখ টাকা lose করছি ছাই।

রেবেকা। আচ্ছা মরা ছাড়া কি আর উপায় নেই?

চম্পাটি। ভেবে পাচ্ছিনে ত।

রেবেকা। Why not divorce. If you must get rid of me, why not divorce me on a false plea.

চম্পাটি। By Madagascar—that is a brave idea—why not divorce?—Of course. You are angel dearest! আমার বরাবর তাই বিশ্বাস। আমি সকলকে তাই বলে' এইছি। Divorce—of course—আমি suit আনবো না তুমি আনবে? চল যা হোক একটা করা যাবে—শীগ্গির চল; dearest তুমি আমার—তোমাকে আর কি বলবো?—Oh derry derry darling! তোমাকে আমার যে মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে [গীত ও নৃত্য] Rom ti rom ti tom,—tim tim tim.

[প্রস্থান।

রেবেকা। Fie! Oh shame! Is he a type of his nation, I wonder! I hope not.

[চম্পাটীর আবরণ ও প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বিনোদের নতুন বাটী। কাল—প্রাহ্ন।

বিনোদ ও সরোজিনী

বিনোদ। কেমন হইল! চম্পাটি সাহেব আর বোঠারগের কেমন আক্কেল দিইছি। এখন কও “গর্দীলখোর” চট্‌পটি সাহেব! এখন আমার দাদার টাকা লইয়া মজা কর বোঠারাগ! কি বল সরোজিনী।

সরোজিনী। কিন্তু তুমি আমায় এখন ভালবাসবে।

বিনোদ। তা বাসবো না আমার সোনার চাঁদ? তোমার জন্যেই ত এ সম্পত্তি পাইলাম। তুমি যে আমারে এত ভালবাস তা এতদিন কও নাই ক্যান্ সরোজিনী? তা হইলে এ কাম ত আরো শীঘ্রাঘর উদ্ধার কর্তে পার্তাম।

সরোজিনী। তোমার জন্যে এটা কর্বোছি বটে। কিন্তু না জেনে আমার সখীর প্রতি নেমকহারামের কাজ করেছি।—আমার মিনতি তুমি এ বিষয় আমার সখীকে ফিরিয়ে দিও।

বিনোদ। ও সোনার চাঁদ! তোমার এত কোমল প্রাণ? তা দিম্ন দিম্ন, তোমার সখীরে কিঞ্চিৎ টাকা দিম্ন। গর্লির পয়সার লইগে তার নিকট ত আর চাইতে হইবে না। তারে মাসোয়ারা কিঞ্চিৎ দিম্ন।

সরোজিনী। কিন্তু নাথ! তোমাব গর্লি-খাওয়া ছাড়তে হবে।

বিনোদ। সে কি কও? এ্যা ত গিরিমেন্টের মধ্যে ছিল না। গর্লির লৈগে এত কলম, গর্লি ছাড়ম্ন কেমন কৈরা?

সরোজিনী। আমার জন্য গর্লি ছাড়তে হবে।

বিনোদ। এ যে বিয়ে হইতে না হইতে বড়ই জ্বরদাসিত আরম্ব কর দেখি।—আচ্ছা দেখম্ন দেখম্ন—হাঁ গর্লি ত্যাগ করম্ন।

সরোজিনী। আর আমায় চরণে রাখবে?

বিনোদ। চরণে কি কও, তোমারে স্কন্ধে কৈরা রাখম্ন।

[নিষ্কান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—চম্পটিংর নতুন গৃহ। কাল—প্রভাত।

চম্পটিং একাকী

চম্পটিং। বিয়ে কোরে ত কোন সর্বিধে কর্তে পাল্লাম না। Widow-র বিষয়টা হাত-ছাড়া হয়ে গেল।—কে জান্ত যে বিধবা বিয়ে কল্পেই তার পূর্বস্বামীর বিষয় হারায়। আমি কোথায় লুকিয়ে বিয়ে কল্পাম, পাছে কেউ কেড়ে নেয়—তার এই ফল। পেটটুকের এই দশাই হয়ে থাকে।—এই যে আমার নবীনা

প্রেয়সী আসছেন। মেজাজটা একটু গরম কর্তে হবে।

ইন্দুমতীর প্রবেশ

চম্পটিং। আমার সঙ্গে জুচ্চুরি!—

ইন্দুমতী। হাঁ! জুচ্চুরি!—কিসে?

চম্পটিং। দেখতে পাচ্ছে না? নেকি!

ইন্দুমতী। কি দেখতে পাচ্ছনে।

চম্পটিং। যে এ the frying pan থেকে to the fire হলো।

ইন্দুমতী। সে কি?

চম্পটিং। বুঝছো না? নেকি! এই তোমার বিষয়টা হাতছাড়া হয়ে গেল। আর আমার ঘাড়ের একটা বোঝা নামতে না নামতে আর একটা বোঝা এসে পড়লো।

ইন্দুমতী। তা আমি কি কর্ব, আমার কি দোষ? তুমি আমায় বিয়ে কল্পে কেন?

চম্পটিং। 'কেন' জান না? তোমাকে কি বিয়ে করেছিলাম? না তোমার টাকাকে বিয়ে করেছিলাম। তুমি ত একটা বিসর্গ। তা সে টাকা ত কর্পরের মত উড়ে গেল। এখন ভাঁড়টা নিয়ে আমি কি কর্ব?

ইন্দুমতী। তা আমি কি কোরে জানবো? তুমি ত আইন জান্ত।

চম্পটিং। আরে আইনই যদি জান্তাম, তা' তালে কি আর বিয়ে কর্তে যেতাম? Practice কর্তাম।

ইন্দুমতী। [চক্ষু বন্দ্র দিয়া ক্রন্দন]

চম্পটিং। আর কাঁদতে হবে না। এখন তুমি নিজের পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি। আমি জানি, আমার জীবনে কোন রকম সর্বিধে হবে না। এ, জীবনে যত রকম চলানো যেতে পারে চলিইছি বাবা। Briefless barrister হওয়া, মেম বিয়ে করা, তাকে divorce করা; পরে আবার এক portionless widow বিয়ে করা—যত রকম হতে পারে। এখন একটা প্রায়শ্চিত্ত কল্পেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। এখন তবে অনুমতি কর, এ দাস বিদায় হোক। সন্দরি! প্রেয়াসি! পিতামহি! আজ্ঞা করো, বিদায় হই।

ইন্দুমতী। আমি তবে কোথায় যাবো?

আমার সম্পত্তি গিয়েছে, জাত গিয়েছে।
কোথায় যাবো?

চম্পটি। কোথায় যাবে? চুলো আছে,
হিমালয় পর্বত আছে, Terai jungles
আছে, বাউলের দল আছে, মেয়ে যাত্রা আছে,
যেখানে খুঁসী যাও! আমার কোন আপত্তি
নেই। আমিও যাই—যমের দয়ার খোলা আছে,
Theosophical Society আছে, কংগ্রেস
আছে, কলিকাতার রাস্তা আছে, যেখানে হয়
যাবো।

ইন্দুমতী। আমাকে কি কেবল টাকার
জন্যই তুমি বিয়ে করেছিলে?

চম্পটি। নৈলে কি, যাও, আর রাগিও না
বলছি। যাও! লক্ষ্মীটি আমার! মানিক
আমার! বদ্রঙের গোলাম আমার! হুইস্কি-
শূন্য বোতল আমার! কৃপা কর। বিদায় হও!

ইন্দুমতী। আমি কি তোমার কোনই
কাজে লাগবো না; আমি তোমার বাসন
মাজবো, ভাঁড়ার রাখবো, রাঁধবো, ঘরকন্না
কর্ব—

চম্পটি। আরে ঘর থাকলে ত কন্না করবে
—যাও বলছি।

ইন্দুমতী। হায়! পুরুষজাত কি এমনি
স্বার্থপর! আমরা স্ত্রীজাতি; আমরা অবস্থা-
গুণে যাদের পরাধীন, তারা কোথায় আমাদের
ভরণপোষণ করবে—না আমাদের বিয়ে করে
তারা বড় মানুস হতে চায়। ধিক্ পুরুষগণ,
তোমাদের টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা
আছে! অন্য যথেষ্ট উপায় আছে—ব্যবসা
আছে, বাণিজ্য আছে, চাকরি আছে, পেটেন্ট
মোর্ডিসিন আছে, চুরি আছে, ঘৃষ আছে; তার
ওপরে আর আমাদের বধ কোরে টাকা করবার
চিন্তা কর কেন? আমরা নিরীহ জাত,
আমাদের ছেড়ে দাও।

চম্পটি। আরে তাই ত ছেড়ে দিচ্ছি। ভুল
হয়েছে, দোষ হয়েছে, অন্ততাপ হয়েছে। এই
নেও নাকে খৎ দিচ্ছি।

ইন্দুমতী। এখন বুঝতে পারিছ যে,
পৃথিবীতে প্রেম বোলে জিনিষটা নেই—প্রেমের
জন্য বিয়ে করা ভুল; হা অদৃষ্ট!

চম্পটি। তা আর বোলে?—আমি দ্বার
বিয়ে করেছি—একবার প্রেমের জন্যে, একবার

টাকার জন্যে; দ্বারই ঠকিছি। Logically
দাঁড়াচ্ছে যে বিয়ে করাটাই mistake.

[প্রস্থান।

ইন্দুমতীর গাইতে গাইতে প্রস্থান
কীর্তন

কেন খুঁজতে যাস্‌রে বিমল প্রেম, এ জগতে ভাই।
কেন মিছা খুঁজা পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা, শূধু রে প্রাণদান—প্রতিদান বেচা-কেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর

অভিমানময়;

শূধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন, চাহনি চুম্বন ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হোলে আশ, মিটলে পিয়াস,

মিলাইয়ে যায়;

কেন চাস্‌ হেথা বল্‌ সে প্রেম অটল,

তারা সম স্থির;

এ সঙ্গীত মহান্‌ গগনের গান, নয় এ পৃথিবীর;
বার দ্‌ একটিবার—পথহারা স্বর

মাঝে মাঝে মোরা পাই।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উমেশের বাটী। কাল—সায়াহ্‌।

উমেশ, পরেশ, রমেশ, সুরেশ, সুরেশিনী,
সুরেশিনী, সুরহাসিনী ও সুরভাষিনী

গীত

রমণীগণ। We—oriental, beauties :—
Did our domestic duties
As we're by nature fit ;
To teach us different,
wholly

Was your stupendous
folly ;—

পুরুষগণ। It was, we quite admit,
Our dears, it was,
we quite admit.

রমণীগণ। We cooked you decent
dinners
Till you—poor reckless
sinners

You sent us to the school;
You taught us conics,
Statics, history and
Mathematics,

পদ্রুশগণ। Which made you darned
conceited and which
made you precious fools.
রমণীগণ। To please our husbands
ever
Has been our best
endeavour,
Till, through sheer
thoughtlessness ;
You changed our
manners gentle
To manners occidental,
পদ্রুশগণ। And made a pretty mess,
our dears,
And made a pretty mess,
রমণীগণ। Your Mills and Herbert
Spencers
Had failed to make you
men, Sirs,
You, for their precious
sake,
Made us forget our
Geeta,
Our Sabitri and Seeta ;
পদ্রুশগণ। A terrible mistake, our
dears, a terrible mistake.
[নিষ্কান্ত।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চম্পাটির নতুন বাটী। কাল—প্রাতঃ।

হুঙ্কা হস্তে বাঙালীবেশে চম্পাটি ও সিগারেট
মুখে তর্কপণ্ডানন

চম্পাটি। এখন একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা
দিয়ে ফেলুন তর্কপণ্ডানন মহাশয়। যা হবার
তা ত হ'ল—এখন একটা দিন টিন ঠিক
ক'রে—

তর্ক। তা ব্যস্ত হও কেন বাপু। শাস্ত্রই
আছে—“যেন ধুবানি পরিত্যজ্য অধুবানি
নিষেবতে” তার জন্যে আর ভাবনা কি!
প্রায়শ্চিত্ত কল্পেই সব দোষ কেটে যাবে।

চম্পাটি। প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হ'লে আমাকে
কি কত্তে হবে?

তর্ক। এই, ব্রাহ্মণকে কিছুর অর্থ বিতরণ
কত্তে হবে। তার পরে শাস্ত্র আছে—“মাথা-
মুণ্ডং ঘোলং বর্ষেৎ” অর্থাৎ কিনা, মাথা
মুণ্ডিয়ে ঘোল ঢেলে একটু গোময় খেতে
হবে।

চম্পাটি। গোময় কি?

তর্ক। গোময় কিনা গোবর।

চম্পাটি। খেতে হবে?

তর্ক। হাঁ বাপু, অত সব গবাদি অখাদ্য
খেয়েছো, সব দোষ কেটে যাবে।

চম্পাটি। তার চেয়ে একটা জোলাপ নিলে
হয় না?

তর্ক। তা বাপু না হয় পরে একটা
জোলাপও নিও কিন্তু গোময় একটু ভক্ষণ
কত্তে হবে।—নামমাত্র। প্রায়শ্চিত্তের প্রথা বাপু
মেনে চলতে হয়।

চম্পাটি। তা হোক, একটা হ্যান্ডা নাস্তা
করুন। একটা দিন ঠিক করুন।

তর্ক। আচ্ছা বাপু, এখন তবে আমি
আসি। পরে যা হয় বিহিত করা যাবে।

[প্রস্থান।

চম্পাটি। যাক্ ছাই! প্রায়শ্চিত্তই করা
যাক্। বেঁচেছি; বাপু! বিলিতি চাল কি
আমাদের দেশে পোষায়? বিলিতি লাগল কি
আমাদের দেশের গরুতে টানতে পারে? না
বিলিতি পোষাক বাঙালীর অঙ্গে শোভা
পায়? না বিলিতি খানা এ দেশে সহ্য হয়?
একে তো এদেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তার
উপর বিপর্যয় খরচ।—এই ভোলা, ওরে
ভোলা রে!

ভোলা। এজ্ঞে।

ভোলার প্রবেশ

চম্পাটি। দেখ ভোলা এক ছিলাম তামাক
সেজে নিয়ে এস ত বাপধন।

ভোলা। যে এজ্ঞে।

চম্পাটি। এই দেখ, চাকর-বাকরের সঙ্গে
ব্যবহার! তাড়া দিয়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে
বটে, কিন্তু ভালবাসা পাবে না। আগে চাকর-
বাকর বাড়ীর পরিবারের মধ্যে গণ্য ছিল—
রাধুনি হোত মাসী, খানসামা হোত দাদা।
তাদের ছেলোপিলেদের মূনিবেরা কোলে নিত।

এখন মর্দনবেরা কুকুরের ছানা কোলে কর্ষেন,
কিন্তু চাকরের ছেলিপলেকে কোলে কর্ষেন
না। তার effect হোল এই, যে আজ একজন
চাকর যাচ্ছে, কাল আর একজন আসছে।
তামাক এনেছো বাবা? রাখো।

ভোলার তামাক লইয়া প্রবেশ ও
তামাক দিয়া প্রস্থান

চম্পটি। [তামাক টানিতে টানিতে] আঃ
—তামাক টেনে বাঁচা গেল। কেমন দিশী চাল
দেখ দেখি বাবা!—এক পয়সার তামাক কেনো,
দশজন মিলে সমস্ত দিন খাও। কিন্তু এক
একটি ভাল সিগারের দাম—বাঁবা—অন্ততঃ এক
এক আনা। আর তাও মোটে একজনে খেতে
পারে মাত্র। বাপ্! সাহিবী করা কি এ গরিবের
দেশে পোষায়? চেয়ার চাই, টেবিল চাই,
ক্যাবিনেট্ চাই; আরাম চেয়ার চাই। আর্ষ্য
ঋষিগণ কেমন সর্বাধিক কোরে গিয়েছেন দেখ
দেখি; একখান তক্তাপোষের উপর এক সতরণ
বিছাও—তাতে যত খুসী লোক বোস, শোও,
নাচো, গাও—আর গড়গড়ি টান,—বাস্।
এখন বেশ বদ্বতে পাচ্ছি যে ছেঁড়া
পেন্টেলনের চেয়ে ছেঁড়া ধূতি-চাদরই
বাঙালীর অঙ্গে শোভা পায়—দেখতে পাচ্ছি
যে ছেলেমেয়েগুলোকে ফির্নিংর ছেলে করার
চেয়ে বাঙালীর ছেলে' করাটাই বহুৎ আচ্ছা।
দেখছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙালীর
পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙালীর
বাঙালিয়ানাই বহুৎ আচ্ছা।

নবম দৃশ্য

গীত

হ'ল কি? এ হ'ল কি? এত ভারি আশ্চর্য্য!
বিলেত ফের্তা টানছে হুঙ্কা,
সিগারেট খাচ্ছে ভর্চার্য্য!

হোটেল ফের্তা মন্সেফ ডাকছে

“মধুসূদন কংসারী”!

চট্ চট্টির দোকান খুলে দস্তুর মত সংসারী।

ছেলের দল সব চশমা পোরে—

বোসে আছে কাটখোটা;

সাহেবেরা সব গেরুয়া পরছে,

বাঙালী নেকটাই হ্যাটকোটা,

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত

ছেলেবেলায় খান নি কে?

ভব-নদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহিকে।

পদ্য গদ্য লিখছে সবাই কিন্ছে না-ক কিন্তু কেই;

কাটছে বটে—পোকায় কিন্তু,

জ্বরচন্দ্র গোকুল মাইতি—বাড়ছেন লম্বা চওড়াতে;

বিদ্যারত্ন—দরকার শূধু বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

পদ্রুশেরা সব শূধু বসে'

মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে;

গাচ্ছে এমনি তালকাণা যে

শূধু তা পীলে চমকাচ্ছে;

রাজা হচ্ছে শিল্পশাস্ত্র প্রজা হচ্ছে জবর্দার;

মর্দনব কচ্ছে আজ্ঞা হুঙ্কর চাকর কচ্ছে খবর্দার।

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমণ্ডে নাচছেন গিয়ে আনন্দে;

ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম

হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে;

শাস্ত্রবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্গ ধার,

স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবর্গবে বেশীমাত্রায় কর্ণধার।

ঘর্নিকা পতন

আর্য্যগাথা (১ম)

উদ্বোধন

Blest pair of sirens, pledges of Heaven's joy
Sphere born harmonious sisters, Voice and Verge
Wed your divine sounds—

J. MILTON.

সংগীত

আইস সংগীত আজ বাসি মোরা দুই জনে,
গাইব প্রমত্ত কভু—বিষন্ন—বিমদুগ্ধ মনে।
নবীন ঝঙ্কারে আজ,
গাইব ভারত মাঝে,
উঠিবে সংগীতধ্বনি উন্মত্ত পবনভরে:
শূনি সে সংগীত, সবে,
মাতিবে—বিমদুগ্ধ হবে,
কভু বা বিষন্ন হয়ে শূনিবে সে সমস্বরে।
অথবা হাসিবে বিশ্ব?—ভাবি না তাহার তরে।
বিপদ তুফান মোর আলোড়িত হৃদয়-নদী,
মাঝে মাঝে হৃদি দিয়া হৃৎকারিয়া যায় যদি।
তোমারে নিকটে হেরি,
সে বিপদ তুচ্ছ করি,
চলে যাব মৃত্যু পাশে আনন্দে—নিভীক প্রাণ;
তুফান মাঝার দিয়া,
যাবে নদী কল্লোলিয়া,
আলিঙ্গনে নীল সিংধু গাইতে গাইতে গান।
—আকুল নদীর সেই সাধের বিরামস্থান।

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সংগীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্য্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুমঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে,
ঢালিব আর্থের কানে,
উঠিবে অর্ধদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।
তৃণ পত্র নিদ্রা যায়,
ঢালিব স্ফর্দলিঙ্গ তায়,
প্রজ্বলিবে দাবানল অর্মানি হৃৎকার করি।
—সে ভীম অনলদৃশ্য হেরিব নয়ন ভরি।

বিষন্ন হইয়ে কভু গাইব করুণ তানে
পূজিব বিষাদ দেবে অশ্রুজল ফুল দানে।
ক্ষতি নাহি, হাসে কেহ,
চাই না মৌখিক স্নেহ,
ভাল বাসি নরে—তার এই যদি পরিণাম,
গায় সঙেগ নদীগণ,
দীর্ঘশ্বাসে সমীরণ,
তা হলেই তুচ্ছ রব—পূর্ণ হবে মনস্কাম।
চাই না কাপট্য করি সহ বেদনার নাম।
প্রকৃতি জননী, আসি প্রতিসন্ধ্যা একবার
তাঁহার শিক্ষিত গীত গাইব নিকটে তাঁর,
সাগর জ্বীমুত ঘন,
পিকরাজি, সমীরণ,
গাইলে নিস্তব্ধ হয়ে শূনিব সে সমস্বর:
শূনিতে শূনিতে গান,
আমিও ধরিব তান,
দেবীর গীতের গান ঈশগীত উচ্চতর।
—দেবীস্তুতি—ঈশস্তুতি—যে প্রকৃতি সে ঈশ্বর।

প্রকৃতিপূজা

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দর্শন।

বীণা

গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
শূনি জননীর স্তুতি ভাসুক—ভরুক প্রাণ।

এত স্নেহতরে মার
কি দিব কি আছে আর
বিনা এই কণ্ঠস্বর, বিনা অশ্রু প্রতিদান।
গাও, সে মদিরা পানে
সানন্দ—উন্মত্ত প্রাণে
প্রেমাশ্রুতনয়নে সঙ্গি আমিও ধরিব তান।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
যেমাতি কিলীর স্বরে
কোলাহল দর করে,
বসুধার তাপ জ্বালা হয় অবসান:
সেই অপার্থিব হবে
এ তুফান স্থির হবে,
হৃদয়ের চিতা-বহি হইবে নিৰ্ব্বাণ।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান। ১ ॥

প্রকৃতি-স্তোত্র

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন,
তোমার মহিমায় রচনা মনোরঞ্জন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তথায় নিস্পন্দ রাখি
মুগ্ধভাবে শোভায় করি শোভা নিরীক্ষণ।
উদ্ধেৰ চন্দ্র রবি তারা নীল নভস্থলে, (দেবি)
বিপদলা বসুধা পৃথিবী পড়ি পদতলে;
সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগ যুগান্তর
রহে প্রতি উন্মিষায় করি ফেন উর্গরণ।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

রবিতপ্ত মরুস্থল ঘোর ভয়ঙ্কর, (দেবি)
নিষ্কর্ন গহনরাজি, বিরল প্রান্তর,
তুঙ্গ শৈলরাজি তায়, রহে ব্যাপি মেঘপ্রায়
ঈশ্বর চিন্তায় স্তম্ভ তাঁর ধ্যানে নিমগন।
নদনদী বসুধার হৃদয়-রতন (দেবি)
তরুলতা, তুণ শ্যাম কান্ত উপবন;
সুন্দর কুসুমরাজি, কোমল সৌন্দর্য্যে সাজি
পবিত্র নীহার-জলে শোভে হৃদয় মোহন।

গম্ভীর সুন্দর ভাবে ভূষিত করিয়ে (দেবি)
রাখিয়াছ সকলি হে ব্রহ্মান্ড শোভিয়ে;
এই সবে নিরাখিয়ে, আনন্দে ভরিত হয়ে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় ক্ষুদ্র নর মন।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন। ২ ॥

আকাশ

হে সুনীল নভঃ অনন্ত অপার!
কত কাল আছ, কত কাল রবে
অসীম বিস্তার!

আনে উষা হৃদে নব প্রভাকর,
ফুটায় সন্ধ্যায় কুসুম সুন্দর,
প্রশান্ত হৃদয়ে লয়ে আসে নিশি
নিশীথ রতন বিধু সুকুমার।
হে আকাশ তুমি নীলিমা জলধি,
লহরী সমীর খেলে নিরবাধি,
রতন তারকা,—তরণী নীরদ,
দেবতা অঙ্গুরা নাবিক তাহার।

কত বার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দহীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব:
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার;
নিস্পন্দ নয়নে, অই জ্যোতির্ম্ময়ে
নিশীথে রতন-খচিত হৃদয়ে
নিরাখি নিরাখি স্তম্ভ হয়ে থাকি,
চাহি না হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্ব আর। ৩ ॥

দিনমণি

জ্বলন্ত গোরব! মহান সুন্দর!
জীবন্ত বিস্ময়! দেব প্রভাকর!
মুক্তিকায় বন্ধ বিস্মিত মানব,
পূজে জানু পাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।
জাগাও প্রত্যহ, কোথা হতে আসি,
ঘুমন্ত জগতে ঢালি কররাশি,
পুনঃ নিদ্রামগ্ন করিয়ে বসুধা
মধুর সন্ধ্যায় কোথা যাও চলি।

কোটি গ্রহ তারা তোমার আদেশে,
ছুটিছে অপ্রান্ত নীল নভোদেশে,
তুমি দীপ্ত রবি ভ্রমিছ অবাধে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত উজ্জল অম্বরে।

গোঁরবে আসিয়া যাও সগোঁরবে
বিষন্ন তিমিরে ডুবাইয়ে ভবে,
জ্বালি দিয়া নভে নভোদীপরাজ
যাও চল দেব বিশ্বামের তরে।

মানবের ক্রীড়া কি ছার বিজ্ঞান,
বর্ণিবে তোমার শক্তি সূমহান্!
প্রতিদিন আসি যাবে প্রতিদিন
বিমল জ্যোতিতে ভাসায়ে সংসার।
শৈশবে যেমতি আনন্দে বিস্ময়ে
হেঁরিতাম, হেঁরি আজো স্তম্ভ হয়ে,
শেষ দিন দেব বিস্মিত নয়নে
হেঁরিব জ্বলন্ত মাধুর্য্য তোমার। ৪ ॥

একটি নক্ষত্র

নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া
সুন্দর অম্বরে।
নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধার।

মুদিলে কুসুম সুরভি কাননে,
ফোট ফুল সম আকাশ উদ্যানে,
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।
চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপরশি,
কেবল তারকে বড় ভালবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে। ৫ ॥

চন্দ্র

গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারি ধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি সারি।

হেলে দলে, ঢলে ঢলে,
পিড়িছ গগনতলে,—
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি। ৬ ॥

নীহার

সুন্দর নীহারবিন্দু পবিত্র কোমল।
নীর্বে নিশীথে ঝর মধুর নিস্মল।
প্রতি নিশি প্রেমজলে, ভাসাও রে ধরাতলে,
ভিজাও রে পত্রাবলি নব দূর্ষাদল।
নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল;
সদা মানব-রোদন, শূনি কিম্বা তারাগণ,
নর-দুখে সমদুখী ফেলে অশ্রুজল।

কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল;
কিম্বা বিভু-প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল। ৭ ॥

নক্ষত্র

গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভঃ শোভিয়া।
তপন নিস্বাণ হলে,
ভাস রে গগনতলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদ রে আঁধারে বসি
কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি
সখে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নেপরে
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া। ৮ ॥

সন্তমীর শশী

গভীর গভীর নিশীথে আসি।
সুন্দর সুনীল গগনে ভাসি,

কে নীরবে তুমি জীবন্ত মাধুরি
নিশীথ আঁধারে উদ্ভিত হও হে।
মধুর মধুর নবীন করে,
আকাশ প্লাবিয়া হরষ-ভরে,
দূর প্রান্ত হতে স্তবধ জগতে
কোমল কিরণ ঢালিয়ে দেও হে।

বুঝিবা নিদ্ৰিত হেরিয়ে ধরা,
স্নিগধ স্বর্গীয় মাধুরি ভরা
অমরার দীপ নভ চন্দ্রাতপে
জ্বালি ঝিলীরবে সঙ্গীত গাও হে।
অথবা নন্দন কুসুম করি
পূরব পবনে পড়েছ ঢালি,
নভোবনে ক্ষুদ্র তারা পুষ্প মাঝে
কিরণ সৌরভে গগন ছাও হে।

অথবা তাপিত ধরায় হেরি
আন সুশীতল কিরণ বারি,
অমল শীতল স্নিগধ কিরণে
নিশীথে সখীরে স্নান করাও হে।
অতুল কোমল মাধুরি লয়ে,
গৌরবে পূরবে উদ্ভিত হয়ে,
তারাদল সনে স্তবধ গগনে
নীরব রাজত্ব করিয়ে যাও হে। ৯ ॥

জ্যোৎস্নান্নাত গগনে মেঘখণ্ড

কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে,
শশিমাখা সুনীল অম্বরে।
চলিছ ধীরে, মৃদু সমীরে।
নির্মল শশিকর নীরে,
রে গগন তরি গগন মাধুরি,—
বিমল গগন সাগরে।

মধুর হাসি, আনন্দে ভাসি,
ছড়ায়ে তব রূপরাশি,
একাকী সুন্দর, গগনে বিহর,
রূপে মোহিয়ে নারী নরে।
কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে। ১০ ॥

মেঘ

পবিত্র সলিলভরে ভারত পূর্ণ হৃদয়ে,
আসিছ কি কাদম্বিনি আনন্দে ভারত হয়ে।

সুনীল অম্বরতলে, উড়ায়ে কাদম্বকুলে,
আনন্দে নুচায়ে শিখী, মন্দ মন্দ গরজিয়ে।
যেন সিন্ধু হৃদি পরে, সিন্ধু যান ক্রীড়া করে,
তরঙ্গ তরঙ্গ ঘায় হেলি দুলি উছলিয়ে।
কেমন সুন্দর ছায়, ছাইল ধরণী কায়,
হাসিল পৃথিবী যেন নব বাস পরিধিয়ে।
আইস সলিলভরে ভারত পূর্ণ হৃদয়ে।

হেরিলে ও রূপ তব, শুনিলে গম্ভীর স্বব,
বিগত শৈশব কাল আসে হৃদি আলোড়িয়ে;
তখন তোমায় হেরি, হৃদয় আনন্দে ভারি—
বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে উল্লাসি যেতেম ধেয়ে,
স্বর্গীয় দূত কি তুমি, উল্লাসিয়ে মর্ত্য ভূমি,
আস নভে মাঝে মাঝে সুনীল সৌন্দর্য লয়ে
পবিত্র সলিলভরে ভারত পূর্ণ হৃদয়ে। ১১ ॥

গিরি-নির্ঝরিণী

ঝর ঝর স্বরে, কে উচ্চ অম্বরে,
গিরিশৃঙ্গ হতে পড় গিরিশিরে।

স্বর্গদূত ভাবি নিয়ত তোমায়ে
ভ্রমর-সেবিত জড়িত নীহারে
সধুপ চন্দন, লয়ে ফুলগণ,
পূজে তরুরাজি আসি তব তীরে।
বিমল তির্টিন! বিমল গগনে
কেন না ভাসিলে গ্রহ তারা সনে,
কেন মর্ত্য আসি, পবিত্রতা নাশি
মাখিলে কলুষে বিমল শরীরে। ১২ ॥

তরুপত্র

ধীর মৃদু বায়ুভরে দোল ঘন পত্রাবলি।
বিটপীর রুদ্ধদেহে মাধুর্য-তরঙ্গ তুলি।
পোহাইলে বিভাবরী, কেন দেহে অশ্রু হেরি,
নিজে দুখী, কোলে লয়ে সহাস কুসুমকলি।

গাও কি মর্ম্মরতানে, সন্ধ্যায় বিষন্ন প্রাণে
কি ভাব লুকায়ৈ মদুখ সকল নিশীথ কালি।
ভাব কি ঝরিলে পরে, পড়ে রবে অনাদরে,
যাবে অহংকারী নর তোমারে চরণে দলি। ১৩ ॥

কাননকুসুম

কে আছ রে শোভি এই বিজন কাননে।
উদ্যান ত্যজিয়ে কি গো এসেছ এ নিরজনে?

তোমারে নিষ্ঠুর নরে, ছিঁড়ে নিজ সুখ তরে,
এসেছ সে দুখে, কিম্বা ভ্রমরের জ্বালাতনে।
নরের বিশ্বাস ঘায়, সংসারের শূঙ্ক বায়,
কলুষিবে দেহ তাই এসেছ এ তপোবনে।

হেরিলে পবিত্র প্রাত, হইয়ে শিশির-স্নাত
পূজ দেব সবিতারে প্রেমপূর্ণ দরশনে;
নিষ্পাপ! ঝরবে যবে, কান্ত দেহ পড়ে রবে,
যাবে প্রাণ মকরন্দ চলে পূণ্য নিকেতনে। ১৪ ॥

কুসুম মধুময়

কুসুম মধুময়।
আপন গোরবে কিবা শোভিছ তরুশাখায়।
সতী প্রেম, শিশু হাসি,
ভুবন সৌন্দর্য্যরাশি,
একত্রিয়ে কে শোভিল তরুবর সমুদয়।
প্রতি সমীর লহরে,
স্বর্গীয় মাধুর্য্য ঝরে;
কভু মেঘে স্থির বিধু যেন সুধা ঢেলে দেয়।
ফুল! ও মধুর হাসি
নিরাখিতে ভালবাসি,
হেরিলে ও রূপরাশি এ হৃদয় মন্ত হয়।
কুসুম মধুময়। ১৫ ॥

কানন অশোক

রে দুখী কাননতরু লোকালয় ত্যজিয়ে।
কাঁদছ একাকী কেন নিরজনে আসিয়ে।
ছড়ায়ৈ মাধুর্য্যরাশি
অধোমুখে দিবানিশি
বিষাদ-প্রতিমে! আছ বিষাদেতে ভাসিয়ে।

বুঝি শাপে দেবসুত
হইয়ে অমরা-চ্যুত
আছে তরু-বেশ ধরি নিরজন শোভিয়ে।
ভুলিতে পার না তায়
স্মরি সেই অমরায়
কাঁদ তাই দেবভাষে দুখ-গীত গাইয়ে। ১৬ ॥

তরু

আনন্দে হাসিছ সদা হে শ্যামল তরুবর।
দোলাইয়ে শাখাবাহু প্রীতিভরে নিরন্তর।
প্রভাতে শিশির-জলে, করি স্নান ফুলদলে,
কর রে অঞ্জলি দান বিভূরে প্রসারি কর।

সন্ধ্যায় কুসুমগণে, ক্রোড়ে লয়ে সযতনে,
গাও রে নিদ্রার গীত সনসনে মনোহর।
নিশীথে অনন্য প্রাণে, শুন ঝঞ্জীরব গানে,
কি আনন্দে শুন তরু
বিহগের কলম্বর। ১৭ ॥

কোকিল

কি সুখে বিহগবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ মরতভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বাসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশে নি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাও রে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ-সংগীত শুনিতে তা'
অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুম্বর, তাই এ
বিজনে আসি। ১৮ ॥

কে গহন বনে

কে গহন বনে
(বসি) প্রকৃতি শোভায়, হয়ে বিমোহিত
তুষে বনরাজি গীতি প্রতিদানে।

বুঝি দুখী কেহ, ত্যজি নিজ গেহ,
সংসারের শঠ শ্বেষের ভয়ে,
আসিয়ে কাননে, গায় নিজ মনে,
সকরণ তানে ব্যথিত হয়ে।
কিম্বা বনদেবী ডাকে নরগণে
লভিতে বিশ্রাম পশিয়ে কাননে। ১৯ ॥

তমসা

স্তম্ভ হয় মন হেরি প্রকৃতি তোমার।
তমসে! শমনস্বসা যবে ঢাক রে সংসার।
আসি নরে সমুদায়, রাখ রাত্রে মৃতপ্রায়,
ঢাক বিশ্ব নীলাম্বর—অনন্ত বিস্তার।
অগম্য গিরিগহ্বরে, গভীরোদধি কন্দরে,
নিবিড় গহন বনে কর রে বিহার।
মৃত্যুর অপর পারে, ও ভীম রূপ বিহরে,
অজানিত ভবিষ্যতে ভ্রম অনিবার।
শুরু হই তম! হেরি প্রকৃতি তোমার। ২০ ॥

সলিল

পবিত্র সলিল! ত্যজি ত্রিদিব কাহার তরে
এসেছ মরত-ভূমে ধরণী পবিত্র করে।
ঘোর গভীর সাগরে, নদনদী হৃদিপরে,
বিহর নবীন নীল প্রাবৃটের জলধরে।
প্রভাতের শতদলে, তরুপদ্রে, তৃণদলে,
প্রতিভাত রবিকরে নাচ রে পবন-ভরে।
হও নরস্পর্শে আসি, কলুষিত অশ্রুরাশি,
করে তার দৃকোচ্ছ্বাস তোমারে সে নীচ নরে।

হে সলিল পার যদি, নিবাতে অনল হৃদি
নিবাও আসিয়া তবে চিতানল এ অন্তরে।
॥ ২১ ॥

বনবিহঙ্গ

বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি।
তুই কি রে দেশত্যাগী আছ বন মগ্ধ করি।
সংসার-বিরাগী পাখী,
ভ্রম কি বনে একাকী,
কুঞ্জবন মাঝে থাকি, ঢাল রে স্বর-লহরী।

আমিও রে তোর মত
সংসারের দুখ যত
তাজেছি জন্মের মত, একা আজি বনে ফিরি।

সাধ হয় তব সনে
রহিব এ নিরজনে,
শুনিব স্বর্গীয় গানে, নিয়ত হৃদয় ভারি।
এ জীবন অবসানে
শ্বেও মম মৃত্যু গানে,
তু' আগে তম্ভিলে প্রাণে আমি দিব অশ্রুবারি।
বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি। ২২ ॥

বনের তাপস আমি

বনের তাপস আমি ভ্রমি সূখে কাননে।
বিসর্জিত সংসার-দুখ, শান্তি-নদীজীবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় আমারে, ঢালি স্বর-সুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর তলে, শূন্যে থাকি যায় চলে
নাচিয়ে গাইয়ে নদী সূমধুর স্বননে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সূখে কাননে।

প্রকৃতি সায়াহ্নে আসি, লইয়ে কুসুমরাশি,
দেখান ভাঙার খুলি নানাবিধ রতনে।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ঘুমাই সকল ভুলে,
প্রকৃতি নিদ্রার গীত গান মম কারণে।
আহরিণে ফুল ফলে, ভ্রমি বনে কুতূহলে,
হেরিয়ে গহন শোভা জুড়াই এ নয়নে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সূখে কাননে। ২৩ ॥

কানন-সুখ

চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।
জীবনের যত জদালা জুড়াব বিজনে।
আহরিব বন-ফলে, বস্কল পরিণয়ে হে।
স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে।
কভু নিবর্ণিগী-কলে, কভু বা নিকুঞ্জে হে,
ভ্রমিব দুজনে সূখে হরষিত মনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

শ্যামল প্রান্তরে, কভু ভূধর উপরে হে,
কভু বা গহন বনে ভ্রমিব দুজনে।

কোমলদী নিশীথে, প্রাতে, ললিত প্রদোষে হে,
বেড়াবে দৃজনে সুখে সুন্দর কাননে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বেড়িয়ে বেড়িয়ে মোরা গাব একতানে হে,
ভুলি তার প্রতিধ্বনি সেই নিরজনে।
পবনের সনস্বন নদী কুলদ্রবে হে,
বিহগের কলস্বরে শূনিব শ্রবণে!
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বনে বনে ফুল তুলি গাঁথি ফুলমালা হে,
পরস্পর গলদেশে পরাব যতনে।
হোরিব হরষে কত, রবি তারা চন্দ্রে হে,
কভু ঘন কাদম্বিনী সুনীল গগনে।
এস মোরা দুই জনে রচিয়ে কুটীর হে,
রব সুখে ভাই-ভগ্নী-তরু-লতা সনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে। ২৪ ॥

নীল গগন

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে।
হের নয়ন, হর্ষমগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব, মানব-রব, নীরব ভব রে।
সুন্দর নব, হেরি বিভব, মেদিনী তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন, প্লাবিত বন রে।
নন্দন বন, তুল্য গহন, মোহিত মন রে। ২৫ ॥

তটিনী

তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।
ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য আনি জগতে মিশাও রে।
অমরা হইতে আসি, আনি স্বর্গ-সুধারামি,
দুগ্ধী মহী-দুখ কি গো ঘুচাইতে চাও রে।

কি প্রভাতে, কি সন্ধ্যায়, নিশার তিমিরে,
গীতের লহরী তুলি যাও কলস্বরে;
তরল সঙ্গীত দিয়ে, নরপ্রাণে মাখাইয়ে
শ্রবণেতে স্বপ্নময়ী সুধা ঢেলে দাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।

একই সান্ধ্য সমীরণ ধীরে যায় লঙ্কে,
উপরে অরুণ রক্ত কান্ত মেঘচয়ে;

নিম্নে সুরঞ্জিত তায়, লহরী কাণ্ডন প্রায়,
যে লহরে হে নীলাঙ্গে! ভুবন ভাসাও রে।

যখন তারকা বিধু নীলাকাশ হতে
কিরণলহরী দিয়ে ভাসায় জগতে,
ঝিল্লীরবে গায় গান, তুমিও ভরিয়ে প্রাণ,
কি মধুর কল্লোলিনি! মৃদু গীত গাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে। ২৬ ॥

বন-প্রবাহিনী নদী

কোথায় হেলি দুলিয়া নদি!
নাঁচিয়া চলি যাও রে।
ললিত মৃদু মধুর রবে
কাহার গুণ গাও রে।
হোরিয়া বৃষ্টি কানন-শোভা
মোহিত তুমি হও রে;
তাই কি নদি বিভুর প্রেমে
মগন হয়ে রও রে!
বিজন বনে বাহিয়া তুমি
তুষ রে বনবাসী;
বিতর সবে বিমল তব
সলিল সুধারামি।
যাও রে পদবাহিনী-
নদী-সখী সন্নিধানে;
শূনাতে তায় বিজন
বনবাসী সুখ-গানে। ২৭ ॥

হৃদ

দিবার্নিশ কেন হৃদ! কাঁদে দুখভরে।
একাকী বিরলে তুমি বল কার তরে।
তুলি ক্ষুদ্র বীচি তব, করি মৃদু কলরব,
কেন, গাও শোকগীত,—কি ব্যথা অন্তরে।
পিঞ্জরের পিক মত, থাক বন্ধ অবিরত,
তাই কি গাও রে দুখে মৃদু কলস্বরে?
তাই দিবার্নিশ হৃদ কাঁদে দুখভরে?

অথবা সংসার ত্যজি, তুমি কি তাপস সাজি,
সলিল-কুটীর রচি ডাক রে ঈশ্বরে।
বিজন কুটীরে তব, আসে ক্ষুদ্র নদী সব,
ত্যজি কোলাহলপূর্ণ দৃষিত নগরে;

তাহাদিগে দয়া করে, ধর হৃদে স্নেহভরে,
দেও রে আশ্রয় ক্ষুদ্র কুটীর ভিতরে।
কিন্তু দিবানিশি কেন কাঁদে দুখভরে। ২৮ ॥

সাগর

রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।
আনন্দে কল্লোলি যাও রে মৃদু-গম্ভীরনাদী!
অযুত যোজন ব্যাপি, অযুত বরষ যাপি,
আছ রবে কত কাল বিস্তারি বিপুল হৃদি?
জলজীবপূর্ণ হয়ে, ধর হৃদে রত্নচয়ে,
তোমারে ভীষণ করি রত্নসু করিল বিধি।

সুন্দরীল গগন সঙে, মিশাও সুন্দরীল অঙে,
উত্তাল লহরীকূলে খেলাও রে নিরবিধি।
গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে, চলি যাও কলরবে,
নিরুদ্দেশে অব্যাহত অবিশ্রান্ত রে বারিধি।
রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি।
॥ ২৯ ॥

সাগর—যাও রে কল্লোলি

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার!
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার!
স্বাধীন তরঙ্গদলে, তুলিয়ে চলিছ তুমি,
গরজি গম্ভীর সিন্ধু চলি যাও অনিবার।
বিস্তারি স্বাধীন বক্ষ, স্বাধীন চিন্তার সম,
সহ না নরের দর্প তার বীর্য অহঙ্কার।

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
বাত্যা প্রভঞ্জন সনে, কর ঘোর রণ তুমি,
একা সম প্রতিপক্ষ তুমি ভীম ঝটিকার।
কাল-বাহু বিশ্বজয়ী ভাঙবে চুরিবে সবে,
বিজয়ী তোমার কাছে সিন্ধু! পরাজয় তার।
যেমতি সৃষ্টির দিনে কল্লোলিতে হে বারিধি!
কল্লোলিবে শেষ দিন—যোগ্য সৃষ্টি বিধাতার।
যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার। ৩০ ॥

প্রভাত

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শব্দরী অবসান!

গেল কৃষ্ণবাস নিশা, দেখা দিল উষা
লোহিত বসন পরিধান।
হীনভাতি হেরি শশী ভাতিল দিনেশ,
ভুবনে জীবন করি দান।
নির্মীলিত নিরাখিয়ে তারকা-কুসুম্বে,
জাগিল ধরায় ফুল-প্রাণ।
নীরব বিল্লীর রব, তাই কুঞ্জে কুঞ্জে
বিহগ ধরিল মধুগান।
হাস্যময়ী উষা দিল মৃছায়ে ধরায়
অশ্রুসিক্ত কোমল বয়ান।
উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শব্দরী অবসান। ৩১ ॥

সন্ধ্যা

কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।
অশ্রুসিক্ত মৃখ মহী তিমিরে লুকায় রে।
দোলে তরু বায়ুভরে, মেঘখণ্ড দোলে ধীরে,
দোলে তার সনে হৃদি মৃদুস্মৃতি বায় রে।
উথলে তটিনী ধীরে, সঙে উথলে অন্তরে,
কেন রে চিন্তার নদী নিরাখিয়া তায় রে।
হেরি সবে কেন মনে, স্মরি দূর প্রিয়জনে,
কেন সবে করে চিত্ত উদাসের প্রায় রে।
কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে। ৩২ ॥

তরী প্রবাহিয়ে

তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।
কি সুন্দর নিশি, কে যাবি আয় রে।
ভাসে সুধাকর নীল গগনে রে,
নাচে নদী-হৃদি-মাঝারে—আয় রে।
বহে সমীরণ তুলি লহরী রে,
নাচে মৃদু তরুবল্লরী—আয় রে।
সব সনে নাচে প্রাণ আমার রে,
শান্ত ধরাতল হেরিয়ে—আয় রে।
তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে। ৩৩ ॥

সমীরণ

ধীরে অবিরত তুমি বহ মৃদু সমীরণ;
অদৃশ্য মানব-নেত্রে বহ বায়ু অনুরুণ।

নিশীথে আন রে কানে,
কি মধু মুরলী-গানে,
সঙ্গীতে মাথায় নিশি করি মনোহরতর;
করিয়ে প্রবাসী প্রাণে সুখস্মৃতি জাগরণ।
লয়ে যাও বিধু করে,
মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে,
চুম্বি চুম্বি ধীরে বায়ু! ফুটন্ত বাসন্ত ফুলে;
মধুর সুরভিষ্বাসে ভাসাও কুসুম বন।
হে সমীর বহ তবে
ভারতে এ কণ্ঠরবে,
থাক ভস্মে অগ্নিকণা রবে না পড়িয়ে তৃণ;
তুমি আছ আসিবে না কেন সখা হৃদাশন। ৩৪ ॥

জন্মভূমি

কি মাধুর্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেঁরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচখে প্রিয় ছবি হেঁরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাই হয় চিতে;
অভূষণ শোভারশি;
মাতঃ তব ভালবাসি:
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার। ৩৫ ॥

ঐ—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে প্রাণে আছি মিশি প্রেমময়ি যার।
পারে পারিতে সে কি ও মুরতি আর।
যখন তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার।
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চার;

যেন বিপরীত বায়ু
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উষ্মমালা খেলে বার বার।
ধনী বা কাঙ্গাল থাকি, এ বিশ্ব সংসারে
যথা যাই ভুলিব না জীবনে তোমারে;
যথা যাই রবে মম
সাগর-লহরী সম
হৃদয়ে অধিকত বিধু মুরতি তোমার।
হৃদয়ের আছে এক প্রিয় মনস্কাম;
যেই দিন পরিহরি যাব ভব ধাম,
সে দিন ও প্রেমমুখে,
হেঁরিতে হেঁরিতে সুখে
পাই ও চরণতলে ত্যজিতে সংসার। ৩৬ ॥

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আর বার।
মুহুর্তের তরে শোক ভুলি একবার।
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে;
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসিপূর্ণ দুটি দুটি
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আর বার। ৩৭ ॥

হাস রে স্বর্গীয় ফুল

হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস রে আবার
ক্ষণতরে ভুলে যাই দুখ আপনার।
আকাশে হাসিলে ইন্দ্র, আনন্দে উথলে সিদ্ধ
গম্ভীর হৃদয়ে খেলে লহরী তাহার

যখন হাস রে শিশু তখন সুন্দর;
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে যবে হাস মনোহর
যেন ফুল্ল রবিকরে, উষায় সরসীনীরে
হাসে পশ্ম বিকাশিয়ে মধুরিমা তার;
আবার রোদন পরে হাস রে যখন
কি নব সুন্দর শোভা ধরে ও আনন!

যেন কাঁদি ঘনরাশি, হাসে ইন্দ্রধনু-হাসি
নবীন মাধুর্যে তার হাসায় সংসার
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার।

হাস তবে মৃদু হাসি, স্বর্গকান্তি পরকাশি,
পবিত্র সুন্দর ভূমি নন্দন-কুসুমকলি;
হৃদয় বিমুগ্ধ হবে, সুধাহাস্য নিরখিবে,
হৃদি দিয়া সুধা বর্ষি সুধাকর যাক চলি;
সুধার সুর্ভাষি শ্বাসে ভাসুক সংসার।
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার। ৩৮ ॥

শিশু (নির্মল কুসুম)

নির্মল কুসুম হাস অনিবার।
স্বাধীন পবনে দোল অবিরত,
ঢালিয়ে সুর্ভাষি-ভার।

পবিত্র নীহারে, প্রাত রবিকরে,
স্নাত হয়ে সুকুমার,
ও স্বর্গীয় শোভা লহরে লহরে
ঢাল ঢাল রে আবার।

যত দিন ফুল কোমল হৃদয়ে
নাহি পশে কীট সব,
হাস তত দিন বিমল হরষে,
বিকাশি মাধুরি তব।

আমাদের হাসি মৃথের কেবল,
মিশ্রিত বিষাদে দৃখে;
স্বরগ-সম্ভব শোভা পায় হাসি
তোমার সুন্দর মৃখে।

হাস রে কুসুম দাঁড়িয়ে অদরে,
দেখি আমি সেই হাসি।
ও পবিত্র তব সহাস বদন,
ফুল বড় ভালবাসি। ৩৯ ॥

জানি না জননি কেন

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।
দৃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমার কাছে কেন খেয়ে আসি।

চাহিলে ও মৃথ পানে, কেন সব ভুলে যাই,
দরে যায় কেন তাপ-দৃখ-তমোরাশি।
জানি না আননে তব কি মৃদু সান্ধনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি। ৪০ ॥

একটী বাসনা

না চাই সম্পদ ধনজনমান।
দাস দাসী শত, সেবিত্তে নিয়ত
গৃহমালা প্রাসাদ সমান।
প্রকৃতি জননী যার, কিসের অভাব তার
রেখেছেন শত পরিজন;
আমার সন্তোষ তরে, সবে প্রাণপণ করে,
—আমারি এ নিখিল ভুবন।

প্রকৃতি আমার তরে, রেখেছেন শির'পরে
নিরমল সুনীল আকাশ;
সুন্দর উজল রবি, কোমল চন্দ্রমা ছবি,
তারাদল গগনে প্রকাশ।

আমারি কারণে ঘন, নিব্বরিণী, গিরি, বন,
ছুটে মত্ত নীল পারাবার;
তরুলতা, ফুলগণ, পিককুল, সমীরণ,
সাধিতেছে নিয়োগ আমার।

বিজন কুটীরে রব, বন-শোভা নিরখিব,
মাতৃকোলে হইয়ে শয়ান।
বিষাদিত হলে প্রাণ, নিজ মনে গাব গান,
পাব শেষে বিরামের স্থান। ৪১ ॥

এত ভালবাস

এত ভালবাস বলি প্রকৃতি আমায়
তাই কি তোমার পানে সদা মন ধায়?
যে ভালবাসে আমারে ভালবাসি তারে;
প্রাণ সহ ভালবাসি তাই কি তোমারে।
না, নিঃস্বার্থ ভালবাসা জানিও আমার,
ভালবাসি, নাহি চাই প্রতিদান তার। ৪২ ॥

প্রকৃতি অন্তিম দিনে

প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
 তাপিত সন্তানে মাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
 শান্তিময় দীপ সম,
 ধরিও মা ক্লান্ত মম
 তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব-তরি।
 তায় শত ক্রেশ ভুলি,
 যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
 নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।

সেই দিন মা তোমার
 সাশ্রুনেত্রে একবার,
 শেষ দিন—প্রেমময়ি নির্খিব প্রাণ ভরি।
 চাহি তব মুখ পানে
 ধীরে মৃদিব নয়নে,
 রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবরি।
 সেই দিন শূইয়ে কোলে,
 —স্থিরনেত্রে—পদতলে,
 স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
 প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি। ৪৩ ॥

কাঁদবে কি স্নেহময়ি

কাঁদবে কি স্নেহময়ি জননি আমার;
 পূজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।
 যে ভালবাসিত এত,
 পূজিত মা অবিরত,
 দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার;
 শেষ দিন যে তোমারে
 বিদাইল নেত্রধারে,
 তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রাসার?
 স্থির পাণ্ডু মুখ পানে
 চাহিয়ে স্থির নয়নে,
 হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার?
 কাঁদবে কি সেই দিন জননি আমার?
 অথবা মা গুণযুত
 হেরিয়ে অপর স্নাত
 এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর।
 না মা, এ পুত্রেরও তরে,
 তরু পত্র মরমরে,
 গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার!

সন্ধ্যা সমীরণোচ্ছ্বাসে
 ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
 ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
 কাঁদবে কাঁদবে দেবি জননি আমার। ৪৪ ॥

ঈশ্বর-স্তুতি

“These, as they change,
 Almighty Father, these
 Are but the varied God”———
 Thomson.

মন ভাব তাঁরে

মন ভাব তাঁরে।
 বিরাজিত যিনি আকাশে, ভুবনে,
 বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।
 তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর,
 যাঁহার সৌন্দর্যে শশাঙ্ক সুন্দর,
 মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার,
 অযুত অযুত তারকার হারে।

যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,
 গাম্ভীর্য যাঁহার জলধি-জীবনে,
 করুণা যাঁহার, নিত্য অনিবার,
 নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।
 কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,
 নিম্মল নীহারে যাঁর নিম্মলতা,
 পবিত্র নিঝরে, যাঁর প্রেম ঝরে
 মহিমা যাঁহার জীমুত প্রচারে।

অপার অগম্য গম্ভীর তাঁহার
 গাও রে মহিমা প্রাণ অনিবার,
 দুখ দুরে যাবে, মনে শান্তি পাবে,
 গাও রে গাও রে অন্তর তাঁহারে,
 ক্লগতরে যাবে শোক তাপ ভুলি,
 দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলিবে সকলি,
 বিশ্ব মধুময় হবে সমুদয়,
 প্রকাশিবে রবি হৃদি-অন্ধকারে। ১ ॥

আহা কি মধুর

আহা কি মধুর দরশন।
 অরুণ-কিরণময় হাসিছে ভুবন।
 প্রকৃতি-সন্তানগর্দল
 তরু লতা হেলি দর্দলি,
 পূর্জিছে বিভূরে ফুলে মাথায় চন্দন।
 গায়ক বিহগ সবে
 মিলিত ললিত রবে,
 তাঁহার মহিমা-গান করিছে কীর্তন।
 এস মোরা সব সনে,
 ঐমলিয়ে পবিত্র মনে,
 প্রীতি উপহার তাঁরে করি রে অর্পণ। ২॥

এস এস এস নাথ

এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি।
 ডাকে, প্রেমময় পিতা তুলি ক্ষুদ্র স্বরে হে,
 সন্তান তোমারি।

ভাসিল আকাশ রবি পরকাশে,
 উর হৃদয়-ভানু হৃদয়-আকাশে;
 গাইল বিহগকুল নব অনুরাগে,
 গাউক এ চিত্ত তব করুণা প্রচারি।

ফুটিল প্রসন্ন সুরভি কাননে,-
 ফুটুক আনন্দ হৃদে তার সনে;
 ভাসায় সুরভি বন নবীন নীহারে,
 ভাসাক্ হৃদয় মম তব প্রেম-বারি।

সুন্দর প্রভাত-সমীরণ বয়,
 কি সুন্দর বিশ্ব পবিত্রতাময়,
 বহুক হৃদয়ে নাথ শান্ত-সমীরণ
 পবিত্র হউক চিত্ত পাপতাপহারি!

নিবিড় অরণ্য এ ঘোর সংসারে,
 শ্রান্ত পথিক এসেছি তব দ্বারে,
 দেও হে আশ্রয় নাথ তোমার কুর্টারে,
 এসেছে সন্তান তব শরণ-ভিখারী।
 এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি। ৩॥

গাও রে আনন্দে সবে

গাও রে আনন্দে সবে মহিমা তাঁহারি।
 পূর্জিয়ে সে রবে বিশ্ব মিলি নর নারী।
 প্রকাশিছে তেজ তপন যাঁহার,
 কোমলতা শশী তারকার হার,
 গায় যাঁর গুণ মেদিনী অপার
 মহিমা প্রচারি।
 ঘোষে সিন্ধু যাঁর মহিমার গানে,
 গায় জলধর ব্যাপিয়া গগনে,
 গায় তরুণগণী সুমধুর তানে,
 করুণা যাঁহারি:
 পূর্জে পূর্জে যাঁরে নিত্য তরুণগণ,
 মাথায় কুসুমে নীহার চন্দন:
 যাঁর গুণগান করিছে কীর্তন,
 আকাশ-বিহারী।
 যাঁহার মহিমা অসীম অম্বরে,
 জর্লধি-বিস্তারে, অচল-শিখরে,
 ঘোর মরুভূমে গহনভিতরে,
 সতত নেহারি। ৪॥

ভাবিলে রচনা

ভাবিলে রচনা এই নাথ তব অতুলিত,
 হয় প্রাণ মন মম, তব প্রেমে পুলকিত।
 হৃদয়-জর্লধি-নীরে, উথলে লহরী ধীরে,
 আনন্দে বিস্ময়ে মগ্ন হয় হে ভকত-চিত।
 হৃদি-কুঞ্জবন হয় নন্দন-সুরভিময়,
 নয়নে হয় হে নাথ প্রেম-অশ্রু বিগলিত।
 যথায় ফিরাই আঁখি, সেখানে তোমারে দেখি,
 সাগরে ভুবনে নীল নভে তুমি বিরাজিত। ৫।

এস হে হৃদয়বন্ধু

এস হে হৃদয়বন্ধু! দরশন দাও দাসে।
 ভাসুক হৃদয়োদ্যান স্বর্গীয় সুরভি-স্বাসে।
 শোক তাপে জর জর, ব্যাকুলিত এ অন্তর,
 হাসুক ক্ষণেক তরে পূর্ণ প্রেম পরকাশে।
 অভেদ্য তিমিররাশি, ফেলেছে হৃদয়াকাশে।
 বিরাজ হে পূর্ণবিধু, তামস হৃদয়াকাশে।

দেও শান্তি দেও প্রীতি, দেও জ্ঞান শুদ্ধমতি,
তব প্রেম যাচি নাথ! পুরাও এ অভিলাষে।
এস হে হৃদয়বন্ধু দরশন দাও দাসে। ৬ ॥

কত আর প্রেমময়

কত আর প্রেমময় করুণানিধান!
কাঁদবে তাপিত তব মানব-সন্তান।
সুখ বিনা কি উদ্দেশে,
আসি নাথ এই দেশে,
কিসের পরীক্ষা—যদি পরীক্ষার স্থান।
সংসারে আসিয়া পিতঃ সহি এত ক্লেশ,
পুনঃ শান্তিভয়ে কেন থাকি পরমেশ;
করি যা এখানে এসে,
করি সব তবাদেশে,
পাপ পুণ্য সকলি ত তোমার বিধান।
আছে জানি আমাদের শত অপরাধ,
তার তরে পিতা পুত্রে হয় কি বিবাদ
সন্তানে যাতনা দিতে,
বাসনা কি হয় চিতে,
বুঝি না এ সব মোরা শিশুর সমান।
স্নেহ করে আমাদের মুছ আঁখিধার,
স্নেহবাক্যে হাসিমুখে বল একবার,
শেষ দিন দোষ ভুলে,
লবে তবে কোলে তুলে,
হৃদয়ের ভয় ভীতি হ'ক্ অবসান। ৭ ॥

বিষাদোচ্ছ্বাস

"But hail, thou goddess sage
and holy
Hail divinest Melancholy."
IL. Penseroso.

সঙ্গীত

এস সখে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার।
দুখেতে সান্ধনা একা তুমি অভাগার

যে তুফানে হৃদি-নদী
আলোড়িত নিরবধি,
এ ভীষণ বেগ তুমি কি জানিবে তার।

তুমি বিনা বল আর
কেবা আছে আপনার
—অহো কি কঠোরতম বিধি বিধাতার।

জীবন আঁধারে মম
উজল নক্ষত্র সম,
এস গাই দুই জনে দুখ দুজনার।
সংসার না শনে তাই
হাসে বিশ্ব ক্ষতি নাই
আপনি মোহিত হব গীতে আপনার।
এস তবে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার। ১ ॥

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না।
নিভে মোর প্রাণদীপ হৃদে চিতা নিভিল না।
জীবন আকাশে মম,
প্রভাত-তারকা সম
প্রতিদণ্ড চলে যায় উষা কিন্তু আসিল না।
ফুরায় রে লীলা ভবে,
তবু কি কাঁদিতে হবে,
শুকায় জীবন-সিঁধু শোক-নদী শুকাল না।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না। ২ ॥

নিশীথে গান শুনিয়া

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান।
মাতিল হৃদয় করি গীতি-সুধা পান।
গায় কি তারকা সবে, মিলিত করুণ রবে,
ভাসায়ে সঙ্গীত-স্রোতে নরনারী-প্রাণ।
স্বর্গচ্যুতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি,
ঢালেন কি দুখপূর্ণ সুমধুর তান।
পাপেতে ব্যথিত প্রাণে, ধরণী করুণ তানে,
গান কি এ গীত দেখি দিবা অবসান;
বিধি কি স্বর্গীয় স্বরে, পাঠালেন দয়া করে,
জুড়াতে নিদ্রিত শ্রান্ত মানব-সন্তান।
নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান। ৩ ॥

দুঃখশোক-পরিপূর্ণ

দুঃখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতলে।
আসে নরগণ হেথা কাঁদিতে কেবল।

প্রতি পদে দুঃখরাশি, আবার জীবন আসি,
 —রোদনের জন্মভূমি এ মহীমন্ডল।
 আজ মৃত পিতা কার আজ কার মাতা,
 আজ কার প্রিয়ভগ্নী আজ কার ভ্রাতা,
 এইরূপ হাহাকারে, শূন্য সदा এ সংসারে,
 মানব-জীবনময় আঁধার কেবল।
 দুঃখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল
 না উঠিতে সুখ-ভানু জীবন আঁধারে।
 অমনি নিবিড় মেঘে আবরে তাহারে।
 না উঠিতে তৃণচয়, চরণে দলিত হয়,
 না ফুটিতে শুকায় রে সুখ-শতদল।
 রয়ে না একটি ফুল এ কণ্টকবনে,
 ভাসে না একটি তারা আঁধার গগনে,
 কাঁদিতে জনম লব, কাঁদিয়া চলিয়া যাব,
 অশ্রুবারি মানবের জীবন-সম্বল।
 দুঃখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল। ৪ ॥

নিরাশা

দুঃখেতে যাপিত মম হল চিরকাল।
 নাহি জানিলাম সুখ—হায় রে কপাল।
 সন্তরিন্দু সরোবরে সুখ-সরোজ আশে,
 দেখি কমলহীন শৈবাল।
 পেতে স্বপ্ন শান্তিময় ভ্রমিলাম সাগরে,
 দেখি সব তরঙ্গ বিশাল।
 অন্বেষিতে সুখোদ্যানে আসিলাম শ্মশানে,
 হায় বিধি মোর কি করাল।
 স্থান দিও পরমেশ নাথ তব চরণে,
 যবে আসিবে হে পরকাল। ৫ ॥

বিষাদ-সঙ্গীত

আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।
 লহরে ভাসায়ে লয়ে যায় যে এ প্রাণ।
 হৃদিতল আলোড়িয়ে, সুখ-স্মৃতি জাগরিয়ে,
 আকুল করিয়ে চিত্ত কে ধরিল তান।
 কে যেন চিরিয়ে বক্ষে, খুলিয়ে স্মৃতির চক্ষে,
 আনিল শৈশব-দৃশ্য স্বপন সমান।
 কে গাইল কে গাইল; অমৃত ঢালিয়ে দিল,
 ভাসাল সুরভিষ্বাসে হৃদয়-উদ্যান।
 আহা কে গাইল এই সুমধুর গান। ৬ ॥

জীবন বিসর্জন

বহিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
 নিশা সম হেরি মহী সূর্নিবিড় অন্ধকার।
 আর এ কণ্টকবনে, থাকি বল কি কারণে,
 কিবা কাজ এ জীবনে চিরদুখী অভাগার।
 কোথা আজ পিতামাতা,
 কোথা ভগ্নী কোথা ভ্রাতা,
 দেখ চিরদুখী হেথা ত্যজিল দুঃখ-সংসার।
 ডুব রে জীবন তবে, কাল-সাগরে নীরবে,
 নাহি তোর কেহ ভবে ফেলিবে যে অশ্রুধার।
 থাকিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
 ॥ ৭ ॥

সান্ধ্য-চিন্তা

ওই যায় দিনমণি হ'ল দিবা অবসান।
 আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব-উদ্যান।
 জীবনের এক দিন
 কাল-জলে হ'ল লীন,
 পৃথিবীর কোলাহলে কেটে গেল দিনমানী
 আবার কাল আসিবে,
 আবার চলিয়া যাবে,
 আবার আসিবে নিশি জাগায়ে তারকা-প্রাণ।
 এইরূপে ধীরে ধীরে
 বহিবে জীবন-তারি,
 ডুবিবে একদা শেষে সাগরে অর্ণব্যান।
 জীবনের সে সন্ধ্যায়,
 বহিবে না মৃদু বায়,
 বিহঙ্গ ললিত তানে গাবে না মধুর গান।
 আসিবে গভীর নিশি,
 আঁধারিয়ে দশ দিশি,
 সে ব্যোমে তারকা চন্দ্র বহিবে না ভাসমান।
 হ'ল দিবা অবসান। ৮ ॥

সুখ বিসর্জন

কেন আর ধরি এ জীবন।
 বিগত সকল সুখ জীবনে মরণ।
 মনোহর এ সংসার, সুন্দর না হেরি আর,
 বহিয়ে শোকের ভার অবসন্ন মন।

গগনে চন্দ্রমা হেরি ভাসে সুখে নরনারী,
কিন্তু কেন অশ্রুবারি ঝরে এ নয়ন।
দেখি নিশা অবসান, পাঁপিয়া গায় রে গান,
কাঁদে কেন মম প্রাণ, শূন্য তা এখন।
কেন বৃথা ধরি এ জীবন। ৯ ॥

নিশীথ

এস তারাময়ি নিশি!
এস দেবী ধরাতলে,
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে
ডাকি আমি তোমারে।
হয় যে সময় হৃদে, বৃকেতে যে শেল বিধে,
তোমা বিনা শান্তিময়ি
জানাইব কাহারে,
হৃদ করি হৃদিতলে, দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি
নিবাও গো তাহারে।
কোলাহলে রবি-করে, হৃদয় ব্যথিত করে,
ভালবাসি এ নিজ্জনে
স্বপ্নময় আঁধারে।
ভরিয়ে ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণেক করিব পান,
অশ্রান্ত স্বর্গীয় তব
মৃদু ঝিল্লী ঝঙ্কারে।
অশ্রুভরা আঁখি দিয়ে, ভরি প্রাণ নিরখিয়ে,
প্রিয়কান্ত তারাগুলি
নভোবন মাঝারে। ১০ ॥

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এস রে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মূর্তি তোমার।
উঘাটি হৃদয়ম্বারে, লয়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয়-আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মৃকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এস রে আমার। ১১ ॥

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরি।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।

প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মরমরে,
প্রতি জ্বলধররাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বালাছবি চিত্রমুগ্ধকরী।
বড় ভাল লাগে মোর, স্বপ্নময় ঘোর ঘোর,
বিষাদে জড়িত ওই বদন তোমারি।
এস এস প্রিয় সহচরি। ১২ ॥

বিগত শৈশব

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আবার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গী সনে,
বেড়াতাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতি দিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ,
কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি,
কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বার বার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়,
সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখকাল শৈশব আমার রে।

॥ ১৩ ॥

নিদ্রা

এস শান্তিময়ি দেবি! দেও ক্লোড় সুকোমল
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুখেতে দিবে সান্ধনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবনসম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মূর্তিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মূছাও মা অশ্রুজল।

যুঝে যে তফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উন্মির্দল।

বায়ুর্শ্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষস্থল।
এস শান্তিমায়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল।
॥ ১৪ ॥

বয়ে যাও বয়ে যাও

বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম,
নাহি পাও যত দিন সেই দ্বীপ—শান্তিধাম।
বহুক ভীষণ বাত্যা, গজ্জক তরঙ্গরাশি,
ভয় নাই—বয়ে যাও সে দ্বীপ উদ্দেশে;
আকুল এ সিন্ধু-বক্ষে কভু পারে না বিরাম।
এ ভীম ঝটিকা মাঝে ডুব তায় ক্ষতি নাই,
অনুকূল বায়ু আশে রহিও না কভু;
নিষ্ঠুর পবন উর্মি কখন হবে না বাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও অবিশ্রান্ত—অবিরত,
পাও সে অন্তিম দ্বীপ, থামিও সে স্থানে,
—সে দিন পাইবে শান্তি পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম। ১৫ ॥

মুরলী

গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার
কলকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া উঠ আর বার।
আর বার সুধাম্বরে, ভুবন প্লাবিত করে,
চন্দ্রসুধা সনে গীত মিশাও তোমার।
কাঁপি বায়ু মধুস্বরে, মিশাইবে নীলাম্বরে,
কাঁপি পরিশিবে মম হৃদিযন্ত্র তার।
অমনি সে গীত সনে, অমনি প্রমত্ত মনে,
উঠবে স্মৃতির তন্ত্রী করিয়ে ঝঙ্কার।
গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার।
॥ ১৬ ॥

পূর্ণিমা-নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া

কে গায় রে সুমধুর স্বরে:
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।
সুদূর আকাশে বসি,
গায় কি রে পূর্ণশশী
তা না হলে এত সুধা কোথা হতে, করে।

এ জ্যোৎস্নায় ঢালে কাণে,
কিবা জ্যোৎস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রতি সমীরলহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া,
যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৭ ॥

ঐ—কে গায় রে সুমধুর স্বরে

কে গায় রে সুমধুর স্বরে;
মাথায় স্বর্গীয় সুধা চন্দ্রসুধাকরে।
মোহি মন্ত্রে দশ দিশি, দূর শূন্যে যায় মিশি,
—প্লারিল—ভরিল গীত অবনী অম্বরে।
কিবা বিষাদিত স্বর, কিবা প্রাণমুগ্ধকর,
বিষাদের তান বিনা কি মোহে অন্তরে।
—আবার সে উচ্চ তান—মাতিল—ভরিল প্রাণ,
জানি না উথলে কি যে প্রাণের ভিতরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৮ ॥

অশ্রুজল

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল!
আকুল জীবনে সখে তুমি মানবসম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে
করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহি
নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
॥ ১৯ ॥

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে

শৈশব বসন্ত যবে
ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ আছে
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।
আমার জীবনে হয়, কিবা আর শোভা পায়
কি শোভে তামসী নিশি
নীহার সলিল বিনে।

নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবার,
হেসেছি হৃদয় ভরি
সুখের হাসির দিনে।

দৈববশে তায়, যদি পুনরায়,
জাগে আর্য শূনি জানিত ঝঙ্কার।
বীণা বাজ একবার। ১ ॥

শশুদের শোভে হাসি, আমাদের অশ্রুরাশি,
রহিও নয়নে যবে
গাইব বিষাদগানে।
লয়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবন-পথে,
রহিও নয়নে অশ্রু!
ভবলীলা অবসানে। ২০ ॥

রেখে দেও রেখে দেও

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভূত, চাই না ও মৃদু গীত,
গাও রে পার্শ্বিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শূনিয়া মুরলী-গান জাগিবে না আর্যপ্রাণ,
চালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

আর্যবীণা

“সুন্দরীলগ্নাবস্থয়া বহিরেবাপেক্ষ ইব স্থিতঃ”
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

বীণা বাজবে কি আর

বীণা বাজবে কি আর।
অথবা নির্দ্রিত আর্য হিন্দু সনে
রহিবে বিষন্ন প্রাণ কি তাহার।
ঘুমাবে কি বীণা চিরদিন তরে,
জাগিবে না আর সুমধুর স্বরে,
শূনি যার স্বর, স্তম্ভিত সাগর,
ভাসিত আকাশ মোহিত সংসার।
সেই বীণা আজ বিষন্ন কি রবে,
সেই বীণা আজ ঘুমাবে নীরবে,
যার সুধা-স্বরে, ভারত ভিতরে,
হইত একদা জীবন সঞ্চার।
কভু না কভু না উচ্চতর স্বরে,
বাজ বীণে আজ ভারত ভিতরে,
গাও উচ্চ তানে, সে নীরব গানে,
নবীন ঝঙ্কারে বাজ রে আবার।
আজি এ ভারত মহান্ শ্মশান।
মহানিদ্রাগত কোটি কোটি প্রাণ,
ভারত সংসার, স্তম্ভ চরির ধার,
গভীর গভীর অভেদ্য আধার।
এই অন্ধকারে বীণা একবার,
বাজ রে গম্ভীর বাজ রে আবার,

শঙ্কর-গোতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্যকবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।

॥ ২ ॥

স্বদেশ-স্নেহ

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণছটা সায়াহ অম্বরে,
সুর্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাথা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাঙার
বিতরেন মদুকরে শোভারশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,
 হারিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ;
 কিন্তু তব হির্মগরি, জাহুবীর নীল বারি,
 পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
 অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
 মিথিবে মা অশ্রু সনে নয়নে আমার;
 যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
 ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন। ৩ ॥

প্রভাত-শশী

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার,
 বিষাদের রেখা কেন বা আননে।
 নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
 ও মৃখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
 ধীরে ধীরে রবি পানে, চাহিয়ে বিষন্ন প্রাণে
 পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাণগণে।

এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি করসুধারাশি,
 ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে।
 লুকাল সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
 আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে। ৪ ॥

প্রতিমা বিসর্জন

আয় রে অভাগা আজি আয় রে ভারতবাসী।
 চিরপ্রিয় গৃহলক্ষ্মী আয় বিসর্জিয়ে আসি।
 ভাসাই সাগরে আনি, সোনার প্রতিমাখানি,
 লুকাইবে সিদ্ধজলে সে অনন্ত রূপরাশি।
 আমরা দাঁড়ায়ে তীরে, বিসর্জিয়ে নেত্রনীরে,
 হেরিব মঞ্জতী মর্ত্ত স্বর্গশোভা-পরকাশী।
 ডুবিবে সে কান্তি যবে, বিষাদে ফিরিব তবে,
 হেরি শূন্য সিদ্ধহৃদি একবার দীর্ঘশ্বাসি।
 পারি যদি পুনরায়, আদরে তুলিব তায়,
 নহে বিসর্জিব সঙে আনন্দ—সুখের হাসি।

। ৫ ॥

প্রভাত-কুসুম

কোমল কুসুম রঙ্গ উঠ ত্বরা করি।
 সমুদিত সুখভান্দ পোহাইল বিভাবরী।

বহে স্বাধীন পবন,
 নাচাইয়ে ফুলগণ,
 তুমি না সেবিলে তায় বিষাদে দেহ আবারি।
 সকলের অশ্রুজল, রবিকরে শূকাইল,
 কেন তব নেত্রনীর ঝরে অনিবার;
 বৃষ্টি বা কোরকে তব
 পশিয়াছে কীট সব
 নীরবে দংশন-ব্যথা সহ ফেলি অশ্রুবারি।
 সব পদ্প হাঙ্গে সুখে, তুমি কেন অধোমুখে,
 পথাণ্ডলে ঢাকি তব কোমল বয়ান;
 অতুল প্রসন্ন আর
 ফেলিও না আঁখিধার
 উঠ রে কানন-রঙ্গ এ বিষদ পরিহারি।
 কোমল কুসুমকলি উঠ উঠ ত্বরা করি। ৬ ॥

মেল রে নয়ন

মেল রে নয়ন;
 ভারতসন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
 শতাব্দী শতাব্দী পরে,
 আবার সে রবিকরে
 ভাসুক ভুবন।
 দেখ সকলেই হাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
 তুমি কেন রবে আর্ষ্য বিষাদে মগন;
 বিভাবরী অবসানে
 উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
 প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
 ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
 ভারত-গৌরব-গান করেন কীর্তন;
 শূনি তাহা কোন্ প্রাণে
 আছ পড়ি এই স্থানে
 করিয়ে শয়ন। ৭ ॥

কেন মা তোমারি

কেন মা তোমারি—
 সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
 আলদলিত কেশপাশ,
 তব এ মলিন বাস;
 হেরিতে না পারি।

নীরবে সজল আঁখি, উদ্ধব্ধাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বন্ধ বাহুদুগ প্রসারি;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি।৮॥

তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝংকার!
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার। ১১॥

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য

ভারতমাতা

কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।
বল মাতঃ কি কারণে, বসি আছ ধরাসনে,
কেন বা এ নিরজনে গাইতেছ দুখ-গান?
কত বর্ষ হ'ল গত, আর মা কাঁদিব কত?
হবে না কি এ জীবনে দুখনিশি অবসান?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারি তরে রহিতে দাসী সমান?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?। ৯॥

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবননদী শুকাবে না আঁখিজল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলাম একদিন যবে প্রাণভরে,
হাসিতিস্ আর্য তুই জগত ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবনদীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য কাঁদ অবিরল। ১২॥

কেন রে ভারতবাসি

কি লয়ে কর রে গর্ব?

কি লয়ে কর রে গর্ব কি বল আছে তোমার?
সকলি পরের লয়ে কেন বৃথা অহংকার।
বিধু যথা রবিকরে, মহী আলোকিত করে,
না পায় কিরণ যদি সব হয় অন্ধকার।
বিদেশীর পদতরি, আছ রে আশ্রয় করি
অপরের ছায়া তুমি কিবা তব আছে আর?
॥ ১০॥

কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন!
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।
ভারতগৌরব-সুখ-দিনমণি।
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুখ-যামিনী,
হইবে ভারত আবার তেমন।
ভারতনিবাসী প্রফুল্ল অন্তরে
গাইবে কি পুনঃ সুন্দরিত স্বরে,
ভারতমহিমা ভারত ভিতরে,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসিয়ে ভুবন।
উঠ রে প্রাণের দ্রাতৃগণ সবে,
উঠিবে দিনেশ আবার পূর্বে,
অরুণকিরণে ভারত ভাসিবে,
রবিকরে নিশি হবে নিমগন। ১৩॥

বিষণা ভারতী

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর।
কেন মা আজ নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে একধার?

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝংকারিয়া আর?

করো না করো না তার অপমান

আর্য!
যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।

ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি;—
করো না করো না তার অপমান।

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্মদা সিন্ধু বেগমান;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হির্মগরি;—
করো না করো না তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি মেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বস্তুমান?
নাই উজয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা?—
করো না করো না তার অপমান।

এ অমরাবতী প্রতি পদে যায়
দলিছ চরণে ভারতসন্তান!
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত;—
করো না করো না তার অপমান।

আজো বৃন্দ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান!!
আদর্শিছে শুন অদ্রান্ত ভাষায়,
“করো না করো না তার অপমান”। ১৪ ॥

জ্বালাও ভারত

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নিস্বর্ণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বস্তুমান হে,
সে দর্শন যাহে মৃদু আজো ভূমন্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্দ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনাবারি, আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল।

উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজপ্ন রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল। ১৫ ॥

গাও আর্য্যসুতচয়

গাও আর্য্যসুতচয়।

মিলিয়া গাও রে বৃটন-মহিমা
ভাস রে হরষে ভারত-হৃদয়।
গাও ভাসি সবে সুখের সাগরে,
বৃটন-মহিমা প্রফুল্ল অন্তরে,
সঘন গরজে সুগভীর স্বরে,
গাও আর্য্যসুত বৃট্যানিয়া জয়।
কি আনন্দ নাচ ভারত অন্তর,
জয়ের নিনাদে ফাটুক অম্বর,
তোল রে মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর,
গাও রে অবাধে নাহি কারে ভয়।
কারে কর ভয় কেবা নাহি জানে
বৃটনের বীর্য্য এ তিন ভুবনে,
কি ভয় যখন বৃটন-চরণে,
স্পর্শে কেশ তব সাধ্য কার হয়।
ঘোর রবে ভেরী বাজুক সঘনে,
গজ্জুক কামান মেঘগরজনে,
ঘৃষুক সকলে তোমাদের সনে
বৃটন-মহিমা আর্য্যভূমিময়।
গাও আর্য্যসুতচয়। ১৬ ॥

কত কাল দুখ-ঝড়

কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে।
অভাগা ভারতবাসী কত দুখ-সহিবে।
ত্যজি গর্ব মান ত্যজি,
পথের ভিথারী সাজি,
কত দিন আর্য্য আর স্বারে স্বারে ফিরিবে।
হায় রে ব্যথিত হয়ে
বিষাদের ভার বয়ে,
কত দিন পথে পথে শোকগান গাইবে।

অতুল ঐশ্বৰ্য্য ধন
পরহস্তে সমৰ্পণ,
কৰিয়ে ভাৰত কত অনাহাৰে কাঁদিলে।
কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিলে। ১৭ ॥

অধীন ভাৰতে বহ না মা আৰ,
এ কলঙ্কৰেখা মূছায়ে দাও গো।
উথলি তৰ্টিনী গভীৰ গৰজে,
সস্নত ভাৰত-হৃদয় ছাও গো। ২০ ॥

আজ্ঞ আয় আয় ভাই

আজ্ঞ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশাহিত আয় রে সকলে।
চিৰদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধৰাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হ'লে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে:
আয় একবার সবে শ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দুৰে যাবে চলে। ১৮ ॥

কেন উষে

কেন উষে কেন আজ তুমি ভাৰত মাঝাৰ।
পাৰ না কৰিতে দুৰ যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মূদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমাৰ মধুরালোকে তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস দাসত্ব পরে,
দেখ ক্লগকাল তরে,
ঘুমায় নিবানি আৰ্য্য অবারিত আঁখিধাৰ।
তুমি তন্ত্ৰ ব্যথা দিতে
নব দুখে জাগৰিতে
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আৰ।
॥ ১৯ ॥

কেন ভাগীরথি

কেন ভাগীরথি হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সৈকত পদলিনে,
বহি এ ভাৰতে কি সুখ পাও গো।

নিরাশি মা আজ্ঞ ভাৰতের দশা,
এ দুখে অনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পৰি,
হৰষিত মনে সাগরে ধাও গো।

আৰ্য্যবিধবা

কেদ না রে অনাৰ্থিনি কেদ না কেদ না আৰ।
পাৰি না হেঁৰিতে অশ্রু আৰ নয়নে তোমাৰ।
সহ অবনত মুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাৰত স্বৰ্গীয় শোভা যে চাৰু আননে,
ভাসিত ত্ৰিদিবজ্যোতি যে যুগল লোচনে,
বিষন্ন সে মুখ হেঁৰি, সে নয়নে অশ্রুবাৰি,
নিরাশি উথলি মম যায় শোকপাৰাবাৰ।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুৰদামে আনন্দে, যতনে;
আজ্ঞ মলিন সে বাস, আলদলিত কেশপাশ,
পাৰি না হেঁৰিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমাৰ।
কেদ না রে অনাৰ্থিনি কেদ না কেদ না আৰ।
॥ ২১ ॥

কে কাঁদিছ

কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নিষ্কৰ্ণ স্থানে;
কেন বা গাইছ মূদু এত সৰুৰুগ গানে।
এত যে কৰুণ তান! কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কাৰুণ্য ঢালিছ কানে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদ কমল,
মূছান অশ্রুণ আসি তার নেত্রজল;
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মূছাবে না কি ও অশ্রু তপনকিরণ দানে।
হেঁৰিয়া দুখনি আজ্ঞ এ দশা তোমাৰ,
বিদীৰ্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমাৰ,
বল কোন জন্মফলে, আসিলে এ পাপ স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্ৰাণে। ২২ ॥

ভাৰতমাতা

কত কাঁদি দুখানলদগ্ধ হরে
বল মাত বিবাদেৰ ভাৰ বরে।

পারি না হেরিতে তব নেত্রজলে,
তাই দুর্বল কাঁদি দুখে বিরলে।

কত দীর্ঘ নিশীথে তোমার তরে,
করি অশ্রু বিসর্জন শোকভরে,
কত কাঁদিব পিঞ্জরবন্ধ হয়ে
ঝটিকার অনন্ত আঘাত সয়ে,

তবে কাঁদিব না শুধু মাত সনে
এই জীবন অর্পিব ও চরণে;
এস ভাই সবে মিলি এক হয়ে,
করে সাহস শান কৃপাণ লয়ে। ২৩ ॥

আয় ভারতসন্তান

আয় ভারতসন্তান হয়ে একপ্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
এক বার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি-অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেঁসিতেছে অশ্রুধারে,
হৃদে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নিস্বর্ণ।
আয় ভারত-সন্তান হয়ে একপ্রাণ। ২৪ ॥

প্রতাপসিংহ

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেব না কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি।
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবারিয়ে।
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে নয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।

॥ ২৫ ॥

গুরুগোবিন্দ

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ অন্ধ কারাগৃহে হায়।
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত
দংশে তাঁয় অবিরত;
দেখ রে কাঁদেন কত দারুণ ব্যথায়।
—আয় রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়।
দেখ বসি বাতায়নে
চাহেন সাশ্রুনেয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে উদ্ধারিতে তাঁয়;
আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়।
এ দুখ দেখিয়া মার,
কেমনেতে থাকি আর;
আমরা সন্তান তাঁর ধাই রে সবায়।
আয় রে আনিব তাঁকে যাক যদি প্রাণ যায়।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে। ২৬ ॥

চাঁদ কবি

ঘুমাস্ নে ঘুমাস্ নে রে আর।
দেখ্ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোনার।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিল শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণপ্রতিমার।
দেখ্ রে নয়ন মেলি দেখ্ দেখ্ একবার।
যদিগে প্রহরীরেশে, রেখেছিলি স্মারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হয়ে ছেড়ে দিলি দ্বার:
দেখ্ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ডকতিভরে, পূর্জিতিস্ সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার।

॥ ২৭ ॥

আজো নৃত্যগীত

আজো নৃত্যগীত ভারত ভিতরে,
আজিও উন্মত্ত ভারতসন্তান!
আজো দীপমালা প্রতি ঘরে ঘরে,
মহার্ঘ ভূষায় আর্ঘ্য শোভমান!!
নাহি কি ভারতে আর আত্মনাদ?
হয় নি ভারত বিশাল শ্মশান?
আজো প্রতি পুরী শোভিত যে তাঁর?
আজো যে উঠিছে উল্লাসের গান?

দেখ রে চাহিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
ফিরাইয়ে আঁখি পদতল পানে;
এ কি?—জননীৰ বিমূৰ্ছিত দেহ,
ছঁটিছে রুধির প্রতি ক্ষতস্থানে।
আৰ্ঘ্য-নয়নে কি অশ্রুবিন্দু নাই?
বক্ষের ভিতর নাই কি হৃদয়?
শিরায় আৰ্ঘ্যের শোণিত কি নাই?
এখনো উল্লাসে মন্ত সমুদয়!!

উঠ আৰ্ঘ্য তবে কেন বৃথোল্লাসে,
কর কলঙ্কিত পুণ্য আৰ্ঘ্য নামে?
উঠ তবে আজ নবীন উৎসাহে,
চল জীবনের ভীষণ সংগ্রামে।
যায় যদি প্রাণ যাক সে উদ্দেশে,
নহেক অমূল্য আজ আৰ্ঘ্য-প্রাণ;
অনাহারে, শোকে, যায় যে জীবন,
কে স্বদেশ-পায়ে না করিবে দান।

হয়ো না হতাশ বল না বিষাদে,
'বিধির লিখন রহিব এমনি';
এখনো আসিতে পারে সেই দিন;
এখনো ফিঁরিতে পারে দিনমণি।
আজিও তেমনি তপন উজ্জ্বল,
তেমনি প্রশান্ত নিম্মল গগন,
বিধুর কিরণ তেমনি কোমল,
বরষে মাধুর্য আজো তারাগণ।

আজো ফুলবনে ফোটে ফুলগণ,
আজো গায় পিক সুমধুর স্বরে,
আজিও স্নিগধ বয় সমীরণ,
আজো শ্যামলতা বিরাজে প্রান্তরে।
সবই আছে আৰ্ঘ্য হয়ো না হতাশ,
কর রে সাধনা এ মহাশ্মশান,
সন্ন্যাসীর ব্রত লও প্রতি জনে
তবে অমানিশা হবে অবসান। ২৮॥

কত কাল প্রিয় ভাই

কত কাল প্রিয় ভাই ধনমদে মন্ত রবে?
কাঁদে না কি প্রাণ তব মায়ের রোদনরবে?

নিজ গৃহে করি বাস,
হইয়ে পরের দাস,
কি লাজে উজল বেশে বিরাজিছ সগৌরবে।
সাজে কি এ বেশ আজ
পর ভিত্তারীর সাজ,
পরিও এ বেশ যবে এ দশা মোচন হবে।
করি ধনজনমান
বাড়া'ও না অপমান,
পথের ভিত্তারী কেন বৃথা ধনমন্ত সবে।
কত আর প্রিয় ভাই ধনমদে মন্ত রবে? ২৯॥

গিয়াছে সে দিন

গিয়াছে সে দিন গিয়াছে সে দিন,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
উজল ভারত আঁধার রে আজি,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

ছিল এ ভারত বসুধা-উদ্যান,
জগতের তীর্থ—পুণ্যময় স্থান,
আজ সে ভারত আঁধার শ্মশান:
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
আজ উল্লাসিত থাকা রে তোমার
এ দুখের দিনে শোভে না রে আর,
আসিয়াছে দিন আজ কাঁদিবার,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

থাকে যদি অশ্রু চক্ষের ভিতরে,
দে রে ঢালি আজ সে দিনের তরে:
থাকে ত হৃদয় কাঁদ প্রাণ ভরে,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
পার রে কাঁদিতে যদি প্রাণ ভরি,
এখনো আসিতে পারে রবি ফিঁরি,
কাঁদিলে বসুধা হয় বিভাবরি—
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী। ৩০॥

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ আজ কারাগারে।
অশ্রুবরি দীর্ঘশ্বাস মিশাউক অন্ধকারে।
বড করোঁছিলে আশ, পূরিজ না অভিলাষ,
পরিতে কুসুমহার পরিলে গলায় ফাঁস।

বল আর্ষ্য নামে কেন,
কলঙ্ক লেপিলে হেন,
আর্ষ্যের লজ্জার কথা ঘৃষিলে বিশ্ব সংসারে।
হায় জীবনে তোমার, কভু ফুরাবে কি আর,
এ অনন্ত পরিতাপ এই দুখপারাবার।
তবে কাঁদ অধোমুখে,
চিরদিন মনোদুখে,
নিবাও এ শোকানল অবিরল অশ্রুধারে। ৩১ ॥

বৃটন দেখিও আর্ষ্য

বৃটন! দেখিও আর্ষ্য—পড়ে আছে পদতলে।
করো না করো না ঘৃণা অধীন কাঙ্গাল বলে।
আজ দুখী এ ভারত, বিদেশীর পদানত,
সহেছে সহিবে আরো পদাঘাত কত শত,
ছিল এক দিন ভবে,
ভারত স্বাধীন যবে,
মেদিনী কাঁপায়ে আর্ষ্য বীরদর্পে যেত চলে।
হেরিত যে আর্ষ্য সবে, সভীতি ভকতিভরে,
সে ভিখারী, তব কাছে কাঁদে মর্দুর্টিভঙ্কা তরে,
মহত পতন দেখি
সিক্ত যদি হয় আঁখি,
করো না প্রকাশ বীর্য পতিতে চরণদলে।
বৃটন! দেখিও আর্ষ্য পড়ে আছে পদতলে।
॥ ৩২ ॥

বৃদ্ধ

তাজেছি হৃদয়রত্ন অন্তরের প্রিয়ধন।
সংসারের মায়ামোহ করিয়াছি বিসর্জন ॥
তাজেছি স্নেহের আশা, তাজিয়াছি ভালবাসা,
তাজিয়াছি তাজিয়াছি সবই হে গহন বন।
পিতা মাতা তাজি মম, তাজি শিশু প্রিয়তম,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন;
তাজি মোর ঘর দ্বার, প্রাণপত্নী প্রেমাধার,
—কেন আঁখি—কেন আঁখি কর অশ্রুবরিষণ;
শান্তির—সত্যের তরে আসিয়াছি তব দ্বারে,
উদ্ধারিব অভিলাষ মোহভ্রান্ত নরগণ।
হে অরণ্য কৃপা করি, লও মোরে ক্রোড়ে ধরি,
যাও চলি ভূত স্মৃতি—উদাস হও না মন।
॥ ৩৩ ॥

প্রতাপ (স্বাধীনতা-বিদায়)

যাবে কি পারিবে যেতে—তাজি চির বাসস্থান?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চির প্রিয় লীলোদ্যান।
চিরকাল উষাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদবে না হৃদয় কি ব্যাধিত হবে না প্রাণ।
আজি হতে ঘর দ্বার, হ'ল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজল আলো হ'ল আজ নিরবাণ।
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্বার,
আবার হাঁসিবে গৃহ—তমঃ হবে অবসান। ৩৪ ॥

আর্ষ্য ইতিহাস

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর।
মানস নয়ন তায়
নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে কিন্তু চর্ম্মচখে অশ্রুধার।
স্বর্গীয় কিরণময়
সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়
অনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আধার।
সে আনন্দ সেই প্রীতি,
আসে সেই সুখস্মৃতি,
করিতে রে উপহাস দুখ আর্ষ্য অভাগার।
লয়ে যাও লয়ে যাও
সাগরে ডুবিয়ে দেও,
—হা সজ্যোতি স্বাধীনতা—হা তামস কারাগার।
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।
॥ ৩৫ ॥

চাহি না শূন্যে বীণা

চাহি না শূন্যে বীণা ও মধুর স্বরে আর।
শূন্যে করে নয়নে অবিরল অশ্রুধার।
এই বীণা ধরি করে,
মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাইতেন আর্ষ্যগণ মোহিত হ'ত সংসার।
(ওরে বীণা)
স্মরিলে সে সব কথা
মনে যদি পাই ব্যথা,
কি কাজ জাগায়ে তবে সুখস্মৃতি পুনর্বার।

(ওরে বীণা)
সে সন্দের দিন হয়
ফেৰে যদি পুনরায়,
বাজিও তখন বীণে ঝঙ্কারিয়ে আর বার।

(ওরে বীণা)
তখন তোমার গানে
শুনিব সানন্দ প্রাণে,
কি কাজ ধনিনীয়া আজ এ নীরব কাৰাগার।
চাহি না শুনিতে বীণে ও মধুর স্বরে আর।
॥ ৩৬ ॥

ঘুমাও ঘুমাও বীণা

ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
—কেন জাগলাম আহা ভাঙিলাম ঘুমঘোর।
ছিল এক দিন যবে,
ললিত গম্ভীর রবে,

গাইতিস্ আৰ্ঘ্যভূমে, সে দিন নাহি রে আর;
—আজি এ ভারতভূমে বিরাজে আঁধার ঘোর।
আর এ ভারতে আজ গাইবি কি গান রে
কেমনে ভুলিবি বীণে সেই বীরতান রে;

যবে বীণে লয়ে করে
জাগান্দ করুণ স্বরে,
মাতিল শ্রোতার চিত্ত সে সংগীত করে পান;
কিন্তু হয় অশ্রুবিন্দু ঝরিল নয়নে মোর;
কেন জাগলাম আহা, জাগাব না আর,
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সন্দের আর বার:
যবে পড়ি পদতলে
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
কাজ নাই কাঁদি আজ হেরিয়া ভারত আর;
জাগাব না বীণে তোরে এ নিশি না হলে ভোর।
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
॥ ৩৭ ॥

সমাপ্ত

আর্যগাথা (২য়)

কুহ

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুদ্ধ উজ্জলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির;
শুদ্ধ গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে;
লালিত লালিত এক অমর স্বপনে।

২

কেন যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিন্দু;—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি 'আলোকিক' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উন্মভাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে?
কিম্বা শূন্যেছিন্দু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছি সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আসনি আজ সে বেশ পরি;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোম্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো;—সে মধুরে
ছিল না জীবন খেল। অতীব সুন্দর মুখখানি;
কিন্তু যেন চক্ষুদুর্টি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপ সে যেন উদ্যসীন,
চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে;
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজ যৌবন সোদাম;
প্রভাতশিশির
সম স্নিগ্ধ; বীণাধরনি সম
স্বর্গীয়; বিশ্বাস সম স্থির;
গাঢ়, নীল আকাশের মত;—
সে দুর্দানভর প্রেমে মোরই পানে নত।

৫

ছিলে বা তখন
 পাঁপয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল;
 ছিলে বা তখন
 প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল;
 ছিলে নক্ষত্রের সম অন্ধ রজনীর—
 শান্ত, দিব্য, স্থির;—
 কিন্তু দূরস্থায়ী।
 তখন সৌন্দর্য্য এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৬

আহা—
 যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
 হইত আবদ্ধ এক স্বরে;
 যদি অঙ্গুরার সংমিলিত গীতধ্বনি
 হ'ত সত্য; নৈশ-নীলাম্বরে
 প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাগোন্মাদী সুর
 হইত; অথবা যদি হেম
 সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ
 একাটি দিগন্তব্যাপী ঝংকার হইত;
 হইত আশ্চর্য্য তাহা।
 কিন্তু হইত না অন্ধমধুরসংগীতও
 যেমতি মধুর
 স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

আর্য্যগাথা

[খট্—টিমে তেতাল্লা]

১

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে
 এসেছি আজ তোদের কাছে,
 হৃদয়ভরা গান লয়ে আজ—
 এ প্রাণে যা কিছ্ আছে।
 এ গানগর্দল তোদের দিব,
 আর কিছ্ করি নে আশা,
 কেবল তোদের প্রাণের হাসি—
 কেবল তোদের ভালবাসা।

২

নাহিক আর বিরস হৃদয়,
 নাহিক আর অশ্রুরাশি;
 হৃদয়ে জড়ায় রে প্রেম,
 হৃদয়ে গড়ায় হাসি;
 ভাঙা ঘরের শূন্য ভিতে
 শূন্যবি নে আর দীর্ঘশ্বাসে,
 কি দুখেতে কাঁদবে সে জন,
 প্রাণ ভ'রে যে ভালবাসে।

৩

আজ যেন রে প্রাণের মতন
 কাহারে বেসেছি ভালো;
 উঠেছে আজ মলয় বাতাস,
 ফুটেছে আজ মধুর আলো।

[ধানেশ্রী—মধ্যমান]

১

জানিস্ ত তোরা বল্
 কোথা সে কোথা সে,
 এ জগৎ মাঝে আমারে যে
 প্রাণের মতন ভালবাসে।
 হৃদয়ের ঘর আলো করি,
 স্বপনের মালা পরি,
 মাঝে মাঝে গানের মত
 প্রাণের কাছে ভেসে আসে।

২

কে সে—আসে রে হৃদয়ে মম—
 স্বপনে পরীর সম,
 প্রেমের সুরভির মতন মলয় বাতাসে;
 মাঝে মাঝে প্রাণে এসে
 কি বলে' যায় ভালবেসে,
 চাইলে পরে যায় গো মিশে
 চাঁদে'র কোণে, ফুলের পাশে।

[কীৰ্ত্তন]

১

ছিল বসি' সে কুসুমকাননে;
আর অমল অরুণ উজ্জল আভা
ভাসিতোছিল সে আননে।

ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে,
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক,
শান্তি, অতুল গরিমা ভাসি;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,
সেথা বাঁধা ছিল শব্দ স্নেহের স্মৃতি—
হাসি, হরষ, আশা;
সেথা, ঘুমায়ে ছিল রে পূণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সূঠাম দেহ
(প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো,
যেন যা কিছু কোমল, ললিত,
তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ;
পরে সজ্জিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে,
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সুন্দরিত, সমতান
যেন সজীব—সুন্দরিত, মধুর মলয়,
কোকিলকুঞ্জিত গান।

৫

শব্দ চাহিল সে মোর পানে (একবার গো;)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী,
অমনি অধীর প্রাণে;

সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া,
বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্তগুণে, কে জানে।

[পূর্ববী—একতারা]

১

আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।
মধুর মিলনে আজ মিলি দুজনে—আয়।
আয় লো ফুলফুল নিকুঞ্জবনে,—
ধ্বনিত কানন পিকগণে
চুম্বি চুম্বি কুসুম প্রাণ বহিছে প্রদোষ-বায়।
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

২

মধুর যৌবনে মধুর জীবন,
মধুর বসন্তে মধুময় বন,
মধুর মলয়স্রোতে সুন্দরিত ভাসিয়ে যায়;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

৩

মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লো ধাই;
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায়;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

[স্বেহাগ—একতারা]

১

আয় রে প্রাণের আলো,
আয় লো হৃদয়ে মোর।
রজনীর দৃ নয়নে লেগেছে ঘুমে ঘোর;
অধীর হৃদয় পড়ে
মুদ্রিছে জ্যোছনাপায়;
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরাভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
 ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ;—
 আয় লো স্বপনখানি.—
 যামিনী বহিয়ে যায়:—
 অধরে মধুর হাসি
 আয়—আয়—আয়।

৩

যেহাতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর,
 মেঘখানি হোতে নামে তরুণ রবির কর,
 সাঁঝের তারার মত,
 বসন্তে মলয় প্রায়,
 আয় লো যমুনাবালা
 আয়—আয়—আয়।

[গৌরী—কাওয়ালি]

১

বসি শ্যাম উপবনে,
 শত ফুল ফুল সনে,
 শূনি নদীকুলস্বরে শূনি সান্ধ্য সমীরণে,
 শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
 আকাশেতে উড়ে পাখী,—
 আকাশেতে ভাসে মেঘ সোনার কিরণে:
 একা একা বসে তাই হেরি লো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
 কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
 কে কথা কহিলে কাণে,
 কে চাহিলে মোর পানে,
 চাহিয়ে কাহার মুখে স্তম্ভ হয়ে রই;—
 প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

[ভৈরবী—আড়া]

১

ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
 নিশি হ'ল ভোর;
 ঢলে পড়ে তারাগুলি চখে ঘুমঘোর।

শোন্ লো বকুল কাণে
 গোপনে কি কহে বায়ু,
 কি কহে কমলে ভুগ তার মনোচোর,
 ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
 নিশি হ'ল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
 পাঁপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
 নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর
 ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
 নিশি হ'ল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে
 ফুলকুল দেখ্ ওই—
 কেন লো মর্দিত রবে কমল-আঁখি তোর,
 ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
 নিশি হ'ল ভোর।

[কীর্তন]

১

চাহি, অতৃপ্ত নয়নে তোর মধু পানে,
 ফিরিতে চাহে না আঁখি;
 আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
 অবাক্ হইয়ে থাকি।

ভুলি মধু পরিতাপ যাতনা, যখন
 রহি লো তোমার কাছে;
 ওই মধু পানে চাই; ও মধুকমলে
 জানি না কি মধু আছে।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সন্ধ্যার মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে,
নিরাখি তোমার হাসি;

সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
নুখভরা সম দৌখি;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

[বাউলের সুর]

১

ও কি কাব্যমাথা সে আঁখি দুটি, হায়!
তারে কে একেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায়।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায়;
ওরে, কত জ্ঞান, কত শক্তি,
কত স্নেহ দয়া অনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায়।

২

এই দুখে ছল ছল,
এই স্নেখে ঢল ঢল,
এই স্থির এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,
এই, লাজভাবে ঢলে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে চায়।

৩

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায়;
লেখা—শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায়।

[জয়জয়ন্তী—একতারা]

১

(মোর) হৃদয়ের আলো
তুই রে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে,
(মোর) বিরাগে বাসনা,
ব্যথায় বিস্মৃতি; অশ্রুতে উজল হাসি রে,
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর;
গৃহে আমি রে উদাসী;
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার,
আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নিব্বার,
আশার প্রতিমাখানি;
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাগে আসি;
কোথা চলে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

৩

দিন্দু তোরে প্রাণ, দিন্দু তোরে মন,
নে' রে যাহা কিছু চাস্ নে';—
কুটীর আমার আঁধার করিয়ে
শুধু কোথা চলে যাস্ নে।
পরিহাস সখী, সচিব আমার,
গুরু, শিষ্যা, প্রভু, দাসী;
সকলি আমার;—তুই এ প্রাণের
সব আশা অভিলাষই রে।

[ছায়ানট—ঝাঁপতাল]

১

কেন লো পরাগ মম সদা তোমারেই চায়।
সিন্ধু পানে নদী সম তোর পানে সদা ধায়।

তোমাতে মগন হয়ে
তোমা পানে চেয়ে আছে,
দূরে বা নিকটে রহি রহি লো তোমার কাছে।

২

আলৌকিক হৃদয়ে ভাসি সতত থাক লো তুমি,
স্বপনে হেরি ও হাসি স্বপনে ও মৃথ চুমি।
কি বিরলে, কোলাহলে,
শূনি তব প্রিয় স্বরে;
যখন তখন হৃদে আস তুমি চুরি ক'রে।

[বাহার—ঝাঁপতাল]

দিয়াছি হৃদয় তবু পূরে না কি আশা ?
সাগর সমান প্রেমে মিটে না পিয়াসা,
বিধে বা এ ফুলহার, চরণে তোমার
নন্দনকুসুম যার কাছে কি ছার,
ঢেলেছি চরণে প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা,
(মোর) হৃদি সৃথ, দৃথ, 'বৃকভরা ভালবাসা।

[বসন্তবাহার—আড়া]

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নতন ক'রে।
যা ছিল এ প্রাণেতে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।

তোমার নিঠর প্রাণে
চাও না তাহারি পানে,
দেখবে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

[কেদারা—মধ্যমান]

১

চেও না, চেও না হেন নিঠর নয়ানে।
চেও না বিরাগে মাখি,
হিম্ম আঁখি তুলি মোর পানে।

অভিমান ভরে চাহ, ভৎস মোরে,
বৃথিব শৃথ এ প্রেম লুকান রে,
বিধো না ও উদাসীন, রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভান্দমৃথ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভান্দ পূনঃ সে পূরণ হাসি; -
ঘৃণার তুহিন দিয়ে,
সে ত প্রিয়ে, ঢাকে না বয়ানে।

[দেওকিরী—সুর ফাঁক]

দু দিনের হাসিটুকু আর
রোষ দিয়ে করো না আঁধার—
বসন্ত রয় না চিরদিন,
—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন হয় স্বপন মিলায়ে যায়;—
এস আজ যত পারি হাসি;
না জানি বা কাল ফুটি যবে কি না ফুল দুটি;
আজ যত পারি ভালবাসি।

[দেশ—ঝাঁপতাল]

তোমারি আমি সৃথে, দৃথে,
বিপদে, কি সম্পদে
তোমারি আমি গৃহে, প্রবাসে।
তুমি মোর মিলনে জ্ঞান, প্রাণ;
তুমি বিরহে
ধ্যান মোরি স্মরণে।
তোমারি সৃথ মোরি সৃথ,
তোমারি দৃথ দৃথ মে,
সর্পিছি সব প্রেম, পূণ্য ও প্রীতি,
তোমারি ও চরণে।
তুমি পূজা ভকতি মে,
তুমি দেবী, তুমি রাণী,
সিঁথি মে তোমারি প্রসাদবাণী—
দেখিব শৃথ—হাসি মৃথে,
রাখিব শৃথ সৃথে হে,
সাধনা মোরি এই, করম মোরি জীবনে,
ধরম মোরি মরণে।

[আশোয়ারি—একতারা]

১

কি দিয়ে সাজাব মধুর মদুরতি,
কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে?
কঠিন হীরা হেম রজতে
সাজায়ে পুরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত কনক কিরণে
অতুল উজল মদুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হ'তে পাড়ি
গাথি হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি দি'
ও আঁখি অপাঙ্গে বদলায়ে,
কুড়ায়ে তারাহীরাভাতি
চারু কর্ণে দুল দি' দলায়ে;
পূর্ণচন্দ্রেখারচিত
কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কজন-গঠিত নুপূর
চুম্বি যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি
নবঘনশ্বেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন সাম্ভ্য মেঘে
রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলঙ্ক
কবির গীত ভকতিরাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ
কিশোরপ্রেমস্বপনহাসি।

[শঙ্করা—ঝাঁপতাল]

১

অলঙ্কিতে রূপে তোর খেলে আলো জ্যোৎস্নার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
তুই যবে বস পাশে ধরণী কেমন হাসে;
চলি হাস অমনি সে দখে মলিন, আঁধার।

২

এ রহস্য গদুতর;—যায় যদি শশিকর,
যায় না মলয়গাথা, যায় না ক কুহুস্বর;
বিহনে লো তোর, প্রাণ হারায় মলয়, গান;
ফুলের সদুভি ঝরে, যায় মধু রে সুধার।

[সোহিনী—পোস্তা]

সব চেয়ে মদুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে?
হাসে মদুখ দিয়া তোর
সব চেয়ে অথবা সে?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর;
সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে;
সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে' কুহুস্বর,
সব চেয়ে নীলাকাশ
তোরই আঁখিনীলে ভাসে।
সব চেয়ে গন্ডে তোরই কুসুম ঘুমায়,
সব চেয়ে মধু' তোর পরশে শিহরি আসে;
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পায়,
জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শধু তোর ভালবাসে?

[আলো—আড়া]

ধীর সমীরণে মধুর মধুমােসে
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে।
—না জানি কেন এত সুধা মলয়বাতাসে,
কেন, ফুলভরা বসুন্ধরা এত হাসি হাসে;
প্রেমের কথা মলয় সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে করে ভালবাসে।

[গৌরদারঙ্গ—মধ্যমান]

কি জানি কোয়েলা কেন এত মধুর বোলে;
যেন প্রকৃতির প্রাণ হ'তে এ গান উথলে;
অথবা এ প্রতিধ্বনি এ প্রাণের গানেরি, যা
মুঁড়িছি পড়িছে সদা প্রিয়া-পদতলে।

[কালিগড়া—খেমটা]

কেন তুই সুধাকর এত হাসি হাসিস্?
নিতি নিশি ফুলবনে কার কাছে আসিস্?

কোন্ সুখে তুই ভোর,
কে দেখিছে হাসি তোব.
কার পানে চেয়ে চেয়ে এত সুখে ভাসিস্ ?
বুঝিছ কেন ও হাসি.
—আমিও যে ভালবাসি,
বুঝিছ নবীন প্রাণে কারে ভালবাসিস্ ।

[সিদ্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালি]

১

শোন্ রে—শোন্ রে ঐ করুণ বাজে বাঁশি;
সে কেন রুদ্ধ কেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি ?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে;
কভু বা মনের দুখে,
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে ।

৩

সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে
কি যেন তার বুক লয়ে;
দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেন্দে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হয়ে ।

৪

জানি না, কি শেল বিধে
বাঁশীর হৃদে,
ভেঙেছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেয়নি ভালবাসা ।

[মেঘমল্লার—একতারা]

১

এ কি ভীম শোভা
নিরাখি মনোহরা রে;
নব নীল নীরদ ছাইল
নীল ছায় শ্যাম ধরারে ।
ঘনস্নিগ্ধ পবন উছলে,
উথলে সিদ্ধু, চমকে চপলা;
(শোভে) বসুধা ছবি সম,
সুন্দর কালো রূপে ভরা রে ।

২

যায় অযুর্ভাবির্ভাপপ্রহত
গীত অপার্থিব উচ্ছ্বাসি রে;
কল্লোলে জলরাশি,
মেঘমল্ল মুরজভাষী রে;
সহসা দশ দিক্ গম্ভীর
মধুরস্বরমুখরা রে ।

৩

(এ) মধুর আধ অন্ধকারে
আঁরে সখি হৃদিসম্মিধ এ;
দুরদিন শূন্য বাঁধে দৃঢ়তর
প্রকৃত যুগলপ্রণয়িদয়ে;
গরজ্জক ঘন, পবন ঈর্ষী:
হাসি হেরিব মোরা রে ।

[বসন্ত—একতারা]

বহিতোছিল সুমুদুল মলয়;—
চেয়ে ছিল চাঁদ, সে তোরাই লাগি:
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি ।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢালি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চালি ।

[বেলাবেলী—রূপক]

১

পদ্য মুরতি; প্রেম দেবতা;
নীতা মরতে ত্রিদিববারতা;
নিতি ঘরে সীতা,
সতী অভিনীতা;
নিতি ঘরে গীতা পুরাণের কথা।

২

কেন পূজ ভাই শত দেবী গড়ি,
যবে ঘরে ঘরে প্রকৃত ঈশ্বরী;
পূজ তারে গিয়া
প্রাণ মন দিয়া,
ঘৃচিবে পশুতা, ভীরুতা, নীচতা।

৩

দেখ নি স্বরগ কিম্বা অবিশ্বাসী?
—মুছ সতী-অশ্রু, দেখ তার হাসি;
চাহ কি ধরম,
নীতি উচ্চতম?
—ঘৃচাও ব্যথীর ব্যথা, মলিনতা।

[কুকব—ঝাঁপতাল]

যে আমারে বাসে ভাল
ছাড়িয়ে সংসার,
সে নহে প্রণয়বশ
প্রণয় বশ তার;
ধন মাত্র দানের প্রণয় তারি প্রাণের,
দিতে পারে সে যারে
তারে সম রবিকিরণধার।
প্রেম ধরম তার,
আমি শূদ্ধ সে প্রেমাধার,
আমি শূদ্ধ প্রতিমাখানি
তার প্রিয় দেবতার।

[পরজ—ধামার]

১

আমারি তরে মলিন যার মুখ;
আমারি তরে জাগে যাহারি হাসি;
আমারি লাগি পাষণে বাঁধি বৃক,
নীরবে সহে যাতনা রাশি রাশি;
আমারি ছবি নয়নে যার ভাসে;
আমারি কথা জাগে হৃদয়পাশে;
জগত ছাড়ি আমারে ভালবাসে;
—শূধাও, কেন তাহারে ভালবাসি?

২

অকুণ্ঠিত যে জীবন, মন দেহ—
বিভব তার করিতে সবে দান;
তারে যে হেলে হৃদয় তার হেয়,
তারে না পূজে পাষণ তার প্রাণ;
পারিতাম ত সেই প্রতিমাখানি-
পায়ে' দিতাম দেবের প্রীতি আনি,
করিয়ে তায় অমরসুখরাণী,
দিতাম বাঁধি ধরারে তার দাসী।

[সারণ্য—কাওয়ালী]

নিতি নব মুখ তারি যখনই নিহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

[মূলতানী—একতাল]

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্
পলকে নয়নে বিজলি হাসি;
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে,
অধরযুগলে লুকায় অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাত;
পুনঃ হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্
 দূরে থাকি; নিকটে রহিয়া দূরে;
 সদা খেলিস্ চাতুরীময়
 লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপূরে।
 তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
 যখন বিরহী আমি;
 তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
 পল সম দ্রুতগামী।

৩

তোর কর্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী,
 ভাষায় কুজনরাশি;
 তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শূন্যে আছে
 মন্দারসুর্ভি আসি;
 হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা;
 অবদ্বয় সমান সব এ;
 মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
 সন্মুখের পরাভবে।

[কীর্তন]

১

সে কে? এ জগতে কেহ আছে,
 অতি উচ্চ মোর কাছে
 যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ;
 সে কে? অধীন হইয়ে, তবু
 রহে যে আমার প্রভু;
 প্রভু হইয়ে আমি যার দাস;

২

সে কে? দূর হতে দুরাশ্রয়ী,
 প্রিয়তম হতে প্রিয়,
 আপন হইতে যে আপন;
 সে কে?—সত্য হতে কীণ তারে
 বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
 ছাড়াতে পারি না আজীবন;

৩

সে কে? দূর্বলতা যার বল;
 মর্মভেদী অশ্রুজল;
 প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার;
 সে কে? যার পরিতোষ,
 মম সফল জনম সম;
 সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার;

৪

সে কে?—হ'লেও কঠিনচিত
 শিশু সম স্নেহভীত
 যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে;
 সে কে? বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার;
 অপমান নাই
 শত বার পাদুখানি ছুয়ে;

৫

সে কে?—মধুর দাসত্ব যার,
 লীলাময় কারাগার,
 শঙ্খল নুপূর হইয়ে বাজে;
 সে কে?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া,
 নিজে যাই হারাইয়া
 যার হৃদিপ্রহেলিকামাঝে।

[হাম্বীর—একতাল্লা]

১

তোমার রাখিব নয়নে নয়নে,
 পলকে হারাই যেন রে সদাই
 মনে হয় যেই ধনে।
 স্বর্গের সমান কৃপণ মতন, এ
 রাখিব তুলিয়া অতুল রতনে,
 মরমমরমে বাঁধিয়া যতনে।
 রাখিব রে প্রাণপণে।

২

প্রাণের অধিক! দিব না ত ছাড়ি
সর্বস্ব আমার কে লইবে কাড়ি?
যে লবে,—নিষ্ঠুর—লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ;
ভুলি হাসি ভাল বাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে।

[ভৈরবী—কাওয়ালী]

একা রেখে যেতেছি না তোরে;
যেতেছি রাখিয়ে অর্ধ মোরে;
রাখি উষানবপ্রাণ; সান্ধ্য উপকথা গান;
নৈশ শান্তি বন্ধ;
শরতের প্রিয় হাসি, বরিষার স্নেহরাশি,
মলয়ের মধু।

[ষোড়শ—একতারা]

১

তুই, বাঁধিয়ে, কি দিয়ে, রেখেছিস্ হৃদি এ
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে;
এ কি, বিচিত্র, নিগড়, নিগড় মধুর;
(কি) প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ?
এ যে চলে' যেতে বাধে চরণে;
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে;
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

২

এ কি অদৃশ্যেও মোরে তোর বাহুপাশ
(আছে), মধুর ভীতিতে জড়ায়ে?
তোর ক্ষমা, প্রীতি, পূণ্য, নিষ্ঠুর, বিশ্বাস,
(তোর) প্রাণ অননুভব এ;

এ কি তোর জীবনের কাহিনী
—তোর কথা, হাসি, তোর চাহনি,
তোর রোষ, অভিমান, তুহিন সমান
বিগলিত অশ্রুধারায় এ?

[খট্—মধ্যমান]

১

বিদায়-চুম্বন দেও লো যামিনী পোহায়,
তরুণ অরুণ-আভা লেগেছে মেঘের গায়;
—বিদায়।

দেখ জাগি সারা নিশি ক্লান্ত অবশ শশী,
নির্মীলিত তারাকুল ঢলে পড়ে নীলিমায়;
—বিদায়।

২

সখি রে কঠিন নয় হৃদয় আমার;
সখি রে কঠিন বড় বিধি বিধাতার;
না উঠিতে সুখগান রোদনেতে অবসান,
ফুটন্ত মিলন হাসি বিরহে মিলিয়ে যায়;
—বিদায়

[ভীমপলাশী—একতারা]

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে খালি বৃকে;
কেমনে রহিবে প্রাণ না হেরে ও হাসি মৃখে।
নরক আঁধার ভাল,
যদি থাকে করে আলো ও মৃখখানি রে;
তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গেলেও রব না ক সুখে
বিলাসে, নন্দনবনে,
যখন পড়িবে মনে ও মৃখখানি রে,
সঙ্গীতও নীরস হবে, স্বর্গও আঁধারিবে দৃখে;
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে
আমার খালি বৃকে।

[বাগেশ্রী—আড়া]

মায়াময় মোহময় মৃখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর।

একই সে মদুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ;
সে মদুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর;
মায়াময় মোহময় মদুখখানি ওর।

[ঝিঝিট—আড়া]

১

আজ তোরই কাছে ভেসে যায় লো
হৃদয় আমার;
আজ সহসা ঝরিল চখে কেন
বারিধার;
কত গান, হাসি দিয়া,
তারা ফুল শশী দিয়া।
অশ্রুতে উজ্জ্বল আসে স্মৃতি লো তোমার;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

২

হেরিলে আনন তব উথলে হৃদয় মম
পূর্ণিমা-হাসিত-চন্দ্র-চুম্বিত-সাগর সম;
আজ না হেরে আনন তোর
উথলে এ প্রাণ মোর
অমানিশি উথলিত সম পারাবার;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

[ইমনকল্যাণ—আড়া]

১

এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা;
সেই সে চাঁদের আলো ঢেউ সনে করে খেলা।
মনে কি পড়ে গো, মোরা হৃদয়ে হৃদয়লীন,
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাত কত দিন;—
আয় লো হৃদয়-রাণী, প্রেমের স্বপনখানি,
একবার—একবার ধরি হৃদে
জুড়াই প্রাণের জ্বালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

২

সেই সে মাধুরী মেলা তেমনি ছড়িয়ে আছে,
শুধু রে মাধুরী প্রাণ তুই লো নাহিক কাছে;
এ শোভা যা আছে ঘেরে,
আয় লো জাগায়ে দে রে;—
একবার—একবার ধরি হৃদে
আয় নেমে সুরবালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

[হিন্দোল—চৌতাল]

শত-ফুল-ফুল্ল উপবন মনহারী;—
মদুল মদুল মধুময় মলয়বাহী;—
কুজে মদু কোয়েলিয়া; হাসিভরা ধরণী;—
কিন্তু সবে পিয়া বিনা কি যেন নাহি।

[বাহার—আড়া]

আজি গাইব কি গান,
উদায়স চিত মোর অবশ পরাণ।
আজি কভু সে মদুখ
আসে রে মলিন,
বিরহগীত সম স্মরণে আমারি;
—গাইতে চাহে রে চিত বরিখে নয়ান।

[বিহগড়া—মধ্যমান]

১

কত ভালবাসি,
বদ্বি রে, বদ্বি রে শুধু বিরহে।
কত যে লুকায়, মদুখ ও আনন ভরি
রেখোঁছিস্ প্রাণেশ্বর;
বদ্বি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি
আঁধারে হারাই মোর,
বদ্বি কত প্রিয় কতই মধুর
হাসি মদুখখানি তোর;

বুঝি রে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে;
বুঝি রে তখন এ প্রেম-নদী
কত গভীর বহে।

[কানেড়া—কাওয়ালী]

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে আশা করে' রহে বল;
স্বজন সুহৃদ সবে উজলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল।

২

তখন কার সঙ্গাপনে, কপোলে সরম সনে
জাগে রে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল;
উদ্ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপে রে স্বর,
চলিতে কার পায়ে সদা বাধে,
—কে গতিবিহবল।

৩

ঘোমটা ভিতরে থেকে
কত যে লুকায়ৈ দেখে,
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল;
বিরলে কার বাহু দুটি,
গলে মোর জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল।

৪

রাখিয়া আসিলে চলে',
আঁখি কার ভাসে জলে,
সব চেয়ে কার প্রাণ দহে রে বিরহে বল।—
সে রে সেই জন,
ঘরে যাই রে যাহারি তরে,
যাহার কিরণে হাসে জীবনের অশ্রুজল।

[আড়ানা—যং]

১

আমি আস্চি—আস্চি—আস্চি—প্রিয়ে;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্চি ফিরিয়ে।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি,
মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,—
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে—
দেখ্ জানালা দিয়ে,—আমি আস্চি—

২

নিয়ে,—মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ৈ,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ৈ,
কত, নীরব চাহনি কথা, হৃদয়মিলন ব্যথা,
(কত) কুহুময় রাত্ৰি দিন
তোর লাগি নিয়ে, আমি আস্চি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যা রে আগে যা, গিয়ে
বল্ তারে আমি ঘুরা আস্চি তার লাগিয়ে;
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীর অতি এ।
—আমি আস্চি।—

[সুরট—তেওট]

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগ রে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি;—
ঢাল শশীতারা,—এ মিলনরাত্ৰি;
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি।

২

জাগো রে বিহগ;—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাও রে উচ্ছ্বাসি।

II

[পাহাড়ী—দাদ্রা]

১

আয় রে বসন্ত তোর ও
কিরণ-মাথা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখীর
গানের পাতা গানের ফুলে।
বলে--পাড়ি প্রেমফাঁদে
তারা সব হাসে কাঁদে—
আমি শূন্য কুড়ই হাসি—
সুখনদীর উপকূলে।

২

জানি না ত দুখ কিসে,
চাহি না প্রেমের বিষে,
আমি বনে বোড়িয়ে বেড়াই,
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে।

৩

নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলো চুলে।

[সিদ্ধ ভৈরবী—কাওয়ালী]

১

কেন, দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা;
কেন মানব হইয়ে চাহি পিইতে অমিয়ধারা;
অবোধ কুমুদ কাঁদে
কেন লো চুমিতে চাঁদে,
যখন তারকা শত তার প্রেমে মাতোয়ারা;
কেন দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

২

সমানে সমানে হয়
প্রণয়ের বিনিময়;
মেঘ কি বিজলি ছাড়ি ধরে হৃদে দীপজ্বালা;
রাজা কে কিসের আশে
ভিখারী দুয়ারে আসে;
জেনাকির প্রেমে কভু
নেমে কি আসে লো তারা।
কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

[রামকলী—কাওয়ালী]

মনে কত ভালবাসা
আঁধারে লুকায় আছে;
ফুটিতে পারে না ভয়ে
হিমে ঝরে যায় পাছে:
হৃদয় গোপন করে
রহে নিজ মানভরে,
ভালবেসে সুখী রহে
প্রতিদান নাহি যাচে।

[খাম্বাজ—মধ্যমান]

১

সে মৃখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ অখিল স্বরমাঝে তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে শূন্য সেই মৃখ স্বপনে কি জাগরণে।

২

মোহের মদিরাঘোর ভেঙেছে—ভেঙেছে মোর;
কেন রহে পিছে পাড়ি পাপবাণী পরধনে।
চ'লে যা নিষ্ঠুর স্মৃতি,—শূকায় যা পাপপ্রীতি—
রহ বা ভকতি হ'য়ে—বাসনায় পর্দা স'নে।

[মল্লার—আড়া]

১

তোমায় ভালবাসি বলে'
বাসি না বাসি না ভাল ভাসিতে নয়নজলে;
বে না হৃদয় যদি, বহিবে এ প্রেমনদী
গাপনে আপন মনে আধারে, বিরলে।

২

এ দেহে থাকিতে প্রাণ, না ছাড়িব অভিমান
রাখিব চাপিয়ে বহি বন্ধের ভিতর;
হৃদয় ফাটিতে চায়, ভেঙ্গে যাক যাতনায়,—
বীরবে পুড়িয়ে যাব আপন অনলে।

[কীর্তন]

১

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে
আমি চিরদিন তারি,
চরণের রেণু ধুয়ে দিতে তার
দিব নয়নের বারি;

তারে দেবতা করিয়া রাখিব হৃদয়ে
সদা তার অনুরাগী;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে,
পাশিব তাহারি লাগি।

২

ভালবাসি যারে, সে না বাসে যদি
তাহে দুখ রোষ নাই রে;
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে দুঃখনার ঠাই রে;

নিরবধি কাল, হয়ত কড়ুও
ভুলিব সে ভালবাসা;
বিপুল জগৎ, হয়ত কোথাও
মিটিবে আমার আশা।

[মিশ্র খাম্বাজ—ঝাপতাল]

১

হীরা কি আধারে জ্বলে
হিমে ফুল কি ফোটে হয়;
ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শূকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা;
কুহরে কোকিল কি লো বিনা সে মলয় বায়?

২

পেলে শূদ্ধ প্রতিদান রহে লো প্রেমের প্রাণ
বিয়োগে, মিলনে সম, কি আশা কি নিরাশায়।
নিরাশা, বিয়োগ, দুখ প্রেমের মরণ নয়,
বাঁচে না শূদ্ধ সে ঘৃণা-অবহেলা যাতনায়।

[মিশ্র বারোয়া—একতাল]

প্রেম যে কি মাথা বিষে জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল বয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শূকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

[সিদ্ধ—টিমেতেতাল]

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে।—
সেই যাগ, সেই কর্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কড়ু কি লো আমারে সে মনে আনে।

[সাহানা—ঝাপতাল]

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

কি দৈবগুণে, কে জানে,
তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ;
দিয়োছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন আশে;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

২

ফিরে কি লো যায় উল্কা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো
আদেশ কি অভিলাষে;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

[গান্ধারীতোড়ী—মধ্যমান]

জাগে মহী চাহি' তার ভান্দু পানে;
জাগে ফুলহাসি ধীরে ধীরে কোয়েলিয়া গানে।
প্রিয়া ঘরে নাহি নাহি রে, কার পানে চাহি—
কার স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ।

[সিদ্ধকাফী—ঠুংরি]

জান কি কঠিন তু'য়া লাগি
হেথা, কেহ অতি দীন
রহে—নিশি নিশি আঁখি-নীরে জাগি—।
সুখী রহ ভুলে রহি', সুখে সহি;—
শুধু কভু মনে করে, এ বিরহী—
জানায়ে সে সুখ করো তুর ভাগী।

[হেমখেম—আড়া]

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি, কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিস্ত ঢালি' তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ।
বুঝিব পদরুশ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয়পাষাণে লাগি' ভাগিবে সে অসিবল;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা ঘুরা নাহি হয় বোধ;—
নির্মম, গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

[সফন্দা—আড়াকাওয়ালী]

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
আগে গিয়ে মন তার চরণে লুটায়।
থাকিবে কি রোষ, মান;
থাকে না রোষের ভাণ—
তাহার দরশে সব আপন হারায়।

[কামোদ—ঝাঁপতাল]

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে' বারে যে তারে গ্যাছে
এ প্রাণে ঘিরি সে বিনে।
মলয়মধু রে মধুর অধরে,
কুহু স্বর—অচেনা পথিক সম আসি' যায়;
হাসে কি আকাশ, ঘন ঘন যবে ছায় তারে।
বিফলে সুরয চন্দ্র তারা ভায় তায় রে।

[ইমনকল্যাণ—পঞ্চমসোয়ারি]

কত ভাল বাসি তায়—বলা হ'ল না,—
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না—
—হৃদয়ে বাঁহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর;
প্রাণের কথা প্রাণে রৈল—বলা হ'ল না।
কত হাত ধরে সে মোরে সাঁধিল,
যেন মোর কাছে কত অপরাধী লো;—
—যদি ফুটিল না মৃথ, কেন ভাঙ্গিল না বুক
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হ'ল না।

[সিদ্ধখাম্বাজ—কাওয়ালি]

কি ঘোরে মোর এ ঢুলিছে নয়ন।
নিরখি জগত—এক প্রেমের স্বপন।
হেরি জগত শুষ্কতা শোভাপ্লাবন সমান,
শুনি জগতের কোলাহল মধুময় গান;
হেরি নীলাম্বর, ঘননীলতর,
ঢুলে মদিরাবিভোরতর বিধুর কিরণ।
জ্বলে, ঋষিবর ভান্দু;—তার প্রাণ সুমহান্
করে জগতের হিত তরে অকাতরে দান—
জ্বলে কোটী তারা প্রেমে আত্মহারা,
যায় হইয়ে আকাশ এক কাব্যের ভবন।

আসি গড়ায়ে পড়িছে বৃকে পৃথিবীর প্রাণ;
আসি কাঁদিছে চরণ ধরি' রৌষ অভিমান;

ঘৃণা দুখ ভয়ে দূরে চেয়ে রহে,
দৌখি আপনি বিহ্বল ভালবাসিছে মরণ।
আহা কি মোহমদিরা মোরে করায়েছ পান,
যাহে অবশ অলস মম শিথিল পরাণ।

যেন ভেসে চলি টেউ অঙ্গে চলি,—
প্রাণ আধ জাগরিত—আধ মোহে অচেতন।

[খাম্বাজ—কাওয়ালি]

আয় রে আমার সূধার কণা আয় রে ননী'র ছবি,
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ আয় রে
উষার রবি;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বৃকে ক'রে
রাখি।

উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে,
পাষণ ভাঙ্গা নিৰ্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে;—
ঘাড়ের কাছে সোণার বরণ
চুলগর্দলি তোর দোলে;
—যাস্ রে কোথা—আয় রে যাদু,
ঘুমা আমার কোলে।

তুই রে শিশু দুন্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রু'নীরে
ভিজি যাস্ রে পাছে?
না যাদু তোর, হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটেবে মধুর চাঁদের আলো এ অধার পূরে।

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু বরে,—
আমার স্বভাব কে'দে ফেলি রে
হাসতে হৃদয় ভরে'—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু
জড়িয়ে আমার গলে,
রিচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যাবেলা আসিস্ আমার বৃকে;
এমনি করে' পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোণা আমার, মাণিক আমার,
যাদু আমার ঘুমো।

[কাফী—একতারা]

দেখ্ রে কেমন খেলা করে
আমার প্রাণের শিশুগর্দলি,
তোরা শূন্যলি নে ত প্রতিবেশী
তাদের মধুর বৃলি।
তারা, বেড়ায় মাঠে ছুটে ছুটে,
যেথা কত কুসুম ফুটে,—
দৌড়য়, নাচে, পড়ে, উঠে, চলে হেলি' দুর্লি'।
তারা, একটি কাঠির তরে, এখনি কলহ করে,
এখনই গলাটি ধরে' করে কোলাকুলি।
তারা যখন আমার কাছে আসে,
মা বলিয়ে মধুর ভাষে
গলাটি জড়িয়ে হাসে—শোকতাপ ভুলি।

[পিলু—৪৭]

একি রে তার ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বলবে “ওমা এনে দে ওমা দে।”
'নেবো নেবো' সদাই কি এ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাসতে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,—
বলে কি না দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা—তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শূন্যলো কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধর্যো অমনি গিয়ে—
“ওমা আমি বিয়ে কর'ব”—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধরল আসি—
“ওমা আমি ফাঁসি যাব”—বিনি অপরাধে।

[খাম্বাজ—৪৭]

কেন রে ঝরিলি আজি
প্রাণের গোলাপ—তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল,
বকুল, মালতি, জুই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে,
বহিছে মলয় বায়ু,
দেখ্, এখনও বসন্ত আছে,
প্রাণের গোলাপ, আয়।

আজি, মাটিতে পাড়িয়ে কেন
 মলিন বদন তোর,
 একবার চাও রে বদন তুলে,
 হৃদয়ের নিধি মোর;
 ডাকি হাত দুইখানি ধরে'
 ওঠ্ রে প্রাণের ফুল,
 আয়, মদুছায়ে দি' মদুখখানি,
 বেঁধে দি' তোর এলো চুল।

[ঝর্ণঝট—একতালা]

ও তা'রা কা'রা নাই;
 তা'রা চলে গেছে এসে দুদিনের তরে
 একা পড়ে' কাঁদি তাই।
 একাকী কুটীরখানি পতিত জলার গায়,—
 বাহিরে বাহিতোছিল শীতের প্রখর বায়;
 ভিতরে ছিল না বাতি,—গভীর আঁধার রাতি;
 আইল পথিক দু'টি হেসে,
 মা বলি' ডাকিল এসে;—
 পরদিন খড় আনি' ছাইনু কুটীরখানি;
 করিনু সুন্দর ঠাই—কেন বা করিনু ছাই।
 করিনু সুন্দর ঘর তাহাদের তরে
 চলে গেল এসে তা'রা দুদিনের পরে;—
 নীরব সে নিতি নব হরষের কলরব
 কলহ-নালিশ সব হয়;—
 নীরব কুটীর পুনরায়;—
 আবার প্রখর বায় তেমতি বাহিয়ে যায়,
 আবার, গভীরতর আঁধার বিজন ঠাই।

[কীর্তন]

১

একবার
 দেখে যাও দেখে যাও
 কত দুখে যাপি দিবানিশি,—
 তোমা বিহনে, ব'ধু হে;—
 তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়;
 তোমা বিনে শূন্য ভুবন অন্ধকারময়;
 তোমা বিনে শূন্য ফুলমেলা,
 নীরস সাক্ষের মেঘের খেলা,
 তোমা বিনে, পূর্ণ চাঁদ স্নান দুখে চায়;

তোমা বিনে শিথিল জীবন
 এক ধারে পড়ে' কাঁদে মন,
 ছিন্নতার আশা বীণা করে হয় হয়;
 তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয়;
 তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিঁনু হে—
 তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি,
 (মনে ছিল)
 তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণ ভরি,
 (মনে ছিল)
 খুঁজি, জীবন-নদীর পূণ্যতম তীর
 বসাইব সেথা তোমার মন্দির,
 (মনে ছিল)
 দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব,
 (মনে ছিল)
 দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব,
 (মনে ছিল)
 তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
 প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ
 (মনে ছিল);—
 মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
 বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
 প্রাণনাথ হে, ব'ধু হে,
 বড় সাধে—
 প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
 নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
 দীপ নিভে গেল; বিনা তৈল হে নাথ;
 অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ;
 একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়াহলে হব আমি রাজা তব,
 উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—

বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুহুময় অন্তঃপুর;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইষে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া.
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া;
ভাঙাব বৃকের তব পাষণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—

সুখের স্বপন দেখিতোঁছিলাম—জাগিলাম,
শতবীণাধরনি শুনিতোঁছিলাম—জাগিলাম;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতোঁছিলাম—জাগিলাম;
প্রেমের চরণে হাসিতোঁছিলাম—জাগিলাম;
মলয় পরশে শিহরিতোঁছিন্দু—জাগিলাম;
নন্দনকাননে বিহরিতোঁছিন্দু—জাগিলাম;
আঁধারে কেন জাগিলাম,
অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে
কেন জাগিলাম হে।

একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—

খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বৃক্ষে ল'ব তৃষিত চুম্বনে;
নীরব হৃদয়ভাষা তাহে র'বে পণ,
র'বে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন;
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বৃক্ষে ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে;—
দিব বাঁধ করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শূন্য বিনিময়,
তার রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ;
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল,

সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী;—
বিহরিব কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে;
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে;
দেখিব মিলিত বন্ধু সে কাননে বসি'—
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী;
দেখিব বিজলি শ্যাম বরিষা অধরে;
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে;
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি,
উথলিবে যুগ্ম বন্ধু কাকলীর ভাষা;
বৃক্ষিব—জগৎ এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্‌ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
স্বপ্নয়জীবনারে?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙিতে পার না যারে?
এত শূন্য কি হে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছ্‌ জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজল.—তা হে?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
—প্রণয় পুরুষ খেলা,—
এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী-রাধনা,—
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণীসাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম;
প্রণয়ই মম জ্ঞান;
প্রণয়ই মম ধরম:—

শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
 অক্ষুণ্ণ প্রণয়ভাষা;
 সে হৃদয়ে আজীবন
 জ্বলে শৈশবভালবাসা।
 হায়—পদরুশ প্রণয়ে হাসে রমণী
 পোড়ে অনুরাগে;
 পদরুশ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
 রমণী প্রণয়ে জাগে;
 প্রণয় পদরুশ প্রহর,
 ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো;
 প্রণয় রমণীজীবন,
 ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
 অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
 রুদ্ধ উড়ে অবসাদে;
 কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
 মম ঘরময় পড়ি কাঁদে;—
 সীমন্তে মম সিন্দূরবিন্দু
 অর্ধবিম্বচ্ছিত শয়নে;
 ক্ষীণ গন্ড দিয়া মদুমদুম বরষিত
 বারি হীনপ্রভ নয়নে;
 পাংশু অধর'পর যায় সভয়গতি
 অক্ষুণ্ণ কম্পিত বাণী;—
 দর্শন সখসম ত্যজত বলয় হত-
 বৈভব বাহু দুখানি;—
 চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
 অর্ধ-ভগ্ন মম দেহ:—
 প্রাণ চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
 শূন্য এ হৃদয়-গৈহ।

[মালকোশ—আড়া]

অধর চুম্বি মে অরুণ অধরে,
 পরশি দেহ মলয় সমীরে,
 আও প্রাণনাথ,
 —পোহাল রাত,—
 'পিয়া' বলি ডাক পিউস্বরে ধীরে।
 এ ভালবাসা,
 অতপ্ত পিয়াসা,
 জীয়াও ঢালি কিরণমদিরে।

[কালাংড়া—একতারা]

একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে,
 তুইও কি রে জরজর প্রেমমধুগরলে?
 মধুর চাঁদনি রাতে
 ডাকিস্ কি রে প্রাণনাথে;
 পড়িস্ কি প্রণয়ের বিরহের অনলে;
 একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।
 গাস্ নে বিহগী আর
 ভাঙিবি প্রাণ আমার,—
 তোর গানে এই প্রাণে কে জানে কি উথলে।
 একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।

[ভৈরৌ—কাওয়ালী]

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি'
 মধুর সম্ভাষি'
 যমুনার বাঁশি বাজে;—
 ঐ কানন উছলি,
 যায় যেন চলি'
 'রাধে' 'রাধে' বলি আজ এ।
 পড়ে ঘুমাইয়ে ওই
 তারাকুল সই,
 অধরে মিলায় হাসি;
 নেমে, নিশিশেষে এসে
 নায় এলোকেশে
 যমুনায় জ্যোৎস্নারানি।
 দেখ্ নিশি পড়ে ঢুলে
 যমুনার কূলে
 উছলে যমুনাবারি:—
 সখি ছুরা করে' আয়,
 যাই যমুনায়
 হেরিতে মুরলীধারী।
 দেখ্ সমীরণ ধীরে
 উঠিল জাগি রে
 জাগিল পূরবে ভাতি:
 শোন্ কুঞ্জ গীত উঠে,
 কুঞ্জ ফুল ফুটে,
 —সখি রে পোহাল রাত।

[কীর্তন]

ক'ই তব্দ সে ফিরে এল না এল না।—
বলে' গিয়েছিল যে সে শীত-ঋতুশেষে
রবে না সে, দূরে বিদেশে।
ঐ শিশির ত অন্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে,
ঐ ধরণীনাথে কুহুরবে ভাষি',
সাজি' শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিল ত বক্ষে স্দুধর হাতি'
ফুলকুল পারি' এলোকেশে।
তব্দ কেন সে ফিরে এল না এল না।
কত রহি, সে কি জানে, চেয়ে পথ পানে
সে মদুখদরশন-আশে;
বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তব্দ মোর পাশে।
সে কি জানে না, কি জ্বলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে;
কি শত শেল বিধে, বিরহিণী-হৃদে,—
সে কি রে তাও না জানে।
তব্দ কেন সে ফিরে এল না এল না।
সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি'
ধন, মন, হৃদয়, দেহ;
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি, আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ;
সে কি জানে না সে মোর কর্ম্ম, বিশ্রান্তি,
প্রেম, কলহ, অভিমান;
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ, দুঃখ, জীবন, প্রাণ।
তব্দ কেন সে ফিরে এল না এল না।

[কীর্তন]

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে;
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর
হৃদয় হৃদয়'পর হে;—
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে আজ
শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে।
তোমারি হারাণ বাঁশি
লুঠায় ধরণী'পর;
মলিন,—তোমারি তব্দ—
আদরে তুলিয়া ধর;—
পূরণ প্রাণের বাঁশি
তেমনি ক'রে আজ বে
নাথের করে মধুর স্বরে
—বাজ্ রে বাজ্ রে।

III

[কীর্তন]

কেন খুঁজতে বাস্ রে বিমল প্রেম
এ জগতে ভাই!
কেন মিছে খুঁজা পারি না যা—
হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধু রে প্রাণ-দানপ্রতিদান-
বেচাকেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস,
আর অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন,
চাহনি, চুম্বন, ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক,
কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটলে পিয়াস,
মিলাইয়ে যায়;
এ প্রেম ইন্দ্রধনুহাস, বিজলি বিকাশ,
অস্থির এমন তাই।
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল
তারা সম স্থির;
সে সংগীত মহান্ গগনের গান,
নয় এ পৃথিবীর।
যার দু'একটি কর—পথহারা স্বর—
মাঝে মাঝে মোরা পাই।

[বিভাস—একতারা]

কল্লোলিয়া যায় এক সংগীত মহান্,
আয় বে'ধে নে' যা সঙ্গে তোদের বেসুরা প্রাণ।

এ গানে বিষাদ নাই,
 এ গানে অশান্তি নাই রে;
 স্ফুৰ্ণভীর, স্থির, স্নিগ্ধ, অবিশ্রাম এ গান।
 শ্বেষ, ঈর্ষা, বিরাগ, ব্যথা—
 শব্দ প্রাণের মলিনতা;
 বিস্মৃতি এ মহাগীতের—ক্লোভ অভিমান;
 নিয়ে আয় প্রাণের সব ক্ষুদ্র কথা;
 নিয়ে যা প্রাণ ভরি' অমরতা;
 নিয়ে যা নতুন প্রাণ এ গানে করি তীর্থস্থান।

[সিন্ধু—টিমে তেতালা]

আজ কেন প্রাণ আকুল হয়?
 প্রাণ কাঁদে কিন্তু দখে নয়।
 এ যে গীতের ভাষা ভালবাসা-
 মেশা-অশ্রু, মিলন হাসিময়;
 প্রিয়পরশনে, স্বর শব্দে,
 জাগে যেন ঘুমন্ত হৃদয়।
 যেন শিশু তার পে'ল মা'র
 হারা কোল,—শান্তির আলয়;
 যেন নব বধু পে'ল ব'ধু,
 পথহারা পথিক, আশ্রয়।
 কারে মৃদুস্বরে, প্রেমভরে
 ডাকিতে আকুল বাসনা এ?
 প্রাণ—বাহু দিয়ে জড়াইয়ে
 হৃদয়ে ধরিতে কারে চায়।

[কীর্তন]

১

এস সখে এস প্রভু
 প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ হে;
 পুরাব পিয়াস প্রাণের,
 মিটাইব মনসাধে;
 মনসদখে মৃখখানি
 দেখিব ভরিয়ে আঁখি;
 জড়াব জীবনজ্বালা
 তোমারে হৃদয়ে রাখি।

২

এস, ডাকিব পুরিয়া সাধ
 আজ, তোমারে “আমার” বলে;
 গাঁথা প্রণয়ভক্তিহারে
 দিব পরায়ে তোমার গলে;
 আজ শব্দাব প্রাণের স্বরে
 রচে' রেখেছি যে সব গান;
 আজ তোমারে ছাইয়ে দিব
 দিয়ে প্রণয়ের অভিধান।

৩

আহা, কতদিন মোর হৃদয়মাঝারে
 বরেছি তোমারে প্রভু;
 কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
 পাব কি তোমারে কভু;
 কত উষার শিশিরে, প্রদোষ-সমীরে,
 নিশার তিমিরে জাগি,
 নাথ ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
 তু'হার দরশ লাগি।

৪

শব্দনি মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমন গণি'
 চমকিয়া তুলিতাম মৃখ,
 তব সমস্নিগ্ধ মেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণকরে
 দরুদ দরুদ কাঁপিত এ বৃক;
 আজি সে তুমি আমার নাথ,
 হেরি তোমা দিন রাত,
 তবু যেন ভরে না পরাণ;
 আজ তোমার আলোকঘায়, জগৎ ডুবিয়া যায়
 গগন হইয়ে যায় গান।

[ইমন—আড়া]

নিয়ে চল—নিয়ে চল
 পথ দেখাইয়ে মোরে;
 দুর্গম প্রান্তরে, নাথ
 নিয়ে চল হাত ধরে।

আঁধার নিবিড় অতি,
 এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
 তোমার আলোকে দেব,
 উজলো তিমির ঘোর এ;
 নিয়ে চল—নিয়ে চল
 পথ দেখাইয়ে মোরে।
 গরবে, তোমার আলোভাঙ্গা
 এক কণা পেয়ে,
 এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহেনি
 ও মৃখে চেয়ে;
 এতদিন—মৃঢ় আমি চিনেনি
 আপন স্বামী—
 ভুলে যেও প্রাণনাথ—
 অপরাধ দয়া করে।
 চল সিদ্ধ, গিরিশঙ্কর, মরু,—
 যেথা দিয়ে বল,
 গহন, কান্তার, শৈলে—
 শূন্য তুমি নিয়ে চল;—
 সৃষ্টি দেখে শূন্য নাথ হে,
 রেখো পায়ে থেকে সাথে,
 কি বসন্ত বরিষায়,
 কি ঘোর নিশীথে, ভোরে।
 নিয়ে চল, নিয়ে চল—
 পথ দেখাইয়ে মোরে।

[ভীমপলাশী—৪৭]

আমি উঠিতে কি পারি
 তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
 সদা নীচগামী, স্বতঃ সিদ্ধবারি,
 ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী;
 তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
 আছি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,
 নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে:
 শূন্য তব—নাথ—দরশাভিচারী।
 যদি আস কভু স্বরা চলি যাও,
 দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও;
 এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

[মালকৌশল—মধ্যমান]

আজ নিশি অবসানে সৃষ্টির মিলন;—
 দেহে দেহে নয় আজ প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন।
 এখানে নাহিক অশ্রুরাশি
 এখানে শূন্যই হাসি রে,
 নাহিক আঁধার;
 চিরকাল আলো,
 ভালবাসার কিরণ।
 মধুর প্রভাতে মধুর গানে,
 ঢালিব দুটি প্রাণে রে;
 চিরকুহুরবে, মধু উপদ্রবে,
 আজ ঢালিব জীবন।

[আশা—কাওয়ালী]

এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি'।
 ছোট এ হৃদয় হায়, ধরে না ধরে না তায়
 আকুল অসীম এ প্রেমরাশি।
 তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
 রাখি না কেনই যত কাছে,
 যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
 কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
 এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
 দিয়া প্রেম পুরে না'ক সাধ এ;
 যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
 অপূর্ণ বাসনা পড়ি' কাঁদে।
 এ আবদ্ধ মনে প্রেম, এ ক্ষুদ্র জীবনে প্রেম
 কত দিব মিটিবে না আশা:
 জনম অশ্রুতে পূরা, এ জগত ভাঙাচুরা,
 হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
 হউক বিস্তৃত স্থান, হউক অসীম প্রাণ,
 হউক কাল নিরবিরোধ;
 তখন পূরাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা
 জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।
 সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম রাজস্বে উঠি
 যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি';
 জনমের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে,
 জগৎ বিস্ময়ে র'বে চাহি'।

পিউ

উপহার

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণি রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে;
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মৃগুদশনা, রক্তকমলাধরা রে।

পতিপ্রিয়া, পতিভকতা,
সখী পতি সহ পরিহাসে,
দঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা,
নীরবা নিঠরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে;

দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পূণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্মরদৃঢ়চিত্তা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।

কে বলে কালো রূপ নয়,
যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষার চাহে কে মৃঢ়
মণ্ডিতে বসন্ত হাসি?
তাজি নব ঘন কে চাহে
শ্বেতমেঘ শোভা প্রথরা রে।

জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়ী,
নিদ্দি' তুহিনে শূদ্রচিত্তে,—
বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে,
কালো রূপে অমরা রে।

হা, এ রত্ন দাস-হৃদয়ে—

পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—

পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—

স্বার্থদাসদাসী;—

কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অঙ্গরারে ॥

I

SCOTCH SONGS

AULD LANG SYNE

পূরণ প্রেমকো নহি যাও ভাইয়া হো,
পূরণ প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যাঁউ যব্ বনমে ফুল ঢুঁড়িয়া হো,
আয়া ছোঁড়ি' সো দূর্মে সো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যো দিন নদীমে তুম্ হম্ খেল কিয়া হো,
তব্ সে বীচ্ মে র'হু গাঢ়া দরিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

নে হাত দে হাত মূব্ কো মোরা পিয়া হো,
পিও জি খেয়াল্ কর্ অব্ যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

তোমারি ভরো তুম্ হম্ ভরে' মেরি আ হো,
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

YE BANKS & BRAES

কেমনে তুই রে যমুনাপদালিন
সাজিস্ রে এত ফুল্ল ফুলগণে;
কেমনে হরষে গাস্ রে বিহগ,
আর আমি এত বিষাদিত মনে—
গাস্ না ক আর পদ্পিত কাননে,
পাখী রে ভাঙ্গিবি হৃদয় আমার;
কেন রে অন্তরে জাগাস্ সে স্মৃতি
গিয়াছে যে সুখ—ফিরিবে না আর।

কত বার এই যমুনাপদালিনে .
ভ্রমিয়াছি আহা প্রভাতে সন্ধ্যায়.
কর্জিতিস্ তোরা প্রণয়ে বিহগ
আমিও যেমতি গাইতাম হায়—
গেলাম তুলিতে গোলাপ মুকুলে,
বাড়াইনু হাত কত সাধ করে';
নিঠুর প্রণয়ী হরে' নিল তায়,
রেখে গেল কাঁটা আমারি অন্তরে।

ROBIN ADAIR

কিসের নগর আর—
নবীন যে নাই;
কি দেখিতে এনু আমি
কি শুনিতে ছাই—
কোথা সে আনন্দ উল্লাস এখন;
আনিতে যা ভবে স্বরগভুবন:
গিয়াছে তোমার সনে
নবীন আমার।

তুইই সভার মুখ
করিতিস্ আলো—
উৎসব তোরই তরে
লাগিত রে ভাল;
ফুরালে উৎসব কেন এ হৃদয়
হ'ত রে উদাস,—সব শূন্যময়?
তোরেই বিদায় দিতে
নবীন আমার।

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার;
আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার:
তবু তোরে এত বাসিতাম ভাল,
রহিবি আমার হৃদে চিরকাল;
তোরে কি ভুলিতে পারি
নবীন আমার।

LAND OF THE LEAL

আমি—ক্লান্ত হইয়ে লীল,
পড়ি ঘুমাইয়ে, লীল,
যাই ঘুমাইয়ে
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আজ—আমি যেথা যাই, লীল,
দুঃখ জনালা নাই, লীল,
প্রসন্ন সদাই
সব পুণ্য নিকেতনে।

তুই—ছিলি বড় বেশ, লীল,
কাজ হলে শেষ, লীল,
আসিবি সে দেশ
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আছে—মেয়েটি তথায়, লীল,
দেখিবও তায়, লীল,
সোণার বাছায়,—
সেই পুণ্য নিকেতনে।

তবে—মোছ অশ্রু আয়, লীল,
যাই, দে বিদায়, লীল,—
পরীরা দাঁড়ায়
ঐ পুণ্য নিকেতনে।

তবে—যাই বিধুমুখি, লীল,
হোস্ নে তুই দুখী, লীল,
হব মোরা দুখী
সেই পুণ্য নিকেতনে।

ANNIE LAURIE

সেই, মধুপদুর কুঞ্জবনে
 যথা—প্রভাতে শিশিরময়;
 সেথা—বলোঁছিল তারাময়ী
 আমা বই সে কাহারো নয়
 “আমা বই সে কাহারো নয়”
 ভুলিব না সে বচন তার
 —সুন্দরী তারার তরে
 আমি ত্যজিব জীবন ছার।

তার—কিবা সে বঙ্কিম গ্রীবা
 কিবা—কপোল গোলাপ সম;
 আহা—রবির কিরণতলে
 তার—মুখখানি নিরুপম;—

তার—মুখখানি নিরুপম;—
 কিবা—ভ্রমরনয়ন তার,
 —সুন্দরী তারার তরে
 আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

আহা—কমলে নীহার সম
 তার, নীরব মধুর গতি;
 আহা মধুর মলয় সম
 স্বর মৃদু মধুময় অতি;—
 তার, মধুময় মৃদু স্বর,
 প্রাণস্বর্ষস্ব সে যে আমার:—
 —সুন্দরী তারার তরে
 আমি ত্যজিব জীবন ছার।

BLUEBELLS OF SCOTLAND

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়,
 ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়;
 “গ্যাছে নিশান উড়ায়ে
 যেথা বীরকুল ধায়;—
 আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়;
 গ্যাছে নিশান উড়ায়ে
 যেথা বীরকুল ধায়;—
 আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়।”

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়,
 ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়;

“সে গো, থাকিত সে বীরভূমি
 রাজপুতানায়;—
 আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।
 সে গো, থাকিত সে বীরভূমি
 রাজপুতানায়;—
 আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।”

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর
 কি বেশ পোরে' যায়,
 ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর
 কি বেশ পোরে' যায়
 “তার, পাগড়ি মাথায়,
 আর লৌহবর্ম গায়;—
 আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়,
 তার, পাগড়ি মাথায়,
 আর লৌহবর্ম গায়;—
 আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়।”

ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর,
 ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর:
 “না না, প্রেমই সহায়—
 এনে দিবে তায় আবার;—
 হায়, এ বুক ভাঙবে যদি না ফিরে সে আর
 না না, প্রেমই সহায়—
 এনে দিবে তায় আবার
 হায়, এ বুক ভাঙবে যদি
 না ফিরে সে আর।”

AULD ROBIN GRAY

হেম বিয়ে কর্বে বলে বাস্তু মোরে ভাল,
 টাকা কড়ি কিছু তার ছিল না সম্বল;
 টাকা কড়ির জন্যে হেম গেল দেশান্তরে,
 সে টাকা সে কড়ি তার আমারই তরে।

তার যাওয়ার দৃ হস্তা না হতে হতে ভাই,
 বাবার ভাঙল হাত মোদের চুরি গেল গাই;
 মায়ের হ'ল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
 এমন সময় নবীন এল বিয়ে কর্তে মোরে।

বাবার কাজ বন্ধ হ'ল, তাঁত বোনা মার,
খাবার যোগান তাঁদের হয়ে উঠল ভার;
নবীনই খাওয়াত, আর চোখে জল নিয়ে,
বলত “রামী তাদের জন্যেও করবি না বিয়ে?”

আমার প্রাণ বলত “না, হেম
আসবে সে আবার,”

কিন্তু ঝড়ে ডুবে গেল—নৌকাখানি তার;
নৌকা ডুবে গেল কেন মোল না ক রামী,—
কেন ভাঙা কপাল নিয়ে বেঁচে আছি আমি।

বাপ সে বোঝাত কথা কইত না মা সে ত;
মুখে চাইত কেবল,—

আমার বুকখানা ভেঙ্গে যেত:
তা'রা বিয়ে দিলে, কিছুর কইনু না ক আমি,
পরান আমার রইল হেমের, নবীন হ'ল স্বামী।

বিয়ের পর না যেতে যেতে হবে হুতা চার,
একদিন বসে' আছি দুখে দুয়োরের ধার,
দেখনু যেন হেমের ছায়া, ভাবনু হেম কি এ?
বলল হেম “এনু রামী কর্তে তোরে বিয়ে?”

সে ভাই মোদের দুখের মিলন

অনেক কথা ক'নু.

শেষের দেখা একটি চুমো পরে পৃথক্ হ'নু;
—কেন মোলাম না ক, কেন ভাঙল না এ বুক,
কেন রইনু বেঁচে ভাই সইতে চির দুখ!

আমি ছায়ার মত বেড়াই, মন যায় না কাজে,
হেমের কথা ভাবতে চাই না, পাপ হবে তা যে;
কিন্তু রইব ভাল হয়ে নবীনের পাশে,
নবীন সে বড়ো হ'লেও মোরে ভাল বাসে।

যখন মেঘরা তাদের প'ীড়ে গোয়ালেতে গাই,
শ্রান্ত জগৎ ঘুমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই;
তখন আমার চক্ষে ঝরে প্রাণের বারিধার,
আর পাশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার।

WE'RE' A NODDIN

মোরা, বড়ই খুসী খুসু খুসু খুসী,
মোরা, বড়ই সুখী আছি এখন ভাই—

আয়, ভাল আছি'সু প্রতিবেশী?

একলা আছি'সু কি রে?

দেখ'সে মোরা কত সুখী হেম এয়েছে ফিরে।
কবে—এ—এ সে গিয়েছিল পরান ছিল ভার,
বিদায় দিনু কে'দে, ভেবে দেখ'ব কি তায় আর।

এখন বড়ই খুসী খুসু খুসু খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

আহা, বাছাদের খাওয়া পরা সয়ে' কত দুখ,
যোগাতেম খেটে তাদের দেখতে হাসি মুখ।
মাঝে মাঝে কাঁদত পরান আমার হেমের তরে,
মনে নিত কভু, হেম আসবে ফিরে ঘরে।
এখন বড়ই খুসী খুসু খুসু খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

কে, ঝাঁপে এসে টোকা দিলে,

চিনি যেন সে টোকা,

বলে “ওমা বাবা এয়েছে” দৌড়ে এল খোকা।
কি ভাবিছনু মনুই—অমনি উঠে, পরান উতলা,
দেখনু হেমে কে'দে ফেল'নু
জড়িয়ে ধ'রে গলা।

এখন বড়ই খুসী খুসু খুসু খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

GIN A BODY

যদি ধানের ক্ষেতের মাঝে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কার দেখা পায় তা,

পরের কি দুখ তায়;—

সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আসতে পাড়া দিয়ে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় ডাকে পরের কিবা আসে যায়;
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে

বলে মোর কেউ নাই,

তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আসতে কুয়ো থেকে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় চুমো খায়

তা বোলে কি বেড়ায়;—

সকল মেয়ের প্রেমিক আছে
বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

তাদের মাঝে আছে একজন ভালবাসি যায়;—
না কি, কোথায় বাড়ি, আমি বলব না ত তাঁর
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে
বলে মোর কেউ নাই
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

MY HEART'S IN THE HIGHLAND

মোর, হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে,
হৃদয় হেথা নাই;

মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
মৃগপিছু ধাই;—
যায় সে মৃগয়ায় ফিরি
কাননে সদাই;

মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
যেখানেতে যাই।

তবে বিদায় তোদের পাহাড়মালা
সৌন্দর্যের রাশি;

তবে বিদায় তোদের শস্যভরা
মাঠের শ্যামল হাসি;
বিদায় তোদের নিৰ্ঝরিত
নদনদীগণ.

তবে বিদায় তোদের ফুলভরা
ফলভরা বন।

আজ বিদায় তোরে জন্মভূমি
সূর্য্যকরময়.

মোর বীরত্বের রংগভূমি,
গুণের আশ্রয়;
তোরই কাছে হৃদয় রহে
যেখানেতে আসি;

মোর স্বদেশ তোরে চিরকালই
বড়ই ভালবাসি।

MY AIN FIRECIDE

আমি দেখিয়াছি কত শত ধনী মানী জনে,
আমি বসেছি প্রাসাদে কত রাজা-রাণী সনে;
তবু এমন সুন্দর স্থান কোথা নাহি পাই,
আহা যেমতি আপন ঘর আপনার ঠাই;—

আপনার ঠাই সখে, আপনার ঠাই;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাই।

আজি দেবের কৃপায় নিজ উঠানের ধার
মোর প্রিয় সখাদের সনে মিলেছি আবার;
নহে নিয়ম অধীন হেথা হাসি আঁখিধার,
হাসি আপন হরষে কাঁদি দুখে আপনার;—
আপনার ঠাই সখে, আপনার ঠাই;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাই।

হেথা, নাহি মিছা লুকাচুরি প্রতারণাভয়,
হেথা, সত্য নিকেতন সখে প্রেমের আলয়,
যত, সুখের সোপান দেখি এ জগতে ভাই,
নহে, তেমতি যেমতি সখে আপনার ঠাই;—
আপনার ঠাই সখে, আপনার ঠাই;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাই।

JOCK OF HAZELDEAN

“কেন—কাঁদাচিস্ নদীর ধারে, বালা
কাহার লাগিয়ে,
আমার—ছোট ছেলের সঙ্গ বালা
দিব রে তোর বিয়ে!
তুই—হবি রে তার বধু, পাবি
সুকুমার বরে:”—
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-জল
অজিতের তরে।

“তবে—ছাড়ি শোক এ মোছ ও পাংশু
গণ্ডে অশ্রুধার,
যদু—বীরেন রাটোরের পতি
রাণা বিঠুয়ার;
সে—শান্তি সভায় পুরোগতি,
বিজয়ী সমরে:”—
তবু—ফেলে বালা অশ্রুবাবি
অজিতের তরে।

তোরে—দিব স্বর্ণকণ্ঠমালা
শিরে স্বর্ণ-হার,
দিব—তেজী শ্বকুল, পোষা শোনে,
নব বাজী আর;

যাৰি'—সবার আগে বনরাণী
 তুরঙ্গম'পরে :"
 তবু—ফেলে বালা অশ্রুবারি
 অজিতেরি তরে।
 রাতে বাড়ি হল সুসজ্জিত
 জ্বলে বাতি কত,
 ব'সে পদরোহিত; ও বর, ও বিয়ের
 পদরুষ মেয়ে যত।
 তারা খোঁজে ক'নে কুঞ্জ-ঘরে :
 পেল না ক ক'নে ;
 সে চলে গেছে দেশান্তরে
 অজিতেরি সনে।

CALLER HERRING

কে, কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে :
 কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে,
 মো'দিগে' কি ভেবেছিলে :
 তখন মোরা দাঁড়িয়ে ঝিলে
 আঁধার রাতে জাল ফেলে :—
 কে কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে :
 কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন ম'ইলোক যাই গো চলে,
 সাড়ি-পরা গিঞ্জিকুলে
 গ'ন্ডি়য়ে আঁচল ঘোমটা খুলে
 সিট্‌কোয় নাক মাথা তুলে :—
 কে কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে :
 কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

উবরা কথা করে শোনা,
 যদি কিন্বে টাট্‌কা পোনা,

তবে দর দস্তুর করো না,
 সত্য বই কিছ্‌ টে'কে না :—
 কে কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে :
 কিন্বে তাজা পোনা মাছ এ,
 টাট্‌কা ঝিলে ধরা।
 কে কিন্বে আমার তাজা পোনা,
 বহুৎ কষ্টে ধরে আনা,
 কিন্বে আমার তাজা পোনা :—
 গুণ জানেন যিনি খান :
 কে কিন্বে আমার তাজা পোনা,
 "এ ছোট লোকে খায়" বোলো না :
 বউরা, মা'রা করে জানা
 এ সকলকার প্রাণ ;
 চাই পোনা মাছ, চাই পোনা মাছ।

MAN'S A MAN FOR A' THAT

হয় ইমানদার্ গরীবী সে
 শির্ নোওয়াতা—আওর্ যো কুছ্ ?
 ও কাফের্ উস্‌কো ছোড়্‌কে যাঁয়,
 হম্ গরিব্ হোঁ—হো যো কুছ্ ;—
 হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
 হম্‌রা ছোটা কাম্—আওর্ যো কুছ্,
 ইজ্‌জৎ হয় রুপেয়াকো খেল্,
 মন্দর্ সোনা হয়—হো যো কুছ্।
 ক্যা ছোটা খানা খাঁয় হম্‌লোগ্,
 পর্তা সুতী—আওর্ যো কুছ্ ?
 দেও রেশম্ বেকুফকো দার, বজ্‌জাংকো,
 মন্দর্-মন্দর্—হো যো কুছ্ :
 হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
 দৌলৎ উনোকো—যো কুছ্,
 ইমান্দার্, হো গরিব্ নেহাইৎ,
 তব্‌ভি পাদ্‌শাহ্—হো যো কুছ্।
 পাদ্‌শাহ্ বানাতা তো দেওয়ান্,
 আমীর্ নবাব্—আওর্ যো কুছ্ :
 মগ্‌ ইমান্দারকো বানানে
 কোশীশ্ করে মাৎ ও কুছ্ :
 হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
 ইজ্‌জৎ উনোকো—যো কুছ্ :

হৃদস্কা ইজ্জৎ দামকা দেমাক্
সব্‌সে উচা—হো যো কুছ্।
তব কর্‌ নেওয়াজ্ কে দিন্ আওয়ে,—
যো আওয়েগা—হো যো কুছ্;
যব্ হৃদস্, আক্কেল্ দুনিয়া মে
হোগা বড়া’—হো যো কুছ্;
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
দিন্ আতা হয়্—হো যো কুছ্;
যব মন্দর্ মন্দর্ সব্ দুনিয়া পর্
ভাই ভাই হোগা—হো যো কুছ্।

II

ENGLISH SONGS

HOME SWEET HOME

প্রাসাদে বিলাসে ভাই যেখানে বেড়াই
কুঁড়ে হোক্ নিজ ঘর সম ঠাই নাই,
স্বরগের শোভা এসে হেথায় লুটায়
খোঁজ এ জগতে, তাহা পাবে না কোথায়.

আহা মোর—মধুর মধুর ঘর:
ঘর সম ঠাই নাই, ঘর সম ঠাই নাই।
প্রবাসীর কাছে জাঁক জমক কি ছার,
পুনঃ এনে দেও পর্ণকুটীর আমার;
দেও মোর বশ পাখী হরষের গান
দেও সব চেয়ে প্রিয় শান্ত পরাগ

আহা মোর,—মধুর মধুর ঘর:
ঘর সম ঠাই নাই, ঘর সম ঠাই নাই

LINES TO AN INDIAN AIR

জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি
যবে, নিশার প্রথম ঘুমে,
রহে, তারকা আকাশ ফুটে,
লুঠে সমীর কাননভূমে,
জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি:—
কেহ যেন পরী সম এসে
মোরে ল’য়ে যায় প্রিয়ে, কে জানে কেমনে
তোমারি আলয় দেশে।

ভ্রমি, সমীর এলায়ে পড়ে
কালো আঁধার নদীর গায়;
নিভে চম্পকসুরভিখানি
শিশু প্রেমের স্বপন প্রায়।
প্রেমী পাপীয়ার প্রেমকথা
তার প্রাণেতে ঘুমায়ে পড়ে,
চাহি ঘুমাতে যেমতি আমিও প্রেয়সী
তোমার হৃদয়’পরে।

আজ চেতনা হারায় যাই,
মোরে মাটি হ’তে তুলে ধরি,
তবে বরিষ চুম্বনসুধা
মোর অধরে, নয়নোপরি;
দেখ, শীতল কপোল মম,
দেখ কম্পিত হৃদয়, প্রিয়ে;
তারে বৃকেতে চাপিয়া ধর লো, ভাস্বে সে
ভাঙুক সেখানে গিয়ে’।

WON'T YOU BUY MY PRETTY
FLOWERS

আলোর নীচে পথের ধারে
দাঁড়িয়ে একটি কহিল মেয়ে:
শীতের রাতের নিঠুর বাতাস
চার দিকে তার যাচ্ছে ধৈয়ে;
যাচ্ছে চলে’ পথের মানুষ,
তার পানে কেউ চায় না ফিরে;
কে’দে কে’দে বল্ছে সে “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?”
কত দীন ও দুঃখী—মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে:
আঁধার রাতে কে’দে কে’দে “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?”
আস্‌চে কেবল যাচ্ছে কেবল
পথে পুরুষ মেয়ের দল;
দেখেও না কেউ তাকিয়ে যে তার
নিরাশ দুখের চক্ষের জল;
দীর্ঘশ্বাসে কোমল হৃদয়
তার সে উঠ্ছে পড়্ছে ধীরে;
শোন্ গো একবার রোদন তার “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে?”
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে:

আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?”
কয় না ক কেউ ভাল কথাটি
ডেকে নিয়ে কি ভাল বেসে,
নাইক একটি দয়ার হৃদয়
দাঁড়ায় একবার কাছে এসে’,
যাচ্ছে চলে জাঁকের ঢেউ সে
বিলাসকুঞ্জ, সুখের তীব্র,
শোনে না সে করুণ গান “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?”
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে “কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?”

FATHER, DEAR FATHER

বাবা, মোর সাথে বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই এক বাজে ঘড়িতে শোন;
তুই বলিছিলি বাবা কাজ হলে শেষ,
ফিরে আসিবি, না করিবি গোণ:
গ্যাছে বাতি নিভে ঘরে, এ রাত আঁধার,
সাঁঝ থেকেই মা বসিয়ে আছে;
একা ব্যামো ভাই বেণী কোলেতে সে তার,
আমি বিনে কেউ নাইক কাছে।
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো: বাপ আয় গো বাড়ি আয়।
আহা শিশুটির শোন মধুস্বর,
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়;
কে না শোনে এই ডাক সক্রুণ,
“বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।”

বাবা, মোর সাথে বাবা আয় বাড়ি আয়,
দুই বাজিছে যে ঘড়িতে ওই;
রাত হ'ল আরো শীত বেণী মৃতপ্রায়
শুধু ডাকে “বাবা কই, বাবা কই:”
মা ত বলে সে এ নিশি না হইতে ভোর
হয়ত ভাই সে মরিবে হয়;
মোরে, পাঠাল মা এই বলে “স্বরা আয়,
নাহলে দেখিতে পারি নে তা'য়;”
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।

আহা শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সক্রুণ,
“বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ি আয়।”

বাবা, মোর সাথে বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই তিন বাজে শুনতে পাই;
মোরা একা ঘরে কাঁদি, আমি আর মায়,
আর ঘরে কেউ মোদের নাই;
মোরা, বড় একা—ঘাবা বেণী আর নাই,
ভাই সে তাজেছে জীবন তার;
এই কথাটি বলে সে তাজিল জীবন
“বাবা কই, দেখা হ'ল না আর”
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সক্রুণ,
“বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ি আয়।”

IT WAS A DREAM

ভাঙিল স্বপন, ভাঙিল স্বপন।
শুনিন্দু নদীর স্বর তালকুঞ্জবনে,
শুনিন্দু ঝাউর ধ্বনি সান্ধ্য সমীরণে;
আবার দেখিন্দু যেন সেই প্রিয় স্থান
আবার দেখিন্দু যেন প্রেয়সীবয়ান;
আবার নদীর তীরে ভ্রমিন্দু দুজন,
ভাঙিল স্বপন—ভাঙিল স্বপন।
দেখিন্দু চলেছে নদী ধুসর সাগরে,
দেখিন্দু নম্রিত ঝাউ মাথার উপরে;
আবার শুনিন্দু পাখী, পাতার মর্মর;
আবার শুনিন্দু যেন প্রেয়সীর স্বর;
আবার চাঁদনি রাতে করিন্দু চুম্বন,
ভাঙিল স্বপন—ভাঙিল স্বপন।

COME LASSES AND LADS

আয়, ছেলে মেয়ে, বাপে বলে' কয়ে
সব হোঁচল খেলিবি ত আয়;
যত মেয়ে যাবি সব সাথে পারি,—
ঐ সন্মাই দাঁড়িয়ে রয়;

হেম নাচিবি রাণীর সনে,
 শ্যাম নাচিবি প্যারির সাথ;
 তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
 ধিনিতা নাচি, ধরার্থির হাত;
 তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা
 ধিনিতা নাচি, ধরার্থির হাত
 “হ’ল না.” বলে রাম্, “ঠিক্” বলিল শ্যাম.
 “ও সানাই বাজনা ভুল,”
 “ঠিক্” বলে হরি, “ঠিক্” বলে প্যারি,
 “ঠিক্” বলিল মেয়ের কুল;
 তখন সানাইরা সন্মধুর, ফের বাজাইল সে সুর;
 অমনি ধিন্তা ধিন্তা ধিন্তা
 ধিন্তা নাচে সবে ঘুর ঘুর:
 অমনি ধিনতা ধিনতা ধিনতা
 ধিনতা নাচে সবে ঘুর ঘুর।
 হ’লে প্রহর প্রায়, সবে বাগানে যায়,
 সুর করিল খেতে মেঠাই,
 আরও চুমো খেতে, কে হারে জেতে.
 বাজি ফেলিল মেয়েরা তাই:
 তখন মেয়েরা খানিক পরে,
 অমনি ঝগড়াটি সুর করে.
 বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
 আর তোমাদের নেও ফিরে;
 বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও
 আর তোমাদের নেও ফিরে।
 “যাই” বলে হরি, “যাই” বলে প্যারি,
 “যাই” বলে গোপালকে রাই:
 “যাই” বলিল রাম ডেকে তাহার শ্যাম,
 সবে বলে “আজ তবে যাই”:
 কেউ ধীরে যায় কেউ বা ছোটে
 কেউ যায়, বা করিয়া দেব,
 সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে
 মিলিতে হোলিতে ফের;
 সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে
 মিলিতে হোলিতে ফের।

O WILLIE WE HAVE MISSED YOU

ও .শ্যাম এ কি তুই শ্যাম
 এলি বাড়ি কি রে?
 তাপ্লা বলেছিল মিছে,
 যে তুই আসবি নে ক ফিরে।—

দোরে শুনিন্দু তোর ধনি,
 হইন্দু আনন্দে বিভোর;
 কারণ চিনি খুব তোর পায়ের শব্দ,
 গলার স্বরে তোর;
 এল গানের মত তাহা
 বিজন আঁধার ভিতর:—
 মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
 আয় রে শ্যাম ঘর।
 আছি, নিশি নিশি চেয়ে:
 বিশেষ, আজিকার রাত:—
 আগুন জ্বল্ছিল খুব ঘরে,
 জ্বালা ছিল ঘরের বাতি:
 ছিল, কাঁচাকুচিরা জেগে:
 পরে, দশটা গেলে বেজে,—
 চোখে এল ঘুম, তাই ঘুমিয়ে গ্যাছে
 ছিল যেখানে যে,
 ভেবে আসবি না ক আর:
 (—ব্যগ্র শুনতে রে তোর স্বর:
 মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
 আয় রে শ্যাম ঘর।

যেত দুখে দিবানিশি
 বড় বিহনেতে তোর;
 স্বপ্ন, দেখতুম শূন্য তোরে:
 —আয় ঘরে শ্যাম রে মোর।—
 কাল ছিন্দু রাতে বসি
 দুখে চাঁদের কিরণ তলে;
 যেন তোর পায়ের রব শূনে গেন্দু
 মূছে অশ্রুজলে;
 পরে এলি না ক দেখে—
 এনু হতাশ অন্তর।—
 মোরা দেখি নি কত দিন তোরে,
 আয় রে শ্যাম ঘর।

RULE BRITANIA

যখন নীতি নধিহৃদয়ে,
 উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে,
 অমনি বিধান হইল প্রচার
 হ’ল দৈববাণী দূর শূন্য দেশে—
 “শাস রে বৃটন তরুণরাশি,
 হবে না দাস বৃটনবাসী।”

“অন্য জাতি নহে সম ভাগ্যবান্,
নিয়তির ক্রমে হবে পরাজয়;
যবে তুমিই রবে স্বাধীন, মহান:—
জগতের হিংসা, জগতের ভয়।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

অতিক্রমি প্রতি বিদেশী আঘাতে
হবে তুমি আরো দীপ্ত, ভয়ঙ্কর;
যথা ঘোর ঝঞ্ঝা ছিঁড়িলেও ব্যোমে
তব উক্ষতরু করে দৃঢ়তর:—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

শাসিবে না কভু তোমারে বিজেতা,
প্রতি সে উদ্যম জাগাবে তোমার
মহত্ত্বের বহি:—হবে মাত্র মূল
তাদের নাশের তব মহিমার।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

তোমার রাজত্ব প্রতি গ্রামে, দীপ্ত
হবে প্রতি পুর বাণিজ্য প্রভাষ;
হইবে তোমার পদানত সিন্ধু
প্রতি কূল তার সেবিবে তোমায:—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

কবিতায় চির-স্বাধীনতাসখী
রহিবে তোমার উপকূলে আসি:
সুখী দ্বীপ! তুমি ধর স্বর্গশোভা,
ও যোগ্য মনুষ্যে রক্ষি শোভারশি:
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।”

UNDER THE GREEN WOOD TREE

পল্লবিত শ্যামতরুছায়
মোর সাথ শনুইতে যে চায়,
গেতে গান হরষ অন্তরে
মিলাইয়ে বিহগের স্বরে,
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।

দেখিবি এ ঠাই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রথর বায়।
কে ত্যজিয়ে উচ্চ অভিলাষ
রবিকরে করিবি রে বাস,
আহরিবি, খুঁজি বনে বনে,
যা পাইবি রবি তুষ্ট মনে:—
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রথর বায়।

BLOW BLOW THOU WINTER WIND

বহ বহ বাতাস আগুন
নহ তুমি এত নিদারুণ
যেমতি নরের কৃতঘাতা।
হোক তোর নিশ্বাস কঠোর,
দাঁতে নাই এত বিষ তোর,
কারণ অদৃশ্য তুই তথা।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,
কা'বে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মূখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।
তবে কা'রে নাহি কর ভয়
বেশ এ জীবনটি সুখময়।

দহ দহ নিষ্ঠুর তপন,
নহ এত অসহ্য দংশন
যেমতি কৃতের অস্মরণ।
বটে, তুমি জ্বালাও সংসার,
ও হুলেতে নাহি এত ধার,
বন্ধুত্বের বিস্মৃতি যেমন।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে,
কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মূখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।

WEEP NO MORE, LADIES

কে'দ না রমণীকুল কে'দ না রে আর,
চির শঠ পুরুষ পৃথদীর।
একটি পা জলে, স্থলে অন্যটি পা তার
একে কভু রহে না ক স্থির।

তবে কে'দ না ক আর,
যাক্ যথা ইচ্ছা যার,
রহ হরষে রূপসি নিজ মনে;
কোরে দেও সব তব বিষাদের তান
'তুম্ তারে না তারে না তুম্ দনে।'

গেও না বিষাদ গান—গেও না মলিন,
দীর্ঘশ্বাস, ফেলি; সাশ্রুজল;—
পদ্রুশের প্রতারণা হেন চিরদিন,
যবে হতে বসন্ত শ্যামল;
“তবে কে'দ না ক আর” ইত্যাদি—

TAKE AWAY THOSE LIPS

যাও, নিয়ে যাও ও অধরম্বয়,
কাঁহল যা এত মধুর ছলিয়া,
আর আঁখি দুটি—দিনের উদয়—
ভ্রম হয় যাহা উষার বলিয়া।
ফিরে দেও মোর প্রণয় চুম্বন,
দিনে যায় কিন্তু বৃথা সে এখন।
লুকাও লুকাও উদাসীন ভাষা,
রাখে যা যতনে ও চারু হৃদয়,
উপরে সুন্দর পূর্ণ ভালবাসা,
ভিতরে অস্থির প্রতারণাময়।
কিন্তু আগে দেও ছাড়ি মম প্রাণ,
বেঁধেছ যা' বাঁধে—তুষার সমান।

HARK HARK, THE LARK

শোন্ শোন্ গায় আকাশে পাঁপিয়া;—
জাগিয়া অরুণ ধীরে
অশ্বগর্ভালি তার আসিতেছে নিয়া
কুসুম নীহার নীরে।
চম্পক মুকুল সোনার নয়ন
খুলে এখনও অস্ফুট,
জাগে চারি দিকে যা কিছু মোহন
দেবি, মে সুন্দরি—উঠ।

SOME FOLKS

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে, কেউ কেউ করে,

কেউ কেউ মর্তে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই—
বেঁচে থাক সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ হাসতে পায় ভয়,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়;
কেউ কাঠ্ হাসিময়,
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদসাহ.—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ পায় পাকা চুল,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়;
হয়ে শোকাকুল,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত,
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ চটেই রয়
কেউ কেউ রয়, কেউ কেউ রয়;
তারা শিগ্গীর গোল্লাই যায়,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন বাত;
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ খেটে খুন,
কেউ কেউ হয়, কেউ কেউ হয়
দিনে নিজের মুখে আগুন.—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ.—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

ETHEL DENE MAY

আমি কুড়ায়েছি কুসুম কাননে
তুলি, বসন্তের কিশোর মুকুল
গেছি উপত্যকা গিরি পর্যটনে
যথা, ডড়ে রম্য বিহঙ্গমকুল;
আমি, ভ্রমিয়াছি কত মহাপুরী
কত, সজ্জিত বিলাসী নিকেতনে:—
নাহি, পাখী, কি মুকুল, কি মাধুরী,—
হয় তুল মোর সরলার সনে।
কোমল নিশার তারাসম,
বিভাময়ী সম সে দিবার;
মোর—জীবনেরই সুখ, মোর প্রাণের গরিমা,
কিশোরী—সে সরলা আমার।
আমি,—খুঁজিয়াছি মুকুতা সাগরে,
যাহা—বিরল সে গহ্বর মাঝার,
আমি—অন্বেষণে খনি মণি তরে,—
যোগ্য নৃপতির দেহে জ্বলিবার:
তবু—খুঁজি যদি বিশ্ব সমুদয়,
উষা হতে নিশাবিধি, একমনে
নাহি—মুকুতা কি মণি প্রভাময়,
হয় তুল মোর সরলার সনে।

কোমল নিশার তারা সম;
বিভাময়ী—সম সে দিবার:
মোর—জীবনেরই সুখ, মোর—প্রাণের গরিমা,
কিশোরী সে সরলা আমার।

III

IRISH SONGS

LAST ROSE OF SUMMER

নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ
একা আছে ফুটে,
সুকুমার তার সাথীরা সব
শুকিয়ে ধুলায় লুঠে;
আপনার কেউ কুসুম কলি
কাছে নাইক তথায়,
হোতে সুখে সমসুখী—
সমদুখী ব্যথায়।

যাব না ক ছেড়ে তোরে
একাকী রে গাছে;
ঘুমো গে' যা, ঘুমিয়ে যেথা
শোভারশি আছে।
দয়া করে পাতাগুলি
ছড়িয়ে দি তোর তবে,
শুখে যেথা তোর বিবাস, মৃত
বনের সাথী সবে।

আমিও যাই এমনি যেন
প্রণয় গেলে মবে',
প্রেমের উজল মুকুট হ'তে
মাণিক গেলে ঝরে:—
গেলে শুকিয়ে প্রেমিক হৃদয়,
প্রিয়জনরা চলে',
কে চায় থাকতে একা হায় এ
নীরস ধরাতলে।

WHEN HE WHO ADORES THEE

তোমার ভক্ত অনুরাগী
চলে যাবে যখন শুধু—
অখ্যাতি ও দুঃখের স্মৃতি রাখি'
যখন তা'রা দুঃখে জীবন
অর্পিত যা তোমার পদে
ঝর্বে কি গো তোমার দুটি আঁখি—
কে'দো; যতই দুঃখক শত্রু,
তোমার চোখের জলে প্রিয়ে
ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—
জানেন যিনি অন্তর্যামী
তাদের কাছে দোষী হোলেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

তোমার সাথে জড়ান মোর
ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন
জ্ঞানে প্রতি চিন্তা তব সনে;
অন্তিমের ভিক্ষায় আমার
জগতের পিতার পদে
তোমার কথা জাগবে গো মনে:
সুখী সে সব সখা প্রেমী তোমার
গৌরব সুখের সময়
দেখতে যারা রইবে পরে জীয়ে:

তার পরই প্রিয়বর এই বিধির প্রসাদে হেন
তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

GO WHERE GLORY WAITS THEE

যাও যেথা যশ আছে,
কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো;

যখন অতি অধীর প্রাণে
শুনবে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো:
পাবে অন্য আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে:
সব সুখ ও জীবনে
পাইবে মধুরতর:—
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখন সুখ মধুসম,
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন দেখবে, মধুর সাঁঝে,
সে তারটি আকাশ মাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো:
আসতে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখতেম সে তারটির:—
আমায় একবার মনে কোরো।

নিদাঘ শেষে তরুণীরে
দেখবে যখন গোলাপটিরে,
ঘুমিয়ে পড়িছে ধীরে
ঢলে অতি মনোহর:
তাহে, যে গাঁথিত হার,
ভাল বাসতে তরে যার,
তারে একবার মনে কোরো।

যখন দেখবে চারি ধারে
শীতের পাতা গ্যাছে ঝরে,
আমায় একবার মনে কোরো:
দেখবে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন শুনবে প্রেম গানে,
ঢালিবে সে মধু কাণে,
হয়ত ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখিপব:
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে:
আমায় একবার মনে কোরো।

KATHLEEN O' MORE

আমার প্রিয়ায় আজো ভাবি যেন
দেখি পুনরায়:
কিন্তু দুখী আমায় ফেলে চলে
গিয়াছে সে হাষ:—
বালা আমারি সে বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

ছিল কালো তাহার আঁখি, কালো
উজল কেশরাশি;
তাব বর্ণ সদাই নূতন, নূতন
সদাই তাহার হাসি,
এত রূপসী সে বিভা,
মোর প্রিয়তমা বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সে দুইত ধলা গাইটা, সে গাই
রইত তখন স্থির:
ছিল দুট সবার কাছে, কিন্তু
তাহার কাছে ধীর:
এত ভাল ছিল বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় প্রিয়া ছিল
দোরের ধারে বসি',
শুনতে বায়ুর মৃদু স্বরে, দেখতে
সায়াহের শশী:—
এমনি চিন্তাশীলা বিভা,
মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

বইল কুঞ্জের চারি ধারে, শীতের
 রাতের কঠোর বায়;
 প্রিয়া সে বায়ুর হিমেতে ক্রমে
 শূন্যকায় হইল;—
 তাই হারান মোর বিভায়,
 বালা আমারি সে বিভা—
 রে বিভাবতী মোর।—
 সব পাখীর চেয়ে ভাল বাসি
 ঘৃণ্য পাখীটিরে,
 যে বাসা বেঁধে আছে ওই
 নদীটির তীরে:
 যেন বিভায় ভাবি দুখে
 থাকে নদীর পানে চেয়ে—
 সে বিভাবতী মোর।

ERIN OH ERIN

যথা, স্নানের চিতা ধরণীর বৃকে
 জ্বলে যুগ যুগ বাহি কি ঝড় তিমির,
 তথা বীরের হৃদয় স্নানভীর দুখে
 রহে অক্ষুণ্ণ, অনম্য, অস্তিমিত, স্থির।
 জ্বলে এরিন্ ও এরিন্ আজো প্রাণ তোর
 উজলি অশ্রুর এ তিমির ঘোর।

আজ কত জাতি মৃত, তোর এ যৌবন,
 কত সূর্য অস্তিমিত তোর ত এ ভোর;
 আজ যদিও রে মেঘে ঢেকেছে আনন
 জ্যোতি আবার ঘেরিবে মুখখানি তোর:
 এরিন্ ও এরিন্ দুখী এত দিন,—
 তুই হাসিবি সকলে হ'লেও মলিন।

থাকে দারুণ শিশিরে পত্রে মাত্র ঢাকা
 শূন্য— ঘৃণ্যে অশোকশিশুফুলরাশি—
 যবে, বসন্ত আসিয়া খুলে দেয় পাখা—
 তা'রা জেগে উঠে সব পুনরায় হাসি—
 তোর এরিন্ ও এরিন্ শীত নাহি আর,
 ঘৃণ্য সৌন্দর্য জাগিবে আবার।

BELIEVE ME IF ALL THOSE
 ENDEARING YOUNG CHARM

জেনো যদি তোমার চারু যৌবনের ও রূপরাশি,
 দেখি যাহে প্রেমভরে কত;
 কাল আমার আলিঙ্গনে মিলাইয়া যায় আসি
 তবু তুমি পূজ্য রবে তেমতি, এখন যথা,
 —যাক্ চলে মাধুরী তোমার;
 রবে প্রাণের প্রতি বাহু জড়াইয়া শ্যামলতায়
 সেই প্রিয় ধ্বংসের চারিধার।
 যখনই তোমার প্রিয়ে যৌবন গরিমা রহে,
 অশ্রু দেয় নি দেখা গ'ড'পর.
 তখনই প্রাণের শূন্য ভক্তি ভালবাসা নহে,—
 কালে তাহা হয় প্রিয়তর।
 না, না: যে প্রাণ ভালবাসে বিস্মরণ নাহি জানে,
 অস্তিমিতও সম স্থির রহে:—
 যথা সূর্যমুখী থাকে চেয়ে তার নাথ পানে,
 সম ভাবে কি অস্তে উদয়ে।

QFT IN THE STILLY NIGHT

কভু, যখন নীরব রাত
 যবে, নয়ন মূদে নি নিদে
 স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
 ভূত জীবনকাহিনী হুদে।

বাল্য-অশ্রু ও হাসি
 কত জাগায় আসি,
 কত, প্রিয়কথা মাথা প্রেমে;
 আঁখি কিরণ ভরা
 —আজ মলিন, মরা—
 ফুল্ল হৃদয়, গ্যাছে বা ভেঙ্গে।
 হেন, যখন নীরব রাত,
 যবে, নয়ন মূদে নি নিদে,
 স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
 ভূত জীবনকাহিনী, হুদে।

যবে, সখারা স্মরণে আসে
 ছিল, হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা:—

ঝরে পড়েছে দেখেছি পাশে,
 যেন শিশিরে গাছের পাতা।
 মনে হয় রে হেন,
 একা বেড়াই যেন
 কোন বিজন উৎসব ঘরে;
 মৃত আলোক যার
 শূন্য কুসুমহার
 আছি আমিই একাকী পড়ে।

হেন যখন নীরব রাত,
 যবে নয়নমুদে নি নিদে,
 স্মৃতি দেখায় ধরিয়ে বাতি
 ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে

সমাপ্ত

আষাঢ়ে

কেরাণী

১

খেটে খেটে খেটে—

সারাদিনটা আঁপসেতে কাগজপত্র ঘেঁটে,
লিখে লিখে ব্যথা হলো আঙ্গুলগুলোর গিটে—
যেন, একসা' হয়ে গেল মাজায় ঘাড়ে পীঠে,
পায়ে ধরল বাত,
অসাড় হলো হাত,
খেটে খেটে, লিখে লিখে, সকাল থেকে রাত,
কোথায় সেই ১০১, আর কোথায় সেই ৬টা,
শরীর হলো আগুন—এবং মেজাজ হলো চটা।

২

খেটে খেটে খেটে—

মুখে চারটি অন্ন গুঁজে, চাপকান গায়ে এঁটে,
আঁপসে যাই উদ্ভব'বাসে একটু না থেমে,
ওছট্ এবং ধুলো খেয়ে, দুপুর রোদে, ঘেমে;
হুকো টেনে কোসে',
ভাঙা চ্যারে বোসে',
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম:—
এবং ঠোঁটে লাগলো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মূনিবদন্ত গালি।

৩

খেটে খেটে খেটে—

আসি রোজই মূনিবের শ্রীপদযুগ চেটে:
দীনমূর্ত্তি দেখিলেই মূনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে:
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায়;
ইচ্ছা হয় যে চলে' যাই
—দ্যুৎ!—ছেড়ে এই পাড়ায়,
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ; জীবনে হয় ঘৃণা;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়গুড়ি বিনা।

৪

খেটে খেটে খেটে—

এলাম যদি শ্রান্ত-দেহে দু ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়তে নেই জলবিন্দু; গামছা গেছে হারিয়ে;
ছুতোর আজও চারপায়খানা
দেয়ও নি ক সারিয়ে,
ধূঁত গেছে উড়ে:
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপর্মাট চাঁট বিছানায়
আর একপাট আঁস্তাকুড়ে:
বিশু গেছে বাজারেতে,—ঘুমোর রামা কুড়ে,
বামন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

৫

খেটে খেটে খেটে—

আঁপস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'শেটে'—
কোণেতে জড়ানো দেখি তক্তাপোষের পাটি:
ফরাসের ও সতরণে এক কোমর মাটি:
পুত্ররক্ত গিয়ে
হুকোগাছটি নিয়ে,
ভেঙে সেটি, কালি মেখে, কঙ্ক ফেলে দিয়ে,
ঘূনসি' পোরে তাকিয়াতে কচ্চেন বোসে নৃত্য:
ঘূমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্ব' প্রিয় রামকান্ত ভৃত্য।

৬

খেটে খেটে খেটে—

অগ্নিতুল্য একেবারে হঠাৎ ভীষণ 'রেটে'
পুত্রকে দিলাম চড়, রামাকে দিলাম লাথি:
পুত্র কোল্লেন 'ভ্যা',
ও কোল্ল 'কোঁৎ' রামা হাতি।
বোল্লেন "রামা পাজি!
এখনি যা, সাজি'
নিয়ে আয় রে তামাক,
নইলে প্রলয় হবে আজি;
লক্ষ্মীছাড়া, শূরোর, ষণ্ডা,
ঘূমোচ্ছিস যে গাধা।

আমার ফরাসে যে,—

পায়ের পঁচিশ বস্তা কাদা।”

৭

খেটে খেটে খেটে—

ক্ষুধায় যেন বাড়বাগ্নি জ্বলে যাচ্ছে পেটে,—

বাহিরের সে অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,

এলাম যদি বাড়ীর মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,

খেতে খেতে খাবি,

জলখাবারটি ভাবি’,

—দোখ সব ফাঁককার—

গিন্নীর হারিয়ে গেছে চাবি,

—আসে নাইক সন্দেশ,

দুগ্ধ ফেলে দিয়েছে মেয়ে,

গ্যাছে সকল রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

৮

খেটে খেটে খেটে—

—বলতে আপন দুঃখের কথা

হৃদয় যায় গো ফেটে—

চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন ভেড়ে,

তার সে সুদর্শনচক্র, স্বর্ণনখটি নেড়ে,

“সারাদিনটা খাটি’,

শরীর ক’রে মাটি,

পোড়ার মূখো! কাহিল হোলাম

যেন একটি কাটি;

ছেলে কোলে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে

ফুলে গেল পা-টা;

তবু বলে শূয়ে আছ,—

নিয়ে আয় ত ঝাঁটা।”

৯

খেটে খেটে খেটে—

মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম, বাড়বাগ্নি পেটে,—

এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রপূরী ছাড়ি,

একেবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি;

—হায় রে অধর্ম!

ছেড়ে সকল কর্ম,

যাহার গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় গো ঘর্ম

সেই না ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে ‘পোড়ার মূখো’

—কলিকাল!—যাক্—অরে রামা

নিয়ে আয় ত হুকো।

১০

খেটে খেটে খেটে;—

পারিবারিক ব্যাপার ফেলে হৃদয় থেকে ছেঁটে,

ভৃত্য রামকান্ত কর্তৃক তামাক হ’লে সাজা’,

দিলাম দু তিন টান ও তখন

ভাবলাম ‘আমি রাজা’।

দিয়ে হুড়ো তাড়া

প্রদীপ কল্লম্ খাড়া

ডেস্কেকার উপর, এবং পরে ফরাস হ’লে ঝাড়া,

বসলেম্ গিয়ে তদুপরি পেতে একটি পাটি;

তবলা নিয়ে ধাঁই ক’রে দিলাম দু তিন চাঁটী।

১১

খেটে খেটে খেটে;—

এলে কটি এয়ার বক্সি দু চার পাড়া ঝেঁটে,

চাল্লিশ বাজি তাস এবং চৌদ্দ বাজি পাশা,

খেলে, উঠে হ’ল খেতে বাড়ীর মধ্যে আসা।

রাধুনীর কি গুণ—

ডালে বেজায় নুন;

মুখও গেল পুড়ে—পানে বিষম রকম চুণ,—

রাধুনীকে বোকে এবং গিন্নীর উপর রেগে,

দিলাম পাড়ি শয়নের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে বেগে।

১২

খেটে খেটে খেটে—

এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,

অন্নপূর্ণার বিমূর্ষিত ইন্দীবর আঁখি,

বুঝলাম খাসা তখনই যে গিন্নীর সবই ফাঁকি;

গোঁফে দিয়ে চাড়া,

নখে দিলাম নাড়া;

গিন্নী উঠলেন ‘ফোর্স’ ক’রে, সপের মত খাড়া;

—বেধে গেল যুদ্ধ; হ’ল বরিশণ প্রীতি-

পূর্ণ বহু ভাষা; পড়ল ঘূমের দফায় ইতি।

১০

থেটে থেটে থেটে—

বল্লেন তিনি “কড়া পড়ল হাতে বাটনা বেটে—
গায়ে হ'ল বাত, আর মাথার চুলও গেল উঠে,
মেয়ে কোলে ক'রে ক'রে;—

আমি কি তোর মূটে?

—হায় গো কোন্ পাপে

হতচ্ছাড়া কাপে

কুলীনের মেয়েকে নিয়ে বিয়ে দিল বাপে?

তার উপরে চোপা!

আবার আমার উপর চটা!

নিয়ে আয় না আনতে পারিস

আমার মত ক'টা?

১৪

“থেটে থেটে থেটে

হ'লাম কি, দ্যাখ্ রে নির্লজ্জ

পাষণ্ড, বোম্বটে।”

—দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত এবং সটাং;

তদুপরি আমার মেজাজ ছিল সে দিন চটাং;

আর ও অভ্যাস দবেলা

বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,—

সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা;

বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটী

সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটী।

১৫

থেটে থেটে থেটে

হয় ত গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু; নয়ত ফেটে

কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী;

তাহা সঠিক জ্ঞানি না ক; কিন্তু জ্ঞানি, অমনি

গিন্নী সেই চড়ে,

সটাং গেলেন পড়ে'

মুছ'রায়; যেন তালবৃক্ষ আশ্বিনেরই ঝড়ে;

আর যখন জ্ঞান হ'ল, এমন বদলে গেল খাঁটি

তাহার সেই মেজাজ—যে সে অতি পরিপাটী।

৩৪

১৬

থেটে থেটে থেটে—

অস্থি হ'ল মাটি; এবং গৃহ হ'ল মেটে;
শয্যা হ'ল তক্তাপোষ; আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে;

বেছে বড় বরে

ভাল কুলীনঘরে

দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট ক'রে,

স্ত্রী, হোলেন গতাসু, কি করি?

শোকতপ্ত অমনি—

আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।

১৭

থেটে থেটে থেটে—

হয়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল এবং বেটে;—

প'ড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা;

কাণে যায় না শোনা;

ভাল চোখে যায় না দেখা;

চল্লিশ বছর থেকেই

চুলও গেল পেকে;

মাংসও গেল বদলে; সঠাম শরীর গেল বেঁকে;

দাঁতও হ'ল জীর্ণ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে;

চিবুক গেল উঠে;—এবং নাক গেল নেমে।

১৮

থেটে থেটে থেটে—

দিবস গেল মাসও গেল বর্ষ গেল কেটে—

স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায়ই হা বাঙালী বাবু!

থেটে থেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু;—

ক্রমে এবং ক্রমে,

রক্ত গেল জমে',

শীর্ণ হ'ল দেহ; দেহের জোরও গেল কমে'

মাথাটা বসে না যেন ভাল আর এ ঘাড়ে;

মাংসে ধরল ছাতা;—শেষে ঘৃণও ধরল হাড়ে।

১৯

থেটে থেটে থেটে—

যে কয়টা দিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে;

বিধাতার সেই আদালতে পরকালে গিয়ে
উত্তর দেবার আছে—

“দিইছি তিনটি মেয়ের বিয়ে;

তাহাই আমার ধর্ম;

তাহাই আমার কর্ম;

মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে বোঁবিয়ে গেছে ধর্ম;
আর নিজে দুই বিয়ে কোবে

ফুরিয়ে গেল ‘প্রময়’:

অন্য কিছু করিবারে পাই নি ক সময়।”

শ্রীহরি গোম্বামী

[চুড়ামণির অভিশাপ]

১

একদা শ্রীহরি, প্যান্টটা কোটটা পরি’
খাচ্ছিলেন ত চৌবেলেতে কাট্লেট্ রোষ্ট্ করি;
চতুর্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্মখনি;
ছিলেন সঙ্গ অন্য আরো মান্য গণ্য,
বিশেষ লক্ষ্য (টিকীর দৈর্ঘ্য) মহেশ চুড়ামণি।

২

মহাত্মাদের কর্ণিট পদতলে চটি,
কর্ণিদেলে ধূতি গরদ কিম্বা সূতি,
একটি একটি নামাবলী সবারই বিরাজে;
(আহা—কৃষ্ণনামাবলী বিনা
ভক্তরে কি সাজে?)
কপালেতে ফোঁটা সরু কিম্বা মোটা,
গায়ে সোজা বাঁকা হরির নামটি আঁকা;
একটি একটি টিকী ঝুলে প্রতি স্কন্ধোপরি;
(—টিকী মান্য—টিকী গণ্য—টিকিতেই হরি!)

৩

এই অতি গম্ভীর সভা; সবাই ধ্যানে মগ্ন;
ছুরি এবং ফর্ক,— ধারাল সব তর্ক,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন বসে ভগ্ন;

সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য রুদ্ধ,
ঠনুদক ঠিনিক টঙাস ভিন্ন নাই ক কোনই শব্দ;
কেবল টিকী নেড়ে—“মধুর—বাহা—বেড়ে”—
একবার বল্লেন চুড়ামণি—পুনঃ সবাই স্তম্ভ;
—হ’ল একটু ভুল —ভাবী তর্কের মূল,
সে “মধুর”টা হরির নাম কি পক্ষী মাংসের ঝোল,
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিং রয়ে গেল গোল।

৪

যা হোক— ডিনার সাবাড় করি সুরাপানে রত,
(নাটক অন্তে অভিনয়ে প্রহসনের মত)
গদ্যফহীন ও শ্মশ্রুহীন সেই মহামতি যত;
তখন—চুড়ামণি— বিধর্মীদের শনি—
উঠলেন হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যায়; উখিত অমনি
করতালি, “সাবাস” “সাবাস” ধরনি গৃহ হতে,
—গলাস হাতে লয়ে ভাবে বিভোর হ’য়ে
উঠলেন তিনি হিন্দুধর্ম ঘোষিতে জগতে:—

৫

“আমি জানি বেশ—কিছু যাহা পেশ
আপনাদের কাছে,—যে বৈকুণ্ঠে হৃষীকেশ,
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, এবং কৈলাসে মহেশ,
এ তিন ভায়ার মধ্যে—
(বটে জানি না কে জ্যেষ্ঠ),
এ তিন ভায়ার মধ্যে ভায়া হৃষীকেশই শ্রেষ্ঠ।
স্বাপরযুগে কংস এবং ত্রেতাযুগে রাবণ
কল্পেন যিনি নিধন—সে শ্রীহরি পতিতপাবন,
সেই হরিই ধন্য; তিনি ভিন্ন অন্য
নরের নাইক গতি—আহা! হরিনামের তথা
অতি গুঢ়—এ জগতে হরিনামই সত্য।

৬

“হা বাঙালি নব্য; হ’য়ে একটু সভা
বিজ্ঞানের ক খ গ পাড়ি করে কতই গর্ব—
ডুবছে ‘খাবি খাচ্ছে সব’ সভ্যতা হিল্লোলে;
হায় ব্যাসের কর্ম, হায় মনুর মর্ম,
ডুবলো কি এ কলিকালে মর্গীর ঝোলে?”

৭

(এখন—ইহার বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা নাহি জানি,
যদিও শাস্ত্রীয় কথা ভীষণ রকম মানি,
'—যে মরে সে মরে; ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মোরে গেলে প্রাণী;
বরং তাহা নেহাৎ একেবারে বেহাত।

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত

অসাড়, হিম, বেবাক্ তার;

—হাজার আস্দুক কবিবরাজ

আর হাজার আস্দুক ডাক্তার।'

৮

তাই বল্ছি—যে যদিও এর কারণটি না জানি,
—হয় বস্তুর হজমে নি ভাল

কট্লেট কি চপখানি,
কিম্বা কারি স্বাদু; কি সর্ষেব যাদু;

কিম্বা সবই শ্রীহরিরই প্রকাণ্ড সয়তানী;

তাহাতে দিব না মত।

সে যা হোক্ না, নিভীক
হ'য়ে এই কথাটি আমি বল্তে পারি ঠিক্।
যখন "মুরগীর ঝোলে" এই কথাটি বোলে,
উঠলেন বস্তা—তারই ডাকটি বস্তুর পেটে যেন
শুনলেন সবাই—ব্যাস কি মনু

যা বল্ধন না কেন।

৯

সবাই উঠলেন হেসে, বস্তা গেলেন ফেসে,
সবার পানে চেয়ে, হিন্দুয়ানী রকম কেশে,
বল্লেন একটু অপ্রতিভ সে চুড়ামণি শেষে:—
"না,—না: একি—একি অতি অসম্ভব কথা।
তোমরা কি উল্টাতে চাও মরণেরও প্রথা?
চিরকালটা জান— শাস্ত্র নাহি মান?
খেলে কি উদরের মধ্যে করে জন্ম শব্দ?
বিশেষ—টিকীর প্রভাবে সব হজম এবং স্তম্ভ।

১০

"যতক্ষণটা আছে
নামাবলী বৃকে,

ফোঁটা নাকের কাছে,
হরিনামটি মূখে,

—আর আর এই হজমি গুলি—

তাই ত এ্যাঁ সে কি?"

মাথায় হস্ত দিয়ে বস্তা দেখেন নাইক টিকী—

১১

সকলেই ব্রহ্মত, সবাই দারুণ ব্যস্ত—
দেওয়ালে, পাখাতে, মেঝে দেখে দিয়ে হস্ত;
খোঁজে পাতি পাতি ক'রে চুড়ামণির চুড়ো—
নইলে চুড়ামণি উঠিয়ে এক্ষণি
অভিশাপে বিশ্বজগৎ ক'রে দিবেন গুড়ো:
ঠেকাতে পারবে না কারো হারাধনখুড়ো।

১২

সবাই টেবিল নাড়ে নামাবলী ঝাড়ে,
সবাই দেখে হস্ত দিয়ে আপন আপন ঘাড়ে;
কেউ বা ঝাড়ে কোঁচা; কেউ বা মারে খোঁচা
টেবিলেরই নীচে; কেউ বা ম্যাটিন খিঁচে;
চেয়ারগুলো দিল উল্টে—সবই হ'ল মিছে;
সবাই বল্লে শেষে,—পাওয়া যাবে না সে চুড়ো,
যদি সবাই খুঁজে খুঁজে হ'য়ে যায় বৃড়ো।

১৩

—মণিহারা ফণী —তখন চুড়ামণি—
চুড়ো গেছে উড়ে—হায় গো যেন দৃষ্ট শনি,
দৃষ্টে গণপতির মূণ্ড অদৃশ্য অর্মানি;
অগস্ত্যকে দেখে বিশ্বাচল থেকে
গত নত হত শৃংগ হায় রে যেমনি;—
তখন উঠে চুড়ামণি বিশ্বামিত্র সম,
দেখালেন স্বকীয় বীর্য, ধর্মপরাক্রম—
বল্লেন "ওরে নিয়ে আর বেদ পুরাণ এবং মনু,
যে নিয়েছে টিকী তারে ক'রে দিব হনু,—
চারি দিকে দেখে, উপস্থিতে ডেকে,
শাপ দিলেন টিকী চোরে মনু পুরাণ থেকে।

১৪

"যে নিয়েছে টিকী আমি শাপ দিলাম তাকে,
হবেই সে বিপদগ্রস্ত যেখানে সে থাকে;

তার পায়ে হয়ে বাত;—সে উঠতে হবে কাৎ;
খেতে খেতে গলায় লেগে বেধে যাবে ভাত:
—খিল্ লাগবে হাস্তে:

বিষম লাগবে কাশতে:
—দিনে দুপদরেতে. ওছট খাবে যেতে:
শনুতে লাগবে মশা. আর বসতে লাগবে মাছি;
নেতে খেতে যেতে পড়বে
টিকটিকী আর হাঁচি;

১৫

“সে—পাবে না ভোজ খেতে রম্ভাপত্র পেতে:
পাবে না সে দইয়ের এবং চিঁড়ের এবং ‘কলার’:
সন্দেশ এবং মনোহরার মধুর মিষ্ট ‘ফলার’:
পাবে না সে গজা: পরমাসের মজা:
পাবে না সে মিঠাই মন্ডা, রাব্‌ড়ি খুরী খুরী;
ডাক্বে না তায় নেমন্তন্ন গোবিন্দ চৌধুরী:
হারাবে তার থালা বাটি, হারাবে তার ঘটি:
হারাবে তার ধূতি চাদর, হারাবে তার চটি:
তদুপরি সেই বেটা—কঁচ্ছ এরূপ অনুমান—
মাথা থেকে পা পর্যন্ত হয়ে যাবে হনুমান।”

১৬

তর্কচুড়ামণি উক্ত অভিশাপটি দিয়ে
চোলে গেলেন চোটে, আপন চটি চাদর নিয়ে;
যদিও সেই অভিশাপে ব্যাকরণের ভ্রম,
এবং সাধু বঙ্গভাষার একটু ব্যতিক্রম,—
বোধ হয় কণ্ঠরোধে, বিরক্তিতে, ক্রোধে,—
কিন্তু কেউ—শুনি নি কভু এমন অভিশাপ:
সবাই বললে একস্বরে ‘বাপ্ রে—বাপ্’।

১৭

ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল শ্রীহরির সয়তানী;
শ্রীহরিই যে টিকী-চোর তা সবাই ফেললে জানি;
মস্ত সুরাপানে ছিলেন চুড়ামণি যবে,
সে সময়ে দৃষ্টমতি শ্রীহরি. হবে,
ছোট কাঁচ দিয়ে টিকী কেটে নিয়ে,
দিয়োছিল ছুঁড়ে ফেলে বারান্দায় গিয়ে।

শ্রীহরির প্রস্তাব

১

বর্ষা যায় কেটে: চুড়ামণির পেটে
হজম্ হ'ল ক্যাটলেট্ কারি ক্রমে দ্রুত 'রেটে'
দেখা দিল টিকী আরও লম্বা, আরো ভাল,
আধ্যাত্মিক—ও একেবারে মিশ—মিশে কালো।

২

এদিকে শ্রীহরি প্যান্টটা কোর্টটি পরি',
খেতে লাগলেন ঘরে ব'সে
ক্যাটলেট্ চপ্ ও কারি।
মহাত্মাদের সাজে, হিতকর কাজে,
তর্করত্ন আদি সেথা আসেন মাঝে মাঝে:
“সুরাই অমৃত: আহা—ক্যাটলেট্ সূধা,
নিবারে যা চিরকালটা দেবগণের ক্ষুধা:
শ্রীহরিই ইন্দ্র, এবং গোস্বামিনীই শচী”—
দিলেন গোপাল শাস্ত্রী নতুন শাস্ত্র রচি'।

৩

—শ্রীহরিরও ক্রমে, জানি না কি ভ্রমে,
জানি না যে প্রকৃতির কি অবৈধ নিয়মে,
হ'ল দুইটি পুত্র—(সে ত হয়ও নিজ পাপে)
আর এক কন্যা—সেটি কিন্তু চুড়ামণির শাপে।

৪

“এই বারটী শ্রীহরি ভায়া দেখুক মজাটি কি”—
বল্লেন বিদ্যাবাগীশ “দেখুক
রাখ্বে না ত টিকী;
কাট্বে না ও ফোঁটা—
আরও রাখ্বে গোফ ও দাড়ি:
কর ওরে একঘরে, আর যাব না ওর বাড়ী;
যাব না ও পাড়া, কেবল রাতে ছাড়া
দু' একটি বার মাত্র, চড়ে শ্রীহরিরই গাড়ী।”

৫

সময় যায় ত চলে মহাগণ্ডগোলে;
 শ্রীহরি একঘরে, তাই ক্রোধভরে
 রাতে খান চপ্ রোস্ট ও কারি
 আরো বেশী ক'রে;
 মহাআরাও এসে মাঝে মাঝে, হেসে,
 কারি চপ্ ঠেসে খেয়ে, অবশেষে
 দিয়ে যান বিজ্ঞ বিজ্ঞ ধর্ম-উপদেশে!

৬

শ্রীহরির এক দুঃখ—ছেলে দুটি মূর্খ;
 তার উপরে তা'দের আবার স্বভাবটাও রুদ্ধ:
 একটি চুপে চুপে, কি জানি কি রূপে
 যোগাড় ক'রে টাকা. একেবারে ছাঁকা
 বম্ব যাব বলে বিলেত গেল চলে;
 দ্বিতীয়টি হ'ল ফেল্ তিনটি বার 'এল্-এ':
 এইরূপ দাঁড়াল ত শ্রীহরির দুই ছেলে।

৭

হেমাঙ্গিনীর ক্রমে প্রকৃতিরই ভ্রমে
 বয়সটা বাড়েই—কভু একটু না কমে:
 ক্রমে হেমাঙ্গিনী—হ'য়ে উঠলেন তিনি
 রূপে সান্ধাৎ রতি. বিদ্যায় সরস্বতী,
 —সতীত্বে সাবিত্রী, পাকে দ্রৌপদী সুন্দরী;
 উঠলেন ক্রমে বোধোদয় পাঠসাঙ্গ করি।

৮

শ্রীহরি করেন তাঁর মেয়ের বিবাহসম্বন্ধ.
 কিন্তু পাঠটারের মোটে নাই ক নামগন্ধ;
 দিল না কেউ বরে গোস্বামীজীর ঘরে:—
 “প্রকাশ্যে খায় মূর্গী” বলে দিলও 'গালি মন্দ':
 সকলেই খুঁসি. গোস্বামীজী রুঁষি,
 কল্লেন শেষে পণ্ডিতদিগের খানা দেওয়া বন্ধ।

৯

একদিন মিষ্টার এম্ এন্ সরকার
 হীরালালকে দিয়ে
 পাঠালেন ত বলে, তাঁর সঙ্গে হ'লে
 শ্রীহরি দেন কি তাঁর কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিয়ে?
 মিষ্টার বোসের কি না,
 আসল কথাটা ভিতরকার;
 হয়েছিল হাজার দু'চার নিতান্তই দরকার।
 এখন—মিষ্টার বোস্ নাহি কোনই দোষ,
 ব্যারিষ্টারও—শ্রীহরির ত বড়ই 'সন্তোষ';
 তিনি একটু হেসে, পা দু'লিয়ে কেশে,
 পরে একবার মাথা নেড়ে, বারান্দায় এসে,
 নীচে পানে তাকিয়ে ত দিলেন একটি তুড়ি;
 এমন সময় উপস্থিত হরিদাসী খুড়ী।

১০

“তাই ত এ খুড়ী যে; কারি!”

বাড়ীর সব ভাল ত?
 প্রণাম হই”—“বাপ বেঁচে থাক বছর পঞ্চ শত;
 ধনে পুত্র হ'ও বাবা লক্ষ্মীশ্বরের মত”;
 (—লক্ষ্মীশ্বরের আপাততঃ ছিল ক'য়টি ছেলে;
 এ কথা যদিও বড় পুরাণে না মেলে)
 —নানান্ কথার পরে খুড়ী বলেন “অরে
 দ্যাখ্ ত রে শ্রীহরি সুগণনা করি’,
 আমাদের ঐ হেমাঙ্গিনীর ঠিক্ বয়স কত হলো”
 —“আমাদের ত বহুৎ হ'ল. হেমাঙ্গিনীর ষোল”;
 —“বলিস্ কি রে? তবে ওর বিয়ের কি হবে”!!
 খুড়ী হ'লেন মূর্ছাপ্রায় ত:

“বিয়ে হ'বে কবে?”

“বিয়ের চারি দিক্ সকলই ত ঠিক্
 পাঠেরই ত গোল।—

তা খুড়ী যদি বিয়েই দরকার.
 মিলেছে এক ভাল পাঠ

মিষ্টার এম্ এন্ সরকার।”

“সে কে?” “জ্ঞান সরকারের ছেলে”:

খুড়ী ত অবাক্—

“সে কি রে?” শ্রীহরি বলেন

“সমস্ত ঠিক্ ঠাক্।”

১১

এবার কিন্তু সত্য সত্যই মূর্ছা গেলেন খুড়ী;
শেষে জ্ঞানটি হ'ল যখন—তখন তিনি বুড়ী;
বয়সও তাঁর বেড়ে গেল হঠাৎ দুই কুড়ি;
কেশগুচ্ছ গেল পেকে, পো'ড়ে গেল দাঁত,
নাকও গেল ঝুলে—আর—

আর এ সব অকস্মাৎ!!!

শ্রীহরি ত নেই!—বলেন “এই এই—
তাই ত—এও কি হয়—এ কি হ'ল—
কি উৎপাত।”

১২

সে দিনটা ত গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর ‘গতর’ যেন একটু জোরও পেল;
বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বজ্রেন শেষে খুড়ী,
(—ধর্ত্তে গলে তিনি এখন
ষাট্ বৎসরের বুড়ী—)

১৩

“শ্রীহরি রে পাগলামী রাখ্,—এখন দিয়ে মন
আমার পরামর্শটা—আর আমার কথা শোন্;
হেমাঙ্গিনীর হ'ল এখন বছর ষোল,
বলিস্ নে ক সেটা,—বলিস্ বছর অষ্ট নয়;
দেখি দেখি বিয়েটা ওর হয় কি না হয়;
আমিই দিব পাত্র” বলে এই মাত্র
উঠলেন, আবার বসলেন—

খুড়ী একবার ঝেড়ে গাত্র;
“শান্তিপদরের কাছে একটি পাত্র আছে—
কুলীন, আর সে আমার ভাইয়ের

ইস্কুলেরই ছাত্র;
কর্ষ তারে রাজী বাছা—মুর্গী খাস্ তুই বটে,
তা খা', কেবল দেখিস্ সেটা অত্যন্ত না রটে;
আর একটি কাজ—শোন্ না বলি”

দু চার মিনিট ধরে
তৎপরে কি কইলেন খুড়ী
ফুস্‌ফুস্‌ করে।

বজ্রেন তাহার পরে একটু উচ্চৈঃস্বরে,
“এই রকম কর্, বাছা

কুলে আনিস্ না ক কালি—
ঘোষ বোস্ মিস্ত্রির সরকার কলেকের ডালি,
আর সকল ভার আমার উপর”—

উঠলেন শেষে খুড়ী,
শ্রীহরি সজোরে আবার দিলেন একটা তুড়ি।

তৃতীয় প্রস্তাব

১

পরের দিবস থেকে, প্যান্ট কোট রেখে,
শ্রীহরি গেরুয়া নিলেন; পান্ডিতদিগের ডেকে,
একশ একশ টাকা এবং রূপোর গেলাস থালা
দিলেন প্রতি জনে, এবং সেই ক্ষণে
মুড়ালেন ত মাথা; মাথায় ঘোলও হ'ল ঢালা;
খেলেন গোময়; নিলেন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা;
পান্ডিতদের সব নিয়ে, মেয়ের দিলেন বিয়ে,
প্যারী মৈত্রের ছেলের সঙ্গে;—সে একটুকু কালা,
এক চক্ষুহীন, ও মুর্খ, বে'টে এবং কালো,
গরীব এবং মাতাল;—নইলে অন্য-সবই ভালো।

২

এখনও শ্রীহরি, হরিনামটি স্মরি,
(প্রকাশ্যেতে) না খান রোস্ট্
ক্যাটলেট কিম্বা কারি;
যদি কেউ তা খায় তা তিনি বলেন

“উঃ হঃ ছিঃ ছিঃ”
তার অর্ধটা প্রাণীহত্যা কেন মিছামিছ—
জপেন হরির মালা: এবং পড়েন ভাগবৎ;
সবাই বলে “গোস্বামিজী অতি ঋষি, সৎ”
ব্যারিস্টার তাঁর ছেলে, বিলেত থেকে এলে,
মুর্গীখোর বলে, তা'রে দিলেন জাতে ঠেলে।

৩

এখন শ্রীহরি, গেরুয়াটি পরি',
যাচ্ছেন দেখবে রাস্তায় কড়ু হরিনামটি করি':
হাতে মালা: কপালটি তাঁর চন্দনেতে মাথা;
কামানো গোঁফ দাড়ি, গায়ে হরিনামটি আঁকা

মন্দিরত মস্তকে টিকী, গায়ে নাই ক কুর্ভা;
 অতি ভক্ত গোস্বামিজী—সুপ্রসন্ন মূর্তি।
 কিন্তু দৃষ্টে দোষে, (সেটি কিন্তু রোষে,)
 বলে তাঁরা “দেখায় তাঁরে একেবারে হনু,
 কেশশূন্য মাথা, অর্ধবস্ত্রশূন্য তনু;
 ফল্লো নাকি চুড়ামণির সেই অভিশাপ।”
 বল্লো সবাই একস্বরে—“ওহো বাপ্ রে বাপ্,
 চুড়ামণির—কি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ’!!!
 শ্রীহরি গোস্বামিজীর কথা অমৃত সমান,
 হরিদাসজী ভগে, এবং শূনে পূণ্যবান্।
 —পরে জানা গেল, যে শ্রীহরি নামে কেহ
 কভু ছিলেন কি না, তা’তে প্রকাণ্ড সন্দেহ।
 থাকিলেও তিনি দিয়েছিলেন কোন খানা—
 পণ্ডিতদিগের কি না, এরূপ যায় নি ক জানা।

বাঙালী-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে,—“বাঙালী ভীরু,
 বাঙালীর নাহি একতা—”
 কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী,
 খবর কাগজে লেখ তা?
 অদ্য পদ্যে আমি বাঙালী বীরত্ব
 করিব জগতে ঘোষণা;
 বেরোবে ছাপায়; পড়িতে পাবে তা;
 ব্যস্ত হও কেন? রোস না।
 তবে তালুদেশে চড়াং করিয়া
 নেমে এস মাতা ভারতি!
 অজ্ঞানের সাধ্য হ’ত যুদ্ধ করা
 কৃষ্ণ না থাকিলে সার্থি?
 সাহায্য তুমি না কর যদি আমি
 সমর্থ তাহাতে নহি মা;—
 দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার,
 গাইব বাঙালী-মহিমা।
 খোল ইতিহাস:—সতর তুরস্ক
 প্রবেশিল যবে গোড়িতে,
 লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট
 কচুবনে এক দৌড়েতে।
 সে অপদূর্ব্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক
 দীর্ঘপলায়নকাহিনী
 যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও
 ভাল করে কেহ গাহি নি!

পরে আফগান, মোগল, পাঠান
 দলে দলে দেশ জর্দিয়া
 কার্ল রাজত্ব; তাহাও বীরত্বে
 সহিল বাঙালী উর্দিয়া।
 আসিল ইংরাজ; বাঙালী (লেখে ত
 সব ইতিহাস-বহিতে)
 দিল দীর্ঘ লক্ষ্য ইংরাজের কোলে
 পাঠানের ক্রোড় হইতে।
 করেছে সংগ্রাম মহারাট্টা শিখ,
 মূর্খ যত সব মেড়িয়া;
 তুমি সুক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মত
 (যদিও পর নি গেরিয়া)
 নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
 বৃদ্ধে নিলে সব পলকে;—
 “ভবিতব্য লিপ কে খন্ডাতে পারে?
 কাটাকাটি ক’রে ফল কি?”
 হবে না বা কেন? খায় ছাতু রুটি—
 পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে;
 তোমরা বসিয়া কাঁচকলা, ভাত
 খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
 তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
 কার্য করাটাই শ্রেয়সী;
 তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
 জীবনের সার প্রেয়সী;
 তাহাদের চিত্র অজ্ঞান রাবণ
 ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে;
 তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
 প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে;
 তারা গায় সবে “জয় সীতারাম”
 আজও শূনি যেথা যাই গো;
 তোমাদের গান “জয় শ্রীরামকে—
 ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।”
 তেমনটি কেহ পারে নি জগতে—
 তোমরা যেমন দেখালে;
 বৃদ্ধেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে—
 —ধিক্ মিথ্যাবাদী ‘মেকালে’।
 এ সব ত মাতা পুরাণ কাহিনী—
 কাঁহাতক স্মরি’ রাখি মা।
 কিন্তু আজও দেখ চক্ষুর সামনে
 প্রত্যক্ষ বাঙালী গরিমা।
 এখনো বাঙালী জগৎ সম্মুখে
 রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত

চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে
 প্রচার করিয়া দিও ত।
 তার পর বৃন্দ!—আশ্চর্য্য সে বৃন্দ!
 ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
 পাড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে; নিতেছে
 'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
 ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি
 নাটক নভেল লিখিয়া,
 আজিও আছে ত শৃঙ্গ বৃন্দবলে
 এ জগতে সবে টিকিয়া।
 ল্যান্ডেয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে;—
 ট্যান্ডেম হাঁকায় সঘনে;
 বা-সিকলে যায়; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
 ধূলি উড়াইয়া গগনে;
 খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
 সার্কাস, জান না তাও কি?
 করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে;
 —তার বেশী আর চাও কি!
 ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে
 কলিযুগাধি হেন সে
 বরাবর বেঁচে এসেছে ত; তার
 বেশী আর পার্শ্ব কেন সে?
 এত বিপদের আবর্তের মাঝে,
 এত বিজাতীয় শাসনে,
 বরাবর টিকে আছে ত, তাকিয়া
 ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।
 ধন্য বৃন্দবল!—যুদ্ধে কভু শির
 দেও নি কাহারে বন্ধকী;
 যদি বাহুবল অভাব, বৃন্দিতে
 পুষ্টিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি!

অদল বদল

[ব্যারিষ্টার বনাম উকিল]

১

গোপীকৃষ্ণ দাস— গোমুটাতে বাস,—
 বয়স ২১-এতে পড়েছেন এই গেল বর্ষা;
 বদনখানি ছাঁচে ঢালা, রংও ভারি ফরসা;
 একহারা দেহ;— করে নি ক কেহ
 এ পর্য্যন্ত তদীয় সূচরিত্রে সন্দেহ;

অতি সাধু শিষ্ট;—তবে এইটুকু জানি—
 মাঝে মাঝে ছিপি আঁটা বিলাতি আমদানী
 রক্ত পীত কষায় তীর নানাবিধ পানী,
 খেত মিলে সে আর দু'চারিটি এয়ার;
 তাতে বড় কাহাকেও কর্ত না ক 'কেয়ার'।
 —ভগ্নী কিম্বা ভাই একটিও নাই;
 মাও ম'লেন সর্পি (বৃন্দ)
 বাপের হাতে গোপী;
 পিতাও তার সুসংগতি ছিলেন সবিশেষই;
 পড়া শূনাও গোপীর তাই হয় নি ক বেশী।
 ক্রমে গোপীর পুত্ররক হ'তে প্রাণজন্য
 বিবাহটাও হ'য়ে গেল নির্বিঘ্নে সম্পন্ন।

২

যাচ্ছে গোপী ক্রমে, স্ত্রীকে—
 (সবে মাত্র বিয়ে
 স্বশূর বাড়ী হ'তে, গোপীর বাপের বাড়ী নিয়ে
 সাধন কর্তে স্বামীর সমুচিত ক্রিয়া;
 বলেও রাখি কাদম্বিনী শ্বাদশবর্ষীয়া।

৩

স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে চেলি, নানা জরির নক্সা আঁকা;
 পায়ে মল;—ঘোম্‌টায় তাঁহার
 বিধুমুখটি ঢাকা;—
 বোধ হয় রূপের 'তরাসে',
 পাছে কারো জ্বর আসে,
 কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
 —ধন্য বিবেচনা—তাঁরে নিয়ে যায় তাই মূড়ে;
 ঝি আছে সজোরে আঁচলখানি ধ'রে,
 (বোধ হয়) পাখা খুলে পরী হ'লে
 পাছে যান বা উড়ে।
 —জানি না চেহারাখানি মন্দ কিম্বা ভালো,
 তবে হাত পা দেখে বোধ হয়—
 ঘুটঘুটে কালো;
 অলঙ্কারের ধনি— শূনে মনে গণি,
 তারই জোরে স্বামীর গৃহ
 কস্বেন তিনি আলো;

৪

হেন স্ত্রীকে নিয়ে, হাবড়ায় গিয়ে,—
কোঁচানো ঢাকাই পরা, মোজা বড় পায়ে;
কোঁচানো চাদরে বাঁধা কালো কুঁড়ি গায়ে;
—(চাদরখানি বন্ধে বাঁধা, পরা হয় নি খুলে,
কি জানি কেউ পাছে, তার যে নীচে আছে,
'স্টার'-প্যাটার্ন সোনার চেন,

তা দেখতে যায় বা ভুলে)

—হেন গোপী, দেখে, তিনটে কুলি ডেকে,
নিজের জিনিষ 'ইন্টারমিডিয়েট

'কেলাশেতে' রেখে,

স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—

(ভিড়ে কিছ, নাহি দমে)—

দিল তুলে' স্ত্রীগাড়ীতে অবলীলাক্রমে।

৫

এখন সে গাড়ীতে ছিল বর্ণিতে না পারি,
ছোট, বড়ী, ফর্সা, কালো কতকগুলি নারী।
কিন্তু জানি আরও একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ে,
কাদাম্বিনীর বয়সী, ফর্সা কাদাম্বিনীর চেয়ে,

পরা একই চেলি (যেন বিধির খেলই)

ছিল সে গাড়ীতে: পরে শুনোছিও আমি—
ছোট আদালতের একটি হাকিম তাহার স্বামী।
যাচ্ছিলেন সে ধর্মাবতার সে দিন বদলি হয়ে,
মুংগেরে (তৃতীয় পক্ষ) নবোঢ়া স্ত্রী ল'য়ে।

কীর্তিকলাপ তাঁর কৰ্ব্ব না প্রচার
পরের ঘরের কথা টেনে কেন করা বার?

একটি কথা বলে রাখি শব্দ সংগোপনে,
ধর্মাবতার গিয়ে সেই কন্যা দরশনে:
দিতে পুত্রের বিয়ে, দেখি কন্যাটি এ
অপ্সরা, নিজেই বিয়ে করে এলেন নিয়ে।

৬

এখন পাঠক সভ্য ও পাঠিকা নব্য!
যদি এখানেতে ভাবেন মদীয় কৰ্ব্বব্য,—
সেই জজের নাম, বংশাবলী, ধাম,
ব্যক্ত করে পূর্ণ কৰ্ব্ব তাঁদের মনস্কাম:

যাতে তাঁরা গিয়ে, হৃদয়টিকে নিয়ে,
দিতে পারেন 'উত্তম মধ্যম' অনায়াসে ধরে,
তাহা হলে ক্ষমা তাঁরা করেন যেন মোরে;
এবং দিবেন 'মোপে'; এরূপ সংক্ষেপে
দেওয়া নীতিশিক্ষা যে ভাল পরীক্ষা,—
সে বিষয়ে করে বাস্তব মতভেদাভিক্ষা।

৭

চল 'লুপ' মেল ইংরেজের খেল—

হাওয়ায় যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুঁড়ে—
দরের জিনিষ কাছে এনে,

কাছের ফেলে দরে;—

যেন তাহার খেলা;— ছোট টিশন মেলা,

ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে;

সেখানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে, নামিয়ে,

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।

জ্ঞান নেইক দাদার আলো কিম্বা বৃষ্টি—

করে নাও দৃষ্টি ঝঞ্জা কিম্বা বৃষ্টি—

উদ্ধবাসে উড়ে পাহাড় জঙ্গল ফুড়ে—

টরাটট টরাটট টরাটট ধ্বনিতে

ছাড়াল যে কত স্টেশন পারি নাইক গণিতে।

৮

থাম্‌ল গিয়ে গাড়ী ক্রমে মেমারিয়া গ্রামে,
গোমুটার সব যাত্রিবর্গ সেখানেতে নামে:—
ঘুরঘুরে অন্ধকার—অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি, জিনিষপত্র ছাড়ি,
নামাইতে স্ত্রীকে খুঁজিয়ে, সে দিকে
দৌড়াইল, যেই দিকে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী।

৯

এখন না হয় গোপীনাথের কপালেরই জোর,
নয়ত সে কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই অনুমানি',
নিল গোপী চেলি পরা, জজের স্ত্রীকেই টানি'।

১০

চলে গাড়ী জ্বারে জামালপুর্নে ভোরে
এল ক্রমে; উঠি হাকিম আধ ঘুমের ঘোরে,
স্বীগাড়ীতে গিয়ে গোপীর স্বীকে নিয়ে,
(আহা! বেচারী সে বন্ধ) সদৃশীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়ীতে গিয়ে দিলেন সোজা তুলে।

১১

১২ মিনিট পরে জজের পথভ্রষ্টা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়ীতে ক্রমে উত্তরিল আসি।
আর সে লুপ মেলও দ্রুত চ'লে গেল
ছাড়ি স্টেশন, উঙ্গার ক'রে ধোঁয়া রাশি রাশি।

১২

হ'ল গোপীর বধুর,—কঙ্কে কেহ নাই ক দেখি
ঘোমটা দঃসহ (তীরও যেমন গ্রহ!)
ঘোমটারটি তুলে চাইলেন যেমন ভুলে:—
অমনই ঝি চীৎকারিল “এ কি বাবু এ কি?
কে এ? কাকে নিয়ে এলেন”—
“তাই ত ঝি!—এ কে?
এ যে কালো”—বজ্রাহত জজ্ ত তা'রে দেখে।

১৩

ঘোড়দোড়, ছুটাছুটী;—প্রকান্ড চীৎকার;
“ঝি—ও মোধো—টোলগ্রাফ্—স্টেশন মাষ্টার।”
—বল্লেন চীৎকারিয়া জজ্‌টি ঘরে এসে তাঁর।
হাঁপাতে হাঁপাতে “দোহাই স্টেশন মাষ্টার,
—বিপর্যায় কান্ড— আঁধার ব্রহ্মান্ড—
দোহাই তোমার, ধর্ম অবতার
তুমিই; তা যা বলুক না সব ধর্ম গ্রন্থকার;—
রক্ষা কর ধর্ম;— এমনও কুকর্ম!
কখনও কর্ব না, প্রভু, স্বীকে ছেড়ে এসে
স্বীগাড়ীতে একা—হ'ল ইহাই অবশেষে!!!
অহো ভগবান হায় কি হ'ল!

—হা হতাশ।”

কেয়া হুয়া বাবু”

“আরে কেয়া! সর্বনাশ

স্বীচুরি—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে—
চাপল একটা অন্ধকেরে মেয়ে স্কন্ধদেশে;
স্বামীর নামও বলে না ক—বলে বাপের নাম
কোথাকার এক মস্তাগাছির
কোন এক শম্ভুরাম।
—উপায়? হা হরি—এখন যে কি করি”
বসে পড়লেন হাকিম একটা বেণেরই উপরি।

১৪

স্টেশন মাষ্টার দেখি এ ব্যাপার—
নিজের স্বী হারিয়ে লোকটা নিয়ে এল কার,
এই কথাটি ভেবে হাসি রাখা চেপে
হ'ল ভারি দঃসাধ্য; প্রায় যান ত তিনি ক্ষেপে;
ধৈর্যের যাহা গোড়া গোঁফে দিয়ে মোড়া;—
বল্লেন তিনি “সে কি বাবু
ফেল্লেন কি স্ত্রী হারিয়ে?
বড় খারাপ কটা; আরও
ডুঃখের বিষয় ভারি এ;
কিন্তু, বাবু! দায়ী রেলওয়ের লোক নাই;
রসিড্ নিয়ে মাল গাড়ীতে ডিলে, টবে মানি,
হোট ডায়ী এ সম্বন্ধে রেলওয়ে কোম্পানী:
টালে প'হুছিট স্ত্রীও নিঃসন্দেহে এসে।”
বলে ফেল্লেন শ্বেতাঙ্গটি ইংরাজীতে হেসে।
হুজুর ত অবাক্ লেগে গেল তাক্,
শুনলেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদান।
কি কস্বের্ন আর?

বেণে বসে স্বীর জন্যে ত হ্যাদান!
শ্বেতাঙ্গটি শেষে দিলেন উপদেশ এ—
“এ স্ত্রীলোকটি আপাটট এ স্টেশনে ঠাক্,
পুলিশেটে খবর ডিবেন আপনার স্ত্রী জন্য,
ইহা ভিন্ন সড়ুপায় ডেখি না ট অন্য;
টারা বড়ো সড়ুবে দেখবে গিয়ে খুঁজে;
আপনি এখন ঠাকুন শড়ুয়ে নাক মূখ গুঁজে।”

১৫

হুজুর দেখলেন, যাবে দেখাছ,
উভয় কুলই তাতে;
এটা তবু আপাতত থাকুক নিজের হাতে;
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা;
—পেলে তারে হাতছাড়া ক'রে আর কোন বেটা,—

বল্লেন “চলুক আপাতত এটা আমার সাথে;
নির্দারী এ মালে দিব পুর্লিশেরই হাতে”
বলে কষ্টে শ্রমে হতাশ হয়ে দমে,
পহুঁছিলেন ধর্মাবতার মৃগেরেতে ক্রমে।

১৬

গোপী ত এ দিকে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
চ'লে গেলেন বাড়ী, এবং পরমকৌতুকে,
করেন যাপন দিবা বিভাবরী স্নখে।

এক দিন গিয়ে গোপী কহেন “প্রিয়ে
সুশীলে” সম্ভাষি তারে ‘অতি স্নেহে চুমি’.
জান্তাম না ক সত্যি!—এত সুন্দরী যে তুমি,
আরও শুনোঁছিলাম—প্রিয়ে ক’রো না ক রোষ—
তোমার বাপের নাম—কি যেন শম্ভুচরণ ঘোষ;
স্ত্রীও বল্লেন হেসে “আর—ও—তুমি এত যদ্বা
সুন্দর যে, তা বলে নি কেউ আমারে; নতুবা
কাদতাম কি আমি, বল্লেন যখন মামী
মাকে ‘বড়ই বড় হ’ল আহা বাছার স্বামী’?
আরও শুনোঁছিলাম তোমার বর্ধমানে সাকিম?
আরও শুনোঁছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।”
বল্লেন গোপী—হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসতত ভাই।”

শ্বিতীয় প্রস্তাব

১

এজলাস বড় মেলা লোক জড়—
মাছেঁ সব পেয়াদা তাদের ঘুঁসি মৃষ্টি চড়ও;
ভীষণ রকম রোল, যেন শত ঢোল
ঢল, কাঁশি, শঙ্খ মিলে কছে গন্ডগোল।
জিজ্ঞাসিলাম তাদের “অদ্য এখানে কি হবে?
চীৎকার কছ কেন হেন ষাঁড়ের মত সবে?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুটে
কছ কি হে? নেবে না কি আদালতটা লুটে?”
—“স্ত্রীচুরির এক মোকদ্দমা” সবাই বল্ল উঠে।

২

শুনে আমি তাই ভিতরেতে যাই,
দেখলাম যাহা, হ’ল তাতে
বৃদ্ধি শৃদ্ধি লোপই;—
একটি দিকে সেই জজবাবু, অন্য দিকে গোপী,
ব্যারিষ্টার দাদা—মোটো’ নহেন সাদা—
ডেপুটিবাবুকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন—গাধা।

৩

“হিন্দুশাস্ত্রমতে হুজুর স্ত্রীরত্ন মহৎ,
ইহা সকলেই জানে—মুর্নিদিগের মত;
হীরা জহর ইহার কাছে লাগে না ক কিছু,
ছাগ, গো, মেঘ, মহিষ, হস্তী ইহার চেয়ে নীচু;—
স্ত্রীই বাড়ীর গির্নী, হুজুর!

স্ত্রীই বাড়ীর দাসী:
স্ত্রীই স্বামীর জমিদারী, তালুকদারী, চাষী;
স্ত্রীই স্বামীর বাহার; স্ত্রীই স্বামীর আহার:
—একটি কথায় নাহি কিছু সমতুল্য তাহার।
শুধু এই কালের নহে, পরকালের গতি;
পুত্রকে গ্রাণ জন্যও স্ত্রী দরকার অতি।
স্বর্গের যেটা সূত্র, মহামূল্য পুত্র,
জজবাবুর এই ভার্যা ভিন্ন আশা তস্য কুত্র?”
বল্লেন উঠে গোপীর উকীল এইখানে চটি’
“প্রমাণেও জজবাবুর পুত্রকন্যা ন’টি।”
“ত বটে তা বটে” বলে চুলকাইয়া ভুরু।—
কল্লেন জজের ব্যারিষ্টারটি

আবার বাক্য সূত্র।—

“তা যাক্, কেবল দেখাবার যা উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন অতি দামী, হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি; পরে হুজুর করুন সুবিচার;
এটাও দেখবেন ভেবে হুজুর জজটি অতি বৃদ্ধ,
মান্য এবং গণ্য, ও এই চুরির জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হয়েছেন সিদ্ধ;
বিশেষ তাঁর স্ত্রী অনুপমা সুন্দরী যদ্বতী,
(হেথা চুরির মতলবটিও জাজ্বল্যমান অতি;)
এবং হাতি সমান দিয়াছিও প্রমাণ,
গোপীকৃষ্ণ বয়্যাটে ও মাতাল সর্বিশেষই,
সে জন্য তার হওয়া উচিত সাজা খুবই বেশী।”

৪

উঠলেন বেড়ে গোপীর দক্ষ উকীল পরিশেষে,
 তাঁর চুল বেজায় কটা মেজাজ ভারি চটা,
 আরম্ভলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে, কেশে;—
 “এ বিষয়ে সব-জজবাবুই—দোষী, তিনি ঘোর
 পাপী এবং ব্যভিচারী, ভণ্ড এবং চোর,—
 বল্লাম এই যাহা, প্রমাণ হবে—তাহা!
 জ্ঞানেন যখন স্যব জজবাবু অপরের স্ত্রী এ,
 তবু গোপীর স্ত্রীকে সটাং এলেন ঘরে নিয়ে!
 নাহি জ্ঞানকান্ড? অকালকুস্মান্ড?
 একেবারে খালি ওটার বিদ্যাবুদ্ধিভান্ড!!!
 প'য়ষটি বছরের বড়ো, হতভাগা গাধা,
 অনায়াসে হ'তে পারে যে তাহার ঠাকুরদাদা;
 নিয়া গিয়া তারে, জ্ঞাত ব্যভিচারে
 বিনাশিল ধর্ম তাহার নিঃসঙ্কেচে?—আরে—
 তুই একটা জজ; নাহি লজ্জা তোর কি ছাই?
 ম'রে যাবি টুকু ক'রে কবে, ঠিক নাই;
 করেছিস্ ত বিয়ে বেটা শুধু টাকার জোরে;
 অপদর্শ সদুন্দরী এই বালিকাকে ধ'রে;

৫

নিজের ছেলের বিয়ে, কোথায় দিতে গিয়ে
 নিজে এলি বিয়ে ক'রে? তুই কি একটা মানু'ষ!
 তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য,
 লাঠিম কিংবা ফানু'ষ।”
 বল্লেন চ'টে ব্যারিষ্টারটি “উকীল মহাশয়! কেন
 মক্কেলটিকে আমার, মিছে গালাগালি দেন ও?”
 “গালাগালি? ম'শয় আপনার
 মক্কেল অতি শয়োর,
 কোলাব্যাং—ওর যাওয়া উচিত”
 ভিতরেতে কয়োর;
 সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, ও শুকিয়ে,
 শীঘ্র ম'রে যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর!
 যখন জজের স্ত্রীকে নিয়ে গোপীকৃষ্ণ আসে
 তখন আঁধার ঘরঘুটে রাত্রিকাল, তা সে
 গোপীকৃষ্ণ, প্রভু. জ্ঞানিত না কভু
 সদুশীলা যে অন্যের পত্নী—অনিবার্য যুক্তি;
 গোপীকৃষ্ণ পেতে পারে বেকসুরী মৃত্তি;
 কিন্তু ঐ হাঁড়িমুখো বানর বেটাছেলে—
 হস্তা হক এখনই ওকে পাঠিয়ে দিতে জেলে।

উনি আনার জজ! বদমায়েস, পাজি,
 আরে খেলে যা,
 নিজে চুরি ক'রে, নালিশ—যা বেটা
 যা জেলে যা।

৬

—“আবার গালাগালি” উঠলেন
 ব্যারিষ্টারটি ব'লে।
 উকীল বল্লেন “চুপ কর; নয় বাইরে যাও চ'লে,
 এ আমার সময় দাদা, দিও না ক বাধা—
 যেমন বেটা জজ তেমনি কি
 ব্যারিষ্টারটাও গাধা।”
 “—কোটে অপমান? ভাল যদি চান”
 বল্লেন আবার ব্যারিষ্টারটি—
 “আপনি বেরিয়ে যান।”
 “এও কি দাদা হয়—এ কি ছেলের হাতে মোয়া?
 এমনি মাৰ্ব্ব রগে চড় যে দেখবে সবই ধোঁয়া।”

৭

সদরু পরে হাতাহাতি, পরিশেষে লাথালথি
 পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে “দাড়াদাড়ি;”
 দেখলেন শেষে হাকিম তখন
 হ'ল কিছু বাড়াবাড়ি;
 বল্লেন “দেখ আদালতটা অনেক ক্ষণই সয়েছে;
 আর সহিতে পারে না, বেশ অপমান হয়েছে;
 এই অপমান করার দরুন আদালত ও আইন,
 তোমাদের প্রত্যেকের হ'ল
 দু'শো টাকা ‘ফাইন’।”

৮

এইরূপ প্রসঙ্গ হ'য়ে গেলে ভগ্ন
 হাকিম দিলেন তখন রায়, তার এবম্বিধ মর্মা—
 “যাও—কর বাড়ী গিয়ে যার যা নিত্যকর্ম;
 বৃন্দ জজ হে!
 কাদাম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্য্যা;
 গোপীকৃষ্ণ, সদুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা

অন্য দাবী—ডিসমিস—পরে

ইচ্ছা হয় ত কারও

সিভিল কোর্ট খুব খোলা আছে,

নালিশ কর্তে পারো!"

জর্জটি অতি ক্লিষ্ট—গোপী অতি হুস্ট
হ'লেন তাতে, অতি স্পষ্ট হ'ল সেটা দৃষ্ট;
সবার মাঝে সাফ, গোপী দিলেন লাফ;
সুশীলাকে ধ'রে গেলেন গাড়ী ক'রে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে সজোরে।

মর্ম্ম

১। হিন্দু বিবাহটা হয় ত খুবই আত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয়—তা অবশ্যই ঠিক;
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূরই গড়ায়;
সেরূপ বিবাহটা নিশ্চয় আত্মার মোক্ষসেতু,
কিন্তু হয় তা প্রায়ই গৃহে অশান্তির হেতু।

২। ঘোমটা যে জিনিষটা সেটা
ভালই, তা বলে;
সেটা ঠিক একটি গজ

লম্বা না হ'লেও চলে।

যদিই অন্যে পঙ্কীর চারু-চন্দ্রমুখখানি
দেখে খুঁসি হয় বা, তাতে এমনই কি হানি

৩। রেলের যেতে হ'লে সবাই স্ত্রীগাড়ীর মোড়ে
আপন আপন স্ত্রীগাড়ীকে
নিও বৃদ্ধে পোড়ে।

৪। উকিলেই দেখবে অনেক কার্য যায় চলে
মোকদ্দমা জেতে না ক ব্যারিস্টারই হ'লে।

বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী

১

যুবতী কুমারীগণ শুন দিয়া মন
বৃদ্ধা কুমারীর এক আত্মবিবরণ;
কি হেতু—যদিও আমি বয়সে পঞ্চাশ,
তথাপি কুমারী, তার শুন ইতিহাস।

২

বয়স পনের যবে, ভাবিতাম মনে,—
সমস্ত জগতে এসে লোটাতে চরণে;
হইত বিস্ময় শূন্য,—এত দিন হেন
সুঠাম চরণে তারা লুটায় নি কেন?

৩

বিবাহ ত করিব না যতক্ষণ পায়
প'ড়ে, রাজপুত্র এক মরিতে না চায়
“বাঁচাও” বলিয়া যবে পায় পড়বে সে,
উঠাব কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়া তারে হেঁসে।

৪

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স বিংশতি;
—রাজপুত্রগুলো দেখি আহাম্মক অতি।
মরিবার থাকিতেও এহেন সুযোগ,
সে সুখটা আজো কেহ করিলে না ভোগ।

৫

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স ত্রিশৎ;
তথাপি ছাড়ি না আশা চেয়ে আছি পথ;
জোয়ার ছাপিয়া ওঠে কূলে কূলে ঐ;
—হায় তবে রাজপুত্র এল আর কৈ!

৬

বয়স চল্লিশ। ভাটা প'ড়ে গেছে ঐ;
কি করি!—তবে না হয় মন্ত্রীপুত্রই সই!
কোর্টালের পুত্র ভিন্ন আসে না ক কেউ;
এদিকেও নেমে যায় জোয়ারের ঢেউ।

৭

বয়স পঞ্চাশ।—সেই প্রবল ভাটার
হঃ হঃ শূন্য নদী বেগে বয়ে যায়;
—কোর্টালের পুত্রই সই শেষে—হা কপাল!
কিন্তু রোস—সেই কোন্ আসে আজকাল?

৮

বোধ হয় হবে গত বর্ষ দুই চার,
কোটালের পদ্যটাও আসে না ক আর।
—এইরূপে করি ভ্রমে রাজপদ্য আশ।
কুমারীই রহিলাম—বয়সে পঞ্চাশ।

মর্ম্ম

১

এই পদ্যের মর্ম্ম এই;— প্রথমতঃ ভাই
পৃথিবীতে বড় বেশী রাজপদ্য নাই।
তদুপরী, যারা আছে তারা চায় যত—
অপ্সরা না হোক—রাজকন্যাও অন্ততঃ।

২

দ্বিতীয়তঃ বেশীক্ষণ পথ চেয়ে প্রায়,
আর কিছ্ না হোক জোয়ার বয়ে যায়;
রূপ বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায় বেশী রেখে;
টোপ জলে গ'লে যায় বেশীক্ষণ থেকে।

৩

যদি বৃক্ষে টান নাহি দাও লাগসে,
পরে উঠিবে না কিছ্, বড়শীটি বৈ।

ভট্টপল্লীতে সভা

১

একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,—
“তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল,”
সে গভীর প্রশ্ন, এবং সে বিষম তর্ক,
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক্ষ পক্ষ,
পন্ডিভেরা শেষে, টোলে সবাই এসে,
কল্লেন মহাসভা একটা অস্মিন্ বঙ্গদেশে।

২

টোলের সেই মাটি, সষতনে ঝাটি,
পড়লো ক্রমে সতরণ ফরাস এবং পাটি,

এলো নানাপ্রকার গড়গড়ি গড়গড়ি,
বহুবিধ হুকো—কারো মাথায় বাঁধা করিড়।
কোনটির খোল নারকেলের

আর কোনটির খোল রূপোর,
কোনটি বা ফরাসেতে বৈঠকেরই উপর;
কোনটি বা কোণে দুঃখিত ক্ষুন্ন মনে,
প'ড়ে আছে—তাদের যেন করেছে কেউ হেলা;
যেন পাশে ব'সে আছে ছোটলোক মেলা।

৩

সূর্য্য যাচ্ছে অস্ত, সবাই অতি ব্যস্ত,
সন্ধ্যার পরই পন্ডিভেরা আসবে মস্ত মস্ত;
সবই হ'ল গোছান, হুকো টুকো মোছান,
পাটি টাটি বিছানো, ও 'ফরাস টরাস' ঝাড়া;
অত্যাশ্চর্য্য যশ্টি'পরে প্রদীপ হ'ল খাড়া;
দিবা গত হৈল, চাকরেরা রৈল,
পন্ডিভদিগের অপেক্ষাতে—স্তম্ব হ'ল পাড়া।

৪

—ইতি অবসরে, এস ভাল করে,
দেখে নিই টোলটির চারি দিক, পাঠক,
যেথা অভিনীত অদ্য হবে মহা নাটক;
টোলটিকে না মাড়িয়ে, বাহিরেতে দাঁড়িয়ে,
দেখব গিয়ে তাতে কেহ দিবে না ক আটক।

৫

টোলটির—নাম “নব হরিধাম”
চারি দিকে অত্যাশ্চর্য্য চতুষ্কাণ থাম;
বোঝানটা শব্দ যে তাহার, কি আশ্চর্য্য কাজ,
যখন দেখ নি সেন্টাপটার, পার্লামেন্ট কি তাজ;
তারি কারিকুরি, করে, সকল চুরি,
ফ্রান্সদেশে রচিছিল 'ভার্সাই' চমৎকার,
(—স্বীকার করেন তাহা

গেটে ও মোক্ষমুদার—)

বর্ণনা আর কর্ম্ম না ক সে অপূর্ব্ব কর্ম্ম;
ইচ্ছা হয় ত দেখে এস সেই চারু হর্ম্ম্য।

৬

সেই হুম্মায়র কোন স্থান বা সৰ্বপতৈলে মাথা,
কোথাও বা সিন্দুরেতে গণপতি আঁকা;
সে অপদূৰ্ব্ব টোলে, কোথাও বা দোলে,
চিত্রপটীট শ্রীকৃষ্ণের—“শ্যাম বংশীধর বাঁকা।”
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে;
(আহা)—যাহার জন্য শ্রীরাদিকা

কালি দিলেন কূলে;

এরূপ চিত্র কেহ কভু দেখি নি ক আগে,
কোথায় রাফেল আঞ্জোলা ও টিসিয়ান লাগে,
—আর্য্যঋষিবর্গ বড় ছিল না ক যে সে,
ক'রে গেছে যা তাহারা আর্য্যবস্তে এসে,
পারে নি ক কোন কালে কেহ কোন দেশে।

৭

সে কথাটা যাক্—দূর এ উড়ো তর্ক তুলে,
কি বলতে যাচ্ছিলাম আমি
সেটাই গেলাম ভুলে।
—এরূপ রমণীয় হুম্মায় এলেন সবাই ক্রমে,
বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি; গেল জ'মে,
ক্রমেই সে টোল; বলে হরিবোল;
বসলেন পণ্ডিতেরা সবাই হ'য়ে নানা ম'খো,
কার হাতে নস্যদান আর কার হাতে হুকো।

৮

সবাই অতি ব্যস্ত, চাকরেরা গুস্ত,
জ্বালিল অমনি সেই প্রদীপসমস্ত;
ক্রমে টোলের শোভা হ'ল মনোলোভা,
কোথায় লাগে এথেন্স, রোম,
কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ।

৯

পণ্ডিতেরা বসলেন সবাই কোলাকুলি ক'রে,
মহা ভ্রাতৃভাবে; শেষে নানা কথায় পরে,
উঠলেন নরহরি শাস্ত্রী—মন হাতে ক'রে
বল্লেন একটু হেকে, মধ্যস্থলে এসে,
“হে বিদ্যার ভাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,

প্রচণ্ড মার্গণ্ড সম পণ্ডিতসমাজ,
সবাই ত জানেনই অদ্য সভার যে কি কাজ।
লেখে সবাই জানে, মার্গণ্ড পুরাণে
“পাত্রাধারে তৈলং” কিন্তু শুনুন মন থেকে,
“তৈলাধারে কাংস্য পাত্রে” এইরূপই লেখে,
আপনারা ইহার অতি করুণ সর্বাচার,
'তৈলাধারই পাত্র' কিম্বা 'তৈল পাত্রাধার'।
যে বিচারের জন্য, হবেন বিশ্বগণ্য,
আর এ মূর্খ পৃথিবীতে হবেন ধন্য ধন্য;
কেন না এ প্রশ্ন বিষম জটিল কুটিল অতি;
কচ্ছে যাহা বসুন্ধরার বিষম রকম ক্ষতি।

১০

তখন হ'ল তর্ক, পণ্ডিতেরা পক,
দিলেন নানান্ অভিমত সব নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেন বহু শ্লোক বেদ ও পুরাণ থেকে;
বিদ্যারঙ্গ খুঁজেন ব্যাস; তর্করঙ্গ তিনি,
খুঁজেন ব্যোপদেব; খুঁজেন গোস্বামী পার্গনি;
শিরোমণি অলঙ্কারশাস্ত্র; ন্যায়রঙ্গ
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্রখানি ক'রে অতি যত্ন;
স্মৃতিরঙ্গ খোঁজেন পুরাণ; শ্রুতি বহুস্পতি।
জ্যোতিষশাস্ত্র পাতি পাতি খুঁজেন সরস্বতী;
—লাগলেন ক্রমেই সে মহা সভার প্রতি সভ্য,
প্রকাশ কর্তে সে বিষয়ে স্বকীয় মন্তব্য।

১১

সে যজ্ঞে সে কুম্ভ, সে তর্কে সে হুম্মায়,
পণ্ডিতেরা মৎস্য সম হ'য়ে গেলেন ঘুম্মায়;
কার কথা কে শোনে, সবাই সভ্য জনে,
শোনান্ ওজস্বিনী ভাষায় নিজ নিজ মুম্মায়;
ক্রমশঃ সে মহাতর্ক হ'য়ে উঠল চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ আর সে ঘর হ'ল গরম।

১২

আমি—দেখিছি বার দশেক শান্তিপুরে রাস;
ব্রিষ্টলে প্রদর্শনীতে গরু শ পঞ্চাশ;
'ওয়ারিকে' দু তিন হাজার কুকুর জাতির মেলা;
মুগ্ধগেরেতে দিনবাবুর বাড়ীতে তাসখেলা;

শুনোছি কলকাতার রাস্তায়
 ষ্ট্রামগাড়ীর বনঝনি;
 বেহাই বাড়ী ছেলোদিগের চেঁচামেঁচির ধনি;
 সন্ধ্যাপূজায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ঢক;
 সান্যাল এবং চক্রবর্তীর স্পেসার নিয়ে তর্ক;
 অজ্জানের গান্ডীবের জানি

ছিল ভীষণ টঙ্কার;

পড়েছিও রামায়ণে যুদ্ধের বিষয় লঙ্কার;
 কিন্তু যা দেখিছি, শুনোছি ও পড়েছি,
 —তা সব,
 একত্রেতে জড়ালেও হয় অসম্ভব,
 এগোলো সে ধুন্ধুমারি সে দুন্দুভি রব।

১৩

ক্রমে সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে;
 কল্পেন ব্যক্ত তথা. বহু উদার কথা;
 ক্রমে সবার টিকী মহা আন্দোলিত স্কন্ধে;
 ক্রমে প্রেমভরে, সবাই পরস্পরে,
 সে অপদূর্ষ হরিসভায় 'নব হরিধামে',
 সম্বোধিতে লাগলেন শেষে ভাল ভাল নামে;
 হিন্দুশাস্ত্র ছেড়ে পরে দিলেন পরস্পরে,
 ডারুইনেরও বংশোৎপত্তির মত ব্যাখ্যা ক'রে;
 আরও সে সম্বন্ধে তাঁদের পদুর্ষদিগের আদ্য,
 ক'রে দিলেন বন্দোবস্ত ভাল ভাল খাদ্য;
 ও নব উপায়ে, বিনা ভোজে, ব্যয়ে.
 ক'রে দিলেন সুসম্পন্ন পরস্পরের শ্রাম্ব।

১৪

পরে সহ ভক্তি, গাঢ় অনুরক্তি,
 কল্পেন পরীক্ষা সেই সকল মহোদয় ব্যক্তি,
 পরস্পরের উদরের পরিধি এবং শক্তি:
 দেখালেনও বাহুবীর্ষ্য, সেই সকল আর্ষ্য,
 সবাই যেন অবতীর্ণ এক এক দ্রোণাচার্য্য:
 পরিধেয়ের পশ্চাতের বা সম্মুখেরই অংশ;
 (—কাছা কোঁচা) অনেকেরই হ'য়ে গেল ভ্রংশ;
 পরস্পরের কেশে, ধরে অবশেষে,
 ক'রে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নিস্বংশ,
 (—যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন,
 ছিল না ক বড় বেশী এক এক টিকী ভিন্ন,
 তবু সে প্রসঙ্গ, হ'য়ে গেল ভঙ্গ,

বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাক্‌চক্য;)
 মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

এদিকে বাসুকি দেখেন উঠে নিদ্রা থেকে,
 পৃথিবীটা গ্যাছে ভারি পদূর্ষ কোণে বেঁবে
 গোটা কতক খুঁটিরও হ'য়েছে সেথা ভঙ্গ;
 তখন ত বাসুকি দেখেন মেরে উঁকি
 ভীষণ রকম আলোড়িত দক্ষিণ-পদূর্ষবঙ্গ,
 এবং বঙ্গসমুদ্রে ঘোর উত্তাল তরঙ্গ।
 বাসুকি সে ব্যাপারখানা বুঝলেন গিয়ে যে
 তৎক্ষণাৎ—সেই একেবারে বলা কওয়া নেই
 দিয়ে সটাং পাড়ি, চ'ড়ে লেজের গাড়ী,
 চলে এলেন অবিলম্বে—ইন্দ্রদেবের বাড়ী।

২

এদিকে ত শচী (সহ সহস্র সীগনী,
 বাঁধাচ্ছিলেন রতির কাছে মারাত্মক বিনী,
 যেন কালসর্প, অথবা কন্দর্প-
 ফুলধনুর ছিলো, কিম্বা নিধুবাবুর টম্প
 শূন্যছিলেন সদুয়ো এবং দুয়োরাগীর গল্প
 রতির কাছে; হাস্ছিলেনও মিটিমিটি অল
 ভেবে, "অদ্য ইন্দ্র হবেন মুগ্ধ এবং জন্ম
 এমনসময় হ'ল ঘরে ফোর্স্‌ফোর্স্‌ শব্দ।

৩

"এ কি! তাই ত বাসুকি যে, অকস্মাৎ যে হে
 ব্যাপারখানাটা কি? আর এ বিষয় মুখ কেন
 বাসুকি জড়িয়ে লেজে শচী দেবীর পায়,
 বল্লেন "রক্ষ রক্ষ মাতা রক্ষ বসুধায়,
 নহিলে সে অবিলম্বে রসাতলে যায়;
 বণ্ণে যত মেলে, সরস্বতীর ছেলে,
 করে মহা তর্ক—আর সে—
 —দেখবেন বাইরে এ
 সে তর্কতরঙ্গে, উঠেছে যা বণ্ণে,
 গ্যাছে ধরা পদূর্ষকোণে বিষম রকম হেলে।"

শচী বল্লেন “তাই ত—এ ত বার্তা ভয়ঙ্কর,
এখন উপায়? আচ্ছা আগে আসুন পুরন্দর।
যা কর্তব্য করা যাবে করে পরামর্শ;
রক্ষিব পৃথিবী, যাও মা, হয়ো না বিমর্ষ।”

৪

বাসুকি যান ঘর, এলেন পুরন্দর,
শুনলেন ভীষণ বার্তা সেই লোমহর্ষকর;
পাঠালেন ত ডেকে, নানাস্থান থেকে,
বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইত্যাদি বিস্তর
দেবগণে; হ'ল মন্ত্রণা গভীর;
অবশেষে বৈকুণ্ঠেই যাওয়া হ'ল স্থির।

৫

সে সময় খাচ্ছিলেন বিষ্ণু মিঠে মোহনভোগ,
যে সময় উপস্থিত সেথা হলেন দেবলোক।
বল্লেন বিষ্ণু শেষে “শুনি ওহে মান্যগণ্য
দেবগণ! অকস্মাৎ—এ—এ—এ হল্লা কি জন্য?”
বল্লেন প্রণমিয়া ইন্দ্র “অদ্য সবে মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় সরস্বতীর ছেলে;
সেথা অতি বিষম এবং জটিল তর্ক হৈল,
'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল';
সে তর্ক তুরন্ত, হ'ল সদুরন্ত;
হচ্ছে এখন মহাসমর!—বিষম বাহুযুদ্ধ,
বৃষ্ণি রসাতলে যায় বা পৃথবী স্বর্গ শূন্য।
হেন যুদ্ধ করে নি কেউ—অমর, দানব, যক্ষ;
প্রভো—বারম্বার, হয়ে অবতার,
পৃথবীয়ে রক্ষিলে তুমিই আর একবারটি রক্ষ।”

৬

বল্লেন বিষ্ণু “তাই ত মোটে দশটি অবতার
ক'রে গেছেন পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা আমার;
তাহার মধ্যে ন'টি, গিয়াছে ত ঘটি'
আছে একটি, তাও যদি হ'য়ে ফেলি আজ,
তাহার পরে বসে বসে বেঁচেই বা কি কাজ?
তবে শোন এর একটি খুব পরামর্শ আছে,
চল সবে মিলে যাই গে ব্রহ্মাদেবের কাছে।”

৩৫

৭

তখন দেবতারা পড়েন ব্রহ্মাদেবের পায়
বল্লেন “হে দেব! তোমার সৃষ্টি রসাতলে যায়।”
শুনলেন ক্রমে প্রজাপতি পরে সে বৃশাস্ত;
বল্লেন ডেকে “বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র হও শান্ত”;
হুকুম কল্পেন ডেকে ব্রহ্মা দতীকে “হে অশ্বৈ!
সরস্বতীকে যাও ডেকে আন অবিলম্বে।”

৮

এদিকে ভারতী, মধুর স্বরে অতি,
বীণার সুরের সঙ্গে ধরে অতি মৃদুতান
ভাঁজিছিলেন ত ছাদে বসে, ইমনকল্যাণ!
শুনে মৃথে অম্বার, আজ্ঞা দেব ব্রহ্মার,
এলেন বাণী পালকী চড়ে অতি অবিলম্বে, আর
ভাবতে ভাবতে “বুড়ো কেন ডাকে”
তা বারম্বার।

৯

সরস্বতী এলে, তাকিয়াতে হেলে,
বল্লেন ব্রহ্মা “শোন সরস্বতী, সবাই মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় তোমার যত ছেলে;...
সেথা হইল ঘোর তর্ক, এখন হচ্ছে যুদ্ধ;
বৃষ্ণি রসাতলে যায় বা অদ্য সর্বশূন্য;
তুমি যাও, ও সভাপতি হ্রষীকেশের স্কন্ধে,
—অর্থাৎ রসনাতে বসে থামাও গে সেই স্বন্দে”
“তথাস্তু” বলে তা চলে গেলেন সরস্বতী
নব হরিধামে—যথা সভা, সভাপতি।

১০

এল এখন মহাতর্কের সময় খতম হবার;—
শ্রীহ্রষীকেশ সভাপতি দাঁড়িয়ে মাঝে সবার;—
তুলে দুই হস্ত, ও হ'য়ে মধ্যস্থ,
উচ্চৈঃস্বরে আদেশ কল্পেন “ভবন্তু নিরন্ত;
পণ্ডিতগণ, এ মহারণের কর এখন ভঙ্গ,
থামাও না ভীষণ বাত্যা, নহে ত এ বঙ্গ,
বঙ্গ কি! ধরণীই, যাবে যে এখনই
রসাতলে; সামাল সামাল, এ তর্ক তরঙ্গ।
তখন ইদং বিশ্ব, পাছে হয় অদৃশ্য,

অকস্মাৎ, সেই পিণ্ডভেঁরা, পাছে প্রলয় ঘটে,
বল্লেন সবাই একবাক্যে—“হাঁ তাও ত ঝটে।”

১১

পুনঃ সভাপতি, বল্লেন “এটি অতি,
কটু প্রশ্ন; অতএব এ তর্ক হও ক্রান্ত;
তোমরা কি মর্নিরাও নহেন অদ্রান্ত;
তোমাদেরও আমারও বা হতে পারে ভ্রম;
বিশেষ যখন এ প্রশ্নটি সমস্যা বিষম;
এ হেন সমস্যা কভু ঘটে নি ক আগে;
কিবা যোগস্মৃতি, কিবা রাজনীতি,
কিবা জ্যোতিষ—ইহার কাছে

কোথায় সে সব লাগে।

যে তর্ক অদ্য এ বংগ—ভট্টপাড়ায় হল,
“তৈলাধার পাঠ কি না পাতাধার তৈল”,
ভেবে চারিদিক্ দেখিছি দুইই ঠিক্—
কিম্বা দুইয়ের একটি ঠিক্;

আর তা যদি না হয়

নিতান্ত, তা হলে ঠিক্ তার কোনটিই নয়;
তোমরা এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট অবশ্য,
অতএব দ্রাতৃবৃন্দ! নেও সবে নস্য।”
উক্ত সুন্দর মীমাংসাটি করে হৃষীকেশ,
সে রাগেতে সভাকার্য্য করে দিলেন শেষ।

মর্ম্ম

রাস্তায় কুড়ের মত কেন ঘুরে ঘুরে মরো?
ঘরে কেজো লোকের মত উড়ো তর্ক করো।

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা

১

হরিনাথ দস্ত চ'ড়ে সকাল বেলার ট্রেন্'
দুর্গাপূজার ছুটী—শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।

এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দস্ত
পাটনায় চাকরি করেন;—কিন্তু সে চাকরির অর্থ
বলা কিছ্ শক্ত; কারণ এটি ব্যস্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর, তান্ত

কর্ত্তেরন টাকার জন্যে; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে করে, অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

২

হরিনাথ ত উপন্যাস করে মেলা জড়
পড়তেন দিবারাত্র; কেন কার্য্য কর্ম্ম বড়
শিখেন নি ক, বসে পড়তেন তিনি ক'রে
কপালকুণ্ডলা এবং দুর্গেশনন্দিনী,
এবং তাহাই দিবারিংশি ভাবতেন বসে তিনি

৩

হরিনাথের বাপের বাড়ী ছিল পাবনায়;
বাংগালদিগের আদিস্থানে সিরাজগঞ্জ গাঁয়;
শ্বশুরবাড়ী হুগলির কাছে—গরিফায়।
তাঁহার স্ত্রীটি সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আরো সে (তা বলতে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারিক বালিকা ইস্কুলে।

৪

—এখন বালিকারা শিখলে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট;—
তারা বাঁধে না ক খোঁপা, চুল ফেরায় তোফা,
শাড়ী এত বড় হয় যে বিরক্ত হয় ধোপা;
শান্তিপুর্নে, বারাগসী, ঢাকাই যায় সব চুলো;
পরে এখন ‘বোম্বাই’ পর্শিচশ হস্ত লম্বায়;
তাও এত কুঁচায় যে তার ঘোমটাতে না কুলো
তার নীচেতে পরে কামিজ, জ্যাকেট পরে গারে
পায়ে দেয় না আলতা বরং মোজা পরে পায়ে
তার উপরে জুতো; ইত্যাদি;—বস্তৃতঃ
শীঘ্রই তাদের জবালায় চোটে উঠে জ্যেষ্ঠী, মাম
পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত—ক্ষেপে যায় স্বামী।

৫

সৌদামিনীর অবশ্যই ছিল সে সব দোষ;
কিন্তু তাতে বড় কেহ কর্ত্ত না ক রোষ;
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
টাকার ছিল না ক খাঁক্তি;

তাই তাঁর এসব কসুর

“ইন্দোঃ কিরণেশ্ববাঙ্কঃ” যেত সবই ঢেকে;
খরচ হ'ত না ত দিতে কার্দ পকেট থেকে;
(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গুণ টাকার
তিনিই এ কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার)
আরো এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধবী দশবর্ষীয়া যুবতী।

৬

মোটে গত হ'ল প্রায় মাসেক ষোল,
দিয়েছেন বিবাহ সদুর তদীয় মা বাপ,—
একবারটি হরির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ।
আশৈশব হরির পত্নী থাকেন বাপের বাড়ী,
দেখতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আস্চেন মহোপাসে অদ্য চ'ড়ে রেলের গাড়ী।

৭

হরিনাথ দত্ত ত একটি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে,
এক ধারে গাড়ীর বেণ্ডের ব'সে একটি পাশে,
বাইরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবাচ্ছিলেন পান,
এবং সদুর রূপরাশি কত্তেছিলেন ধ্যান;
(সেই রূপরাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে না ক খুঁজে এলেও বৃন্দাবন ও কাশী।)

৮

দেখবেন সেই ব'ধুর, বদনখানি মধুর,
ডাকবেন কত ভালবেসে নামটি ধ'রে সদুর;
বলবেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
কর্ষন সদুর সঙ্গে তিনি অনেক দিনের পরে,
—ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধরে।

৯

তিনি বাড়ী গিয়ে ঘরের দুয়ার দিয়ে
প্রথমতঃ ডাকবেন স্ত্রীকে সম্বোধিয়ে “প্রিয়ে!”
সদু বলবে “নাথ!” তদন্তরে বলবেন তিনি
“প্রাণেশ্বর! প্রিয়ভমে! সদু! সৌদামিনী!”
দিবে উত্তর সদু, “প্রাণেশ্বর ব'ধু!
হৃদয়বল্লভ! প্রভো! প্রাণনাথ! পতি!
সর্বস্ব! জীবিতেশ্বর!” বলে সে যুবতী
তৎক্ষণাৎ তাঁর আলিঙ্গনে বন্ধ নিঃসন্দেহে

মুচ্ছা যাবেই—সাম্লাতে তা
পার্শ্ব না ক কেহ;
এই ভেবে হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু দুটি হ'ল সিস্ত, মুখটি হ'ল ম্লান।

১০

ভাঙলে সেই মুচ্ছা উঠে আবেগে অচিরে
বলবেই সে নিম্নমত ভাসি অশ্রুদীপে।

“নাথ তব লাগি, নিশিলাগি জাগি,
কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে প্রভো! তোমারি বিরহে?”

পাষণহৃদয়, নিষ্ঠুর নিদয়”!!
“নিষ্ঠুরে প্রেয়সি” তিনি বলবেন তাঁরে চুমি,
“কিরূপে গিয়াছে দিন জান তা কি তুমি?”
দুই জনে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহে পরে
কাঁদবেন দু'চার খানিক ঘণ্টা চোঁচা উচ্চৈঃস্বরে।
ভাবতে ভাবতে উত্তরূপে বিরহী সে হরি
কাঁদতে লাগল সতাই শেষে ভেউ ভেউ করি।

১১

পার্শ্ব একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে
অতি ফরসা রং, একহারা তার ঢং,
টস্-টসে বৃদ্ধ যেন আত্ম সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ঐ উক্ত সকল ব্যাপার;
ভাবছিলেন কি লোকটার

এ সব লক্ষণগুলো ক্ষ্যাপার?
পরে যখন দেখলেন তিনি আর্সি বাহির ক'রে
হরি সম্মুখেতে তারে অর্ধঘণ্টা ধ'রে
চেয়ে তারই পানে অতৃপ্তনয়ানে
মুখটি টিপে হাসেন, এবং আঁচড়ান নবীন দাড়ি,
বাগিঁশ করা জুঁতি, কালাপেড়ে ধুঁতি:—
বুঝলেন ব্যাপার কতক;

তখন দূরের বোঁগ ছাড়ি,
বসলেন গিয়ে অবিলম্বে হরির কাছে এসে;
কল্পেন অর্নি আলাপ সদুর,

দু তিনটি বার কেশে,—
“মহাশয়ের নাম? ও নিবাস?
কোথা হয় তাঁর থাকা?
কোথা যাবেন? কি করেন?
আর পান বা কত টাকা?”

ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করি সদুদত্ত
জানলেন সেই বড়, ব্যাপারটি যা গড়;
তাঁহার নাম ও বাড়ী 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জানলেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পর্য্যন্ত।

১২

এখন বড়োর হাতের উপর বসে রোয়ে রোয়ে।
ঝুলছিল সময়টা যেন বেশী ভারি হ'য়ে।
কল্পেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা।
সময়টাকে নিম্নমত করিবারে হত্যা।

১৩

জিজ্ঞাসিলেন তিনি আবার

"প'হুঁছবেন ক'টায়?"
উত্তরিলেন হরি "রাগি আটটা কিম্বা ন'টায়"।
—"চিঠি লিখেছেন?" "ইস্ বাঙ্গাল
পেয়েছেন কি আমায়?
চিঠি লিখে শ্বশুরবাড়ী যায় কি কভু জামাই?"
—"সে কি বলেন?—আপনার জানেন
যেতে হবে রাত?
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়বে,
পাবেন না যে ভাত।"
—"হ্যাঁ হয় কভু কি এ?—একটি বছর বিয়ে,
পায় না খেতে জামাই নতুন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে?
যাব এমনি হঠাৎ যে সেই হর্ষের মহা ঝড়ে,
বিরহিণী সদু আমার মূর্ছায় যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরি আবার আয়না ক'রে বের
দেখে নিলেন গর্বে নিজের চেহারাটি ফের।

১৪

এখন ভদ্রলোকটির স্বভাব একটু রসিক ধাঁজের;
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ওসব কথা বাজের
বল্লেন একটু কেসে; মৃদুমৃদু হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সদুচারু,
মনে ত পড়ে না এমন দেখেছি যে 'কারু';
তবে,—একটি কথা খাঁটি, এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করেছে যে মাটি।"
হরিনাথের সে বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ',
বল্লেন "ক্যান? এ দাড়িটারে
কিসে দেখেন মন্দ?"

"জানেন নাকি কিসে?—

এহেন মিস্‌মিসে—
কালো দাড়ি রাখে শূধু বাবুর্চি সহিসে;
এহেন কোঁকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মৃদুফরাস মূর্চি, দর্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ি-ফ্যাসন—

করেন নি ক পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা এবং খাটো;
আঃ—রাম! হেন, দেশী এবং ধেনো।
দাড়ি বুদ্ধিমান্‌টি হয়ে রেখেছেন তা জেনেও?
এখনই কামিয়ে হরিবাবু ফেলে দেন ও।"

১৫

শুনে এই সব; হরি ত নীরব;
ভাবলেন তিনি 'তাই ত—কিরূপে মায়া ছাড়ি'
—ফেলে দিই বা এত দিনের যত্নের হেন দাড়ি?
ভদ্রলোকটি বুললেন তখন হরিনাথের সন্দ',
বল্লেন তিনি শেষে, আবার একটু কেসে,
"এহাঁ বিশেষতঃ শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়িফাড়ি একেবারেই করে না পছন্দ;
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।"
তখন সাগ্রহে হরি বল্লেন "বলে? বটে?
সত্যি?"—"নয় কি মিথ্যে—

মিথ্যে কইবার আমার মানে?
এ কথা কলকাতার মশয় সকলেই ত জানে।"
"কিন্তু এ যে বহুদিনের?" বুলাইয়া হাত
আর্সি সামনে ধরি, বল্লেন আবার হরি:—
"এত যত্নের দাড়ি—ফেলে দিব অকস্মাৎ?"
"দেবেন না ত দেবেন না ক; হ'লে একটু সাফ—
আপনার সদুন্দর বদনখানি আমার তাতে লাভ?"
এইটি ব'লে বৃদ্ধ একটু চ'টে যেন গিয়ে;
হেলান দিলেন, মূর্খটি ঢেকে হাতের বাঁহ দিয়ে।

১৬

"তাই ত তাই ত" বসে
আবার ভাবতে লাগলেন হরি
"কামাব—কি কামাব না?—এখন যে কি করি?"
হঠাৎ ভদ্রলোকটি বল্লেন, কেতাব ক'রে বন্ধ
"আর—ও—ছি ছি এ কি,
আসুন দেখি দেখি:

দু এক গাছ যে পাকা;
হোন্ ত দেখি বাঁকা;
অহো রাম! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ!
ওয়াক্-ওঃ ওয়াক্!—
“সত্যি নাকি?” “ওয়াক্!
কি গন্ধ! ও—মা গো!
আপনি বাঙালই নিঃসন্দ।”
“বলেন কি?” “হ্যা দেখতে পান না?
আপনি নাকি অন্ধ?
এ দাড়িও রাখে? আঃ ছাঃ!
নিয়ে উক্ত দাড়ি—
সত্যি কথা বলতে কি তা—
গেলে শ্বশুরবাড়ী,
ভাব্বে আপনাকে ডোম, কি
মুন্দ্‌ফরাস হাড়ি।
ওয়াক্-ও অথঃ—আপনার সেই সদু—
দেখ্বে আপনার দাড়ি মশয়, এবং শুক্বে যবে
চুমো খাওয়া দুরে থাক্ সে, কথাও না ক’বে?”

১৭

এবার হলেন হরিনাথ ত সম্পূর্ণ পরাস্ত—
বল্লেন তখন মহোৎসুকো হয়ে ভারি ব্যস্ত—
“মহাশয় তবে দেখুন. উপায় কি যে এখন,
এ দাড়িটা কামাই কোথা?”—“কেন, বন্ধুমান।”
“সেখানেতে নাপিত আছে?”
—“কত গন্ডা চান?”
তখন ত ঠিক হ’ল, থামলে বন্ধুমাণে গাড়ী
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

১৮

ঘট্ ঘট্ ঘট্—শোঁ, ঘটক্ ঘটক্—পোঁ,
বন্ধুমাণে ক্রমে গাড়ী এল ক’রে চোঁ।
এবং সেই বন্ধুমাণে যেই থামা গাড়ী
নামলেন অর্মান হরি দত্ত কামাতে তাঁর দাড়ি;
সবিশেষ অন্বেষণে বন্ধুমান ইন্টেশনে,
পেলেন একটা নাপিত—
কিন্তু কার কথাটি কে শোনে,
কারণ সেটি ১২৮২ সাল, যে সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে;
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে টিটকার;—
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথিণ্ডে ত স্বীকার।

১৯

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ,
নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় অষ্ট মিনিট;—“এত তাড়াতাড়ি
হবে”—ভাব্লে পরামাণিক—“কামান এ দাড়ি?”
যা হ’ক সে বিষয়ে চিন্তা কল্পেই নিজের ক্ষতি;
(নাপিতেরও পয়সার সে দিন টানাটানি অতি)
বল্ল “একটা টাকা নেবো কামাতে এ মুস্ত
প্রবীণ দাড়ি।” হরি স্বীকার; করি তায় টাঁকসু,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটি ক’রে বাহির,
শীঘ্র বসা হ’ল কর্তে নৈপুণ্য তাঁর জাহিব।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকের দাড়ি হ’ল ত নিপাত;
তাতে পড়ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়ল শান
ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস, ফ্যাস ফ্যাস ফ্যাস,
হ’ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান,
পড়লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেই মত, আর
বাঁদিকের মুখটা তাঁর ক্রমে হ’ল পরিষ্কার।
এখন, নাপিত হাঁচি, লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অর্ধ, এমন সময় বন্ধু-
মাণে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনটি বার
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠক মশয় এ সময়টা কবে’ন আন্ডায় মাফ
যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই.—চোঁচা, দিলে একটা লাফ;
চাদর মাদর ফেলে, লোকজন ঠেলে,
উঠলেন গিয়ে, বহুৎ কণ্টে, পুনরায় রেল।

২০

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি;
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বন্ধুমাণে।
পাঁচটি মিনিট হরিনাথ ত
বসে রইলেন খাড়া;
তবে পড়ল ঘণ্টা আবার
তিনবার; ও তা ছাড়া

এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্ ভক্ ভক্, ঘটক্ ঘটক্,
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্, ঘট্, ঘট্,
চল্ল, স্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট্।
গেল সে রেলগাড়ী বর্ধমান ছাড়ি;
রইলই কামান অর্ধ হরিনাথের দাড়ি।

২১

তখন, ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি—“এ কি মহাশয়?
ক’রে ফেল্লেন এ কি?”
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—“মশায় দেখুন দেখি,
আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—”
“তাই ত একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি!
এমনও কি করে?—তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটাও ত হ’য়ে গ্যাছে সাফ”,
বলে উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ কো’রে,
ভদ্রলোকটি হাসলেন চোঁচা দশটি মিনিট ধরে।

২২

হরিনাথ ত রইলেন বসে চুপটি করে, রেগে;
হৃদয়লীতে থামলে সে গাড়ী অতি তীর বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে সাহেব এবং মেমে)
দিয়ে ছুট, ভাড়া করে একখানা ছ্যাক্ড়া গাড়ী,
হরিনাথ— আর কথাটি নেই, চোঁচা দিলেন পাড়ি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

১

রাত্রি হবে দুপুর, বাড়ীর মধ্যের উপর,
সৌদামিনী এবং তার কনিষ্ঠ বোন, এই দু’য়ে
জুড়ে, তাঁদের দিদি মায়ের দুইটি দিকে শূয়ে
অকাতরে মাটির মতন ঘুমুচ্ছেন ত প’ড়ে।

বাড়ী অতি স্তম্ভ নাই সাড়া শব্দ—
হেন কালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চ’ড়ে;
হ’ল দেরি বেকুফিতে হরির নৌকার মাঝর—
তাইতে হরি শ্বশুরবাড়ী দুপুর রাতে হাজির।

২

মহা হুড়োহুড়ি এবং মহা ডাকাডাকি,—
জেগে উঠলো সবাই, ভেবে
‘ডাকাত পড়ল নাকি?’
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি ক’রে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে কল্ল বেগে তাড়া;
কর্তা বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াকড় এক হুকুম দিলেন
‘নীচেতে না নামি’,—
“মারো বেদম বজ্জাৎ চোরকো”
“আমি আমি আমি”
চীৎকারিলেন হরিনাথ ত,—
“দেখুন নেমে এসে—
আমি”—আর—সে আমি—
চোঁচা তস্য পশ্চান্দ্রেশে,
পড়লো দু তিন লাঠি, যুদ্ধে নাই আঁটি,
হরিনাথ ত উপড় হ’য়ে কামড়াইলেন মাটি।

৩

সবাই তাঁরে বাঁধে: পরে নিয়ে কাঁধে,
নিয়ে এল বাবুর কাছে; সেথা তারে নামাই’
দিল মনঃপুত জোরে দুদশ জুতো;
কর্তা বল্লেন “বেটা, রাখে তোরে কেটা?
শীঘ্র নামটা তোর বল্ ত শালা চোর;
দুপুর রেতে ডাকাতি?—

কে বল্ না শালা আমায়,”
“ডাকাত নাই, চোরও নাই,
শালাও নাই,—জামাই”।
বল্লেন শেষে হরি দত্ত, ক্রমে হাঁফ ছাড়ি’।
“জামাই!—তবে কোথা গেল

একটা দিকের দাড়ি?
বেটা ষণ্ডামার্ক বজ্জাৎ!
আবার বলে জামাই, এঃ—
অর্ধেক দাড়ি গেল কোথা?”—

“ফেলোঁছ তা কামাইয়ে।”

৪

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্তুতঃ;

তখন শ্বশুর মশয় হলেন দারুণ অপ্রস্তুত, ও
সজ্জায় যেন কাঁথা—চুলকাইয়া মাথা,
বলেন, “বটে বটে, কিন্তু এমনও কি করে?
চিঠি নাহি লিখে হাজির রাতি দ্বিপ্রহরে!
ছিঃ ছিঃ রাম! বলতেও হয় নামও;
এত লাঠি, ‘আমি’ : ভিন্ন কথা নাহি সরে।
তাতে অর্ধ দাড়ি শূন্য! এমনও কি করে?
এখনি অগত্যা হ’ত যে গো হত্যা—
অর্থাৎ—যা হ’ক্ শোওগে বাছা
বাড়ীর ভিতর গিয়ে।”
(স্বগত) “এ গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে!”

৫

হরিনাথ ত শুলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—;
“অভ্যর্থনা সদর হ’ল কিছুর গরুর;
হবে এটা হুগলি জেলার অভ্যর্থনার প্রথা,
খেতে দিলেও বদ্বতাম, সেটা হ’ত কড়ামিঠে,
তা দিলে না মোটে, মরি ক্ষুধার চোটে,
পেটে পড়ল দ’, আর লাঠি জুতো পড়ল পিঠে।
যা হোক দেখি, প্রিয়ার মদুখপঙ্কজ নেহারি,
পেটের পিঠের জ্বালা যদি ভুলিতেও পারি।”
ভাবছেন হরি হেন শূয়ে বিছানার উপরে:—
এদিকে সদর মা গিয়ে
সদরকে তাঁর জাগিয়ে,
অনেকক্ষণটি বদ্বিয়ে,
ভোগা দিয়ে বদ্বিয়ে,
পাঠালেন সদরকে শেষে হরিনাথের ঘরে।

৬

প্রবেশিল ঘরে সদর, সহ হৃৎকম্প;
হরি অমনি, দিয়ে একাট ছোট খাটো লম্বফ.
তারে বদ্বকে নিয়ে, বল্লেন “অয়ি প্রিয়ে—”
হ’ল না কর্তে তাঁর বেশী সম্ভাষণ সদরধর—
“ওগো মেরে ফেল্লে মা গো”—
মুচ্ছা হ’ল সদর।
তখন, সদর মাতা উঠে,—এলেন ঘরে ছুটে,—
দেখলেন যে তাঁর সৌদামিনী
ধরায় পড়ে’ লুঠে;
এবং তাঁহার জামাতা—থেকে তস্য পা, মাথা
পর্যন্ত আড়ল্ট, খাড়া, মদুখটি করে ফাঁক.
(একাট দিকে দাড়িশূন্য)—নিষ্পন্দ নিষ্বাক্।

দেখে গিন্নী আগুন, তেলে যেন ‘বাগুন’,
বল্লেন তিনি চীৎকারিয়া,—“হনুমান্টা, কে রে,
সোনার বাছা সদরকে তুই ফেল্লেছিস্ যে মেরে;
সোনার মেয়েটরে বিয়ে দিল কি রে
কায়তের এক ঢেঁকি, বদ্বো বাঁদর হত্যাচ্ছেরে?
বাবুই ত ঘটাল এ, এ ত ছিল জানাই;
আমি ত এ বরাবরই করিছিলাম মানাই;—
বেরো বদ্বো, বাড়ী থেকে বেরো,
শিঘ্রঘর বেরো;
দেখ্ছিস্ ও কি চেয়ে;—

আহা সোনার মেয়ে!—

কপালেরই গেরো গো সব কপালেরই গেরো।”
তখন সদর মা, তার মদুখে জলের ছিটে দিয়ে,
সদরকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চলল যান ত নিয়ে।

৭

দেখে ব্যাপার এই, হরি ত আর নেই;—
খেয়ে উক্ত তাড়া, দিলেন না ক সাড়া;
ভাবতে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া;
হ’ল ভগ্ন আহা তাঁহার সারা পথের আশা,
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালবাসা?
কই ত এরূপ চোঁচা মুচ্ছা স্বামী দরশনে,
দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মৃগালিনী,
গিয়াছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে।
চাহিলে নাও ভাল করে কহিলে নাও কথা—
আর জামাইয়ের এ কি রকম অভ্যর্থনার প্রথা!
আহারের সঙ্গে ত মোটে নাইক নামগন্ধ,—
আদর সদর লাঠি জুতায়—শেষে অর্ধচন্দ্র।
যা হ’ক্ এ সব ভেবে

কি জানি, যান ক্ষেপে
পাছে তিনি; ছাড়ি’ সাধের শ্বশুরবাড়ী,
জেগে’ সারা রাতি প্রাতে কামাইয়া দাড়ি,
চড়ে পুন নৌকা, ছ্যাক্ড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই, হরিনাথ,
ফের পাটনায় দিলেন ‘পাড়ি’।

মর্মান্ত

প্রথমতঃ ;—নিজের কার্য ফাঁকি দিয়ে, বড়
পড়ো না ক উপন্যাস; আর যদি কিছুর পড়

নিতান্তই, প'ড়ো ভাল কাজের বহি; খেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুঁরি জেনো।

দ্বিতীয়তঃ; দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিও না; চোলে যায় তা

যাক্ না রেলের গাড়ী;
না হয় দেরিই হ'ল একদিন যেতে শ্বশুরবাড়ী।
তৃতীয়তঃ; কাউকে বেশী ক'রো না বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ীর কথা ক'রো না ক ফাঁস

যাহার তাহার কাছে: এ জগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা দেখে নিও শিখে—
শেষতঃ; যেও না কোথাও চিঠি নাই লিখে।

ডেপুটি-কাহিনী

১

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি—
আপিসেতে চ'লে যান নবীন ডিপুটি—
অতি এক লক্ষ্মীছাড়া, ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিতবর্ণ, অপরটি সাদা।

২

পরিয়া ইংরাজি প্যান্ট গলা আঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর রোচে না ক মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে:

৩

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা বাইরেতে পোষাকে অন্ততঃ;
কেরাণীর চাপকান পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্তে:
শ্রিশঙ্কুর মত, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্যে।

৪

তদুপরি, শোভে শিরে 'ধূম্রপানসেবী'
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনারা উল্টানো তার,
কি রকম বোঝা ভার,

অনেকটা বহুরূপী;
চিৎপরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।

৫

এবিস্বধ পরিচ্ছদে স্ফুটিত অতি,
ডিপুটিপ্রবর চাড়ি', মৃদুমন্দগতি
প্রাগুক্ত পুস্তকরথে,
উপনীত আদালতে,—
তাড়াতাড়ি এজলাসে উঠি,
ডাকিলেন বেণু ক্রাক্ নবীন ডিপুটি!

৬

পরে যত ফরিয়াদি আসামী, বেবাক
পিড়িল তাদের সব ঘন ঘন ডাক;
হ'ল সাক্ষী এজাহার,
ছাঁকা মিথ্যা, পরিষ্কার—
পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ভ'রে গেল তায়;
ডিপুটি দিলেন পরে দীর্ঘ এক 'রায়'।

৭

বিচার সমাপ্ত করি', সিগারের ধূমে
ক'রে গিয়ে 'ডিসিন্ফেক্ট' এজলাস 'রুমে',
ছাড়িয়া ইংরাজি গৎ, ক'রে মেলা দস্তখৎ,
ক'রে মোকদ্দমা দিন ধার্য;
ক'রে দুটো ছোটখাটো রেভিনিউ কার্য:

৮

চলিলেন, এজলাস হ'তে শেষে উঠি',
চাড়িয়া পুস্তকরথ আবার ডিপুটি:
আন্দালিও বাস্ক হস্তে,
চলে সঙ্গে; শশব্যস্তে
সরে' যায় পুর্লিশ প্রহরী;
ডেপুটি স্বগৃহে যান, কার্য শেষ করি।

৯

সেখানে বসিয়া তাঁর সন্মিষ্টভাষিণী,
সন্মন্দগমনা, গোরী, মধুরহাসিনী
নবপরিণীতা প্রিয়া, ঘরেতে দরজা নিয়া,
নিদ্রায় যাপিয়া দীর্ঘ দিবা,
আসিলেন পার্শ্ব তাঁর—মনোহর কিবা।

১০

একে মিষ্ট, তাতে হস্তে মিষ্টান্নরেকাবী,
—(সোনায় সোহাগা)—আর অণ্ডলেতে চাৰি,
পায়ে মল, হাতে বালা. অধরেতে মধুঢালা,
কৃষকেশ-কবরী সুরভী:—
(আশে পাশে ঘোরে ঝিটা—নিতান্ত অকবি!)

১১

ডেপুটি আপিস হ'তে অন্তঃপুরে এসে.
একেবারে গ'লে গিয়ে ফেলিলেন হেসে—
সার্থক জীবন যার, ঘরে হেন পরিবার.
বারম্বার তিনি তার পানে
চাহিলেন.—(অকবি কি তবুও এখানে?)

১২

যাহা হোক! জলযোগে স্নিগ্ধ করি মন,
আসিলেন. বহির্দে'শে: সেবি' কিছুদ্ধগ
তাম্বুল ও তাম্বুলটে. পরে 'চার' হ'তে উঠে,
উড়নি উড়ায়ে, গুটি' গুটি'
চলিলেন হাওয়া খেতে—নবীন ডিপুটি।

১৩

প্রতাহ সন্ধ্যায় হয় মন্সফ বাবদ
বাহিরের ঘরে সভা, তথায় প্রচুর
তর্ক. পরিনিন্দা চর্চা. (হয় যাহা বিনিখর্চা।)
হয় তাহা সেথা প্রতি রাত্র:
(তামাকেব ব্যয় তাহে দ. ছিলিম মাত্র।)

১৪

তথায় বিচার করি' বিবিধ চরিত্র:
রমণী-জাতির নানা সতীত্বের চিত্র:
অম্বকের ভুল রায়. আপীলের পরীক্ষায়
যাহা প্রায় কখন না টিকে:
কি বলিয়াছিল শ্যাম দুর্কড়ির স্ত্রীকে.

১৫

ইত্যাদি সমালোচনা, তর্ক. আবিষ্কার.
তুলনা, উপমা, যুক্তিখণ্ডন, বিচার.
নিষ্পত্তি, ব্যবস্থা, হাস্য—সংগে নানা টীকাভাষ্য

সমাপ্ত হইলে সভাস্থলে,
সভাভঙ্গে, গাত্রোথান করেন সকলে।

১৬

তখন ডেপুটির উঠে ধীরি ধীরি,
হরিকেন লণ্ঠন সাহায্যে বাড়ী ফিরি'
ভাত ডাল মৎস্যঝোলে—
(যাতে ঋষি-মন ভোলে,
কেন না সে প্রিয়ার রম্বন)
খাইয়া স্বর্গীয় সুখে নিমগন হন।

১৭

ক্রমে পুনরক হ'তে ডেপুটির গ্রাণ:
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রামে যান:
শ্লীহা ছুটি দরখাস্ত. (উপরে তা ববখাস্ত)
সেখানে যাপন চারি বর্ষ:
কাজেই ডেপুটি হন ক্রমশঃ বিমর্ষ।

১৮

ক্রমে তাসক্রীড়াসক্ত. ক্রমে হ'ল পাশা,
দেবী হ'ত প্রায় তাঁর বাড়ী ফিরে আসা,
(১১. ১২টা কভু)—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সংগে, হ'ত বিসম্বাদ:
বুঝে উঠা হ'ত ভার কার অপরাধ.—

১৯

স্বামী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, কার্যভারে নত:—
কেবল কি স্ত্রীপুত্রার্থে, নিত্য অবিরত,
দিবারাত্র, দিবারাত্র, করিবেন দাস্য মাত্র?
নিষিদ্ধ কি বিশুদ্ধ আমোদ?
স্বামীর কি কুলী বলে পত্নীদের বোধ?

২০

স্ত্রী বেচারী, সারাদিন স্বামী সহবাসে
বর্ণিত, থাকেন শূন্য রাত্রির প্রত্যাহাশে:
তাতেও বিধির বাদ? এমনি কি অপরাধ
থাকিবেন একা দিবারাত্র?
স্বামীদের বিশ্বাস কি তাঁরা দাসী মাত্র?

২১

কান্নাকাটি, ভার মূখ; পীড়ন, তাড়ন,
বাক্যালাপ বন্ধ? ক্রমে বিচিত্র রন্ধন;—
ডালে নুন কম; মাছে গন্ধ; ঘৃত পচিয়াছে;
ধরিয়াছে দুধ; এইরূপ
দুজনের অনাহার—দুজনেই চূপ।

২২

ক্রমে বাড়াবাড়ি; শেষে করি' অভিমান
পুত্রগণ সহ পত্নী পিত্রালয়ে যান;
যেন তার প্রতিশোধে, ডেপুটিও মহা ক্রোধে,
যান কোন বিনামা বসতি;
অন্তিম পাপীর যথা কাশীধামে গতি।

২৩

পরদিন মাথাধরা; ভারি ডিম্পেপ্শিয়া;
বিজ্ঞান; দিনে নিদ্রা আপিসেতে গিয়া;
ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন. বিকেলেতে শূয়ে র'ন;
রাতে কাশীধামই ভরসা;
বেগতিক ক্রমে ক্রমে শরীরের দশা।

২৪

হইল ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি ডেপুটির,
(যদিও সংখ্যায় নয়)—গেজেটে জাহির,
তিনি মহকুমা-পতি; যান সেথা শীঘ্রগতি,
বেতনেও একশত যোগ;
অতুল প্রভু সেথা করিলেন ভোগ।

২৫

করিলেন নানাবিধ বিধান ডেপুটি—
রাতে সব মোকদ্দমা, দিনে সব ছুটি;
ডিসমিশ আবেদন; অষ্ট মাস পর্যটন;
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছুর নাই;
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই।

২৬

কেরাণীমহলে তাঁর দেখে কে সুখ্যাতি!
আরো পদবৃদ্ধি; তাঁর কুটুম্ব ও জ্ঞাতি,—
স্বীয়পুত্র ও পরিবার, (বটে, কেহ নহে কার

রামমোহনের এই উক্তি)

একা তাঁর পুণ্যফলে সকলের মর্ন্তি।

২৭

এইরূপে করিলেন, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে,
বৃদ্ধি ও আনুষ্টিগক বিজ্ঞতার জোরে,
সপুত্রকলত্রকন্যা, ডিপুটির অগ্রগণ্যা
(‘অগ্রগণ্য’ ব্যাকরণসংগত) সর্বাঙ্গ-
সুন্দর সৌগন্ধপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।

রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা

১

(সময় আর যায় না)

একদিন বেলা দুটোয়, রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়,
হয়ে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দারুণ দীর্ঘতায়;
সে সুরদ প্রদোষে, শূয়ে, উঠে বোসে,
“দিন ত আর যায় না”

রাজা বস্তুনে শেষে রোষে।
বাহিরেতে এসে, তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখে,
বাড়ীর যত ভূত্যাগকে পাঠালেন সব ডেকে;—
বস্তুনে “বেটা রামা, তোর যে

গায়ে নেই ক জামা?”

বোলাও শূয়ের বাবুর্জিকো—বোলাও খানসামা;
—পাঁড়ে হারামজাদা,—

ঐ তোর গোফ যে বড় সাদা?

—দফাদার তোম্ শালা তো

স্নেফ্ বৈঠ্কে বৈঠ্কে খাতা হয়;

—এই যাও লে আও চাবুক—

এই চন্দ্র কাঁহা যাতা হয়?

এই প্রকারেতে রাজা কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে,
রোষভরে সম্মুখ থেকে কাউকে দিলেন তাড়িয়ে,
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট সুশ্রাব্যাতি;
কাউকে দিলেন চাবুক,

এবং কাউকে দিলেন লাথি।

তবু সময় যায় না; পরে ‘ড্রয়িং রুমে’ পৌঁছে।
নিঃস্বাস ফেলে বসলেন গিয়ে

লম্বা একখান কোঁচে:

দেখলেন একটি সাদা বিড়াল শূন্যে আছে নীচে,
অর্মানি লাঠি নিয়ে

রাজা ছুটিলেন ত তার পিছে।
বিড়ালটি ত লাঠি খেয়ে, ঘূর্মটি থেকে উঠে,—
চারি দিকে দেখে, উঠল সেখান থেকে,
সে প্রহার সম্বন্ধে, ভাল কিম্বা মন্দ এ,
বেশী আন্দোলন না ক'রে পালিয়ে গেল ছুটে;
শূন্য একবার মাথা নেড়ে, হেছে কল্প 'মেউ'
অর্থ—'ভদ্রলোকে এমন করে না ক কেউ'।

বাজা আবার বসলেন গিয়ে
'কৌচে', ক্রিষ্ট প্রাণে:
দেখলেন অতি দীনভাবে
চেয়ে ঘাড়ির পানে:
পরে পড়লেন নূয়ে, কৌচের উপর শূন্যে,
নিলেন একখানা ছবিওয়াল
'রেনল্ডস্ নভেল' হাতে:
এমন কি তার ওলটালেনও

দুই চার পাঁচ পাতে,
কিন্তু সেটাও দেখলেন তিনি বদ্বৃতে অসমর্থ:
বোধ হল যে সে বইখানার ভারি শক্ত অর্থ,—
অসম্ভব তা বোঝা—লাইনগুলো সোজা,
কিন্তু তার সেই মানেগুলি এত এ'কাবেকা;
যে যেন সে উদ্দ' কিম্বা পাসী'-ভাষায় লেখা।
ডান দিক্ থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডানে,
প'ড়ে দেখলেন যে তার দাঁড়ায়

একই রকম মানে।
বইখানা দিলেন ছুড়ে, পচিশ হস্ত দূরে;
উঠলেন শেষে; এদিক্ ওদিক্
দু' তিনটি ঘর ঘুরে;
চেয়ে নিজের চেহারা পানে ঘরের বড় আয়নায়,
আবার বসলেন দীর্ঘশ্বাসি'

"সময় যে আর যায় না এ।"

৪

শেষে ঘাড়ি দেখে, পাঠালেন সব ডেকে,
মন্ত্রিবর্গে, পারিষদে তাদের বাড়ী থেকে;
দিলেন আজ্ঞা "অবিলম্বে, শীঘ্র এবং দ্রুত,
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো।"

কড়া এবং মিঠে, পড়বে তাদের পিঠে;
বন্ধ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার, ঘূর্ঘূ চরবে ভিটে।"

এই বাস্তবী শূনি', মাননী এবং গুণী,
পণ্ডিত পারিষদ ও মন্ত্রী ও সভ্য সমস্ত
এসে হলেন হাজির সবাই, হ'য়ে মহা ব্যস্ত।

সবাই এলে, বসলেন রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়—
"বলে আস'ছি কর একটা যা কিছ' উপায়,
যাতে সময়টা একরকম শীঘ্র কেটে যায়;
তোমরা অতি বন্য, অতি অকর্মণ্য,
পাল্লেন না ত কোন উপায় কর্তে সেটার জন্য,
অদ্য নির্ধারণ এ প্রশ্ন কর অবিলম্বে,
এক্ষণি এক্ষণি ভেবে:—নইলে নিতম্বে,
পৃষ্ঠে এবং শিরে, পড়বেই অচিরে,
নবতম সভ্য প্রথায়, অতি মনঃপূত—
শপাশপ্ চাবুক এবং দমাদম্ জুত।"

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবল "এ কি,
প্রস্তাবটি অসুবিধার; নিশ্চয় ও নিঃসন্দ',
'বেন্দুদত্ত' চাপিয়াছে মহারাজার স্কন্ধ।"
সবাই ভেবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশমিবে রাজার নিদারুণ সেই কোপে;
সভায় নাইক শব্দ, সকলে নিস্তম্ব,
কেউ বা টিকী নাড়ে, কেউ চুলকায় ঘাড়ে,
কারো হস্ত গণ্ডস্থলে, কারো হস্ত গোঁফে;
কারো পেল কার্শি, কেহ বা নিশ্বাসি'
তাকায় আগে, পিছ' পানে,
উপরে ও নীচু পানে,
দেওয়ালে, কর্ণিতে, পাখায়;—অর্থাৎ সর্বস্থানে,
কেবল কেহ তাকায় না ক রাজার মূখের পানে।

বসলেন রাজা পূনরায় "এ জীবনটা ঘোর ফাঁকা;
সুবিধা হ'ল না কিছ' থেকে এত টাকা;
সময়ই জীবনের দেখ'ছি অতীব বিপদ;
জীবনের এই প্রধান কার্য—সময় করা বধ।"

শূন্য কারুর কারুর সময় হাওয়ার মত ছোটে;
আমার সময়টা ত দেখি এগোয় না ক মোটে।
কিনি এত হাতী ঘোড়া, চাঁড়ি এত গাড়ী;
এত নাচ গান তামাসা দিচ্ছিই রাজবাড়ী;
রাখি এত পারিষদ মাইনে দিয়ে ধ'রে;
রাণীতে রাণীতে গেল অন্দর মহল ভ'রে;
তবু সময় যায় না ক যে!!

—মুসলমানদের কালও

এ বিষয়ে ইংরাজ আমল চেয়ে ছিল ভাল;
তখন নবাব, রাজারা ত পেত বার মাসই—
সময় কাটার জন্য দিতে প্রজাদিগের ফাঁসি;
এখন সময়টা ঠিক যেন কচ্ছপবৎ হাঁটে!
—বল দেখি সময় কাহার কি রকমে কাটে?"

তখন উঠলেন শ্রীল শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,
নির্বোধিতে কি রকমে সময়টি তাঁর যায়।

—“মহারাজ—এই—কবিতা—

ও নভেল এবং নাটক

লিখনে ও পাঠে খাসা সময় কাটে;

আমার লেখার হোকই কিম্বা

নাইই বা হোক পাঠক;

কেহ দেয় না ক—তা বিশেষ

গালি কিম্বা আটক।

গুরু বিষয়ের কাছ দিয়ে যাই না কভু ভ্রমে;

নাটক নভেল লিখি বিনা পরিশ্রমে—

দু'চারখানা বই খুঁজে, সহজে চোখ বন্ধুজে;

বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্র কিছই না বন্ধু,

সময়টি বেশ কাটে রাজন—

কিছই না শিখে,

নাটক, নভেল প'ড়ে;

এবং নাটক নভেল লিখে!"

বলেন রাজা তবে, স্বীয় মস্তক হস্তে রাখি,

“হা যারা বয়াটে, তাদের সময় কাটে

এরূপে অনেক; কিন্তু তবু থাকে বাকী।

—তা সে যা হোক, পূর্ণচন্দ্র তুমি একটা ছাগল,

নির্বেশ এবং গন্ডমুখ, নিষ্কর্মা ও পাগল,

এবং অতি ‘পাকা’ রোজগারে ত ফাঁকা,

খাও, দাও, বোসে থাক, উড়াও বাপের টাকা!

—সন্দার, পূর্ণচন্দ্রকে না ক'রে কিছ বেশী,

বিদায় ক'রে দেও ত দিয়ে অর্ধচন্দ্র দেশী।”

কল্প সে পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার;
এবং কল্লেন পূর্ণচন্দ্র এবম্বিধ সাজার
সদাপত্তি নানা; বল্লেন “আহা না না—
দোহাই হুকুর”—সন্দারকেও

কল্লেন অনেক মানা;

—সবাই বৃথা; পূর্ণচন্দ্রও অর্ধচন্দ্র খেয়ে,
গেলেন লজ্জায় অন্য কারো পানেতে না চেয়ে।

বল্লেন উঠে তবে শ্রীমান্ নন্দদুলাল দত্ত—

“মহারাজ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্ব-
অধিকারী আমি লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ:

ইংরাজ এবং বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,

চ'লে যায় পেটে; দিন যায় কেটে

সুখে; ধর্মের এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণে,

করি মেলা গোল, তাই আমায়

অনেক লোকেই জানে।

মহারাজ, এই সংবাদপত্র লেখা অতি সোজা;

দরকার শুধু ইংরাজ সংবাদপত্রগুলো খোঁজা;

এবং খ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটা;

কদাচ বা ‘লাইবেল’ ক'রে, চাইও ফাটক খাটা।”

রাজা বল্লেন “বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে

যাঁদের, তাঁদের ইথে অনেক সময় কাটে জানি,

কিন্তু তবু বাকী থাকে সময় অনেকখানি।

নন্দ তুমি ভ্যাড়া—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া:

সন্দার, নন্দর ১১ বার নাকটি ধ'রে নেড়ে,

১৭ কানুটি দিয়ে এরে দাও ত ছেড়ে।”

ক্রমে কার্যে পরিণত উক্ত সে আদেশ,

সে রকমে খানিক সময় কেটে গেল বেশ।

দত্ত অতি ক্লিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট

অন্য সবাই তাঁর সে সাজায় হ'লেন বরং হৃষ্ট।

বল্লেন উঠে জীবন সরকার তখন “মহারাজ
হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণটা করাই আমার কাজ;

করি ব্যাখ্যা ধর্ম ভাগবতের মর্ম,

বেদ ও দর্শন, মনু, স্মৃতি,—সংস্কৃত না শিখিই

প্রচারি যোগ ব্রহ্মচার্য—চালাই একখান মাসিকী

ইথে” বল্লেন সরকার “বিদ্যে নেইক দরকার

বলা দরকার 'ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব';
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে—'অসম্ভব'!!"
রাজা বল্লেন "কর্ম না থাকিলে ধর্ম
নিয়ে নাড়াচাড়া ও মাসিকী নহে মন্দ;
কিন্তু তা ক'রেও সময় থাকেই নিঃসন্দ'।
কিন্তু তোমার সরকার, কিছুর শিক্ষার দরকার;
সন্দার, এই বানরের মাথায়

গোবর গোলা খাঁটী—

ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত

ঠিক ৮২ গজ মাটি।"

শুনে এই আজ্ঞা জীবন গেলেন ভারি দ'মে,
উত্তরূপে স্নাত হ'য়ে, নাসা দ্বারা ক্রমে
৮২ গজ খাঁটী, মাপিলেন ত মাটি,
নাসিকায় ও হস্তপদে ততখানি হাঁটি'।

১১

বল্লেন উঠে তবে শ্রীল গোবিন্দ 'গোস্বামী—
"রাজন, হিন্দু সমাজের সংরক্ষকর্তা আমি;
যদি কোন প্রভু, প্রকাশ্যে খান কভু
কুক্কট ইত্যাদি, অংশ আমারে না দিয়ে,
হুলস্থূল্ বাধিয়ে দেই সেই ব্যাপার নিয়ে।
যদি বা কেউ গিয়ে, বিধবার দেয় বিয়ে;
কিংবা কেহ ফিরে আসে বিলেত ফিলেত গিয়ে;
তখন বলি 'লাগে'; আধ্যাত্মিক রাগে,
যাই তাহার মস্তকটাকে চিবিয়ে খেতে আগে;
পেলে মেলা লোকের এরূপ বৃদ্ধি, বিভ্রাটে
এই রকম গোলেমালে অনেক সময় কাটে।"
বল্লেন তখন গোপীকৃষ্ণ বিরক্ত ও ক্রিষ্ট,
"দলাদলি ক'রেও সময় থাকে অবশিষ্ট।
যা হোক তুমি ঘোর, বিড়াল এবং চোর;
সন্দার, বেড়াও ১৯টি বার টিকি ধরে ওর;
এবং মারো ২৫টি চড় গালেতে সজোর।"
খেয়ে ২৫ চপেটাঘাত, ১৯ টিকী পাক,
বাহিরিলেন গোস্বামীজী চুলকাইয়া নাক।

১২

বল্লেন উঠে শ্রীশ্যামভট্ট "খেয়ে পুঁথি ঘেঁটে,
উড়া তর্ক ক'রে আমার সময়টি যায় কেটে;
যাহা কিছুর বাকী, থাকে, দেই ফাঁকি
টিকী নেড়ে টিকী ঝেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে;"

রাজা নেড়ে ঘাড়, বল্লেন "তুমি ষাঁড়,
নস্য নিয়েও সময়ের যে অনেক বাকী থাকে।
সন্দার, শ্যামের পিঠের উপর

আমার ঘোড়ার চাবুক

অতি বেগে পনের বার উঠুক এবং নাবুক।"
চাবুক খেয়ে ভট্ট চীৎকারিলেন অট্ট;
এবং তিনি যে এক মহাশব্দ অতি বন্য,
রাজার দত্ত সে খেতাবটি কল্লেন প্রতিপন্ন।

১৩

বল্লেন তখন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষ উঠে—
"আমার সময়টি যায় তোফা ঘোড়ার মত ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেলের গাড়ী,
খেয়ে দেয়ে এবং খেলে পাশা, তাস ও দাবা;
তাতে শূন্য সময়? কাটে সময়ের যে বাবা।
করি মিলে কয়টি এয়ার ফরাসেতে ব'সে,
'পঞ্জা' 'কচে বার' এবং 'কিস্তি' দেই ক'সে;
কভু টানি হুকো দিয়ে তাকিয়ায় ঠেস;
তাতে সময় তা একরকম কেটে যায় ত বেশ।"
রাজা বল্লেন "না, না আমার আছে জানা,
খেলায় অনেক সময় যায়,

তা যায় না ষোল আনা

তাস ও পাশা খেলেও সময় অনেক বাকী থাকে
হে মহেন্দ্র ঘোষ! তুমি একটি 'মোষ'—
সন্দার দেও ত ঝাঁটাইয়া অকর্মণ্যটাকে।"
অন্তঃপুর হ'তে এল রমণীয় ঝাঁটা,
চীৎকারিলেন মহেন্দ্র ঘোষ—নবমীর পাঁটা;—
সম্মাজ্জর্নী আহার, নিকটে ত তাহার,
এমন কিছুর নতন নয়—তা দাগাই আছে পিঠে
তবে কি না মিঠে হাতের হ'লে হ'ত মিঠে।

১৪

বল্লেন উঠে তখন শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল মূখো—
"আমি বাবা খেলিলে তাস, টানিনেক হুকো;
আমি কাটাই কোনরূপে সকাল থেকে সন্ধ্যা,
আফিং খেয়ে ঢুলে, শূয়ে হাই তুলে,
ব'সে ফরাসে আর মিলে ক'টি এয়ার,
তাকিয়াতে ঠেসে, রাজা বাদশাহ সম্বন্ধে,
করি সবাই উড়া গল্প; এবং তিনটি তুড়িয়ে,
সময়ের যে চৌন্দ পুরুষ দিয়ে দেই উড়িয়ে।"

রাজা বল্লেন “কৃষ্ণকমল তুমি একটি হাতী;
 দিতে পার ঢুলে, শূয়ে হাই তুলে,
 অনেক সময় ফাঁকি; তবু থাকে বাকী;
 সন্দাঁর, ছেড়ে দেও ত একে দিয়ে দু’টি লাথি।”
 ৮২র গুজন কোরে লাথি ভোজন.
 মূখাজী পো চম্পট দিলেন
 দু দশ দীর্ঘ যোজন।

১৫

শ্রীরাধানাথ চট্টো উঠে বল্লেন;—শোন রাজা—
 আমার সময় কাটে খেয়ে গর্দলি এবং গাঁজা:
 এবং অতি সরস সিঁধি এবং চরশ—
 স্নোতের মত চলে যাচ্ছে, দিবস মাস ও বরষ;
 কতিপয় নব্য, বর্ষর, অসভ্য,
 এগর্দলির গৌরবাট চাহেন করিবারে খর্ব্ব;
 খেতেন স্বয়ং শিব—তা জানে পুরাণজ্ঞ সর্ব্ব।”
 রাজা বল্লেন “রাধা, তুমি অতি গাধা,
 —সন্দাঁর, ছেড়ে দাও ত একে
 মেরে চৌন্দ চটী।”
 চটী খেয়ে চট্টিজিত দিয়ে তিনটি লাফ।
 সভাগৃহ হ’তে দ্রুত পাড়ি দিলেন সাফ।

১৬

উঠে বল্লেন শেষে শ্রীযুত রতিকান্ত বল্লেন;
 —ফোলা দু’টি গাল, চক্ক দু’টি লাল,
 ঢালি’ আগে পাশে, এডো এডো ভাষে;—
 আরান্তিম তাঁর মুখে তাঁর হুইস্কি মদের গন্ধ—
 “ধর্ম্মাবতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য
 সদুপায়—সময়টাকে করিবারে বধ,
 এই দুই তুল্যমূল্য দুব্য—বেশ্যা এবং মদ।
 বেশ্যাসক্তি মস্তোঁ, ছিল আর্ষ্যাবর্তে—
 আরো সোমরস নামে—ঋষিরা লেখেনও,
 ছিল এক প্রকার মদ দেশী এবং ধেনো।
 কিন্তু কভু, কোথায়, সুরা সভ্য প্রথায়,
 খাওয়া য়ে ছিল না—
 স্বীকার কর্বেই এই কথায়।
 ইংরাজি প্রথায়—এ—
 ব্রান্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,
 সময় বধের অত্যশ্চর্য্য অব্যর্থ সন্ধান;

তারা ছোট করে না ক শূধু দীর্ঘ সময়,
 তারা খাটো করে নরজীবনের ‘প্রময়’।”
 রাজা বল্লেন “ইথে সময় যায় বটে দ্রুত—
 কিন্তু তবু খানিক বাকি থাকেই;—বস্তুতঃ
 তুমি অতি শূয়োর, স্বভাব অতি কু;—ওর
 মুখে মারো, সন্দাঁর, জোরে দুই বট জুতো।”
 খেয়ে প্রহার, ডসন বাড়ীর অত্যুৎকৃষ্ট বট,
 রতিকান্ত সভা হ’তে দিলেন বাইরে ছুট।

১৭

সবারে তাড়িয়ে দিয়ে—বেলা তখন ৬টা—
 রাজার মেজাজ হ’ল আরো খারাপ এবং চটা;
 বস্লেন গিয়ে বেগে, বাড়ীর মধ্যে রেগে;
 বল্লেন শেষে—“হায় রে বিধি!
 এখনও দু ঘণ্টা,
 —গ্রীষ্মের বেলা—কিই বা করি
 ব’সে এতক্ষণটা?
 করেছেন অতীব মূর্খ অপদার্থ ব্রহ্মা,
 জীবনটা ঘোর ছোট এবং সময়টা ঘোর লম্বা।
 লিখলে পড়লে, চোটে মাথা ধরে ওঠে;
 সে জন্য সে কার্য্য কর্তে পারি না ক মোটে।
 জমিদারি কাজে মন বসে না;—তা যে
 নীরস;—আর এ কার্য্য কর্ম্ম

রাজাদের কি সাজে?

দেখিছি ত বহু উপায় কাটাতে তিন বেলা;
 অনেক রকম নেশা, এবং অনেক রকম খেলা,
 অনেক রকম রংগ, অনেক রকম সগ্গ,
 অনেক রকম ব্যভিচারে স্বাস্থ্য করি’ ভগ্গ—
 বিলাসসম্ভোগভুং—টাকার যাহা সাধ্য,
 করেছি ত সর্ব্ববিধ আমোদেরও শ্রাম্ধ।
 তবু সময় যায় না ক যে; দেখছি ভেবে সব.
 রাজা-রাজড়াদিগের সময় যাওয়াই অসম্ভব।

১৮

“এখন কি যায় করা?—
 কোথায় বা যায় যাওয়া?”
 রাজা উপায় না পেয়ে, উঠলেন যেন হাঁপিয়ে,
 যেন হঠাৎ বন্ধ হ’ল ঘরের মধ্যের হাওয়া;
 চাকর দিয়াছে ছাড়ান;
 বিড়াল গিয়াছে তাড়ান;

মন্ত্রী পারিষদদের ধরে দেওয়া গিয়াছে জুতো;
পুনর্ভিনয় তার ত হয় না, বস্তুতঃ

পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব
এও অতি স্পষ্ট যে সাফ
নাইক কোন কাজ আর;
এবং অন্য কোথা যাওয়াও কষ্টকরী রাজার;
তাই গেলেন রাজা—যেথা অতি সোজা—ভেবে
চীনেও নয়, ব্রহ্মে নয়, মাদ্রাজ নয়, বম্বে নয়.
আমেরিকা, ইউরোপে নয়.
রেল কি স্টিমার চেপে,
আকাশে নয়, পাতালে নয়.—
রাজা গেলেন ক্ষেপে।

নসীরাম পালের বক্তৃতা

সভ্য এবং ভব্য গদ্যটিকতক নব্য
শিক্ষিত-বাঙালী-রঙে মিলিয়া সকলে,
ডাকলেন একটা ভারি “মীটিং” এলবার্ট হলে।
দেওয়া গেছে “প্লাকার্ড”
‘নোটিশ্’ ছেয়ে রাস্তা ঘাট—
“স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ,
বক্তা বাবু নসীরাম পাল কন্বের্ন গিয়ে পাঠ।”
সে বিষয়ে দক্ষ উদার এবং পক্ষ
নানাবিধ মতের হবে আলোচনা, তর্ক।
অনেকের বক্তৃতা হবে ছোট এবং বড়;—
সে কারণে শ্রোতৃবর্গ হ’লেন গিয়ে জড়:

শ্রীনসীরাম পাল বি, এ, ভারি সুলেখক,
কলিকাতার আর্যসভার দক্ষ সম্পাদক,
হিন্দু শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে আছে ভারি দৃষ্টি;
সভ্যতার কাছে হিন্দুধর্ম বাঁচে
যাতে, সে কারণে হ’ল আর্যসভার সৃষ্টি।
সেই সভার সভ্য গদ্যটিকতক নব্য
শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিক—জাতি কামার এবং চামার,
আরও বহু আর্য—সবায় স্মরণ নেইক আমার;
বিজ্ঞানেরই শরে, হিন্দুধর্ম মরে
পাছে, উঠলেন কর্ণটি বক্তা সে প্রকাণ্ড কার্ণে
প্রচার কর্তে হিন্দুধর্ম, চেতন কর্তে আর্ষে।

বাজলে ঘণ্টা সাড়ে সাতটা—

এলবার্ট হলের ঘাড়ি,
কেনারাম কর্মকার ত তস্তার উপর চাঁড়ি.
কল্লের্ন প্রস্তাব যে, অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা
বেচারাম তেলী লউন সম্পাদকী তস্তা;
নিধিরাম সন্দার ও কুড়োরাম পোন্দার
কল্লের্ন তাতে ‘দ্বিতীয়’ ও পড়লে করতালি,
শ্রীবেচারাম তস্তার উপর বসলেন গিয়ে খালি।

উঠে বেচারাম তখন একটুখানি কেসে,
বল্লের্ন অতি বড় গোঁফে অতি ছোট হেসে—
“হে ভদ্রসমাজ! যে কারণে আজ
সমবেত সবে—সবাই জানেন সে কি কাজ।
এই সভায় হয় আলোচ্য বিষয়—
রমণীদের কথিত দাসত্ব ও অবরোধ ও হীনতা;
বিবেচ্য—কত দূর দেয় স্বাধীনতা;
কত দূর যে অনিষ্টকর পদরূষ ও স্বাধীন সমতা,
কি কারণে বেড়ে যাচ্ছে নারীজাতির ক্ষমতা;
আমি সেই জন্য মান্য এবং গণ্য
নসীরাম পালকে ডাকি, অদ্য তৎসম্বন্ধে
পড়তে অবিলম্বে তাহার রচিত প্রবন্ধে।”

উঠলেন তখন নসীরাম রক্ষিতে হিন্দুধর্ম,
(আমরা দিব আজি শূন্য সে বক্তৃতার মর্ম)
—“চেয়ারম্যান ও ভদ্রগণ—

এ বিষয়টি খুব শক্ত
আমি ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধিশূন্য ব্যক্তি;—
কিন্তু যখন গড়াচ্ছে ঐ আর্য মাতার রক্ত,
শত ক্ষত হ’তে; যখন গিয়াছেন মা মোহ;
রাস্তাতে প্রস্তরখণ্ড ‘চীৎকারে’ “বিদ্রোহ”;
(হে পাঠক, অনুবাদ এটি সেক্ষপীয়র থেকে)
ধর্মপ্রস্ট দুরাচার সেই পাপাত্মাদের দেখে
যখন শাস্ত্র কাঁদে, এবং হিন্দুধর্ম লুকায়
অরণ্যে লজ্জাতে; যখন স্নেহ প্রীতি শূন্য
তীর তাপে; এবং যবে নীতিও হয় শীর্ণ;
অবিদ্যাও করে ঘোরা তমসা বিকীর্ণ;

তখন উঁচত এবং—এবং—নিতান্ত কর্তব্য
এ বিষয়ে চিন্তা করেন প্রতি হিন্দু সভা।

“শ্রোতৃবর্গ আজ, এ নব্য সমাজ
ক্ষীণতেজা, হীনপ্রভ, নাই কিছুর শক্তি.
কেন?—কারণ আর্থের

নাইক আর্থধর্মের ভিত্তি।

পুরাতনী প্রথা, ঋষিগণের কথা,
এগুলিতে হিন্দুর নাইক কিছুরই মমতা।
একবার চক্ষু দুটি মেলি, দেখুন আর্থসভা,
উঠে যাচ্ছে বাল্যবিয়ে, বিধবার বৈধব্য;
ছেড়ে কক্ষে আস্থা, নিয়ে বাঁকা রাস্তা,
পাকাচ্ছে খিচুড়ি নিয়ে খুঁট স্পেন্সার বৃদ্ধ,
আবার তাতে জড়াচ্ছে এ হিন্দুধর্ম শৃঙ্খল:

ভদ্রবর্গ! আমাদের এই দেশেতে স্ত্রী জাতি
শিখছে তারা দিনে দিনে ভারি বদীয়তি:
স্ত্রীশিক্ষার নামে, সমাজ সংগ্রামে
ক্রমে নিচ্ছে কেড়ে তারা পুরুষদিগের রাজ্য,
ছেড়ে রন্ধনাদি যত তাদের উঁচত কার্য।

“গর্দাকতক চামায়, জানি না কি আশায়,
পোষা যত কালসর্প পুরুষদিগের বাসায়,
—কতিপয় বিদ্রোহী সেনা স্বর্ণময় এ বঙ্গে,
কচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র নারীজাতির সঙ্গে।

যত মূর্খ ঘোর, করে ভারি জোর
বড় কল্লো বাড়ীর সকল গবাক্ষ ও দোর,
অন্তঃপুরের সনাতন সেই
পাঁচিলগুলো ভাঙলো;
হাস্তাকুড়কে কল্লো বাগান,
চালা কল্লো ‘বাঙলো’;
মেয়েদের পরালো জুতো,
শাড়ীর বাড়ালো বহর;

জ্যাকেট দিইয়ে গায়ে বেড়ায়
দেখিয়ে নিম্নে সহর;
দিচ্ছে তাদের শিক্ষা, দেওয়াচ্ছে পরীক্ষা:
স্ত্রীদের শিক্ষার নামে তাদের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা,
গোল্লাই দিচ্ছে হিন্দুধর্ম—সনাতনী প্রথা।

১০

“স্ত্রীদের স্বাধীনতা? সে কি রকম কথা:
তাঁরা কি সব যাবেন চলে, যথা ইচ্ছা তথা?
স্ত্রীরা স্বাধীনই—গৃহপ্রাচীর ভিতরে;
তাঁদের ত অপ্রতিহত রাজত্ব অন্দরে;
তাঁরাই ত ব্রাহ্মণী দাসীর রক্ষক কিম্বা হস্ত্রী;
তাঁরাই স্বামীদিগের হচ্চেন সর্বকার্যে মন্ত্রী।
শুদ্ধ মন্ত্রী?—অনেক সময় স্বামীদিগের প্রভু:
কখন দেন খেতে [হাস্য] নাই দেন বা কভু:
বিনা স্ত্রীর সাহায্য, হয় না কোন কার্য;
শয়নঘরে তাঁদের ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য;
ভাঁড়ারঘরে তাঁদের ত অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা,
রান্নাঘরে আইন ত তাঁদের একটি কথা।

১১

“তাঁদেরই দাপোটে, বকুনির চোটে,
মাথা থেকে পা পর্যন্ত সদাই কেঁপে ওঠে:
ঘরের মধ্যে অবিলম্বে অগ্নিনদী ছোটে।
তাঁহাদের জ্বালায় অনেকে ত পালায়
শূন্যে ছিও দেখেছিও গো ও অশ্বশালায়,
মাঠে, বনে [শোন শোন] পগারে ও নালায়।
তাঁরা আবার অধীন নাকি?

হা কলি!—হা ধর্ম!
পুরুষ তাঁদের সেবায় ব্যস্ত
ছেড়ে সকল কর্ম।
গহনাটি দিতে দিতে
তাঁদের চারু অঙ্গে,
নাকের জলটি মিশে যায় তার
চখের জলের সঙ্গে।
তাঁদের জন্য ব্যস্ত তাঁদের ভয়ে চম্বত।
ভবর্গবে ঘুরপাক খাচ্ছে পুরুষরা সমস্ত।

১২

“স্ত্রীস্বাধীনতা কি আছে কিছু বাকী :
গাড়ের উপর ছেড়ে তাঁরা

মাথায় চড়বেন নাকি?
তারাই ত সব প্রভু. এবং আমরাই ত সব দাস,
খেতে দিলে খাই নইলে রহি উপবাস:—
তাঁরাই ‘আহার বিহার’ শয্যা—

পুরুষদিগের গতি;
আমরাই ত সব ভার্য্যা তাঁদের—
তাঁরাই ত সব পতি।

১৩

‘গুটিকতক নব্য বন্য অর্থসভা
বলেন আরও স্বাধীনতা দেওয়াট কতব্য।
ভাবেন এখন পুরুষ করুক স্ত্রীদের পরিচর্যা
ভাবেন স্ত্রীরা দেবতা—ওঃ—

[কি লজ্জা কি লজ্জা]!

আর এই পুরুষ?—এসেছেন সব তাঁরা বঙ্গদেশে
‘সুমাত্রা’ ‘বোর্নিও’ থেকে বন্যায় টন্যায় ভেসে।
তাঁরা ভাবেন পুরুষ বন্ধ থাকুক অন্তঃপুরে,
এবং স্ত্রীরা ‘ফিটন’ চ’ড়ে বেড়ান সহর ঘুরে;
এইরূপ যদি স্ত্রীরা দেখেন

কেবল বাইরের আলো,
সেটা কি সুবিধার হবে, হবে কি তা ভালো?

১৪

“ভদ্রবর্গ, এই ত গেল স্ত্রীদের স্বাধীনতা।
সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে তাঁদের শিক্ষার কথা।
স্ত্রীজাতিটা—বলতে বেশী হবে না ক আমাদের
বেজায় রকম ফাজিল এবং

ফক্কড় এবং ড্যামাকে।

শিখলে লেখা পড়া

(তাঁদের) মেজাজ হবে কড়া,
মাথায় উঠবে রাধাবাড়া শীঘ্রই নিঃসন্দ’
স্বামীদেরও ক্রমে হ’বে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

৩৬

১৫

‘এখনও ত তবু তারা রাঁধে কভু;
কিন্তু যদি তারা জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে,—পৃথিবী জোরে. ভোঁভোঁ ক’রে ঘোরে;
চাঁদে রাহুভায়া শূন্য তারি ছায়া;
শোনে—বাষ্পবলে রেল ও স্টিমার চলে;
কিম্বা যদি জেনে ফেলে ও আর ২য়ে ৭;
তা হ’লে কি ভাব তারা রেঁধে দেবে ভাত?
হাঁড়িকুড়ি ছুঁড়ে ফেলে আঁস্তাকুড়ে
দুই কথায় স্বামীদিগের দিয়ে দেবে তুড়ে;
হাতা বোড়ি রেখে, ‘রুজ’ পাউডার মেখে,
প’রে মোজা বুট. ক’রে সবায় হুট,
পুরুষদিগের রাজ্যমাজ্য ক’রে সবায় লুট,
অনায়াসে ও নির্বিঘ্নে দিয়ে একটি ছুট.
নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চ’লে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

১৬

“বন্ধুবর্গ এক্ষণ করি পর্যবেক্ষণ
শিক্ষিতাদের বাড়ীর মধ্যে অবস্থাটা দেখুন—
স্ত্রীরা এখন প্রাতে ওঠে, রান্নাবান্না ছেড়ে,
স্বামীর হস্ত থেকে খবর কাগজটি নেয় কেড়ে;
ছেড়ে লুচি ভাজা, রাঁধা, তাম্বুল সাজা,
ছেড়ে মেঝে টেবিলে ঝাঁট ও বাসন কুশন মাজা,
গৃহিণীরা এখন যেন নবাব কিম্বা রাজা।
বাজান কেউ বা পিয়ানো;

আর কেউ বা গান “আ-পেয়ালা
মুখে ভরে দে”—আর বাজান

কেউ বা ব’সে বেহালা।
কেউ বা আছেন মাইকেলে,

কেউ সেক্সপীয়রে মেতে,
কাউকে আন্তে ঘরে,

হয় বা সিভিল কোর্টে যেতে।

১৭

“ঢাকাই কাপড় ছেড়ে, এখন পরেন বম্বে শাড়ী
পরেন কোমরে বেল্ট ফিতে, চন্দ্রহার ছাড়ি:

ব্যাং মল ছেড়ে, দিচ্ছেন এখন

জুতো মোজা পায়ে;
সোনার গহনা ছেড়ে সবাই
জ্যাকেট পরেন গায়ে;
চারি ভরে যে অণ্ডলটি ঝুলত তাঁদের কাঁধে,
সে চার, অণ্ডলটি এখন রোচাটি দিয়ে বাঁধে।
নাকের নলক রেখে, রুজ ও পাউডার মেখে,
বাইরের ঘরে বসে খাসা আরাম চ্যারে বেকে,
কার্যকর্ম ছেড়ে চক্ষু বন্ধ করে অল্প,
পড়েন উপন্যাস কিম্বা করেন মিলে গল্প।

১৮

“প্রাচীর গেল উড়ে, চারি দিকে জুড়ে,
দালানের বারান্দা হ’ল, বাগান আঁস্তাকুড়ে:
রান্নাঘরটি চলে গেল দুই যোজন দূরে,
দূরে থাকত যেই স্থানটি এল তা শিউরে!
ভিতর বাইরের তফাৎ হ’ল দুয়োর পন্দা মাত্র,
তা ফুড়েও স্ত্রীরা বাইরে আসে দিবারণ;
যথায় ঝুলত উর্গনাভ সেথায় ঝোলে পাখা,
দেওয়াল থেকে উঠে গেল কৃষ্ণ রাধা আঁকা:
তক্তোপোষে ছেড়ে বসাই আনে স্প্রিঙের খাটে,
তক্তার পাটি মেঝেয় পেতে তার উপরে হাঁটে;
ছেড়ে ঠান্ডা মেঝে, স্ত্রীরা বিবি সেজে
মিলে ক’টি এয়ারে, বসেন এখন চেয়ারে;
ছেড়ে খাসা পা ছড়ান—হোল রে কি দশা—
হচ্ছে এখন গিন্নীদিগের পা ঝুলিয়ে বসা!
যেন তাঁরা এক এক রাণী কিম্বা যেন দেবী—
আমরা যেন কৃতার্থ হই তাঁদের চরণ সেবি’।

১৯

বাহিরে বোরিয়েও স্ত্রীদের মনে নাই আঁটে;
বেড়াতে যান ফিটিন করে পথে ঘাটে মাঠে।
তাঁদের সে অসূর্য্যম্পশ্য পীতরূপরাশি
দেখে কিনা রাস্তার লোকে পাড়াপ্রতিবাসী।
ঘোমটা গেল উঠে—হায় রে—

প্রাণে হয় যে ক্লোথ;
ঘণ্টা দয়া লজ্জা পশে যেন মজ্জা,
নাই কি রে নব্যবঙ্গের হিতাহিত বোধ?—”
শ্রীনসীরাম বসলেন শেষে প’ড়ি উক্ত গন্যে,
ভয়ঙ্করী কালাকারী প্রশংসারই মধ্যে।

২০

অবশেষে তক্তাখানি পশ্চাতেতে ঠেলি,
উঠলেন তক্তা-অধিকারী বেচারাম তেলী—
“আজি সন্ধ্যাকাল নসীরাম পাল
পড়লেন যেই অতি ‘বিস্বান্’ প্রবন্ধটি খাটী,
তাহা অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটি।

২১

“ভদ্রগণ এ বিষয়টি যদি কিঞ্চিৎ রিঙিন,
কিন্তু হ’য়ে দাঁড়াচ্ছে ত ক্রমে ক্রমে সঙিন:
নারীজাতির ক্রমে শক্তি যাচ্ছে জ’মে
স্ত্রীদের তেজটা যাচ্ছে বে’ড়ে.

পুরুষদিগের ক্রমে’।
হ’য়ে উঠছে স্ত্রীজাতিটা ভারি বেজায় ফক্কড়—
আমাদের সঙ্গে এসে দিতে চাচ্ছে টক্কর।
সে দিন প্রাতে বল্লাম “দেখ গিন্নী খুলে দোর,
সূর্য্য উঠল কি না.— অর্থাৎ হ’ল কি না ভোর?”
—বলে “সূর্য্য উঠেছে কি’ বল এতক্ষণ—
হ’ল সমান্ত কি ধরার দৈনিক আবর্তন।”

২২

“শুনলেন ব্যাপারখানা?—সবাই—

জানেন স্ত্রীদের স্বভাব
ঐ প্রকারই—সুবুদ্ধিরও তাঁদের বিশেষ অভাব।
কিন্তু একটি সঙিন কথা—স্ত্রীজাতিটা অতি
খল ও কুর—ও [শোন শোন]—ও কপটমতি।
এ কথাতে সেক্ষপীয়র বাইরন পোপাদি
সর্ব্বদেশে কবিরা সম্মত সর্ব্ববাদী।
স্ত্রীজাতির এক কর্ম্ম স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্ম
স্বামিসেবা—সতীত্বই রমণীদের বর্ম্ম;—
স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিলে, নাইক বিচিত্র,
হবে কলঙ্কিত তাঁদের অমূল্য চরিত্র।
পরপুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীরা কইলে কথা,
পাতিব্রতের অবধারিত হইবে অন্যথা।
স্ত্রীজাতি-হৃদয় প্রতারণাময়,
তাহাদের হায় কিছুমাত্র নাইক কুত্র বিশ্বাস।”
—ছাড়লেন হেথা বক্তা একটি বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস।

২৩

“বন্ধুসকল—ইহার যদি উদাহরণ চান,
দেখবেন ইয়ুরোপে এটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ!
আরও আমি অবগত আছি, বার মাস
করে না ক তাদের স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে বাস,
ইয়ুরোপখণ্ডে; বরং দণ্ডে দণ্ডে—
স্বামীদিগে মারে চাবুক কর্তে চাহে গর্দল,
বেড়ায় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে চক্ষে দিয়ে ঠুলি।
আমি এটি জানি অতি ধ্রুব এবং সত্য,—
ইংরাজ ভাষায়ই নাইক কথা—‘পাতিব্রতা’;
পাতিব্রতা আছে—হিন্দুরই সমাজে—
(আরও বোধ হয় কিছুর কিছু

মোসলমানদের মাঝে)

কেন? কারণ তাদের স্ত্রীরা ঘরে রহে বন্ধ;
কেন?—কারণ তারা শোঁকে আঁস্তাকুড়ের গন্ধ;
কারণ তারা অবরুদ্ধ অষ্ট বছর থেকে;
কারণ তাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্যা শেখে;
কারণ নাইক লুকিয়ে ভিন্ন

পুরুষ পানে চাওয়া;

কারণ লাগে নাক মুখে আলো কিম্বা হাওয়া।’

২৪

“কেউ বা বলেন স্ত্রীদিগে দাও ধর্মনীতি শিক্ষা,
তৎপরে দাও স্বাধীনতা—প্রকাণ্ড পরীক্ষা!
স্ত্রীজাতিকে ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যাহা,
গরুটাকে হরিনামটি শিক্ষা দেওয়াও তাহা।
[ভয়ঙ্করী প্রশংসা ও অতি দীর্ঘ হাস্য]

অতএব ভদ্রগণ স্ত্রীদের উচিত কার্য দাস্য;
স্ত্রীদের উচিত বাসস্থান সেই জানালাহীন ঘরে;
স্ত্রীদের যোগ্য বিহারভূমি প্রাচীরভিতরে;
স্ত্রীদের বাক্যলাপটি শূন্য

স্বামীর সঙ্গেই সাজে;

স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শূন্য রান্নাঘরের মাঝে;
পেলে বেশী আলো রংটা হবে কালো;
বেশী হাওয়াও নয়ক তাঁদের

স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা—ভয়ঙ্কর এ কার্য,
বিষসম বন্ধুবর্গ ইহা পরিহার্য।
দেখতে পাবেন সবাই ইহা মনোরূপ চক্ষে,
ইহা ন্যায়ের বিবেকের ও ধর্মেরও বিপক্ষে।”

২৫

প’ড়ে গেলেন সভাপতি সংজ্ঞাহীনপ্রায়
ভাবোন্মাদে চ্যারের উপর; পড়ল সে সভায়
বজ্রসম করতালি!—শান্ত হ’লে সবে
সভাস্থলে—ক্রমে শেষে উঠে বল্লেন তবে
কেনারাম কর্মকার—“যে অদ্য সভার অতি
ধন্যবাদপত্র মাননীয় সভাপতি।”

শ্রীনিধিরাম সন্দার

শ্রীকুড়োরাম পোন্দার

‘দ্বিতীয়’ করিলে, তাতে—চেয়ারখানি ঠেলি,
সভাভঙ্গ কল্লেন উঠে বেচারাম তেলী।

কাল যজ্ঞ

[অনুষ্টুপ্ ছন্দ]

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা॥
আসিলা যে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরনে কুর্তি, কাহারো উড়ুনী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্,

কাহারো সাহেবী ধড়া॥

কাহারো সম্মুখে টেড়ী কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুঁটি—কা কস্য পরিবেদনা॥

এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে।

বস্তুতা করিয়া—বাবা লড়াই করিতে ফতে॥

তন্মধ্যে মুখসর্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত

রেজলশন নিম্মাণে বস্তুতায় মহারথী॥

এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইল বস্তুতা সুর্দ।

ইংরাজের মহা কেছা ইংরাজি রেজলশনে॥

ইংরাজিতে কথাবার্তা ইংরাজিতে চ বস্তুতা।

প্যাণ্ডলের তলে আজি ইংরাজিতে খই ফুটে॥

বাহবা বাহবা শব্দ সমুখিত সভাস্থলে।

বাহবা বাহবা শব্দ করতালি চটাপট॥

এরূপ শূন্য ইংরাজি এরূপ উপমা ছটা।

এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বস্তুতা॥

সিসিরো, পিট, বর্কীদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।

একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে॥

চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহিব।

পড়িয়া এ মহাবার্তা আতঙ্কে ত বিমূর্ছিত॥

উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
 এ জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি' অসম্ভব॥
 উঠবে উঠবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
 বৃষ্টি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন॥
 লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
 পোর্টলা পুটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট॥
 পরপ্রাত হতে রাজ্য আর্ষ্যজাতির সংস্থিত।
 পরপ্রাত হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম সনাতন॥
 বিস্তীর্ণ আর্ষ্যসাম্রাজ্যে সবার সম্মতিক্রমে।
 রেজলুশন নিষ্পাতা বাঙালী হইলা প্রভু॥
 আশ্চর্যরূপ রাজত্ব বাঙালীর বলে সবে।
 কেবল বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি॥
 একদা আসি' আফ্গান আক্রমিল হি ভারত।
 মহাকাবু সবে খেয়ে বাঙালী বক্তৃতা হুড়া॥
 তৎপরে রুশিয়া আসি গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
 বাঙালী বক্তৃতা চোটে করে দেশে পলায়ন॥
 বাঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলন্ড জার্মানী।
 কাঁপে ফরাস মাকী'ন কাঁপে সসাগরা ধরা॥
 ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল সর্বত্র এ মহীতলে।
 ভরিয়া গেল এ দেশে মীটিঙ রেজলুশনে॥
 একদা তু বাঙালীর হইল বড় মূর্খকল।
 কটতর্ক উঠে এক মহাম্বন্দ্র ঘরে ঘরে॥
 উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটীলা অতি।
 শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ॥
 আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
 সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে॥
 আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
 আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট॥
 কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
 সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে॥
 পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
 নিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে॥
 বাঙালী মহিমাকীর্তিকলাপকাহিনী যদি।
 শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কর্ণবিমর্দন কাহিনী

[পঙ্কটিকা ছন্দ]

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
 কর্ণবিমর্দন মর্ম কি গঢ়?

কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
 যদি না তা আকর্ষণ জন্য?
 যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
 অপর করে নয় আদরিচিহ্ন:
 তবু যদি সাহিব অল্পে সল্পে
 টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে:
 অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে—
 কান মলা হয় গিলিতে হেসে।
 বাবা সে দশ ইঁপ প্রস্থ—
 বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
 শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
 আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?
 কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
 যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
 হুজুর হুজুর বলি' জীবনমরণে
 র'ব পড়ি' ইন্দুনিন্দিত চরণে:
 —রহিও খুসি, ঘৃষি আস'টা, রাগে
 মেরো নাকো কেবল নাকে।
 ও ঘৃষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
 ত্রিভুবন: শূনি শূধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ,
 ও ঘৃষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
 একেবারে মাথা ঘোরে।
 কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে।
 ভূমিবলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
 পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি।
 পড়িলে নাকে রক্তারক্তি!
 শূধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
 শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে।
 বসিয়া বসিয়া নিজঘরমধ্যে
 লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে—
 “সমুচিত, তুলিয়া ঘৃষি নিজহস্তে
 মারা বেগে অরাস্তি মস্তে”;
 জানো না সে স্থানে, একা
 লাগে প্রথমত ভেবা চেকা:
 যখন পরাজয় খলু অনিবার্য—
 তখন কি যুদ্ধটি বৃষ্টির কার্য?
 না হইলে সমসিঙন অবস্থা,
 বাক্যে বীরস্বৈ হি অতি সস্তা।
 মাখি তৈল ঘন কৃষ্ণত কেশে;
 স্নানস্নিগ্ধ উদরটা, ঠেসে
 ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
 গণ্ডে পানে ভরিয়া তূর্ণ

চাপ্‌কান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হে পদ্রুমানক্রম ভূতা,
নাকে কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোনরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
রহি না ঘর্ষি ঘর্ষি কাছাকাছি।

নিত্যানন্দের উপাখ্যান

সদানন্দের পুত্র, মহানন্দের দৌহিত্র,
প্রেমানন্দের ভাগিনেয়, নিত্যানন্দ মিত্র,—
পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে সিদ্ধি এনে কিনে,
কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিনে,
খেলেন বেটে ছটাক খানিক

ঠান্ডা জলে গুলে,
দুপুর বেলায়।—শেষে গিয়ে বিছানাতে শুলে,
সবাই বল্ল, “নিত্যানন্দ উপর গিয়ে চটাৎ,
এমন দিনে দুপুর বেলায় শুলো কেন হঠাৎ!”
নিত্যানন্দ তাঁহার বাপের একটিমাত্র ছেলে,
মা বাপের আদুরে:—বেড়ান দিবারাত্র খেলে;
ঘরে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়,

করেন যা তাঁর খুঁসি,
মেরে বেড়ান যারে তারে

লাখি চাপড় ঘুঁসি।—
পাড়াশুদ্ধ বাতিব্যস্ত নিত্যানন্দের জ্বালায়,
ইচ্ছা—ঘটি বাটী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালায়।
নিতাই ভাবলেন, “সবাই বলে,

সিদ্ধি খেলে হাসে,
দেখি দিকি আমার হাসি কেমন করে আসে।”
ভেবে নিত্যানন্দ খানিক সিদ্ধি এনে কিনে,
খেলেন গুলে দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিনে।
খেয়ে অতি গম্ভীর হয়ে বাড়ীর মধ্যের উপর,
শুলেন গিয়ে বিছানাতে:—বেলা তখন দুপুর।

ওমা! যেমন তিনি নিজের বিছানাতে গিয়ে,
শুয়েছেন এক মোটা নরম বালিশ মাথায় দিয়ে,
নাসিকার্ট গুঁজে, একটি পাশের বালিশ ঠেসে,
অর্মানি কি দুর্মিনিটে ফেল্লেন তিনি হেসে!
বল্লেন, “সে কি! বিছানাতে শয়নমাত্র হাসি।
—আচ্ছা একবার নীচের তলায়

গিয়ে ঘুরে আসি।”

বলে উঠে বিদ্যুৎস্ববেগে নেমে সিঁড়ি দিয়ে,
বাইরের ঘরের বারান্দাতে পাটির উপর গিয়ে,
বসলেন গম্ভীর ভাবে; কিন্তু

সময় বসতে যাবার,
‘ফি-ক্’ করে নিত্যানন্দ হেসে ফেল্লেন আবার।
বল্লেন নিত্যানন্দ, “এ কি এলাম চলে নীচে,
চেষ্টা করলাম গম্ভীর হতে,—তাও হ’ল মিছে?
আচ্ছা দেখি”—বলে তিনি মাঠে গেলেন ছুটে,
বসলেন গম্ভীর ভাবে

একটা গাছের উপর উঠে।
কিন্তু বৃথা চেষ্টা:—তিনি যতই চেষ্টা করেন,
ততই তিনি একেবারে হেসে চলে পড়েন।
যেথায়ই যান না, হাসি তাঁকে কিন্তু নাহি ছাড়ে,
জোঁকের মত কামড়ে যেন রৈল তাঁহার ঘাড়ে;
তিনি বসেন সেও বসে; তিনি ওঠেন, ওঠে:
তিনি দাঁড়ান, দাঁড়ায়; লাফান, লাফায়:

ছোটেন, ছোটেন।
নিতাই তখন প্রমাদ গ’ণে বল্লেন, “এ কি হৈল?
হাসিটা যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপেই রৈল!”
সকল উদ্যম হ’ল বৃথা—থামে না তাঁর হাসি,
এলেন ছুটে তাঁর মা, দিদি, মামী, পিসী, মাসী,
বাবা, খুড়ো, ঠাকুরদাদা, পিসে: মেসো, মামা,
বন্ধু, ডাক্তার, দাসী, চাকর, রাঁধুনী, খানসামা,
গরু, বাছুর; কিন্তু হাসি নাহি কমে তাঁহার;
হাসতে লাগলেন ক্রমাগত—ভুলে নিদ্রা আহার।
“ব্যাপারখানাটা কি নিতাই? ক্ষিপ্তের মত হেন”
—সবাই করেন প্রশ্ন—

“নিতাই এত হাস্‌ছ কেন?”
“হাস্‌ছি আবার কেন?—হাঃ হাঃ—
অদ্য—হিঃ হিঃ—ভুলে
খেলাম খানিক সিদ্ধি—হঃ হঃ—

ঠান্ডা জলে গুলে:—
সিদ্ধি গুলে খেয়ে—হেঁ হেঁ—এত হাসি পায়,
জান্লে—হোঃ হোঃ—কি আর—

নিতাই সিদ্ধি গুলে খায়?
বাঁচাও—ঠিঃ ঠিঃ—কোন রূপে,
নইলে হেলায় ফেলায়,
নিতাই—ক্ষিঃ ক্ষিঃ—হেসে মরে
দিনে দুপুর বেলায়!”

ইহা বলে দারুণ হাস্‌ল নিত্যানন্দ মিত্র।
কত যত্ন মত ঔষধ কি চেষ্টা চরিত্র,—

বাড়ীশুদ্ধ বিরাট্ ব্যাপার—সবাই প্রয়াসী,
সবাই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে গেল থামাতে সে হাসি।
বাবা বলেন, “হেস না-ক

গোপাল আমার আদরে!”

মাও বলেন, “থাম, সোনা,

বাছা আমার যাদু রে!”

পিসী বলেন, “থাক বাবা

চুপ্‌টি ক’রে খানিক!”

মাসী বলেন, “সোনার চাঁদটি—

থামো আমার মাণিক।”

সকল চেষ্টা বিফল হ’ল। শেষে তাঁহার খুড়ী,
(নিতাই তাঁরে ঠাটা ক’রে বল্‌ত

‘কালো বুড়ী’—

কারণ তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন বর্ণে মসী,
বয়সেতেও অকালবৃদ্ধ, শুদ্ধকতাতে ঘসী!)

বাহির কল্লেন নতন উপায়

মিনিট চারিক ভেবে।—

বল্লেন, “বাড়ীশুদ্ধ নিতাই পাগল ক’রে দেবে,
এমন ক’রে লক্ষ্মীছাড়া নিত্য যদি হাসে।

যা বলি তা কত্বে পার? নয়ক শক্তটা সে
এমন কিছ্‌; সকল নোকে চিম্‌টি নাগাও পায়ে;

তপ্ত নোয়া নাগাও হাতে; নবণ দাও গায়ে?
চখে নাগাও নংকা মরিচ;—থামবে তবে সিনা?

নাথি মারো জোরে—দেখি হাসি থামে কি না!
ষন্ডা নম্বা ছোঁড়া, নেইক বৃদ্ধি কড়াটোকো;

নোখাপড়ায় ঢেঁকি—আবার

হাস্‌তে নাগলো দেখো।”

খুড়ীর কথাই শূন্তে বাধা

হলেন সবাই শেষে;—

এলো, লংকা তপ্ত লৌহ তাঁহার উপদেশে।
দেখে শূনেই নিত্যানন্দের ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ বৃক,

থেমে গেল হাসি এবং শূকিয়ে গেল মূখ;—

উঠে তিনি বল্লেন, “আমার সেরে গেছে হাসি,
কিছ্‌ কত্বে হবে না-ক—এখন তবে আসি!”

মস্ম

ছেলোপিলের উপদ্রবটা কতক আগে ভাগে,
বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে—ভালো লাগে।
বাড়ে যখন অধিক মাত্রায়, দৃষ্টমি কি বাতিক,
প্রয়োগ কত্বে হবে তখন ঔষধ এলোপ্যাথিক!

শুদ্ধদেব

টিয়া বলে “গাইতে কেহই কিছ্‌ই না জানে”;
দোয়েল কোকিল ঘৃঘৃ শ্যামা যখন ধরে গানে,
টিয়া কাছে গিয়ে অমনি করে চেঁচামিচি,
এবং তার (এ) ডানা তুলে তারে বলে “ছি ছি”।

পিকেরা একদা মিলে অনেকখানি ভেবে,
যুক্তি ক’রে করজোড়ে কহে শুদ্ধদেবে,—
“প্রভুর আলোচনা যেহুপ্‌ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদের গায়ক;
প্রভু একবার দয়া ক’রে গেয়ে দেখান দিকি,
আমরা (শিখে নি ত কিছ্‌ই)

শূনে কিছ্‌ শিখি।”

টিয়া মাথা চুলকোয়, ভেবে

পায় না বল্‌বে কি যে;

শেষে কহে, “মহাশয়গণ

আমি অর্থাৎ নিজে—

বড় একটা গাই না—তবে—

বল্‌তে বা কি হানি—

মহাশয়গণ আমি খাসা ছি ছি কত্বে জানি।”

সমাপ্ত

হাসির গান

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

তানসান্-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল
নব রত্ন ন' ভাই;
আর, তানসান মহা ওস্তাদ
—এলেন তাঁহার সভায়:
অ—অর্থাৎ আস্তেন নিশ্চয় তানসান
বিক্রমাদিত্যের 'কোটে'—
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তানসান
জন্মান নি ক মোটে।
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি
ধিন্তাকি ধিন্তাকি,
মেও এও* এও*।

যা হোক, এলেন তানসান কলিকাতায়
চোড়ে রেলের গাড়ী;
আর, 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন
বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়,
কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয় নি;
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য
রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি
ধিন্তাকি ধিন্তাকি—
মেও এও* এও*।

যা হোক, এলেন তানসান রাজার কাছে
দেখাতে ওস্তাদি;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—
'পিয়ানো' ইত্যাদি;—
অ—অর্থাৎ আন্তেন নিশ্চয়,
কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি

যে, হয় নি ক তানসানের সম্মুখে
'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।।
ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—
মেও এও* এও*।

যা হোক, তানসান গাইলেন এমন মঞ্জার,
রাজা গেলেন ভিজ্জে;
আর, গাইলেন এমন দীপক, তানসান
জ্বলে উঠলেন নিজে;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজ্জে,
তানসান উঠতেন জ্বলে;
কিন্তু, রাজার ছিল 'ওয়াটারপ্রুফ';
আর তানসান এলেন চ'লে।
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি
ধিন্তাকি ধিন্তাকি—
মেও এও* এও*।

৫

হ'ল, সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ
তানসানের গীতি বাদ্য;
আর, আজও রোজ্ রোজ্ অনেক ওস্তাদ
করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ;
অ—অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—
তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে?
আর, তানসান মুসলমান,
তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করে হবে?
(কোরাস) তা ধিন্তাকি ধিন্তাকি
ধিন্তাকি ধিন্তাকি,—
মেও এও* এও*।

ইরাণ দেশের কাজী

আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
আমরা এসেছি একটা নতুন আইন
প্রচার কর্তে আজি।
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল,
হউক মিথ্যা হউক ভুল;—

তোমাদের হবে বলিতে তাতেই
 “বাহবা, বাহবা, বা জি!”
 ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়,
 পাশা মিত্যাবাদী;
 পাশা ইমামে বিবাদ বাধিলে,
 পাশাই অপরাধী।
 পাশা ঠেকিলে ইমাম গায়,
 মাথাটি বাঁচান হইবে দায়;—
 পাশার শির কাটিয়া লইলে,
 হইতে হইবে রাজি।
 আমরা সবাই দেখেছি ইমাম
 বিচার করিয়া স্কন্ধ—
 ইমাম সবাই বুদ্ধিমান,
 আর পাশা সবাই মূর্খ;
 পাশার তবে হইল রদ—
 ব্যতীত কুলী ও কেরানী পদ:
 হাকিম হাকিম হইবে সবাই
 হোসেন হাসেন হাজী।
 দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক
 কারসেট্জী কি মেটা—
 আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—
 সবাই সমান বেটা:
 তবে, যে বেটা বলিবে, “হাঁ হাঁ তা হোক”
 সে বেটা কতক ভদ্রলোক;
 আর, যে বেটা বলিবে “তানানানানানা”
 সে বেটা বেজায় পাজী।

রাম-বনবাস

এ কি হেরি সর্বনাশ!
 রাম, তুই হ'বি বনবাস—
 এ কি হেরি সর্বনাশ!
 তোরে ছেড়ে র'বে না প্রাণ—
 আমার ধুব এ বিশ্বাস।
 এ কি হেরি সর্বনাশ!
 যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
 সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
 ভালো এক জোড়া পাশা,
 আর ঐ (ওরে) ভালো দু' জোড়া তাস।
 এ কি হেরি সর্বনাশ!
 ওরে, আমি যদি তুই হইতাম,
 পোর্টম্যান্টর ভিতরে নিতাম

বাকিমের ঐ খানকতক
 (ওরে) ভালো উপন্যাস।
 এ কি হেরি সর্বনাশ!
 ও রাম, দেখিস্ তোর ঐ বাপ মাকে
 চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
 আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে,
 (ওরে) ‘পোটেটো চপ্’ খাস।
 এ কি হেরি সর্বনাশ!

দুর্ভাসা

পুরাকালে ছিল, শূনি,
 দুর্ভাসা নামেতে মূনি—
 আজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
 দাড়িগুলো ভারি কটা:
 পারিত না বটে লিখিতে কবিতা
 মহর্ষি বাস্মীকি চাইতে:
 পারিত না বটে নারদের মত
 বাজাতে নাচিতে গাইতে:
 কিন্তু ঋষি ভারি রোষে
 বিনা কারো কিছু দোষে,
 গালি দিত খুব কোসে;—
 কোরে দিত কারো ব্যবস্থা
 সুন্দর নানাবিধ ভালো খাদ্য:
 কোরে দিত কারো, বিনা
 বেশী ব্যয়ে, পিতৃপিতামহশ্রাদ্ধ:
 তার ভয়ে দিবানিশি
 বিকম্পিত দশ দিশি—
 এমনি বেয়াড়া ঋষি।

জিজিয়া কর

পাঁচশ' বছর এমনি করে
 আসছি সয়ে সমুদায়;
 এইটি কি আর সইবে না ক—
 দু' ঘা বেশী জুতার ঘায়?
 সেটা নিয়ে মিছে ভাবা;
 দিবি দু' ঘা, দে না বাবা!
 দু' ঘা বেশী, দু' ঘা কমে,
 এমনি কি আসে যায়।

তবে কিনা জুতোর গুতো
হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছুর নতুন রকম
কলে হ'ত উপকার;
ধর না যেমন, বেটা ব'লে
দিলি না হয় কানটা ম'লে:—
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা
প'ড়ে গেছে সকল গায়।

প'ড়ে আছি চরণতলায়
নাকটি গুঁজে অনেক কাল;
সেবে সবই, নই ত মানুষ,
আমরা সবাই ভেড়ার পাল;
যে যা করিস দেখিস চাচা,
মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে
দিস রে দুটো দুবেলায়।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব,
মোবা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা
তোদের বাড়ী তোদের ঘর:
মোরা বেটা মোরা পার্জি,
যা বলিস তাই আছি রাজি:—
রাজার নন্দিনী প্যারি,
যা বলিস তাই শোভা পায়।

খুসরোজ

আজি, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা
ত হবে বজায়:
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য এদিক্ ওদিক্
বুঝে চলাই:
—সাথে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে
বাবা বলায়।

আজি, এই শুভ রাত, জ্বালবো বাতি
ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে;
নৈলে যে চাকরি যাবে,
নৈলে যে চাকরি যাবে।
—আমাদের ভক্তি যা —এ যে গো
পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি,
নিয়ে আয় দিয়েসলাই:
—সাথে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

“জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র”
ব'লে জোরে ডংকা বাজাই;
পাহারা ফিচ্ছে দ্বারে,
সেটা যেন ভুলে না যাই:
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
প্রাণের দায়ে;
কি জানি পিছন থেকে
কখন ফাঁসি পড়ে গলায়:
—সাথে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আমরা সব “রাজভক্ত রাজভক্ত” ব'লে
চেঁচাই উচ্চ রবে:
কারণ সেটার যতই অভাব,
ততই সেটা বলতে হবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ মানের,
পেটের, প্রাণের দায়ে;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা
ছুটে পলায়:
—সাথে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

ভোলানাথ শূন্যে আছেন,—
ঈশ্বর তাঁরে স্নেহে রাখুন;

কালী জিব মেলিয়ে আছেন,
তা তিনি মেলিয়ে থাকুন;
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন
তিনি পটেই আঁকা;
আমরা সব নিয়ে শরণ
মোগলদেবের চরণতলায়,
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

কালো রূপ

কালো রূপে মজেছে এ মন।
ওগো, সে যে মিশ্‌মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো—অতি নিরূপম।
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুঁচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো;—
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ—
ওগো সেই কালো রঙ।
কালী কালো, মিশি কালো,
অমাবস্যার নিশি কালো;
গদাধরের পিসি কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ!
ওগো, সে কালোবরণ।

দশ অবতার

হরি, মৎস্য অবতारे ছিলেন জলে বাসা করি,
আর কুর্মা অবতारे পাঁকে ঋশিলেন হরি।
এলেন, বরাহাবতारे, উঠে জঙ্গল ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হলেন বিকাশ অর্ধনরে।
হলেন, বামনাবতারে নর—খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্য্য স্থাপেন রাজত্ব।
হলেন, রাম অবতারে হরি—প্রেমিক, ভক্ত, সৎ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি রচেন গীতা 'ভগবৎ'।
আর বৃন্দা অবতারে নিলেন যোগধর্ম শিখি,
আর, কাল্কি অবতারে হরি রাখিলেন টিকী।
তবে, টিকী রাখি' কর সব জীবন সফল,
আর, একবার টিকী নেড়ে "হরি হরি" বল।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে
"কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর রাধা বলে
"এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেগু"
আর—রাধা বলে
"ওহো—শুনে আমি মরে গেনু।
আমায় ধরো ধরো।"
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমায় সবে"
আর—রাধা বলে
"বটে! হ'ল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো"
আর—রাধা বলে
"তবু যদি না হ'তে মিশি কালো—
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মৃগধ ব্রজবালী"
আর—রাধা বলে
"ঘুম হচ্ছে না! এ ত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি"
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে আমায় কয়"
আর—রাধা বলে
"লোকের কথা ক'রো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা"
আর—রাধা বলে
"হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বলতেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর—রাধা বলে
"কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে"।

কৃষ্ণ বলে “এমন বর্ণ দেখি নি ত কভু”
 আর—রাধা বলে
 “হাঁ আজ সাবান মাখি নি ত তবু—
 নইলে আরও শাদা”।
 কৃষ্ণ বলে “তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে”
 আর—রাধা বলে
 “এসব কথা বল্লেই হত আগে—
 গোল ত মিটেই যেত।”

—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose ;
 মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
 আমরা স্বাধীন করি দেশ—
 আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
 করি খুব hate ও abuse ;
 কিন্তু সামনে সেলাম না করি
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose.

২। সামাজিক

REFORMED HINDOOS

যদি জানতে চাও আমরা কে,
 আমরা Reformed Hindoos.
 আমাদের চেনে না ক যে,
 Surely he is an awful goose ;

কেন না, আমরা Reformed Hindoos.
 It must be understood
 যে একটু heterodox আমাদের food ;
 কারণ, চলে মাঝে মাঝে
 ‘এ’টা, ‘ও’টা ‘সে’টা যখন
 we choose ;
 কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek
 তা এখনো কত্তে পারি নি ঠিক ;
 আর ছেড়েছি টীক, নইলে সাহেবরা বলে সব
 superstitious ও obtuse,
 —কিন্তু টীকিতে electricity নেই
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
 এ নয় English কি Bengali,
 করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে
 conversationএ use ;

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
 কোন ধর্মের ধারি না ধার :
 করি hoot alike the Hindoos,
 the Buddhists,
 the Mahomedans, Christians
 & Jews ;—
 কিন্তু ফলার ভোজে হিন্দু নই if you think,
 তা'লে you are an awful goose.

About female education,
 ও female emanacipation,
 আর infant marriage,
 আর widow remarriage
 আমাদের খুব enlightened views ;
 কিন্তু views মতে কাজ করি
 if you think,
 তা'লে you are an awful goose

You are not far wrong
 if you think,
 যে আমরা করি একটু বেশি drink,
 কিন্তু considering our
 evolution এর state,
 আমাদের morals নয় খুব loose ;
 আর about morals, we care
 a hang if you think,
 তা'লে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ,
 যে আমরা neither fish nor flesh ;

আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos;
আমরা বস্তুতায় য়ুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের সময় সব চুঁ চুঁস;
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাতফেত্তা

আমরা বিলাত-ফেত্তা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই.
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি.
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি.
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা" আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকলে ধরণ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি.
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি "সাহেব" না বলে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর.
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর.
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাদর:

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি.
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি.
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বুড়ি ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেঁটার হুঁটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।'

আমরা বিলেতফেত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই:
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু এ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি:
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

চম্পটির দল

চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা হবে।
একটু মেশাল রকম ভাবে।
আমরা ক'জন এইটি ভবে
যদি কিছু দেশী রং
রেখেছি সায়েবি ঢং:
একটু তবু নেটিভ গন্ধ,
কি কর্ব তা রবেই রবে।
ইংরাজীতে কহি কথা,
সেটা 'পাপার' উপদেশ:
হ্যাটা কোটা পরি কেন—
কারণ সেটা সভ্য বেশ;
চক্ষে কেন চসমা সাজ?—
কারণ সেটা ফ্যাশন আজ:—
চসমাশূন্য ছাশ্রমহল,
কোথায় কে দেখেছে কবে।
বঙ্গভাষা কহিতে শিখিছ,
বছর দু'দিন লাগবে আরো:
তবে এখন কইছি যে,
সে তোমরা যাতে বুঝতে পারো:

টোঁবিলেতে খাচ্ছি খানা
 কারণ সে সাহেবিয়ানা;
 খাই বা যদি শাক চর্চাড়ি
 টোঁবিলেতে খেতেই হবে।
 ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে
 তৈরি মোরা হ'চ্ছি ক্রমে.
 এদিকেও সংখ্যায় বাড়িছি
 বিনা কোন পরিশ্রমে;
 জানি না কি হবে শেষে,
 কোথায় বা চলিছি ভেসে;
 মাঝিশূন্য নৌকার উপর
 ভেসে যাচ্ছি ভবান্নবে।

নতুন কিছ্ করো

১

নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।
 নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
 পাগুলো সব উঁচু করে, মাথা দিয়ে হাঁটো;
 হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
 কিম্বা চিংপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো;
 ঘোড়াগাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকলে চড়ো,
 —নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
 কর শীগ্গির ধূতিচাদরনিবারণী সভা;
 প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে:
 ধূতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকলে:
 কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো:
 —নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
 হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো;
 আমরা যেন নেহাইং খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
 খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো;
 বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
 —নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।

আর কিছ্ না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো;
 কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো ভালো আরো!
 একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক;
 বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার,
 যা একটা কিছ্ হোক।
 যা হয়—একটা করো কিছ্ রকম নতুনতরো,
 —নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর,
 এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির,
 পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব;
 মর্ষে, না হয় মর্ষে,—একটা নতুন হবে খুব।
 নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো:—
 —নতুন কিছ্ করো, একটা নতুন কিছ্ করো।

হ'ল কি

১

হ'ল কি! এ হ'ল কি!—
 এ ত ভারি আশ্চর্য্য!
 বিলেত-ফের্তা টান্ছে হুঙ্কা,
 সিগারেট খাচ্ছে ভূশ্চর্য্য।
 হোটেলফের্তা মন্সেসফ ডাক্ছেন
 “মধুসূদন কংসারি”!
 চট্ চট্টির দোকান খুলে
 দস্তুরমত সংসারী!

ছেলের দল সব চস্মা পরে
 ব'সে আছেন কাটখোটা;
 সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে,
 বাঙালী 'নেক্টাইহ্যাট্ কোটা'
 পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত,
 ছেলেবেলায় খান নি কে?
 ভবনদীর পারে গিয়ে
 বিড়াল বস্ছেন আঁহিকে।

পদ্য গদ্য লিখছে সবাই,
কিন্ছে না ক কিন্তু কেই.
কাট্ছে বটে—পোকায় কিন্তু.
আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি
বাড়্ছে লম্বা চওড়াতে:
বিদ্যারঙ্গ দরকার শূন্থ
বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

৪

পদ্রুশরা সব শূন্থে ব'সে.
মেয়েরা আসর জম্কাচ্ছে.
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে.
শূনে তা' পীলে চম্কাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত,
প্রজা হচ্ছে জবন্দার:
মুনিব কচ্ছে 'আজ্ঞা হুজুর.'
চাকর কচ্ছেন 'খবন্দার'।

রাধাকৃষ্ণ রংগমণ্ডে
নাচ্ছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে;
শাস্ত্রবর্গ কোনই শাস্ত্রের
ধরেন না এক বর্গ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবর্গবে
বেশী মাত্রায় কর্ণধার।

নবকুলকামিনী

ক'টি নবকুলকামিনী।
অঙ্ককার হইতে আলোকে চলোছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে;
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে:—
'পারত পক্ষে' উপর হইতে
নীচের তলায় নামি নে।

গৃহের কার্য করুক সকলে—
খুড়ি, জোঠী, পিসী, মাসীতে;
আমরা সবাই, নব্য প্রথায়,
শিখোছি হাসিতে কাশিতে;
করিতে নাটক নভেল শ্রাম্ধ;
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে:
ঘুরিতে, দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া,
আনুক অর্থ পতিরা;
বাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া
বাধিত করিতে সতীরা;
বিলাতি চলন, বিলাতি ধরণ
আমরা করিতেছি অনুকরণ
যেমন সভা স্বামীরা, তাহার
চাই ত যোগ্য ভামিনী।

পাঁচটি এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা,
আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি
ভবিসন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শূন্থ বোতল গেলাস—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্র্যান্ড মোদের রাজা,
আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী;
আমরা করি নে কাহারে ডর,
আমরা করি নে কাহারো হানি:
আমরা রাখি নে কাহারও তঙ্কা,
আমরা করি নে কাউরে কেয়ার:
এ ভবমাঝে সবাই ফক্কা—
জেনোছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা,
আর সাগরজলে নুন?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে
হয় মানুসগুলো খুন।
কেন তুমি হ'লে না ক করি,
হ'ল সেল্পপীয়ার?
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে:—
আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—
 বল দেখি দাদা!—
 কারণ, দেবতা খেত লাল পানি,
 আর দৈত্য খেত সাদা।
 এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সদুহুদু
 আছে কে আর?
 এ জীবনের যা সার বুকোছি—
 আমরা পাঁচটি এয়ার।
 মোদের দিও নাকো কেউ গালি,
 মোদের করো নাকো কেউ মানা;
 আমরা খাব না ক কারো
 চুরি করে দুগুধ, ননী, ছানা;
 শুধু, লুঠিব একটু মজা,
 শুধু করিব একটু পেয়ার;
 শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—
 আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না

নাঃ!—এ জীবনটা কিছু নাঃ!
 শুধু একটা “ইঃ”, আর একটা “উঃ”,
 আর একটা “আঃ”!
 এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!
 সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
 আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি;
 এসব ক’রো না ক, খাসা বসে থাক,
 ভায়া, ছাড়িয়ে দিয়ে পা;
 —আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।
 কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
 আর গালাগালি, আর দোষাদোষী?
 কব হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
 আর বসে, গোঁফে দাও তাঃ;—
 ছেড়ে দলাদলি কর গলাগালি,
 ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
 ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
 আর সবাইকে বল ‘বাঃ’!
 —নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
 এত বকাবকি, চোকরাঙ্গারান্গি,
 আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়ভাঙ্গাভাঙ্গি,
 প্রাণ কাজেই তাই করে ‘আই টাই’;—
 আর সদাই ‘বাপ রে মাঃ’;

ছেড়ে কিচির্মিচি, আর ‘ছি ছি ছি ছি’
 আর মূহুদু ‘হায় উহু উহু’,
 প্রাণের সার যাহা—কর ‘আহা আহা’
 আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
 —তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

যায় যায় যায়

ঐ যায় যায় যায়,—
 প’ড়ি এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—
 ভেঙ্গে চুরে, ভেসে যায়।
 ঐ যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়,
 ভোলানাথ চিৎ:
 ঐ যায় দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ,
 হয়ে যায় রে ‘মিথ’
 ঐ যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
 শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে:—
 আছেন এক ঈশ্বর মাত্র: দিব্যরাত্র টানাটানি
 তাঁরেও শেষে।
 ঐ যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—
 তার সঙ্গে মিশি’;
 ঐ যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধান,
 ব্যাস, নারদ ঋষি:—
 ঐ যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা,
 সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি,—
 রৈল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা,
 রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
 ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র,
 শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে:
 ঐ যায়—গীতামঙ্গল, ক্রিয়াকর্ম,
 হিন্দুধর্ম উড়ে’;
 রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল,
 আর—ছেলের খরচ মেয়ের ‘বিয়া’;
 রৈল শুধু—ভাষ্যার ম্বন্দ্র, ড্রেনের গন্ধ,
 জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া!

বলি ত হাসব না

বলি ত হাসব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে:
 কিন্তু, এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে,
 যেতে হয় প্রায় স্কেপে’!

সাহেব-তাড়াহত, খতমত, অণ্ডলস্থ স্ত্রীর,
 ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর.
 যবে সব কলম ধরে, গলার জোরে
 দেশোদ্ধারে ধায়;
 তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে.
 হ'য়ে ওঠে দায়।
 যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রবর্গ
 টাঁকি দীর্ঘ নাড়ে,
 একটু 'গ্যানো' প'ড়ে কেহ
 চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
 কোর্টে 'এক ঘরের' মস্ত বন্দোবস্ত
 বাস্ত কোন ভায়া;
 তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে
 ছেড়ে প্রাণের মায়া।
 যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে
 বেংকে প্রায়শ্চিত্ত করে.
 যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত
 ধর্ম ভাঙে গড়ে;
 যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাশণ্ড
 পড়েন হরির মালা—
 তখন ভাই নাই ক্ষেপে, হাসি চেপে
 রাখতে পারে কোন—

তা সে হবে কেন

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্তে চাও কি
 করে মুখে বড়াই?
 তা' সে হবে কেন!
 তোমরা বাক্যবাণে শূদ্ধ ফতে কর্তে
 চাও কি লড়াই?
 তা' সে হবে কেন!
 তোমরা ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুধ ব'লে
 চাও কি যে, সে
 তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা স'পে, শেষে
 তলিপতলপা বে'ধে, নিজের চলে যাবে দেশে?
 তা' সে হবে কেন!

তোমরা হিন্দু-ধর্ম "প্রচার" করেই,
 হতে চাও যে ধন্য.
 —তা' সে হবে কেন!

তোমরা মুর্থ হ'য়ে হ'তে চাও যে
 বিশ্বে অগ্রগণ্য!
 তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু-ধর্মের
 অতি সুক্ষ্ম মর্ম—
 ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুর্ডেমটা ধর্ম!
 অর্মানি তাই সব বুদ্ধে যাবে যত শ্বেতচর্ম?
 —তা' সে হবে কেন!

তোমরা সাবেক ভাবে
 বাখতে চাও যে খাড়া:
 —তা' সে হবে কেন!
 তোমরা স্মোত্রটাকে ফিরাতে চাও
 যে দিয়ে মুখের তাড়া:
 —তা' সে হবে কেন!
 তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্য-কার্য করে বাড়ী ফিরে,
 শাস্ত্র ভুলে, রেখে শূদ্ধ আর্কফলা শিরে—
 দলাদলি করে শূদ্ধ রাখবে সমাজটিরে?
 —তা' সে হবে কেন!

৪

তোমরা চিরকালটা নারীগণে
 রাখবে পাঁচিল ঘিরে?
 —তা' সে হবে কেন!
 তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে?
 —তা' সে হবে কেন!
 তোমরা চাও যে তারা বন্ধ থাকুক,
 এখন যেমন আছে,
 রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আস্তাকুড়ের কাছে:
 এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে?
 —তা' সে হবে কেন!

এমন ধর্ম নাই

১

ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হো!
 কার্তিক, গণপতি—
 আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী,
 লক্ষ্মী, সরস্বতী—

আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম,—
ঐ সবই আছে—হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম ?—
(কোরাস্) ছেড়ো না ক এমন ধর্ম.

ছেড়ো না ক ভাই;
এমন ধর্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম নাই!
। বাদা । তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্ ।

ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বাবু,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর;
হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতাব,
বাস্—বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর'—
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি ।

আছে বানর, কুম্বীব, কাঠবিড়ালী,
ময়ূব, পেঁচা, গাই—
আর তুলসী, অশথ, বেল বট, পাথর -
কি এ ধর্ম নাই!
ঐ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্'
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—
কিছু যায় নি ফাঁক।
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি ।

যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও—
তা গুণ্য দেও গে ডুব;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও সে—
পূর্ণ্য হবে খুব;
আর মদ্য, মাংস খাও—বা যদি হ'য়ে পড় শৈব;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও:—
এর গুণ কত কৈব।
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি ।

গীতার আবিষ্কার

১

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কচ্ছেঁ দিবারাতি;
বলছে আমরা ভণ্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী-জাতি;

হতাশ ভাবে তক্তার উপর পড়লাম গিয়ে শুয়ে,
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছাঁড়িয়ে হস্ত দুয়ে;
ভাবছি এটার মুখের মতন জবাব দেবো কি তা'
--ঠেকলো হাত এক বইয়ের উপর,

তুলে দেখি গীতা'
—ও মা' তুলে দেখি গীতা'।

লাফিয়ে উঠলাম তক্তার উপর
'মাটামভাবে' সোজা;
ছট্কে পড়লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা।
এবার যদি নিন্দা কর, কব্ব তা কি জানি—
অমনি চাঁদেব চ'খেব সামনে ধব্ব গীতাখানি,
এখন বটে অপমানটা কচ্ছ মোদের বড়;
তবু একবার চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়—
একবার গীতাখানি পড়।

সকাল বেলায় আঁপিস্ গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি;
বাড়ী ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হ'লে খালি,
যাঁদের অঙ্গে ভরণপোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি;
একা হ'লে (হায় রে, গলায় জোটেও না দাঁড়ি!)
বুঝি বা সে নাই বুঝি—গীতাখানি পাড়ি—
আমার গীতাখানি পাড়ি।

দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' বলে ডাকি.
পালাই ছুটে উদ্ধরশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে।
চান্দর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে;
পিতৃপুণ্যে পেঁছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাৰি.
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি।
আমার গীতার কথা ভাবি।

গীতার জোরে সছে ঘুঁষি সছে কানুটিটে,
গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে;
করি যদি ধাম্পাবাজি, মিথ্যে মোকদ্দমা,
স'য়ে যাবে,—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা;

মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
 মদুর্গীর কোষ্মীর চেয়ে আমার গীতাই
 মিষ্টি যেন—
 আমার গীতাই মিষ্টি যেন।
 (কোরাস) গীতার মত নাইক শাস্ত্র,
 গীতার পুণ্যে বাঁচি—
 বেঁচে থাকুক গীতা আমার—
 গীতায় ম'রে আছি:
 বাবা! গীতায় ম'রে আছি।

বদলে গেল মতটা

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম অনাসক্ত,
 খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত:—
 বিশ্বাস হ'ল খ্রীষ্টধর্ম—ভজতে যাচ্ছি খ্রীষ্টে.—
 এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে!
 ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদলে গেল মতটা,—
 (কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
 সবারই মত বদলায়।

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
 চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কণ্ট;—
 কচিং ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম,—
 এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু formএ!
 —ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
 সবারই মত বদলায়।

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে
 মিশলাম গিয়ে রঙে
 Hume ও Mill ও Herbert Spencer
 পড়তে লাগলাম সঙে;
 ভেসে যাবো যাবো হাঁছি Fowl ও
 Beefএর বন্যায়,
 এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গর্দিকতক কন্যায়!

—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
 সবারই মত বদলায়।

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও
 Millএর চর্চায়,
 ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—
 অন্ততঃ নিজের খর্চায়,
 বদ্বছি বসু ঘোষের কাছে
 হিন্দুধর্মের অর্থে—
 এমন সময় পড়ে গেলাম

Theosophyর গর্তে!

—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
 সবারই মত বদলায়।

সে ধর্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
 এইটে কব্ব কব্ব রকম কচি বোধগম্য:
 মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
 এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ!
 —ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
 (কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে
 সবারই মত বদলায়।

নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা
 করিল ভীষণ পণ—
 স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক,
 রাখবেই সে জীবন।
 সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি,
 কর কি, নন্দলাল?'
 নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া
 রহিব কি চিরকাল?
 আমি না করিলে কে করিবে
 আর উদ্ধার এই দেশ?'
 তখন সকলে বলিল—
 বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!

নন্দর ভাই কলেরায় মরে,
 দোঁখবে তাহারে কেবা!
 সকলে বলিল 'যাও না নন্দ
 কর না ভায়ের সেবা'
 নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য
 জীবনটা যদি দিই—
 না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা
 দেশের হইবে কি?
 বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
 ভেবে দোঁখ চারি দিক্':
 তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ
 তা বটে, তা বটে, ঠিক'

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির,
 কোথা কি ঘটে কি জানি;
 চাঁড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন
 উলটায় গাড়ীখানি;
 নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ,
 রেল 'কলিশন' হয়:
 হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর
 গাড়ী-চাপা-পড়া ভয়:
 তাই শূয়ে শূয়ে, কণ্ঠে বাঁচিয়ে
 রহিল নন্দলাল।
 সকলে বলিল—ভালা রে নন্দ,
 বেঁচে থাক্ চিরকাল'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা
 কাগজ করিল বাহির,
 গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে
 বিদ্যা করিল জাহির:
 পাঁড়ল ধন্য দেশের জন্য
 নন্দ খাটিয়া খুন:
 লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়ে,
 খায় তার দশ গুণ!—
 খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা
 ও সন্দেশ খাল খাল:
 তখন সকলে বলিল—বাহবা
 বাহবা নন্দলাল'

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক
 সাহেবকে দেয় গালি,
 সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার
 টিপিয়া ধরিল খালি:
 নন্দ বলিল 'আ-হা-হা! কর কি,
 কর কি, ছাড় না ছাই,
 কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে
 আমি যদি মারা যাই:
 বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খত,
 যা বল করিব তাহা';
 তখন সকলে বলিল—বাহবা
 বাহবা বাহবা বাহা!

হিন্দু

এবার হয়োছি হিন্দু, করুণাসিন্দু
 গোবিন্দজীকে ভজি হে।
 এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
 (শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
 আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না!
 (তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
 আহা! জান ত আমার স্বভাব উদার
 (তাতে) গোপনে নাইক অর্দাচি।
 এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
 (হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো।
 আমি জীবনের সার করেছি আমার
 (আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।
 আহা! কি মধুর টিকি, আর্ষা ঋষি কি
 (এই) বানিয়ে ছিলেনই কলি গো।
 সে যে আপনার ঘাড়ে আপনাই বাড়ে
 (অথচ)—চতুর্বর্গ ফলি গো।
 আহা এমন কল্প, এমন নম্র,
 (আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
 অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
 (এমনি) বিষম হজমি গুলি এ!

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নিভ'য়ে তুলি
 (ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো।
 দেয় হারিনাম শূনে টাকা হাতে গুণে,
 (আছে) এখনও বহুত গাধা গো।
 তবে মিছে কেন গোল, বল হারিবোল
 (আর) ববে না ক ভব-ভাবনা।
 দেখ হারির কৃপায় দশ জনে খায়
 (তবে) আমরাই কেন খাব না।

কবি

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ, -
 শেলি, ভিক্টর-ইউগো, মাইকেল

আমাব কাছে তুচ্ছ।

আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে ঢস্কে
 পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্কে।
 (কোরাস্) মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ

'কুইলের' কলম হস্তে,

কে তুমি হে মহাপ্রভু? নমস্কে নমস্কে।

আমি লিখি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
 নিজেই বন্ধি না তার অর্থ,

বুঝবে কি তা অন্যে!

আমি যা লিখি এবং আজকাল

যা সব লিখি:

সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই

অনেক শিখি।

মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

আমার কাব্যের উপর আছে আমার

অসীম ভক্তি:

আমি ত লিখি না সে সব,

লিখছেন বিশ্ব-শক্তি;

তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা,-

পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।

মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
 (যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
 যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ
 আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝতে পার্ত্ত:
 মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
 তোমাদিগের মংগল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য!
 এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
 আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্ব।
 মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

চণ্ডীচরণ

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার:
 এমনি তিনি হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তে'ন মর্ম্ম ব্যক্ত,—
 দিনের মত জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
 জলের মত বিষয় হ'ত ই'ন্টের মত শক্ত।

(কোরাস্) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ

লিখ্ছে বেশ! হাঃ হাঃ হাঃ!

যা হোক তোরা নিজের নিজের

ঘটিবাটি সাম্লা!

বাহির কর্ত্তে'ন ব'সে ব'সে

আরও স্কন্ধ স্কন্ধতার:

চুলটি চিরে দ্রু ভাগেতে

কর্ত্তে'ন তিনি কর্ত্তে'ন।

বুঝ'ত না ক কেউ তা কিছ্র,

এইটেই যে দুঃখ তার—

অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্ত্তন।

সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে প'ড়ে গেল

টিড্'টিকার;

লিখতেন তিনি অব্যাহত অতি চাঁছা গদ্যে :
বোঝাতেন যে হার্বাট স্পেন্সার.

ওয়বেষ্টার কি বিড্ডিকার.—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে :
সবাই বললে (ইত্যাদি)

৪

রইল না কারো সন্দেহ সংসারটা এ ঝক্‌মারি.
যদিও কেউ ছাড়ল না ক ব্যবসা কি নক্‌রি.
সাত্তিক আহার শ্রেষ্ঠ বদুঝে ধল্ল মাংস রক্‌মারি
—'ফাউল বিফ্ ও মটন হ্যাম্

ইন্ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি ।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

৫

নিজের বিষয় পরকে দিয়ে
হ'ল না কেউ ভেঙ্‌ধারী.
নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো
করে না কেউ বিশ্বাস :
দেখে শনে চন্‌ডীচরণ হয়ে শেষে দেক্‌দারী.
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস ।
সবাই বললে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার

১

যদি জানতে চান্ আমি
ঠিক কি বকম স্ত্রী চাই
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি বং
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা,
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং,
শোন—তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চলতে জানে যদি, বাঁচিয়ে ক'দিক.
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে.
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়ে সোহাগা!

২

কপাল এক রন্তি বা কপাল গড়ের মাঠ.
ভ্রু পদ্পধনঃ কি ভ্রু যষ্টিবৎ.

নীলাঙ্জনেত্রা কি সে মাজ্জ'রাঙ্কী—
তা খুব যায় আসে না, আমার এ মত ।
যদি স্বামীরে কটু সে কয় না ক বেজায়,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়.
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়ে সোহাগা!

৩

বিম্বাধরা হোক্ কি কাফ্‌রীবদোষ্টা.
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টোক
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা.
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক,
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন.
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন.—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়ে সোহাগা!

৪

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী.
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক.
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা;
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক,
যদি রাখে না খোঁজ্ স্বামী খায় ভাঙ্ কি চরস্.
ভান্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস.—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়ে সোহাগা!

৫

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে.
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখানা চায়.
খরচপত্র একটু গুঁছিয়ে করে.
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় :
যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন.
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ.—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়ে সোহাগা!

যেমনটি চাই তেমন হয় না

১

দেখ গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি বিশৃঙ্খলা
বিশ্বময়—না
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

২

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্য,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পের ভাগ কন্যা;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্খা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সম্ভা:—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

৩

আমি চাই চির যৌবন, আমার কেমন বাস্তবিক।
তা যৌবনটি বাঁধা ত রয় না।
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্তিক;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সুক্ষ্ম,
চাই ভার্য্যার মেজাজ হয় একটু কম রুদ্ধ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই না ক দুঃখ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

৪

আমি চাই আমার গুণকীর্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ:—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না;
চাই ভঙ্গ হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেল সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মর্দনবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ—কিন্তু হা অদৃষ্ট!—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

কি করি

দিন যে যায় না, কি করি!
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হ'য়ে হাঁপিয়ে মরি?
তাস খেলার প্রবল তোড়ে,
ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা ওঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি;
তবু দিন যে যায় না কি করি!
দাবা খেলি হ'য়ে কাং, বাজির উপর বাজিমাং,
পাশা খেলে মাজায় বাং,
চিং হ'য়ে নভেল পাড়ি:
তবু দিন যে যায় না কি করি!
পরিনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি,
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটে না ক বিভাবরী—
আমার দিন যে যায় না কি করি!
গাঁজা গুলি চরস্ ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিম্বা ব্রান্ডী হইসিক 'বিয়ার'
কিম্বা তাড়ী ধান্যেশ্বরী:—
নইলে দিন যে যায় না কি করি!
কল্লের্ন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা
—আর জীবনটাকে এত ছোট যে,
দুর্দিন যেতেই 'বল হরি':—
আমার দিন যে যায় না কি করি!

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট,
তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য
ক্ষুধায় জ্বলে যায় যে পিত্ত,
খেতে বসলে চর্ষণ কর্তে কর্তে পরিশ্রান্ত:
যদিই বা খাই যথাসাধ্য,
খেলেই বায় ফুরায়ো খাদ্য:—
পান্ত আন্তে লবণ ফুরায়,
লবণ আন্তে পান্ত।
দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে মাছি সর্ষ গাত্র,—
রাতে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত:

তদুপরি ভার্য্যার অর্জুনীতে গয়নার ফন্দ,
নারিসকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত!
কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য;
রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দান্ত;
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা;
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্বস্বান্ত।

প্রেমবিষয়ক

(প্রেমতত্ত্ব)

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না futureএর চিন্তা,
থাকে না ক shame;—
তারেই বলে প্রেম।

যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ;
যখন past all surgery আর যখন
past all hope,
তবে ভিন্ন জীবন ঠেকে
যখন ভারি tame,—
তারেই বলে প্রেম।

দুপুর রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি, রন্দুর—
when it doesn't care a pin
হোক সে কাফ্রী কিম্বা ম্যাম,
মর্চি, মর্দী, মন্দফরাস,
when it doesn't care a 'damn'
Blind কি bald, deaf কি dumb, কি
hunch-back কিম্বা lame!—
তারেই বলে প্রেম।

রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড়, বন কি বাঘ কি ভাল্লুক,
when it dosen't care a hang
কার্জিট অন্যায় কিম্বা ঠিক,
ঠাট্টা হোক কি নিন্দা হোক,
when it dosen't care a kick
মরি কিম্বা বাঁচি,
when it is very much the same—
তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল,
ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হয়ে গেলাম,
বলবো তাহা কাহারে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

এম্নি হ'ল আমার স্বভাব,
যেন বা খাজাখাঁ নবাব;
নেইক আমার কোনই অভাব;
পোলাও কোম্মা কোপ্তা কাবাব্
রোচে না ক আহারে;
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন
ফুটে আছে প্রিয়ার মূখ,
দূরে থেকে দেখবো শুদ্ধ,
শুক্বো শুদ্ধ গন্ধটুক্ব;
রাখ্বো জমা প্রেমের খাতায়,
খরচ মোটে কর্বো না তায়,
রাখ্বো তারে মাথায় মাথায়,
বুজ্বো না ক আঁখির পাতায়;—
হারাই পাছে তাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শঙ্কা হ'ত প্রিয়া পাছে
কখন ক'রে অভিমান,
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান;
নকলনবিশু প্রেমের পেশায়,
হ'য়ে রৈতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়,
খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়;—
মরি মরি আহা রে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে চাঁদের করে
নেহাইং প্রিয়া তৈরি নন,
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা,
বরং শেষে জ্বালাতন,

যদি একটু দাবা খেলায়,
আসতে দেরি রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু, চেলায়,
পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে
হ'লে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথার রতন
নেপ্টে রইলেন আঠার মতন:
বিফল চেষ্টা বিফল যতন,
স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন—
রচোঁছিলাম যাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

নতুন চাই

পূরণো হোক ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নতুন নতুন নৈলে কারো চলে না;
নিত্যই পোলাও কোম্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার?
আমার ত তা দুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
দু'চার বর্ষ হ'লে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পরিতত:
নইলে সে উর্বরা হলেও
বেশী দিন আর ফলে না;
নিত্যই যদি কার্য মা পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই;
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও
কেউই কিছুই বলে না।
কুমাগত টম্পা খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রতাহ-অপ্সরা দেখলেও
তাতে আর মন টলে না;
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চার বার—
বিবহ আত্মত্বি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

এস এস ব'ধু এস

এস এস, ব'ধু এস! আধ ফরাসে ব'স,
কিনিয়া রেখোঁছ কল্‌সি দাঁড়
(তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চাঁড়।
তুমি চিঁড়ে নও ব'ধু, তুমি চিঁড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে (ব'ধু হে)।
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিঁড়িয়াখানায় দিতাম রেখে!

নয়নে নয়নে রাখি

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা-ঢাকা হন অমনি ব'ধু,
একটু যদি মৃদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই,
একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে
আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী'
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে
কখন ব'ধুর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অণ্ডলের নিধি
অণ্ডল থেকে খসে পড়েন:
তাই যদি তার হেলায় ফেলায়
আসতে দেরি রাত্রি বেলায়,
ব'কে ঝ'কে, কে'দে কেটে,
কুরুক্ষেত্র ক'রে থাকি।

সবই মিঠে

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক, মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে
মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়নাগুলি,
মিষ্টি চুড়ির ঠুনঠুনিটে;
যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময়
ঘুঘু চরে স্বামী'র ভিটে'।
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি
তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে

আর—সে করস্পর্শে অণ্ণে যেন
 দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে।
 আহা!—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও
 মিষ্টি যেন গিটে গিটে।
 আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গর্দিল,
 আহা যেন পর্দলিপটে!
 আহা! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি
 প্রিয়ার হস্তের কান্দুটিটে:
 মধুব সব চেয়ে তাঁর সম্মাজ্জর্নী—
 আহা যখন পড়ে পিঠে।

আমরা ও তোমরা

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
 আর তোমরা বসিয়া খাও।
 আমরা দুপুরে আঁপসে ঘামিয়া মরি—
 আর তোমরা নিদ্রা যাও।
 বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি,
 তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কর্ডি
 অমায়িকভাবে গুছায়ে পাঙ্কী চাঁড়ি—
 দ্রুত চম্পট দাও।

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়ি—
 আহা! যেন কত কাল চেনা,
 তোমরা দোকানী, সেক্‌রা, পসারী ডাক—
 আর আমাদের হয় দেনা।
 সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢালি,
 —নব কার্ত্তিক আর কি!—আদরে গালি,
 “প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ” বলি—
 কৃতার্থ করে দাও!

তোমরা অবাধে যা খুঁসি বলিয়া যাও—
 ভয়ে আমরা স্তম্ভ রই:
 আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
 সদা সেই ভয়ে সারা হই।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি—
 আমরা যেন বা কতই না অপরাধী;
 পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
 তবু ফিরে নাহি চাও।

৪

আমরা বেচারী ব্যবসা, চাকরি করি—
 আর তোমরা কর গো আয়েস;
 আমরা সদাই-মুনিব-বকুনি খাই—
 আর তোমরা খাও গো পায়েস।
 তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
 কার্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
 অবহেলে চলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
 অথবা মরিতে ধাও।

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
 রোজ জন্মলাতন হ'য়ে মরি:—
 তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক
 খাসা বেশাবিন্যাস করি।
 আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
 তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,
 বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
 তবু মন উঠে না ও।

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে,
 (ঘরে) আমরা বন্ধ রই:
 তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
 (তাই) ভাবিয়া অবাক হই:—
 আঁপসে কাটাও তামাক, গল্প গুজবে,
 পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুকোবে,
 পবে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
 (শেষে) করে গোটা কত সই।

চাষার প্রেম

দুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,
 (আর) মোরা খাই তার দাঁহ;
 যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো.
 (ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
 তোমরা খাইবে, আমরা বসিয়া রাঁধিব,
 না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাঁধিব,
 তোমরা বঁকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,
 (তাও) তোমাদের সহে কই?

তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই বাস্—
 (যাও) বসগে হাত পা ধুয়ে;
 আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি, কিছ্
 (তার) থাকে না ত দিয়ে থুয়ে।
 তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
 তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী;
 আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
 (শুধু) অন্ন বস্ত্র বই।

তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে
 (তবু) সেটা যেন কিছ্ নহে;
 আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
 (তাও) তোমাদের নাই সহে;
 তোমাদের চাই মেজ্, সেজ্, খাস্-কাম্,রা,
 আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত-না-মরা,
 থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা
 (বুঝি) সে সময় কেহ নই।

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
 (তার) যাতনা আমরা সহি,
 পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
 (তার) দুঃখ আমরা বহি;
 কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
 কাঁদিলেই নাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
 ভাগ্যে গলে ঘুমটি রাতে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
 (তার) বকুনী আমরা সহি।

ঐ যাঁচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই
 ডোবার ধার দিয়ে,
 ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায়
 কাঁকে কলসী নিয়ে।
 সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল
 শুধু মোরই পানে,
 আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—
 ঠিক এ—এইখানে।
 তার রং বড্‌ডই ফর্সা,
 তারে পাব হয় না ভরসা,
 তার জন্যে যে কচ্ছে রে
 মোর প্রাণ আনচান।

ও, পরণে তার ডুরে শাড়ি
 মিহি শান্তিপুরে;
 —ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই
 শান্তিপুরে ডুরে।
 তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর,
 যেন পটল-চেরা;
 আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই
 —সকলকার সেরা।
 তার রং যে বড্‌ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা
 পায়ে বাঁকা মল;
 আর মূখখানি যে একেবারে
 কচ্ছে ঢল ঢল।
 তার নাকটি যেন বাঁশপানা
 কপালটি একরত্তি;
 এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
 আগাগোড়া সত্যি—
 তার রং যে বড্‌ডই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

তার এলো চুলের কিবে বাহার
 —আর বলবো কি রে;
 —তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল
 —মিথ্যে বলি নি রে;
 মূই মিথ্যে কইবার নোক নই রে
 —করিনিও ভুল;
 ও তার হেঁটুর নীচে চুল.
 ও রে তার হেঁটুর নীচে চুল।
 তার বং যে বড়ই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট,
 গোল-গোল যে তার চং;
 আর কি বলবো মূই ওরে
 লেতাই কিবে যে তার বং।
 সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল,
 ক'রে মন চুবি,
 আর ঠিক এই জায়গায়
 মেরে গেল নয়ানের ছুরি।
 তার বং যে বড়ই ফর্সা। [ইত্যাদি]।

বুড়ো-বুড়ী

বুড়োবুড়ী দুজনাতে
 মনের মিলে সুখে থাকত।
 বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব,
 বুড়ো ছিল ভারি শাস্ত।
 হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি,
 হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি:
 ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি,
 পাড়ার লোকে পর্লিশ ডাকত।
 হঠাৎ একদিন 'দুস্তোর' বলে,
 কোথা বুড়ো গেল চলে,
 বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে
 কল্লি চক্ষু লবগাস্ত।
 শেষে বছর খানেক পরে
 বুড়ো ফিরে এল ঘরে.

বুড়ী তখন রেঁধেবেড়ে
 তাকে ভারি খুঁসি রাখত।
 ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে,
 মনের মিলে গভীর প্রেমে,
 বুড়ী দিত দাঁতে মিঁশি,
 বুড়ো গায়ে সাবান মাখত।

তুমি বুঝ মনে ভাব

তোমায় ভালবাসি বলে তুমি বুঝ মনে ভাব,
 যে তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে
 ম'রে যাব?
 ঘুঘু চর্বে আমার বাড়ী,
 উননে উঠবে না হাঁড়ি:
 বৈদ্যোতে পাবে না নাড়ী, এমনি,
 অন্তিম দশায় খাবি খাব।
 এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল;
 তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত ব'য়ে গেল।
 ডাকলে তোমার পাইনে সাড়া,
 নেই কি কেউ আর তোমা ছাড়া?
 এই গোফ্ জোড়াতে দিলে চাড়া
 তোমার মত অনেক পাব।

বিরহ-তত্ত্ব

বিরহ জিনিসটা কি
 নাই রে নাই রে আর বুঝতে বাকি!
 যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভূতা
 বাজার খরচ ফন্দ, করি দীর্ঘ নিত্য,
 রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—
 তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
 যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
 —যদিও, রন্ধনের তারতম্য তাতেও, বড় হয় না;
 দু সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
 তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
 বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
 ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
 ভাবি রে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
 পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকি।

বিরহ-যাপন

১

তোমারই বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর)
ঘুম পেলেই ঘুমই!
কি বলবো আর—পরিত্যাগ (এখন)
—একেবারে চিঁড়ে দই—
—রোচে না ক মুখে কিছু পাটার ঝোল
আর লর্চি বৈ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই,
হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপরি—
আর দুঃখের কথা করে কই!
দুঃখের বারিধির আমার
কোন মতেই পাই নে থৈ—
—আবার বিরহে বৃষ্টি (আমার)
ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ।

(এখন) বিকেলটাও যদি হয়
সর্ব্বং খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন
প্রাণটা আর বাঁচে কৈ।
কে যেন সদাই এ প্রাণের
পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে
(এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই।

৪

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে
ঘুম আসে না নয়ানে,
কোন রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন
চর্ষ্বশ ঘণ্টাই জেগে রই:
বিরহেতে দিন দিন
ওজনেতে বেশী হই:—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি)
তোমা বই আর কারো নই।

চাষার বিরহ

তোরে না হেরে মোর,
আন্দাজ হয় দিনে, গড়ে,
বার পঁচিশ চাঁদ-পারা ঐ
মুখখানি তোর মনে পড়ে।
যেখন মূই উঠি ভোরে—
পূবে চাই পশ্চিমে চাই
কোথাও দেখি নে তোবে,
তেখন প্রাণ কেঁদে ওঠে
ভেউ ভেউ করে।
বলতে কি—তেখন বে মোর
জানটা আর থাকে না ধড়ে।

যেখন গো বেলা দুকুর—
বেড়ুল হয় দেখছি যেন
তোরে আর সেই পানা দুকুর,
পরে দ্যাখি শুয়ে শুধু কলে কুকুর
তেখন মোব ডুকরে ডুকরে
পরানটা যে কেমন করে।

বিকলে নেশার ঝোঁকে—
মনে হয় আবগাছতলায়
যেন পবাণ দেখছি তোকে
পরে আর, দ্যাখি পাই নে
সাদা চোকে:—
তেখন মোর গলার কাছটায়
কি যেন রে এঁটো ধবে।

৪

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মূই দ্যাখি তোরে,
তার পরে ঘুম ভেঙে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস করে:
কলাগাছ পড়ে যেমন
চৈতন্য কি আশ্বিনের ঝড়ে।

৫

বটে তুই থাকিস দূরে,—
থাক্ না তুই পাবনা জেলায়
আর মূই থাকি হাজিপূরে,
তবু জান উজান চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জনে
মোরি মাথার টনক নড়ে।

অনুতাপ

এখন তাহারে আমি পেলো যে কি করি
হাসি কিম্বা কাঁদি কিম্বা
হাতে কিম্বা পায়ে ধরি
ঘরেতে দরোজা দিয়ে
বুঝি তারে বলি 'প্রিয়ে,
যা হবার তা হয়ে গেছে,
এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরী,
এমন কর্ম্ম আর কর্ণে না,
এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরী।"
বাঁধি দিয়ে বাহু দুটি
(যন্দুর আঁকড়ে পেয়ে উঠি,
বলি "এই নেও সামনে তোমার,
পাঁটা খেতে খেতে মরি,
চাও ত প্রায়শ্চিত্তে,
এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

তোমার তুলনা তুমি

তোমার তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমন অগের কালোবরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।
যেমন দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারি সমতুল।
আবার, যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে—
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।

নতুন প্রেম

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার
প্রেমিক মজার জিনিস।

ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলো,
আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।
প্রথম মিলনের চুম্বনেতে জীয়ন্তে মরা,
আর হাতে স্বর্গপ্রাপ্ত তারে বন্ধেতে ধরা—
—দেখে ধরারে সরা (মরি হয় রে হয়)
ওরে ভাবিস কি রে এমনি গো
তার থাকবে চিরদিন! ঈস্'
কত "ভালোবাসো"? "ভালবাসি।" "বাসো—
কতখানি"?
কত ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ডু, কতই না জানি;
মিঠে মিঠে মূদু বাণী (মরি হয় রে হয়)।
এই বকম হ'লে তারে
নতুন প্রেমিক বলে চিনিস'
প্রথম বিবাহেতে অনিদ্রা,
আর ওহো! হা হুতাশ।
আর—আহা উহু হু হু—
যেন হ'ল যক্ষ্মাকাশ,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস (মরি মরি হয় রে হয়)
শেষে বিবাহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ
বাঁচবে তা দেখে নিস'
কত "জীবনবল্লভ" "নাথ"
"প্রভু" "প্রাণেশ্বর";
কত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরী" তাহারি উত্তর;—
লেখা লেখি নিরন্তর (মরি হয় রে হয়)
এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে
"ওগো শোন"য়ে ফিনিশ।

৩। প্রাকৃতিক

বসন্ত বর্ণনা

১

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি
শিশির হইল অন্ত।
বুঝি বা এবার ঢেঁকা হবে ভার
সখি রে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি,
—এ সময় আহা বিরহিণীগুণি
কেমনে রবে জীবন্ত।

২

ঝর ঝর ঝর কুল, কুল, কুল,
বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভন্ভনে মাছি দিনের বেলায়,
শনশনে মশা রাত্রে;
ডাকিছে কোঁকিল কুহ, কুহ, কুহ,
গুঞ্জরে অলি মূহ, মূহ, মূহ,
বাঁচি নে বাঁচি নে উহ, উহ, উহ,
হি হি হু হু হা হা হন্ত।

৩

পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর
কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি
গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যায়, নে'
খেয়ে নিয়ে শূই বিরহশয়নে.
পড়িগে' অর্ধ্ মূদিত-নয়নে
গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

৪

নিয়ে আয় সখি বরফ নহিলে
মরি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল না ক পতি
—আজ যে মাসের ২৭এ:—
নিয়ে আয় পান, তাস আন্ ছাই
—বিরহের এত জ্বালা—মা'রে যাই।
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই
বাহির করিয়ে দন্ত!

বিষ্মৎবারের বারবেলা

১

পার ত জন্মা না কেউ,
বিষ্মৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সামলাতে
পারবে না ক তার ঠেলা।

দেখ, বিষ্মৎবারের বারবেলায়
আমার জন্ম হইল;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে, রোদে ধ'রে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

২

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে!
দিল না ক মায়ের দুধ,
ক'রে দিল শরীর সর, বৃন্দ্বি গর,
খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়—
বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়
পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

৩

দেখে মোর গুরুমশয় (যেন কশাই)
বিদ্যায় খাটো শর্মা রে,
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়িছি দেখে,
স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল;
দিল মোর চাকরি ক'রে তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বৃন্দ্বি রম্ভা,
কনের দরও চড়ে গেল।
হায়! গো বিধি দুশ্ট সবায় তুশ্ট,
রুশ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেললাম বলে জন্মে ভুলে
বিষ্মৎবারের বারবেলা।

বিলেত

১

বিলেত দেশটা মাটির,
সেটা সোনার রূপোর নয়;
তার আকাশেতে সূর্য উঠে,
মেঘে বৃষ্টি হয়;

তার পাহাড়গুলো পাথরের,
 আর গাছেতে ফুল ফোটে;—
 —তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা
 কচ্ছ না ক মোটে;
 কিন্তু এ সব সত্য, এ সব সত্য,
 এ সব সত্য কথা ভাই,
 তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
 তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় নাক
 টিয়াপাখীর ছা';
 আর চতুপদ সব জন্তুগুলোর
 চারটে চারটে পা;
 তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়,
 আর মাথাও নয়কো পিছে;
 —তোমরা অবাক্ হচ্ছ, বোধ হয়
 ভাবছো এ সব মিছে;
 কিন্তু এ সব সত্য, এ সব সত্য,
 এ সব সত্য কথা ভাই,
 তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
 তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ,
 আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে;
 আর জোয়ান বড়ো করি.
 কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে;
 তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে,
 পাগুলো সব নীচে;
 —তোমরা মূর্চকি হাসচ বোধ হয়
 ভাবচ এ সব মিছে;
 কিন্তু সব সত্য, সব সত্য,
 সব সত্য কথা ভাই,
 তোমরাও যদি দেখতে তা'লে
 তোমরাও বলতে তাই।

সেথা বসনভষণ কৰ্মতি হ'লে
 স্বামীকে স্ত্রী বকে;

আর নতনেই প্রেম মিঠে থাকে,
 'বাসি' হ'লেই টকে;
 আর আমোদ হ'লে হাসে তারা
 দন্ত ক'রে বাহির;
 —তোমরা ভাবছো কচ্ছ আমি
 মিথ্যে কথা জাহির;
 কিন্তু এ সব সত্য, সব সত্য,
 সব সত্য কথা ভাই,
 তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
 তোমরাও বলতে তাই।

তবে কি না, দেশটা বিলেত,
 এবং জাতটা বিলিতি;
 কাজেই--একটু সাহেবী রকম
 তাদের রীতিনীতি।
 আর ঐ করে শূধু সাদা হাতে
 চুরি ডাকাতি সে;
 আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে
 বিশুদ্ধ ইংলিশে;—
 এই তফাৎ, এই তফাৎ,
 এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
 আর আমাদের সৎগ তাদের
 বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্;
 বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্;
 প্রবল ঝড় বহে--আম্র কাঁটাল সব—
 পড়িছে চারি দিকে ধুপ্ ধাপ্।

বজ্র কড়কড় হাঁকে:
 গিল্মী শূয়ে বোঁমাকে
 "কাপড় তোলা বড়ি তোলা" ঘন হাঁকে;
 অমনি ছানের উপর দুপ্ দাপ্।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
 জোলো হাওয়া বহে বেগে,
 ছেলেরা বেরতে না পেয়ে, রেগে
 ঘরের ভিতরে করে হুপ্ হাপ্।

ছুটিল “এ কি হ’ল” ভাবি,
উদ্ধবলাঙ্গুল গাভী;
এ সময় মর্দি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলদরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে;
রাস্তা কন্দমে পোরে;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছলে পড়ে সবে ঢুপ্ ঢাপ্।

ভিজ়েছে নিব্ব’ম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী-
ঘরেতে ব’সে আছি চুপ্ চাপ্।

কোকিল

আছে একটা ভারি কাল পাখী,
ও তার আছে দুটো কাল পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাঙ্গুন চৈতে তার কু-অভ্যাস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ ‘হা হুতাশ’ করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে;
‘প্রাণকান্ত’ বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে,
গোল বাধায় ফাঙ্গুন চৈতে এসে;
ভাগ্গিস নয় সে পাখী বারোমেসে,
নৈলে মর্দুকল হ’ত বে’চে থাকা।

শেয়াল

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
আর সে নিজে ব’সে বেড়ে,
টাকা কর্দির চিন্তা ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মূখ করে)
—এই পূরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া,
ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

শালিক পাখী

আমি একটি শালিক পাখী—
(আমার) কাজ কর্ম সবই চালাকি;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মর্দিয়ে আঁখি।
পাপিয়া গায় “পিউ” গানে;
কোকিল জানে “কুহু” তানে,
চাতক স্নেফ্ “ফটিক জল” জানে;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।
ধূপদ খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টম্পা কীর্তন লাগে নাকি?
বাজায় বীণা যত মূর্খ:
বেগুর স্বরটা নেহাইং রক্ষ:
(বুঝলে না কেউ এইটেই দুঃখ!)
(হায় রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি।
হ’য়ে পাকে কৃতবিদ্য,
কল্পেন শেষে ব্রহ্মা বৃক্ষ
কোকিল বেগু টম্পা সিদ্ধ,—
(তবে) হ’ল শালিক নিয়ে ছাঁকি’।
[তান] ঘূনি কট্ কট্ কচ্ কচ্ কিচিমিচি
কক্যে কক্যে ড্যাপ ড্যাপ প্রিং প্রিং—

বানর

১

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়
—সভ্যতার সে ভাতি রে।
ব্যাপ্ত ভারতে অদ্য নিবিড়
বর্ষরতার রাত রে।
মানে না ক কেউ এখন—বুঝছ
—সনাতন, সুন্দর ও পূজা
(বাকি বিশেষণ রহিল উহ্য)
সভ্য বানর জাতি রে।

করে না শাস্ত্র নব্য হিন্দু
বিশ্বাস আর ত এক হিন্দু

ছাড়ে না ক দূটো রম্ভাও
আর বানর জাতির খাতিরে;
কোথা থেকে আর মিলবে রম্ভা,
খেয়ে ফেলে সব সাহেব শর্মা
যত বর্ষর ও নিষ্কর্মা সব
বানর বিলাতি রে।

৪। দার্শনিক

জগৎ

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্বা কিম্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর;—
মাতগ কুরগ পন্নগ উরগ
ভূজগ পতগ বিহগ তুরগ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর;—
যে আছ যেখানে, তুলে দুটি কানে,
শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হ'ল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান,
মদ্য খেলেই সদ্য প্রমাণ.
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ংকর।

পৃথিবী

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিন।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন।
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম, শীতকালেতে ঠান্ডা:
একের পিঠে দুয়ে বারো, দুই আর একে তিন।
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া,
আর গরু ডাকে হাম্বা.
হাতীর উপর হাওদা আবার
ঘোড়ার উপর জিন।

সংসার

১

হায় রে সংসার সবই অসার,
বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাইতে নাস্তি বেশী,
সৃষ্টির চাইতে শূন্য।

বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে
কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে অঁধার বেশী,
স্থলের চাইতে সিঁধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম
কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী,
ধর্মের চাইতে তন্দ্র।
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশী,
পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী,
মণির চাইতে কন্দম্ব।
স্বপ্ন ক্রান্তির পরেই ভার্য্যার
তর্জনি গর্জনি হৃদম্ব॥

২

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—
ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো
ভার্য্যার চাইতে ভর্তা বড়,
ভর্তা বাড়ীর কর্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা
ভর্তার ভর্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়,
শক্তির নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান
মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়,
যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যাজ্য ও তার
কপালেতে অগ্নি॥

৩

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো,
ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাস্যের চাইতে অনেক ভালো
গলে রঞ্জু বন্ধন॥
মুক্তশত্রু বরং ভাল,
নয় তা ভণ্ড মিত্র।

আসল প্রেমের চেয়ে ভাল
কাব্যে প্রেমের চিত্র ॥
গদ্যে প্রেমের পরিণামে
আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে মর্খ সে
যৎপরোনাস্তি ॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল
—বলে সর্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধল্লের ছাড়ে তবু
ধল্লের ছাড়ে না স্ত্রী ॥

পূর্ণিমা মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুদ্ধ, আছে কিছুর জলযোগ
আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়,
এইখানেতে হ'য়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও দ্রাতৃভাবে
কর্ত্তে হবে কালহরণ।
হোক না, ধনী গরীব বড় ছোট
সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবে না ক ঐতিহাসিক
গবেষণার কোন ক্রেশ;
হেথায়, হবে না ক বক্তৃতা
কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
আমরা, আসি নি ক জারিজুরি
কর্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসি নি ক কর্ত্তে বিফল
রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন;
হেথায়, নাই ক করতালির মধ্যে
কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছুর ভায়ের প্রতি,
মাতৃভাষার প্রতি টান;
তাঁদের কর্ত্তে হবে পরস্পরে
প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায়, অনত্যাচ্য কলরবে
মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শূন্য, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী
পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্ষন না কেউ হ'ল
একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।

৫। আহার ও পানীয়-বিষয়ক

চা

বিভব সম্পদ্ ধন নাহি চাই,
যশ মান চাহি না;
শুদ্ধ বিধি, যেন প্রাতে উঠে
পাই ভাল এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি “টোস্ট” ডিম্ব থাকে,
আপত্তিকর নয় তা;
শুদ্ধ বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্যেরি আর,
খাও যার খুসী যা;
শুদ্ধ কেড়েকুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কে বা বল কার—
দারা সূত বাপ মা;
এ অসার জগতে যাহা কিছুর সার—
সে, ঐ প্রাতে এক পেয়ালা চা।

পান

[সুর মিশ্র—খেমটা]

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠকে হি যা নিরিবিলি;
রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম বেকুফ নেহাইৎ!
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ!
দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্ কিয়া কোন কাম?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! আরে রাম
ইস্মে থোড়িসি গুয়া আওর চুনা খুস্বো;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায়;
আরে তু! তু! তু! আরে হায়! হায়! হায়!

সন্দেশ

উহু, সন্দেশ বন্দে গজা মতিচূর
রসকরা সরপূরিয়া;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি!
কত না বৃদ্ধি করিয়া।

যদি দাও তাহা খালি—আঃ!
 মর্দীয় বদনে ঢালিয়া:—
 উহ্ন. কোথায় লাগে বা কুর্মা কাবাব,
 কোথায় পোলাউ কাঁলিয়া:—
 উহ্ন. খাই তাহা হ'লে চক্ষু মর্দিয়া,
 চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
 আহা. ক্ষীর হ'ত যদি ভারত-জলধি,
 ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
 আহা. পারিতাম কিছ্ করে নিতে কিছ্
 সুবিধা হয়ত মহাশয়,
 অথবা দেখিয়া শূন্যিয়া
 বেড়াতাম গুনগুনিয়া,
 আহা. ময়রা-দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—
 কি মজারি হ'ত দুনিয়া;
 আহা. বেজায় বেদম বেমালুম তাহা
 খাইতাম হ'য়ে 'মরিয়া'।
 ওহো. না রাখিত বাঁধ সন্দেহ আদি,
 সংসারে এই সমুদয়,
 ওহো. হ'য়ে মানি খাষি, ছুটে কোন্ দিশি,
 যেতাম হয়ত মহাশয়!
 পেলাম না শূধু—হরি হে'
 —খাইতে হৃদয় ভরিয়ে;—
 ওহো. না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর
 সন্দেহ থাকে পড়িয়ে;
 ওহো. মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়,
 চখে বহে' যায় দরিয়া!

“সালসা খাও”

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভ'রে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
 হচ্ছে সব তুল্যাপাপী, দিচ্ছে কারে শাস্তি কে;
 মান্ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও;—
 ধর্ম যদি রাখতে চাও, প্রত্যুষেতে প্রত্যহ
 সালসা খাও।

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখলে দুর্ভিক্ষেরে,
 নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্য রে;
 পাচ্ছ না ক কোথা কিছ্ খাদ্যনামগন্ধেও,
 বাঁচতে চাও?—বাঁচবে সবে,—
 নাই ক কোন সন্দেহ;—
 সালসা খাও।

কন্যাদায়ে বিব্রত যে কচ্ছে মেয়ে-পক্ষকে,—
 সম্বন্ধ হচ্ছে যেন খাদ্য আর ভক্ষকে;—
 কন্যা বড় দেখলে যবে নিন্দা করে নিন্দকে,
 শূন্য সম দেখবে যবে সংসাবেও সিন্দকে,—
 সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রংগালয়ে কচ্ছে 'কোকেন' চর্বাশ,
 চর্বা অভিনেত্রী নিয়ে কচ্ছে—যে সে সর্বাশ!
 বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি!—কিছ্ ভেবে পাচ্ছ না,
 পুত্র নিয়ে কর্বে যে কি?—
 সালসা কেন খাচ্ছ না?—
 সালসা খাও।

সালসা খাও, বস্বে হয়ে উচ্চ মণিমণ্ডবান্;
 বিদ্যা হবে পণ্ডানন ও মূর্ত্তি হবে পণ্ডবাণ;
 শত্রু দলে কমবে, শ্যালীসংখ্যা দলে বাড়বে খুব
 ভার্য্যা সনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পারবে খুব;
 সালসা খাও।

(কোরাস)

সালসা খাও, ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
 সালসা খাও, রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
 সালসা খাও।

ভাঙ

আমরা—ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
 যাচ্ছি চ'লে—সশরীরে—
 যাচ্ছি চ'লে মধুপুত্র।
 শূন্য বসে নিশিদিন,
 কানের কাছে বাজ্ছে বীণ;
 খাচ্ছে যত অর্বাচীন—
 ঐ গাঁজা গুলি 'চরস';
 সন্তা হোক না, তার চেয়ে ভাঙ—
 লক্ষগুণে সরস;
 নেশার রাজা সিদ্ধি,
 যেমন মণির মধ্যে কোহিনুর।
 ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
 লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা
 'স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ';
 খেতেন তা, হয় ভোলা, কিম্বা
 পুরাণ-কর্ত্তাই, সতরাং।

জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর,
 জেগে জেগে ঘুমের ঘোর;
 বেশী খেলেই নেশায় ভোর;
 আর অল্প খেলেই তাহা—
 —আর কি—ব'সে হাস্য কর—
 হাঃহা হাঃহা হাঃহা;
 হোক না কেন ফকির,
 ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর।'
 ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।

সূরা

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি
 বিমল আমোদ চাও রে—
 তালে মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার
 ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।
 এই ভব মরুভূমে সূরা জলাশয়,
 ঝড়ে সূরা পাকাবাড়ী;
 আর মজারূপ বারণসীতে যাইতে—
 সূরাই রেলের গাড়ী রে:
 এই জীবনটা ঘোর মেঘলা
 এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো;
 এই ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে
 এ সূরাই একটু আলো রে।
 আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে
 সূরাই একটি চাবি;
 আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—
 তা অবশ্যম্ভাবী রে!—
 কোন, থাকিবে না ভেদ পাতাপাত,
 হিতাহিতবোধ—সেটা;
 আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে
 কাম ক্রোধ দুই বেটা রে।
 তখন, থাকিবে না কোন চন্দুলজ্জা,
 রবে না কারো ওয়াস্তা,
 আর, হবে পরিষ্কার সূপ্রশস্ত
 চুলোয় যাবার রাস্তা রে;
 এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও
 সে মহানন্দ কিংগৎ,
 তবে, মাঝে মাঝে মন, করো রসনারে
 সূরাসুধারসে সিঁগিত, বাবা।

৬। নানাবিধ

প্রেম পরিণাম

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
 (একদিন সে জন কাঁদেই কাঁদে)
 প্রথমে দুর্দিন ভারি হাসি,
 পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
 শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি
 (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে।
 প্রথমে মাথায় তুলে নাচি,
 পরে ঘেঁষি না ক কাছাকাছি,
 শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
 (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

মদ্যপ

আমি বদ্বি সং?
 তোমরা যে সব হাস্ছো দেখে
 আমার বেজায় নতুন টং।
 ভাব্ছো আমার টল্ছে পা?—
 মিথ্যে কথা—মোটাই না,—
 (শুদ্ধ) ফেল্ছি চরণ নতুন ধরণ,
 বাহির কচ্ছি রং বেরং।
 আবোল তাবোল বক্ছি আমি কি?
 ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধভাষা গুঁছিয়ে বল্ছি নি,—
 ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ,
 (ক'ছে মাথা ভোর্-র্-ভোঁ)
 তোমরা যত হাস্ছো তত
 হচ্ছি আমি রেগে টং।

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ,
 লাথি একটা মারিই রাগে;
 —তোর ত আঙ্গুষ্ঠি বড়,
 পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে?
 আমার পায়ে লাগলো সেটা,—
 কিছই বদ্বি নয়কো বেটা?
 নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস,
 নিজের কথাই ভাবিস আগে!

লাথি যদি না খাবি ত
 জন্মেছিল কিসের জন্যে?
 আমি যদি না মারি ত,
 মেরে সেটা যাবে অন্যে!
 আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—
 ন্যাকামি নয়? শস্যের গাধা!
 —দেখিছ যে তোর পিঠের চামড়া
 ভরে গেছে জুতোর দাগে!
 আমার সেটা অনুগ্রহ—
 যদি লাথি মেরেই থাকি:—
 লাথি যদি না মার্তাম ত:—
 না মার্তেও পাম্তাম না কি:
 লাথি খেয়ে ওরে চাষা!
 বরং রে তোর উঁচত হাসা,—
 যে তোর কথাও মাঝে মাঝে,
 তবু আমার মনে জাগে।
 বরং উঁচত—আগে আমার
 পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া!
 পরে ধীরে ধীরে নিজের
 পিঠের দাগটা মূছে নেওয়া!
 --পরে বলা ভক্তিভরে,—
 “প্রভু! অনুগ্রহ করে,
 পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি
 মারো দেখি পুরোভাগে!
 —দেখি সেটা কেমন লাগে।”

পরিশিষ্ট

[একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গায়।]

বেশ করেছে

রাজা। কালীচরণ কর্তৃক বড়
 বীরত্বেরই বড়াই,
 পারিষদবর্গ। বুলি গাঁজায় দিয়ে দম—
 রাজা। দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে
 কর্তৃক এল লড়াই;
 পারিষদবর্গ। বেটার আঙ্গুষ্ঠি নয় কম।
 রাজা। আমি বললাম তবে রে বেটা
 আয় না দেখি তবে রে বেটা;
 —পরে যখন ধরে আমায়
 করে দিল জুতোপেটা;

দেখলাম, বেটা আমার হাতে
 মরে বুলি এবার—
 যোগাড় করেও তুলেছিলাম
 দুই এক ঘা দেবার।
 বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
 রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
 কিন্তু রাগটা সামলে গেলাম
 অনেক কণ্ঠে সে বার।
 পারিষদবর্গ। বেশ করেছে, বেশ করেছে,
 নাহিলে অন্ততঃ
 একটা খুন খারাপি হ'ত,
 একটা খুন খারাপি হ'ত।
 রাজা। কেদার বেটা সাধু বলে
 সহরে ঢাক পেটায়,
 পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
 রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা
 চাইতে এল সেটায়;
 পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
 রাজা। আমি বললাম তবে রে বেটা,
 আয় না দেখি তবে রে বেটা,
 কে কে কে তোর টাকা জানে,
 তো তো তো তোর
 সাক্ষী বেটা?
 কর না গিয়ে মকদ্দমা—
 I don't care a feather.
 মূখখানি ত চুনিটি করে
 ফিরে গেল কেদার।
 টাকা নিয়ে কর্বে সে কি?
 টাকাগুলো সব শেষে কি
 গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা
 উঁড়িয়ে দেবে দেদার?
 পারিষদবর্গ। বেশ করেছে, বেশ করেছে,
 সে টাকা নিশ্চিত,
 বেটা সব উঁড়িয়ে দিত,
 বেটা সব উঁড়িয়ে দিত।
 রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ বলে
 কর্তৃক চায় সে প্রমাণ;
 পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক।
 রাজা। কর্তৃক এল তর্ক সে দিন
 আমার সঙ্গে সমান,
 পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।

রাজা। আমি বললাম তবে রে বেটা,
আয় না দেখি তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher,
গাধা শূয়র জানিস সেটা.
বলে দূ ঘা পিঠে লাঠি
বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে পড়ে গেল
বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি.
তখন তর্কে হার মেনে
সে পালিয়ে গেল সটাং।
পারিষদবর্গ। বেশ করেছে, বেশ করেছে,
তর্কেতে বস্তুতঃ
সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো,
সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো।

হ'তে পার্তাম

রাজা। দেখ, হ'তে পার্তাম নিশ্চয় আমি
মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারদটার গন্ধ কেমন
করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে
লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন
শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, হ'তে পার্তাম আমি
একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু “গবেষণা” শুনলেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটা বেজায় গরম আর
বিছানাটাও বেশ নরম
আর তাও বলি প্রেয়সীর
সে হাসিটুকু চরম।

আর তাঁকে চর্চা কল্লোও একটু -
কাজও দেখে বরং।
ছাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, হ'তে পার্তাম নিশ্চয়
একজন উঁচুদের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো
গর্মিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া,
মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া.
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও
দেয় না ক সে সাড়া;
তাই হাজারই পা দুলোই.
গোঁফে হাজারই দেই চাড়া,
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, হ'তে পার্তাম
রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি
অবাধ্য স্ত্রীর মত;
আর মূখস্থ সব বুলি এমন
বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সদুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায়
বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি
দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা
আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক
সামান্য বিশেষ;
কেবল প্রথম ধাক্কা পেলেই
চ'লে যেতাম বেশ;
হতাম পেলে সদুযোগও বৃষ্টি
একটা যেও সেও
ওই কেণ্ট বিস্ট্রের মধ্যে একটা
হতাম নিঃসন্দেহ;

কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমার
 দিলে না ক কেহ:
 তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম
 আমি চ'টে ম'টেই ত,—
 তা নইলে—বুঝলে কি না—
 পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

জানে না

সকলে। হ্যাঃ আর ভালো লাগে না ক
 প্রত্যহই একঘেয়ে,
 মেউ মেউ করা যত সব
 বাঙ্গালির মেয়ে।
 উমেশ। না জানে নাচতে, না জানে গাইতে,—
 রমেশ। না জানে সৌখীনরকম
 চক্ষু তুলে চাইতে—
 পরেশ। সভ্যরকম হাসতে—
 সুরেশ। সভ্যরকম কাশতে—
 সকলে। জানে না:—
 উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি
 একটি হস্তিমর্খ যেন:
 বমেশ। না পড়েছে Shakespeare
 না পড়েছে Ganot;
 পরেশ। Hockey Tennis খেলতে—
 সুরেশ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে—
 সকলে। জানে না—
 উমেশ। Adam Smithএর
 Political Economy জানে না।
 রমেশ। Malthus এর Theory of
 Population মানে না:
 পরেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পরতে—
 সুরেশ। Bicycleএ চড়তে—
 সকলে। জানে না—
 উমেশ। Huxley, Tyndall, Spencer,
 Millএর ধারণা ধারে না ক—
 রমেশ। Dynamicsএর একটা আঁকও
 কষতে পারে না ক—
 পরেশ। উল বোনা শিখতে—
 সুরেশ। নাটক নভেল লিখতে—
 সকলে। জানে না।

ভাবনায়

উমেশ। হাঁ হাঁ মশয় আমরা সবাই
 পড়েছি এক ভাবনায়—
 রমেশ। ভেবে দেখলাম আমাদের আর
 বেঁচে কোনই লাভ নাই।
 পরেশ। মনে ভারি দুঃখ, স্ত্রীরা গণ্ডমর্খ—
 সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি
 কটকে কি পাবনায়।

ধর ধর

ইন্দুমতী। সখি ধর ধর।
 সরোজিনী। কেন কেন এ ভাব নির্ঝি,
 কেন কেন তুমি এমন কর?
 ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি—
 সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো,
 এ যে ঘেমে মরি—
 ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—
 সরোজিনী। উড়িতেছে চিল
 ডাকে কা কা কাক মধুরম্বর।
 ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—
 সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে!
 ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—
 সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা
 তাই প্রবলতর!
 যৌবন-জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,—
 ী। যৌবন কি বল পার হ'য়ে ত্রিশ।
 ইন্দুমতী। কি করি কি করি—
 সরোজিনী। আহা মরি মরি!
 ইন্দুমতী। উহু উহু সখি—
 সরোজিনী। না যাও সর;
 ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি?
 সরোজিনী। না ভালো লাগে না
 তোমার ন্যাকামি।
 ইন্দুমতী। কোথা শ্যাম আমি যে ম'লাম;—
 সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

বরাবরই ব'লে গোঁছ

বরাবরই ব'লে গোঁছ;
 যে আহার এবং নিদ্রাই সার,
 অন্য সবি (তর্কভঙ্গ) অন্য সবই মিছি মিছি।

গ্যাং ভাঙলে বা হ'লে জখম
দেখবে সবাই একই রকম:
ছেড়ে দিলেই বকম বকম,
গলা টিপে (দেখবে সব) গলা টিপে
ধল্লৈ চি' চি'।

আছে শূধুই উড়ে বেয়ারা,
আর ঐ শূধু আছে ঢেঁকি—
যারা শত পদাঘাতে বলে
“আবার মার দেখি”;
যা হোক্ যায় বা আসে কি কার
এটা কত্তে হবেই স্বীকার
যাঁদের যতই রুচিবিকার,

তাঁরাই তত (আবার সব)
তাঁরাই তত করেন ছি ছি।
পৃথিবীতে জ্বর ও যক্ষ্মা,
শূল ও সন্দি, কাশি, হাঁচি,
এরি মধ্যে কায়ক্লেশে
কোনরূপে টিকে আছি;

গ্রীষ্মকালে ব'সে ধোঁয়াই:
শীতকালেতে রন্দুর পোহাই:
আর যা বলো রাজি,—
দোহাই, হাসির গানটা (কেবল ঐ)
হাসির গানটা ছেড়ে দিছি।
হাসির গান ত গাইতে বলো—
তোমরা ত বেশ হেসে নিলু:
কাঁক্ করে কেউ ধরলে আমায়—
দেখবে আমার ছেলোপিলে?
তোমরা হেসে বাড়ী গেলে,
আমি চেঁচিয়ে চল্লাম জেলে,
তোমরা দশ জনে কাঁঠাল খেলে,
আমার গলায় (বেচারী) আমার
গলায় বাঁধে বীচি।

I THOROUGHLY AGREE

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried
থাক্তাম যদিপিও, সেটা,
চম্পটী। It would have been
far preferable,
't would have been
much better.

রেবেকা। তোমায় marry করা
was an act of
great mistake for me.
চম্পটী। In this view of the case,
my love! I thoroughly
agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,
my love—
I thoroughly agree.

রেবেকা। It was a great mistake
to marry ধ'রে একটা pauper.
চম্পটী। The more so, O my love!
when you yourself
had not a copper.

রেবেকা। Tremendous sad mistake,
my darling!—
very sad, I see
চম্পটী। In this view of the case
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। এই loveএর প্রথম stageটাই ভাল,
—whispers, hugs and
kisses.

চম্পটী। The charm is not so great
as soon as
you become a Mrs.

রেবেকা। The case becomes
more complicated
on the contrary—

চম্পটী। In this view of case,
my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case,

my love!—

I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me
a thousand kisses,
and be mine for ever;

চম্পটী। চাই something
more substantial
কিন্তু মদখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as
Solomon, though not so
rich as he—

চম্পটী। In this view of the case,
my love!—

I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love!—

I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry করে না হোক
কোন অন্য কার্য সিদ্ধি,

চম্পটী। But annually একটি করে
হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি;

উভয়ে। Whatever difference of
opinion there may be—
In this view of the case,
my love!—

I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,
my love!—

I thoroughly agree.

চাকরি করা হয়রাণি

সকলে। মোরা সবাই ঠিক করেছি যে
চাকরি করা হয়রাণি!

নাপিতানী। মদই নাপিতানী।

ধোপানী। মদই ধোপানী।

মেছুনী। মদই মেছুনী।

ময়রাণী। মদই ময়রাণী।

নাপিতানী। মোদের নকরি করে গুজরাণে
আর মন উঠে না সই।

ধোপানী। মোরা চাই, শয়ন করে নয়ন মদে,
বিভোর হয়ে রই।

মেছুনী। নাই কি উপায় চাকরি করা বৈ—

ময়রাণী। বলি খেটে খেটে হইছিল কি
তৈরি এ চাঁদ মদখানি।

নাপিতানী। হেলিয়ে নয়ন বাঁকা,
অবহেলে করি ভুবন জয়।

ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর—
কারে করি না ক ভয়।

মেছুনী। মোদের কি লা চাকরি করা সয়?

ময়রাণী। এখন কর্তে হবে সহজ একটা
নতন উপায় আমদানি।

নাপিতানী। ঐ লো মদুর ম্বরে বাজছে বাঁশি,
আর কি থাকা যায়।

ধোপানী। আহা, বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে
জন্ম হই নি হয়।

মেছুনী। ওলো, তোরা সব আসবি যদি আর।

ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায়
রূপের ছটায়

মাতিয়ে দেবো রাজধানী।

একঘরে

মহাশয়,

আমরা দীনহীন কাঙ্গাল মূর্খ বিলেত-ফেরত; আমরাদিগকে কেন প্রাণে মারেন? আপনারা দেশের অহংকার, আপনারা জাতির জ্যোতি, আপনারা বিদ্যার প্রতিনিধি, আপনারা জ্ঞানের উৎস, আপনারা সত্যের নায়ক, আপনারা সাহসের প্রতিমূর্ত্তি। আমরা আপনাদের নিষ্কলঙ্ক-চরণে পিড়িতোঁছি; প্রাণে মারিবেন না।

আমরা—অন্ততঃ আমি যখন বিলাতে গিয়াছিলাম, তখনই বোধ হইয়াছিল কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। ভাবিয়াছিলাম যে, এ বিজ্ঞানের, উৎসাহের, বীর্যের, স্বাধীনতার রংগভূমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কোথায় এক ভীরুতার আলয়, মূর্খতার চণ্ডীমণ্ডপ—বিলেতে যে যাইতোঁছি—এ কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। একবার মনেও হইল, বুদ্ধি অধম্মের, অজ্ঞানের অমোচ্য কলঙ্কের অনন্ত নিরয়ের বীজ বপন করিতোঁছি কিন্তু কি করিব—মুগ্ধ মানবের মন বিবেকের বাধা শূন্য না। জাহাজে চাড়িলাম, প্যান্ট পরিলাম, কটলেট্ খাইলাম, তাহার পর দেখুন এই বিপদ।—জাহাজটা যখন গভীর গর্জনময় সাগরের নীলিমায় গিয়া পড়িল, তখনই বেশ বুদ্ধিতে পারিলাম যে, কাজটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু তখন ফিরিয়া আসি কিরূপে? কি করিব, বিলাতে যাইলাম, ইংরাজের সহিত মিশিলাম, রোস্ট চপ খাইলাম। এখন পস্তাচ্ছি। সমস্ত দোষ স্বীকার করিতোঁছি, মস্তক অবনত করিতোঁছি:—প্রাণে মারিবেন না।

দীনতার প্রতিমা আমরা, জীর্ণ শীর্ণ মলিন রোরুদ্যমান আমরা, আপনাদের শত কমলবিনিন্দিত পুণ্যময় চরণে পিড়িতোঁছি:—প্রাণে মারিবেন না।

আমরা যে ঘোর পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব;—মাথা মুড়াইব (তেড়ী ভাঙিয়া যায় ক্ষতি নাই); ঘোল ঢালিব; গব্য চন্দনামৃত পান করিব:—প্রাণে মারিবেন না।

এবার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, গোবর দ্বারা

পেটকে পবিত্র করিয়া, টেবিল ভাঙিয়া, বাড়ী ফিরিয়া, রুদ্ধা প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিয়া—তবে আর কাজ।

আবার আমরা রামাঘরের প্রশান্ত-প্রান্তে,—বমণীয় কাষ্ঠ-পিণ্ডিতে বসিয়া; অক্ষৌহিণী মক্ষিকার মিলিত ঝঞ্কারে; ধূমের অন্ধকার-ময়ী স্নিগ্ধতায়; আর্ষ-থালে; ঠাকুরের বকুনীর সহিত পৈতৃক ডাল ভাত খাইব; প্রাণে মারিবেন না।

আর একবার আপনাদের চাঁদোয়ার নীচে সুন্দর মাটীতে, এক ছেঁড়া কদলীপত্রে ভোজ খাইব:—তাহাতে দই গড়াইয়া দিব; পরমাম্র ছড়াইয়া দিব; ও তৎসঙ্গে পাম্বস্থ আঁস্তাকুড়ের শত-মন্দারিনন্দী স্বর্গীয় গন্ধ সেবন করিব:—জাতে লউন।

আর একবার চাদর কোলে করিয়া; উদ্ধব-জানু হইয়া বসিয়া; কমনীয় খুঁড়িতে পরমাম্র খাইয়া; মনোরম ঘটে জলপান করিয়া; চটি-জুতা হারাইয়া;—সঘর্ম্ম কলেবরে; শূঙ্কহস্তে; ততোধিক শূঙ্কমুখে; (কারণ হারায়িত চটি) ক্রোশান্তরে গিয়া পানাপুকুরে মুখ হস্ত ধৌত করিব।

আমি বেশ দেখিতে পাইতোঁছি—আমাদের জাতি স্বর্গলাভে ঈর্ষিত হারাধন সাম্রাজ্য নামক জাতিভ্রষ্ট কোন বঙ্গীয় কবি, আমরাদিগকে—অন্ততঃ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া এই কবিতাটি লিখিবেন।

• হায় হায়!

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
ছেড়ে দিলেন মুরগী গরু জাতের ঠেলায়;
মুড়িয়ে মাথা, ঢেলে ঘোল,
ধল্লেন আবার মাছের ঝোল,
কুম্ভোসিদ্ধ, বেগুনপোড়া, আলুভাতে তায়;
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

হায় হায়!

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
লেখেন বসে তক্তাপাষে, ঠেসে তাকিয়ায়
খেয়ে তাওয়ায় তামাক মিঠে,
ভুলে গেলেন সিগারেটে!

মাথা হেঁটে, হাতে ঘেঁটে দই চেটে খায়;
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

হায় হায়!

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
দলে মিশি' ভণ্ড ঋষি হতে যদি চায়,—
পেটের মধ্যে থেকে থেকে,
মুরগীগুলো উঠে ডেকে,
গরুগুলো হাম্বা করে—এ কি হলো দায়,—
বিলেত থেকে ফিরে এসে—হরিদাস রায়!

হায় হায়!

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে—হিন্দুর ঘবে যায়;
চেলি পরে' হলুদ মেখে,
নারায়ণকে সাক্ষী রেখে,—
ঐ সময়টাই উঠে ডেকে মুরগীগুলো হায়;—
বিলেত থেকে ফিরে এসে—হরিদাস রায়!

হায় হায়!

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
প্যাণ্ট ছেড়ে, পরেন বেড়ে কালাপেড়ে হায়;—
—করুন যা তাঁর আসে মনে,
হারাধন সাম্রাজ্য ভণ্ড
বুদ্ধিমানের রোস্টচপ টপাটপ খায়,
মনের সন্ধে চুরোট ফুকে হোটেলখানাঘ।

—কিন্তু আমরা ধর্মের জন্য, সখের জন্য,
দেবভক্তির জন্য যাহা করিতে যাইতেছি, ইহা
দ্বারা তাহা হইতে ভীত হইয়া পিছাইব না।
কোন ভগ্নাংশ যুবক, কোন গৃহহীন “একঘরে”
আমাদের সম্পদে, গৌরবে ঈর্ষিত হইয়া যে
এরূপ ব্যঙ্গ ও শ্লেষ করিতে পারে, তাহার
আর আশ্চর্য্য কি?

আমরা আপনাদের স্বর্গীয় রীতিনীতির
অনুসরণ করিব। আমরা আপনাদের ন্যায়
বন্ধকবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া, বাহিরে
আসিয়া, অমায়িকভাবে মিছা কথা কহিয়া
পুণ্য সঞ্চয় করিব। আমরা আপনাদের ন্যায়
দু'একবার গোপনে (কেন না, সাবধানের বিনাশ
নাই)—গোপনে হোটলে যাইয়া চপ্টা আস্টা
খাইয়া ইহজন্ম সার্থক করিব। ইহাতে দোষ
কি? ইহাতে ত একঘরে হইবার সম্ভাবনা
নাই।

আমরা আপনাদের ন্যায় মাংস (প্রকাশ্যতঃ)
ছাড়িয়া দিব: মাছ ধরিব (অবশ্য পুকুরে
নহে): এত দিন অনাদৃত নবগ্রন্থিত পৈতা

পরিব: গরদের কোঁচা ঝুলাইব: চন্দনের ফোঁটা
কাটিব: হরিনামের মালা লইয়া ঘড়ির চেন
করব: টিকী রাখিব: ও জাতিভ্রষ্ট কন্যা বা
ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিব—জাতি
লউন।

সত্য আমাদের মধ্যে অনেকের কন্যা নাই,
কিন্তু কখন যে হইবে না, এরূপ বলিলে কেবল
আমাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। আমাদের
সেই ভাবী কন্যাদিগের বিবাহে আপনারা বাধা
দিবেন না, ও নিমন্ত্রণ খাইবেন। আপনাদের
আশীর্ব্বাদে সে কন্যাগণ দীর্ঘজীবিনী হউক,
ও তাহাদের (ভাঙ্গ খাওয়া ব্যতীত আর সব
বিষয়ে) শিবের মত স্বামী হউক। সম্ভাব্য
কন্যাদায়গ্রস্ত যে আমরা,—আমাদের জাতি
লউন। একেবারে প্রাণে মারিবেন না।

আমরা আপনাদের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে পঞ্চম
বর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া, প্রকাশ্যে বঙ্গ-
বিধবাকে স্বার্থত্যাগের ধর্ম্ম দীক্ষিত করিব:
ভাগবতের মহিমা পাঠ করিব: হিন্দুধর্ম্ম
প্রচার করিব, অন্তঃপুরের গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ
করিয়া আসিয়া বারাঙ্গনালয়ে ভারতবর্ষের
সতীত্ব কীর্ত্তন করিব।

আমরা আপনাদের ন্যায় ভণ্ডামীর কসুম
দিয়া, জুয়াচুরির মন্ত্র পড়িয়া, নীচাশয়তার
মন্দিরে, মিথ্যার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা
করিব।

আমরা আপনাদের ন্যায় প্রতারণার ধর্ম্ম
আচ্ছাদিত হইয়া, ভীরুতার অঙ্ককারে, উচ্ছেদের
কুঠার ন্যায়ের, স্নেহের, সত্যের প্রাণে বসাইব:
জ্ঞানের দুর্গ অবরোধ করিব: উন্নতির স্রোত
রোধ করি: বিধবার, পরিত্যক্তার সন্তানের
ভ্রাতার বন্ধুকে কঠিনতার ছুরী বিধিব: আর
আপনার জাতির খাতিরে,—ভাবী কন্যাদায়ের
খাতিরে—সম্ভাব্য জামাতার কোলীনত্ব বা
অর্থের খাতিরে, জাতিচ্যুত পুত্রকে, কন্যাকে,
জামাইকে, শঙ্কমুখে, স্থিরস্বরে, হাত নাড়িয়া,
প্রেমের ভাষায় বলিব “যাও, তুমি আমার কেহ
নও।”

মহাশয়, এ ভাষায় আর লিখিতে পারি না।
এ সমাজের বিষয় আর এ বিদ্রূপের ভাষায়
আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা অসম্ভব।—ইহার ভাষা
ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায় ক্ষুদ্ৰ

ত্রব্যায়ির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদ-
দালিত ভুজঙ্গের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা
অগ্নিদাহের জ্বালা। এ ভীরুতার রাজত্বের, এ
অন্যায়ের ধর্মশালার, এ প্রবণতার রাজনীতির
বিষয় বলিতে—যদি শতশেলময়ী, দাবানলের
ক্ষুণ্ণিময়ী, নরকের জ্বালাময়ী ভাষা থাকে,
তাহাই ইহার উপযুক্ত ভাষা।

মহাশয়, আপনি কোন্ লজ্জার মাথা খাইয়া
বলিয়াছেন, যে “তোমাদিগকে আমরা সমাজে
লইব, কেবল তোমরা প্রায়শ্চিত্ত কর।” হাঁ
প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু বলুন কোন্ পাপের?
আপনারা যাহা গোপনে করেন আমরা তাহা
প্রকাশ্যে করি বলিয়া? ও আপনারা যেখানে
অসত্যের, অধর্মের প্রশ্রয় লন, আমরা সেখানে
সত্যের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াই বলিয়া?

আর কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব? কোন্
লোভে এই সমাজে ঢুকিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত?
এই জলময়, গহ্বরময়, কীটদষ্ট, ছেঁড়া সমাজে
যাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত? এ মর্খতার দালানে,
এ শঠতার ভান্ডার ঘরে, এ নীচাশয়তার আঁস্তা-
কুড়ে ঢুকিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত?—আপনাদের
উন্মত্ততা অথবা ধৃষ্টতা, যদি এই সমাজে
ঢুকিবার জন্য বিলাত-ফেরতদিগকে প্রায়-
শ্চিত্ত করিতে বলেন?—বরং আমরা আপনা-
দের সমাজে এতদিন যে ছিলাম, ইহার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন রাজি আছি। যে
সমাজে পদে পদে ভীরুতা, সত্যের গ্লানি,
নির্মমতা, যে সমাজে পদে পদে মিছা কথা,
বিবেকের বৈশ্যাবৃত্তি, সে সমাজ হইতে এত-
দিন বাহির হইয়া আসি নাই কেন, ইহার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন ত রাজি আছি।

মহাশয়, আমরা কি দঃখে, কি অসহ্য
জ্বালায়, কি লজ্জাময় যন্ত্রণায় প্রায়শ্চিত্ত
করিব বলিয়া দিউন। সত্য, আপনাদের সমাজ
হইতে আমরা ‘একঘরে’। কিন্তু তাই বলিয়া
কোন্ হিন্দুসন্তান বিলেত-ফেরতদিগের উপর
ঘণার বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে?
আমাদের সমাজ ছোট; হয়ত সহস্রাধিকও
হইবে না। কিন্তু আপনাদের সপ্ত কোটীর সমাজ
কয়টি মাইকেল বা লালমোহন ঘোষ দেখাইতে
পারে! এ সমাজ ছোট, কিন্তু মর্খ নহে। যে
সমাজে কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত ও

সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: যে সমাজে তরু দত্ত ও
রমাবাই, সে সমাজ মর্খ হতাদর, ঘণ্য নহে।
এ সমাজ একঘরে হইয়াও মহৎ। এ সমাজ
ছোট, কিন্তু এ সমাজে প্রতিজন অন্ততঃ
বলিতে পারে যে “আমি বিলেত-ফেরত।”
এ সমাজ ছোট—কিন্তু ইহা রাজার সমাজ—

আর ‘একঘরে’ হওয়াতে কিছু লজ্জার
বিষয় নাই। একঘরের অর্থ ‘কদাচারী’
নহে। একঘরে করা পৃথিবীর সর্বত্র আছে।
যে বিভিন্নমত দলের সংখ্যা অতি কম,
সেখানে সে দল একঘরে। আমাদের দেশে
যিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে পুস্তকে
পাঠাইয়াছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন।
যিনি প্রথমে পৌত্তলিকতার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া-
ছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন। যিনি
হিন্দু-বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি
একঘরে হইয়াছিলেন। একদিন ঈশাও একঘরে
হইয়াছিলেন, একদিন গ্যালিলিও একঘরে
হইয়াছিলেন। দেখিতে পাইতেছি, এ
পৃথিবীতে যাঁহারা নবপ্রথার নবনীতির, নব-
ধর্মের নেতা, তাঁহারা একঘরে। এ জগতের
প্রশ্নময় পথে যাঁহারা অগ্রগামী, যাঁহারা
জাতীয় জড়তার জীবন, যাঁহারা উন্নতির,
ধর্মের, জ্ঞানের প্রথম সহায়, তাঁহারা
‘একঘরে’। পৃথিবীতে অনেক সময়ই এক-
ঘরের অর্থ মর্খতা, বা অধর্ম নহে; ইহার
অর্থ সাহস, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ।

কিন্তু আমরা যে একঘরে, এ একঘরেতে
সাহসও নাই, কারণ ইহাতে শাস্তি নাই, বা
কণামাত্রও স্বার্থত্যাগ নাই। এ একঘরের এক-
মাত্র স্বার্থত্যাগ কন্যার বিবাহে পাত্রের অসম্ভাব।

—আমি ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সব
সমাজেই কন্যার বিবাহ হইতেছে। অর্থ ব্যয়
করিলে জামাতার অভাব হয় না।—আর তাহা
হইলেও কন্যার বিবাহের জন্য যদি এত মিছা
কথা, ভীরুতা ও লুকাচুরী, ত ইহার চেয়ে যে
কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকাও ভাল।

এ একঘরের আর একটি আরামময় ভীতি
যে ছেলের বিবাহে বা পৈতায় কেহ আমাদের
সহিত খাইবে না। সুখী আমরা! আমরা
পূর্ণাস্তঃকরণে বলি ‘তথাস্তু’। বলা বাহুল্য যে,
আমরা হিন্দুর ফলারের বা ভোজের পক্ষপাতী

নাহি। আমরা কোন হট্টগোলময়, ছিন্নকদলী-পত্রময়, 'মহাশয়, এ-পাতে'-নয়, গড়ায়িত-দধিময়, হারায়িত চটী-জুতাময়, হিন্দু ফলারে বা ভোজে খাইতে উচ্চাভিলাষী নাহি।

বলা বাহুল্য যে, আমরা আপনাদের ফলা-রের স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া যাই নাই; আপনাদের ভণ্ডামীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও অপস্থূত নাহি।

ইউরোপে 'একঘরের' অর্থ অন্যরূপ। সেখানে একঘরের অর্থ কন্যার বিবাহে গোল-যোগ নহে, বা নিষ্ফলারতা নহে। ক্রানমার্-লাটিমার যে একঘরে হইয়াছিলেন, সে একঘরে এ 'একঘরে' নহে। সে একঘরের অর্থ অন্য-রূপ। সে একঘরের অর্থ অনাহারের জ্বালা, কারাগারের যন্ত্রণা, জল্লাদের কুঠার, অনলের দাহ; সে একঘরের অর্থ বিচ্ছিন্নতার বিষাদ; একাকিতার হতাশা, সমাজের বিদ্বেষ, মৃত্যুর চিন্তা। তাহাতে তাহারা ভীত হয় নাই, স্বমার্গ হইতে স্থলিত হয় নাই, সত্য হইতে চ্যুত হয় নাই, আলিঙ্গিত ধর্ম হইতে অবিশ্বাসী হয় নাই। আর আপনার বিশ্বাস যে এক সম্ভাব্য কন্যাদায়ে, নিষ্ফলারতার আরামময় ভীতিতে আমরা পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিব। যে একঘরের অর্থ দেশের মান্য, জাতির ভক্তি, যে একঘরের অর্থ পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছন্দতা, নিরাস্তরিকুড়তা, কদলীপত্রহীনতা, সেই একঘরের ভয়ে আমরা ভীরুতার, মিথ্যার, লজ্জাময়, ঘৃণাময় পথে আত্মাকে কলুষিত করিব!

বলিতে ঘৃণা হয়, শরীরে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা হয়, এই লক্ষ্মীবর্জিত দেশে আমরা লক্ষ্মীবর্জিত জাতি, এই এক কন্যাদায়ে, এই 'জাতের' খাতিরে আজ ভণ্ডামীর দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন; ভীরু-তার, শঠতার, ক্ষুদ্রতার রাজত্ব চুকিয়াছেন, এ বিপদলা বসুন্ধরার কোণে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। এই এক প্রশ্ন হিন্দু সমাজের বিধাতা; এই কন্যার বিবাহ সর্ব্ব বিঘোর মূল, সর্ব্ব উন্নতির পর্ব্বতসম বাধা। ইহার কাছে দেশের হইলেও অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন হিতৈষিতা উৎসর্গীকৃত; ইহার কাছে হিন্দুর সাহস পরাজিত। ইহার জন্য অন্তরে ব্রাহ্ম

না। ইহার জন্য সকলে দশমাধিক বয়স্কা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন। ইহার জন্য কেহ দ্বাদশ বর্ষাধিক কন্যাকে অবি-বাহিত রাখিতে সাহসী হন না; ইহার জন্য কেহ শিশু বিধবাকে বিবাহ দিতে অগ্রসর হন না; ইহার জন্য মিছা কথা, লুকাচুরি, অধর্ম্ম; ইহার জন্য লুকাইয়া খাওয়া; ইহার জন্য প্রকাশ্যে ভ্রাতৃত্যাগ, পুত্রত্যাগ, বন্ধুত্যাগ। ইহার মন্ত্রবলে জাতি অথর্ষ, নিজ্জীব: ইহার বিষময়ী জ্বালার ভয়ে সপ্ত কোটী মানব আজ গ্রস্ত, বদ্ধহস্ত.—“নিবাত নিষ্কর্ম্মিব প্রদীপম্।”

—অহো রমণীজাতি! আজ তুমিই বংগের সর্ব্বনাশের উপায় হইলে! তুমিই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কর্ম্মের বাধা হইলে! তুমিই ভীরুতার, অধর্ম্মের কেন্দ্র হইলে! ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে অন্য উদ্দেশ্যে বংগে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। কোথায় তুমি বঙ্গবাসীর উন্নতির যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী হইবে; কোথায় অধর্ম্মের সহিত সমর-পরিশ্রান্ত বঙ্গীয় যুবকের মস্তক কোমল ক্রোড়ে রাখিবে; কোথায় তুমি এ জীবনের বিপন্ময় গিরিসঙ্কটে—অপ্সরাকণ্ঠে প্রেমের বিমল সঙ্গীত শুনাইবে; না তুমিই বংগে সর্ব্ব উন্নতির বাধা, সর্ব্ব নিষ্কর্ম্মতার ওজোর, সর্ব্ব পাপের কারণ!

মহাশয়, আমরা সত্য সে জাতি নাহি, যে শূদ্র 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' বলিয়া চিরান্দকার কারাগারে যাইতে প্রস্তুত; সে জাতি নাহি, যে জাতি 'এই হাতে মিথ্যা লিখিয়াছিল ইহা অগ্রে পুড়ুক' এ কথা জ্বলন্ত অনলের সম্মুখে নির্ভয়ে বলিতে পারে। কিন্তু যে সমাজ কন্যার কুলীন বা ধনী বরের প্রত্যাশায় মিছা কথা কহিতে পারে, শঠতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে, ও সত্যের, স্নেহের, জ্ঞানের, বিবেকের মস্তকে কুঠার মারিতে পারে, সে জাতির আশা নাই।

আমরা ভীরুর জাতি। বিলাত-ফেরতারা অন্ততঃ আমি যে সে ভীরুতা হইতে মুক্ত, তাহা বলি না। আমরা—অন্ততঃ আমি যে বিশ্বাসের জন্য হাত পুড়াইতে পারি, বা ক্রুশে ঝুলিতে পারি, তাহা বলি না। যদি কেহ বলে যে “বল পৃথিবী স্থির, নইলে তোমার নাসিকাটি কাটিয়া মুখ সমভূমি করিয়া দিব”

তাহা হইলে, যদি দেখি যে শাণিত ছুরির তামাসাটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে ত বলি “তা যদি পৃথিবী ঘোরার সহিত নাসিকার অস্তিত্বের এক গঢ় সম্বন্ধ থাকে, ত পৃথিবী মোটে ঘোরে না; পৃথিবী হিন্দু সমাজের মত স্থির ও নিশ্চল।”

কি করিব, হাত পুড়াইতে পারি না সত্য. মরিতে পারি না সত্য, কিন্তু মহাশয়, আপনার সহিত আমার একটু প্রভেদ, যে এক কন্যাদায়ে বিবেককে এত মলিন করিতে পারি না। হিন্দু সমাজের ফলারে এত সূধা নাই, কন্যার এক ধনী বা কুলীনবরে এমন মাধুরী নাই, যাহার জন্য মিথ্যার কন্দমে, ক্ষুদ্রতার আঁতাকুড়ে; লুকোচুরির ময়লাময় জগলে জীবনকে, ধর্মকে, বিবেককে বিসর্জন দিব।

* * *

মহাশয়! আপনি বলিয়াছেন যে, “প্রায়শ্চিত্ত না কর, অন্ততঃ বাহিরে হিন্দুয়ানিটা রাখিও.” অর্থাৎ ভণ্ডামিটা করিও।—মহাশয়, আমার যদি আপনার সহিত আলাপ না থাকিত, আপনার কথা কখন না শুনিতাম, আপনাকে চক্ষু না দেখিতাম, কেবল কাহার প্রতি আপনার প্রদত্ত ঐ উপদেশটি কোন সূত্রে আমার দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িত, ত আমি জ্যোতিষিক নিশ্চয়তার সহিত বলিয়া দিতে পারিতাম যে, আপনি বাঙালী ও আপনার কন্যা আছে।

—আমি বেশ জানি যে আপনি আমাকে সমাজতঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার ইচ্ছা যে, আমি একবারে মোসলমান না হই: যাহাতে আপনি অন্ততঃ আমার বাটীতে পানটা নিভয়ে খাইতে পারেন, ও হুকোটা নিভয়ে টানিতে পারেন; অথচ আপনার বাটীতে আমি গেলে আপনি আমাকে কলেকটা পর্য্যন্ত দিবেন না। যাহা হোক আপনি আপনার পুণ্যময় সমাজে বেশ আছেন থাকুন। আমিও বেশ আছি। আমি দুর্নোকায় পা দিয়া চলিতে বাগ্ন নাই ও সে দরকারও আমার নাই। সুখে থাকতে কেন ভূতে কিলোয়?

তবে একটা কথা বলি, যে আপনাদের সমাজে কয়টা টিকী আছে, যাহা ধনীর পদ-

তলে না গড়ায়?—শুনিতে পাই কালীসিংহ মহোদয় টাকা দিয়া ব্রাহ্মণদিগের টিকী খরিদ করিয়া এক টিকীর প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। আমি বিলাতে ঐরূপ নানাপ্রকার মেষের পশম প্রদর্শনী দেখিয়াছি বটে। তাহাতে নানা-জাতির মেষের পশম প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতে ঐরূপ টিকী প্রদর্শনী দেখিয়াছি কিনা, ঠিক স্মরণ হয় না। কালীসিংহ মহোদয় বোধ হয় ভারতবর্ষে প্রথম ঐরূপ প্রদর্শনী খোলেন। তাহাতে ভাটপাড়ার, নবম্বীপের, কালীঘাটের, নানা-জাতীয় পশুদের শাদা, কাল, মসৃণ, ছোট, বড়, খোলা, গেরো দেওয়া, ইত্যাদি নানাপ্রকার টিকী প্রদর্শিত হইয়াছিল ও তাহাদের নিম্নে (শুনিয়াছি) তাহাদের খরিদ দামও লিখিত হইয়াছিল, যথা:—

| টিকী | দাম | ওজন |
|---------------------|----------|--------|
| ভাটপাড়ার— | | |
| ভট্টাচার্যের টিকী | —৫. | ১ ছটাক |
| তর্কবাগীশের টিকী | —৬।। | ঐ ” |
| ঐ | | |
| (একটু মোলায়েম) | —৭।।/০ | ঐ ” |
| নবম্বীপের— | | |
| বিদ্যারঙ্গের টিকী | —৯।।/০ | ১।। ” |
| ঐ (পাকা) | —১০।।/১৫ | ঐ ” |
| শিরোমণির টিকী | —৭।।/০ | ১ ” |
| কলিকাতার— | | |
| তর্কচুড়ামণির টিকী | —৩।।/১০ | ১।। ” |
| (electricityওয়ালা) | —৪।।/১৫ | ঐ ” |

ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঐরূপ প্রদর্শনী খোলার জন্য কালীসিংহ মহোদয় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কারণ, ঐরূপ প্রদর্শনী—খুব কৌতূহলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। আমি ধনী হইলে ঐরূপ প্রদর্শনী বৎসরে বৎসরে একবার করিয়া খুলিতাম।

বাঙালার কোন এক ব্রাহ্মণ মহারাজের— (নাম করিলে মানহানির মোকদ্দমা হইতে পারে) সদাড়ি, দাড়িহীন নানাপ্রকার নানা-জাতির রাধুনি ছিল। একদিন তাহার কুল-গুরু (—টিকওয়ালা) তাহাকে কহিলেন,— “আপনি হিন্দুরাজ হইয়া ঐরূপ নানা জাতীয়

রাধুনী রাখিয়াছেন কেন?” মহারাজ উত্তর করিলেন যে, “হিন্দু রাধুনীতে ত মুরগী রাধে না. তাই মুসলমান রাখিতে হইয়াছে; আর মুসলমান ত শূকর রাধে না. তাই একজন হাড়ি রাধুনী রাখিতে হইয়াছে।” কুলগুরু কহিলেন—“এরূপ করিলে আমাদের আপনার বাটীতে আসা ভাল দেখায় না।” মহারাজ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন যে, “আপনি আমার এখানে না আসিলে আমার যে বিশেষ ক্ষতি তাহা ত দেখিতে পাই না।” বলা বাহুল্য যে. কুলগুরু বোধ হয় মহারাজের প্রতি তাঁহার স্নেহাধিকো বা নিজের দয়াগুণে. অথবা টিকীর মাহাত্ম্যে. তাঁহার সে ভীতিপ্রদর্শন কার্যে পরিণত করেন নাই।

জানি মহাশয়. এই ত আপনাদের সমাজ, টাকা বা টিকী থাকিলে. মিছা কথা কহিলে. বা গোঁফ কামাইলে. সাত খন মাফ। মহাশয়. আমার দূরদৃষ্ট যে টাকা নাই. টিকী নাই. চন্দনের ফোঁটা নাই. কোশাকুশী নাই. ও গোঁফ আছে।

আপনি বলিয়াছেন যে. “তোমাকে জাতে উঠাইবার জন্য আমরা চেষ্টিত আছি।” মহাশয়. মাফ করিবেন. কিন্তু আপনার প্রথম কথাতেই আমার আপত্তি আছে। “জাতি” একথা আজ হিন্দুর প্রতি ব্যবহার্য্য নহে। একদিন হিন্দু জাতি ছিল বটে; কিন্তু এখন হিন্দুকে জাতি বলিলে আর্ষপ্রয়োগ হয়। কাণা ছেলেকে ‘পম্মলোচন’ বলিয়া ডাকিলে অন্য লোকের যে নিদারুণ কষ্ট হয়. কেহ কাককে ‘কলকণ্ঠ’ বলিয়া ডাকিলে অন্যের যে দুঃখ হয়. পেয়াদা শব্দরূপে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে. কেহ তাঁর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে ‘সুন্দরি’ বলিয়া ডাকিলে অপরের যে যাতনা হয়. হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার তেমনি শরীরের বেদনা হয়. গায়ে জ্বর আসে।

আর ‘উঠা’ এ কথাটিও এখানে অস্থান-প্রযুক্ত। উঠা শব্দে নীচু হইতে উঁচু যাওয়া বুঝায়. উঁচু হইতে নীচু যাওয়া বুঝায় না. আর উঠার এরূপ অর্থও বোধ হয় পান্ডিতেরা দেন নাই। ইহার মাতৃশব্দ ‘উত্থান’এর নীচু

হইতে উঁচু যাওয়া এইরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব এ স্থলে (বিলেত ফেরতাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবার সময়) উঠা স্থলে ‘নামা’ বলিবেন ‘পালে মেশা’ এ বলিলেও আমার আপত্তি নাই।

সে বাহা হোক. আমার অনুরোধ যে. বিলেত-ফেরতাদিগকে আপনাদের পালে ঢুকাইবার এই মহতী উদার চেষ্টা হইতে আপনি বিরত হইবেন। বলিয়া দিই যে ও পালে মিশিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে।। বলিয়া দিই.—ও আপনারা জানিয়া বোধ হয় সুখী হইবেন যে. তাহারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছে. ও খাইতেও পায়: এবং আপনাদের প্রতি আপাততঃ নাসিকার অগ্রভাগ বাম হস্তে বন্ধাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া দেখাইতে তাহারা কিছুমাত্র শঙ্কিত নহে।

* * *

মহাশয়. বিলেতফেরতাদিগকে ‘একঘরে করা’ বা ‘জাতে তোলা!’ কথাটাই আপনাদের আশ্পর্ক। আজ যাঁহারা দেশের নেতা. জাতীয় জড়তার জীবন. ধর্ম্মের শরীরে নবপ্রাণদাতা বলিলে অতুষ্টি হয় না. তাঁহারা প্রায় সব আজ বিলেতফেরতার কেন্দ্রীভূত। আজ এ দেশ হইতে যদি বিলেত-ফেরতারা চলিয়া যায় ত দেশের কি দশা হয়? দেশে যে এ জ্ঞানের ক্ষীণপ্রভা. তাহাও নির্ভিয়া যায়. উৎসাহের যে ক্ষীণতরঙ্গ. তাহাও ভাঙিয়া যায়।

গ্রীস একদিন সক্রোটস্কে একঘরে করিয়াছিল। রোম কোরায়লেনসকে নিষ্পাসিত করিয়াছিল। খ্রীষ্ট ইউরোপ একদিন লুথারকে পীড়ন করিয়াছিল। রোমের সমাজ সীজারের বৃকে ছুরি বিধিয়াছিল।—ইহার জন্য তাহাদের পরে কাঁদিতেও হইয়াছিল।

* * *

আপনি বলিয়াছেন. “একটু হিন্দুয়ানি না রাখিলে কিরূপে তোমার বাড়ী যাই।” এখানে আপনার স্নেহের খাতিরে আপনাকে এক কথা বলিয়া দিই। ব্রাহ্মণী রাধুনী আপনার চক্ষু মুসলমানের চেয়ে সুশ্রী ও গৌরবর্ণ হয় ত রাখিলাম; ব্রাহ্মণ বলিয়া ত সে আমার চক্ষুঃ-শূল নয়। আপনি বলেন. ‘পৈতা রাখিও.’

রাখিলাম: ও বিলাতেও আমার পৈতা ছিল। টেবিলের ধারে বসিয়া আহার না করিলেও ভাগবত অশুদ্ধ হয় না; ও মুরগী না খাইলেও বাঁচি ও আবশ্যিক বোধ হইলে তাহা ছাড়াইতেও পারি।

কিন্তু মহাশয়, এ সকল বিষয় আমি স্বর্গীয় ঘণার সহিত দেখি। পৃথিবীর নৈতিক সমরে এ সকল তুচ্ছ বিষয়। বৃটজুতা পায়ে দেওয়া, টেবিলে খাওয়া, মাংস উক্ষণ করা, এ সব সুবিধাও বিলাসের অঙ্গ, নীতি ও ধর্মের নহে। ইহাদিগকে সমাজের রক্ষক করা, ইহাদের একঘরের নিয়ন্তা করা সমাজের কর্তব্য নহে। যে সমাজ এ বালুময় ভিত্তির উপর স্থাপিত, সে সমাজ থাকে না। এরূপ ভঙ্গুর সমাজ পৃথিবীর কুর্থাপি নাই ও থাকিতে পারে না।

সমাজের অন্য দৃঢ়তর বন্ধন আবশ্যিক। যাহা সমাজের ক্ষয়কারী কীট, মর্মাশী পিশাচ, সেই সকল বিষয় সমাজের প্রশ্ন করুন, সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা করুন। 'একঘরে' করিতে চাহেন, আসুন, আজ যে সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু, তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন, আজ বলি, যে শঠতা করিবে, মিছাকথা করিবে তাহাকে একঘরে করিব: যে স্ত্রী ছাড়িয়া বেশ্যাবৃত্তি করিবে, তাহাকে একঘরে করিব: যে পঞ্চবর্ষীয়া শিশুবালিকার বিবাহ দিবে, তাহাকে একঘরে করিব: যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে, তাহাকে একঘরে করিব। যে স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহাকে একঘরে করিব। আসুন, যে সব ব্যাধি জাতির বৃকে বসিয়া অবাধে বৃকের রক্ত পান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিধিতেছে, তাহাদিগকে একঘরে করি: পীড়নের হেতু করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন, দেশের মঙ্গল হইবে: জাতির জীবন হইবে। সে 'একঘরে'র অর্থ অধর্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘণা ও ক্রোধ: সে 'একঘরে'র অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ: জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত

হইবে না; কারণ, তাদের অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্তি। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম।

আপনি বলিয়াছেন—“একটু হিন্দুয়ানি রাখিও,” নহিলে আপনি আমার বাটীতে আসিবেন না;—দুঃখের বিষয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিবেন না যে, আপনাদের ভগ্নকুটীতে যাইবার জন্য তথাপি অসত্যের বা ভণ্ডামির প্রশ্রয় লইব। আপনি নহিলে আমার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। তথাস্তু। মহাশয়, এখনও আপনাদের বয়সের প্রতারণা শিখি নাই। কিন্তু আশা করি, চিরকাল এইরূপ হৃদয়কে আপনার সমাজের কলুষতা হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব। আশা করি যে, জীবনের সুখ-দুঃখের মিশ্রিত আলোক অন্ধকারে প্রাণের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এইরূপেই চলিয়া যাইতে পারিব। আশা করি, তাহাতে ভাবী কন্যার বিবাহচিন্তা, একঘরের আরামময় ভীতি ও আপনার পরিত্যাগ-সঙ্কল্পও স্থান পাইবে না।

পরিত্যাগ করিবেন? করুন। সংসার পরিত্যাগ করে করুক, তথাপি এ মাথা সংসারের কাছেও হেঁট হইবে না। সংসার যদি ভণ্ডামী চায়, প্রতারণা চায়, সে সংসারকে আমি একঘরে করিব। না হয় সংসার ছাড়িয়া একটি নিষ্কর্জন পল্লীতে, নিষ্কর্জন কুটীতে গিয়া বাস করিব। সে-ও ভাল, ভণ্ডামীর সহিত সহবাস হইতে যে, সে স্বপ্নও মধুর; প্রতারণা হইতে পর্ণকুটীরও ভাল। সেখানেও বিহংগের সঙ্গীত নিকুঞ্জে ঝঙ্কারিত হইবে; সেখানেও পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবে: সেখানেও মলয় সমীরণ বহিবে। আমার কুটীরের পার্শ্ব গোটা দুই ঝাউগাছ লাগাইয়া দিব, তাহারা সোঁ সোঁ করিয়া দিন-রাত স্বপ্নময় সঙ্গীত চালাবে: কুটীরের সম্মুখে দু-চারটি বেলের, বকুলের, মালতীর গাছ লাগাইয়া দিব, তাহারা সে কুটীরে স্বর্গের সৌরভ আনিয়া দিবে; কুটীরের পূর্বদিকের জানালায় একটি রঞ্জিত চিক টাঙাইয়া দিব: তাহাতে লাগিয়া প্রভাতের সূর্য্যকিরণ ভাঙিয়া ভাঙিয়া আমার ঘুমন্ত শিশুর গায়ে ঢালিয়া পড়িবে। ঈশ্বর আমাকে নির্ধনতার অন্ধকার, পরিত্যাগের বিষাদ দিউন, সেও ভাল; কিন্তু

যেন আত্মার কলুষতা, বিবেকের গ্লানি হইতে রক্ষা করেন।

* * *

মহাশয়, এক কথা বলিয়া দি। অন্য কারণে জাতিচ্যুত হিন্দু আপনাদের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারে; বিলেত-ফেরতারা তাহা করিবে না, ও এতদিনও (দুই একজন ছাড়া) কেহ তাহা করে নাই। হিন্দুসমাজ যদি তাহাদের সহিত মিশিতে চাহে ত ইহাকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহারা পিছাইবে না। হিন্দুসমাজকে দরওজা প্রশস্ততর ও উচ্চতর করিতে হইবে, তাহার মৌরশী নীতি ও প্রথা ছাড়িতে হইবে। আমরা তাহার ভগ্নমন্দিরে যাইবার জন্য মাথা হেঁট করিব না। তাহার উঠিতে হইবে, আমরা নামিব না। হিন্দুরা যদি আমাদের অন্তরে ভালবাসেন বা ভক্তি করেন, তবে এ তাচ্ছিল্যের ও বৈরাগ্যের ভান কেন? এ ঢাকা-ঢাকি কেন? এ সত্যের গ্লানি কেন? আমরাও হিন্দু; বিলাতে গিয়াছি বলিয়া, হিন্দুর পৌরাণিকী প্রথা ও নীতির প্রতি পূর্ণবাস্তু ঘৃণা থাকিলেও হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা যায় নাই। যদি আপনাদের বিশ্বাস যে, আমরা ইংরেজদের খোসামুদে ত সে ভুল। আমরা যাহার যেখানে যাহা ভাল দেখি, তাহা লই; তাই বলিয়া, ইংরেজদের অনেক প্রথার অনুবর্তী বলিয়া তাহাদের খোসামুদে নহি, বা দেশের প্রতি বীতস্নেহ নহি। আমরা যেমন এখানে হিন্দুর আচরণে ও প্রথায়, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাই, বিজাতীয় কেহ হিন্দুর নিন্দা করিলে যথাসাধ্য হিন্দুকে অন্য জাতির শ্লেষ ও বিদ্বেষের ভল্ল হইতে রক্ষা করি। কারণ, তাহাতে আমাদেরও গায়ে লাগে। আর আপনাকে আপনার সমাজের বিষয় নহে; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায় ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ, সেই ক্রোধেই বলিয়াছি।

মহাশয়, আমি সামান্য; কিন্তু আমার সমাজ সামান্য নহে, মূর্খের নহে। এ সমাজে আসিতে চাহেন আসুন, সমাজে এ দ্বার চিরোন্মুক্ত স্নেহের বাহু প্রসারিত। এখানে লুকোচুরি নাই, শঠতা নাই, নিম্মমতা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই। আসুন, আপনাদিগকে ভাই বলিয়া,

আর্য্য বলিয়া, হিন্দু বলিয়া এ সমাজে আলিঙ্গন করিয়া লইব। কিন্তু অতি উন্মাদ স্বপ্নেও ভাবিবেন না যে, আমরা মাথা হেঁট করিয়া, বিবেককে কলুষিত করিয়া, পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আলিঙ্গিত প্রথা ও নবজীবন বিসর্জন দিয়া আপনাদের সমাজে ঢুকিতে যাইব।

এক কথা বলিয়া দিই, বিলেত-ফেরতারা মূর্খ হইলেও তাহাদের একঘরে করিয়া আপনাদের সমাজ বলবান্ হইবে না। কোন জাতি কোনকালে নিজের মধ্যে বিচ্ছেদের নীতি অবলম্বন করিয়া বড় হয় নাই। বরং সশ্মিলনের নীতিতেই বড় হইয়াছিল। গ্রীস এই গৃহবিবাদে দুর্বল, ভারত এই গৃহবিবাদে উচ্ছন্ন হইল; রোম যে বড় হইয়াছিল, তাহা দেশীয়কে জাতিচ্যুত করিয়া নহে, বিজাতিকে স্বজাতি করিয়া। বৃটেনও বড় হইয়াছে বিচ্ছিন্নতায় নহে, মিলনে। জাতিতে কেন পৃথিবীর চারিদিকেই সংযোগই উন্নতি, বল, সভ্যতা, জীবন; বিচ্ছিন্নতা, অবনতি—ব্যাধি, বর্ষরতা, মৃত্যু।

এ সমাজে আর গৃহ-বিবাদ কেন? আজ যাহারা এই ক্ষীণ সমাজে নতন নতন ব্যাধি আনিতেছে—তাহারা হিন্দু নহে, হিন্দুর শয়তান। যাহারা এই বিচ্ছিন্ন সমাজে আবার নতন পার্থক্যের বেড়া রচনা করিতেছে—তাহারা ইহার শত্রু। যাহারা এই অন্ধমৃত জীর্ণ, জাতিতে আবার বিচ্ছেদের কুঠার মারিতেছে—তাহারা ইহার হত্যাকারী জঘন্য। বৎস! তুমি জান না যে, আজ তোমার অন্ধকারে, তোমার এ ভগ্নগৃহে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা তোমার সন্তান নহে; তাহারা তোমার শবলোলুপ, রক্ত-পিপাসু, পিশাচ। তোমার সন্তান সকলে চলিয়া গিয়াছে।

হতভাগ্য হিন্দু! তোমার এ ঘরাহ বিবাদ আর ঘুঁচিল না; তোমার অপমানের কলঙ্কের মূল এ অন্তর্দাহ আর ঘুঁচিল না; তোমার সোনার গৃহে কাল সাপ, কুসুমের কীট—এ ব্যাধি আর ঘুঁচিল না! তোমার প্রাণের কলুষতা, জ্ঞানের হলাহল বৃকের চাপা—এ বিবাদ আর ঘুঁচিল না।

আজ এ জাতির যা কিছু জীবন—‘এক-ঘরে’ করার ব্যগ্রতাতে পরিলক্ষিত, আর অন্য দিকে উত্থান শক্তিহীন। যে ঘরাহ বিবাদ পূর্বে রাজায় রাজায় ছিল, তাহা আজ ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরিণত হইয়াছে; সেই চিরশত্রু হিন্দুর রক্তপায়ী প্রেতায়া আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে।

হিন্দুসমাজ পিচিতেছে—

পৃথিবীর সজ্জা মনুষ্যজাতির আবর্জনা,
প্রত্যাড়িত পদাহত হিন্দুসমাজ—আজ
পিচিতেছে।

জীর্ণ, শীর্ণ ভাঁড় হিন্দুসমাজ—আজ
পিচিতেছে।

শঠতার ভান্ডার, মিথ্যাকথার ওস্তাদ,
লুকোচুরীর সম্ভার, ভীরুতার সেনাপতি
হিন্দুসমাজ আজ পিচিতেছে—

এ মিথ্যা, এ প্রতারণা, এ ভাঁড়ামি, এ
নির্মমতা, এ নিৰ্ব্বিবেকতা, সে পচার দুর্গন্ধ
ও দূষিত বায়ু।

[বাগেশ্রী মল্লার—তাল তাড়া]

কেন আর এ ভাঙ্গা ঘরে
মারিস তোদের সিধকাটি?
ছিন্নতরুর মূলে হ’তে
কেন ভুলে দিস্ মাটি।
বিষে জ্বর জ্বর প্রাণে,
কেন হানিস বিষবাণে,
পাপের ন্যায় ভরা দেশে
আনিস্ নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন দুঃখে
মারিস্ কুঠার মায়ের বুক্,—
দুদিন গেলে দিস্ রে ফেলে,
পূরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি!

কালিদাস ও ভবভূতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আখ্যানবস্তু

অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক, এবং অনেকেরই মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। “কালিদাসস্য সৰ্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।” সেইরূপ উত্তররামচরিত ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করিতে হইলে, এই দুইখানি নাটকের তুলনা করিলেই চলিবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আখ্যানবস্তু কালিদাস মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতে লইয়াছেন। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডেও শকুন্তলার উপাখ্যান বিবৃত আছে। এবং সেই গল্পের সহিত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সমাধিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অনেকের মতে পদ্মপুরাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরবর্তী রচনা। এবং ইহা কালিদাসেরই শকুন্তলা নাটক কাব্যাকারে গঠিত। সেই জন্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানই যে এই নাটকের মূল গল্প, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যানের সারাংশ এই:

“শকুন্তলা বিশ্বামিত্র মর্নি ও মেনকা অশুরার সন্তান: অরণ্যে বর্জিত হইয়া মহর্ষি কশ্ব কর্তৃক লালিত হইলেন। তিনি যখন যুবতী, তখন একদিন রাজা দৃশ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে মহর্ষি কশ্বের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে শকুন্তলার রূপে মূগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে একাকী ফিরিয়া যান।

“মহর্ষি কশ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানবলে সমস্ত জানিলেন এবং ঋত্বিয়দিগের মধ্যে গান্ধর্ব-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া সেই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। পরে কশ্বাশ্রমে শকুন্তলার এক পুত্র হয়। কশ্বমর্নি পুত্রবতী শকুন্তলাকে রাজসদনে প্রেরণ করেন।

“শকুন্তলা রাজসভার উপনীত হইলে দৃশ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দৈববাণী হইলে তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বিবাহ-বৃত্তান্ত রাজার স্মরণ ছিল। কিন্তু তিনি লোকলজ্জাভয়ে শকুন্তলাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।”

এই গল্পটি কালিদাস তাঁহার নাটকে এইরূপ সাজাইয়াছেন:—

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্মন্তের মৃগয়ায় বাহির হইয়া কশ্বমর্নির আশ্রমে উপস্থিত। দৃশ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের পরিচয় ও প্রেম। শকুন্তলার সহচরী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সে বিষয়ে উৎসাহদান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্মন্ত ও বয়স্য। রাজার মৃগয়ায় নিরুৎসাহ ও বয়স্যের সহিত শকুন্তলা সম্বন্ধে আলাপ। রাজাকে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য সেনাপতির নিষ্ফল অনুরোধ। তাপসদ্বয়ের প্রবেশ ও রাক্ষসগণের বিঘ্ননিবারণের জন্য রাজাকে অনুরোধ। মাতৃ-আজ্ঞাচ্ছলে দৃশ্মন্তের স্বীয় বয়স্যকে বিদায়-দান ও দৃশ্মন্তের তাপাবনের পুনঃ-প্রবেশ।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্মন্ত শকুন্তলার পরস্পরের প্রেমজ্ঞাপন ও গান্ধর্ববিবাহের প্রস্তাব। সহচরীগণের সে বিষয়ে সাহায্য-দান।

চতুর্থ অঙ্ক

দূরে বিরহিণী শকুন্তলা; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপন। শকুন্তলা-সমক্ষে দৃশ্মাসার প্রবেশ ও অভিশাপ। আশ্রমে কশ্বের প্রত্যাবর্তন ও শকুন্তলাকে গৌতমী ও তাপসদ্বয়ের সহিত পতিগৃহে প্রেরণ।

(এই অঙ্কে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা

বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্বে শকুন্তলাকে এক অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দিয়া যান।)

পঞ্চম অঙ্ক

রাজসভায় রাজা দুষ্মন্ত। গৌতমী ও তাপসম্বয়-সহ শকুন্তলার প্রবেশ, প্রত্যাখ্যান ও অন্তর্ধান।

পঞ্চম অঙ্কাবতার

ধীবর নাগরিক ও রক্ষিম্বয়। অঙ্গুরীয়ের উদ্ধার।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিরহী রাজার বিলাপ। স্বর্গ হইতে ইন্দ্রের আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি।

সপ্তম অঙ্ক

স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে হেমকূট পর্বতে দুষ্মন্তের আগমন। তৎপুত্র-দর্শন ও শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।

দেখা যাইতেছে, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত এই নাটকের বিশেষ কোন বৈষম্য নাই। কালিদাস মূল উপাখ্যানকে পল্লবিত করিয়াছেন মাত্র। প্রধান বৈষম্য এই যে (১) মহাভারত অনুসারে মহর্ষির আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র হইয়াছিল; কালিদাসের নাটকে তাহার প্রত্যাখ্যানের পরে তাহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; (২) মহাভারতের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সেই সভামধ্যেই গৃহীতা হইয়াছিলেন; নাটকে বিচ্ছেদের পরে মিলন স্থানান্তরে হইয়াছিল; (৩) সর্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য, এই অভিজ্ঞান ও দূর্ভাসার অভিলাষ।

যেমন কালিদাস তাহার গল্পটি মহাভারত হইতে লইয়াছেন, সেইরূপ ভবভূতি উত্তর-চরিত্রের আখ্যানবস্তু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামায়ণের উপাখ্যানটি এই:—

“রাম লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রজাগণ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটাইল। রাম স্বীয় বংশমর্যাদা-রক্ষার্থ তাপাবন-দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনবাস দিলেন; সীতা বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামক

যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাহার পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। তিনি তাপোরত শত্রুক রাজাকে বধ করেন। পরে অশ্বমেধ-যজ্ঞোপলক্ষে বাল্মীকি লব ও কুশকে লইয়া রামের রাজসভায় আসেন। সেখানে লব ও কুশ বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গান করে। রাম তাহাদের চিনিতে পারেন, এবং সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সীতার সতীত্ব প্রজাসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করেন। অভিমানে সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করেন।”

ভবভূতি তাহার নাটকে গল্পটি এইরূপ সাজাইয়াছেন:—

প্রথম অঙ্ক

অন্তঃপুরে সীতা ও রাম। অষ্টাবক্র মূর্খের প্রবেশ। তাহার কাছে প্রজারজন্য জানকীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে রামের প্রতিজ্ঞা। আলোচ্য দর্শন করিতে করিতে সীতার তাপাবনদর্শনে ইচ্ছা-প্রকাশ। দুর্মুখের প্রবেশ ও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ-বিজ্ঞাপন ও রামের সীতানির্ভাসনে সংকল্প।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রামের পঞ্চবটী বনে প্রবেশ ও শত্রুকের শিরশ্ছেদ। রামের জন্মস্থান-দর্শন।

তৃতীয় অঙ্ক

বাসন্তী, তমসা ও ছায়াসীতার সমক্ষে রামের বিলাপ। (এই অঙ্কে বিষ্কম্ভকে তমসা ও মুরলার কথোপকথনে প্রকাশ পায় যে, রাম হিরণ্ময়ী সীতা প্রতিকৃতিকে সহধর্মিণী করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন)। বনবাসান্তে প্রসববেদনায় সীতা গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করেন, এবং পৃথবী ও ভাগীরথী তাহাকে পাতালে লইয়া রক্ষা করেন, এবং তাহার যমজ কুমারম্বয়—লব-কুশকে মহর্ষির হস্তে অর্পণ করেন।

চতুর্থ অঙ্ক

জনক, অরুণধতী ও কৌশল্যার বিলাপ: লবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ।

পঞ্চম অঙ্ক

লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপ-
কথনে সেই যুদ্ধের বর্ণনা। লব, কুশ ও
চন্দ্রকেতুর সহিত রামের সাক্ষাৎ ও কুশের
মুখে বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ-গাথা শ্রবণ।

সপ্তম অঙ্ক

রামের সীতানির্বাসন অভিনয়-দর্শন।
রামের সহিত সীতার মিলন।

ভবভূতি মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছই
গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ, রামায়ণের রাম
বংশমর্যাদা-রক্ষার্থে, ছলে সীতাকে বনবাস দেন;
ভবভূতির রাম প্রজানরঞ্জনরূপে বিনা ছলে
জ্ঞানকীকে নির্বাসিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ছিন্ন-
শির শম্বকের দিব্যমূর্তি গ্রহণ, ছায়াসীতার
সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর
যুদ্ধ রামায়ণে নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুতর
বৈষম্য—রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কবিদ্বয়
মূল উপাখ্যান উক্তরূপ বিকৃত করিলেন
কেন?

কালিদাস শকুন্তলার পুত্র দ্বারা দৃশ্মন্ত ও
শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন।
সম্ভবতঃ এই সময়ে লব-কুশের কাহিনী কবির
মনে উদিত হইয়াছিল। এ ব্যতিক্রম কবিত্ব
হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। মিলন সম্বন্ধে
বৈষম্যও উক্তরূপ কবি-কল্পনা। কিন্তু প্রধান
বৈষম্য অভিজ্ঞান ও অভিশাপ সে উদ্দেশ্যে
কল্পিত হয় নাই। একটি গুরুতর উদ্দেশ্যে
কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন।

আমরা দেখি, এই অভিজ্ঞান ও দৃশ্বাসার
অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের অন্তর্গত করায়
একটি ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাহাতে দৃশ্মন্ত
বাঁচিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাহাকে তাহার
নাটকের নায়ক করিয়াছেন, তিনি মূল উপা-
খ্যানে একজন লম্পট রাজা; তিনি বহুপত্নীক;
মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় পদুপ হইতে পদুপা-
ন্তে বিচরণ করেন। তিনি একটি সুন্দর

কুসুমকলিকা দেখিলেই তাহাতে উড়িয়া
বসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? তিনি যে
মুগ্ধা বালিকার প্রকারান্তরে ধর্ম নষ্ট করিয়া
পলায়ন করিবেন তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।
তাহার পরে রাজসভায় বা অন্তঃপুরে সে
লজ্জার কথা প্রকাশ করিবেন না, বা স্বীকার
করিবেন না, তাহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু
কালিদাস দৃশ্মন্তকে ধার্মিকপ্রবর কর্তব্য-
পরায়ণ রাজারূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস
করিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস তাহাকে
কলঙ্ক হইতে দুইবার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,
—প্রথমবার, গান্ধর্ষ-বিবাহে; দ্বিতীয়বার, এই
অভিজ্ঞান ও দৃশ্বাসার অভিশাপে।

এই নাটকে বর্ণিত দৃশ্মন্তের চরিত্রটি
মানসিক অগদ্বীক্শণে দেখিলে তাহাকে বেশ
রসিক পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে
কবের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, কবি
বলিয়া না দিলেও পাঠক বুঝিবেন যে, তাহার
সহিত বৈখানসের কথিত “দুহিতরং
শকুন্তলাম্ অতিথিসংকারায় নিযুজ্যে”র বেশ
একটু সম্পর্ক আছে। এই আকারান্ত শব্দটি
রাজার বেশ একটু কৌতুহল উদ্দীপ্ত
করিয়াছে। রাজা যে উত্তর করিলেন,—উত্তম!
“তাং দৃক্ষ্যামি,” তাহা নিতান্ত উদাসীনভাবে
নহে। তাহার পরে সখী সহ শকুন্তলাকে
আশ্রমোদ্যানে দেখিয়া তিনি যে ভাবিলেন,—
“দুরীকৃতাঃ খলু গুণৈরদ্যানলতা বন-
লতাভিঃ” তাহাও যে ঠিক কলাবৎ হিসাবে
ভাবিলেন, তাহা নহে। তাহা হইলে তাহার
পরই “ছায়ামাগ্রিত্য” লুকাইয়া দেখিবার
প্রয়োজন কি ছিল? যেখানে মনে পাপ,
সেখানেই লুকাচুরি। তিনি চোরের মত
লুকায়িত হইয়া সখীগণের কথোপকথনে
তিনিটির মধ্যে শকুন্তলা কোন্টি, তাহা যখন
জানিলেন, তখন তিনি এ হেন রঙ্গকে
“আশ্রমধর্ম নিযুক্ত্তে” এই বলিয়া কব-
মুনিকে যে “অসাধুদর্শী” কহিলেন, তাহা
হৃদয়ে করুণরস উদ্ভিক্ত হইবার ফলে নহে।
তিনি “পাদপান্তরিত” হইয়া তাপসী বালাকে
দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

“ইদমুপহিতস্ স্কুগ্ৰামিথনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিগাহাচ্ছাদিনা বন্ধলেন।

বপূরভিনবমস্যাঃ পদ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনন্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ।”

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে স্কন্ধগ্রন্থিধ্বারা বঙ্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তন-
যুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে
শকুন্তলার নবীন দেহ, পাণ্ডুবর্ণ পরিপক
পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার
কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

পাঠক দেখিতেছেন, রাজার লক্ষ্য প্রধানতঃ
কোথায়? পরেই সোজাসর্জি কবুল জবাব,
“অভিলাষি মে মনঃ।”—পাঠকের সর্ব সংশয়
ভঞ্জন হইয়া গেল।

কিন্তু এই সঙ্কটে কার্লিদাস দৃষ্টিমন্তকে খুব
বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা লালসায় দীপ্ত
হইয়াও শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের
কথাই ভাবিতেছেন; তিনি শকুন্তলার জন্ম ও
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, আর
ভাবিতেছেন,—

“সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃ-
করণপ্রবৃত্তয়ঃ।”

[সম্ভজনগণের যেখানে সন্দেহ হয়,
সেখানে তাহাদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই স্থির-
নিশ্চয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে]।

পরে যখন তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা
মেনকার গর্ভজাতা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা, তখন
তাহার মন হইতে একটা প্রকাণ্ড ভার নামিয়া
গেল। তিনি স্বগত কহিলেন,—

“আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং
রত্নম্”

[তুমি যাহাকে অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা
করিতেছিলে, তাহা এখন স্পর্শযোগ্য রত্ন
হইয়াছে।]

এই স্থানে কবি দেখাইলেন যে, রাজা
কামুক বটে, কিন্তু লম্পট নহেন। এই মানসিক
বিশ্লেষে তাহার মনুষ্যত্ব যায় নাই, এবং তিনি
কামান্দ্র হইয়াও বিবেকচ্যুত হইয়া নাই। তিনি
পিপাসাদনে শকুন্তলাকে দেখিতেছেন সত্য,
তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই
আপনারই উপভোগ্য বিবেচনা করিতেছেন
সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুন্তলার
সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন।
তখন বৃষ্টি, যাহাই হউক, তিনি বালিকাকে

দ্রষ্টা করিয়া পলায়ন করিতে চাহেন না, তাহার
সংকল্প সাধু।

কামকবিগণ বিবাহ জিনিসটাকে নিশ্চয়ই
অত্যন্ত গদ্যময় বিবেচনা করেন। স্বর্গীয় প্রেমে
বিবাহ যেন একটা বাধা। তাহাদের মতে বিবাহ
একটা অতি অনাবশ্যক ঝঞ্জাট। তাহারা ভাবেন
যে, কাব্যে ইহার স্থান নাই।

Platonic loveএ বিবাহ নিঃপ্রয়োজন
সন্দেহ নাই। কারণ, তাহার ভবিষ্য ইতিহাস
ঐ প্রেমেই পর্য্যবসিত। কিন্তু যেখানে যৌন
মিলন, সেখানে অপরিহার্য ব্যাপার। বিবাহ
না থাকিলে এই মিলনটি পাশব ক্রিয়ামাত্র
হইয়া দাঁড়ায়। আর প্রেম জিনিসটা দাঁড়ায়
গিয়া—কর্তব্যজ্ঞানহীন কামসেবায়। বিবাহ
বুঝাইয়া দেয় যে, এ মিলন কেবল আজিকার
জন্য নয়, ইহা ক্ষণিক সম্ভাগ নহে, ইহার
একটা মহা ভবিষ্যৎ আছে, এ মিলন চিব-
জীবনের। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, নারী
কেবল ভোগ্য নহে, সম্মানার্থী। বিবাহ—
গৃহে সুখের উৎস, সন্তানের কল্যাণের হেতু
সামাজিক মঙ্গলের উপায়। ইহার উপর কেবল
ব্যক্তির শান্তি নহে, সমস্ত সমাজের শান্তি
নির্ভর করে। বিবাহই কুৎসিত কামকে সুন্দর
করে, উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়,
বিশ্বসৃষ্টিকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া
যায়। পশুদের মধ্যে বিবাহ নাই, অসভ্য
জাতির মধ্যে বিবাহ নাই। বিবাহ সভ্যতার
ফল। ইহা কুসংস্কার নহে, আবর্জনা নহে,
বিপত্তি নহে।

কাব্যে কি বিবাহের স্থান নাই? কাব্যে তবে
স্থান আছে বৃষ্টি উচ্ছৃঙ্খল কামসেবার, নগ্ন-
মূর্ত্তিদর্শনে উদ্দীপিত লালসার উত্তেজনার,
এবং পাশব সংযোগের ক্ষণিক উন্মাদনার?
বিবাহহলেও কাব্যে এ সব ব্যাপারের বর্ণনা
ন্যাকারজনক! সব মহাকাব্যে এ বীভৎস
ব্যাপার উহ্য থাকে। কেবল ভারতচন্দ্রের মত
কামকবিরা তাহার বর্ণনা করিয়া পরমানন্দ
লাভ করেন। বিনা বিবাহে এ ব্যাপারের বর্ণনা
ব্যর্থগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকার।

মহাভারতকারও এই বিবাহ কাব্যে অপরি-
হার্য বিবেচনা করিয়াছেন: পাশব সংগমের
বর্ণনা করেন নাই। আর কার্লিদাস একজন

মহাকাবি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্তব্যজ্ঞান-বর্জিত লালসা সুন্দর নহে—কুৎসিত। তিনি কুৎসিত আঁকিতে বসেন নাই, সুন্দর আঁকিতে বসিয়াছেন। তাই তিনি বিবাহ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিবেচনা করিয়াছেন। চন্দ্র সুন্দর; আকাশ সুন্দর; পদুপ সুন্দর; নিব্বরিণী সুন্দর; নারীর আকর্ষণশ্রান্ত চক্ষু ও সরস রক্তিম অধর সুন্দর। কিন্তু মানবের অন্তঃ-করণের সৌন্দর্যের কাছে এ সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায়। ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদির স্বর্গীয় সৌন্দর্য নারীর সুগোল বাহু ও পীন বক্ষ লজ্জা পায়। কর্তব্যজ্ঞানের অপেক্ষা সুন্দর কি আছে? এই কর্তব্যজ্ঞান লালসাকেও আলোকিত করে, বীভৎস কামকেও সুন্দর করে। বিবাহকে বর্জন করিয়া লালসাকে চিত্রিত করিলে তাহা সুন্দর হয় না,—কুৎসিত হয়। যাহারা কামী, তাহাদের যে এই চিত্র ভাল লাগে, তাহা এ চিত্র সুন্দর বলিয়া নহে, তাহাদের কামকে উদ্দীপ্ত করে বলিয়া।

আর এক স্থলে কবি দৃশ্মন্তকে অত্যন্ত বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যখন রাজা রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি অনায়াসে ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। একজন কামুক বিশেষতঃ একজন বহুপত্নীক রাজা ত এরূপ করিয়াই থাকে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কবি অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়া দৃশ্মন্তকে বাঁচাইয়া লইলেন। তিনি যাইবার সময়ে শকুন্তলাকে যে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দৃশ্মন্ত শকুন্তলাকে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা যায় যে, রাজার বিস্মৃতি লম্পটের বিস্মৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাজার হাত ছিল না। এমন কি, কবি ধর্ম্মভয়ই এই শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কারণ বলিয়া দেখাইয়া লইলেন। কবি এ বিষয়টি এইরূপে নাটকে প্রবেশ করাইয়াছেন। চতুর্থাঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলা দৃশ্মন্তের চিন্তায় নিষণ্ণা। দূর্ষাসা আসিয়া কহিলেন, “অয়মহং ভোঃ।” শকুন্তলা অনন্যমনা শূন্যে পাইলেন না। তাহার পরে

অনসূয়া শূন্যে পাইলেন, দূর্ষাসা অভিশাপ দিতেছেন—

“বিচিন্তয়তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামদুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি হ্যং ন স বোধিতোহপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং ধৃতামিব ॥”

[তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে (অর্থাৎরূপে) উপস্থিত এই তপোধনের, (আমার) অভ্যর্থনা করিলি না, যেমন (মদ্যাদি পানে) মত্ত ব্যক্তি যে বাক্য প্রথমে প্রয়োগ করে, পুনরায় আর তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, তেমনি সেই ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপে স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোকে স্মরণ করিতে পারিবে না।]

অনসূয়া দেখিতে পাইলেন যে, মহর্ষি দূর্ষাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি দ্রুত যাইয়া মহর্ষির পদ-তলে পড়িয়া কহিলেন,—আমাদের প্রিয়সখী বালিকা, তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। দূর্ষাসা শেষে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কোনও আভরণ অভিজ্ঞানস্বরূপ দেখাইলে রাজার স্মরণ হইবে। পরে শকুন্তলার পতি-গৃহে গমনকালে অনসূয়া কি প্রিয়ংবদা দৃশ্মন্তের অভিশাপের কথা আর শকুন্তলাকে বলিলেন না। যাইবার সময় স্বতঃ-উন্মিষা শকুন্তলার মনে একটা আশঙ্কা জাগ্রৎ করিয়া লাভ কি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে দৃশ্মন্তের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া কহিলেন যে “রাজর্ষি যদি তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে এই অভিজ্ঞানটি তাঁহাকে দেখাইবে।”

এই অভিজ্ঞান লইয়াই শকুন্তলা নাটক। কিন্তু দূর্ষাসার শাপ না থাকিলেও এই অভিজ্ঞানের বস্ত্রান্তটি আগাগোড়া নাটকের আখ্যানের সহিত খাপ খাইত; কেবল দৃশ্মন্তকে ধর্ম্মদার-প্রত্যাখ্যানকারী লম্পট-রূপে চিত্রিত করিতে হইত, এইমাত্র।

ভবভূতিও একবার রামকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন। বাণ্মীকির রাম নিজের বংশমর্যাদা-রক্ষার জন্য পতিপ্রাণ সীতাকে ছলে নিব্বাসিত করিয়াছিলেন। ভবভূতি দেখিলেন যে, তাহাতে রামের চরিত্র

মলিন হইয়া যায়। সর্বত্র ন্যায়বিচারই রাজার সর্বপ্রধান কর্তব্য। তাহার কাছে এক দিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে ন্যায়বিচার। বংশ যাউক, রাজ্য যাউক, নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিব না—এইরূপই তাহার মনের অবস্থা হওয়া উচিত। বংশমর্যাদা-রক্ষা আর কন্যার বিবাহ দেওয়াও ধর্ম, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম—ন্যায়বিচার। রাম জানেন যে, সীতা নিরপরাধিনী। যে রাজা বংশমর্যাদা-বক্ষার্থ নিরপরাধিনীকে নিষ্প্রাণিতা করেন, সে রাজার বংশমর্যাদা রক্ষা হয় না, সে রাজা সবংশে নিষ্প্রাণ হন। ভবভূতি দেখিলেন যে, এ রামে চলিবে না। তাই অষ্টাবক্রের সমক্ষে রামকে প্রতিজ্ঞাবন্ধ করাইলেন যে,—

“স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা
জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মৃগুতো নাস্তি
মে ব্যথা।”

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জানকীকে পর্যন্ত প্রজারজনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

ভবভূতি দেখিলেন যে, রাজার প্রধান ধর্ম প্রজারজন। সেই প্রজারজনরূপ কর্তব্যপালনের জন্য রাম নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিলেন। এইরূপে ভবভূতি যতদূর সম্ভব রামের চরিত্রকে দোষণ্য করিয়া লইলেন।

ভবভূতি আর এক স্থলে রামকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা শত্রুক যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি তাহার শিরশ্ছেদের পরে যে তিনি দিব্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জন্মস্থান দেখাইতে লাগিলেন, এরূপ ব্যাপার রামায়ণে নাই। রামায়ণের রাম, শত্রুক শত্রু হইয়া তপশ্চর্যা করিতেছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করেন। ভবভূতি দেখিলেন, এ অত্যন্ত অবিচার। পুণ্য-কার্যের জন্য প্রাণদণ্ড? এ রামে চলিবে না। তাহার রাম তাই কৃপা করিয়া তরবারি দ্বারা শত্রুককে শাপমুক্ত করিলেন।

কিন্তু কবিবয় এ রূপ কেন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, অলঙ্কার শাস্ত্র বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে এক শাস্ত্র আছে। যিনি যত বড়

কবিই হউন না কেন, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরাকালে সকলকেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইত। যাহারা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমন কি, যাহারা বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মুখেও বেদ মানিয়া চলিতে হইত। এই কবিবয়কে সেই অলঙ্কার শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইয়াছে। এই অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিধান এই যে, নাটকের যিনি নায়ক, তাহাকে সর্বগুণান্বিত ও দোষণ্য করিতেই হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম অত্যন্ত কঠোর, এবং ইহা নাটককারের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু গানের তাল নৃত্যের ভঙ্গী, কবিতার ছন্দ, সৈন্যের গতি—সব মহৎ জিনিসের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। নিরঙ্কুশ বলিয়াই যে কবিরাও নিয়মের শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা নহে।

নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্য ও নাটক সুকুমার কলা। নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্যে এত সৌন্দর্য্য। তবে এ নিয়ম উচিত কি অনর্চিত, তাহাই বিচার্য্য।

আমার বিশ্বাস যে, নায়ক সর্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কলাবিদগণ কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। Shakespeare-এর সর্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা বা রাজপুত্র; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং Othello এক জন General) ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতই তাহাদের চিত্রের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। Homer-এর ইলিয়ড রাজায় যুদ্ধ লইয়া রচিত।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে এ মত মানিয়া চলা হয় না। মহাকাবি Ibsen-এর রচিত বিখ্যাত সামাজিক নাটকগুলির নায়ক সকলেই গৃহস্থ। বস্তুতঃ গৃহস্থের ব্যাপার লইয়াই “সামাজিক নাটক।” স্পেনীয় ও ওলন্দাজ ও ইংরাজ চিত্রকরগণ সামান্য মনুষ্য ও দৃশ্য চিত্রিত করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন। কিন্তু Shakes-

peare-এর সর্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির সহিত Ibsen-এর নাটকগুলির বোধ হয় তুলনা হয় না। সেইরূপ Rubens বা Turner-এর নাম বোধ হয় Raphael, Titian, Michael-angelo-র সহিত এক নিঃস্বাসে উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মটি সাধারণতঃ ঠিক। বিষয় উচ্চ না হইলে নাটকের কার্যাবলীর একটা গরিমা অনর্ভূত হয় না। কোনও মহাচিত্রকর শূন্য একটা ইটের পাঁজা চিত্রিত করেন নাই। হয়ত তিনি ইষ্টক-স্তুপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নির্দোষভাবে চিত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু এই চিত্র কখন Raphael-এর Madonna-র সহিত একাসনে স্থান পাইবে না! কোনও শ্রেষ্ঠ নাটককার (Ibsen পর্য্যন্ত) কেরণীকে নাটকের নায়ক করেন নাই। লেখকের ক্ষমতা এরূপ চরিত্রাঙ্কনে পরিষ্ফুট হইতে পারে; তাহাতে সূক্ষ্ম বর্ণনা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ নাটক Shakespeare-এর Julius Caesar-এর সহিত এক পংক্তিতে বসিতে পাইবে না। এরূপ চিত্রে বা নাটকে দর্শক বা শ্রোতার হৃদয় স্তম্ভিত বা স্পন্দিত হয় না—কেবল কলাবিদের প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একটা সহর্ষ বিস্ময় হয় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত মহা রচনা কেবল ঐরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে না। যেখানে কলাবিদের নৈপুণ্যই মনে উদ্ভিত হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ব্যাপার। অতি মহৎ ব্যাপারে দর্শক বা শ্রোতা চিত্রকর বা কবির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে, তাহার রচনায় অভিভূত হইয়া যাইবে। যখন Irving অভিনয় করিতেছেন, তখন যদি মনে হয় যে, বাঃ! Irving ত সুন্দর অভিনয় করেন, তাহা হইলে সে উত্তম অভিনয় নহে। শ্রোতা Hamlet-এর কাহিনীতে Irving-এর অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তখনই বলিব, এই উত্তম অভিনয়। গ্রন্থকার সম্বন্ধেও তাই। যে নাটক পাঠ করিতে করিতে পাঠক মনে করিবে,—গ্রন্থকারের কি কৌশল, কি ক্ষমতা, কি সূক্ষ্ম দর্শন, কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইত্যাদি, সে নাটক অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক নহে। যে নাটক পাঠককে উন্ময় করে, পাঠকের সমস্ত চিন্তা,

সমস্ত অনর্ভূতি, সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে, পাঠকের জ্ঞান লুপ্ত করে, তাহাই অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক।

রাজার প্রেম, রাজার যুদ্ধ, রাজার উন্মত্ততায় অমনই একটা মোহ আছে। “রাজা” কথাই একটা ভাবের আধার। সে ভাব এই যে, ইনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি, সকলে ইহাকে মানে, সমস্ত জাতির তিনি মহিমা, বন্ধন, কেন্দ্র। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোক তাঁহাকে দেখিতে রাস্তায় জড় হয়। তিনি রাজসভায় বসিলে লোক তাঁহার পানে অনিমেষনে চাহিয়া থাকে। রাজার ব্যাপারে একটা যেন নিগূঢ় আছে। রাজা উঠিলে, রাজা উঠিলেন। রাজা শয়ন করিলে, রাজা শয়ন করিলেন। রাজা লম্পট হইলেও তিনি রাজা। রাজার ঘটনা শূন্যে ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত ভালবাসে। তাই দিদিমা গল্প করেন,—‘এক যে ছিল রাজা, তিনি একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন কি না—এক সুন্দরী রাজকন্যা।’ রাজকন্যা না হইলে গল্প জমে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজার বিষয় বস্তা কি শ্রোতা কিছুই জানে না।

কিন্তু আমার বোধ হয় যে, অনেকটা সেই জন্য এই ব্যাপারে এতখানি মোহ। যে বিষয় জানি না, অথচ যাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু কখনও কখনও শূন্যে পাই, তাহার বিষয়ে আরও জানিবার কোতূহল হয়। তাহার উপর এ আর কেহ নহে, রাজা। উন্মত্তনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে হয়; তাঁহার ইচ্ছাতে লক্ষ সৈন্য সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাঁহার অর্থ প্রত্যহ লক্ষ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে; তাঁহার প্রাসাদ যেন একটা কক্ষাবলির অরণ্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ জমকাল মনে হয়।

নাটককারগণও রাজকাহিনী বর্ণনায় বিষয় বলিয়া মনে করেন; তাহারাও একটা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র চান—যেখানে কার্যের গতি অবাধ। সমুদ্র নহিলে তরঙ্গ দেখাইয়া সুখ নাই।

এই জন্যই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকেরই নায়ক রাজা। বিষয় মহৎ হইল। তাহার উপর সেই রাজা যদি সর্বগুণসম্পন্ন হইলেন ত বিষয় মহত্তর হইল।

আমি বিবেচনা করি যে, নাটকের বিষয় মহৎ হইবে, এ নিয়ম সংগত। তবে রাজাকেই যে নায়ক করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। গৃহস্থের মধ্যেও মহৎ প্রবৃত্তি দুর্লভ নহে। একজন সামান্য ব্যক্তিও কার্যে প্রকৃত বীর হইতে পারে। প্রকৃত শৌর্য, প্রকৃত সাহস, প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণতা—সামান্য ব্যক্তির কার্যাবলিতেও প্রদর্শিত হইতে পারে। গৃহস্থও নাটকের নায়ক হইতে পারে।

তবে সে গৃহস্থ মহৎ হওয়া চাই। নায়ক সর্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরাহিত হইবেন, ইহা একটু বেশী রকমের বাঁধাবাঁধি নিশ্চয়। এরূপ কঠোর নিয়মের দোষ—(১) সব নাটকই কতকটা এক ছাঁচে ঢালা হইয়া যায়; (২) চরিত্রটি অতিমানুষিক হইয়া যায়, স্বাভাবিক থাকে না; কারণ, প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দোষ আছেই। বর্ণিত মানুষে দুঃপ্রবৃত্তির একেবারে অভাব থাকিলে সে মানুষ আর জীবন্ত মানুষ হয় না। সে কতকগুলি গুণের সমষ্টিতে পরিণত হয়। Idealistic শ্রেণীর নাটকে ইহা চলে। কিন্তু Realistic School-এর নাটকও জগতে আছে এবং তাহাও আবশ্যিক। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, একজন লম্পট বা পাষণ্ড কোনও নাটক বা কাব্যের নায়ক হয় না। তাহা চিত্রিত করিয়া জগতের সৌন্দর্য দেখান যায় না। যাহা প্রকৃত, তাহাই সুন্দর নয়। যাহা প্রকৃত, তাহাই যদি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই সুন্দর;—এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, 'সুন্দর' শব্দটিরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কুৎসিত আছে বলিয়াই 'সুন্দর' নামে কতকগুলি পদার্থকে পৃথক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অসুন্দরকে নাটকের নায়ক করিতে নাই। কোনও মহা চিত্রকর বা কবি অসুন্দর ব্যক্তি বা পদার্থ আলেখ্যে কেন্দ্রীয় চিত্র করিয়া আঁকেন নাই। তবে সুন্দরকে তুলনায় আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য কুৎসিতকে চিত্রিত করা যাইতে পারে।

মহাকাবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয়

মহৎ বটে, কিন্তু তাহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই। Hamlet-এর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতস্ততঃ করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাহার প্রধান দুঃখ Regan ও Gonerill তাহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন; পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—*Ingratitude thou marble hearted fiend* ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এতদূর অন্ধ হইলেন যে, প্রমাণ না চাহিয়াই সাধনী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth ত নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেই সব চরিত্রদোষালোর বা পাপ-প্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলতা বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goetheর Faustএও তাই।

কিন্তু Shakespeare এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহার নায়কদিগের চারি দিকে তাহারা একাট জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamlet-এ Horatio, Polonius, Ophelia; Lear-এ Kent, Fool, Edgar, Cordelia; Othello-তে বিশুদ্ধ-চরিত্রা Desdemona ও তাহার সহচরী Macbeth-এ Banquo ও Macduff; Antony and Cleopatra-তে Octavius; Julius Caesar-এ Brutus ও Portia নায়কদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্ষিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাহার কাছে সমাধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমাধিক মগ্ন হইতেন। বিরাট ক্ষমতা বিরাট বৃদ্ধি, বিরাট বিম্বেষ, বিরাট অসুয়া, বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাহার কাছে সমাধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু পুত্র

দঃখকাতর বৃদ্ধ বা ভক্ত চৈতন্য বোধ হয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব তিনি যে একেবারে বর্জিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্যকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁকজমকের নীচে স্থান দিয়াছেন।

প্রাচ্য কবিগণ একটা ধর্মের মহিমায় মহীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতার মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে: কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে অধিক প্রীতি-প্রদ ছিল। চরিত্রকে তাঁহারা ক্ষমতার নিম্নে স্থান দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। তাঁহারা তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল রাজা হইবে, তাহা নহে। নাটকের নায়কগণকে মহৎ করতে হইলে, সেই রাজার সর্বগুণান্বিত হইবার প্রয়োজন আছে। ভারতে মহাকাবি কালিদাস ও ভবভূতি ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য স্ব স্ব নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে সর্বগুণান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিস্বয় উক্তরূপে তাঁহাদের নাটকের নায়ককে সর্বগুণসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়েন নাই। রচনার স্থানে স্থানে নায়কের প্রতি কবিস্বয়ের উদ্ভিত ক্রোধ গৈরিকস্রাবের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এবং প্রপীড়িতা নায়িকার প্রতি কারুণ্য ও অনু-কম্পা ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজসভায় দৃশ্যমন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করিবার পূর্বেও (যখন ক্রোধ হইবার কারণ হয় নাই) গোতমী বলিতেছেন—

“গাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমি এ তু
এবি গ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কস্সঅ চরিত্র কিং ভগদু এক্ক
এক্কস্সিং ॥”

[এই (শকুন্তলা) গুরুজনের কোনও অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধু-বান্ধবকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব এই (শকুন্তলা এবং আপনার) আচরণ বিষয়ে মহর্ষি ক'ব তাহা কি বলিবেন? যাহা করিয়াছেন, তাহাই সমর্চিত বলিয়া জানিবেন।]

ইহা জ্বালাময় ব্যঙ্গ। প্রত্যাখ্যানের পরে শার্গরব বলিতেছেন,—

“মুচ্ছান্ত্যমী বিকারঃ প্রায়ণৈশ্বর্যমস্তানাম্।”
[ঐশ্বর্যমন্ত ব্যক্তিদিগের এইরূপ মনো-বিকার প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে।]

তাহার পর,—

“কৃতাবমর্যামনুমনামানঃ সূতাং ত্বয়া
নাম মূর্নির্বিমান্যঃ।
মুশ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো
দস্যুরিবাসি যেন ॥”

[আপনি যে এই মূর্নি-তনয়াকে স্পর্শ করিয়াছেন, মহর্ষি ক'ব তাহা জানিয়াও এখন ইহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। চৌর্য-বস্ত্র যেমন দস্যুকেই প্রদান করা হয়, মহর্ষিও সেইরূপ আপনাকে নিজ তনয়া সম্প্রদান করিয়াছেন।]

তাহার পরে যখন প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা মুখে বস্ত্রাণ্ডল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন শার্গরব তাঁহাকে ভৎসনা করিতেছেন—

“ইখং প্রতিহতং চাপল্যং দহতি।”—

[চাপল্য হেতু যে প্রণয় করিয়াছিলে, তাহাই এখন দগ্ধ করিতেছে।]

চাপল্যের ফল; না জানিয়া শুনিয়া গোপনে প্রণয় করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। দৃশ্যমন্ত তাহাতে আপত্তি করিলে শার্গরব কহিলেন,—

“আজন্মঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্য প্রমাণং
বচন জনস্য।

পর্যভিসম্ভানমধীয়তে যৈর্বিদ্যোতি তে সন্তু
কিলান্তবাচঃ ॥”

[যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে শঠতা শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তির কথা অপ্রমাণ হইল; আর যাহারা বাল্যাবধি পরপ্রতারণা বিদ্যাস্বরূপ শিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের কথাই সত্য বলিয়া গণ্য হইল!]

যাঁহারা প্রতারণাকে বিদ্যার ন্যায় অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কথাই বিশ্বাসযোগ্য বটে। সর্বশেষে যেভাবে গোতমী ও শিষ্যস্বয় শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে একটা রোষ প্রকাশ পায়,—সে রোষ কামদক রাজার প্রতি ও কামদকী শকুন্তলার প্রতি। ঋষিশিষ্য ও ঋষিকন্যার মূখে ও

আচরণে এই তীব্রতা দেখিয়া মনে হয় যে, উহাই কালিদাসের মনোগত ভাব।

ভুবভূতিও রামকে অনেক বাঁচাইয়া চলিলেও, তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তীর মূখে মনে হয়, তাহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছায়াসীতা-বিস্কম্ভকে বাসন্তী ব্যাণ্ণের মর্ম্মভেদী বাণে রামকে বিদ্ধ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন,—

“ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কোমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমণ্ণে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরূধ্য মৃগধাং
তাম্বেব শান্তামথবা কিমিহোত্তরেণ॥”

[তুমি আমার জীবনস্বরূপা, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপা, তুমি নেত্রদ্বয়ের কোমুদী, দেহের অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই সরলহৃদয়াকে প্রীতা করিয়া—যাক্, আর অধিক কথায় কাষ নাই।]

তাহার পর যখন রাম বলিতেছেন, “লোকে শূনে না কেন, তাহারাই জানে,” তখন বাসন্তী বলিতেছেন,—

“অয়ি কঠোর যশঃ কিল তো প্রিয়ং কিমযশো
ননু ঘোরতরঃপরম্।”

[হে নিষ্ঠুর! যশই তোমার প্রিয় হইল! (কিন্তু) ইহার অধিক আর কি অযশ হইতে পারে?—]

পরে বার বার সেই চিরপরিচিত স্থান দেখাইয়া রামকে ভূত-সুখস্মৃতিতে জর্জরিত করিতেছেন।

এরূপ হইবারই কথা। পৃথিবীতে এমন একজন মহাকাবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রপীড়িতের দুর্ভাগ্যে তাহার হৃদয় কাঁদে নাই। যে পাপী, তাহার দুর্ভাগ্যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। সেইজন্য মাইকেল রাবণের জন্য কাঁদিয়াছেন, মিলটন শয়তানের দুঃখে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু যে নিরাপরাধা প্রপীড়িতা নারী, তাহার দুঃখে ত কাঁদিতেই হইবে। Desdemona-র মৃত্যুর পরে তাহার সহচরীর মূখে তাঁর ভৎসনা দৈববাণীর মত শুনায়। শকুন্তলার সেই রোষ গোঁতমীর মূখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং কামপরবশা হইলেও, তিনি মৃগধা তাপসী, যারী—প্রলুপ্তা, পরিত্যক্তা। তাহার দুঃখে কবিকে কাঁদিতেই হইবে। আর সীতা—

আকাশ-পবিত্র-চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরী, সেফালিকার মত সুন্দরী, যুধিকার মত নম্রা। জগতে অতুলনীয় সীতা, তাহার জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে, কবি কাঁদবেন না? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপর কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে। ভবভূতিরও আসিয়াছে। সেই রোষ বাসন্তীর মূখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভবভূতি যে অন্তিমে প্রণয়িষদুগলের চির-বিচ্ছেদস্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে,—নাটক সুখ-দুঃখ শেষ করিতে হইবে। Tragedy সংস্কৃতে হইবার যো নাই। এই নিয়ম সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। যদি নায়ক পুণ্যবান্ হইল ত পুণ্যের ফল দুঃখ হইতে পারে না। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখাইতেই হইবে; নহিলে অধর্ম্মের জয় দেখিলে লোকের অধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা।

আমি এই নিয়মটির অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, বাস্তব-জীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া পড়িত না। ধর্ম্মের যদি অন্তিমে জয় হইতই, তাহা হইলে, সেই সব উদাহরণ দেখিয়া অধিকাংশ মানুষই ধার্ম্মিক হইত। তাহা হইলে ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য কেহ প্রশংসা পাইত না; মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম অনেক সময় আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত উচ্চ শির করিয়া চলিয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জীবন ও Martyr দেব জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

একদিন ইংলণ্ডেও Poetic Justice নামে একটি সাহিত্যিক নীতি ছিল। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের সমৃদ্ধিত বিকাশ হয় না দেখিয়া ইংরাজ নাট্যকারগণ তাহা এক রকম পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, তাহাতে মনুষ্যজীবনের এক দিক্ সাহিত্যে উহাই থাকিয়া যায়।

সাহিত্যে যদি অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় দেখান যায়, তাহা হইলে কি দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়?—কখনই নহে। ধর্ম্ম তখনই ধর্ম্ম, যখন সে আর্থিক লাভালাভের দিকে লক্ষ্য

করে না; যখন সে তাহার দঃখে দারিদ্র্যে একটা গরিমা অনুভব করে; যখন ধর্ম-পালনের সুখই ধর্ম-পালনের পুরস্কারস্বরূপ গণ্য হয়। Latimer Cranmer যে তেজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, রাণা প্রতাপ যে বলে আমৃত্যু দঃখ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার গরিমা কেবল যে দর্শক ও পাঠককেই মূগ্ধ করে, তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্য্য স্বয়ং ত্যাগীও উপভোগ করেন।

স্বর্গে যাইব বলিয়া ধার্মিক হওয়া, ভবিষ্যতে সম্পৎশালী হইব বলিয়া সৎ হওয়া, আর প্রত্যাশকার পাইব বলিয়া উপকার করার নাম ধর্ম নহে—স্বার্থ-সেবা। মোন্ডা দেখাইয়া সত্যবাদী হইতে বলা নীতিশিক্ষা দিবার প্রকৃত উপায় নহে। যে শিক্ষা সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহা সত্যের সহিত সংঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাই উচ্চ নীতি-শিক্ষা, যাহা সত্যকে ভয় করে না, আলিঙ্গন করে। নীতিশিক্ষা দিতে হয় ত বলিতে হইবে, “দেখ, চিরদিনই ধর্মের পুরস্কার সম্পদ নহে, কখন বা ধর্মের পুরস্কার—দঃখ। কিন্তু সে দঃখের যে সুখ, তাহার কাছে সম্পদ মাথা হেঁট করে।” যে প্রকৃত ধার্মিক, সে ধর্মের কোনও পুরস্কারই চায় না; সে ধার্মিক হইয়াই সুখী। সে যে ধর্মকে ভালবাসে, তাহা ধর্মের পদবী দেখিয়া নহে, ধর্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।

সত্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম বলবান্ হয় না। ধর্মের পার্থিব অধোগতি সাহিত্যে দেখিয়া, যে ব্যক্তি ধর্ম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, সে পিছাইবে না; পিছাইবে সে, যে ধর্মকে পণ্য করিয়াছে, যে ধর্মের বিনিময়ে কিছু চায়।

এই নীতির অনুসরণ করিয়া কালিদাস শেষে দৃশ্যমন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন; ভবভূতি রামের সহিত সীতার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কালিদাস মহাভারতের আখ্যায়িকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ভবভূতি বিপদে পড়িয়াছেন।

উত্তররামচরিতের সপ্তম অঙ্কে, রাম, লক্ষ্মণ ও পৌরজন বাল্মীকিকৃত সীতার নিম্বাসন নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। সেই অভিনয়ে

লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, সীতার ভাগীরথী-সলিলে ঝপ্পপ্রদান হইতে তাহার রসাতলে প্রবেশ অর্থাৎ ইঙ্গিতে অভিনীত হইল। রাম

“ক্ষুণ্ণিতবাস্পেপাংপীড়নির্ভরপ্রমুগ্ধ”

(বিগলিতাশ্রুপ্রবাহ-আকুল ও মোহপ্রাপ্ত) হইয়া সেই অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে, রাম “হা দেবি দন্ডকারণ্যবাস্যপ্রয়স্যখি চারিত্রদেবতে লোকান্তরং গতাসি” বলিয়া মূচ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন

“ভগবন্ বাল্মীকে, পরিত্রায়স্ব, পরিত্রায়স্ব, এষঃ কিং তে কাব্যার্থঃ।”

(ভগবন্ বাল্মীকি! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এ কাব্যের কি প্রয়োজন?)

নেপথ্যে দৈববাণী হইল,—

“ভো ভো সজ্জগমস্থাবরাঃ প্রাণভূতো মর্ত্য্যামর্ত্য্যঃ, পশ্যত ভগবতা বাল্মীকিনান্দৃষ্টাতং পবিত্রমাশ্চর্য্যম্।”

[হে স্থাবর-জগম, মর্ত্য্য ও অমর্ত্য্য প্রাণিগণ! ভগবান্ বাল্মীকির অনদৃষ্টানুষ্ঠিত এই পবিত্র ও আশ্চর্য্য (বিষয়) অবলোকন কর।]

লক্ষ্মণ দেখিলেন,—

“মস্থাদিব ক্ষুণ্ণিতা গাংগাম্ভো—

ব্যাপ্তাং দেবীর্ষাভিরন্তরীক্ষম্।

আশ্চর্য্যমার্য্যা সহদেবতাভ্যাং

গাংগামহীভ্যাং সলিলাদুর্দেতি ॥’

[গঙ্গাজল যেন মথিত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছে, অন্তরীক্ষ দেবতা ও ঋষিগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কি আশ্চর্য্য! আর্য্যা (সীতা) গাংগা ও পৃথিবী এই দুই দেবীসহ জল হইতে উৎখিত হইতেছেন।]

আবার নেপথ্যে ধ্বনি হইল,—

অরুণ্ধতি জগম্বন্দ্যে গাংগাপৃথ্বী ভজস্ব নৌ।
অর্পিতৈয়ং তবাভ্যাসে সীতা পৃণ্যবতা

বধুঃ ॥”

[জগৎপূজিতা অরুণ্ধতি! আমরা গাংগা ও পৃথিবী এই উভয়ে পৃণ্যবতা বধু সীতাকে আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি (ইহাকে রাম কর্তৃক পরিগৃহীতা করাইয়া) অনুগৃহীত করুন।]

লক্ষ্মণ কহিলেন, “আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্

রামকে কহিলেন, “আর্য্য পশ্য পশ্য।” কিন্তু দেখিলেন যে রাম তখনও মূচ্ছিত।

তাহার পরে প্রকৃত সীতা অরুন্ধতী সহ রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। রাম উঠিয়া গুরুজনকে দেখিলেন। গঙ্গার ও বসুন্ধরার সহিত অরুন্ধতী রামের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

“কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনু-
কম্পিতঃ”

(কি! আমি এত বড় অপরাধী হইয়াও দেবীদ্বয়ের অনুকম্পালাভ করিলাম!) বলিয়া রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। অরুন্ধতী পরে সমবেত প্রজাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

“ভো ভোঃ পৌরজানপদাঃ ইয়মধুনা
ভগবতীভ্যাং জাহুবীবসুন্ধরাভ্যামেবং প্রশংস্যা
মমারুন্ধত্যাঃ সমর্পিতা পূর্ব্বং চ ভগবতা বৈশ্বা
নরেণ নির্ণীতপুণ্যচারিত্রা সর্ব্বশকৈশ্চ দেবেঃ
সংস্তুতা সবিভূকুলবধুদেবযজনসম্ভবা সীতা-
দেবী পরিগৃহ্যত ইতি কথং ভবন্তো মন্যন্তে।”

[হে পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ! ইনি (সীতা) সম্প্রতি ভগবতী জাহুবী ও পৃথিবী কর্তৃক প্রশংসিতা হইয়া আমার নিকট অর্পিতা হইলেন, এবং পূর্ব্বং ভগবান্ বৈশ্বানর কর্তৃক পুণ্যচারিত্ররূপে নির্ণীতা ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক সংস্তুতা, এই সূর্য্যকুল-বধু দেবযজনসম্ভবা সীতা পরিগৃহীতা হউন। এ বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন?]

লক্ষ্মণ কহিলেন—

“এবমার্য্যারুন্ধত্যা নির্ভৎসিতাঃ প্রজাঃ
কৃৎস্নশ্চ ভূতগ্রাম আর্য্যাং নমস্করোতি লোক-
পালাশ্চ সপুর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে।”

[আর্য্য অরুন্ধতী কর্তৃক প্রজাগণ এইরূপে তিরস্কৃত হইল, সমস্ত ভূতগ্রাম আর্য্যাকে নমস্কার করিতেছেন,—এবং লোকপাল ও সন্তর্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।]

অরুন্ধতীর আদেশে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। লব-কুশ প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের উপর যবনিকা পড়িল।

ভবভূতি এক অঙ্কেই করিলেন—অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল—বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন। কারণ, সীতার রসাতলে প্রবেশের পরে এ চাতুরী একে-

বারে হাতে হাতে ধরা পড়ে। অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ-দৃশ্যের পরে কম্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যংগের মত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।

কালিদাস বৃন্দ্রের সহিত এমন বিষয় বাঁছিয়া লইলেন, যাহাতে কাব্যকলা বা অলঙ্কার শাস্ত্র কাহাকেও বধ করিতে হয় না। ভবভূতি এমন বিষয় বাঁছিয়া লইলেন, যাহা লইয়া অলঙ্কার শাস্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাটক হয় না।

এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া শূন্য কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, Poetic Justiceকেও হত্যা করিয়াছেন। একজন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটকে সেইরূপই করিয়াছেন।

দৃশ্যমন্ত যে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া-ছিলেন, কবি দেখাইয়াছেন যে, তাহা দৃশ্যমন্তের দোষজনিত নহে, দ্রাস্তিজনিত। সে দ্রাস্তিও দৈব, তাহাতে দৃশ্যমন্তের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রমাদ-বশতঃ নহে, স্বেচ্ছায়। প্রজাদের বাক্যে, বিচার না করিয়া, বিশ্রম্ভা, পতিগতপ্রাণা, আজন্ম-দুঃখিনী সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের কষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কষ্ট তাঁহার নিজের দোষেই হইয়াছিল। রামের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সীতা-নির্ব্বাসন ন্যায়বিচার নহে। রাম নিশ্চিত ভাবিয়াছিলেন যে, সীতাকে বনবাস দিয়া তিনি রাজকর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা করেন নাই। রাজার কর্তব্য নহে—প্রজারা যাহা বলে, তাহাই শোনা। রাজার কর্তব্য,—ন্যায়-বিচার। সীতা পত্নী বলিয়া কি প্রজা নহেন? মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রকে—প্রজারা চাহিলেই বনবাস দিতে হইবে, কি শূন্যে দিতে হইবে? Brutus পুত্রের বধের আজ্ঞা দিয়াছিলেন—পুত্র দোষী বলিয়া, প্রজা কর্তৃক অভিযুক্ত বলিয়াই নহে। সীতা অভিযুক্ত। রাম জানেন, সীতা একান্ত নিরপরাধিনী। প্রজার নিকটও

যদি সীতাকে নিরপরাধিনী সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি নিশ্চিন্তের পদক্ষেপে একটা অগ্নিপরীক্ষারও প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু কথাবাত্তা নাই, যেই অভিযোগ, অমনই বনবাস। সীতারও ত একটা অস্তিত্ব আছে। তাঁহার হৃদয়ও অনুভব করে। তাঁহাকে দুঃখ দিবার রামের অধিকার কি?—এরূপ রাম নিশ্চয়ই সীতাকে আবার পাইবার যোগ্য নহেন। পাইলেন না,—ইহাই Poetic Justice. ভবভূতির রাম প্রজারঞ্জন করিতে গিয়া মহত্তর কর্তব্য হইতে স্থলিত হইয়াছেন। সে কর্তব্য ন্যায়-বিচার। তাহা তিনি করেন নাই। তিনি জাগ্রত দিবসে নিরপরাধিনী বিশ্রম্বাকে বনবাস দিয়া আবার তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহেন। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি গড়াইয়াছেন সত্য, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বেড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু সীতার প্রতি ন্যায়-বিচার তিনি করেন নাই। তিনি সীতাকে পাইবার যোগ্য নহেন। বাস্মীকি ঠিক করিয়া-ছিলেন। কিন্তু ভবভূতি এই মিলনে একটু কাব্যকলা ও Poetic Justice উভয়েরই শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, সীতা নিজের পাতিত্রিতে রামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ উক্তি সীতার প্রতি ঘোরতর অপবাদ। সীতা তাঁহাকে হারাইয়া-ছিলেন, (কি দোষে জানি না) আবার পাইলেন (বিশেষ কি গুণে, তাহাও জানি না), দোষী এ স্থলে সীতা নহেন, দোষী রাম। রাম নিজ দোষে স্বপত্নী হারাইয়াছিলেন। এরূপ অপবাদ কেবল সীতার প্রতি নয়; এ দুর্নাম সমস্ত ধর্ম-নীতির প্রতি। ইহা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে adding insult to injury.

(যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের গৃহের আসবাবস্বরূপ দেখেন, যাঁহারা নারীকে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা নারী-জাতিকে কাম-চক্ষে দেখেন, তাঁহারা আমার কথা বদ্বিবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ যে, স্বামী চরিত্র-হীন হইলে স্ত্রী তাঁহার চরণে পদ্পাঞ্জলি দিবে ও স্ত্রী একবার ভ্রম্ভট হইলে স্বামী তাহার স্কন্ধে কুঠারঘাত করিবে, তাঁহাদিগকে বদ্বাইবার জন্য

আমার এই প্রয়াস নহে।) আমি স্বীকার করি যে, নারী দুর্বল অসহায়, কোমল-প্রকৃতি; পুরুষের অধীনে তাহাকে থাকিতেই হইবে। আমরা জানি যে, পুরুষের চরিত্রশুদ্ধির অপেক্ষা নারীর সতীত্ব দশগুণ অধিক দরকার। কিন্তু তথাপি নারীর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে—অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্য শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। নারীজাতিকে তৈজসের মধ্যে ফেলিতে পারি না, তাহাকে উপভোগ্যমাত্র বিবেচনা করিতে পারি না, বরং অনেক বিষয়ে আমরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। নারী শারীরিক বলে বা মানসিক উদ্যমে পুরুষ অপেক্ষা হীন বটে, কিন্তু সেবায় ও সহিষ্ণুতায়, স্নেহে ও স্বার্থত্যাগে, ধর্ম্মানুরাগে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নারী দুর্বল বলিয়াই পুরুষ তাহার উপর নিয়ত এই অত্যাচার করে।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত নারীর প্রতি পুরুষের সম্মান বাড়িতেছে। কেন না, সভ্যতার সহিত ক্রমে ক্রমে পুরুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হইতেছে। করায়ত্ত শত্রুর প্রতিও সভ্য-জাতি সদয় ব্যবহার করে। আর যে জীবনের সঙ্গী, গৃহের জ্যোতি, বিপদে সহায়—সে করায়ত্ত বলিয়া সভ্য পুরুষ কি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে? অনেক মনীষীর মতে নারী-জাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন দ্বারা জাতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব পরিমিত হইতে পারে। যখন এই আর্ষ্যজাতি জাতীয় উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের পুরুষ-জাতি নারী-জাতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিত। আমরা তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই ভবভূতির নাটকেই পাই। রাম সীতাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং সীতা যখন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, রাম কহিতেছেন—“আজ্ঞাপন্ন।” ইহার উপর সভ্য ইংরাজও যাইতে পারেন নাই। সেই জাতির যদি কাহারও আজ এইরূপ ধারণা হয় যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন করিলেও চলে, না করিলেও চলে, তাহা হইলে বলিব,—আজ এ জাতির বড়ই দুর্দীন!

রাম-সৈন্যের সহিত লকের যুদ্ধ ভবভূতি

পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ড হইতে লইয়াছেন। যুদ্ধ রঙ্গমণ্ডে দেখান যায় না, সেইজন্য ভবভূতি বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহার নাটকে এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে। নাটকত্ব হিসাবে এ নাটকে যুদ্ধের অবতারণার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে এই যুদ্ধ-বর্ণনা—অমূল্য! পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইব।

আমরা এই দুইখানি নাটকের গল্পাংশে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখি। প্রথমতঃ দুইখানি নাটকেই রাজার প্রণয়-কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ দুই নাটকেই প্রণয়িনী অমানুষী-সম্ভবা। তাহার পরে উভয় নাটকেই নায়ক নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুইখানিতেই প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা দৈবশক্তিবলে মাত্রালয়ে নীত হইয়া রক্ষিত হইলেন। শকুন্তলা হেমকূট পর্বতে, সীতা রসাতলে। দুইটিতেই বিচ্ছেদের পরে নায়িকার পুত্র হইল, সেই পুত্রই মিলনের উপায়স্বরূপ হইল এবং শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হইল।

কিন্তু নাটক দুইখানিতে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্য অধিক। শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি যে, এক কামুক রাজা শকুন্তলার রূপ দেখিয়া উন্মত্তবৎ; উত্তরচরিতে একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজা সীতার গুণমুগ্ধ। একখানি নাটকের বিষয়—প্রণয়ের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস; আর একখানির বিষয়—দীর্ঘ সহবাসজনিত প্রণয়ের গভীর নিভর; একটিতে রাজা কিয়দিনেই নায়িকাকে ভুলিলেন; আর একটিতে নায়ক বিয়োগে কেবল সীতার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। একজনের বহুমহিষী, আর একজন পত্নীকে বনবাস দিয়াও অনন্যপত্নীক।

নায়িকা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বৈষম্য আছে। প্রথমতঃ, শকুন্তলা যুবতী, সীতা প্রৌঢ়া। শকুন্তলা তাপসী, সীতা রাজ্ঞী। শকুন্তলা উদ্দাম-প্রবৃত্তি, রাজাকে দেখিয়াই মুগ্ধ, বিবাহে কন্বমূর্নির অনুর্তির জন্য অপেক্ষা করিতে ভর সহিল না; সীতা ধীরা, বিশ্রম্ভা, রামের বাহু আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থা। শকুন্তলা গর্বিণী, সীতা ভয়-বিহ্বলা। বস্তুতঃ, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী, সীতা সংসারী হইয়াও সম্যাসিনী।

সংক্ষেপে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়ক ও নায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে কামুক ও কামুকী; উত্তরচরিতের নায়ক ও নায়িকা দেব ও দেবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরিত্রাঙ্কন

১। দৃশ্মন্ত ও রাম

পূর্বে পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, মহাভারতের দৃশ্মন্ত একজন ভীরু লম্পট মিথ্যাবাদী রাজা। তাঁহার রাজকীয় গুণরাশির মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই। তাঁহার যে গুণ ছিল, সকল রাজারই প্রায় সে গুণ থাকিত। তিনি মৃগয়া-শীল, শ্রমসাহিষ্ণু, রণশাস্ত্রবিশারদ বীর ছিলেন—কিন্তু তিনি রঘুর মত দিগ্বিজয় করেন নাই; অর্জুনের ন্যায় সমবেত কোরব সৈন্য পরাজিত করেন নাই। দৃশ্মন্তে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা নাই, কর্ণের দাক্ষিণ্য নাই, ভীষ্মের বল নাই, লক্ষ্মণের উৎসর্গ নাই, বিদুরের তেজ নাই। দৃশ্মন্ত অতি সাধারণ ব্যাপার।

কালিদাস তাঁহার এই নাটকে দৃশ্মন্তকে অনেক উঠাইয়াছেন, অনেক বাঁচাইয়া গিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা নির্দোষ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর সুপেশী ও বিশাল বটে এবং তিনি মৃগয়া-শীলও বটে—

“অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনকুরকর্ম্মা
রবিকিরণসাহিষ্ণুঃ শ্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতর্মপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥”

[আতপসাহিষ্ণু ও অনবরত শরাসন আকর্ষণ দ্বারা নিয়তই প্রাণিহিংসারূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেছেন, তজ্জন্য ঘর্ম্মাঙ্গমও হইতেছে না, এই সমস্ত কারণে দেহ সর্বিশেষ ক্ষীণ হইলেও অত্যন্ত আয়ত বলিয়া সেই কৃশতা অনুভূত হইতেছে না, তথাপি ইনি পার্শ্বতীয় মাতঙ্গের ন্যায় মহাসারবিশিষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইতেছেন।]

কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয়?—ইহাতে এই-
মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিলাসে মগ্ন হইয়া
দিবারাত্র অন্তঃপুরে বাস করেন না; তিনি
শ্রমসাহিষ্ণু। কিন্তু ইহা দোষহীনতা; গুণ
নহে। এই শ্রমসাহিষ্ণুতা দ্বারা তিনি কোনও
মহৎ কার্য সাধন করেন নাই। মৃগয়া করিতে-
ছেন,—ব্যাপ্ত কি ভল্লুক নহে, পলায়মান হরিণ।
আর এই মৃগয়াকে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্যসন
বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।—যাহার জন্য
সেনাপতি ইহার সপক্ষে ওকালতী
করিতেছেন—

“মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবতু্যসাহযোগং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্ছিত্তং

ভয়ক্লোধয়োঃ।

উৎকর্ষ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে
চলে

মিথৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ

কুতঃ ॥”

[মৃগয়া দ্বারা মেদের অপনয়ন হেতু উদর
ক্ষীণ হইয়াছে, তজ্জন্য শরীরও লঘু এবং
উৎসাহবিশিষ্ট হইয়াছে এবং প্রাণিগণের ভয় ও
ক্লোধ জন্মিলে তাহাদের কিরূপ চিত্তবিকার
হয়, তাহাও জানিতে পারা যায়, আর ইহাতে
চণ্ডললক্ষ্যভেদ করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারীদিগের
বিশেষ হর্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (অতএব
মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ) যে মৃগয়াকে ব্যসন
বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তাহা অযথার্থ বলিয়াই
বোধ হইতেছে, এরূপ আমোদ আর কোথাও
নাই।

কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষীণ যুক্তি। প্রাণিগণের
চিত্তবিকার সম্বন্ধে জ্ঞান মৃগয়ায় যেরূপ হয়,
তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। Darwin
কিংবা Lubbock. মৃগয়া দ্বারা ইতর প্রাণি-
গণের চিত্তবিকারাদি অবগত হইয়েন নাই,
আবেক্ষণ করিয়া তাহাদের এ সব জানিতে
হইয়াছিল। মৃগয়ায় মানুষ মেদশ্ছেদকৃশোদর
হয় বটে, কিন্তু প্রাণিহত্যা না করিয়াও বহুবিধ
ব্যায়াম দ্বারা তাহা সংসাধিত হয়; এবং
পৃথিবীতে চিত্তবিনোদনের উপায়েরও অভাব
নাই। বস্তুতঃ সেনাপতি এ যুক্তিটুকু না
দিলেও নাটকের সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হানি
হইত না।

তাহার পরে কালিদাসের দৃষ্টিমন্ত রাক্ষসের
অত্যাচার-নিবারণের জন্য কশ্মলুনির আশ্রমে
কতিপয় দিবস যাপন করিতে আশ্রিত হইয়া-
ছিলেন বটে; কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তিনি সে
আশ্রমে বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাহার
প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। বিদুষক উচিত
কথাই বলিয়াছিল যে—‘এটি আপনার অনুরূপ
গলহস্ত।’

তদুপরি, রাজা মধ্যে মধ্যে এক একবার
হুঙ্কার দিতেছেন বটে। যেমন তৃতীয় অঙ্কের
শেষে—

“ভো ভোস্তপস্বিনঃ মা ভৈশ্চ মা ভৈশ্চ
অয়মহমাগত এব” ইত্যাদি।

[হে তপস্বিগণ! ভয় করিবেন না, ভয়
করিবেন না! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি।]

কিন্তু সে শৌর্য্য শরতের মেঘের মত—
গজ্জ্বল, বর্ষে না। তাহার কোনও বীরত্ব
পদস্তকমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল
হুঙ্কারমাত্র। কেবল সপ্তম অঙ্কে একবার
দেখি, তিনি দানব দমন করিয়া স্বর্গ হইতে
ফিরিতেছেন। কিন্তু সে ব্যাপার মাতলি যেরূপ
বর্ণনা করিতেছেন, তাহা দৃষ্টিমন্তের পক্ষে বড়
গোরবের কথা নহে—

“সখ্যস্তু স কিল শতক্রতোরবধ্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্ত্বং প্রভবতি যম সপ্তসপ্ত-
স্তম্বেশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥”

[সেই দানব ত্বদীয় সখা পুরন্দরের অবধ্য।
আপনিই রণমধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন,
ইহা অবধারিত হইয়াছে। দেখুন, যে নৈশ তমঃ
বিনাশ করিতে দিবাকর সক্ষম হন না, চন্দ্রমা
সেই অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন।]

সে দানবগণকে দেবরাজ বধ করিতে পারেন
না যে, এরূপ নহে—তাহারা দেবরাজের অবধ্য
—যেরূপ গো-জাতি হিন্দুর অবধ্য। এবং দেব-
রাজের শৌর্য্য দিবাকরের ন্যায়, আর দৃষ্টিমন্তের
শৌর্য্য নিশাকরের ন্যায়, এরূপ স্তোকবাক্য
মাতলি উহা রাখিলে দৃষ্টিমন্ত বোধ হয় সমাধিক
তুষ্ট হইতেন। দেবরাজ তাহার প্রতি প্রকাশ্য
সভায় বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য,
কিন্তু সে ইন্দ্রের সৌজন্য।

দৃষ্টিমন্তের আর একটি গুণ এই যে, তিনি

ধর্মশাস্ত্রে ও বিপ্রবাক্যে আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু সেরূপ আস্থাবান্,—ভারতের সকলেই ছিল। তাহাতে কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। বরং দেখি, তিনি মহর্ষির আশ্রমে অর্থাথ থাকিয়া শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করায়—ঋষিদিগের প্রতি একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন এবং এক মহর্ষির পুণ্যাশ্রম কলুষিত করিয়াছিলেন। দূর্ব্বাসার উচিত ছিল শাপ দৃশ্মন্তকে দেওয়া। প্রতারণা শকুন্তলাকে তিনি ক্ষমাও করিতে পারিতেন।

তাহার পরে দৃশ্মন্ত মাতৃ-আজ্ঞা রাখেন বটে—কিন্তু বয়স্যকে দিয়া। “সখে মাধব্য! তুমপ্যম্বাভিঃ পুত্র ইব গৃহীতঃ” বলিয়া অপ্রীতিকর কার্যে মাধব্যকে সরাইলেন, স্বয়ং চলিলেন—“তপোবনরক্ষার্থম্” নহে—সেটা মিথ্যা কথা। তিনি চলিলেন শকুন্তলার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে। এই দ্বিতীয় অঙ্কেই রাজার সত্যবাদিতার পরিচয় পাই, তিনি বয়স্যকে বদ্বাইলেন,—

“ক বয়ং ক পরোক্শম্মথো মৃগশাবৈঃ সহ
বর্ধিতো জনঃ।

পরিহাসবিজ্ঞপিতং সখে পরমার্থেন ন
গৃহ্যতাং বচঃ॥”

[সকল কলাভিজ্ঞ নাগরিক বিষয়ী পুরুষ আমরাই বা কোথায়, আর যাহাদের কামভাব আবির্ভূত হয় নাই, মৃগশাবকের সহিত বর্ধিত সেই ব্যক্তিগণই বা কোথায়? অতএব হে সখে! তোমার নিকট যাহা যাহা বলিলাম, ইহা সমস্তই অলীক পরিহাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, যথার্থ মনে করিও না।]

মহর্ষিদিগের অসুয়ার ও ভৎসনার ভয়, রাজার এখন হইতেই হইয়াছে। কালিদাস হাজারই ঢাকুন, হাজারই রং মাখান, মনের পাপ যাইবে কোথায়! কালিদাস মহাকবি। এ ব্যাপারে যে রূপ মনের অবস্থা ঘটিবে, তাহা তাহাকে দেখাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাহার লেখনীর মূখ দিয়া বাহির হইবেই।

প্রথম অঙ্কে দেখি, রাজা নিজের পরিচয় গোপন করিয়া শকুন্তলার সমক্ষে মিথ্যা কহিতেছেন। অথচ নিজে চোরের মত লুকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যেটুকু বাকী রহিল,

তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। এ স্থলে রাজার লুকাইয়া শোনায়ে ও মিথ্যা পরিচয় দেওয়ায় কি সদৃশ্যে থাকিতে পারিত! প্রবণতা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে লোকে করে না। তাহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ শকুন্তলাকে একটু যাচাইয়া লওয়া। আমি মহারাজ, এ কথা হঠাৎ বলিলেই শকুন্তলা প্রাণ খুলিয়া আর কথা কহিতেন না। অতএব বিবাহের পূর্বে একটু রসিকতা করা যাক্;—এইরূপ তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

কালিদাসের দৃশ্মন্তের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ দেখিতে পাই যে, তিনি ধর্মভীরু। এমন কি, তাহার যাহা প্রধান কলঙ্কের কথা—শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান—কালিদাস ধর্মভয়কেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পশ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন,—

“ভোস্তুপস্বিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু
স্বীকরণমগ্রভবত্যাঃ স্মরামি তং
কথামিমাভিব্যক্তসতুলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং
মন্যমানঃ প্রতিপৎসো।”

[তপস্বিগণ! চিন্তা করিয়াও দেখিলাম, ইহাকে যে কোনও কালে বিবাহ করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হইতেছে না; তবে কিরূপে আমি গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিব?]

কিন্তু ইহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য বিশেষ বাড়ে না। প্রত্যেক ভদ্রব্যক্তিরই আচরণ এই-রূপ। সুন্দরী রমণী দেখিলেই যাহার কামের উদ্বেক হয় এবং হইলেও যে ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে না পারে, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে, সে পশু। কালিদাসেরই মতে, রঘুবংশীয় প্রত্যেক রাজারই “মনঃ পরম্প্রীবিমুখপ্রবৃন্তি।” ইহাতে অহংকার করিবার কিছুই নাই।—Byron-এর Don Juan সংসারে বিরল। প্রায় প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তিই পরদারকে মাতা বলিয়া জানে। এরূপ না হওয়াই নিন্দার কথা, হওয়ায় প্রশংসার বিষয় বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস তাহার দৃশ্মন্তকে গদ্যটিকতক মনোহর সদৃশ্যে ভূষিত করিয়াছেন।

প্রথমঃ, কালিদাস দৃশ্মন্তকে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে

রাজা স্বর্চিহিত শকুন্তলাচিত্র দেখিয়া, উৎকণ্ঠ চিত্রের লক্ষণ কি, তাহা বিদুষককে কহিয়া দিতেছেন—

“অস্যাস্তুঙ্গামিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব
নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো
ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মান্দর্বািমদং
স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ
বক্তীব মাম্ ॥”

[আরও এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও উহার স্তনযুগল উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ নীচ ও প্রকোষ্ঠে বলয় অতি উন্নত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আর তৈলাক্ত বর্ণের শক্তি-বিশেষ হেতু অঙ্গে এই দৃশ্যমান মৃদুতা স্থায়িরূপে প্রকাশমান হইতেছে ও প্রণয়বশে যেন আমার মৃদুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন করিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।]

সেই চিত্র দেখিয়া স্বয়ং চিত্রাৰ্পিত শকুন্তলাকে প্রকৃত শকুন্তলা বলিয়া মিশ্র-কেশীর ভ্রম হইতেছে। পরিশেষে সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে স্বয়ং চিত্রকরের ভ্রমোন্মাদ হইল। তিনি শকুন্তলা-বদনকমলাভিলাষী চিত্রিত মধুকরকে দেখিয়া কহিতেছেন—

“অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রয়াতিথে!
কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি।
এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী
ভবন্তমনুরক্তা।

প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু
স্বাং বিনা পিবতি ॥”

[ওহে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি! এখানে উড়িয়া বসিবার কণ্ট অনভব করিতেছ কেন? —এই কুসুম-লতায় নিষণ্ণা তোমার প্রতি অনুরক্তা মধুকরী তৃষিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমা ব্যতিরেকে সে মধুপান করিতেছে না।]

তথাপি মধুকর উড়িয়া গেল না দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন—

“ভো ন মে শাসনে তিস্ঠসি, শ্রুয়তাং তর্হি
সম্প্রতি হি—

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া
সদয়মেব রতোৎসবেষু।

বিস্বাধরং দর্শাসি চেদ্ভ্রমরাপ্রিয়ায়া স্বাং
কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥”

[তুমি আমার শাসন মানিলে না, তবে এখন শোন। হে ভ্রমর! আমি সুরতোৎসব-সময়ে, অম্লান অথচ নূতন তরুপল্লবের ন্যায় লোভনীয় প্রিয়ার যে বিস্বাধর অতি সদয়ভাবে পান করিতাম, তুমি যদি তাহাতে নিষ্ঠুররূপে দংশন কর, তবে এখনি আমি তোমাকে কমলের উদরমধ্যে বন্ধন করিয়া ফেলিব।]

বিদুষক দেখিলেন, রাজার চিত্তবিভ্রম হইয়াছে। তাই ভীত হইয়া রাজাকে বঝাইলেন—

“ভো, চিত্তং কখু এদং।”

[মহারাজ! এ যে চিত্র।]

তখন রাজার চমক ভাঙিল—“কথং চিত্রম্ !”
এরূপ চিত্রনৈপুণ্য যাহার, তিনি একজন সাধারণ চিত্রকর নহেন।

পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব মধুর শ্লোকে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখি। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া আসিয়া রাজা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজসভায় বসিয়া নেপথ্যে সংগীতধ্বনি শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে রাজা বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতেছেন—

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সর্বাখতোহপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বাং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহদানি ॥”

[জীবগণ সুখে থাকিলেও মনোহর বস্তু দর্শন এবং সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া যে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বভাবতঃ নিশ্চল জন্মান্তর-সৌহদ্য অজ্ঞান-পূর্ব্বক মনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।]

রাজার কি যেন মনে পড়িতেছে, অথচ পড়িতেছে না। তিনি অগাধ সুখে একটা অগাধ বিষাদ অনভব করিতেছেন: কেন তাহা বঝিতে পারিতেছেন না। এই একটি শ্লোকে শকুন্তলার প্রতি তাহার সমাচ্ছন্ন প্রেম ও তাহার সংগীততত্ত্বজ্ঞান আমরা একত্র সম্মিলিত

দেখিতে পাই। এ প্রেম যেন দূর্বাসার
অভিশাপকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। এ সঙ্গীত-
তত্ত্বজ্ঞান যেন কবির কবিত্বকেও ছাপাইয়া
উঠিতেছে। চিন্তা ও অনুভূতি, বিরহ ও মিলন,
স্থৈর্য ও উচ্ছ্বাস এইখানে আসিয়া মিলিত
হইয়াছে। যেন তরুণায়িত নীল সমুদ্রের উপর
প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, ঘনকৃষ্ণ
মেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, লালিত
জ্যোৎস্নার উপর বনানীর ছায়া আসিয়া
লাগিয়াছে। Shakespeare এক স্থানে
বলিয়াছেন

"If music be the food of love,
 play on :
Give me excess of it, that
 surfeiting
The appetite may sicken and
 so die
That strain again ; it had a
 dying fall
O it came o'er my ear like
 the sweet south,
That breathes upon a bank
 of violets
Stealing and giving odour."

অতি সুন্দর। কিন্তু তাহাও এই শৈল্যের
কাছে লাগে না। এতখানি অর্থ তাহার মধ্যে
নাই। একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কবিত্ব তাহাতে নাই।
একসঙ্গে পূর্বজন্ম ও ইহজন্ম তাহাতে নাই।
একসঙ্গে অপসরার নৃত্য ও মর্ত্যের বেদনা,
প্রভাতের আশা আর সন্ধ্যার, বিষাদ, মাতার
রোদন ও শিশুর হাস্য তাহাতে নাই।—এ
শৈল্য অতুল।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার একটি প্রকৃত রাজকীয়
সদৃশ্য দেখি। তিনি স্বয়ং রাজকার্য পৰ্য্য-
বেক্ষণ করেন। পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রাজার
রাজ্যশাসনপ্রথার একটি নমুনা পাই।

নগরপালকের শ্যালক ও রক্ষিম্বয় এক
ধীবরকে বাঁধিয়া আনিতেছে। ধীবর রাজ-
নামাঙ্কিত অঙ্গুরী কোথা হইতে পাইল?
ধীবর বন্ধাইতেছে যে, সে এক রোহিত মৎস্যের
উদরে সে অঙ্গুরীটি পাইয়াছে। নগরপালের

শ্যালক অঙ্গুরীটি ঘ্রাণ করিয়া দেখিল; 'হাঁ,
ইহাতে মৎস্যের গন্ধ আছে বটে' বলিয়া সে
অঙ্গুরীটি লইয়া রাজার কাছে গেল।
ইত্যবসরে, ধীবরকে মারিবার জন্য রক্ষিম্বয়ের
হাত শূড়্‌শূড়্‌ করিতেছে (এটা রক্ষীদের
চিরকালই করে, দেখা যাইতেছে)। তাহার পর
নগরপালের শ্যালক পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিল,
"নিগতং এদম্।" অমনই ধীবর মনে করিল,
গিয়াছি—হা হতোহস্মি।" তাহার পর নগর
পালের শ্যালক ধীবরকে মৃত্যু করিয়া দিতে
কহিল, এবং ধীবরকে রাজদত্ত পারিতোষিক
দিল। রক্ষী কহিল যে, বেটা যমের বাড়ী
থেকে ফিরে এল—বলিয়া যেন নিতান্ত
অনিচ্ছায় ধীবরকে ছাড়িয়া দিল। ধীবর
শূলদন্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল দেখিয়া
রক্ষীদের যে বিশেষ ক্ষোভ হইয়াছিল, তাহা
তাহার পরেই দেখিতে পাই। ধীবর সেই
পারিতোষিকের অর্দ্ধেক রক্ষিম্বয়কে মদ খাইবার
জন্য দিলে, তবে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন
হইল।

দেখা যাইতেছে যে, তখনও পূর্লিশের
প্রভাব এখনকার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল
না। কয়েদীকে মারিবার জন্য তখনও তাহাদের
হাত শূড়্‌শূড়্‌ করিত। মানুষের স্বভাব!
ইতরলোকের হস্তে শক্তি, বালকের হস্তে
তরবারি, ঘাতকের হস্তে বল, ইহাদের প্রায়ই
একই অবস্থা ঘটে। তাহার পরে তখনকার
পূর্লিশের যে শূদ্ধ মারিতে নয়, উৎকোচ গ্রহণ
করিতেও হাত শূড়্‌শূড়্‌ করিত—তাহাও এই
দৃশ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই দুর্দান্ত
পশুবৎ মনুষ্যও দুর্ভ্রমন্তের রাজত্বে দূর হইতেও
অপ্রিয় রাজাজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করে
না। রাজার এইরূপ দৃঢ় কঠোর শাসন।

এই নাটকে রাজার আর একটি কোমলত্ব
দেখি। দেখি—তিনি রাজ্ঞীদিগকে দস্তুরমত ভয়
করেন। শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে
রাজ্ঞী আসিয়া পড়িলে তিনি ভয়ে চিত্রখানি
লুকান, রাজ্ঞীদের ভয়ে বয়স্যকে মিথ্যা করিয়া
বলেন যে, তাহার কর্ণিত শকুন্তলা-বৃন্দান্ত
সমস্ত অমূলক পরিহাস; বিরহে রাজ্ঞীদের
সমক্ষে সহসা অসতর্ক মূহুর্তে শকুন্তলার নাম
করিয়াই লজ্জায় অধোমুখ হইলেন।—ইহা

গুণ বলিব কি দোষ বলিব, তাহা জানি না। সময়বিশেষে ইহা গুণ, এবং সময়বিশেষে ইহা দোষ।

দুঃস্মন্তের চিত্রনৈপুণ্য ও সংগীতাভিজ্ঞতা, উভয়ই কলাবদ্যায় পারদর্শিতামাত্র, চরিত্রের গুণ নহে। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ এমন কোন গুণরাশি নাই, যাহাতে তাঁহাকে সর্বগুণ-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। মহাভারতের দুঃস্মন্ত-চরিত্রের উপর কালিদাস গিয়াছেন বটে; তথাপি তিনি দুঃস্মন্ত-চরিত্রকে একটি আদর্শ-চরিত্র করিতে প্রয়াসী হন নাই—এবং যদি হইয়া থাকেন ত কৃতকার্য হন নাই। তাঁহার ন্যায় অতিথি কোনও গৃহে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার ন্যায় পতি কোনও নারী শিবের কাছে বর চাহিবেন না। তাঁহার ন্যায় বীর কোনও দেশে বরণীয় হইবেন না। তাঁহার মত রাজা হউক বলিয়া কোনও প্রজা ঈশ্বরের কাছে মাথা খুঁড়িবে না।

এই ব্যক্তি এই জগন্মিথ্যাত নাটকের নায়ক। পাঠক কহিবেন, তবে কি হইল? এ দুঃস্মন্ত-চরিত্রের যদি কোন বিশেষত্ব নাই, তবে এ নাটক এত জগন্মিথ্যাত নাটক হইল কি প্রকারে! তাহার উত্তর এই যে, দুঃস্মন্ত এইরূপ সামান্য-চরিত্র হইলেও কালিদাস তাঁহাকে লইয়া খেলাইয়াছেন চমৎকার। তাহাই এখন দেখাইব।

এই নাটকের বস্তুতঃ তিন ভাগ। প্রথম ভাগ প্রথম তিন অঙ্কে—প্রেম। দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে—বিচ্ছেদ। তৃতীয় ভাগ শেষ দুই অঙ্কে—মিলন। প্রথম ভাগে রাজার পতন, দ্বিতীয় ভাগে উঠবার চেষ্টা, তৃতীয় ভাগে উত্থান।

দুঃস্মন্তের চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহার এই পতনে ও উত্থানে। মৃগয়াসূত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার যতদূর সম্ভব পতন হইল। লুকাইয়া শোনা, মিথ্যা করিয়া আশ্বপরিচয় দেওয়া, শকুন্তলাকে দেখিয়াই আপনার উপভোগ্যা নারী বিবেচনা করা, মাতৃ-আজ্ঞায় উদাসীন হওয়া ও মাধবাকে ছল করিয়া রাজধানী পাঠান এবং মিথ্যা বলা, এবং বিবাহান্তে কাম্বুদিনির আগমনের পূর্বেই চৌরের মত পলায়ন করা—যতরূপ গর্হিত

কাজ করা সম্ভব, তিনি করিয়াছেন। পাপাচারে কেবল একটিমাত্র পুণ্যের রেখা—তাঁহার গান্ধর্ষ বিবাহ। একমাত্র ইহাই তাঁহাকে প্রথম তিন অঙ্কে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার উঠবার পথ রাখিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়াছেন;—পতনের চরম সীমা। এই অঙ্কে দেখি, রাজা সেই বিস্মৃতি-সাগরে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন— একবার উপরে উঠিতেছেন, আবার ডুবিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সভায় উপনীত হইবার পূর্বেও রাজা সংগীত শুনিয়া উন্মনা হইতেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বর্তমানে অতীত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শকুন্তলা তাঁহার সভায় আসিলে সম্মুখে যখন ঋষিগণ শপথ করিতেছেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীতা ভার্যা—তাঁহার তখন সন্দেহ হইতেছে,— “কিমগ্রভবতী ময়া পরিণীত-পূর্বা।” কিন্তু স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলার “নাতিপরিষ্ফুট শরীরলাবণ্য” দেখিতেছেন, তাঁহার লোভ হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিতেছেন, “ভবত্যনির্ধ্বংগং খলু পরকলত্রম্।” শকুন্তলার উন্মুক্ত বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

“ইদমূপনতমেবং রূপমর্কিষ্টিকান্তি
প্রথমপরিগ্রহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবসান্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সর্পাদি ভোক্তুং নাপি শক্লোমি
মোক্তুম্ ॥”

[এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না? এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দ-পুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।]

তথাপি তিনি ধর্মপথ হইতে একপদও বিচলিত হইতেছেন না। শকুন্তলা যখন বলিতেছেন—

“পোরব জুস্তং গাম তুহ পুরা অস্‌সমপদে
সব্‌ভাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জগং তধাসম

অপদ্ববঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ঈদিসেহি
অক্খরেহিং পচ্চাক্খাদুং।”

[পোরব! পূর্বে আপনি আশ্রম-স্থানে
আমার মন প্রণয়-প্রবণ দর্শন করিয়া,
নিয়মপূর্বক গ্রহণ করতঃ সম্প্রতি
এরূপ নিষ্ঠুরাঙ্কর কিরূপে ব্যস্ত
করিতেছেন? ইহা কি আপনার উচিত
হইতেছে?]

তখন রাজা কর্ণে হাত দিয়া কহিলেন,
শান্তং শান্তম্।
ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাণ্ড নাম
পাতয়িতুম্।
কদলকষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং
তটতরুণ্ড ॥”

[ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কদলকষা নদী
যেমন বিমল সলিলরাশি কলুষিত করে এবং
তটস্থ তরুসকলকেও নিপাতিত করিয়া থাকে,
তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকে কলুষিত
এবং আমাকেও নিপাতিত করিবার অভিলাষ
করিতেছ।]

তৎপর শকুন্তলা যখন অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান
দেখাইতে চাহিলেন, রাজা উঠিতে চেষ্টা
করিলেন, বলিলেন,—“প্রথমঃ কল্পঃ।” যখন
শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে অসমর্থ হইলেন,
রাজা কহিলেন—

“ইথং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।”

[এই কারণেই লোকে বলিয়া থাকে যে,
স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি।]

তাহার পর অবিশ্বাসের উপরে অবিশ্বাসের
টেউ আসিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল।
তিনি এতদূর নিম্নে নামিয়া গেলেন যে,
সমস্ত স্ত্রীজাতিকে (তাহার' মধ্যে তাপসী
গৌতমী একজন) তিনি তীর ব্যাঙ্গে আক্রমণ
করিলেন,—যাহা উদ্ধৃত করিতে আমি ঘৃণা
বোধ করি। তাহার পর শকুন্তলা তাহাকে তীর
ভৎসনা করিলে, তাহার বিভ্রমবিবর্জিত রোষ-
রক্তিম বদন দেখিয়া আবার রাজার সন্দেহ
হইতেছে—

“ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোহতিপদরুশাঙ্করং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমাক্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ
প্রকাশবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥

অপিচ সিন্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতবমি-
বাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। তথাহানয়া—

ময্যেবমস্মরণদারুণচিন্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যামানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুশয়া স্মরস্য।”

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না,
ইহার চক্ষুও অতিশয় লোহিতবর্ণ ধারণ
করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাঙ্করবিশিষ্ট
এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পদরুশগণের প্রতি
সংগত হয় না। অপিচ, ইহার ভাব আমি
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অকারণে
আমার প্রতি এই রমণীর এরূপ কোপ কখন
সম্ভব হয় না। আমি যে ইহাকে বিবাহ করি-
য়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে
কি এই কামিনী মদনানলে সন্তপ্ত হইয়াছে?
... কি আশ্চর্য্য! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ
ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া থাকে।]

তৎপরে দৃষ্ণমন্ত আবার বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন
হইলেন।

এই অঙ্কে দেখি, হাঁ, রাজা দৃষ্ণমন্ত কামুক
হউন, মিথ্যাবাদী হউন,—একটা মানুষ বটে।
সম্মুখে অসামান্য রূপবতী যুবতী পতিত্ব
ভিক্ষা করিতেছে। কখনও কাতরস্বরে, কখনও
তর্জান গর্জনে। সেই রূপ—যাহাতে “দুরী-
কৃতাঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ”; সেই রূপ—
যাহা “মানুষেষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য
সম্ভবঃ”; সেই রূপ—যাহা দেখিয়া তিনি
কামুকের কাজ করিয়াছিলেন, আতিথ্যের অব-
মাননা করিয়াছিলেন, ঋষির অভিশাপভয় তুচ্ছ
করিয়াছিলেন; সেই রূপ এখনও ম্লান হয়
নাই, এখনও শরীরলাবণ্য ন্যতিপরিষ্কৃত। সে
আসিয়া পতিত্ব ভিক্ষা চাহিতেছে। কিন্তু অপর
দিকে ধর্মভয়। ঋষি ও ঋষিকন্যা সম্মুখে
কখনও মিনতি করিয়া রাজাকে শকুন্তলার জন্য
কহিতেছেন, কখনও বা বিনিপাতের ভয়
দেখাইতেছেন! কিন্তু রাজা কি করিবেন, অপর
দিকে ধর্মভয়। একদিকে অমানুষীসম্ভব রূপ,
ঋষির ক্রোধ, নারীর অনুনয়; আর একদিকে
ধর্মভয়।

তিনি ডুবিতেছেন, কিন্তু সন্তরণদক্ষ হস্তে
উঠিবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, পারিতেছেন

না। একটা দৈববল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই কুম্ভাটিকা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন; যেন পিঞ্জরাবন্ধ সিংহ প্রবলবিক্রমে লোহপিঞ্জর চূর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাহার প্রভুর গজ্জন শুনিয়াই অস্ফুট করুণ শব্দে শির নত করিতেছে। দৃশ্যমন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত দীপ্ত-শ্বাসে ফণা বিস্তার করিয়াই ধূলায় লুপ্ত হইতেছেন। এরূপ দৃশ্যে একটা মোহ আছে, উল্লাস আছে। হাঁ, দৃশ্যমন্ত একটা মানুষ বটে।

এই পঞ্চম অঙ্কে একাট অপদূর্ষ জিনিস দেখি। দেখি, অলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ হইতেছে। একদিকে ক্ষত্রিয়ের তেজ, আর একদিকে ব্রাহ্মণের তেজ, ঋষিশিষ্যদ্বয় ও ঋষিকন্যা গৌতমী দৃশ্যমন্তকে কি ভৎসনাই না করিয়াছেন! দৃশ্যমন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে এক পদ স্থলিত হইতেছেন না। অথচ ব্রাহ্মণের অভিশাপও শিরে রহন করিতে হইতেছে, ফেলিতে পারিতেছেন না।—অপদূর্ষ!

আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি। গ্রীক নাটকে এইরূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জার্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই, ইংরাজ নাটকে পড়ি নাই।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি যে, শকুন্তলার সহিত পরিণয়-বস্ত্রান্ত বিরহী রাজার স্মরণ হইয়াছে। বসন্তোৎসব আসিয়াছে। তথাপি রাজভবন নিরুৎসব। চেটীন্দ্র কামদেবের অর্চনার জন্য আশ্রমকুল পাড়িতেছে। কণ্ডুকী আসিয়া নিষেধ করিলেন। রাজা রাজ্যে বসন্তোৎসব রহিত করিয়া দিয়াছেন।

তাহার পরে কণ্ডুকী তাহাদের কাছে রাজার চিন্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—

“রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভিন্ প্রত্যহং
সেব্যতে শয্যোপান্তবিবর্তনৈর্বিগময়তুমিদ্ৰ
এব ক্রপাঃ।

দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচম্ চিতামন্তঃপুৱেভ্যো যদা
গোৱেষু স্থলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবন-

মুশ্চিরম্ ॥”

[এখন তিনি সমস্ত রম্য-পদার্থের প্রতিই বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং এখন আর

পদূর্ষের মত অমাত্যদিরাও প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিতেছে না। রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় না, শয্যার উভয় দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়াই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। আর যখন দাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে উচিতমত উত্তর প্রদান করিতে চান, তখন বচন স্থলিত হয় এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবস্থিত করিতে থাকেন।]

তাহার পর তাপসবেশধারী রাজা বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত প্রবেশ করিলেন। কণ্ডুকী তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

“প্রত্যাদিষ্টবিশেষমন্ডনবিধিবামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রংকাণ্ডনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরস্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতান্ননয়নস্তেজোগদুর্গৈরাশ্বনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামর্গিরিব ক্ষীণোহপি
নালক্ষ্যতে ॥”

[ইনি নানাবিধ ভূষণপ্রিয় হইলেও তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল বাম প্রকোষ্ঠে একগাছি মাত্র স্বর্ণবলয় পরিহিত রহিয়াছে, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা অধরোষ্ঠ নিপীড়িত হইয়াছে এবং চিন্তাজনিত জাগরণ ঘটিয়াছে বলিয়া নয়নযুগল অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে ইনি অতিশয় ক্ষীণ হইলেও স্বীয় গুণ দ্বারা শাগিত অস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।]

রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন—

“বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যাপিশুনং ব্রূহি অদ্য
চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিধর্ম্মাসনমধ্যা-
সিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ
পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।”

[বেত্রবতি! আমার বাক্যানুসারে অমাত্য পিশুনকে বল, যে, অদ্য আমি অত্যন্ত নিশা-জাগরণ হেতু ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না, আপনি যাহা কিছু পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবেন, তাহা পত্রের মধ্যে আরোপিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।]

রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা যথার্থ আদেশ দিলেন। কেবল কল্য রাত্রিজাগরণের জন্য তিনি আজ ধর্ম্মাসনে বসিতে অক্ষম; তথাপি বিশেষ কোন কাজ থাকিলে তিনি স্বয়ংই করিবেন।

তাহার পরে প্রিয় বয়স্যের সম্মুখে রাজা তাহার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত করিলেন। বিদুষক আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। রাজা অঙ্গুরীয়কে ভৎসনা করিলেন—

“অয়ে ইদং তদস্দুলভস্থানভ্রংশে শোচনীয়ম্।

কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুর্দালিং

করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভাসি।

অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে

ময়েব কস্মাদববীরিতা প্রিয়া॥”

[এই অঙ্গুরীয়ক অস্দুলভ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহার অবস্থা শোচনীয়: অঙ্গুরীয়ক! তুমি কেন সেই কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুর্দালিবিশিষ্ট কর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সলিলে নিমগ্ন হইলে? অথবা ইহা ত অচেতন পদার্থ, দোষ-গুণ-বিচারে অক্ষম: কিন্তু আমি—বিশিষ্টরূপ চেতনাবান্ হইয়াও—কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিলাম!]

পরে রাজা শকুন্তলার উদ্দেশে কহিলেন,—

“প্রিয়ে! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দগ্ধহৃদয়-স্তাবদনুকম্পতাময়ং জনঃ পুনন্দর্শনে।”

[প্রিয়ে! অকারণ পরিত্যাগ হেতু অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, এখন পুনর্বার দর্শন দিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।]

তাহার পরে স্বাভিকত শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে অভিভূত হইয়া বাষ্প বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

তৎপরেই রাজকার্য্য আসিল। মন্ত্রী পরামর্শ চাহিয়া পাঁছেন—“বিদিতমস্তু দেবপাদান ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ বারিপথোপ-জীবী নোবাসনে বিপন্নঃ, স চানপত্যঃ, তস্য চানেককোটীসংখ্যং বসু, তদিদামীং রাজস্ব-তামাপদ্যতে ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।”

[মহারাজের অবগতি হইল যে, জল-পথোপজীবী ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ নৌকা-নিমজ্জন হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও নিঃসন্তান, তাহার বহু কোটি-সংখ্যক রত্নাদি আছে, তাহা এখন রাজস্বায়িকতা প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ কর্তব্য অবধারণ করুন।]

রাজা আশ্চর্য্য দিলেন, তাহার এক বিধবার গর্ভস্থ সন্তান আছে; সে সম্পত্তি পাইবে।

তাহার পরে কহিলেন—

“কিমেনে সন্ততিরস্টি নাস্তীতি।

যেন যেন বিযুক্ত্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।

ন স পাপাদৃতে তাসাং দৃশ্মন্ত ইতি

ঘৃষ্যতাম্॥”

[সন্তান আছে না আছে, তাহাতে কি প্রয়োজন? প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে বন্ধুগণ কর্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা দৃশ্মন্ত তাহাদের সেই সেই বন্ধু বালিয়া ঘোষিত হইবেন।]

এই স্থানে কবি তাহার নাটকের নায়ককে আর একবার খেলাইয়াছেন চরম। এত শোকেও রাজা রাজকার্য্য ভুলেন নাই। শাসন পূর্বেই মত যন্ত্রবৎ চলিতেছে। কিন্তু এই শাসনে রাজার শোকের ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। কঠোরে মধুর আসিয়া মিশিয়াছে। উপরে উন্মত্ত রাজাজ্জায় আমরা দেখি যে, সে আজ্জায় তাহার শোক ও তাহার ধর্মজ্ঞান, তাহার কর্তব্য ও স্নেহ, তাহার বর্তমান আর অতীত মিলিয়া এক অপূর্ব ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছে। নিঃসন্তান বণিকের সম্পত্তি রাজা আশ্বসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীকে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পত্তি দিতে হইবে। আবার বণিকের পুত্রহীনতা ও তাহার বিধবাদিগের শোক—তাহার নিজের পুত্রহীনতা ও শোকের সহিত আসিয়া মিলিল। আর রাজা-প্রজায় ভেদ নাই। সমান দুঃখ উভয়কে চেষ্টা সমভূমি করিয়া দিল। তিনি অনুকম্পায় গলিয়া গেলেন। আর কে রাখে। “যার যার প্রিয় জন বিযুক্ত হইয়াছে (সে পাপী না হয় যদি) দৃশ্মন্ত তাহার বন্ধু!”—চমৎকার!

সন্তম অঙ্কে রাজা উঠিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমপ্রান্তে আবার তিনি শকুন্তলাকে পাইলেন। দেখিলেন—

“বসনে পরিধূসরে বসানা

নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবোণিঃ।

অতিনিষ্করুণস্য শৃঙ্গশীলা

মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভক্তি ॥

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল পরিধান করিয়া আছেন, কঠোর ব্রত-ধারণ হেতু ইহার মুখ পরিষ্কীণ হইয়া গিয়াছে, শিরো-

দেশে একটিমাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই শূদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহ-ব্রত ধারণ করিয়া আছেন।]

শকুন্তলার প্রতি তাহার প্রথম সম্ভাষণ অত্যন্ত নীরস। প্রথমে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে রাজার প্রতি বিরক্ত হইতে হয়।

“প্রিয়ে! ক্রৌঞ্চ্যমপি যে স্বয়ং প্রযুক্তমন্-
কুলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং স্বয়া
প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানমিচ্ছামি।”

[প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় আচরণ করিলেও তাহার পরিণাম সুখজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু এক্ষণে তোমার পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।]

তাহার পরেও তদ্রূপ।—

শকুন্তলা উত্তর দিলেন না। তাহার পরে রাজা আবার কহিলেন—

“স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা

প্রমুখে স্থিতাসি মে স্মৃদুখি।

উপরাগাস্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী-

যোগম্ ॥”

[প্রিয়ে স্মৃদুখি! পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় এক্ষণে মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে আমার স্মৃদুখিস্থিত হইয়াছ; রাহুগ্রাসের পর্ব এক্ষণে শশধরের রোহিণীযোগ হইয়াছে।]

তাহার পরে যখন শকুন্তলা কহিলেন, আৰ্য্যপুত্রের জয় হউক।’

‘বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেহপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপদং মদুখম্ ॥”

[প্রিয়ে! জয়-শব্দ বাষ্প দ্বারা স্তম্ভিত হইলেও আমার জয়ই হইয়াছে, যে হেতু আমি তোমার অসংস্কারে পাটলবর্ণ ওষ্ঠপদ-বিশিষ্ট আনন সন্দর্শন করিলাম।]

তখনও রাজা নিজের ভাগ্য ভাল, তিনি জয়যুক্ত, এই কথাই বলিতেছেন! কিন্তু পরে যখন শকুন্তলা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন রাজা—

“সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কির্মপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।

প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শূভেষু হি বৃন্তয়ঃ
স্রজর্মপি শিরস্যক্ঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যাহিশঙ্কয়া ॥”

[হে শোভনাঙ্গি! আমি পরিত্যাগ করায় তোমার মনে যে নিদারুণ পীড়া জন্মিয়াছে, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর; যে হেতু সেই সময়ে আমার কি এক প্রকার মনোমোহ উপস্থিত হইয়াছিল। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলকর বিষয়ে ঘোর অজ্ঞানের কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে, যেমন অন্ধ ব্যক্তি মস্তকে বিনিষ্কিপ্ত মালাও ভূজঙ্গমাশঙ্কায় ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া থাকে।]

এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন। তখন বৃষ্টি, রাজা এতক্ষণ আত্ম-গোপন করিতেছিলেন; অনুভূতিকে একবার প্রশয় দিলে সে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, আর কথা কহিবার অবসর দিবে না, সেই জন্যই তিনি এতক্ষণ অনুভূতিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন—

তৎপরে দুঃস্মৃত শকুন্তলাকে পাইলেন; তাহাদের মিলন হইল।

পাঠক হয়ত এত সংক্ষেপে মিলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজা ষষ্ঠ অঙ্কে যখন বিলাপ করিতেছিলেন, তখন মিশ্রকেশী (মেনকার সখী) সেখানে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সমস্ত শূনিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় শকুন্তলাকে গিয়া বলিয়াছিলেন। কি হেতু রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কালিদাস রাজার বিলাপের সঙ্গে কৌশলে বিন্যস্ত করিয়া—এইরূপে শকুন্তলাকে শোনাইয়াছিলেন এবং তাহাকে এইরূপ মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বিলাপটি কৌশলী কালিদাস এইরূপে কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাহার জন্য রাজার শেষাঙ্কে বিস্তৃত অনুতাপের প্রয়োজন হয় নাই। মিলন শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সপ্তম অঙ্কে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখিতে পাই। দেখি, তিনি শিশুবৎসল। তাহার পুত্রকে রাজা দেখিতেছিলেন (তখনও তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন

নাই) আর ভাবিতোছিলেন—

“আলক্ষ্যদন্তমুকুলানানামস্তহাসে-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃন্তীন্।
অঙ্কপ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পদ্রুশ ভবন্তি॥”

[অর্নিমিত্ত হাস্যদ্বারা যাহাদের দন্তমুকুল-সকল ঈষৎ লক্ষিত হয়, যাহাদের বাক্যসকল অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা প্রয়জন-গণের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই তনয়-গণকে বহন করিয়া, তাহাদের অঙ্গ-সংলগ্ন ধূলিম্বারা পদ্রুশেরা ধন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।]

তৎপরে তাহাকে স্পর্শ করিয়া—

“অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ
স্পৃষ্টস্য গাত্রে সর্দাখতা মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য়্যাৎ
যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্রসূতঃ॥”

[এই কোন ব্যক্তির কুলাঙ্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ স্নেহ অনুভব হইল। কিন্তু এই বালক যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তি না জানি কতই স্নেহ লাভ করে।]

যে রাজা নাটকের প্রারম্ভে সামান্য কামুক-মাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি। নাটক-পাঠান্তে বৃষ্টি যে, দৃশ্যমন্ত শূন্য কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক, পদ্রবৎসল, কবি, চিত্রকর, কর্তব্যপরায়ণ রাজা। কালিদাসের কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হই যে, তিনি কি সামান্য চরিত্র পাইয়াছিলেন, আর তাহাকে কিরূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

দৃশ্যমন্ত-চরিত্র অতীব মিশ্র চরিত্র—দোষ-গুণের মনোহর সমবায়। কালিদাস হাজারই অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়া চলুন, তাঁহার প্রতিভা যাইবে কোথায়? তিনি যে মানবচরিত্রবিৎ মহাকবি। একটি মহৎ মানব-চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। তথাপি তিনি দৃশ্যমন্তকে সাধু ইন্দ্রিয়জিৎ বীরোত্তম মহাপদ্রুশ সাজাইতে পারেন না। হয় ত সাজাইতেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে মহাভারতে বর্ণিত সমস্ত প্রধান ঘটনাই উপেক্ষা করিতে হইত এবং তাহা

হইলে দৃশ্যমন্ত-চরিত্র হইত না। হয়ত কামজয়ী অর্জুন বা ত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র হইত। কিন্তু মহাভারতকে তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। পাঠকের বোঝা দরকার যে, ব্যাপারটি দৃশ্যমন্তের ও শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী, হরগোরীর বিবাহ নয়। সেই জন্য ঋষিগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা, শকুন্তলার প্রতি লাম্পট্য ইত্যাদি সমস্তই রাখিতে হইয়াছে। তাহা রাখিয়াও চরিত্র মহৎ করিতে হইবে। কালিদাস সে চরিত্রকে মহৎ করিলেন; সুন্দর করিলেন; কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্কটুকু মর্দিলেন না। তাই বলিতোছিলাম যে, দোষে গুণে দৃশ্যমন্ত একটি মনোহর অপূর্ষ মিশ্র-চরিত্র।

২। শকুন্তলা ও সীতা

প্রতিভার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার চরিত্রে আমরা কালিদাসের পূর্ণ বিকাশ দেখি।

প্রথম অঙ্কেই দেখি, বন্ধল-পরিহিতা যুবতী শকুন্তলা অপর দুইটি যুবতীর সহিত তপোবনে পদ্পবন্ধে জল-সেচনে নিযুক্ত। পদ্পমধ্যে তিনটি যেন জীবিত পদ্প। চারিদিকে তপোবনের ছায়া, শান্তি ও নিষ্কলিতা। শকুন্তলা নেপথ্যে সখীগণকে ডাকিতোছিলেন, “ইদো ইদো পিঅসহীও”। সেই মধুর আহ্বান পাঠক যেন কর্ণে শুনিতে পাইতোছিলেন। তাহার পরে যখন জলকুম্ভকক্ষে সখীসহ শকুন্তলা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন দেখি—একখানা ছবি।

প্রিয়ংবদা, অনসূয়া ও শকুন্তলার কথোপ-কথনে আমরা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই। অনসূয়া যখন দঃখ করিয়া বলিতেছেন, “তাত কন্ধ, তোমার এই নবমালিকা-কুসুম-কোমলা দেহযষ্টিকে আল-বাল-পদ্রুশে নিযুক্ত করিয়াছেন!” শকুন্তলা কহিতেছেন, “শুধু তাত কন্ধের আদেশ নয়, ইহাদের প্রতি আমার সহোদর-স্নেহ বিদ্যমান আছে।”

এই একটি কথায় শকুন্তলার হৃদয়ের অনেকখানি দেখিতে পাওয়া যায়। তরুলতাদের সহিত শকুন্তলার স্নেহ, যেমন মানুষ মানুষকে

ভালবাসে, সেইরূপ। সেই শান্ত তপোবনে অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সখী, কিন্তু তরুলতা ভাই ভগ্নী! তিনি যেন সেই শ্যাম-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্কে সঙ্কে যেন নিজের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন। আর সখীদিগের সহিত তাহাদের বিষয় লইয়াই কথাবার্তা করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে, চতু-বৃক্ষ অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে, অর্থাৎ তিনি করিতেছেন—“দাঁড়াও সখি, ও কি বলে শুনিয়া আসি।” এই বলিয়া শকুন্তলা চতুবৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। অর্থাৎ প্রিয়ংবদার বোধ হইল, যেন একটি লতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিল। অনসূয়া বলিলেন, “বনতোষিণী স্বয়ংবরা হইয়া সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?” শকুন্তলা উত্তর দিলেন, “বনতোষিণীকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আপনাকেও বিস্মৃত হইব।”—এই বলিয়া পদ্পিতা বনতোষিণীকে আর ফলভরে অবনত সহকারকে দেখিতে লাগিলেন। এত একাগ্রমনে দেখিতেছেন যে, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিলেন যে, শকুন্তলা এত স্নেহে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার কারণ এই যে, বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত মিলিত হইয়াছে, শকুন্তলার মনের ভাব যে, সেও আপনার অনুরূপ বর লাভ করে। শকুন্তলা বলিলেন, “এটি তোমার মনোগত ভাব।” তাহার পর মাধবীলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ দেখিয়া সখীদিগের পরিহাসে ঐ একই ভাব দেখি! এ কি মধুর ভাব! এ অপূর্ণ সারল্যের কাছে মিরান্ডার সারল্য যেন ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়।

সহসা এই শান্ত সরল স্বচ্ছ চরিত্রের উপর দিয়া মৃদু পবন-হিল্লোল বহিয়া গেল। সরসী-বারি কাঁপিয়া উঠিল। এক সুন্দর সৌম্য যুবাপরুষ আসিয়া যেন সেই তপস্যা ভঙ্গ করিল। নিদ্রিত সুকুমার শিশু যেন জাগ্রৎ হইল। সহসা দেখিলাম, শকুন্তলা ত্র্যপসী হইয়াও নারী। দেখিলাম যে, এই

হৃদয় শূন্যই শান্ত স্নেহ ও নিরাবিল সারল্যেই গঠিত নহে। ইহাতে প্রেমিকের অশৈথল্য আছে, ছল আছে, অসূয়া আছে। অর্থাৎ রাজাকে দেখিয়াই শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব আসিল। তিনি রাজার প্রেমে মূগ্ধ হইলেন। এই প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার মনের বক্রতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রথম অঙ্কেই যখন সখীস্বয় শকুন্তলার মনোভাব জানিতে পারিয়া পরিহাসচ্ছলে করিলেন— “শকুন্তলা! যদি এ সময় তাত কন্ব উপস্থিত থাকিতেন।” শকুন্তলা যেন কিছু জানেন না, এইভাবে বলিলেন,—“তদো কিং ভবে।” অর্থাৎ মনে ভাবিতেছেন, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত না। সখীস্বয় উত্তর করিলেন—“তাহা হইলে জীবনসর্বস্বদানেও এই অর্থাৎকে সমর্পিত সৎকার করিতেন।” তদন্তরে শকুন্তলা বলিলেন—

“অবেধ তুহ্যে কিম্পি হি অত্র কদুই মন্তেধ গ বোবঅনং সুনিসসং”

[তোমরা দূর হও, কি একটা মনে করিয়া বলিতেছ, আমি তোমাদের কথা শুনিব না।]

মুখে বলিতেছেন তোমরা কি মনে ভাবিয়া এ কথা বলিতেছ, তাহা জানি না, অর্থাৎ সে কথা তিনি বেশ জানেন। তিনি মুখে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, অর্থাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প নাই। চলিয়া যাইতে তাঁহার বক্ষল শাখায় জড়াইয়া যাইতেছে। নারীর এই মধুর ছলনা—পদে পদে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার মনের স্বাভাবিক বক্রতা আরও বিকাশ পাইয়াছে। তিনি মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া সখীদের কাছে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রেমিকলাভে সখীস্বয়ের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে প্রণয়পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন। শকুন্তলা প্রেমলিপি রচনা করিলেন।

“তুজ্ব গ আগে হিঅঅং মম উগ মথগোদিবা
রস্তিং পি।
নিক্রিব দাবই বলিঅং তুহহখমনোরহাই
অঙ্গাইং।”

[জানি না হৃদয় তব, মোরে কিন্তু মনোভব
অহোরাত্র করে অঙ্গে অতি তাপদান হে—
অতি তাপদান।
তব হস্তে মনোরথ, নাহি অন্য কোনও পথ,
করুণা বিহীন তব কঠিন পরাণ হে,—
কঠিন পরাণ।]

রাজা অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিতেছিলেন।
তিনি ক্রমে এই তাপসীগ্রয়ের কাছে আসিলেন।
তিনি যে পৌরব রাজা দৃশ্যমন্ত, এ বিষয় আর
কাহারও জানিতে বাকি নাই। পরে প্রিয়ংবদা
রাজাকে কহিলেন,—“তেণ হি ইঅং নো
পিঅসহী তুমং জ্জিব উদ্দিসিঅ ভঅবদা
মথণেন ইমং অবথন্তরং বাবিদা তা অরিহসি
অবভুববত্তী এ জীবিদং সে অবলম্বইদং।”

[ভগবান কন্দর্প, আপনাকেই উদ্দেশ্য
করিয়া আমার প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থান্তর
প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহ
করিয়া আপনি আমাদের প্রিয়সখীর জীবন-
ধারণের উপায়-বিধান করুন।]

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা স্বীয় ভবিষ্যৎ
সপত্নীদিগের প্রতি বক্রোক্তি করিলেন—
“হলা অলং বো অন্তেউর বিরহ পজ্জস্‌সুএণ
রাজ্জসিনা অবরুদ্ধেন”

[সখি! অন্তঃপুর কামিনীদিগের বিরহে
উৎকণ্ঠিতচিত্ত এই রাজর্ষিকে উপরোধ করার
প্রয়োজন নাই।]

এইখানে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি তাহার
অসুয়ার ভাব দেখিয়া আমরা সমাধিক বিস্মিত
হই। এতও তিনি জানিতেন! বিবাহের প্রস্তাব
ঠিক হইয়া গেল। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন,
শকুন্তলাই তাহার প্রধানা মহিষী হইবেন।
সখীশ্বয় দেখিলেন যে, এখন 'প্ৰণয়িযুগলকে
প্রেমালাপ করিবার অবকাশ দেওয়া উচিত।
এই ভাবিয়া, সখীশ্বয় যখন ছল করিয়া
শকুন্তলাকে রাজার সহিত একাকিনী রাখিয়া
গেলেন, তখন শকুন্তলা সহসা একটু শঙ্কিত
হইলেন। এইরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই,
তাই বোধ হয় তাহার এই ক্ষণিক সঙ্কোচ।
তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা
ধরিলেন। শকুন্তলা দেখিলেন তাহার মান যায়।
তিনি বলিলেন, “ছাড়ুন ছাড়ুন, ধরবেন না,
আমি আমার প্রভু নহি” তাহার পর রাজা যখন

প্রস্থানোদ্যতা শকুন্তলার বস্ত্রাণ্ডল ধরিলেন,
তখন শকুন্তলা কহিলেন, “পৌরব, বিনয়
রাখুন, ঋষিরা চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন।”
চলিয়া যাইয়াই শকুন্তলা ফিরিয়া আসিয়া
কহিলেন, “পৌরব, অভাগিনী শকুন্তলাকে
বিস্মৃত হইবেন না।” কিন্তু শকুন্তলা একেবারে
যাইলেন না। অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া
রাজার অনুরাগ-কল্পিত বাণী শুনিতে
লাগিলেন। পরে করভ্রষ্ট মৃগাল-বলয়
খুঁজিবার ব্যপদেশে আবার রাজার সন্নিধানে
আসিয়া বলয় পরিবার ছলে তাহার সহিত
প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মৃদু-চুম্বনে
আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে নাম মাত্র। তাহার
পরে গোতমীর আগমনে রাজা লুক্কায়িত
হইলে শকুন্তলা রাজাকে উদ্দেশে পুনরামন্ত্রণ
করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এই তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার নিলজ্জ
আচরণ দেখিয়া আমরা ব্যথিত হই। হাজার
হউক তিনি তাপসী। মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ
না করিলে তাহার আচরণ আরও সংযত হইত
নিশ্চয়। কেহ কেহ বলেন যে, তৃতীয় অঙ্কের
শেষভাগ কালিদাসের রচিত নয়; তাহা না
হইলেও এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে
পুরুষের প্রেমভিক্ষা করা কুলটারই শোভা
পায়। স্বয়ংবরা হওয়া পতিত্ব-ভিক্ষা নহে—
পতিত্ব-দান। যেখানে প্রেমালাপের পরে বিবাহ-
প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেও পুরুষই
নারীর প্রেম যাক্সা করে। আমরা
Shakespeareএ দেখি বটে যে, মিরান্ডাই
ফার্ডিনান্ডের প্রেমভিক্ষা করিতেছেন।—

“I am your wife, if you will
marry me—If not I die your maid,
to be your fellow you may deny me,
but I'll be your servant whether you
will or no.”

কিন্তু সে ভিক্ষার মধ্যে এমন একটা সারল্য,
গাম্ভীর্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে যেন বোধ
হয় সে ভিক্ষাই দান। এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে—
এ একটা প্রতিজ্ঞা। Ferdinand বিবাহ করুন
না করুন তাহাতে Mirandaর কিছদু যায়
আসে না। তিনি যে Ferdinandকে
বলিতেছেন, বিবাহ করিবে? কর; আমি

তোমার স্ত্রী হইব। বিবাহ করিবে না? করিও না, তোমার অনুরক্তা দাসী রহিব। তুমি কি চাও? বাঁছিয়া লও!” এ যেন রাজ্ঞী প্রজাকে দান করিতেছেন, ইহা প্রেমাভিষ্কা নহে।

কিন্তু শকুন্তলার ভিষ্কা ভিষ্কা—কিংবা আত্মবিক্রয়। “দেখ আমি যদি তোমায় আমার যৌবন দিই,—এই ভাব। তুমি কি দিবে? কিছুর দাও না দাও, আমায় রক্ষা কর”; এখানে কেবল দৈন্যজ্ঞাপন ও যাজ্ঞা।

আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশে কালিদাসের সময়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবটা কবির ঠিক করিতে পারেন নাই। বৈদিক যুগে কামের দুই স্ত্রী ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—রতি ও প্রীতি। রতি ক্রমে ক্রমে তাহার সপত্নী প্রীতিকে নিষ্বাসিত করাইল এবং কামের একমাত্র প্রেয়সী হইয়া দাঁড়াইল। হরকোপানলে মদন ভঙ্গ হইয়া ‘অনঙ্গ’ হইল। এই অনঙ্গ অবস্থা কিন্তু কাব্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। শারীরী কাম সাংসারিক হিসাবে পুরাতন কাব্যসাহিত্যে অত্যধিক নির্ভয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যেও পুরাকালে কামের অত্যধিক অত্যাচার ছিল। ক্রমে কাম পরিশুদ্ধ হইয়া Shelley ও Browningএর অশরীরী প্রেমে পরিণত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস স্বাভাবিক প্রতিভাবলে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতির যে কতক আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা এই শকুন্তলাতেই দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলায়ই হউক, বিক্রমোর্বশীতেই হউক, আর মেঘদূতেই হউক, সময়ের হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। অবশ্য শকুন্তলার প্রথম তিন অঙ্কে প্রেমের উচ্ছল অবস্থা। কিন্তু মেঘদূতে ত তিনি প্রেমের সংযত অনুরাগ দেখাইতে পারিতেন। তাহা তিনি দেখান নাই।

ভবভূতির সময়ে মনে হয় যে, প্রেম নিরাবিল হইয়া আসিয়াছিল। বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে ভবভূতির কল্পনার উপরে কোনও দেশের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভবভূতির এ বিষয়ে সন্নিবিধা ছিল। তিনি প্রেমের বহুদিন-সহবাসজনিত নির্ভর দেখাইতেই বসিয়াছিলেন। কালিদাস সে সন্নিবিধ পান নাই। তথাপি কালিদাস এ

অবস্থা দেখাইবার সন্নিবিধ একবার খুঁজিয়াও লইতে পারিতেন। তাই মনে হয়, কালিদাসের মনে এত উচ্চ ধারণা কখনও উদ্ভূত হয় নাই।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার যে তরুলতাদিগের প্রতি স্নেহ দেখি, চতুর্থ অঙ্কে আবার তাহাই দেখিতে পাই। তাহার সহিত কিন্তু প্রেম আসিয়া মিলিত হইয়া এক অপূর্ণ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তন্ময় হইয়া তপোবনে দৃষ্টিমন্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—এত তন্ময় যে, দৃষ্টিমন্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন না, তাহার অভিশাপ পর্যন্ত শুনিতেন পাইলেন না। পরে কন্বমুনি আসিলে শকুন্তলা তাহার সমক্ষে আসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইলেন। কন্বমুনি ধ্যানে সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিয়া পরিতগ্ৰহে পাঠাইলেন।

যখন শকুন্তলা পরিতগ্ৰহে যাইতেছেন, তখন তরুলতাদিগের প্রতি তাহার স্নেহ হৃদয় ছাপিয়া উঠিতেছে। তিনি প্রিয়বদাকে কহিতেছেন—

“হলা পিয়ম্বদে অঞ্জউত্তদংসনদুস্‌সুআ-
এবি অস্‌সমপদং পরিচঅন্তীএ দুক্‌খদুক্‌-
খেগ চলগা মে পুরোম্‌হা গ গিবড়লিত।”

[প্রিয়বদে! আমি আৰ্য্যপুত্রের দর্শনে সমুৎসুক হইলেও আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিতে আমার চরণ-যুগল আজ কোনও মতেই অগ্রসর হইতেছে না।]

শকুন্তলা পরিতগ্ৰহে যাইবেন—যে পরিতর জন্য তিনি ধর্ম ব্যতীত সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন বলিলেই হয়,—তথাপি এই তপোবন ছাড়িয়া যাইতে তাহার পা উঠিতেছে না। তপোবনও যেন সেই আসন্ন বিরহে স্তান। তখন শকুন্তলা সেই মাধবীলতাকে গিয়া কহিতেছেন,—লতাভাগিনি, আমায় আলিঙ্গন কর। কন্বকে কহিলেন,—“তাত, ইহাকে দেখিবেন”; সখীস্বয়কে কহিতেছেন,—“এই বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেখিও”; আবার কন্বকে বলিতেছেন,—“এই গর্ভভারমন্থরা হরিণী প্রসব হইলে আমায় সংবাদ দিবেন।” তাহার পরে অনুরাগী হরিণিশব্দকে কহিতেছেন,—“বৎস,

আমার অনঙ্গমন করিয়া কি হইবে? পিতা তোমায় লালনপালন করিবেন, ফিরিয়া যাও।”
—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শকুন্তলার এই ভাবটি এত কোমলকরুণ যে, পড়িতে পড়িতে প্রায় কাঁদিতে হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়,—তাপসী, এদের মধ্যে ত বেশ সুখে ছিলে, এই তপোবনের শান্ত প্রকৃতির সঙ্গ তোমার শান্ত প্রবৃত্তি ত বেশ মিলিয়াছে! এখানে তোমার কিসের অভাব ছিল?—এদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ? কিন্তু উদ্দাম প্রেম সকল বাধা নিষেধ তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছে। আর রাখে কে?

শকুন্তলার এই প্রেম অধীর, উদ্দাম, প্রবল। এ প্রেম হয় নিজবলে সর্বজয়ী হইবে, নয় একটা প্রবল সংঘাতে চূর্ণ হইবে। শকুন্তলার প্রেম শেষোক্ত ধরণের। তাঁহার প্রেম সেরূপ প্রবল, তাঁহার চরিত্রের সেরূপ বল ছিল না। সাবিত্রী হইলে সব বাধা বিঘ্ন স্বীয় চরিত্রবলে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেন। কিন্তু শকুন্তলা কোমল তাপসী, তাই তাঁহার প্রেম প্রবল ধাক্কা খাইল। তিনি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। সে সংঘাতে সেই প্রেম চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু বিবাহ তাহাকে ঘেরিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

এই সংঘাত পঞ্চম অঙ্কে। এই পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার আর এক মূর্তি দেখি। প্রথমতঃ রাজসভায় শকুন্তলার একটা সশব্দ সঙ্কোচ দেখিতে পাই। শার্গরব ও শারম্বত রাজসভায় যাইতে রাজপুত্রী সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু শকুন্তলা যেন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কোলাহল শূন্যে পাইতেছেন না। দেখিলে শূন্যে তিনিও বিস্মিত হইতেন। তিনি আসন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন; অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন। “আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন?” ইহা আশঙ্কার লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরে গৌতমী ও শার্গরব যখন রাজসভায় গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন, রাজার উত্তর শূন্যবাক্যে শকুন্তলা উৎকর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন,—“কি কখু অজ্ঞউস্তো ভগিস্‌সদি।”

[এখন আর্ষ্যপুত্রই বা কি বলেন?]

রাজা যখন বলিলেন,—

“অয়ে কিম্বিদম্‌পন্যাস্তম্‌”

[ইহারা কি বলিতে লাগিলেন? ইহা ত আমার উপন্যাসের ন্যায় বোধ হইতেছে।]

শকুন্তলা তখনও প্রত্যাখ্যান আশঙ্কা করেন নাই। কেবল ভাবিলেন,—

“হৃদী হৃদী সাবলেবো সে বঅগাবক্-

থেবো।”

[হা ধিক্! হা ধিক্! ইহা বাক্যে যে অতিশয় গর্ষিত বলিয়া বোধ হইতেছে।]

তাহার পরে রাজা যখন প্রশ্ন করিলেন,—

“আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম?” তখন

শকুন্তলা ভাবিলেন, “সর্বনাশ! যাহা আশঙ্কা

করিয়াছিলাম।” ভাবিলেন যে, রাজা তাঁহাকে

গ্রহণ করিতে হয় ত অস্বীকৃত। পরে রাজা

যখন নিরবগুণ্ঠনা শকুন্তলাকে দেখিয়াও

বিবাহ অস্বীকার করিলেন, তখন শকুন্তলা

একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পাঠক, লক্ষ্য

করবেন যে, শকুন্তলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি

কথাও কহেন নাই। এখন অনুরুদ্ধ হইয়া

রাজাকে তিনি সান্দ্রায়ে ‘আর্ষ্যপুত্র’ বলিয়া

ডাকিয়াই অভিমানে এ সম্বোধন প্রত্যাহার

করিয়া সসম্মানে কহিলেন,—“পৌরব! ধর্ম-

মতে পাণিগ্রহণ করিয়া পরিশেষে অস্বীকার

করা কি উচিত হইতেছে?” পরে শকুন্তলা

রাজাকে বিবাহ-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিবার

জন্য যখন অঙ্গুরীয় দেখাইতে পারিলেন না,

তখন আমরা তাঁহার মূর্তি কল্পনা করিতে

পারি। শেষে একবার শেষ প্রয়াস—পূর্ব-

বৃত্তান্ত কহিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা

করিলেন; ব্যর্থ হইলেন। এখনও আমরা

শকুন্তলার রুদ্রমূর্তি দেখি নাই। পরিশেষে

যখন রাজা সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর চাতুরীর

অপবাদ চাপাইলেন, তখন শকুন্তলার গর্ষ

জাগিয়া উঠিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—

অগঞ্জ অন্তণো হিঅআগুমাণেণ কিম

সম্বং পেক্‌খিসি? কো গাম অণ্ণো ধম্ম-

কণ্ণঅব্যবদেসিণো তিগচ্ছক্‌বোবমস্‌স তুহ

অণ্ণআরী ভবিস্‌সদি।”

[হে অনাৰ্য্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায়

অনুমান করিয়া সকলকেই দর্শন করিয়া

থাকেন, ধর্ম-কণ্ঠকের আবরণ দিয়া তুণ্ড

কপ তুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়?]

প্রতারিতা নারীর সমস্ত লজ্জা, রোষ, ঘৃণা তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার রোষ-রক্তিম আনন দেখিয়া দৃশ্যমন্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। সাধবী ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন,—

“তুম্বো জ্জৈব পমাণং ধর্ম্মার্থাদিগু

লোঅস্‌স।

লজ্জা বিগ্নিঞ্জদাও জাগন্তি গ কিম্পি

মহিলাও ॥

সদৃষ্টং দাব অন্তচ্ছন্দাগ্‌চারিণী গণিআ

সমদবট্ঠিদা।”

[মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহ নাই। এরূপভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে? হে রাজন্! তবে কি আমি স্বেচ্ছা-চারিণী গণিকার ন্যায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি?]

পরে গৌতমী যখন তাহাকে বলিলেন,— “হায় বৎসে, পুরুবংশীয়েরা মহৎ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তুমি শঠের হস্তে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছ!” তখন শকুন্তলা মহা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে গৌতমী ও শিষ্যস্বয়ং যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন শকুন্তলা হতাশস্বরে কহিলেন,—“এ শঠও আমার পরিত্যাগ করিল, তোমরাও করিলে!” এই বলিয়া তাহাদের অনঙ্গমন করিতেই শাঙ্গরব ফিরিয়া তাহাকে কহিলেন,—“আঃ পুরোভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে?” তখন শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিলেন,—

“স্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপদ্বর্ষঃ প্রথম-
মেব চক্রবর্তিনং পদ্রং জননিষ্যসীতি। স
চেম্নুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি
ততোহভিনন্দ্য শদ্ব্যন্তমেনাং প্রবেশিষ্যসি
বিপর্য্যয়ে স্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং
স্থিতমেব।”

[রাজন্! উত্তমোত্তম গণকগণ পদ্বর্ষেই উপদেশ দিয়াছেন যে প্রথমেই আপনার চক্র-

বর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত একটি পদ্র উৎপন্ন হইবে, সেই মূর্নিদৌহিত্র যদি সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে আনন্দ সহকারে ইহাকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহার বিপরীত হইলে, ইহার পিতার নিকট গমন করাই ধার্য্য রহিল।]

পুরোহিতের এই লজ্জাকর প্রস্তাব শুনিয়া শকুন্তলা কহিলেন,—“ভগবতি বসদ্বন্দ্বরে, আমার স্থান দাও!” আমরাও সঙ্গ সঙ্গ বলি যে, যে কেহ আসিয়া এই প্রতারিতা অসহায়্য বালিকাকে স্থান দাও! সকলে সেই সভা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুরোহিত পুনঃ-প্রবেশ করিয়া কহিলেন যে, “এক জ্যোতিঃ নামিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।” তখন আমরা ভাবি যে, বাঁচা গেল! রাজার গৃহে পরীক্ষার্থ থাকার চেয়ে তাহার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। শকুন্তলা রাজার প্রত্যাখ্যান ও দূর্ভাসার অভিশাপকে পদাঘাত করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইখানেই কালিদাসের কল্পনার মহত্ব। এইখানেই শকুন্তলা-চরিত্রের চরম বিকাশ। এইখানেই সাধবী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত। অসতী স্ত্রী যেমন এতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে যে, নিজের পদ্রহত্যা পর্য্যন্ত (যাহা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও ভীষণ) করিতে পারে, সাধবী সতী সেইরূপ এত উচ্চ উঠিতে পারে না যে, পতির (যাহার চেয়ে স্ত্রীর পূজ্য আর কেহ নাই) নিষ্করণ অবমাননাকে তুচ্ছ করিয়া গর্ষভরে শিরঃ উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পরিণামে কবি দেখাইলেন যে, দৃশ্যমন্তকৃত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান অন্যায়, যে ঋষির অভিশাপ সাধবীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধবীর মহত্ব খর্ব্ব করিতে পারে না। সে অভিশাপ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে থাকে দূরে সসম্মানে, হাত ষোড় করিয়া। দূর্ভাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে দংশন করিয়া আপনি পণ্ড্র প্রাপ্ত হইল, শকুন্তলার পক্ষে এ ক্ষণিক যন্ত্রণামাত্র।

সম্ভ্রম অঙ্কে শকুন্তলা বিরহিণী—

“বসনে পরিধ্বসরে বসানা

নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবোণিঃ।

অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা

মম দীর্ঘং বিরহরতং বিভক্তি ॥”

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল-পরিধান করিয়া আছেন, কঠোরতর ব্রত-ধারণ হেতু ইহার মুখ পরিষ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শিরোদেশে একটি মাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। হায়! এই শুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহরত ধারণ করিয়া আছেন।]

কিন্তু এ বিরহ পূর্বেকি বিরহ হইতে ঈষৎ পৃথক্। প্রথম বিরহ প্রথম প্রেমেরই মত উচ্ছল, অনিয়ত। এ বিরহ—দৃঢ়, শান্ত, সংযত। প্রথম বিরহে আশঙ্কা ও সন্দেহ; এ বিরহে বিশ্বাস ও অপেক্ষা। এই বিরহে বিশেষত্ব আছে—একটা অপূর্ষ মাধুরী আছে।

এই অণেকই শকুন্তলা-চরিত্রের একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখি। সে তাহার পুত্র-গর্ষ। তাহার প্রত্যাখ্যাত সমস্ত স্নেহ তাহার পুত্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কালিদাস তাহা নেপথ্যে দেখাইয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাই যে, শকুন্তলার পুত্র অত্যধিক আদরে দৃন্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহার মাতার নাম উচ্চারণ মাত্র সে তাহার ক্রীড়নকণ্ড ভুলিয়া যায়। শকুন্তলা বালকের সহিত অধিক কথা কহেন নাই। কিন্তু যে কয়টি কহিয়াছেন, তাহা অর্থে যেন কাঁপতেছে। বালক যখন জিজ্ঞাসা করিল,—“ইনি কে?” তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন, “অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর!” এই উত্তরে পুত্র-স্নেহ, পতির অন্যায়, দৈবের অত্যাচার,—সব আছে। শকুন্তলা জানিতেন যে, তিনি কোন পাপ করেন নাই। তিনি কেবল সরলচিত্তে ভালবাসিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তথাপি এরূপ হইল কেন? এই উত্তরে পুত্রের প্রতি, স্বামীর প্রতি, বিধাতার প্রতি সাধবীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র বৃদ্ধিল না, তাই নীরব রহিল। রাজা বৃদ্ধিলেন, তাই তিনি রোরুদ্যমানা শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া মার্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। বিধাতা এ কথা শুনিলেন, তাই তিনি তাহাদের মিলন সম্পাদন করিয়া দিলেন।

শকুন্তলা-চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া তাহাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পাই না। বিশেষত্বের মধ্যে তপোবনের সহিত তাহার একান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি কোমলা, প্রেমিকা, গর্ষিণী, পুত্রবৎসলা তাপসী। অন্যত্র তিনি সামান্য নারী মাত্র। প্রথম অণেক সখীন্দ্রবয়ের সহিত কথাবার্তা সাধারণ কুমারীর। প্রিয়ংবদা যখন পরিহাস করিলেন—বনতোষিণী সহকারলগ্না হইয়াছে, শকুন্তলা আমিও যেন অনুরূপ বর পাই—এইভাবে তাহার পানে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাহার উত্তরে শকুন্তলা কহিলেন,—“এস দে অন্তগো চিত্ত-গদো মগোরহো।” এরূপ কথা-কাটাকাটি আধুনিক বঙ্গরমণী প্রতিনিয়তই করিয়া থাকে। তাহার পরে পরপুরুষের সম্মুখে প্রত্যেক বিবাহযোগ্য্য বালিকাই শকুন্তলার মত লজ্জায় অধোমুখী হয়। তাহার পরে রাজাকে দেখিয়া প্রেমের উদয়,—

“কধং ইমং জনং পেচ্ছিস তপোবনবিরহিণো
বিআরস্ স গমনীয়ান্নি সংবদন্তা।”

[এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার তপোবন-বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?]

এরূপ প্রেমোদয়ও সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে love at first sight. প্রিয়ংবদা রাজাকে যখন শকুন্তলার পরিচয় দিয়া বলিলেন, “আরও যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন বোধ হইতেছে।” তখন শকুন্তলা তাহাকে অঙ্গুলীসঙ্কেতে শাসাইলেন। এরূপ ব্রীড়ার অভিনয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রিয়ংবদা রাজার কাছে শকুন্তলার বিবাহের কথা তুলিলে শকুন্তলা কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া যে কহিলেন,—“প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই কহিতেছে, আমি চলিলাম।” অথচ চলিয়া যাইবার জন্য আদৌ তাহার কোন অভিপ্রায় নাই। নারীর এই মধুর ছলনা ও পরে যাহাতে অনিচ্ছা নারীজনসমাজে দর্শিত নহে।

এই নাটকের শকুন্তলা-চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষ না থাকিলেও, ইহা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাভারতের শকুন্তলাকে কালিদাস অনেক বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা কামুকী। কালিদাসের

শকুন্তলা প্রেমিকাতে আরম্ভ করিয়া দেবীতে শেষ হইয়াছেন। তদুপরি কালিদাসের শকুন্তলা স্নেহে, সৌহার্দ্যে, তেজে, কারুণ্যে একটা মনোহর সৃষ্টি। মহাভারতের শকুন্তলাকে যে কালিদাস কতদূর উঠাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে, মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উক্তি, নাটকে বর্ণিত উক্তির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বৃদ্ধা যায়।

মহাভারতের শকুন্তলা তাঁহার জন্মের গর্ষ করিতেছেন। তিনি যে অঙ্গুরা মেনকার কন্যা, আর দুষ্মন্ত মানবমাত্র, এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন।

এখানে শকুন্তলা মেনকার নাম করিয়া তাঁহার মোক্ষদমা যতদূর সম্ভব খারাপ করিয়াছেন। দুষ্মন্ত উত্তর দিতে পারিতেন যে, যে নর্তকীর কন্যা, তাহার কথার আবার মূল্য কি!

কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলা-চরিত্রের তেজে দুষ্মন্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছেন। শকুন্তলার অবমাননায় তাঁহার সহিত সহানুভূতিতে পাঠক প্রায় কাঁদিয়া উঠেন।

শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী; ঋষি-কন্যা হইয়াও প্রেমিকা; শান্তির ক্রোড়ে লালিতা হইয়াও চপলমতি। তাঁহার লজ্জা নাই, সংযম নাই, ধৈর্য্য নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যার সহিত এক নিশ্বাসে তাঁহার নামোচ্চারণ করা চলে না। তবে কি গুণে তিনি এই জগন্নিখ্যাত নাটকের নায়িকা হইলেন?

দুষ্মন্ত যে কারণে এই নাটকের নায়ক হইয়াছেন, শকুন্তলাও তাঁহার অনুরূপ গুণে এই নাটকের নায়িকা হইয়াছেন। শকুন্তলা-চরিত্রের মাহাত্ম্য (দুষ্মন্তেরই মত) পতনে ও উত্থানে।

প্রথম তিন অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। দুষ্মন্তের সহিত প্রেমে পড়িয়া তিনি নিজের সঙ্গে সখীদ্বয়ের সহিত চাতুরী আরম্ভ করিলেন—যাহা তাপসীর যোগ্য মনোভাব নহে। পরে তিনি দুষ্মন্তের সঙ্গে যেরূপ নিলজ্জ রহস্যলাপ করিলেন, তাহা তাপসীর কেন, কোনও কুমারীর পক্ষেও লজ্জাকর। যদি শকুন্তলা মিরান্ডার মত সরলা সংসারানভিজ্ঞা

হইতেন, তাহা হইলেও বৃদ্ধিতাম। কিন্তু তিনি সংসারেরই বিবাহযোগ্য কুমারীর ন্যায় বক্রোক্তি ও অভিনয় করিতে শিখিয়াছেন। তিনি পরোক্ষে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সর্বশেষে প্রতিপালক পিতৃসম স্নেহময় মহর্ষির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পণ—একেবারে অধঃপতনের প্রায় চরমসীমা। কুমারসম্ভবে যদিও শিব গৌরীর পূর্ষ-জন্মের পতি, তথাপি শিব যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, গৌরী বলিলেন—পিতাকে জিজ্ঞাসা কর। কন্বে জিজ্ঞাসা করা শকুন্তলার সৌজন্য নহে, তাঁহার অপরিহার্য্য কর্তব্য ছিল। এ কর্তব্য তিনি পালন করেন নাই। কন্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে তিনি লজ্জিতা হইয়াছিলেন, অনুতপ্তা হইলেন নাই। স্নেহময় কন্ব তাঁহাকে ক্ষমার চেয়েও অধিক করিলেন; তথাপি তাঁহার অগ্নুমাত্র অনুতাপ হইল না। তিনি বস্তুতঃ পতিতা হইলেন। তবে এ পতনে বিবাহই একটিমাত্র পুণ্যের রেখা। তাহাই দুষ্মন্তকে ও তাঁহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের উত্থানের পথ রাখিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল—তাঁহার প্রত্যাখ্যানে। তাহার পর দীর্ঘ বিরহরত যাপন করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। তাঁহাদের মিলনের অন্তরায় দূর হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে আবার তাঁহাদিগের মিলন হইল।

দুষ্মন্তেরই মত শকুন্তলা দোষে গুণে একটি মিশ্রচরিত্র। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য দোষে গুণে। দোষে গুণে সে চিত্র অতুলনীয়।

৩। সীতা

রাম ও দুষ্মন্তে যেরূপ প্রভেদ, সীতা ও শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ প্রভেদ।

উত্তরচরিতে তিনবার সীতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে সীতার সমগ্র প্রকৃতি আমরা

একত্র দেখিতে পাই: তিনি কোমলা, পবিত্রা, ঈষৎ পরিহাসরসিকা, ভয়বিহ্বলা, রামময়-জীবিতা। যখন অষ্টাবক্র মূর্খি আসিলেন, সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

“নমঃ তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আৰ্য্যায়াঃ চ শান্তায়াঃ।”

[আপনাকে প্রণাম, আমার সকল গুরু-জনের এবং আৰ্য্যা শান্তার কুশল ত?]

অতি সসম্মান মিষ্ট-সম্ভাষণ। পরে কথায় কথায় যখন রাম অষ্টাবক্র মূর্খিকে কহিলেন যে, প্রজারজনার্থ যদি তাঁহার সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার দ্বন্দ্ব নাই, তখন সীতা এই নিদারুণ প্রস্তাবে ব্যথিত হইলেন না, বরং যেন পরম গৌরব অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন,—

“অতএব রাঘবধরুন্ধরঃ আৰ্য্যপুত্র।”

[এই নিমিত্তই আৰ্য্যপুত্র রঘুকুলধরুন্ধর।]

একেবারে আত্মচিন্তাশূন্য; যেন তাঁহার অস্তিত্ব রামে লীন হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাবক্র মূর্খি চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ একখানি আলেখ্য লইয়া আসিলেন,—সেই আলেখ্যে রামের অতীত জীবনকাহিনী অঙ্কিত আছে। তিন জন সেই আলেখ্যদর্শনে ব্যাপৃত হইলেন। আলেখ্যে সীতার দৃষ্টি প্রথমেই রামের মূর্তির উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, “জন্মভকাস্ত্রা উপস্তবন্তি ইব আৰ্য্য-পুত্রম্।” পরে মিথিলাবৃত্তান্ত দেখিতেও সীতার দৃষ্টি রামে নিবন্ধ,—

“অস্মহে দলম্বনীলোৎপলশ্যামলম্লিঙ্গমসৃগ-শোভমানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়-স্টিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরঃ-খণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুখমুখমণ্ডলঃ আৰ্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।”

[আহা! উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলতুল্য শ্যামল স্নিগ্ধ, মসৃগ, শোভমান, মাংসল দেহ সৌন্দর্য্যযুক্ত, সৌম্য, সুন্দরাকৃতি, কাকপক্ষবৎ কর্তৃত্বকেশশোভিত বদনমণ্ডল আৰ্য্যপুত্র অনায়াসে শঙ্করধনু ভংগ করিতেছেন, পিতা বিস্ময়স্টিমিত হইয়া তাহা দেখিতেছেন, (এই সমস্ত চিত্রপটে) অঙ্কিত হইয়াছে।]

সকলে জনস্থান-বৃত্তান্ত দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, লক্ষ্মণ সীতাকে তদ্বিরহে রোরুদ্যমান

রামের মূর্তি দেখাইলে সীতার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি ভাবিলেন,

“অয়ি দেব রঘুকুলানন্দ এবং মম কারণাৎ ক্লিষ্টঃ অসি!”

[দেব রঘুকুলানন্দ, তুমি আমার জন্য এত ক্লেশ পাইয়াছ?]

সীতার দ্বন্দ্ব শব্দে রাম কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া নহে,—সেরূপ দ্বন্দ্ব সাধবীমাত্রেই হয়। কিন্তু তাঁহার পরম দ্বন্দ্ব যে, তাঁহারই বিরহে রাম কষ্ট পাইতেছেন।—এখানেই দেখি যে, আর কেহ নহে, এ সীতা।

সীতার এই ভাব সর্বত্রই দেখি। তৃতীয় অঙ্কে যখন জনস্থানে রাম সীতাময়ী পূর্বা-স্মৃতিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সীতা কহিলেন,—

“হা ধিক্ হা ধিক্ মাং মন্দভাগিনীং ব্যাহত্যা অমীলনৈত্রনীলোৎপলঃ মূর্চ্ছিতঃ এব আৰ্য্যপুত্রঃ। হা কথং ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ-সিঃসহং বিপর্যাস্তঃ। ভগবতি তমসে পরি-ত্রায়স্ব পরিবারস্ব জীবয় আৰ্য্যপুত্রম্॥

[হা ধিক্! হা ধিক্, আৰ্য্যপুত্র মন্দ-ভাগিনী আমার কথা বলিয়া নয়নপদ্ম নিমীলিত করিয়া মূর্চ্ছিত ও নিরুৎসাহ হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িলেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, আৰ্য্যপুত্রকে বাঁচান।] পরে রাম উপবেশন করিয়া যখন কহিলেন,—

“ন খলু বৎসলয়া সীতাদেব্যা অভ্যুপ-পম্নোহস্মি।”

[স্নেহশালিনী সীতাদেবী না আমায় আশ্বাসিত করিলেন?]

সীতা কহিতেছেন—

“হা ধিক্ হা ধিক্ কিম্বিতি মাং আৰ্য্যপুত্রঃ মাগিষ্যতি।”

[হা ধিক্, আৰ্য্যপুত্র কি আমায় চাহিবেন?]

বাসন্তী যখন রামকে জনস্থান দেখাইতেছেন, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন, তখন সীতা বাসন্তীকে ভৎসনা করিলেন—

“সখি বাসন্তি! কিং স্বয়া কৃতং আৰ্য্য-পুত্রস্য মম চ এতং দর্শয়ন্ত্যা।”

[সখি বাসন্তি! আমাকে এবং আৰ্য্যপুত্রকে এ সকল দেখাইয়া কি করিলে?]

আবার “সখি বাসন্তি কিং ত্বং এবংবাদিনী প্রিয়াহঃ খলু সৰ্বস্য আৰ্য্যপুত্রঃ বিশেষতঃ মম প্রিয়সখ্যা।” “সখি বাসন্তি বিরম বিরম।” “ত্বং এব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যা “এবং আৰ্য্যপুত্রং প্রদীপ্তং প্রদীপয়সি।” “এবং অস্মি মন্দভাগিনী পুনঃ অপি আয়াসকারিণী আৰ্য্যপুত্রস্য।” “হা আৰ্য্যপুত্র মাং মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য সকলজীবলোক-মঙ্গলাধারস্য তে বারং বারং সংশয়িতজীবিত-দারুণঃ দশাপরিণামঃ হা হতাস্মি।”

[সখি বাসন্তি! তুমি কেন এ রকম কথা বলিতেছ? আৰ্য্যপুত্র সকলেরই প্রিয়, বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।—তুমিও সখি বাসন্তি, এইরূপ দারুণ এবং কঠোর যে এইরূপ কাতর আৰ্য্যপুত্রকে যন্ত্রণা দিতেছ?—আমি এমনই মন্দভাগিনী যে পুনর্বার আৰ্য্যপুত্রের ক্রেশের কারণ হইয়াছি।—হা আৰ্য্যপুত্র! তুমি সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার হইয়াও এই মন্দ-ভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়া তোমার বারবার জীবনসংশয় ও দশান্তর হইতেছে।]

—সর্বত্রই ঐ এক ভাব—রাম আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। “আৰ্য্যপুত্র আমায় এত দিনে ভুলিয়া যান নাই কেন? তাও যে ভাল ছিল। সকলমঙ্গলমূলাধার রামের তুচ্ছ আমার জন্য বারবার প্রাণসংশয় হইতেছে।”—এ প্রেম কি জগতে আছে! স্বামীর কল্যাণে সর্বভূতের কল্যাণে আত্মবলিদান—এ প্রেম কি জগতে আছে! থাকে যদি, ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম চিনিয়াছ। না থাকে যদি ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম কল্পনা করিয়াছ। যে প্রেমে—অপমানে অভিমান নাই, নিষ্ঠুরতায় হাস নাই, অবস্থায় বিপর্যয় নাই; —যে প্রেম আপনাতে আপনি পরিপ্লুত, যে প্রেমের জয় উনবিংশ শতাব্দীতে মহাকাবি Browning গায়িয়াছেন—

“You have lost me, I have found thee.”

—এই প্রেম সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতেই এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত গায়িয়াছিলেন।

এই গঢ় তত্ত্ব সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার বলি, ধন্য ভবভূতি!

একবার যেন সীতার ঈষৎ অভিমান হইয়াছিল। রাম যখন সেই সীতাদুর্ন্য নিষ্কর্জন জনস্থানে বাষ্পগদগদ উচ্ছ্বাসিত স্বরে সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ডাকিলেন, “প্রিয়ে জানকি!” সীতা “সমন্দাগদগদ” কহিলেন—
আৰ্য্যপুত্র অসদৃশং খলু এতৎ বচনং

অস্য বৃত্তান্তস্য।”

[আৰ্য্যপুত্র! এখন আর এ কথা শোভা পায় না।] নিরপরাধা আমায় বনবাসে দিয়া তাহার পর এ সম্বোধন শোভা পায় কি? মনুহর্ষের জন্য তাহার প্রতি নিদারুণ অবিচার তাহার মনে আসিল, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া রসাতলে বাস যেন কাঁদিয়া উঠিল, প্রজাদিগের অপবাদের প্রতি অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু এ মেঘ মনুহর্ষের। তাহার পরেই সীতা আবার সেই সীতা।

“অথবা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরে সম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মাং এব মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য বাৎসল্যস্য এবংবাদিনঃ আৰ্য্যপুত্রস্য উপরি নিরনুকোশা ভবিষ্যামি। অহং এতস্য হৃদয়ং জানামি মম এষ ইতি।”

[অথবা একি! আৰ্য্যপুত্রের দর্শন দুর্লভ, তিনি এই হতভাগিনীর প্রতি প্রীতিমান এবং আমার উদ্দেশ্যে যখন এত কথা বলিতেছেন, তখন ইহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইব না। ইনি আমার হৃদয় জানেন, আমিও ইহার হৃদয় জানি।]

আর একবার সীতা অশ্বমেধ যজ্ঞে রামের সহধর্মিণীকে, তাহা জানিবার জন্য “সোৎকম্প” উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই শুনিলেন যে, সে সহধর্মিণী হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি, অমনই সীতা কহিলেন, “আৰ্য্যপুত্র ইদানীং অসি ত্বং অস্মহে উৎখাতং মে ইদানীং পরিত্যাগলজ্জাশল্যাং আৰ্য্যপুত্রেণ।” “ধন্যা সা যা আৰ্য্যপুত্রেণ বহুমন্যাতে যা চ আৰ্য্যপুত্রং বিনোদয়ন্তী আশা-নিবন্ধনং জাতা দেবলোকস্য।”

[আৰ্য্যপুত্র! তুমি এখন আবার সেইরূপই হইলে; আহা, আৰ্য্যপুত্র কর্তৃক পরিত্যাগরূপ

লজ্জাজনিত কণ্টক এখন উৎপাটিত হইল।—
যে আৰ্য্যপুত্র কর্তৃক বহুমানিতা এবং আৰ্য্য-
পুত্রকে বিনোদন করে সেই ধন্যা এবং দেব-
লোকের আশানিবন্ধন হয়।।

উপরি-উক্ত দুই স্থানে সীতার যাহা কিছু
মানবীভূ দেখি। অন্য সর্বত্র তিনি দেবী। রাম
গমনোন্মুখ হইলে সীতা কহিতেছেন—

“ভগবতি তমসে কথং গচ্ছতি এব
আৰ্য্যপুত্রঃ ॥”

[ভগবতি তমসে' আৰ্য্যপুত্র যাইতেছেন
কেন?।

তমসা সীতাকে লইয়া “কুশলবয়োবর্ষ-
গ্রন্থিমংগল” ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যাইবার
প্রস্তাব করিলে সীতা কহিলেন,—

“ভগবতি প্রসীদ ক্ষণমাত্রং অপি দুর্লভং
জনং প্রেক্ষে ॥”

[ভগবতি! প্রসন্ন হউন, ক্ষণমাত্র এই
দুর্লভ ব্যক্তিকে দেখি।] রাম চলিয়া যাইবার
পূর্বে সীতা তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার
করিতেছেন,—

“নমঃ নমঃ অপূর্বপুণ্যজনিতদর্শনাভ্যাং
আৰ্য্যপুত্রচরণকমলাভ্যাম্ ॥”

[আৰ্য্যপুত্রের যে চরণকমলযুগল অপূর্ব
পুণ্যবলে দেখা যায়, সেই চরণযুগলে
নমস্কার।।

এই সুরে সীতার হৃদয়ের মহাসংগীত
বিলীন হইয়া গেল।

আব একবার সীতাদেবীর সহিত পাঠকের
সাক্ষাৎ হয়—সপ্তম অঙ্কে অভিনয় দর্শনে
মূর্ছিত রামকে কোমলকরস্পর্শে সঞ্জীবিত
করিলেন, সেখানেও সীতা বলিতেছেন,—

“জানামি আৰ্য্যপুত্রঃ সীতাদুঃখং
প্রমাণ্টুম্ ॥”

[সীতার দুঃখ অপনোদন করিতে
আৰ্য্যপুত্র জানেন।]

সীতার এই ভাবই এ নাটকে ফুটিয়াছে।
নারীজনসুলভ অন্যান্য গুণের সঙ্কেতমাত্র
কদাচিৎ আছে। লক্ষ্মণ যখন আলেখ্য
দেখাইতেছেন, “এই আৰ্য্যা সীতা, এই আৰ্য্যা
মাণ্ডবী, এই বধু শ্রুতকীর্তি,” তখন সীতা
উন্মীলাকে দেখাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “বৎস! ইয়মপি অপরা কা?”

এইখানে সীতার পরিহাসপ্রয়তার ঈষৎ
আভাস দেখি। তিনি ভয়বিহ্বলা, পরশুরামের
চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছেন। চিত্রিতা
সুর্পনখাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন, “হা
আৰ্য্যপুত্র এতাবৎ তে দর্শনম্!” এই নাটকে
তাঁহার গুরুজনে ভক্তি, পালিত পশুপক্ষীতে
স্নেহ, পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদিরও সঙ্কেত পাই।
কিন্তু সে নামমাত্র। সীতা-চরিত্রের অন্য কোনও
গুণ এই নাটকে ফুটে নাই।

বস্তুতঃ ভবভূতির নাটকে সীতার চরিত্রই
ভাল ফুটে নাই। যাহা কিছু ফুটিয়াছে, তাহা
কোমলত্ব ও অপার্থিব সতীত্ব। তাঁহার রাম
যেমন স্ত্রী বাঙালী, তাঁহার সীতা সেইরূপ
সাধনী বঙ্গবধু। রামের প্রেমের বিশেষত্ব সীতার
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ। আর সীতার
প্রেমের বিশেষত্ব রামের ও জগতের হিতে
আত্মবলিদান। এই দুই চরিত্রের মধ্যে রাম-
চরিত্র একেবারে ফুটে নাই; সীতার চরিত্র তবু
কতক ফুটিয়াছে। তথাপি আমরা চক্ষুর
সম্মুখে সীতাকে দেখিতে পাই না, যেমন
শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে না
পাইলেও সীতাকে অন্তরে অনুভব করি,
যেমন শকুন্তলাকে পারি না। ভবভূতির
সীতা নাটকের নায়িকা নহেন; কবিতার
কল্পনা।

বাণ্মীকির সীতাও নাটকের নায়িকা নয়।
তথাপি ভবভূতির সীতার অপেক্ষা সে সীতা
স্পষ্ট, পরিষ্কৃত। সর্বত্র তাঁহার একটা গতি
দেখিতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে
বনবাসিনী হইয়াছিলেন, লঙ্কেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান
করিয়াছিলেন; পরিশেষে রামের তাচ্ছিল্যও
তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ্য করিবার
ভিগ্নমাও অন্যরূপ। সীতা নিঃস্বাসনে রামকে
যে কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণকে অনুরোধ
করিয়াছিলেন, তাহা অভিমানিনী সাধনীর
উক্তি।

“জানামি চ যথা শূদ্রা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ ॥
অহং তাক্ষা চ তে বীর অবশো ভীরুণা বনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুখিতঃ ॥
ময়া চ পরিহৃত্বাং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতিঃ ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥”

যথা ভ্রাতৃষু বর্ন্তেথা পৌরেষু নিত্যশঃ ।
পরমো হ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা ॥
যন্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবান্দুয়াৎ ।
অহন্তু নান্দুশোচামি স্বশরীরং নরষভ ॥
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন ।
পতির্হি দেবতা নাৰ্য্যা পতিবন্ধুঃ পতি-
গর্দরুঃ ॥

প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং
বিশেষতঃ ।

ইতি মন্দ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥”

[আমি যে শূদ্ধাচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে তুমি ভ্রাতৃগণকে যে রূপ দেখ, পূর্ব্ববাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম। এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্মসংগ্ৰহ করিবে, তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে, যাহাতে তাহা ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গর্দরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে।]

তাহার মধ্যে একটা তেজ আছে, সতীত্বের গর্ভ আছে, রাজত্ব আছে। লঙ্কাজয়ের পরে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা যে উত্তর দেন, তাহার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণখানি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

“কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্ ।
রুদ্ধং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি ।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ॥

পৃথক্ স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং হুং
পরিশঙ্কসে ।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কাস্তু যদি তেহহং পরীক্ষিতা ॥
যদহং গাত্রসংস্পর্শঃ গতাস্মি বিবশা প্রভো ।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥
মদধীনন্তু যন্তুন্মে হৃদয়ং হুয়ি বর্ন্ততে ।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যামানীশ্বরী ॥
সহসংবৃন্দভাবেন ছংসর্গেন চ মানদ ।
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি
শাম্বতম্ ॥

প্রেষিতস্তে মহানীরে হনুমানবলোককঃ ।
লঙ্কাস্থাহং হুয়া রাজন্ কিং তদা ন
বিসর্জিতা ॥

প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তম্বাক্যসমন্তরম্ ।
হুয়া সন্ত্যক্তয়া বীরং ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া ॥
ন বৃথা তে শ্রমেহয়ং স্যাৎ সংশয়েৎ
যস্য জীবিতম্ ।

সুহৃজ্ঞনপরিব্রেশো ন চায়ং বিফলস্তব ॥
হুয়া তু নৃপশান্দল রোষমেবানুবর্ত্ততা ।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পূর্ব্বস্কৃতম্ ॥
অপদেশো মে জনকাস্তোৎপত্তিবসুধাতলাৎ ।
মম বৃন্তুঃ বৃন্তুঃ বহু তে ন পূর্ব্বস্কৃতম্ ॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণিবাল্যে মম নিপীড়িতঃ ।
মম ভক্তিগুণ শীলগুণ সর্ব্বং তে পূর্ব্বতঃ
কৃতম্ ॥

ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাস্পগঙ্গাদভাষিণী ।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্ ॥
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য
ভেষজম্ ।

মিথ্যাবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥

[যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রুঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রুদ্ধ কথা কহিতেছ! তুমি আমায় যে রূপ বদ্বিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রী-জাতিতে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা অনর্চিত। যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিবশয়ে আমি কি করিব, তদ্বিবশয়ে

দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবন্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাই নাই? আমি তোমাকর্তৃক পরিত্যক্তা এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ। কিন্তু আমার জানকী নাম—কেবল জনকের যজ্ঞ-সম্পর্কে—জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বদ্বিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশ্যে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ, তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদগদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাই না।]

এ কথা যে ত্রিসহস্র বৎসর পূর্বে কোনও নারীর মুখে শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পদলিকিত হইয়া উঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, গর্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে, সেই আর্ষ্যযুগে আমাদেরই দেশে এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের, এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি, ঐশী আধ্যাত্মিকতা এরূপভাবে আর কেহ কোনও কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। এখানে সীতার প্রভাবে রামকে পর্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়।

আবার পরিশেষে নিরুৎসাহান্তে প্রজামন্ডলীর সমক্ষে স্বীয় সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য লঙ্কাকর প্রস্তাবে সীতা যে নিদারুণ অভিমানে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

“সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা

কাষায়বাসিনী।

অববীং প্রাজলির্বািক্যমধোদৃষ্টিবামুখী ॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মাণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতং সত্যমুক্তং মে বোদ্ধি রামাং পরং

ন চ।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥”

[সকলকে সমাগত দেখিয়া কাষায়বাসিনী জানকী কৃতাজলিপটে অধোমুখে কহিলেন—যেহেতু আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামকেই অর্চনা করিয়া থাকি, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না এই কথা যখন সত্যই বলিয়াছি, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।]

তিনটিমাত্র শ্লোক। কিন্তু ইহার মধ্যে অর্থের সমুদ্র। পড়িতে পড়িতে সীতার সঙ্গে সহানুভূতিতে চোখে জল আসে, হৃদয় অভিভূত হয়।

ইহার সহিত ভবভূতির তরল কোমল সীতার তুলনা সম্ভবে না। ইহার সহিত তুলনা করিতে গেলে অষ্টম হেনরীতে প্রত্যাখ্যাতা ক্যাথারিনের উক্তির তুলনা করিতে হয়।

Sir, I desire you do me right and justice

... Sir, call to mind,
Upward of twenty years

I have been blest
With many children by you;
if in the course

And process of this time
 you can report
 And prove it too against mine
 honour ought
 My bond to wedlock or my love
 and duty
 Against your sacred person,
 in God's name
 Turn me away—
 My lord! my lord! I am a simple
 woman, much too weak
 To oppose your cunning you're
 meak and humble mouthed.
 You Sign your place and calling
 in full seeming.
 With meekness and humility;
 but your heart
 Is crammed with arrogance,
 spleen and pride.
 Wolseyকে রাজ্ঞী কহিতেছেন—
 Sir,
 I am about to weep;
 but thinking that
 We are a queen (or long have
 dreamed) so certain
 The daughter of a king,
 my drops tears
 I'll change to sparks of fire.

সত্য, ভবভূতি লঙ্কাজয়ের পর সীতার তেজ দেখাইবার মহা সুযোগ পান নাই। কিন্তু নিৰ্বাসনে ও নিৰ্বাসনান্তে সীতার অভিমান দেখাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রাম কর্তৃক নিৰ্বাসনদণ্ড সীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবভূতি একেবারে তাহা দেখান নাই। আর অন্তিম ত তিনি নিঃশব্দে রামসীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন।

কালিদাস কিন্তু একটি সুযোগও ছাড়েন নাই। প্রত্যাখ্যানে কাকুতি অননয় নিষ্ফল হইলে শকুন্তলা জ্বালাময় ব্যঙ্গে সে প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিয়াছিলেন। মিলনের সময়েও

পদে যখন জিজ্ঞাসা করিল, “মা এ কে?” তখন তাহার উত্তর,—“ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।” সমস্ত শকুন্তলা নাটকখানির তত্ত্ব ঐখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মর্ত্য ও ম্বর্গ ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে।

সত্য, কালিদাসের শকুন্তলায় ক্যাথারিণের শান্ত স্বেখ্য নাই, তাহার রাজ্ঞীত্ব নাই। শকুন্তলার আচরণে—প্রথমে আশঙ্কা, পরে অননয়, পরিশেষে অভিমান ও ক্রোধ। ক্যাথারিণের আচরণে যুক্তি, গর্ব, স্থির গাম্ভীৰ্য একত্র মিশিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভেদে এ প্রভেদ ঘটিয়াছে। শকুন্তলা নবোঢ়া কিশোরী, রাজ্ঞী হইয়া এখনও বসেন নাই। তাহার রাজ্ঞীত্ব আসিবে কিরূপে! তাই তাহার উক্তি সরল, সর্বদা একভাবব্যঞ্জক, হয় ভয়, নয় ক্রোধ, কিংবা অননয়। ক্যাথারিণ প্রোঢ়া সংসারাভিজ্ঞা রাজ্ঞী। তাহার এ সকল ভাব পরিচিত, আয়ত্ত। তাহার হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতিগর্ভ মিশিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছে। তাই ক্যাথারিণের উক্তি মিশ্র। দুঃখ, ক্রোধ, অননয়, আত্ম-মৰ্যাদা এক সঙ্গে মিশিয়াছে এবং প্রত্যেক পংক্তিতে সেগর্ভ একত্র নিহিত রহিয়াছে। কালিদাসের কোনও গুটি নাই। কিন্তু ভবভূতি মহাসুযোগ পাইয়াও সীতার রাজ্ঞীত্ব ফুটাইতে পারেন নাই। কালিদাসের শকুন্তলার সহিত ভবভূতির সীতার তুলনা সম্ভবে না। শকুন্তলা একটা চরিত্র, সীতা একটা ধারণা। শকুন্তলা সজীব নারী, সীতা পাষণ-প্রতিমা। শকুন্তলা উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ হৃদ। কালিদাসের শকুন্তলা হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, পড়িয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন উঠিয়াছেন; সীতা কেবল ভালবাসিয়াছেন। নিৰ্বাসনশল্যও তাহার সে ভালবাসাকে বিম্ব করিতে পারে নাই; নিষ্ঠুরতা সে ভালবাসাটাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু সে ভালবাসা কোন কাৰ্য্য করে নাই। সে ভালবাসা জ্যেৎস্নার মত গতিহীন, সূর্য্যমুখীর মত মুখাপেক্ষী, বিরহের মত করুণ, হাসির মত সুন্দর। ভবভূতি, বিষয় বাহিরা লইয়াছিলেন—চরম। কিন্তু বিষয় এত উচ্চ যে, তাহার কম্পনা সেখানে পৌঁছায় না। তিনি একটা অপূৰ্ব সুন্দর স্বর্গীয় মূর্তি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু

তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, যদি এই দেবীকে তিনি জীবনদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জগৎ এমন একটা ব্যাপার দেখিত, যেরূপ ব্যাপার কুত্রাপি কদাপি ঘটে নাই: যে মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মত্ত হইয়া 'মা মা' বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইত এবং তাঁহার চরণধূলির একটি রেণু পাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। কুমারসম্ভবের গৌরী এইরূপ ধরণের একটা ব্যাপার, কিন্তু এই সীতা তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উঠিত। ভবভূতির সীতা যেন কোন হেমন্তের উজ্জ্বল প্রভাতের শেফালিসুরভি স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নই রহিয়া গেল।

অন্যান্য চরিত্র

অন্যান্য চরিত্র নাটক দুইখানিতে নাই বলিলেও হয়। শকুন্তলা নাটকে রাজার বিদুষক, কণ্ঠুকী, প্রতীহারী, মাতলি ইত্যাদি আছে। আর শকুন্তলার পক্ষে তাঁহার পিতা কণ্ব, সহচরী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া, অভিভাবিকা গৌতমী, আর কণ্বশিষ্য শাঙ্গরব আছেন। এক দিকে সংসার আর এক দিকে আশ্রম। কিন্তু তাঁহারা এক রকম নাটকের দর্শকমাত্র। কোনও বিশেষভাবে ঘটনার সংযোগ বিয়োগ করেন নাই। তাঁহারা না থাকিলেও এ নাটক একরূপ চলিয়া যাইত।

শকুন্তলার কণ্বমূর্ত্তি কেবল চতুর্থাঙ্কে দেখা দিয়াছেন। কি অপত্যবৎসল, কি প্রশান্ত কি প্রিয়ভাষী। তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় মাতৃহারা বাঙ্গকের ন্যায় কাঁদিতেছেন, আবার পিতার ন্যায় আশীর্বাদ করিতেছেন। শকুন্তলা যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে দৃষ্ণন্তকে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ নাই, অভিমান নাই। তিনি যেন কেবল স্নেহে ও আশীর্বাদে পূর্ণ।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহচরী: পরিহাসরসিকা, স্নেহময়ী, আত্মচিন্তাশূন্য। তাঁহারা এ নাটকে ঘটকীর কার্য করিতেছেন মাত্র।

কণ্বের ঋষিভগ্নী গৌতমী তেজস্বিনী

ঋষিকন্যা। তিনি দৃষ্ণন্ত ও শকুন্তলার আচরণে ক্ষুধা। শাঙ্গরব তেজস্বী ঋষিশিষ্য। শকুন্তলা ও দৃষ্ণন্তের প্রতি তাঁহাদের তিরস্কার ক্ষুরধার, তীব্র।

বিদুষকের রসিকতায় বেশ একটু রস আছে। তাঁহার 'অনুকূল গলহস্ত' চমৎকার। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্তায় বোধ হয় যে, তিনি শুদ্ধ বিদুষক নহেন, রাজার প্রকৃত বন্ধু।

উত্তরচরিত্রে লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু, শম্বুক, বাস্মীক, জনক, বাসন্তী, আশ্রয়ী, তমসা ও মূরলা আছেন। এ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি চরিত্রও ফুটে নাই। কেবল লবের চরিত্রে অদ্ভুত শৌর্য দেখি।

লবের "কথমনুকম্পতে মাম্,"— এই এক কথায় আমরা লবের ক্ষত্রিয় অভিমান ও তেজ দেখি।

চন্দ্রকেতু উদার বীর। দুই অঙ্কের মধ্যেই আমরা তাঁহার সৌম্য সহাস্য আনন দেখিতে পাই। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা। জনক কন্যাবৎসল পিতা। বাস্মীক পরশোককাতর মহর্ষি। আর শম্বুক বনানীর দর্শনীয়তা। বাসন্তী, আশ্রয়ী, তমসা ও মূরলা সীতার দুঃখে দুঃখিনী। তাহার মধ্যে বাসন্তী একটু তেজস্বিনী। সীতার ব্যথা যেন তাঁহার নিজের ব্যথা। কিন্তু তাঁহাতে সীতার অভিমান নাই। সেটুকু যেন সীতা বাসন্তীকে দিয়াছেন। কোশল্যা ও অরুন্ধতীর কোনও বিশেষত্ব নাই।

লক্ষ্মণ প্রথম অঙ্কে চিত্র দেখাইয়া ও শেষ অঙ্কে সীতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াই বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রকেতু লবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং লবের সহিত রামের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। লব যুদ্ধ করিলেন এবং কুশ রামায়ণ গীত গায়িলেন। শম্বুক রামকে জনস্থান দেখাইয়া বেড়াইলেন। জনক, অরুন্ধতী ও কোশল্যা সীতার দুঃখে কাঁদিলেন। বাসন্তী রামকে পূর্ষস্মৃতিতে জর্জরিত করিলেন। আশ্রয়ী বাসন্তীকে গর্দুকতক সংবাদ দিলেন। দৃষ্ণন্ত রামকে সীতার অপবাদবৃত্তান্ত জানাইলেন। তমসা ও মূরলা সীতাদেবীর জনস্থানে আগমনবার্তা দিলেন এবং তমসা সীতার সহচরী রহিলেন। এ নাটকে ইহাদের কার্য এইখানেই সমাপ্ত।

নাটকত্ব

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস—তিনটিই মনুষ্যচরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গ-মাত্র। কবি মনুষ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবিত্ব দেখান। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষমাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা। অর্জবিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষমাত্র। এ বিলাপে অজের সম্বন্ধে যে রূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র-নির্দীপ্তিতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাহার কবিত্ব দেখানো।

উপন্যাসে, চরিত্রাবলী লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মনুষ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি: তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধ নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখন্ডগুলির মত; তাহাদের গতি এক দিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত:—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত:—চারি দিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের

আকার মোচার মত এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মনুষ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মনুষ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাক্বেথ্। উচ্চাশয় নাটকের মনুষ্য বিষয় হইলে, তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি, যেমন জুলিয়স্ সিজার্। নাটক প্রতিহিংসায় আরম্ভ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসাবই ফল দেখাইতে হইবে: যেমন হাম্লেট্।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটা নিয়ম আছে। মহাকাব্যে বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধা-বাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মনুষ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে: আখ্যান-বস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোনও নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই। কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মনুষ্য-চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এক দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল

পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য দিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছ্‌র না কিছ্‌র ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্যজীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। এক জন বেশ লেখাপড়া করিতোঁছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দাস্য স্বীকার করিল। এইরূপ ঘটনাপরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁজের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখান চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মূখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরিউক্ত উদাহরণে ধরুন যদি নায়ক বা নায়িকার বা উভয়ের মৃত্যু হয়, কিংবা এক জন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছ্‌র বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বাহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক, যেমন—হাম্‌লেট্ বা কিং লিয়র্। বাহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন—ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বদ্বাইল যে, তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বদ্বাইল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল এক স্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডানকানকে হত্যা করিবার পূর্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আতিথেয় ও লোভে; কিং লিয়রের সে যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতার ও প্রবৃত্তিতে। হ্যামলেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জন্মকালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে না। তাহা যে সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুল পরিমাণে থাকে; যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা শ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তি-সমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুণ বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুণি দেখাইলে, কিংবা গুণগুণি বাদ দিয়া দোষ-গুণি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখান হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্যচরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র—মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নাটকাকারে ধর্ম-প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থ-গুণিকে নাটক বলি না। ধর্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটক-কারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্ত-জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ভাগ্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ষ ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটা শক্তি ধরিয়৷ রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়৷ টানিয়া রাখিতেছেন, এই-রূপ কবিই মহাদার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ

সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুণি থাকা চাই; যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগতি, (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দৃশ্যমন্ডলের সহিত শকুন্তলার প্রেম—(তাহার অঙ্কুর—তাহার বৃদ্ধি ও তাহার পরিণাম। দেখানই এ নাটকের উদ্দেশ্য, এ নাটক যাহা লইয়া আরম্ভ, তাহা লইয়াই শেষ। মূল ব্যাপার প্রেম, যুদ্ধ নয়। সেই প্রেমের সফলতা বা বিফলতা লইয়া প্রেমমূলক নাটক রচিত হয়। এ নাটকে প্রেমের সফলতা দেখান হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা নাটকে ঘটনার ঐক্য আছে।

তাহার পরে নাটকে অন্য সব চরিত্র ঐ দৃশ্যমন্ডল ও শকুন্তলার প্রেমকাহিনীকে ফুটাইবার জন্য কল্পিত। নাটকে বর্ণিত সকল ঘটনা-গুণিই সেই প্রেমের স্রোতে, হয় বাধাস্বরূপ আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহাকে দ্রুততর আগাইয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইতেছে। বিদুষকের কাছে রাজার মিথ্যাবাদ, গোপনে বিবাহ, দূর্ভাগ্যের অভিশাপ, অগ্নিরায় অগ্নিগর্ভ হওয়া, এগুণি মিলনের পক্ষে প্রতিকূল; বিবাহ, ধীরের কল্হক অগ্নিরায় উদ্ধার, রাজার স্বর্গে নিমন্ত্রণ—এগুণি মিলনের অনুকূল। এমন একটি দৃশ্য এ নাটকে নাই, যাহা বাদ দিলে পরিণাম ঠিক বর্ণিতরূপ হইত। অতএব এ নাটকে ঘটনার সার্থকতাও আছে।

উপরন্তু দৃষ্ট হইবে যে, ঘাত প্রতিঘাতেই এ নাটক চলিয়াছে। প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার ও দৃশ্যমন্ডলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; এমন সময়ে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা, ওদিকে গোতমীর সতর্ক দৃষ্টি, গোপনে বিবাহ, কশের ভয়ে রাজার পলায়ন, দূর্ভাগ্যের অভিশাপ ইত্যাদি গল্পটিকে ক্রমাগত বক্রভাবে

অগ্রসর করিয়া লইয়া
চলিতে দিতেছে না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অন্ত-
বিব্রোধ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্তবিব্রোধ
প্রায় কোনও স্থানেই পরিষ্ফুট হয় নাই; প্রথম
অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম সম্বন্ধে রাজার কৌতু-
হল বাসনাপ্রসূত। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে
দুঃস্মন্তের ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু অসবর্ণে ত
বিবাহ সম্ভবে না, তাই তিনি ভাবিতেছেন যে
শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কি না। সে দ্বিধা
দুঃস্মন্তকে কোনও অন্তর্দ্বন্দে নিয়োজিত
কবিবার পূর্বেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল।—
তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ও
মেনকার কন্যা। বস্তুতঃ সন্দেহ হইবামাত্রই
ভঞ্জন হইয়াছিল। কারণ, দুঃস্মন্ত বলিতেছেন
যে, তাঁহার যখন শকুন্তলায় আসক্তি হইয়াছে,
তখন শকুন্তলাব ক্ষত্রিয়কন্যা হইতেই হইবে।
এখানে কোনও অন্তবিব্রোধ নাই।

মাতৃ-আজ্ঞা ও ঋষি-আজ্ঞায় কোনও সংঘর্ষ
হইল না। মাতৃ-আজ্ঞা আঁসিবামাত্র তাহার
ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাধব্য যাইবেন মাতৃ-আজ্ঞা
রক্ষায়, রাজা যাইবেন ঋষি-আজ্ঞা-রক্ষায়—
অর্থাৎ শকুন্তলার উদ্দেশে। তৃতীয় অঙ্কে
যখন রাজা একাকী, তখন তিনি ভাবিতেছেন,
—“জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবর্তীতি
মে বিদিতম্।”

কিন্তু তৎপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল,
—“ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো
হৃদয়ম্।”

Caesar-এর দিগ্বিজয়ের ন্যায় লালসার
Vini Vidi Vici—যুদ্ধ হইবার পূর্বেই
পরাজয়। তাহার পরে এই অঙ্কে রাজা
একেবারে প্রকৃত কামুক। প্রকৃত অন্তবিব্রোধ
যাহা হইয়াছে, তাহা পঞ্চম অঙ্কে।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিভ্রম হই-
য়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার
কামুক মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট
হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

“কেয়মবগুণ্ঠবতী নাতিপরিষ্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রা-
গাম্।”

শকুন্তলার নাতিপরিষ্ফুট শরীরটির উপবে
একেবারে তাঁহার লক্ষ্য গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু
যখন শাঙর্গরব ও গৌতমী এই নাতিপরিষ্ফুট-
শরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ
করিতে দুঃস্মন্তকে বলিলেন, তখন দুঃস্মন্ত
কহিলেন,—“কিমিদমুপন্যাস্তম্।”

গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া
দেখাইলেন। তখন রাজা আবার
“ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধাবস্যন্।
ভ্রমব ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তং নাপি শক্লোমি
মোক্তম্ ॥”

। এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর
রূপ পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না?
এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে
ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দ-
পুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ
করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে
ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।।

ইহা প্রকৃত অন্তবিব্রোধ। এক দিকে
লালসা, আর এক দিকে ধর্ম্মজ্ঞান। মনের মধ্যে
যুদ্ধ চলিতেছে। রাজা তথাপি স্মরণ করিতে
পারিলেন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন
কি না। তিনি গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ
করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

“কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং
মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।”

এবার শকুন্তলা স্বয়ং মুখ ফুটিয়া কথা
কহিলেন। “ইহা কি আপনার উচিত
হইতেছে?” “ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচা-
ক্খাদুং”। রাজা কর্ণে অঙুলী দিয়া
কহিলেন,—“শান্তং পাপম্; সমীহসে মাং
পাতীয়তুম্।”

শকুন্তলা অঙুরীয় দেখাইতে গিয়া পারি-
লেন না। অঙুরীয় অঙুলীভ্রষ্ট হইয়াছে।
গৌতমী বলিলেন যে, অঙুরীয়টি নিশ্চয়
নদীপ্রোতে পতিত হইয়াছে। তখন রাজা এমন
কি গৌতমীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ করিয়া কহিলেন,
“ইদং তাবৎ প্রত্যাৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।” এমন
কি, রাজা এমন কঠোর হইলেন যে, গৌতমী
যখন বলিলেন যে, “এই শকুন্তলা তপোবনে

বর্ধিতা হইয়াছেন, শঠতা কাহাকে বলে, জানেন না।” তখন রাজা কহিলেন,—

“স্বীগামশিক্ষিতপটুহুমমানুসীনাং সংদৃশ্যতে
কিমুতঃ যাঃ পরিবোধবতাঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যাম্বজৈঃ
পরভূতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥”

[মনুষ্যোত্তর জীবো স্বীজাতির স্বভাব-
সিদ্ধ চতুরতা দৃষ্ট হয়, এ বিষয়ে বলিবার কি
আছে? কোকিলা শূন্যে যাইবার পূর্বে নিজ
অপত্যকে অন্য পক্ষীর দ্বারা লালিত করাইয়া
লয়।]

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা রোষের সহিত
কহিলেন,—“হে অনার্য! আপনার ন্যায়
সকলকে ভাবেন...তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় শঠ
আপনি। সকলেরই সে প্রবৃত্তি নয়, জানিবেন।”
ক্রোধে তখন শকুন্তলা ফুলিতেছেন। রাজার
তখন আবার সন্দেহ হইল।

“ন তিৰ্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোহপি পদরুশাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমাক্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকার্মবিনতে দ্রবো যদুগপদেব ভেদং গতে ॥”

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না,
ইহার চক্ষুও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ
করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষরবিশিষ্ট
এবং উহা মাদৃশ পদরুশগণের প্রতি সংগত হয়
না।...]

শকুন্তলা তখন উদ্বেগ হস্ত উঠাইয়া
কহিলেন,—“মহারাজ! আপনি যে আমাকে
বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম ব্যতীত
আর কেহই নাই। এরূপভাবে মহিলাকুল কি
লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপদরুশ আকাঙ্ক্ষা
করে? আমি কি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায়
আপনার কাছে আসিয়াছি?”

শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দৃশ্যমন্ত
নীরব। আমরা বুদ্ধিতে পারি যে, এই সময়ে
তাঁহার মনে কি ঝড় বহিতোঁছিল। সম্মুখে
রোরুদ্যমানা অপদূপ সন্দরী তাঁহার পত্নীত্ব
ভিক্ষা করিতেছে; তাহার সহায় ঋষি ও
ঋষিকন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার ধর্ম-
ভয় তাঁহাকে টানিতেছে। একটা মহাসমর
চলিয়াছে। শেষে ধর্মভয়ই জয়ী হইল। একটি

দৃশ্যে এতখানি অন্তর্বির্বাদ অন্য কোনও
নাটকে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা প্রতীহারীকে কহিলেন,
আজ তিনি ধর্মাসনের কার্যসকল সম্যক্
প্রকারে পর্যালোচনা করিতে পারিবেন না।
পৌরকার্য পরিদর্শন করিয়া তাহার একটা
বিবরণ তিনি যেন রাজার নিকটে প্রেরণ
করেন। কণ্ডুকীকেও যথাযথ আঞ্জা দিলেন।
সকলে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার বয়স্যের
নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। তাহার
পর চেটী দৃশ্যমন্ত-চিত্রিত শকুন্তলার আলেখ্য
আনিলে রাজা তাহা তন্ময়চিত্রে দেখিতেছেন।

বিদূষক আলেখ্য লইয়া প্রস্থান করিলে
প্রতীহারী আসিয়া রাজকার্য রাজার নিকট
‘পেশ’ করিল। রাজা শুনিলেন যে, এক
নিঃসন্তান বণিক্ জলমগ্ন হইয়াছে। রাজা
আঞ্জা দিলেন, “দেখ, ইনি সম্ভবত বহুপত্নীক;
যদি তাঁহার কোনও অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যা থাকে,
তাহার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী
হইবে।” তাহার পর প্রতীহারী গমনোদ্যত
হইলে রাজা পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া কহি-
লেন, সন্তান থাকে না থাকে, কি যায় আসে—

“যেন যেন বিষদ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন
বন্ধুনা।

স স পাপাদৃতে তাসাং দৃশ্যমন্ত ইতি
ঘৃষ্যতাম্ ॥”

[প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে যে বন্ধুগণ
কর্তৃক বিষদ্যন্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা
দৃশ্যমন্ত তাহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া
ঘোষিত হইবেন।]

তাহার পরে তাঁহার নিজের নিঃসন্তান
অবস্থা স্মরণ হইল। পূর্বে পদরুশগণের পিণ্ড-
দান কে করিবে, তাহা ভাবিলেন। আপনাকে
ধিকার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মাধব্যের
আত্মনাদ তিনি শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন যে,
পিশাচ আসিয়া তাঁহার বন্ধুকে ধরিয়া লইয়া
গিয়াছে। শুনিয়া রাজা সন্দেহিতের ন্যায়
উঠিলেন। ধনুর্বাণ লইয়া যাইতেছেন, এমন
সময় মাতলি মাধব্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত
হইলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন যে, ইন্দ্রদেব
দৈত্যদমনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়া-
ছেন। রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এই অঙ্কে আর অন্তর্বিরোধ নাই বটে, কিন্তু রাজার রাজকর্তব্যজ্ঞান, বিরহ ও অন্ত-তাপ মিশিয়া যে এক অদ্ভুত করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

ভবভূতির নাটকে কিন্তু এ গুণগুলির একান্ত অভাব। ঘটনার একাগ্রতা উত্তরচরিত্রে আছে বটে। সীতার সহিত বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এই নাটকের প্রধান ব্যাপার। প্রথম অঙ্কে বিচ্ছেদ এবং সপ্তম অঙ্কে মিলন। কিন্তু ঘটনার সার্থকতা এ নাটকে নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কয় অঙ্কে কেবল একটি ব্যাপার আছে। তাহা রামের জনস্থানে প্রবেশ। দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের সহিত পঞ্চবটীদর্শন, তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সমক্ষে রামের আক্ষেপ, চতুর্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা, ও অরুণ্ডতীর সহিত লবের পরিচয়, পঞ্চম অঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশ-মুখে রামের রামায়ণ-গীতি-শ্রবণ—এগুলি না থাকিলেও সীতার সহিত রামের মিলন হইত। এ নাটকে যাহা কিছু নাটকত্ব, তাহা প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে রাম অষ্টাবক্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলেন,—

“স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা
জ্ঞানকীর্তি।
আরাধনায় লোকস্য মৃগতো নাস্তি
মে ব্যথা॥”

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জ্ঞানকীর্তি পর্যন্ত প্রজারঞ্জনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

এইখানে নাটকের আরম্ভ। তাহার পরে আলোক্যদর্শনে সীতার পুনর্স্বার বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। ইহার সহিত পরিণামের কোনও সংশ্লেষ নাই। এখানে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঐষৎ সঙ্কেত আছে। পরে দক্ষরাজ আসিয়া সীতাপবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহার চরম সার্থকতা আছে।

রাম কিরুৎকণ আক্ষেপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এতদূর পর্যন্ত নাটক চলিতেছে। পরবর্তী পঞ্চম অঙ্কে নাটক স্বর্গিত রহিল। আরব্যোপন্যাসের

গল্পের শাখাগল্পের মত একটা প্রকান্ড ফাঁকড়া চলিল। প্রভেদ এই, আরব্যোপন্যাসে গল্পের মনোহারিত্ব আছে, এখানে তাহা নাই।

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত ‘সীতা-নির্বাসন’ের অভিনয় দেখিতেছেন। এইটি বাল্মীকির রামায়ণে-বর্ণিত সীতার পাতালে প্রবেশ লইয়া রচিত, কিন্তু নাটকে এ অভিনয়ের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম ‘অভিভূত’ হইলেন। সীতা আসিয়া রামকে বাঁচাইলেন। তাহার পরে উভয়ের মিলন হইল, এইমাত্র।

সত্য কথা বলিতে গেলে এ নাটকে সীতা নির্বাসন ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, এই দুইটি ঘটনা না থাকিলেও নাটকের কোনও ক্ষতি ছিল না।

এ নাটকে অন্তর্বিরোধ নাই। যেই সীতাপবাদ, সেই নির্বাসন। রামের বিলাপ যথেষ্ট আছে। কিন্তু “করিব, কি করিব না”—এ ভাব নাই। সঙ্কল্পের সহিত কর্তব্যের কোনও যুদ্ধই হয় নাই।

নাটকের নাটকত্বের আর একটি লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণ। আমি পূর্বেই পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, উত্তরচরিত্রে কোনও চরিত্র পরিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলে’ চিত্রণ-কৌশল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে এখানে পুনরুক্তি প্রয়োজন নাই।

কবিষ্ণু শকুন্তলার আছে। কিন্তু তদধিক কবিষ্ণু আমরা উত্তরচরিত্রে দেখিতে পাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিষ্ণু

‘কবিষ্ণু’ শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। বিভিন্ন কোষকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ ব্লেছেন। Webster বলেন,—

‘Poetry is the embodiment in appropriate language of beautiful or high thought, imagination or emotion, the language being rhythmical.

usually metrical, and characterised by harmonic and emotional qualities which appeal to and arouse the feeling and imagination.'

Chambers বলেন,—

'Poetry is the art of expressing in melodious words the thoughts which are the creations of feeling and imagination.'

এখানে high 'thought' এর কথা নাই। সমালোচকদিগের মধ্যে Mathew Arnoldএর স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলেন,—

'Poetry is at bottom a criticism of life. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas of life. . . . Poetry is nothing less than the most perfect speech of man in which he comes nearest to being able to utter the truth.'

Mathew Arnoldএর সংজ্ঞা শুদ্ধ অতি উচ্চ কবিদের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর কবিরাও ত কবি—

Alfred Lyall বলেন,—

'Poetry is most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of the age.'

এখানে criticism of life এর কথা নাই।

'কবি কে,' ইহা লইয়া স্বয়ং কবিগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Bailey বলেন,—

'Poets are all who love, who
feel great truths,
And tell them; and the truth of
truth is love.'

Shakespeare ত কবিদিগকে উন্মত্তের দলে ফেলিয়াছেন।

'The lunatic, the lover
and the poet
Are of imagination all compact.'

কবির কাজ কি?—

'The poet's eye in a fine
frenzy rolling
Doth glance from heaven to
earth, from earth to heaven
And as imagination bodies forth
The form of things unknown,
the poet's pen
Turns them to shape, and
gives to airy nothing
A local habitation and a name.'

Milton বলেন,—

'A poet soaring in the high realm
of his fancies with his garland and
singing robes about him.'

অপিচ,—

Poetry ought to be simple,
sensuous and impassioned,
We poets in our youth
begin in gladness
But thereof come in the end
despondency and sadness.'

কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ।

সংস্কৃতে আছে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। 'রস' নয় প্রকার। বাক্য সেই রসসংযুক্ত হইলেই কাব্য হইল।—অত্যন্ত সহজ।

উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বোধ হয় না যে, কোষকার, কবি ও সমালোচকগণ ইহার একই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

কবি কবিতাকে বলে, ঠিক বোঝান শক্তি। ইহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে, একটি বাক্যে ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানাদি হইতে পৃথক্ করিয়া,—ইহা কি, তাহা না বলিয়া, ইহা কি নহে, তাহা বলিয়া, ইহাকে এক রকম বোঝান যাইতে পারে।

বিজ্ঞান হইতে কবিতা পৃথক্। বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি; কবিতার ভিত্তি অনুভূতি। বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি

হৃদয়। বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য।

কবিকুল-চূড়ামণি Wordsworth কবিতার রাজ্যকে, এমন কি, একটি পবিত্র তীর্থস্থান-স্বরূপ জ্ঞান করেন—যাহাতে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার Poets' Epitaph নামক কবিতায় এই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—

'who would botanise
over his mother's grave.'

কার্লাইল বলেন, poets are seers বা prophets. বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যে শৃঙ্খলা দেখেন, কবিগণ অনুভূতি দ্বারা সেই শৃঙ্খলা অনুভব করেন। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্যই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ না থাকিলে সন্তান বাঁচত না; কারণ, সন্তান দুর্বল, নিঃসহায়—এক পিতামাতার যত্নের উপরই শিশুর জীবন নির্ভর করিতেছে; সেই জন্য মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে ঘুম পাড়ান, নিজের বস্ত্রের পীয়ুষ দিয়া সন্তানকে লালন করেন, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠিত করেন। এই নিয়মে সংসার চলিতেছে। নহিলে সংসার অচিরে লুপ্ত হইত। কবি তর্ক করেন না। তিনি দেখান, মাতার স্নেহ কি সুন্দর,—ঈশ্বরের রাজ্যে কি চমৎকার শৃঙ্খলা! বিজ্ঞানের যুক্তি শুনিয়া সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য বৃদ্ধি। কবিতা পড়িয়া এই বাৎসল্যের প্রতি ভক্তি হয়। বৈজ্ঞানিক ও কবি ইহাদের মধ্যে জগতের উপকার কে বেশী করেন, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সৃষ্টির শৃঙ্খলার প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা।

কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাব্যের বিষয় হয় না। প্রাকৃতিক সত্য হইলেই তাহা সুন্দর হয় না। জগতে অনেক জিনিস আছে—যাহা কুৎসিত। বিজ্ঞান তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু কবি তাহা স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্য অদ্যাবধি কোনও মহাকাব্য আহালাদি শারীরিক ক্রিয়া-

গুলি কাব্যে দেখান নাই। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও নাটকে তাহা দেখান সম্বন্ধে দস্তুরমত নিষেধ আছে। কোনও সুকুমার কলাই কুৎসিত দেখাইতে বসে না। যাহা মিষ্ট, যাহা সুন্দর, যাহা হৃদয়ে সুখকর অনুভূতির সঞ্চার করে, অথচ আমাদের পাশববৃত্তি উত্তেজিত করে না, তাহার বর্ণনা করা সুকুমার কলার একটি উদ্দেশ্য।

এখন অন্যান্য সুকুমার কলা হইতে কবিতাকে পৃথক করিতে হইবে। সুকুমার কলা সাধারণতঃ পাঁচটি;—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কবিতা। ভাস্করের কাজ প্রস্তরমূর্ত্তি দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা। চিত্রকর বর্ণ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেন। স্থপতি ও সঙ্গীতবিৎ প্রকৃতির অনুকরণ করেন না, নতুন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, স্থপতি—মৎপ্রস্তরে, ও সঙ্গীত—স্বরে। কবি মনোহর ছন্দোবন্ধে প্রকৃতির অনুকরণও করেন, নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, নাটকে কবিও থাকা চাই। কিন্তু শুধু কবিও থাকিলেই কাব্য নাটক হয় না। নাটকের অন্যান্য অনেক গুণ থাকা আবশ্যিক। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য। নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন, মানবচরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিকই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিকটাও দেখানর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক ছাড়িয়া দিয়া শুধু সুন্দর দিক দেখান শক্ত। সেক্সপীয়র তাঁহার জগন্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানবচরিত্র মগ্নন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনই পিতৃ-বিশ্বেষ ও ক্রুরতা—স্বেচ্ছাচারিত্ব আছে। তাঁহার Hamletএ এক দিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপর দিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othelloতে যেমন সারল্য ও পাতিলত্যা আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসুয়া আছে। Julius Caesarএ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দণ্ড আছে। Macbethএ যেমন রাজভক্তি ও সৌজন্য আছে, তেমনই রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে।

কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ অশ্লীল করা নিষিদ্ধ, যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। Schilier তাহার Robbers নামক নাটকে ডাকাতি ব্যাপারটিকে মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন বলিয়া, তিনি সমালোচকগণ কর্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

আবার কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়াই যদি ক্লান্ত থাকে ত (সে কুৎসিত ব্যাপারের প্রতি বিশ্লেষণ হইলেও) সে নাটক উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। নাটকেও বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশী ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কি, নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্যও পরিহার্য। সেক্সপীয়রেরই Titius Andronicus কেবল বীভৎস ব্যাপারে পূর্ণ বলিয়াই ইহা অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহা যে সেক্সপীয়রের রচনা, সেক্সপীয়রের উপাসকগণ তাহা স্বীকারই করিতে চাহেন না।

কালিদাস বা ভবভূতি ও দিকেই ঘেঁষেন নাই। তাহারা তাহাদের নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণাই করেন নাই। তাহারা যাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাহারা সৌন্দর্য্য হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। অতএব, অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেও নিন্দেীষ। এই স্থানে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি হইতে এই দুইখানি নাটকের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বহির্জগতেও আছে, অন্তর্জগতেও আছে। যে কবিগণ কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাহারা কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কবিরা মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাহারা মহত্তর কবি। অবশ্য, বাহিরের সৌন্দর্য্য ও অন্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সৌন্দর্য্য ক্রমিক আনন্দদায়ী নহে, বহিঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য ত ইতর জীবজন্তুও উপভোগ করে। কুসুম পূর্ণচন্দ্রের প্রতি

চাহিয়া থাকে, মেঘ দেখিয়া ময়ূর পৃচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করে, কেতকীগন্ধে সর্প আকৃষ্ট হয়, বেণুধরনি শুনিয়া হরিণ নিম্পন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে এই বাহিরের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ ক্রমিক আনন্দদায়ী নহে, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাহিরের মাধুর্য্য মানুষের হৃদয়কে গঠিত করে। আমার বিশ্বাস যে, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উৎপত্তিও—ঐ বাহিরের সৌন্দর্য্যবোধে। প্রস্ফুটিত পদ্প দেখিয়া স্নেহ বিকশিত হয়, সুখ দেখিয়া ভক্তির উদ্বেক হয়, নীল আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘোচে, মৃদু-সংগীত শ্রবণে বিশ্লেষণ দূর হয়।

তথাপি বাহিরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় কবির সমাধিক কবিভূক্তি প্রকাশ পায়। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির, নিম্প্রাণ, অপরিবর্তনীয়। আকাশ চিরকাল যে নীল, সেই নীল, যদিও মাঝে মাঝে তাহা ধূসর হয়, বা মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সমুদ্র ও নদী তরঙ্গসংকুল হইলেও তাহার সাধারণ আকার একই রূপ থাকে। পর্বত, বন, প্রান্তর, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি আকার পরিবর্তন করে না বলিলেও চলে। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্তন যিনি দেখাইতে পারেন, তিনি অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রহস্য উন্মোচিত করিয়া দেখিয়াছেন; মানসিক প্রহেলিকাগুলি তাহার কাছে আপনিই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তম জটিল সমস্যা তাহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছাক্রমে নতুন নতুন মোহিনী মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিধারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার ইংগিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। তাহার যাদুদণ্ড-স্পর্শে নিম্জীব সজীব হয়। তাহার কবিভূ-রাজ্য দিগন্তপ্রসারিত আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় রহস্যময়।

তদুপরি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে কি বাহিরের সৌন্দর্য্য লাগে? কোন নারীর

রূপবর্ণনা পাঠকের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহাইতে পারে, যেমন উন্মত্ত সামান্য কাঠুরিয়ার কৃতজ্ঞতার ছবিতে চক্ষে জল আসে? কবি দূরে যাক, Michaelangeloর কোন্ মূর্তি, Raphaelএর কোন্ চিত্রফলক চোখে জল আনিতে পারে!

আর এক কথা—বাহিঃসৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রকৃত উপায়,—ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। Turner-এর চিত্র এক মূহুর্তে মিশ্র প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য উন্মাদিত করিয়া দেখায়, এক শত পৃষ্ঠায় ছন্দোবন্ধ তাহার শতাংশ দেখাইতে পারে না। কিন্তু কবিতা অন্তর্জগৎ যেরূপ স্পষ্ট সজীবভাবে দেখাইতে পারে, অন্য কোনও চিত্রকলা সেরূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। চিত্রকলা নারীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিতে পারে না।—মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাহার অপূর্ষ নাটকগূর্ল রচনা করিয়াছেন বলিয়াই, সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ-কবি।

তাই বলিয়া বাহিঃজগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে বাহিঃ-সৌন্দর্য্যের ‘পাটে’ বসাইলে কাব্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। সেক্সপীয়র এই হিসাবেই Learএর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার backgroundএ আঁকিয়া এক অপূর্ষ চিত্রের রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি, উভয়েই সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই দেখাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, কে কিরূপ আঁকিয়াছেন।

বাহিঃজগতের সুন্দর বস্তুর মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা সাধারণ কবিদিগের অত্যন্ত প্রিয়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণ রমণীর মুখ ও অবয়ব বর্ণনা করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে আবহমানকাল এই বর্ণনায় কৃতিত্ব কবিদের মানদণ্ডস্বরূপ গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যে এই বিষয়ে যত অত্যাঙ্ক করিতে পারে, সে তত বড় কবি—এইরূপ বিবেচিত হইত।

এক জন কবি বলিলেন,—

‘শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুখমা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ অন্তরে কালিমা।’

ভারতচন্দ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিলেন,

‘কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা?
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা!
বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।’

অনর্ঘরাঘবে কবি সীতার রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রজা সীতাকে সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র ও সীতার মুখ নিষ্কৃতে চড়াইলেন। সৌন্দর্য্য হিসাবে সীতার মুখ সমাধিক সারবান্, অতএব ভারী হইল, সেই জন্য সীতা ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং চন্দ্র লঘু হওয়ার দরুণ আকাশে উঠিলেন।

এই সব বর্ণনার চেয়ে বাঙ্কমচন্দ্রের আশ্মানীর রূপ-বর্ণনা কোনও অংশে হীন নহে।

কালিদাস তাঁহার নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সর্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্কে বঙ্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুঃস্মৃত্ত ভাবিতেছেন:—

“ইদমুপহিতসুক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিগাহাচ্ছাদিনা বঙ্কলেন।
বপূরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমিব পিনন্ধং পান্ডুপত্রোদরেণ।”

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সুক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা বঙ্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তন-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীন দেহ, পান্ডুবর্ণ, পরিপক্ব পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

“অথবা কামমননরূপমস্যা বপুষো
বঙ্কলং ন পুনরলঙ্কারিশ্রয়ং ন পুষ্যতিং।
কুতঃ।

সরসিজমনবৃদ্ধিং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোলক্ষ্য লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বঙ্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মন্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥”

[অথবা বস্কল ইহার দেহের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও, যে একেবারে অলঙ্কার শোভা ধারণ করে নাই, তাহা নহে। কমল শৈবাল-যুক্ত হইলেও রম্য, হিমাংশুর চিহ্ন মলিন হইলেও শোভায়ুক্ত; তদ্রূপ, এই কৃশাঙ্গী বস্কল ধারণ করিয়াও অধিকতর মনোহারিণী; অপিচ; যাঁহাদের আকৃতি মধুর, তাঁহাদের কি না অলঙ্কার হয়?]

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদুষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করিতেছেন,—

“চিন্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্
রূপোচ্চয়েন মনস্য বিধিনা কৃতান্দু।
স্ত্রীরঙ্গসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভূত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যঃ ॥”

[দেহসৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া এইরূপ মনে হয়, যে বিধাতা জগতের সমগ্র নিস্মরণোপাদান একত্রিত করিয়া, সমস্ত রূপরাশি একস্থানে দেখাইবার জন্যই যেন অপরা একটি স্ত্রীরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার,—

“অনাঘাতং পুণ্ড্রপং কিসলয়মলনং কররুহৈ-
রনার্বিন্দং রঙ্গং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তাবং কমিহ সমুপস্থাস্যাতি
বিধিঃ ॥”

[অনাঘাত পুণ্ড্রের ন্যায়, নখচ্ছেদ-বিরহিত নবকিসলয় তুল্য অনাস্বাদিত অভিনব মধু-সম, ও অপরিহিত রঙ্গস্বরূপ; জানি না, বিধাতা কাহাকে ইহার ভোক্তা করিবেন।]

তৃতীয় অঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলার বর্ণনা,—

“স্তনন্যাস্তোশীরং প্রশিখিলম্ণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং তদপি কমনীয়ং
বপুর্নিদম্।

সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-

নতু গ্রীষ্মসৈবং স্ভগমপরাঙ্কং যদ্বতিষ্দ ॥”

[উশীর-বিলেপনযুক্ত স্তন, একমাত্র মৃগাল-বলয় শিখিল, প্রিয়ার দেহ পীড়িত হইলেও কমনীয়, কামসন্তাপ ও নিদাঘ-সন্তাপ তুল্য হইলেও, গ্রীষ্মসন্তাপে যদ্বতীগণের দেহে এরূপ কমনীয়তা থাকে না, স্ভতরাং ইহা নিশ্চয় কাম-সন্তাপ।]

পঞ্চম অঙ্কে সভায় আগতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দৃশ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

“কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিষ্ফুট-

শরীরলাবণ্যা।

মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব

পান্ডুপত্রাগাম্ ॥”

[তপস্বিগণের মধ্যবর্তিনী পান্ডুপুত্র মধ্যে কিসলয় তুল্য, অবগুণ্ঠনবতী, অনতিপরিষ্ফুট দেহলাবণ্যবতী—এ রমণী কে?]

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রাপিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন,—

“দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রয়ুগলং লীলাগুত-

ভ্রুলতং

দন্তান্তঃপরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্না-

বিলিপ্তাধরম্।

ককন্দুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং

তস্যাস্তদেতম্মুখং

চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎ-

প্রোন্ডিভস্কান্তিদ্রবম্ ॥”

[অপাঙ্গ দীর্ঘ, নয়নযুগল বিস্তৃত, ভ্রুলতা বিলাসমনোহর, অধর, দন্তপংক্তির হাস্যকিরণ-চ্ছটায় বিলুপ্ত: ওষ্ঠ পুরুবদরীতুল্য কান্তি-বিশিষ্ট: প্রিয়ার বিলসিত স্বেদযুক্ত মনোহর এবং শোভায়ুক্ত মুখমণ্ডল চিত্রাপিত হইলেও যেন আলাপ করিতেছেন বোধ হয়।]

আবার,—

“অস্যাস্তুগমিব স্তনম্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ
স্থিতা

দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ

সমায়ামপি।

অঙ্গে চ প্ৰতিভাতি মান্দবমিদং

স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং

প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ

বস্তীব মাম্ ॥”

[এই চিত্রফলক সমতল হইলেও, উহার স্তনম্বয় উন্নত এবং নাভি গভীর বলিয়া বোধ হইতেছে, ও বলয় উন্নত দেখাইতেছে; তৈল-বর্ণপ্রভাবে অঙ্গের মৃদুতা স্থায়িতাবে প্রকাশ-মান, ও যেন প্রণয়বশে আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ দেখিতেছেন, ও স্নিতমুখে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।]

সর্বশেষে সপ্তম অঙ্কে রাজা শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

“বসনে পরিধূসরে বসনা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেগিণঃ ।
অতিনিষ্করুণস্য শূদ্রশীলা
মম দীর্ঘং বিরহরতং বিভর্তি ॥”

[ধূসর-বসন-পরিহিতা, নিয়মপালন হেতু ক্ষীণমুখী, একবেগীধূতা অতি নিন্দয়-হৃদয় আমার দীর্ঘ বিরহরত ধারণ করিতেছেন।]

ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতে তিনি দুইবার মাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারই সীতার মুখখানিমাত্র আঁকিয়াছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

“প্রতনুবিবরলৈঃ প্রান্তোন্মীলম্মনোহরকুন্তলৈ-
দর্শনমুকুলৈর্মুখালোকং শিশুদর্ভবতী
মুখম্ ।

ললিতললিতৈর্জ্যেৎস্নাপ্রায়ৈরকৃষ্ণমবিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতুহলমগ্গকৈঃ ॥

[মাতৃগণ বালিকা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে কি আনন্দিতাই হইয়াছিলেন। অতি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম অনতিনিবিড় দন্তপংক্তি এবং মনোহর কুন্তল ও মুখশ্রী সুন্দর চন্দ্রকিরণ-সদৃশ নিম্মল এবং কৃষ্ণম বিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি তাঁহাদের কি কোতুহলই জন্মাইয়াছিল!]

রাম ভাবিতেছেন সীতার মুখখানি, আর তাহাও এই হিসাবে ভাবিতেছেন যে, এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্ধন করিতেন।

আর একবার তমসা বিরাহিণী সীতার বর্ণনা করিতেছেন,—

“পরিপাণ্ডুদুর্স্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্ ।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথের বনমোতি জানকী ॥”

[মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ দুর্স্বলগণ্ড দ্বারা মনোহর! করবী বিললিত, মূর্ত্তিময়ী, করুণরস, অথবা দেহধারিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায় জানকী বনে আসিতেছেন।]

আবার সেই মুখখানিমাত্র! তাহাও আঁকিয়াছেন তাঁহার বিচ্ছেদদুঃখ বর্ণনা করিবার জন্য।

অন্য সর্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভাবিতেছেন। তিনি একটি শ্লেকে সীতার যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দুঃস্মৃত তাহা বহু শ্লেকেও বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—

“ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তিনয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুর্ষি বহুলশচন্দনরসঃ ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃগো

মৌক্তিকসরঃ

কিমস্যা ন প্রয়ো যদি পুনরসহ্যো ন ।

বিরহঃ ॥”

[ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নে অমৃতস্বরূপা, ইঁহার স্পর্শ শরীরে চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ এবং ইঁহার এই মৎকণ্ঠলগ্ন বাহু শীতল এবং কোমল মুক্তা-হারস্বরূপ।]

রাম ভাবিতেছেন, সীতা তাঁহার গৃহ-লক্ষ্মী। আর আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সীতার বিরহে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কি না? তাঁহার কি সীতার বাহ্যিক রূপের দিকে লক্ষ্য আছে! যাঁহার—

“ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তপর্ণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি ।
এতানি তানি বচনানি সরোরহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥”

[কমলনয়নে! তোমার এ বাক্যগুলি সন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়সমূহের মোহন ও সন্তপর্ণস্বরূপ, কর্ণামৃত এবং মনের রসায়নস্বরূপ।]

তাঁহার রূপ রাম বর্ণনা করিবেন কিরূপে?
যাঁহার কাছে থাকিয়া রাম—

“বিনিশ্চেতুং শক্যে ন সুখমিতি বা
দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিম্ বিষবিসর্পঃ কিম্
মদঃ ।

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি
পরিমুঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চেতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥”

[আমি স্থির করিতে পারিতেছি না যে, সুখভোগ করিতেছি কি দুঃখভোগ করিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, অথবা কোন বিষ-প্রবাহ আমার দেহের এরূপ অবস্থা ঘটাইতেছে, কিংবা ইহা মাদকদ্রব্যজনিত মত্ততা।]

তাঁহার রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন
কিরূপে? যাঁহার স্পর্শ—

“প্রশ্চেচ্যাতনং ন্দু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো ন্দু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো ন্দু হৃদি প্রসিক্তঃ॥”

[এ কি হরিচন্দন-পল্লবের রসস্রাব, অথবা
নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণসমূহের রসের সেচন?
ইহা সঞ্জীবন ঔষধির রসস্বরূপ আমার হৃদয়ে
প্রসিক্ত হইয়া আতপ্ত জীবিতরূকে পরিতপ্ত
করিতেছে।]

আবার,—

“প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহাদ্রুশীতলঃ।
অদ্যাপ্যোবাধ্রুয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি
নন্দিনী॥”

[তোমার স্নেহসিক্ত শীতলস্পর্শ মূর্ত্তমান্
প্রসন্নতার স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমার
হৃদয়কে আধ্রুভূত করিতেছে। কিন্তু আমার
আনন্দদায়িনী তুমি কোথা?]

তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়োজন
আছে কি? যাঁহাকে রাম বিবেচনা করেন,—

“উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনাস্তরৈঃ
তীর্থোদকণ্ড বহিষ্চ নান্যতঃ শূদ্ধিমহঁতঃ॥”

[ইনি আজন্মবিশুদ্ধা, ইঁহাকে পবিত্র
করিবার জন্য আর কিছুর প্রয়োজন কি?
তীর্থবারি এবং বহি অন্য কতৃক শূদ্ধির
অপেক্ষা করে না।]

তাঁহার আর অন্য বর্ণনা কি হইতে পারে?

রাম “কালিন্দীতটবট” ভুলিতে পারেন না
কেন? না সেইখানে—

“অলসললিতমুগ্ধান্যধনসঞ্জাতখেদা-
দর্শিখিলপরিবম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃগালীদুর্স্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমূরসি মম কৃড়া যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥”

[যে স্থানে তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া
আকম্পিত অথচ মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনে
অত্যন্ত মন্দনদায়ক এবং দলিত মৃগালের ন্যায়
স্লান ও শিখিল হস্ত আমার বক্ষে রাখিয়া
নিদ্রা গিয়াছিলে।]

বাস্তবিক সীতার বাহিরের রূপ দেখিবার
অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার
গুণে মূগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত পবিত্র, এত

উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখিতেন।
মাতার আবার রূপ কি? তিনি সর্ব্বাঙ্গে,
অস্তরে বাহিরে, কথায় ভাবভাঙগমায় এক মাতা,
আর কিছুর নয়।

কালিদাসের কিন্তু একটি বিশেষ নৈপুণ্য
দৃষ্ট হইবে যে, তিনি তাঁহার এই নাটকে
সর্ব্বত্র শকুন্তলার রূপ নাটকত্ব হিসাবে বর্ণনা
করিয়াছেন। দৃশ্যমন্তের মনের অবস্থা ও তাঁহার
কার্য্যাবলী বদ্বাইবার জন্য এরূপ বর্ণনার
প্রয়োজন ছিল। শূদ্ধ কবিত্ব হিসাবে তিনি
কুত্রাপি শকুন্তলার রূপ-বর্ণনা করেন নাই।
প্রথম অঙ্কে দৃশ্যমন্ত কেন শকুন্তলার প্রতি
আসক্ত হইলেন, কবি তাহার কারণ দেখাই-
লেন। শকুন্তলা কুরূপা বা বৃদ্ধা হইলে দৃশ্যমন্ত
তাহাতে আসক্ত হইতেন না। তাই রূপসী
শকুন্তলার উদ্ভিন্নযৌবনের বর্ণনার প্রয়োজন
হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্যমন্ত বয়স্যের
নিকট যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে কবি
দেখাইতেছেন যে, রাজা কতদূর বিগলিত
হইয়াছে; তিনি এ কথা গোপন করিয়া
রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এরূপ বর্ণনায়
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা নাই। কারণ, সে অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ তখন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত। পঞ্চম
অঙ্কে রাজা আবার শকুন্তলাকে দেখিতেছেন।
আবার নাতিপরিষ্ফুট শরীরলাবণ্যের দিকে
তাঁহার দৃষ্টি। কিন্তু তিনি আপনাকে
সামলাইয়া লইলেন। পরে শকুন্তলার রোষ
বদ্বাইবার জন্য যতখানি প্রয়োজন, কবি
শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় তাহা হইতে এক
পদ অগ্রসর করেন নাই। এখন রাজা গৃগয়া
করিবার জন্য ছুটী লন নাই। এখন তিনি
আলস্যজনিত কামান্ধ নহেন। এখন তিনি
রাজা, প্রজাপালক, বিচারক। রূপ ভাবিবার
তাঁহার সময় নহে। সপ্তম অঙ্কে, দৃঃখপূত-
হৃদয়ে আর কামের তাড়না নাই। বাহিরের
রূপ দেখিয়া মোহিত হইবার অবস্থা তাঁহার
গিয়াছে। প্রপীড়িতা, প্রত্যাখ্যাতা, অপমানিতা
শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার
সেই কথাই মনে পড়িতেছে। তাঁহার লক্ষ্য
বিরহরতধারিণী শকুন্তলার পবিত্র চিত্তের
দিকে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ-বর্ণনায়

রাজার মনের অবস্থার একটি ইতিহাস লিখিত আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অদ্ভুত নাটকত্ব।

ভবভূতি সীতার বাহিরের রূপ-বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কয়েকটি শ্লেকে সীতার মনের পবিত্রতা, তন্ময়তা, পতিপ্রাণতা, স্বর্গীয়তা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলায় নাই।

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি স্থিরসৌন্দর্য্যের বর্ণনা। বস্তুতঃ সে বর্ণনা শব্দলিপি। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সম্মুখে যেন একখানি আলেক্সা দেখিতেছি। আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে, যাহা জীবন্মূর্ত্তির প্রতিকৃতি—চলৎ-সৌন্দর্য্যের চিত্র। যথা,—

রাজা ভ্রমরতাড়িত শকুন্তলাকে দেখিতে-
ছেন—

“যতো যতঃ ষট্চরণোহভিবর্ত্ততে
ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রুরিয়মদ্য শিঙ্কতে
ভয়াদকাম্যাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্ ॥”

[ভ্রমর যে যে দিকে যাইতেছে, সেই সেই দিকেই চঞ্চলদৃষ্টি নিষ্ক্রেপ করিতেছেন; ভয়-হেতু, কামশূন্য হইয়াও, ভ্রুবিবর্ত্তন দ্বারা দৃষ্টির বিভ্রম শিক্ষা করিতেছেন।]

‘অপিচ। সাসুয়মিব
চলাপাণ্ডগাং দৃষ্টিং স্পর্শসি বহুশো
বেপথুমতীং,
রহস্যাত্মায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণাস্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধুরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকরহতস্ফুং খলু কৃতী ॥”

[বহুবার বিকম্পতার নয়নপ্রান্ত স্পর্শ করিতেছে, কর্ণপ্রান্তে বিচরণ করতঃ মৃদু-গুঞ্জনে যেন গোপনে কথা কহিতেছে, হস্তচালনা করিলেও উহার রতিসর্ব্বস্ব অধরসুধা পান করিতেছ! হে মধুকর! ফলভোগ হেতু তুমিই কৃতী।]

বৃক্ষসেচনকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা
কহিতেছেন—

“স্নস্তাংসাবতিমাগ্নলেহিততলৌ
বাহু ঘটোৎক্ষেপণা-
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ
প্রমাণাধিকঃ।

বন্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে
ঘস্মান্তমাজালকং,
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তমিতাঃ
পর্য্যাকুলা মৃদুধ্বজাঃ ॥”

[ইহার স্কন্ধদ্বয় দুর্বল ও অবনত হইয়াছে এবং হস্ততল অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বারংবার জলকলস উত্তোলন করায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক হইয়া এখনও স্তনদ্বয়কে কম্পিত করিতেছে ও মৃদুখন্ডলে ঘস্মাবিন্দু দ্বারা কর্ণস্থিত শিরীষ-পুষ্পের অবরোধকারী অক্ষুট কোরকসমূহের আকার ধারণ করিয়াছে। আর কেশবন্ধন স্থলিত হওয়ায় এক হস্ত দ্বারা তাহা সংযমিত

রাজার প্রতি সমাকৃষ্ট শকুন্তলার প্রতি
চাহিয়া রাজা কহিতেছেন,—

“বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ,
কর্ণং দদাত্যবাহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখী সা,
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥”

[যদিও আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না, তথাপি আমি কথা বলিলে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে থাকে, আর আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না, অথচ ইহার দৃষ্টি অন্যবিষয়েও অধিকক্ষণ থাকিতেছে না।]

“ন তিষ্ঠ্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোহপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমান্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ,
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥”

(অনুবাদ ইতঃপূর্ব্ব দৃষ্টব্য)

শ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়িনী শকুন্তলার বর্ণনা—

“অভিমুখে ময়ি সংহ্রতমীক্ষিতং
হসিতমন্যানিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃষ্টিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥”

[নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে নয়ন ফিরাইয়া লন, অথচ অন্য কথা ব্যাপদেশে হাসিয়া থাকেন; বিনয়হেতু কামবৃষ্টি প্রকাশিত না করিলেও গোপন রাখেন না।]

আবার,—

“দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকান্ডে,
তন্বী স্থিত্তা কতিচিদেব পদানি গতা।
আসীদ্বিব্ভবদনা চ বিমোহয়ন্তী,
শাখাসু বঙ্কলমসক্তমপি দুঃমাগাম্ ॥”

[“কুশাঙ্কুর দ্বারা চরণতল ক্ষত হইয়াছে” এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল অর্মান অকারণে দন্ডায়মান থাকিলেন ও তাঁহার পরিহিত বঙ্কল শাখায় সংলগ্ন না হইলেও, বঙ্কল মোচন করিবার ছলে, স্বকীয় বদনাবরণও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।]

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিষয়ে রাজা ভাবিতেছেন, আর সে ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন।

“ইতঃ প্রত্যাदिष्टा स्वजनमनुगतুং ব্যবাসিতা
স্থিতা তিষ্ঠত্যাচ্চৈর্ষদতি গুরুদৃশিষ্যে
গুরুসমে।

পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামপি তবতী
ময়িক্তরে যন্তং সবিষমিব শল্যাং
দহতি মাম্ ॥”

[আমি প্রত্যাখ্যান করিলে স্বজনগণের অনুগমনে প্রবৃত্তা হন, আবার মাননীয় পিতৃশিষ্য “তিষ্ঠ” বলিলে স্থির থাকিয়া নিষ্ঠুর মৎপ্রতি যে বাষ্পকলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বিষয়ক শল্যের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে।]

উপরি-উদ্ধৃত শেলাকগুলিতেও শকুন্তলার বর্ণনা দৃশ্যমন্তের মনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা কামুক, পঞ্চম অঙ্কে ধার্মিক বিচারক, ষষ্ঠ অঙ্কে অনুতপ্ত।

উত্তরচরিতে বালিকা সীতা ময়ূর নাচাইতেন কিরূপ, তাহার বর্ণনা ভবভূতি এইরূপ করিয়াছেন,—

“ভ্রামিষু কৃতপদান্তর্মন্ডলাবৃত্তচক্ষুঃ,
প্রচলিতচতুর-ভ্রুতাণ্ডবৈর্মন্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুখয়া নর্ত্তমানঃ,

সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥”

[সন্তানের ন্যায় স্নেহপূর্ণ মনে নর্ত্তনশীলা তোমাকে স্মরণ হইতেছে, যৎকালে সপ্তরগ-সময়ে আবরণান্তরে মন্ডলাবৃত্ত চক্ষু, বিচলিত সবিলাস ভ্রুসপ্তারের দ্বারা মনোহর

হইত এবং তুমি করপল্লব দ্বারা তাল দিতে থাকিতে।]

অঙ্গচালনায় মনোভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার সহিত ভবভূতির এ বিষয়ে তুলনাই হয় না।

নারীর রূপ-বর্ণনায় ভবভূতির একটি বিশেষত্ব আছে। কালিদাস ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত-কবির নারী-সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় লালসা আছে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা সর্বত্র শৈল-নির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। কালিদাস নারীর বাহিরের রূপ লইয়া ব্যস্ত। ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত। নারী ‘তুঙ্গস্তনী’, ‘শ্রোণীভারাদলসগমনা’, ‘বিম্বাধরা’ হইলেই কালিদাস যেন আর কিছু চাহেন না। রসাইয়া রসাইয়া তাঁহার নানা কাব্যের নানা স্থানে রমণীয় অবয়বের বর্ণন করিতে তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী “গেহে লক্ষ্মীঃ, তাঁহার “বচনানি কর্ণামৃতানি”, স্পর্শ “সঞ্জীবনৌষধিরসঃ, স্নেহাদ্রুশীতলঃ” তাঁহার পরিরম্ভ ‘সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।’ কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপ-বর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। কালিদাস যখন মাটীতে চলিয়া যাইতেছেন, ভবভূতি তখন উদ্ধেগ বিচরণ করিতেছেন। কালিদাসের কাছে নারী ভোগ্যা, ভবভূতির কাছে নারী দেবী।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাস যে বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার নাটক এক জন কামুক। ভবভূতির নাটক দেবতা। দৃশ্যমন্ত তপোবনে আসিয়া অর্বাধি মদনোৎসব করিতে বসিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার সরল নির্ম্মল তাপস ভাব দেখিতে পাইবেন কোথা হইতে? কিন্তু রাম বহুকাল সীতার সহিত বাস করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অসীম নির্ভর, তাঁহার অগাধ প্রেম মস্মে মস্মে অনুভব করিয়াছেন। আর কি তাঁহার সীতার বাহিরের রূপের দিকে লক্ষ্য থাকে?

কালিদাস এ অবস্থায় আপনাকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যতখানি তাঁহার নাটকের

জন্য প্রয়োজন, তাহার অধিক তিনি একপদও অগ্রসর হন নাই। মহাকাবি কল্পনাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেন না। তিনি কল্পনার গতি রশ্মিসংযত করিয়া রাখেন। কালিদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত অপদূর্ষ। কিন্তু তিনি কতখানি লিখিতে পারিতেন, অথচ লেখেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার অপদূর্ষ গুণপনায় বিস্মিত হইতে হয়। বিষম গিরি-সঙ্কটের একেবারে কিনারা দিয়া তাঁহার কল্পনার রথ প্রবলবেগে চালাইয়া গিয়াছেন অথচ পড়েন নাই। ভবভূতি ও পথেই চলেন নাই। সুতরাং তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রেমের স্বর্গ-রাজ্যে আপনার দেবীকে বসাইয়াছিলেন।

পুরুষ-সৌন্দর্যের বর্ণনা কালিদাস বড় একটা করেন নাই। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতির মুখে রাজার রূপবর্ণনা আছে—

“অনবরত-ধনুর্জ্যাস্ফালন-ক্রুরকর্মা
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশেন ভিন্নম্।
অপাচিতর্মপি গাত্রং ব্যায়ত্বাদপলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥”

(অনুবাদ ইতিপূর্বে গিয়াছে দেখুন)—

ভবভূতি সীতার মুখে রামের রূপবর্ণনা একবার করিয়াছেন। চিত্রাৰ্পিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতা কহিতেছেন—

“অস্মহে দল্লবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধ-
মসৃগ-শোভমান-মাংসলেন দেহ-সৌভাগ্যেন
বিস্ময়স্তিমিত তাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ
অনাদরখণ্ডিতশঙ্করশরাসনং শিখণ্ডমুষ্ণমুখ-
মন্ডল আৰ্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ ॥”

[আহা আৰ্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র লিখিত হইয়াছে! প্রস্ফুটিত নবনীলোৎপলবৎ শ্যামল, স্নিগ্ধ, কোমল, শোভাবিশিষ্ট দেহসৌন্দর্য্য; অবলীলাক্রমে হরধনু ভংগ করিতেছেন। কাক-পত্রবৎ কেশশোভায় মুখমন্ডল শোভিত এবং পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন।]

আর একবার লবের মুখে রামের রূপবর্ণনা পাই—

“অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোহয়ং মহাপুরুষঃ—
আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমালম্বনং মহৎ।
প্রকৃষ্টস্যেব ধর্মস্য প্রসাদো মূর্ত্তিমন্তরঃ ॥”

[আহা এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি পবিত্র প্রভাবসম্পন্ন, আশ্বাস, স্নেহ এবং ভক্তির একমাত্র মহৎ আশ্রয়স্বরূপ এবং মূর্ত্তিমান্ প্রকৃষ্ট ধর্মের প্রসন্নতাস্বরূপ।]

কালিদাসের বর্ণনা এক জন দৃঢ়পেশী মহাকায় বীরের লক্ষণ-নির্দেশমাত্র। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা একটি চিত্র।

“আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননামন্দহাসে-
রব্যক্তবস্তু-রমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অশ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদংগ-রজসা পুরুষা ভবন্তি ॥”

[অকারণ হাস্যে যাহাদের দন্তমুকুল ঈষৎ লক্ষিত, যাহাদের বচন অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা স্বজনের ক্রোড়বাসিপ্রিয়, এরূপ পুত্রগণকে বহন করিয়া ও তাহাদের গাত্রস্থিত ধূলিযুক্ত হইয়া পুরুষগণ ধন্য হইয়া থাকে।]

—একটি শ্লেোকমাত্র। কিন্তু কি সুন্দর! দৃষ্ণন্তের মনের সঙেগ কি সুন্দর খাপ খাইয়াছে।

ভবভূতির দোষ—তিনি আরম্ভ করিলে আর থামিতে পারেন না। শ্লেোকের উপর শ্লেোক চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। এই দোষ লবকুশের বর্ণনায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-চরিতের পঞ্চমাঙ্কে রাম লবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

“ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্প্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য
গুণৈত্যাঃ।

সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সগুয়ো বা গুণানা-
মাবিভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যানির্ম্মণরাশিঃ ॥”

[জগৎরক্ষার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ষেদের ন্যায় বেদরূপ রজাগারের রক্ষার্থ যেন ক্ষাত্রধর্ম দেহধারণ করিয়া সমগ্র গুণের এবং সামর্থ্যের আধার এবং জগতের পুণ্যপুঞ্জস্বরূপে আবিভূত হইয়াছেন।]

কুশকে দেখিয়া রাম ভাবিতেছেন—

“অথ কোহয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবি-
ধর্নিনৈবদন্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীলনীরধরধীরগঞ্জিত-
ক্ষণবন্ধকুটমল-কদম্ব-ডম্বরম্ ॥”

[কে এ ইন্দ্রমণির ন্যায় শ্যামলকান্তি! কণ্ঠ-স্বরেই আমাকে পুলকিত করিতেছে। যেন

নবনীল নীরদের ধীর গজ্জনে কদম্বসমূহের
মুকুল প্রস্ফুটিত হইতেছে।

পরে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া—

“মুস্তাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরীয়ং
সৈবোষ্টি মদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্ষাদ্যপি রক্তনীলে
তথ্যপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব ॥”

[সেইরূপ মুস্তার ন্যায় নিস্মল দন্তকান্তি
দ্বারা মনোহর ওষ্ঠমুদ্রা এবং সেইরূপ কর্ণপাশ।
তবে নেত্রম্বয় নীলাভরক্তিম হইলেও তাহা
নয়নানন্দপ্রদ।]

পুত্রম্বয়ের সহিত রামের প্রথম সাক্ষাৎ
একটি অপূর্ষ ছবি। একদিকে রামকে আর
একদিকে শিশুম্বয় লব ও কুশকে আমরা
প্রত্যক্ষবৎ দেখি। যেন একদিকে সিংহ, অন্য-
দিকে দুই সিংহশাবক দাঁড়াইয়া পরস্পরকে
মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছে।

পশ্চম অঙ্কে শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত লবকে
চন্দ্রকেতু এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

“কিরতি কলিতকিণ্ডৎ-কোপরজ্যম্মুখশ্রী-
রনবরতনিনগুঞ্জংকোটিনা কাম্মুকেন।
সমর-শিরসি চণ্ডং পশ্চচ্চমুনা-
মুপরি শরতুষারং কোহপ্যয়ং বীরপোতঃ ॥”

[ঈষৎসজাত ক্রোধরক্ত মুখকান্তি এবং চণ্ডল
পশ্চিশিখাধারী কে এই বীরবালক, রণমুখে
অনবরত ধনুষ্কোটির শব্দ করতঃ সৈন্যগণের
উপর বাণ বর্ষণ করিতেছে?]

“মুনিজনশিশুরেকঃ সর্বতঃ সৈন্যকায়ে
নব ইব রঘুবংশস্যাপ্রসিদ্ধঃ প্ররোহঃ।
দলিতকরিকপোল-গ্রন্থিটংকারঘোরং
জ্বলিত-শরসহস্রঃ কোতুকং মে করোতি ॥”

[একটি মুনিবালক, রঘুবংশেরই কোন
নতন অজ্ঞাত নাম বালকের ন্যায়, সমস্ত সৈন্যের
প্রতি, গজদন্ডগ্রন্থি-বিদারক ঘোর টংকারকারী
সহস্র প্রজ্বলিত শরক্ষেপণ করতঃ আমার
কোতুক জন্মাইতেছে।]

আবার—

“দর্পেণ কোতুকবতা ময়ি বন্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাম্বলৈরনুসৃতোহয়মুদীর্ণধন্বা।
শ্বেধা সমুদ্রতমরুত্তরলস্য ধন্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্ ॥”

[ইনি সর্কোতুক দর্পে আমার প্রতি বন্ধলক্ষ্য
হইয়া ধনু উত্থিত করতঃ পশ্চাতে সৈন্য দ্বারা
অনুসৃত হওয়ায়, যেন দুই দিক হইতে বায়ু-
সঞ্চালিত মেঘমধ্যে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভিত
হইতেছেন।]

পুনশ্চ—

“সংখ্যাতীতৈর্দ্বিরদতুরগস্যন্দনশ্চৈঃ পদাতৈ-
রত্রৈকস্মিন্ কবচনিচিতে মেধ্যচশ্মোন্তরীয়ে।
কালজ্যেষ্ঠৈরভিনববয়ঃ কাম্যকায়ে ভবাম্ভি-
র্যোহয়ং বন্ধো যুধি পরিকরস্তেন বো
ধিগ্ধিগস্মান্ ॥”

[তোমরা কবচধারী, পরিণতবয়স্ক, অসংখ্য
রথী, সাদী, নিষাদী ও পদাতিক মিলিত হইয়া
এই একাকী, মেধ্যচশ্ম উত্তরীয়ধারী কোমল-
কান্তি তরুণ যোদ্ধার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে
বন্ধপরিকর হইয়াছে, তজ্জন্য তোমাদিগকেও
ধিক্ এবং আমাকেও ধিক্।]

অপিচ—

“অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভারভূরিষ্ফুরৎ-
করালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
ক্ৰণৎকনকাকিঙ্কণীক্ৰন্বনায়িতস্যন্দনৈ-
রমন্দমদদুন্দিন্দ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ ॥”

[এই শিশু একাকী সমরক্ষেত্রে বহু-
প্রজ্বলিত ভীষণ অস্ত্রধারী সৈন্যসমূহ এবং
শব্দায়মান সুবর্ণঘণ্টারবকারী রথরাজি ও
অজস্র মদবর্ষণকারী বারিদবৎ বারণগণ কর্তৃক
পরিবৃত হইয়াছে।]

পুনরায়

“আগুঞ্জংগিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমন্দদুন্দভিরবৈরাধ্যাতমু-
জ্জম্ভয়ন্।
বেল্লশৈববন্দমুরুন্ডনিকরৈর্ষ্বরৌ বিধতে
ভুবস্তৃপ্যৎকালকরালবস্ত বিঘসব্যাকীর্যমাণা
ইব ॥”

[ঘোরতর দুন্দুভিরবে সম্বন্ধিত এই
বীরের জ্যা-নির্ঘোষ, গিরিকুঞ্জবাসী গজযুথের
কর্ণপীড়াদায়ক এবং কালের করাল বদন কর্তৃক
বিক্রান্ত কবন্ধের বিচ্ছিন্ন মূন্ডসমূহের দ্বারা
যেন রণভূমির তৃপ্ত সাধন করিতেছে।]

ডাকিয়া লবকে

“কুমার! পশ্য পশ্য—
ব্যপবর্ত্তত এব বালবীরঃ
প্তনানির্মথনাৎ ত্বয়োপহৃতঃ।
স্তনয়িত্বুরবাদিভাবলীনা-
মবমন্দাদিব দ্প্তসিংহশাবঃ।”

[কুমার দেখ দেখ, যেমন দ্প্ত সিংহশিশু মেঘগজ্জর্জন শ্রবণে গজযুথ-বিমন্দর্ন-বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ এই বীরবালক তোমার আহ্বানে সেনামথনে বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে।]

ভবভূতির এ বর্ণনা চরম। কিন্তু এ বর্ণনা নাটকের উপযোগী নহে। যে বর্ণনা নাটকের আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করে না, তাহা নাটকে পরিহার্য। কিন্তু কবির্ভাষাসাবে ইহার কাছে কালিদাসের বালকের রূপবর্ণনা নিঃপ্রভ।

হয় ত কালিদাস দৃশ্মন্তের বালককে কাব্য-হিসাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। সেই বালক-দর্শনে দৃশ্মন্তের মনের ভাবের বর্ণনাই কালিদাসের মূখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কাব্য লিখিতে বসেন নাই, নাটক লিখিতে বসিয়াছেন। নাটকর্ভাষাসাবে সেই দ্প্ত শিশুর বর্ণনা যতদূর প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক এক পদ তিনি অগ্রসর হন নাই। কিন্তু নাটকত্ব বজায় রাখিয়াও তিনি ভংগীতে, বচনে ও দৃষ্টিতে সেই বীরশিশুর তেজ ও দর্প অঙ্কিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া-ছিলেন। সে সুযোগ তিনি হেলায় হারাইয়াছেন। সর্বদমনের চেহারা আমরা কালিদাসের বর্ণনা হইতে কিছু ধরিতে পারি না। কিন্তু ভবভূতির লব ও কৃশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি—এত স্পষ্ট দেখি যে, তাহা-দিগের উপর পাঠকেরই গাঢ় বাৎসল্যের উদয় হয়, রামের ত হইবেই। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাৎসল্যরসে কালিদাসকে ভব-ভূতির কাছে অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

নারীর রূপবর্ণনায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ, পুরুষের ও শিশুর রূপবর্ণনায় ভবভূতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

জীবজন্তু-বর্ণনায় কালিদাস সিদ্ধহস্ত—

“গ্রীবাভংগাভিরামং মদুহরনুপতিতস্যন্দনে
দন্তদৃষ্টিঃ
পশ্চাচ্ছেদন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়ান্ভূয়সা
পূর্ষকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ
কীর্ণবর্ষা
পশ্যাদগ্রপ্লুতত্বান্বিয়তি বহুতরং
স্তোকমূর্ষ্যাং প্রয়াতি ॥”

[গ্রীবাদেশের বক্রতা হেতু মনোহর, নিয়ত অনুগামী রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, শরপতনাশঙ্কায় দেহের পশ্চাদ্ভাগ অধিকতর অগ্রে প্রবেশ করিয়াছে, শ্রম হেতু বিবৃত মুখ হইতে পতিত অর্ধচর্চিত নবভৃগসমূহে পথ আকীর্ণ করিয়া উদ্ভেদ লক্ষ্য প্রদান করতঃ অগ্রসর হইতেছে, যেন আকাশমাগেই অধিকতর এবং ভূতলে অল্পপথই অতিক্রম করিতেছে।]

তাহার পরে অশ্বের বর্ণনা—

“মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ষকায়
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোম্বর্কণাঃ।
আত্মোদ্ধৈতৈরিপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাস্কময়েব রথ্যাঃ ॥”

[মৃগরশ্মি শিথিল হওয়ায় দেহের পূর্ষ-ভাগ সমাধিক আয়তন এবং চামরাগ্র নিষ্কম্প শান্ত, কণ উন্নমিত করিয়া স্বখরোখিত রেণু-সমূহের অলঙ্ঘনীয় হইয়া মৃগের ন্যায় বেগে পথে ধাবিত হইতেছে, বোধ হয় যেন সন্তরণ দিতেছে।]

বর্ণনা দুইটি এত সজীব যে, যে কোন চিত্রকর এই বর্ণনা পড়িয়াই এই অশ্ব আঁকিতে পারিতেন।

ভবভূতি যজ্ঞাশ্ব বর্ণনা করিতেছেন—

“পশ্চাৎ পৃচ্ছং বহতি বিপুলং তচ্চ
ধুনোত্যজস্রং
দীর্ঘগ্রীবঃ স ভবতি খুরাস্তস্য চত্বার এব।
শম্পাণান্তি প্রকিরতি স্কৃৎপিণ্ডকানাম্মাহ্রান্
কিং ব্যাখ্যাতৈর্ভজতি স পুনর্দরমেহোহি
যামঃ।”

[পশ্চাৎভাগে বিপুলপৃচ্ছ বহন করিতেছে এবং তাহা বহুবার কম্পিত হইতেছে; উহার

গ্রীবা দীর্ঘ এবং চারিটি খর, তৃণ ভোজন করে এবং আত্মবৎ পুরীষ ত্যাগ করে। অথবা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? উহা দূরে বিচরণ করিতেছে, আইস আমরা তথায় যাই।।

এ উত্তম অশ্বের প্রয়োজনীয় গুণরাশির একটা ফিরিস্তি। বর্ণনাটি উত্তম হয় নাই। জীবজন্তুর বর্ণনায় উত্তররামচরিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জড়প্রকৃতিবর্ণনা কালিদাস তাঁহার এই নাটকে কদাচিৎ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে কালিদাস রথের গতি বর্ণনা করিতেছেন—

“যদালোকে স্দক্ষ্মুং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদম্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যম্বকুং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে

রথজবাং।”

[রথের বেগবশতঃ, যাহা দূরে স্দক্ষ্মু দেখাইতেছিল, তাহা সহসা বৃহৎ হইতেছে; যাহা প্রকৃত বিচ্ছিন্ন তাহা যুক্তবৎ দেখাইতেছে; যাহা বক্র তাহা সমরেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; কিছই ক্ষণমাত্র আমার চক্ষুর দূরে বা পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে না।।

রথ বেগে গমন করিলে পার্শ্বস্থ প্রকৃতির আকারে শীঘ্র যেরূপ পরিবর্তন হয়, এ শ্লোক তাহার একটি স্দক্ষ্মু স্দন্দর ও যথাযথ বর্ণনা। পরে তপোবনের বর্ণনা করিতেছেন—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখদ্রষ্টাস্তরুণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্ৰিচিদিঙ্গদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত
এবোপলাঃ।

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতযঃ শব্দং সহন্তে
মৃগাস্তেতায়াদারপথাশ্চ বস্কলশিখানিষ্যন্দ-
রেখাঙ্কিতাঃ॥

অপিচ—

কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা
ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধুমোঙ্গমেন।
এতে চার্শ্বাগুপবনভূবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং
নষ্টাশঙ্কা হরিগণিশিবো মন্দমন্দং চরন্তি॥

[কোটরস্থিত শুকশাবকমুখদ্রষ্ট নীবার-
কণাসকল তরুতলে রহিয়াছে, কোথাও বা

ইঙ্গদীফল পার্শ্বকারী নির্যাসযুক্ত উপল-
খণ্ডসকল (তপোবনের) সূচক হইয়া
রহিয়াছে, মৃগসকল বিশ্বাস সেতু গতিহীন
হইয়া রথ-শব্দ সহ্য করিতেছে এবং জলাশয়ের
পথসকল বস্কলাগ্র-নিঃসৃত বারিরেখা দ্বারা
অঙ্কিত হইয়াছে। আরও,—ক্ষুদ্রজলাশয়ের
বায়ুচালিত জল দ্বারা বৃক্ষমূল ধৌত
হইয়াছে, যজ্ঞীয় ধুম্ভারা নবপল্লবের আকৃষ্ট
বর্ণ মলিন হইয়াছে, ছিন্নকুশাঙ্কুরযুক্ত উপবন
ভূমিতে মৃগশিশুসকল নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দ
মন্দ বিচরণ করিতেছে।]

এ বর্ণনাটির মনোহারিত্ব তপোবন না
দেখিলে বোধ হয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়
না। রাজা স্বর্গ হইতে অবরোহণ কালে
পৃথিবীকে দেখিতেছেন—

“শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুম্ভজতাং
মৌদিনী

পর্ণাভান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াং
পাদপাঃ।

সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যস্তা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং
মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

[যেন স্বর্গতসকল মস্তক উন্নত করি-
তেছে, ও তাহাদের শিখর হইতে পৃথিবী
নিম্নে বৃক্ষসকলের স্কন্ধদেশ
প্রকাশিত হওয়ায়, যেন পত্রমধ্য হইতে
প্রকাশিত হইতেছে; নদীসমূহের যোগুলি
বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ তাছিল তাহা সংলগ্ন
দেখাইতেছে। যেন কেহ সমস্ত পৃথিবী তুলিয়া
আমার পার্শ্বে আনিতেছে।।

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, তবে বৃষ্টি
পূরাকালেও ব্যোমযান ছিল এবং আরোহীর
ইচ্ছামতে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত। নহিলে
কালিদাসের অদ্ভুত কল্পনাশক্তিকে ধন্যবাদ
দিতে হয়। রঘুবংশের এক স্থলে সমুদ্রের
বর্ণনাপাঠে মনে হয়, কালিদাস নিশ্চয়ই সমুদ্র
দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে,
কালিদাস কখনও সমুদ্র চক্ষে দেখেন নাই—
কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। তাহা যদি হয়, ত
ধন্য তাঁহার কল্পনা!

প্রকৃতিবর্ণনায়
পূর্ণ।

রাম দন্ডকারণ্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন,
কোথাও দেখিতেছেন—

স্নিগ্ধশ্যামা ক্ৰীচদপরতো ভীষণাভোগরক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মধুরককুভো ঝঙ্কুতৈর্নির্ঝরাণাম্ ।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দশ্যন্তে পরিচিতভুবো দন্ডকারণ্যভাগাঃ ॥

[পরিচিতভূমি দন্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে ।
কোথাও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথাও বা ভয়ঙ্কর
রক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝঙ্করশব্দে
দিগন্ত শব্দিত হইতেছে, কোথাও তীর্থাশ্রম,
কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে
অরণ্য ।]

—একটি সুন্দর বর্ণনা।

শব্দক রামকে দেখাইতেছেন—কোথাও—
নিষ্কৃজাস্তিমিতাঃ ক্ৰীচৎ ক্ৰীচদপি

প্রোচ্ছন্দসত্ত্বনাঃ

স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভূজগন্ধাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ ।

সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বলপাম্বভসো

যা স্বয়ং

তৃষ্যন্তিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরঃ স্বেদদ্রবঃ

পীয়তে ॥

[সীমান্তপ্রদেশসকলের কোথাও বা একে-
বারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের ভীষণ
গর্জন পরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত
গভীর গর্জনকারী ভূজগণের নিঃশ্বাসে
জ্বলিত অগ্নি; কোথাও গর্ভে অল্প জল দেখা
যাইতেছে। ভূষিত কুকলাসেরা অজগরের
ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে ।]

কোথাও—

ইহ সমদশকুম্ভান্ত্রান্তবানীরবীরুৎ-

প্রসবসুর্ভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি ।

ফলভরপরিণামাশ্যামজম্বুদনিকুঞ্জ-

স্থলনমধুরভূরিশ্রোভসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥

[এইস্থানে আনন্দিত পক্ষিসমন্বিত ও
বেতসলতা—কুসুম-সৌরভাম্বিত শীতল স্বচ্ছ-
বারি প্রবাহিত হইতেছে এবং ফলভরপরিণত
শ্যামবর্ণ জম্বুসমূহের পতনে শব্দায়মানা
ধরশ্রোতা নির্ঝরিণীসকল বহিয়া যাইতেছে ।]

অপিচ—

দধতি কুহরভাজামগ্র ভল্লকয়না-

মনদ্রসিত গদ্রুগি স্ত্যানমম্বদুকৃতানি ।

শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্পকীনা-
মভিদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দ গন্ধঃ ।

[গিরিবিবরবাসী ভল্লকশাবকদিগের থুৎ-
কার শব্দের প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর এবং বারণ-
গণ-কর্তৃক বিভিন্ন শল্পকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত
গ্রন্থিসকল হইতে শীতল, কটুকষায় গন্ধ
বহির্গত হইতেছে ।]

এরূপ ভীম গম্ভীর বর্ণনা কালিদাসে
কুত্রাপি নাই।

রাম সেই পঞ্চবটী বনে দেখিতেছেন—

“পদরা যত্র স্রোতঃ পদলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ স্ফীতরুহান্ ।
বহোদৃষ্টং কালাদপরমিবমন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বৃষ্টিং

দ্রুয়তি ॥”

[সরিৎ বিপর্য্যস্ত হওয়াতে, যেখানে পূর্বে
স্রোত বহিত, সম্প্রতি সে স্থান পদলিনে
পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষসমূহও কোথাও
ঘনীভূত কোথাও বিরলপ্রাপ্ত হইয়াছে।
বহুকাল পরে দেখার জন্য এই বনকে অন্য
বনের ন্যায় মনে হইতেছে। কেবল এই শৈল-
রাজির সন্নিবেশ হেতুই—এই সেই বন
বলিয়া বর্ণিতে পারিতেছি ।]

—চমৎকার।

উত্তরচরিতে আর একটি ব্যাপারের বর্ণনা
আছে যাহা কালিদাস যেন বিবেচনা করিয়াই
তাঁহার নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। সেটি
যুদ্ধের বর্ণনা। এক দিকে লবপ্রযুক্ত জম্বুকাস্ত্র-
নিক্ষেপ দেখিয়া চন্দ্রকেতু কহিতেছেন—

“ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যাতশ্চ

প্রাণিহিতমপি চক্ষুর্গ্রস্তমুত্তং হিনস্তি ।

অথ লিখিতমিবেতৎ সৈন্যম্পদমাস্তে

নিয়তমজিতবীৰ্য্যং জম্বুতে জম্বুকাস্ত্রম্ ॥”

“আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্

পাতালোদরকুঞ্জপদ্বিজিততমঃ শ্যামৈর্নভো

জম্বুভকৈরুত্তমস্ফুরদারকটকিপল-

জ্যোতিজ্বলদীপ্তিভিঃ ।

কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্ত্রীযতে

মীলশ্লেঘতড়িকড়ারকুহরৈর্বিধ্ব্যাপ্তি-

কট্টৈরিব ॥”

[ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় এবং বিদ্যুৎপূর্ণ হওয়ায় চক্ষু একবার নিমীলিত ও একবার উন্মীলিত হইয়া ব্যাধিত হইতেছে; সৈন্যসকল স্পন্দরহিত হইয়া চিত্রে লিখিতবৎ বোধ হইতেছে, ইহা অপ্রতিহতপ্রভাব জ্জ্বলকাস্ত্রের স্ফূরণ।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালাভ্যন্তরবর্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অঙ্ক-কারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উত্তম প্রদীপিত পিস্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জ্জ্বলকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়কালীন দুর্নি-বার ভৈরব বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমালিত বিদ্যুৎকর্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহায়ুক্ত বিদ্যুদ্গির্শিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।]

অপরদিকে লব বিপক্ষসৈন্যকোলাহল শুনিয়া আশ্ফালন করিয়া কহিতেছেন—

“অয়ং শৈলাঘাতক্ষুভিতবড়বাবস্তুহৃতভুক্
প্রচন্ডক্রোধার্চির্নিচয় কবলং ব্রজতু মে।
সমন্তাদুৎসর্পন্ ঘনতুমূলসেনাকলকলঃ
পয়োরশোরোঘঃ প্রলয়পবনাস্ফালিত ইব॥”

[প্রলয়-পবন-পরিচালিত সাগরবারি-প্রবাহ-বৎ চারিদিকে বিচালিত ঘন তুমূল সৈন্য-কোলাহল, পর্বতাঘাত-ক্ষুধ বাড়বানলসদৃশ আমার কোপানলরাশি দ্বারা প্রশমিত হউক।]

এক দিকে চন্দ্রকেতুর বিস্মিত প্রেক্ষণ, আর এক দিকে বালক লবের দর্প। পশ্চম অঙ্ক সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বোধ হয় অতুল।

পরে সেই যুদ্ধমান বালকলব “সন্নেহান্দ-রাগং নিস্বর্গ্য” পরস্পরকে কহিতেছেন—

“যদচ্ছাসংবাদঃ কিম্ কিম্ গুণানামতিশয়ঃ
পূরাণো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।
নিজো বা সম্বন্ধঃ কিম্ বিধিবশাৎ

কোহপ্যবিদিতো

মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয়মবধানং রচয়তি॥”

[ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইতেছে যে? এ কি কোনও অহেতুক পরিচয় মাত্র বা গুণাতিশয়াজনিত; অথবা জন্মান্তরের দৃঢ় স্নেহবন্ধনে বন্ধ আত্মীয়ের মিলন, কিংবা কোনও দৈবদৃষ্টিপাকহেতু অপরিচিত স্বজনের সহিত মিলন?]

এটি কবিদ্বয় হিসাবে চমৎকার। কিন্তু নাটকে একই উক্তি এক সঙ্গে দুজনের মূখে দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে আমরা এই যুদ্ধের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হই। সেই বর্ণনাও জীবন্ত। বীররসে ভবভূতি অস্বতীয়।

কালিদাসের কাছে কিন্তু এ সকল বিষয় বোধ হয় সর্বিশেষ মনোহর বোধ হয় নাই। তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিতে চাহিতেন, ত তাহার এই নাটকেই করিতে পারিতেন। দৈত্যগণের সহিত দুঃসন্তের যুদ্ধ দেখাইয়া তিনি দুঃসন্তের শৌর্য্য পরিষ্ফুট করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা যখন করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার কোমল দিক্‌টাই নিয়াছেন। ভবভূতি নিবিড় জনস্থানের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন—এরূপ বর্ণনার স্থান কি শকুন্তলায় ছিল না। দ্বিতীয় অঙ্কে, কি ষষ্ঠ অঙ্কে বৈচিত্র্য হিসাবে তিনি এরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় তিনি জানিতেন যে, তাহাতে তাহার হাত খুলিবে না। তাই তিনি তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে দিকে, সেই দিকেই গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির কোমল দিক্‌ নিয়াছেন; আর তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন চরম।

প্রথম অঙ্কেই তিনি যে আশ্রম উদ্যানের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ধ্যান কর দেখি। দেখ দেখি, একটি অপূর্ণ ছবি দেখিতে পাও কি না। নিষ্কর্জন আশ্রম, পার্শ্ব তরুরাজি, সম্মুখে উদ্যান। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, মৃগ উড়িয়া সেই পুষ্পে আসিয়া বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। গাছের উপরে পাখী ডাকিতেছে। সেই ছায়ানিবিড় সুগন্ধ স্তম্ভ আশ্রমপদে, সেই পুষ্পগুলির মধ্যে সেরা পুষ্প—তিনটি যুবতী তাপসী পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতেছেন। তাহাদের তরুণ দেহের উপর সূর্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ গণ্ডে নিরাবিল আনন্দ, স্ফূর্তি ও পুষ্পের জ্যোতিঃ, তাহাদের কাছে যেন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, কেবল বর্তমান মাত্র আছে। যেন তাহারা জন্মান নাই; মরিবেন না। তাহাদের শৈশব ছিল না, বার্ধক্য আসিবে না। তাহারা আপনাতেই আপনি মগ্ন। তিনটি মৃত্যু স্বর্ণ-

সুদ্রে বাঁধা, তিনটি অনাঘ্রাত পদুপ, তিনটি আনন্দ ও যৌবনের মূর্তি।—কি সুন্দর ছবি!

আবার সপ্তম অঙ্কে আর একটি ছবি দেখ। কশ্যপের আশ্রমের অনতিদূরে একটি বালক সিংহাশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাপসী-দ্বয় তাহাকে ধমকাইতেছে, শিশু শূন্যতেছে না। অদূরে দৃশ্যমন্ত দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। পরে বিরহিণী—কৃশা মালিনা একবেণীধারিণী শকুন্তলা ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে সেই শান্ত নিস্তব্ধ হেমকূট পর্বতের প্রান্তভাগে প্রণয়-যুগলের পুনর্মিলন দৃশ্য—যেন শান্তি অনঘ আনন্দের নন্দন-কানন।—কি সুন্দর!

শান্তরসের ছবি তাঁহার চেয়ে জগতে কে আঁকিতে পারিয়াছে! Shakespeare একবার চন্দ্রালোকে প্রেমিকযুগলের বর্ণনা করিয়াছেন—Jessica বলিতেছেন—How sweet the moonlight sleeps upon the bank. রমণীয়তায় সে ছবি এ ছবির কাছে লাগে কি?

চতুর্থ অঙ্কে আর একটি দৃশ্য দেখ। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। কব্জলমুনি তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন।

“যাস্যত্যদ্য শকুন্তলোতি হৃদয়ং

সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া

অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং
দর্শনম্।

বৈক্রব্যং মম তাবদীদৃশমপি

স্লেহাদরণ্যোকসঃ

পীড়ান্তে গৃহিণঃ কথং ন

তনয়্যাবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

[শকুন্তলা অদ্য পতিগৃহে যাইবে বলিয়া আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অন্তর্গত বাষ্পভরে বাক্য অবরুদ্ধ হইতেছে এবং নয়ন-দ্বয় চিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে। আমি অরণ্যবাসী তাপস, স্নেহবশে যখন আমারই এমন বিকলতা হইতেছে, তখন, যাহারা গৃহী-নৃতন কন্যাবিযোগ-দুঃখে না জানি তাহারা কতই ব্যথিত হয়।]

কব্জল তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন—

“যযাতেরিব শশ্মিষ্ঠা ভর্তৃর্বহুমতা ভব।

পদুত্রং ত্বমপি সম্রাজ্যং সেবপদুত্রমবানুহি।”

[শশ্মিষ্ঠা যেমন যযাতির বহুমত হইয়া-ছিলেন, তুমিও তদুপ স্বামীর বহুমত হও এবং তাঁহার যেমন সম্রাট পুত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ পুত্র লাভ কর।]

শকুন্তলা কব্জলের আদেশে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

কব্জল শিষ্যদ্বয় শাঙ্গরব ও শারদ্বতকে কহিলেন—

“বৎসৌ ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তাম্।”

[বৎসদ্বয়! তোমরা ভগিনীকে পথ দেখাইয়া দেও।]

তাঁহারা সে আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলে কব্জল বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন—

“ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যাতি জলং

যদুস্মাস্বাস্তেষু যা

নাদত্তে প্রিয়ম্ভূতানপি ভবতাং স্নেহেন

যা পল্লবম্।

আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্য ভবতুৎসবঃ
সেয়ং য়াতি শকুন্তলা পতিগৃহং

সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥”

[হে সমীপবর্তী বনদেবতা ও তপোবন-তরুগণ, তোমাদের জলসেক অগ্রে না করিয়া যে জলপান করিত না; ভূষণপ্রিয় হইয়াও যে স্নেহবশে তোমাদের পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদের প্রথম কুসুমোদ্গম হইলে যে উৎসব করিত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।]

তাঁহার পরে শকুন্তলা সখীদ্বয়ের কাছে বিদায় লইলেন। শকুন্তলার মন ব্যাকুল। পতিগৃহে যাইতেও তাঁহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়বদা শকুন্তলাকে দেখাইলেন যে, আসন্ন বিরহে সমস্ত তপোবন শ্লিষ্ণমাণ। শকুন্তলা লতা-ভাগিনী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কাছে বিদায় লইলেন ও তাহাকে যত্ন করিবার জন্য তাত কব্জলকে অনুরোধ করিলেন। কব্জল একটু মৌখিক কোতক করিয়া উদ্বেগ দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা, সহকার ও মাধবীলতাকে সখীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেই তাঁহারা “আমাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ,” বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কণ্ব তাঁহাদিগকে সান্ধনা করিলেন। শকুন্তলা কণ্বকে অনুরোধ করিলেন যে, গর্ভিণী মৃগী প্রসব করিলে যেন তিনি সংবাদ পান। শকুন্তলা গমনোদ্যত হইলে, মৃগশাবক তাঁহার পথ অবরোধ করিল। শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাকে সান্ধনা দিয়া পরে শেষ উপদেশ দিলেন—

“শুশ্রূষস্ব গরুদন কুরু প্রিয়সখীবৃন্তং
সপত্নীজনে
ভর্তৃর্দ্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাম্ম
. প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে
ভোগেষ্বৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ
কুলস্যাধয়ঃ।

[গরুদজনের শুশ্রূষা করিবে এবং সপত্নী-গণের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, ন্বামী তিরস্কার করিলেও রোষভরে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি দক্ষিণ্যবতী হইও এবং ভোগে আসক্ত হইও না। যুবতীগণ এইরূপ করিলেই প্রকৃত গৃহিণী হইয়া থাকেন, অন্যথা কুলের পীড়া-দায়িনী হয়।]

শকুন্তলা একবার কণ্বের ক্রোড়দেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়দেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মলয় পর্বত হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় কিরূপে জীবন ধারণ করি!” পরে কণ্বের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, “পিতা বন্দনা করি।”

শেষে কণ্ব শোকাবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কহিলেন,—“বৎসে, মামেবং জড়ী-করোষি”

“অপযাস্যতি মে শোকং কথং নু বৎসে ত্বয়া
রচিতপূর্বম্।

উটজম্বারবিরুঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥

[বৎসে! আমাকে এরূপ জড়ীভূত করিয়া ফেলিলে! তুমি পূর্বে পর্ণশালা-দ্বারে যে নীবারবলি প্রদান করিয়াছিলে, তাহা অঙ্কুরিত দর্শনে আমার শোক কিরূপে দূরীভূত করিবে?]

এমন কোমল স্নেহকরুণ ছবি জগতে আর কে আঁকিতে পারিয়াছে?—কন্যাকে তাহার

পতিগৃহে যাইবার জন্য প্রথম বিদায় দেওয়ার কারুণ্য যেন এই অঙ্কে উছলিয়া উঠিতেছে—স্থানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

উত্তররামচরিতে করুণরসেরই প্রাদুর্ভাব বেশী—তাহা আমি পূর্বে পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে কারুণ্য প্রায় বিলাপেই পূর্ণ। এরূপ কারুণ্য অতি সস্তাদরের। “ওগো মা গো” “ওরে তুই কোথায় গেলি রে—” এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদানোর শক্তি—উচ্চ অঙ্গের কবিত্বসূচক নহে। ইহা প্রায় সকলেই পারে। কর্তব্য ও স্নেহ, শোক ও ধৈর্য, আনন্দ ও বেদনা, এই মিশ্রপ্রবৃত্তির সংঘর্ষে যে কষায় অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত যিনি তৈয়ারি করিতে পারেন, যিনি মিশ্রপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুষ্যহৃদয়ের নিহিত কারুণ্যের দ্বার মনুস্ত করিয়া দেন, ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য একত্র রাশীকৃত করিয়া দেখাইয়া যিনি চক্ষে জল বাহির করিতে পারেন—তিনিই মহাকবি, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের গঢ় রহস্য বদ্বিয়াছেন। কালিদাসের কারুণ্য এই শ্রেণীর। ভবভূতির রামবিলাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। তাহা কেবল চীৎকার, কেবল অনুরোধ।

ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে একটি প্রধান রসের অবতারণা করেন নাই। সেটি হাস্যরস। কিন্তু কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরসের মধুর সংমিশ্রণ করিয়াছেন। সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস হাস্যরসে অদ্বিতীয়। দৃশ্যমন্তের বয়স্যের পরি-হাসগর্ভি দই একবার প্রথম বসন্তের সমীরণের মত দৃশ্যমন্তের প্রণয়ম্রোতস্বিনীর প্রবল প্রবাহের উপর দিয়া মৃদু হিল্লোল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এক জন তাপসীর প্রেমে মূগ্ধ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার নামটি করেন না। তাঁহার বয়স্য এই ব্যাপারে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার কাছে প্রেমের চেয়ে সুখাদ্য বেশী প্রিয়। এমন সারবান্ রসনার্ত্তিতকর পদার্থ ছাড়িয়া লোকে কেন যে প্রেমের পাকে পাড়িয়া ঘুরপাক খায়—যাহাতে দস্তুরমত ক্ষুধামান্দ্য হয়, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কার্য্যে অমনোযোগ হয় এবং মনে অশান্তি

হয়—এই কথা ভাবিয়া তিনি অসীম বিস্ময় অনুভব করিতেছেন।

মাধবোর পরিহাসের মধ্যে কিছ্‌ নিগূঢ় অর্থ আছে। তিনি এ গূঢ় প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাহার অশুভ পরিণাম আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাই তিনি রাজাকে তাহা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা পরে যখন তাহার কাছে অনুযোগ করিতেছেন যে, শকুন্তলাবৃত্তান্ত কেন তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই, তখন মাধব্য কাহিলেন যে, রাজা ত সে সময়ে এ সমস্ত ব্যাপার অলীক পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। মাধবোর এই উত্তরে যেন বেশ একটু নিহিত উপদেশ আছে বলিয়া বোধ হয়! ইহার অর্থ যেন—যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

ভবভূতি উত্তররামচরিত হইতে হাস্যরস বর্জন করিয়াছেন। একবার সীতা আলেখ্য-পিত উম্মিলার প্রতি তর্জনী নির্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে সহাস্যে কাহিতেছেন, “দেবর! এ কে?” ইহা অবশ্য ঠিক রসিকতার হিসাবে বিচার্য্য নহে। ইহা মৃদু স্নেহ পরিহাস। ভবভূতি বোধ হয় একেবারে রসিক ছিলেন না। কিংবা হাস্যরসকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন।

জগতে প্রায় কোন মহাকাব্য-রচয়িতা তাহার মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন নাই। ইয়ুরোপে প্রথম এরিষ্টফেনিস ও এসিয়ান কালিদাস বোধহয় প্রথমে হাস্যরসকে তাহাদের মহানাটকগুলিতে স্থান দেন। পরে সেক্সপীয়র এ বিষয়ে এত অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে, তাহার প্রায় প্রত্যেক মহানাটকে চরম রসিকতা দেখিতে পাই। তাহার Henry V নাটকের Falstaff নামকরণ করিলে বোধ হয় ঠিক হইত। তাহার পরে Molieres বিশুদ্ধ হাস্যরসে নাট্যজগতে মহারথী হইলেন। Carventes শব্দ এক হাস্যরসপ্রধান Don Quixote উপন্যাস দ্বারা এমন কি, সেক্সপীয়র ইত্যাদির সহিত একাসনে বসিতে স্থান পাইলেন। সর্বশেষে Dickens তাহার উপন্যাসগুলিতে বিশেষতঃ Pickwick Papers উপন্যাসে হাস্যরসের মর্যাদা বাড়াইয়া দিলেন। এখন আর হাস্যরসকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। অন্যান্য রসের

সহিত হাস্যরস এখন মাথা উঁচু করিয়া বসিতে পারে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি হাস্যরস এত শ্রেণ্য, তবে মহাকাব্যরচয়িতারা ইহার প্রতি কার্য্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন?

তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, মহাকাব্যের বিষয় অত্যন্ত গম্ভীর। মহাকাব্য—হয় দেবদেবী কিংবা দেবোপম বীরের চরিত লইয়া লিখিত হয়। এত গম্ভীর বিষয়ের সহিত রসিকতা মিশাইবার সাধ্য সকলের থাকে না। এরিষ্টফেনিস লিখিয়াছেন ত একবারে নিছক হাস্যরস লিখিয়াছেন। হোমার লিখিয়াছেন ত নিছক বীররস লিখিয়াছেন। গেটে গম্ভীর নাটকই লিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। জার্মানজাতি গম্ভীরপ্রকৃতির জাতিই তাহার হাস্যরসে সর্বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই মিশ্র হাস্য ও গম্ভীররস সমভাবে ও একত্রে প্রথমে সেক্সপীয়র দেখাইতে সাহসী হন। পরে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট ইত্যাদি তাহার পদানুসরণ করেন। এখন প্রত্যেক দেশে সভ্যতার প্রসারের সহিত হাস্যরস ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

তবে হাস্যরসেরও প্রকারভেদ আছে, কাতুকুতু দিয়াও হাসান যায়। তাহাতে হাস্য হইতে পারে, রস হয় না। মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন উক্তি হাसान অতি নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস। প্রকৃত হাস্যরস মানুষের মানসিক দৌর্ভাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্ধ-বধির ব্যক্তি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া যদি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে “এ্যাঁ”, তাহা সেই বধিরের শারীরিক বৈকল্য মাত্র; তাহা যদি কাহারও হাস্যের কারণ হয়, ত সে হাস্য একটা রস নহে। সে হাস্য এক জনকে পিছলাইয়া পড়িতে দেখিয়া হাস্য একই প্রকারের। কিন্তু সেই বধির ব্যক্তি যদি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, ত তাহাতে হাস্যের উদ্বেক হয়—তাহা রস। কেন না তাহার মূলে বধিরের মানসিক দৌর্ভাগ্য—অর্থাৎ আপনাকে বধির বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার অনিচ্ছা।

মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল দৌর্ভাগ্য আছে, তাহার অসংগতি দেখাইয়া হাস্যের উদ্বেক

বর্ণিলে, সেই দৌৰ্বল্যের প্রতি আক্রোশে ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিতে মৃদু পরিহাসের সৃষ্টি হয়।

সেক্সপীয়র শেষোক্ত এবং সার্ভান্টেস প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসে জগতে অস্বিতীয়। সেরিডান প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মলিয়ার শেষোক্ত শ্রেণীর। কবিদিগের মধ্যে Ingoldsby প্রথমোক্ত শ্রেণীর এবং Hood শেষোক্ত শ্রেণীর। কালিদাস শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ পরিহাসিক মহাকাবি। মাধবের রসিকতা মৃদু। তাহার মধ্যে হুল নাই।

আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তাহা অতি উচ্চ ধরনের। তাহা মিশ্র রসিকতা। হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রোদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মৃখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করি, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল। কোন কোন সমালোচকের মতে Falstaffএর চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়রের রসিকতা এই শ্রেণীর। কালিদাস এইরূপ রসিকতা সম্বন্ধে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। রসিকতা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না।—সেক্সপীয়র এত উচ্চে।

চরিত্র-চিত্রণে এই মহাকাবিই মনুষ্যচরিত্রের কোমল দিকটা লইয়াছেন। ভবভূতি তাহার উপরে পঞ্চম অঙ্কে লবের চরিত্রে যে বীরভাব ফুটাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু।

বস্তুতঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু উজ্জ্বল। আদিরসে কালিদাস অস্বিতীয়। রমণীয় করুণ ছবি আঁকিতে কালিদাস যেমন, গম্ভীর করুণ ছবি আঁকিতে ভবভূতি তেমনই। কালিদাসের নাটকে যদি নদীর কলস্বরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভবভূতির এই নাটকে সমুদ্রগর্জনের সহিত তুলনা করিতে হয়। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে, মনের ভাব বাহিরের ভাষায় বা কার্যে প্রকাশ করিতে ভবভূতি কালিদাসের চরণরেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নহেন। আমি পূর্বে

পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, ভবভূতি যে তাহার নাটকের নায়ক ও নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ফুটে নাই। তাহা সুন্দর, কিন্তু অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকা কেহই তাহার প্রেম কার্যে দেখান নাই। কেবল বিলাপ আর স্বগতোক্তি। “প্রাণনাথ, আমি তোমারই” ইহা বলিলেই সাধবীর পতিপ্রাণতা সম্যক্ দেখান হয় না। পতিপ্রাণতার কাৰ্য্য করা চাই। তবেই নাটকীয় চরিত্র ফুটে। রাম, কার্যের মধ্যে বিলাপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, আর শূদ্ররাজাকে বধ করিয়াছেন। আর নীরবে সীতা সহ্য করিয়াছেন—নহিলে আর কি করিতে পারিতেন?—সে সহ্য করাও ফুটে নাই। ভবভূতির সীতা এক সরলা, বিহ্বলা, পবিত্রা, পতিপ্রাণা, নিরভিমানিনী পত্নীর অস্পষ্ট ছবি। এই ছবি যদি ভবভূতি কার্যে ফুটাইতে পারিতেন, সজীব করিয়া আঁকিতে পারিতেন, তবে এ ছবির তুলনা রহিত না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভবভূতি বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন চরম। রাম দেবতা, সীতা দেবী। কালিদাসের দৃষ্টিতে ও শকুন্তলা তাহাদের তুলনায় কামুক ও কামুকী। কিন্তু দৃষ্টিতে ও শকুন্তলার চরিত্র যাহাই হোক, সজীব। ভবভূতির রাম ও সীতা নিজীব। কালিদাসের মহত্ব চিত্রাঙ্কনে, ভবভূতির মহত্ব কল্পনায়।

ভাষা ও ছন্দোবন্ধ

একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার অন্যান্য গুণাগুণের সহিত তাহার ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। চিন্তা বা ভাবসম্পদ কবিতা বা নাটকের প্রাণ, ভাষা তাহার শরীর। ভাষা যে ভাব প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে; ভাষা সেই ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করে। ভাষা ও ভাবের এরূপ নিত্য সম্বন্ধ যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন, যে ভাষাহীন ভাব থাকিতে পারে কি না। যেমন দেহহীন প্রাণ কেহ দেখে নাই, তেমনি ভাষাহীন ভাব মনুষ্যের অগোচর।

এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়াও বলা চলে যে, যে রূপ প্রাণ ও শরীর, শক্তি ও পদার্থ

পদরূপ ও প্রকৃতি, সেইরূপ ভাব ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। যাহা সজীব কবিতা, তাহাতে ভাষা ভাবের অনুগামী হয়। অর্থাৎ ভাব আপনার ভাষা আপনি বাঁছিয়া লয়। ভাব চপল হইলে, ভাষা চপল হইবে, ভাব গম্ভীর হইলে ভাষা গম্ভীর হইবে। না হইলে সে কবিতা অতু্যক্তম হয় না।

Pope তাঁহার Essay on Criticismএ লিখিয়াছেন,—

“It is not enough no harshness
gives offence
The sound must seem an echo
to the sense.”

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে সুন্দর সমালোচনা হইতে পারে না। যেখানে একটি ক্ষুদ্র তটিনীর বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে মৃদুধ্বনি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে ভাষারও জলদনির্ঘোষ চাই। বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা চিরকাল ভাবের অনুগামী। তিনি যখন ক্রুদ্ধ শিবের সজ্জা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাষাও তদ্রূপ গম্ভীর, আবার যখন বিদ্যা মালিনীকে ভৎসনা করিতেছে, তখন তাঁহার ভাষা তম্বিপরীত।

মাইকেলও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন শিবের ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাতেই যেন তাহার অর্ধেক বর্ণনা হইয়া গেল। আবার যখন সীতা সরমার কাছে তাঁহার কাহিনী কহিতেছেন, তখন তাঁহার শব্দগুলি মৃদু, সহজ ও সরল, এবং যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জিত। Browningএর ভাব ও ভাষা পরস্পরের সহিত খাপ খায় নাই। Browning ভাষার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার ভাষা অনেক সময়ে কঠোর ও কৃত্রিম; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুগামী। Tennysonএর ভাষা অতুলনীয়। পুরাতন ইংরাজি কবিগণ অর্থাৎ Byron, Shelley, Wordsworth ও Keats ভাষা ও ভাবের চমৎকাররূপে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন। Wordsworthএর ভাষা স্বাভাবিক। কোন কোন সমালোচক বলেন, Wordsworthএর পদ্যের ভাষা গদ্যের মত।

হোক; যদি গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব সুন্দরতর রূপে প্রকাশ করে, আমরা পদ্য চাই না, গদ্যই চাই। Carlyle গদ্যে চরম কবিতা লিখিয়াছেন। Shakespeare ভাষা ও ভাব যেন একত্র গলাইয়াছেন। বস্তুতঃ যে কবির ভাষা ভাবের বিরোধী, সে কবি মহাকবি নহেন—হইতে পারেন না।

তাহার পরে ছন্দোবন্ধ যত ভাবের অনুরূপ হয়, ততই সুন্দর হয়। কিন্তু তাহার নিস্বাচনের উপর কাব্য-সৌন্দর্য্য তত নির্ভর করে না। Shakespeare এক অমিত্রাক্ষরে প্রায় তাঁহার সমস্ত ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়াছেন। Tennyson ও Swinburne ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজি কবির বিশেষ ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। নৃত্যের ভাব প্রকাশ করিতে নাচনি ছন্দ সর্বা-পেক্ষা উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার একান্ত আবশ্যিকতা নাই। তাহা নহিলেও চলে। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা নহিলে চলে না।

আমাদের এই কবিত্বের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে কাহার শক্তি অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুর্দূহ। উভয়েই সুন্দর ভাষার অধিকারী। তবে, ভাষার সারল্য ও স্বাভাবিকতায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ। তিনি এমন কথা সব ব্যবহার করেন, যাহাতে ভাবটি যে শব্দে হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা নহে, সেটি যেন প্রাণে বাজিতে থাকে। তাঁহার “শান্তমিদমাশ্রমপদম্” এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা আশ্রমপদটি যেন সত্যই চক্ষে দেখিতে পাই ও সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করি। তিনি যখন বলিতেছেন, “বসনে পরিধ্বসরে বসানা”—তখন যেন আমরা তাপসী শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

ভবভূতির উত্তরামচারিত ভাষাসম্বন্ধে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা অপেক্ষা হীন নহে। যেখানে যে রূপ ভাব, উভয় কবিই সেই স্থানে সেইরূপ ভাষা। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ও ধ্বনি ভিন্ন, ব্যবহৃত শব্দের আর একটি গুণ আছে।

প্রত্যেক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভিন্ন ও আর একটি অর্থ আছে। তাহার প্রচলিত ব্যবহারে সেই শব্দের সহিত কতকগুলি আনুর্ভাবিক ভাব বিজড়িত আছে। ইহাকে ইংরাজিতে শব্দের connotation বলে।

সাধারণতঃ শব্দ যত সহজ ও প্রচলিত হয়, ততই তাহা জোরাল হয়। কালিদাসের ভাষা এইরূপের। কালিদাসের ভাষা প্রায়ই প্রচলিত সামান্য সরল শব্দের সুন্দর সমাবেশ। উপরে উদ্ধৃত তাঁহার “শান্তিমিদমাশ্রমপদম্” কিংবা “বসনে পরিধুসরে বসানা” অত্যন্ত সহজ সংস্কৃত। কিন্তু এই শব্দগুলির সার্থকতা কতখানি! ভবভূতি এই গুণ সম্বন্ধে কালিদাস অপেক্ষা অনেক হীন। তাঁহার ভাষা সমাধিক পাণ্ডিত্যবাজক। প্রচলিত শব্দের তিনি পক্ষপাতী নহেন। দূর হ ভাষা ব্যবহার করিতে তিনি বড় ভালবাসেন।

তাহার পর অনুপ্রাস।—কাব্যে অনুপ্রাসের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। Rhyme এর যে উদ্দেশ্য, অনুপ্রাসেরও সেই উদ্দেশ্য। একটা ধ্বনির বার বার পুনরাবৃত্তিতে একটি সঙ্গীত আছে। Rhyme এ প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরে তাহা ঘুরিয়া আসে, তাহাতে একটা শ্রুতিমাধুরী আছে। অমিত্রাক্ষরে যে মাধুর্য্য নাই; অনুপ্রাস তাহার অভাব পূর্ণ করে। কিন্তু যে ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা মধুর হওয়া চাই। যাহা বিকট ধ্বনি, তাহার বারংবার আঘাতে বাক্যবিন্যাস শ্রুতি-মধুর না হইয়া নিশ্চয় শ্রুতিকঠোরই হইবে। সেরূপ শব্দ অপরিহার্য্য হইলে তাহার এক-ছত্রে একবার প্রয়োগেই যথেষ্ট। বীণার তारे বার বার ঘা দিলে সুন্দর লাগে বলিয়া ঢেঁকির কচকচানি ভাল লাগে না।

ভবভূতির অনুপ্রাসে বীণার ধ্বনির চেয়ে ঢেঁকির কচকচানিই অধিক। তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টিতে একটু বেশ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁহার “গঙ্গাদনদঙ্গোদাবরীবারয়ো” কিংবা “নীরঞ্জনীলিনীচুলানি” বা “স্নেহাদনরালনাল-নালিনী” এরূপ অনুপ্রাসে আপত্তি নাই। ইহার সঙ্গে একটা সুন্দর আছে। কিন্তু “কঙ্কাকান্তকপোত-কুঙ্কটকুলা কূলে কুলায়-দ্রুমা” একেবারে অসহ্য।

ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাসের ভাষার অপেক্ষা হীন হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার রচনায় তিনি লালিত্য কোমলকান্ত পদাবলিও শুনাইতে পারেন, আবার জলদ-

নির্ঘোষও শুনাইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে কত গাঢ়, গম্ভীর হইতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাষা।

ভাবকে গাঢ় অথচ সহজে বোধগম্য করাই-বার শক্তি মহাকবিবর আর একটি লক্ষণ। কোন কোন বড় কবিও মাঝে মাঝে ভাবকে এত গাঢ় করিয়া ফেলেন যে, বৃদ্ধিবার জন্য তাহার টীকার প্রয়োজন। অনেক অনুকূল সমালোচক কবিবর এই মহা দৌষকে ‘আধ্যাত্মিক’ নাম দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ও মাঘের এই দৌষ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এ বিষয়ে কালিদাস সকলের আদর্শ। ভবভূতি এ বিষয়ে বিশেষ দোষী। তিনি ভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে সমাসের ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার হাতে পাড়িয়া এমন সুন্দর নিয়ম সমাস, পাঠকের পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত সমাসগুলি কাব্যের ভূষণ না হইয়া ভারস্বরূপ হইয়াছে।

তাহার উপরে উপমা অবশ্য ভাষা কি ছন্দোবন্ধের অঙ্গ নহে। তাহা লিখিবার একটি ভঙ্গী, যাহাকে ইংরাজিতে style বলে। অনেকে বক্তব্য বিষয়টি উপমা না দিয়াই বঝান। সে ধরণ—সরল ও অনলঙ্কৃত। অনেকে প্রচুর পরিমাণে উপমা দিয়া বক্তব্যটি বঝান। তাঁহাদের ধরণ কিছু তির্যক, অলঙ্কৃত। এই উপমা যদি সুন্দর হয় ও উচিত স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উপমা প্রয়োগ লেখার একটি বিশেষ ভঙ্গী বলিয়া, কালিদাস ও ভবভূতির উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

উপমা উত্তম বর্ণনার একটি অঙ্গ। উপমা বিষয়কে অলঙ্কৃত করে, বর্ণনাকে উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য্যকে রাশীকৃত করে, মনোরাজ্যের ও বহিজর্গতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পাঠককে বিস্মিত করে এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর পরিষ্কৃত করে। আমরা কথোপকথনে এত অধিক পরিমাণে উপমা ব্যবহার করি যে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ‘ঘোড়ার মত দৌড়ান,’ ‘হাতীর মত মোটা’,

‘ভালগাছের মত লম্বা’, ‘দেখতে যেন রাজপুত্র’, ‘ষাঁড়ের মত চীৎকার’, ‘পটলচেরা চোখ’, ‘চাঁদপানা মুখ’ ইত্যাদিরূপ উপমা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। তদুপরি, “মাথাধরা”, “পা কামড়ান”, “বসে পড়া” ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ এত সাধারণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যে একরকম উপমা, এ কথা হঠাৎ মনেই আসে না।

উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিক-গণের কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। যেমন যশ কিংবা হাস্যকে কোন শব্দবর্ণের সহিত তুলনা করিতেই হইবে। একটি প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতগণ রাজার যশকে দধিবৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; পরে কালিদাস আসিয়া কহিলেন, “রাজস্তুব যশো ভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ।” অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়াও কালিদাস একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিলেন। এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কালিদাস তাঁহার নাটকে ও কাব্যে বহুতর নূতন উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নতর শ্রেণীর কবিকুল নূতন উপমা রচনায় অক্ষমতা-বশতঃ পুরাতন উপমা প্রয়োগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। পদ্মমুখী, মৃগাক্ষী, গজেন্দ্রগমনা এই সব মান্দাতার আমলের পুরাতন উপমা সম্প্রদায়-বিশেষের কাছে প্রিয়। কিন্তু প্রধান কবি সেই সব পুরাতন গলিত উপমা ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা কল্পনা দ্বারা নূতন উপমার সৃষ্টি করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে, উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে কালিদাসের বিশেষ খ্যাতি আছে। “উপমা কালিদাসস্য।” কালিদাস নিশ্চয়ই উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। সেরূপ রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রারম্ভে প্রায় প্রতি শ্লোকে তিনি উপমা দিয়াছেন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্থানে স্থানে উপমা লাগসই হয় নাই। যেমন—

“মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্‌পহাস্যতাম্‌।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্‌ম্বাহুরিব বামনঃ॥”

[বামন যেমন দীর্ঘকায় লোকের প্রাপ্য ফল লাভের জন্য হস্ত উত্তোলন করে, মন্দ কবিযশ-প্রার্থী আমিও তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইব।।

এ উপমার চেয়ে বাঙালায় প্রচলিত উপমা ‘বামনের চাঁদে হাত’ অনেক জোরাল। কালিদাস এই শ্লোকের অব্যবহিত পদার্থেই এইরূপ জোরাল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—

“ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষদৃদস্তরং মোহাদ্‌ড়ুপেনাস্মি সাগরম্‌॥”

[সূর্য্যসম্ভূত বংশ কোথায়, আর অল্পমতি আমি কোথায়? আমি মোহবশে ভেলা সহজে দৃদস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছি।।

ইহার পার্শ্বে কালিদাসের কষ্টকল্পিত বামনের উপমাটি কি দুর্বল! যেন উপমা একটা দিতেই হইবে। ইংরাজিতে Dryden কবিতার শ্রেণীবিশেষকে ব্যঙ্গ কবিয়া কহিয়াছেন;—

One (verse) for sense and
one for rhyme
Is quite sufficient at a time.”

কালিদাসের—হইয়া দাঁড়াইয়াছে one for sense and one for simile.

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা উক্ত দোষে দৃষ্ট নহে। তিনি যখন যে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা উচিত স্থলে বসিয়াছে, তখনই তাহা নূতনত্ব বাক্যক্ করিতেছে, তখনই তাহা সুন্দর। তাঁহার “সরসিজ-মনুবিবন্ধং শৈবলেন” উপমা অতুল। তাঁহার ‘কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রেষু’ সুন্দর। তাঁহার “অনাঘাতং পদুপম্” চমৎকার।

কালিদাস ও ভবভূতির উপমাপ্রয়োগবিধি এক হিসাবে ভিন্ন শ্রেণীর। উপমা দিবার তিন প্রকার প্রথা আছে। (১) বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা, এবং গুণের সহিত গুণের উপমা, যেমন চন্দ্রের মত মুখ বা মাতৃস্নেহের মত পবিত্র, (২) গুণের সহিত বস্তুর উপমা, যেমন স্নেহ শিশিরের মত (পবিত্র) বা হৃদের মত স্বচ্ছ; চন্দ্রের মত শান্ত ইত্যাদি; (৩) বস্তুর সহিত গুণের উপমা, যেমন মনের মত (দ্রুত) গতি, বা সুখের মত (স্বচ্ছ শান্ত) নিৰ্ঝরিণী, বা হিংসার মত (বক্র) রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালিদাসে ও ভবভূতিতে এই ত্রিবিধ প্রথাই আছে। কিন্তু কালিদাসের উপমার একটি বিশেষত্ব প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত উপমা

ব্যবহারে, এবং ভবভূতির উপমার বিশেষত্ব, শেষোক্তরূপ উপমা ব্যবহারে। কালিদাস বঙ্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে শৈবালবোঁটতা পদ্মের সহিত তুলনা করিতেছেন; সীতাকে (মর্ত্তমান) কারুণ্য ও শরীরিণী বিরহ-ব্যথার সহিত তুলনা করিতেছেন।

কালিদাস বলিতেছেন—

“গচ্ছতি পদরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ-
সংস্থিতা চেতঃ।”

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং
নীয়মানস্য॥”

[বায়ুর প্রতিকূলে নীত নিশানের চীনাংশুকের ন্যায় শরীর অগ্রে যাইতেছে পশ্চাতে অব্যবস্থিত চিত্ত যাইতেছে।]

ভবভূতি বলিতেছেন—

“ব্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্পবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য
গুপ্তৈত্যা।

সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সপ্তয়ো বা গুণানা-
মাবিভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যানির্ম্মাণরাশিঃ।”

(অনুবাদ ইতিপূর্বে দ্রষ্টব্য)

এরূপ উদাহরণ নাটকদ্বয় হইতে ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুতঃ, যেহেতু কালিদাসের শকুন্তলার ধারণা আধভৌতিক আর ভবভূতির সীতার ধারণা আধ্যাত্মিক, সেইহেতু কালিদাসের উপমাও বাস্তব বিষয় লইয়াই রচিত, আর ভবভূতির উপমাও মানসিক গুণ ও অবস্থা লইয়া রচিত। উপমা সম্বন্ধেও কালিদাস যেন মর্ত্ত্য বিহার করিতেছেন এবং ভবভূতি আকাশে বিচরণ করিতেছেন।

উপমার আর একরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যথা সরল ও মিশ্র। সরল উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একটিমাত্র উপমা আছে। মিশ্র উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একাধিক উপমা নিহিত আছে। “পশ্চাত্তের মত স্থির” লালসার এটি সরল উপমা; কিন্তু “বিষাক্ত আলিঙ্গন” ইহা মিশ্র উপমা; প্রথমে লালসার অবস্থার সহিত আলিঙ্গনের তুলনা, তাহার পরে আলিঙ্গনের ফলের সহিত বিষের তুলনা।

ইয়ুরোপে উপমা প্রয়োগ প্রণালীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সরল উপমা ক্রমে মিশ্র উপমার আকার ধারণ করিয়াছে। Homerএর উপমা—বৈচিত্র্যে, প্রাচুর্যে, সৌন্দর্যে, গাম্ভীর্যে পূর্ণ। বহু-স্থলে, তিনি যখন উপমা দিতে বসেন, তখন উপমাকে ছাড়িয়া উপমেয়কে এরূপ সাজাইতে বসেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন যে, সেই উপমেয় স্বয়ং একটি সৌন্দর্যের নন্দনকানন হইয়া দাঁড়ায়; পাঠক সে মূহুর্ত্তে উপমানকে ভুলিয়া গিয়া উপমেয়ের প্রতি বিস্মিত মূগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন, he makes no scruple, to play with the circumstances. একটি উদাহরণ দেই—

“As from an island city seen afar,
the smoke goes up to heaven when
foes besiege.

And all day long in grievous
battle strive ;
The leaguered townsmen from
their city wall ;
But soon, at set of sun, blaze
after blaze
Flame forth the beacon fires, and
high the glare
Shoots up, for all that dwell
around to be
That they may come with ships to
aid their stress
Such light blazed heavenward
from Achilles' head.”

এ স্থলে “at set of sun, blaze after blaze flame forth the beacon fires, and high the glare shoots up” এইটুকুই উপমা। বাকীটুকু অবান্তর। কিন্তু কবি এই ছবিটি এত যত্ন করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া, বিশেষ করিয়া আঁকিয়াছেন, যে, তাহাই একটা সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

“Homeric simile is not a mere ornament. It serves to introduce

something which Homer desires to render exceptionally impressive . . . They indicate a spontaneous glow of poetical energy; and consequently their occurrence seems as natural as their effect is powerful."

ভার্জিল, ডাণ্টে ও মিল্টন এ বিষয়ে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মনে হয় যে, তাঁহাদিগের উপমাপ্রয়োগ ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়াছে। মিল্টন তাঁহার উপমায় তাঁহার প্রভূত পার্শ্বিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উদাহরণতঃ তাহার একটি উপমা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"For never since created Man
Met such embodied force, as
named with these
Could merit more than that
small infantry
Warred on by cranes—though
all the giant brood
Of Phelgra with the heroic race
were joined
That fought at Thebes and
Ilium, on each side
Mixed with auxiliar gods; and
what resounds
In fable of romance of Uther's
son
Begirt with British or Armoric
knights;
And all who since, baptised or
infidel,
Jousted in Asparamount or
Montalban
Damasco or Morocco or
Trebesson
Or whom Beserta sent from
Afric shore

When Charleman with all his
peerage fell

By Fontarabia."

ইহা বিশুদ্ধ পার্শ্বিত্য। অথচ এতগুলি উপমা, উপমান বর্নিতবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিল না। তাঁহার "as thick as leaves in Vallambrosa" উপমা প্রায় হাস্যকর। Vallambrosa কথাটি তিনি বিদ্যা খাটাইবার জন্য এবং একটি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। হোমার কিন্তু তাঁহার উপমাগুলি প্রকৃতি হইতে চয়ন করিয়াছেন। সেই জন্য সেগুলি সহজ, সরল, সুন্দর, বোধগম্য, এবং মহামূল্য। হোমার সৌন্দর্যের উপর সৌন্দর্য্য রাশীকৃত করিয়াছেন, আর মিল্টন শব্দ তাঁহার বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

তথাপি উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই দুই মহাকবি উপমা দিবার ভঙ্গী এক রকম। বাঙ্গালার মহাকবি মাইকেল তাঁহার উপমাপ্রয়োগে কতক ইহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার "যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ বিধিলে মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গজ্জি ভীমরবে ভূমিতলে পড়ে হরি—পড়িলা ভূপতি"—ইহারই দৃষ্টান্ত অনুকরণ।

মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার জগন্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সম্পূর্ণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি উপমায় অত পদস্থানপদস্থে যান না। তিনি শব্দ ইঙ্গিত করিয়া যান। তিনি হৃদয়মুদ বহির্বেন when we have shuffled off this mortal coil. মিল্টন এরূপ বলিতেন না। মিল্টন প্রথম কাসিয়া গলা শাণাইয়া লইতেন, তাহার পর যেন চারিদিকে একবার চাহিয়া লইতেন, তাহার পরে গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিতেন—

As when in Summer ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেক্সপীয়রের ভাষাই উপমার ভাষা। তাহাতে উপমান ও উপমেয় একসঙ্গে মিশিয়াছে—সে মিলন এত ঘনিষ্ঠ, এত গঢ় যে, তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব; এ প্রণালী সেক্সপীয়র যেখানে খুলিবেন, সেই-

খানে পাইবেন। "Wearing honesty" "smooth every passion" "bring oil to fire snow to their colder moods" "turn their halcyon beaks with every gale and vary of their masters" "Heavy headed revel" "toxed of their nations" "pith and marrow of our attribute" "fiery footed steeds" ইত্যাদি।

কদাচিৎ সেক্সপীয়র উপমান ও উপমেয়কে ঈষৎ পৃথক্ করেন। যথা—

"Such smiling rouges, as these, like rats the holy cords atwain" "come evil might thou sober suited matron, all in black" ইত্যাদি। সেক্সপীয়রের যতই হাত পাকিয়াছে, ততই তাঁহার উপমা ঘনীভূত হইয়াছে; এমন কি, একটি বাক্যে দুই বা ততোধিক উপমার চাপ দিয়াছেন, এই ধরুন যেমন—"To take arms against a sea of troubles." আপদের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের সহিত সৈন্যের বিপর্যয়ে অস্ত্রধারণ—এতখানি অর্থ এইটুকুর মধ্যে নিহিত আছে।

কালিদাস ও ভবভূতির ঠিক এরূপ প্রথা নহে বটে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি। পদ্ব্য-কথিত শ্লোকগুলি পুনরায় উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক শ্লোকগুলি ওজন করিয়া দেখিবেন। কালিদাসের "বিভ্রমলসৎপ্রোন্ডিম্ব-কান্তিদ্রবম্" ও ভবভূতির "অমৃত-বর্তিনয়নয়োঃ" "শৈলঘাতক্ষুভিতবড়বাবস্তু-হৃতভূক্" এই দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক আমার বক্তব্য বুঝিবেন।

এইরূপ মিশ্র উপমা ব্যবহার কবা প্রভূত ক্ষমতা ও গুণপনার পরিচায়ক। এই কবিদিগকে উপমা আর খুঁজিয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না, উপমা আপনি আসে। উপমা তাঁহাদের ভাষার, চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কবি যেন স্বয়ং উপমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এরূপ উপমা প্রয়োগ মহাকবির একটি লক্ষণ।

উপমা যতই সরল হইতে মিশ্রের দিকে ষাইতেছে, উপমার ভাষাও ততই মিশ্র ও গাঢ়

হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সমান উপমাকে গাঢ় করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

বস্তুতঃ উপমা দিবার প্রকৃষ্ট প্রথা উপমেয় ও উপমানের প্রত্যেক অঙ্গ মিলান নহে! প্রকৃষ্ট প্রথা, উপমানের ইঙ্গিত দিয়া চলিয়া যাওয়া। বাকি পাঠক কল্পনা করিয়া লউন। পাঠকের শিক্ষা ও কল্পনার উপর অনেক নিভর করিতে হয়। যাঁহাদের সেব্দপ শিক্ষা হয় নাই বা সেব্দপ কল্পনার শক্তি নাই, মহাকবির কাব্য তাঁহাদের জন্য নহে।

ছন্দোবন্ধে উভয় কবিই প্রায় সমতুল্য। সংস্কৃত নাটকে বরাবর একই ছন্দ ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন ভাবানুসারে বা কবির ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ হয়। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই তাঁহাদের নাটকে প্রায় সমস্ত প্রচলিত ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ছন্দগুলি প্রায়ই স্বর্ষত্র বর্ণিত বিষয়ের উপযোগী। বিষয় লঘু হইলে হরিণী, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দ এবং বিষয় গুরু হইলে মন্দাক্রান্তা, শান্দুলবিক্রীড়িত ইত্যাদি ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য ছন্দের মধ্যে, মনে হয় যে, কালিদাস আৰ্য্যা ছন্দ ও ভবভূতি অনুষ্টুপ্ ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ভবভূতি শান্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ কালিদাস অপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকে গুরু বিষয়ের সমাধিক অবতারণা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

মহাকাব্যে অতিমানসিক ব্যাপারের অবতারণা বহুদিন হইতে স্বর্ষদেশেই প্রচলিত আছে। মহাকাব্যে দেবদেবীগণ নিঃসঙ্কেচে মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন, মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের মতই হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন। খুব বড় বড় দেবতারা সাধারণতঃ ভক্তের মনুষ্যস্বয়ানা করিয়াই ক্ষান্ত। হোমারের ইলিয়ডে বর্ণিত যুদ্ধগুলি দেবদেবীর যুদ্ধ

বলিলেও অত্যাধিক হয় না। মাইকেল তাহার মেঘনাদবধে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

নাটকে গ্রীক নাটককারগণ ভৌতিক ব্যাপারের বড় বেশী আয়োজন করেন নাই। সেক্সপীয়র এরূপ ঘটনার অবতারণা কদাচিৎ করিয়াছেন। জার্মান ও ফরাসী নাটককারগণ এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ফাউস্ট প্রকৃতপক্ষে নাটক নহে, কাব্য। তবে ইব্‌সেন এ প্রথা বর্জন করিয়াছেন।

কিন্তু সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে এরূপ ব্যাপার যথেষ্ট আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দূর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রম, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অন্তর্ধান, দুষ্মন্তের ব্যোমপথে স্বর্গারোহণ ও মর্ত্যারোহণ ঐরূপ ব্যাপার।

উত্তররামচরিতে ভাগীরথী কর্তৃক পরিত্যক্তা সীতার ও লবকুশের উদ্ধার, ছায়ারূপিণী সীতার পঞ্চবটী-প্রবেশ, নদীম্বয় তমসা ও মুরলার কথোপকথন, ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি ঐরূপ ব্যাপার।

নাটক হিসাবে উত্তররামচরিতের নাটক সমালোচনা করিলে তাহা কোনরূপেই টিকে না—তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই অতিমানুষিক ব্যাপারগুলির প্রাচুর্য্য ভাবিয়া দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকে না, যে, ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটক হিসাবে লেখেন নাই, নাট্যকারে কাব্য হিসাবে লিখিয়াছেন। যদিও তিনি উত্তররামচরিতে সাত অঙ্ক রাখিয়া ইহাকে মহানাটক আখ্যা দিতে চাহেন এবং অলঙ্কারশাস্ত্র বাঁচাইবার জন্যই তিনি অন্তিমের রাম ও সীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত; তথাপি তিনি ইহা নিশ্চয়ই বুদ্ধিয়াছিলেন, যে, অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়াও ইহাকে তিনি নাটক করিয়া গাড়িতে পারেন নাই। তাই তিনি এই গ্রন্থে কল্পনার ‘রাশ’ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস নাটক হিসাবেই অভিজ্ঞানশকুন্তলের রচনা করিয়াছিলেন। তবে তিনি এত অধিক পরিমাণে অতিপ্রকৃত ব্যাপারের অবতারণা করিলেন কেন?—দেখা যাউক।

প্রথমত, দূর্ব্বাসার শাপ। আমি পূর্বেই

বলিয়াছি যে, এই শাপ মূল উপাখ্যানে নাই। কালিদাস দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছেন; নহিলে, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপত্নীত্যাগী সাধারণ লম্পট হইয়া দাঁড়ান; কিন্তু কালিদাসের এই কৌশলটি আমার বিবেচনায় সুন্দর হয় নাই।

প্রথমতঃ, অভিশাপে স্মৃতিভ্রম—অঘটনীয় ব্যাপার। যাহা অস্বাভাবিক, নাটকে তাহার স্থান নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এখনিকার মাপকাটী দিয়া পুরাতন সাহিত্যের পরিমাপ করা চলে না। যেমন সেক্সপীয়রের সময় ভূত ও প্রেতিনীর অস্তিত্বে জনসাধারণের আস্থা ছিল, তেমনই কালিদাসের সময়ে ঋষির অভিশাপের সফলতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। উক্ত কবিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে বসেন নাই; কি সত্য, কি অসত্য, ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসেন নাই।

ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ নাটক বা কাব্য লিখিতে বসেন না। প্রচলিত বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাহার উপর যদি স্বল্পং কবিরই সেইরূপ বিশ্বাস হয় (উচিত হউক ভ্রান্ত হউক) ত কথাই নাই। সমালোচক কবির ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার দোষ দিতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ সেই জন্য কবির নাটক বা কবিত্বের দোষ দিতে পারেন না। সমালোচক যদি নাটকীয় চরিত্রগত অসঙ্গতি কিংবা সৌন্দর্য্যের অভাব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার প্রতিকূল সমালোচনার মূল্য আছে, নহিলে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া কবি প্রচলিত বিশ্বাস কিংবা নিজের বিশ্বাস লইয়া যথেষ্টাচার করিতে পারেন না। তাহার মধ্যেই যদি অসঙ্গতি থাকে ত তাহা নাটকের দোষ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হ্যামলেটের প্রথমাঙ্কে হ্যামলেট তাহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছেন। সে মূর্ত্তি তাহার বন্ধু হোরেসিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিও দেখিতে পাইতেছেন। তখন বুদ্ধি, প্রেত নামক একটা ব্যাপার সকলেই দেখিতে পায়। তাহা শুদ্ধ দর্শকের কল্পনা নহে, তাহা একটা বাস্তব ব্যাপার। তাহার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। কিন্তু হ্যামলেট তাহার মাতার সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি দেখি-

তেছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা সেই প্রেতমূর্তি দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে কি সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে? ইহার ব্যাখ্যা কি এই যে, হ্যামলেট প্রথমবার যথার্থই ভূত দেখিতেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্ক হইয়া তাহা কল্পনা করিতেছেন? এরূপ ব্যাখ্যা ওকালতী, সমালোচকের সমালোচনা নহে। বরং হ্যামলেটের মাতার আলোকিত কক্ষে হ্যামলেটের এরূপ মানসিক দ্রাব্ধি অসঙ্গত, এবং অন্ধকার রাত্রিকালে নিষ্কর্জন প্রান্তরে হ্যামলেটের এরূপ দ্রাব্ধি সঙ্গত। হ্যামলেটের মাতার সহিত হ্যামলেটের কি এরূপ কথা হইয়াছিল, যাহার অব্যবহিত পরেই হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্তি কল্পনা করিতে বাসিলেন?

কিন্তু কালিদাসের কল্পিত এই দূর্ভাগ্যের শাপ এই ভৌতিক কৌশলের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ, দূর্ভাগ্য আসিয়া যে শকুন্তলার আতিথ্য ভিক্ষা করিলেন, তাহার কোনও কারণই নাটকে পাওয়া যায় না। কুত্রাপি উপাখ্যানের সহিত তাহার যোগ নাই। যদি আখ্যানবস্তুর কোনও অংশের সহিত সংস্রব রাখিয়া দূর্ভাগ্যের আগমন কল্পিত হইত, তাহা হইলে, নাটককারের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। দূর্ভাগ্যের আগমন উপাখ্যানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার; সেই জন্য ব্যাপারটি আখ্যানবস্তুর সহিত তেমন সঙ্গত হয় নাই।

সংসারে যে এরূপ ব্যাপার ঘটে না, তাহা নহে। বাহিরের সম্পূর্ণ ঘটনা আসিয়া মানব-জীবনের গতিরোধ করে কিংবা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরায়। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হয় বলিয়াই, উচ্চ কবির পক্ষে এরূপ কল্পনা শ্লাঘার কথা নহে। গলায় মাছের কাঁটা বাঁধাও লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের নাটকে এরূপ আকস্মিক ঘটনার স্থান নাই। নাটকীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু-সম্পাদন করিতে হইলে, আখ্যানবস্তুর সহিত পূর্বে হইতে সংস্রব রাখিয়া পূর্বেই কোনও ঘটনার পরিণতি-স্বরূপ তাহার মৃত্যু-সম্পাদন করিতে পারিলে কবির গুণপনা প্রকাশ পায়।

তাহার উপর শকুন্তলার মানসিক অবস্থা যদি দূর্ভাগ্য জানিতেন, তাহা হইলে শকুন্তলাকে অভিশাপ না দিয়া বরং আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাওয়াই দূর্ভাগ্যের কর্তব্য ছিল। শকুন্তলা পতিধ্যানমগ্না। পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান; পতি সর্বস্ব, ইহাই কি আদর্শ সতীর লক্ষণ নয়? যাহা সতীধর্ম, তাহার পালনের জন্য এই অভিশাপ! এ কথা দূর্ভাগ্য যে একেবারে জানিতেন না, তাহা নহে। তিনি অভিশাপ দিতেছেন, “যাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া তুই আমার অবমাননা করিলি, সে তোকে ভুলিয়া যাইবে।” অতএব শকুন্তলা কোনও মানুষের ধ্যান করিতেছিলেন, ইহা দূর্ভাগ্য জানিতেন। আর সে মানুষ যে শকুন্তলার অতি প্রিয়জন, তাহাও দূর্ভাগ্য জানিতেন, নহিলে “সে তোকে ভুলিয়া যাইবে”, ইহা শাস্তিস্বরূপ কথিত হইত না। তবে যুবতী যে কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে, ইহা দূর্ভাগ্য জানিতেন। তিনি যদি এতদূরই জানিলেন, তবে শূন্য দৃষ্টি-শকুন্তলার বিবাহবস্ত্রান্তই তিনি জানিতে পারেন নাই এরূপ সিদ্ধান্ত একটু কেমন কেমন বোধ হয়। পত্নী পতির ধ্যান করিতেছে, ইহাতে পত্নীর অপরাধ কি? এ উচিত কার্য। এ ত ধর্ম ইহার পুরস্কার কি অভিশাপ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দূর্ভাগ্য কিরূপে জানিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন? যুবতী তাপসীর কি আর কোনও চিন্তা নাই যাহাতে সে তন্ময়ী হইয়া যাইতে পারে? মানিয়া লইলাম, দূর্ভাগ্য তপোবলে অন্যের মনের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু অভিশাপ দিলেন কি দোষে?

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা একটি প্রবৃত্তির অধীন হইয়া আতিথ্যধর্ম অবহেলা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দূর্ভাগ্য তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত কথা নহে। শকুন্তলা আতিথ্য-ধর্ম অবহেলা করেন নাই। অবহেলা হইত বটে, যদি দূর্ভাগ্যের উপস্থিতি জানিয়াও শকুন্তলা অতিথিকে ফিরাইতেন। কিন্তু শকুন্তলার তখন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়।

তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় নির্দ্রিত; এক কঠোর মধুর স্বপ্নাবেশে অভিভূত। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে, স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এত বেশী অনুরাগ উচিত নহে, যাহাতে সে এক দৃশ্যের জন্যও তন্ময়ী হইয়া যায়? অথচ প্রয়োজন হইলে, এই সমালোচকেরাই বলিয়া থাকেন যে, 'সতীর একমাত্র ধর্ম পতি।'

শকুন্তলা কিছুর অষ্টপ্রহরই দৃশ্যমন্তের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন না। তিনি খাইতেছেন, গল্প করিতেছেন, উঠিতেছেন, বসিতেছেন। হয় ত এক দিন স্তম্ভ প্রভাতে নিজ্জনে শান্ত তপোবনে কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া শূন্য-প্রেক্ষণে দূরে চাহিয়া নবোঢ়া বিরহিণী শকুন্তলা স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুতে জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকের যেমন জ্বরের বিকার হয়, এ সেইরূপ একটা মানসিক বিকার। নবোঢ়া প্রথম বিরহিণীর এইরূপ হইয়াই থাকে। ইহা পাপ নহে। ইহা নিদারুণ অভিশাপের যোগ্য নহে। এ সময়ে তিনি অসীম অনুকম্পার পাত্রী, ক্রোধের পাত্রী নহেন। তাহার উপর শকুন্তলাই না হয় আতিথ্য-ধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়াছেন, দৃশ্যমন্ত দেখান নাই; কিন্তু এই অভিশাপ হেতু শকুন্তলাই কণ্ট পান নাই; দৃশ্যমন্তও পরিশেষে কণ্ট পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, শকুন্তলার শাপাবসানে অভিশাপ দৃশ্যমন্তকে আশ্রয় করিল। দৃশ্যমন্তের দোষ কি?

অপর এক কবি-সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, এইরূপ কামজর্নিত গুপ্ত বিবাহকে দূর্ভাসা অভিশপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহার কবিকল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোন নিদর্শন নাই।

দূর্ভাসার অভিশাপ পড়িলে, সন্দেহ থাকে না যে, শকুন্তলা পাপ-কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিশাপ দেন নাই। দূর্ভাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাহাকে—দূর্ভাসা সম মনিকেকে—অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দূর্ভাসার ক্রোধ, পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের জাঙ্নার জন্য ক্রোধ। ইহাই এই অভিশাপের সহজ সরল অর্থ। অন্য অর্থ কণ্টকল্পনা।

আমার বিবেচনায় কালিদাস কেবল দৃশ্যমন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দৃশ্যমন্তকে কতক বাঁচাইয়াছেন বটে, কিন্তু দূর্ভাসাকে হত্যা করিয়াছেন। দূর্ভাসা যতই ক্রুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি ঋষি ত বটে। অর্জুনের প্রতি প্রত্যাখ্যাতা উর্ধ্বশীর অভিশাপ, পতিপ্রাণা শকুন্তলার প্রতি দূর্ভাসার এই অভিশাপের অপেক্ষা অধিক হয় বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাস দূর্ভাসাকে হত্যা করুন, তাহাতে তত যায় আসে না। কিন্তু তাহার এই অভিশাপ-সৃষ্টি অত্যন্ত অনিপুণ হইয়াছে। যেন, এ সময়ে সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, উচিত হউক, অনূচিত হউক, একটা ঋষির শাপ চাই; এইরূপ পাঠকের মনে স্বতঃই উদ্ভিত হয়।

তাহার পরে শকুন্তলার সখীর অনুরোধে এই অভিশাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন—'অভিজ্ঞান দেখাইলে স্মৃতিভ্রম ঘূচবে।' ইহা ছেলে মানুষীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পরবর্তী ঘটনাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই এবং অন্তিমে দৃশ্যমন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন ঘটাইবার জন্যই যেন ইহা কল্পিত হইয়াছে। নহিলে কোথাও কিছুর নাই, অভিজ্ঞানের কথা আসে কোথা হইতে? মিলনের অন্য উপায় ছিল। যেন দূর্ভাসা জানিয়াছেন যে, দৃশ্যমন্ত শকুন্তলাকে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা প্রথমে শকুন্তলা দেখাইতে পারিবেন না (কারণ, দেখাইতে পারিলে ত তৎক্ষণাৎ শাপাবসান ও নাটকের শেষ হইয়া গেল); এবং পরে তাহা দেখাইবেন—নহিলে মিলন হয় না এবং মিলন না হইলে অলঙ্কারশাস্ত্র সঙ্গত নাটক হয় না। যেন দূর্ভাসাই নাটকখানির রচনা করিতেছেন এবং নাটকখানিকে বাঁচাইবার জন্য পথ রাখিয়া যাইতেছেন।

তাহার পরে স্নানকালে অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, তাহা রোহিত মৎস্যের উদরস্থ হওয়া এবং ঠিক সেই মৎস্য ধীর কর্তৃক ধৃত হওয়া—এ সমস্ত ব্যাপার তৃতীয় শ্রেণীর নাটককারের উপযুক্ত কৌশল

বলিয়া বোধ হয়। সমস্তই যেন আরব্য উপন্যাস, নাটকের মজ্জাগত অংশ নহে।

পরিশেষে, দৃশ্যমন্তের দৈত্য-বিনাশার্থ স্বর্গে গমন এবং ইন্দ্র কর্তৃক সেই দৈত্যের পরাজিত না হইবার কথিত কারণও পূর্ষ্ববৎ বাহিরের ব্যাপার। কোনটিই নাটকের মূল আখ্যানের অংশ নহে, বা পরিণতির ফল নহে। এরূপ কৌশল নাটককার নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আনিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

বস্তুতঃ, অভিজ্ঞানশকুন্তলার যতখানি আখ্যানবস্তু কালিদাসের কল্পিত, তাহাতে আখ্যানবস্তু-গঠনে তাহার অক্ষমতাই প্রকাশ পায় বলিয়াই আমার বোধ হয়। ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যান আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক। কুত্রাপি কষ্টকল্পনা নাই, তাহার সমস্তই একটা প্রাকৃতিক জীবন—উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতি। একমাত্র দৈববাণী ভিন্ন অবান্তর আখ্যানের বহির্ভূত, আকস্মিক কোনও ব্যাপারের উল্লেখ-মাত্র নাই।

ভবভূতি নাটককার নহেন। তিনি আখ্যান-বস্তু-গঠনে নৈপুণ্য দাবী করেন না। বস্তুতঃ তাহার উত্তররামচরিতে আখ্যান-বস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে। তাহার নাটক, বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্য তিনি সে দিকে হাইল ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবাধ গতি দিয়াছেন।

ঘটনা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, সম্ভব কি অসম্ভব, তাহার তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। “নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ” এই সাহিত্যিক সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তিনি যথেষ্টাচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি এক রকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিনি নাটককার নহেন, তিনি শুধু কবি।

সীতা নির্বাসিতা হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। গঙ্গাদেবী স্নেহে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাহার পবিত্র বারি দ্বারা সীতার দঃখ ধৌত করিয়া (তাঁহাব মাত্ৰালয়ে) রাখিয়া আসিলেন। পতি-পরিত্যক্তা নরীর স্থান মাতৃ-অঙ্কে ভিন্ন আর কোথায়? পরিত্যক্তা দময়ন্তী এইরূপে তাহার পিতার গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবজাত-যমজ শিশুকে গঙ্গাদেবী বিদ্যাশিক্ষার্থ

বাল্মীকির করে সমর্পণ করিলেন। সেই কোমল-হৃদয় মহর্ষি ভিন্ন আর কে সেই যুগ্ম শিশুকে সমাধিক যত্নে, স্নেহে লালন-পালন করিতে পারিত?

কবির এরূপ অতিমানুষিক কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ছিল, জানি না। আমার বোধ হয়, বাল্মীকি-বর্ণিত সীতা-নির্বাসন সমাধিক মনোহর ও প্রাণস্পর্শী। ভবভূতির সৃষ্ট সীতার এই পাতাল-প্রবেশ-কল্পনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই। ইহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে জ্যোতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার স্বর্গে উন্নয়নের অর্থ অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়।

শম্বুকের ব্যাপারটির একমাত্র উদ্দেশ্য—রামকে পুনরায় জনস্থানে লইয়া আসা, যাহাতে রাম সীতার বিরহ সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় মিছামিছ বেচারীকে হত করিবার প্রয়োজন কি? রাম যেরূপে অহল্যার শাপাবসান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত্ৰুর্দমন শম্বুকের শাপাবসান করিলেন। এ ব্যাপারে সহৃদয়তা আছে, কিন্তু কবিত্বের বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

তমসা ও মুরলা নদীস্বয়ংকে মানবী-মূর্তি দানে কবিত্ব আছে। যে কবি, তাহার কাছে সমস্ত প্রকৃতি সজীব। গিরি, নদী, বন, প্রান্তর, সকলেই অনুভব করে, সকলেরই একটা ভাষা আছে। কবি সেই ভাষা বুদ্ধিতে পারেন। নদীর কুলস্বরে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে একটা ভাষা আছে, এ কথা যে অকবি, তাহারও মনে আসে, কবির ত কথাই নাই। ভবভূতি মহাকবি, তাহার এই মহাকাব্যে এইরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও অতি সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু সর্ষাপেক্ষা সুন্দর কল্পনা ‘ছায়া-সীতা’। এরূপ মধুর রূপক কল্পনা আমি কোনও কাব্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কল্পনা করণ, কি চিত্র! রাম পুনরায় সেই পঞ্চবটী বনে আসিয়াছেন—যেখানে তিনি প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয় সম্ভোগ করিয়া-ছিলেন। তিনি সেই বনপথ, সেই শিলাতল, সেই কুঞ্জবন, সেই গোদাবরী দেখিতেছেন। বনপথ হরিত তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; শিলাতল বেতসীলতায় অশ্বেক ঢাকিয়া গিয়াছে; কুঞ্জবন আরও গাঢ় হইয়াছে।

গোদাবরী সরিয়া গিয়াছে। তাঁহারই পালিত করিকরভকটি মানুষ হইয়া, সেই নিষ্কর্জন বনে বিচরণ করিতেছে; সেই পালিত ময়ূর-শাবকটি বড় হইয়াছে—যাহাকে সীতা নাচাইতেন। সেই সবই আছে; কেবল সীতা নাই। কিন্তু সীতার ছায়া আছে; সীতার স্মৃতি আছে;—তাঁহাকে রাম ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পারিতেছেন না; তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে; সীতার কণ্ঠস্বর, স্পর্শ অনুভব করিতে না করিতে হারাইয়া যাইতেছে। এ স্বপ্ন, এ মৃগতৃষ্ণিকা, এ অসহ্য যন্ত্রণা, এ মম্মন্তুদ বিরহব্যথা জগতে আর কোনও কবি কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। নাটক হিসাবে এরূপ কল্পনার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন থাকিতে পারে। হইতে পারে, রাম যে সীতার প্রতি এখনও পূর্বেই অনুরক্ত, তিনি যে সীতার বিরহে কাতর, এ কথা সীতাকে জানাইবার প্রয়োজন ছিল। জানিলে, সীতা সে নিদারুণ বিরহে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিংবা শেষ অঙ্কে বিনা বিলাপে ও বিনা আপত্তিতে নীরবে মিলন সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, দৃশ্যমন্তের বিলাপও এইরূপে মিশ্রকেশীর প্রমুখাৎ শকুন্তলাকে শোনান হইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়ে রামই দোষী; সীতা নিরপরাধা; রাম সীতাকে কাঁদাইয়াছিলেন। এখন সীতার পালা। এখন রাম কাঁদিবেন, আর বিনিময়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিবেন, সেই জ্বালার উপর অমৃত সেচন করিবেন। রাম সীতার অনুরক্ত হইলেও, এখনও তাঁহার কাছে সীতার অপেক্ষা যশই প্রিয়।

এখনও রাম সীতাকে পাইবার উপযুক্ত হন নাই। তন্ময় হইয়া স্বর্ষ্ব তুচ্ছ করিয়া তিনি সীতাকে এখনও ভাবিতে শিখেন নাই। সেই জন্য তিনি সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু সীতা সেইরূপ রামময়জীবিতা, সেই জন্য সীতা রামকে দেখিতে পাইতেছেন।

কোনও প্রবীণ বিজ্ঞ সমালোচক এই ছায়াসীতা বিষ্কম্ভকের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সীতা সত্যই

পঞ্চবটী বনে আসেন নাই। সীতার সে স্থানে উপস্থিতি রামের কল্পনামাত্র। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে।

প্রথমতঃ, মূলের সহিত এ ধারণা সংগত হয় না। সীতামূর্ত্তি রামের দ্রান্তিমাত্র হইলে, রামের আসিবার পূর্বে সীতা পঞ্চবটী বনে আসিয়া পহুঁছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সীতা যদি রামের কল্পনামাত্র হইতেন, তাহা হইলে, সীতা বরং রামেরই নয়নগোচর হইতেন। অপরের অগোচর থাকিতেন। কিন্তু ভবভূতি কল্পনা করিয়াছেন যে, সীতাকে কেবল তমসা দেখিতে পাইতেছেন, রাম দেখিতে পাইতেছেন না। কল্পনা যাহার, সেই ত প্রত্যক্ষবৎ দেখে। আর ছায়াসীতা যে রামের কল্পনামাত্র নহে, তাহা সীতার উক্তিগূঢ় দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। রাম ‘সহধর্ম্মিণী’ লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শূন্যিয়া সীতা সোৎকম্প হইতেছেন—ইহা কি রামের কল্পনা? লবকুশ পুত্রস্বয় সম্বন্ধে সীতার আক্ষেপ ত রামের কল্পনা হইতেই পারে না। কারণ, রাম তখনও পুত্রস্বয়ের সন্তুষ্টি ও অবগত ছিলেন না। তাহার পরে সীতা যে ভাবে রামকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন এবং পরিশেষে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও রামের কল্পনা হইতে পারে না।

ছায়াসীতা রামের কল্পনা হইলে, ঐ বিষ্কম্ভকটির অর্ধেক সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়। সীতার উদ্বেগ, সীতার আনন্দ, সীতার বিভ্রম, সীতার পতিপ্রাণতা, সীতার আত্মবলিদান—যাহা এই বিষ্কম্ভকে আছে, তাহা শূন্য রামের কল্পনা বলিলে সীতাকে দস্তুরমত হত্যা করা হয়। আমার মনে হয় যে, ভবভূতি কবি হিঁসাবে কাঙ্ক্ষনিক সীতার কল্পনা করিয়াছিলেন; পরে সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিতে গিয়া, বিষয়টি সাজাইতে গিয়া, সত্য সীতাকে সেখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। এই বাস্তব ও অবাস্তব মিলিয়া যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

কালিদাসের সময়ের আচার-ব্যবহার—ভবভূতির সময়ের আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ

দেখি। প্রথমতঃ, ভবভূতির সময়ে বর্ণভেদের কঠোরতা কমিয়া আসিয়াছিল। দৃশ্যমন্ত তাপস-তাপসীদিগকে যেরূপ ভয় করিতেন, তাহাতে সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব অত্যধিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। দৃশ্যমন্ত স্বীকার করিতেছেন,—

“যদুক্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি
তন্ধনম্।

তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয়াং দদাত্যারণ্যকো হি
নঃ ॥”

[ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল, কিন্তু অরণ্যবাসী তাপস-গণ যে ধন দেন, তাহা অক্ষয়।]

ঋষিকুমারদ্বয় যখন রাজাকে ঋষিদিগের অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“কিমাঞ্জাপয়ন্তি—”

শকুন্তলার প্রতি যখন দৃশ্যমন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন দৃশ্যমন্ত “তপসো বীর্যম্” মনে করিয়া চিন্তাকুল; রাজসভায় রাজা গৌতমী ও শাণ্ডিল্যের তীর ভৎসনা যেরূপ ঘাড় পাতিয়া লইতেছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয় যে, দৃশ্যমন্ত তাহাদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন।

উত্তরচরিতে ব্রাহ্মণ-চরিত্র নাই বলিলেই হয়। যাহার আছেন, (বাল্মীকি ইত্যাদি) তাহারা সকলেই নিরীহ। ভবভূতির রাম অষ্টাবক্র মূর্খের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—যেরূপ বন্ধু বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকে। অষ্টাবক্র প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “স্বস্তি রাম।” রাম উত্তর দিলেন, “অভিবাদয়ে ইত আস্যতাম্।” সীতা বলিলেন—“নমস্তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আৰ্য্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ।”—অতি সাধারণ শীলতা। অষ্টাবক্র সর্বিনয়ে বলিলেন,—

“দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠস্থামাহ—
বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসুত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।
তেষাং বধুস্বমসি নন্দিনী পার্থিবানাং
যেষাং গৃহেষু সবিতা চ গুরুবর্ষণ ॥
তৎ কিমন্যাশাস্মাহে কেবলং বীরপ্রসবা
ভূয়াঃ।”

[দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ তোমাকে

বলিয়াছেন যে—ভগবতী ধরিত্রী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন, প্রজাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা এবং যে বংশের গুরুদেব স্বয়ং সবিতৃদেব ও আমি, তুমি নন্দিনী! সেই রাজবংশের বধু। অতএব আর অধিক কি আশীর্বাদ করিব? তুমি বীর-প্রসবিনী হও।]

রাম সর্বিনয়ে উত্তর করিলেন—

“লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনু-
বর্ততে।
ঋষীগাং পুনরাদ্যানাং বাচথোহনু-
ধাবতি ॥”

[লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থের অনুসারী হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থ আদি ঋষিগণের বাক্যের অনুগামী হয়।]

তাহার পরে উভয় পক্ষই অতি সাধারণ-ভাবে বন্ধুভাবে কথাবার্তা কহিতেছেন। কোনও ব্রহ্মভাব নাই। কোনও “যে আঞ্জার” ভাব নাই। একটা সৌম্য সর্বিনয় সসম্মান ভদ্রব্যবহার মাত্র।

ভবভূতির সময়ে, মনে হয়, নারীর সম্মান কালিদাসের সময় অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নারী ভোগ্যা। উত্তররামচরিতের নারী পূজ্যা। নারীজাতির এই বিভিন্ন পদবী আমরা নাটকদ্বয়ে পদে পদে দেখি। কেহ বলিতে পারেন যে, আচার-ব্যবহারের বৈষম্য। যাহা উপরে কথিত হইল, তাহা সাময়িক আচারের পার্থক্য না হইয়া, কবিদ্বয়ের রুচির পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, কবি যত বড়ই হউন, তিনি সময়ের বহু উদ্বেগ উঠিতে পারেন না। কবির রচনায় সাময়িক আচার-ব্যবহারের কিছু না কিছু নিদর্শন থাকিবেই এবং এই দুই নাটকে তাহা প্রচুর-পরিমাণে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্ত

আমি পূর্বেবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটকের তুলনার সমালোচনা করিয়াছি। আমার শিক্ষা,

বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষ-গুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। আধ্যাত্মিক অর্থ, যে কোনও গ্রন্থ হইতে কোনও না কোনরূপে বাহির করা যায়ই। এই নাটক-দ্বয়েরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দৃশ্যমন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এ নাটকে দেখান হইয়াছে, প্রেম কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠাব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন। কিসের কি ব্যাখ্যা না হইতে পারে? যখন রামায়ণকে কোনও বিদেশী বৈজ্ঞানিক সমালোচক সূর্যের গতির বর্ণনামাত্র বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এরূপ কষ্ট-কল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যাই বিবেচনা করি না।

আমি উভয় নাটকের দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা পাঠকশ্রেণীবিশেষের প্রীতি-প্রদ হইবে না। হইতে পারে, যেখানে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, সেই স্থানে আমি সম্যক্ বুদ্ধিতে পারি নাই। কিন্তু যদি আমার উক্তি অমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার ভ্রম, ধৃষ্টতা নহে।

আমার ধারণা এই যে, যে সমালোচনা বিষয়কে ভয় করিয়া অগ্রসর হয়, নামে মোহিত হইয়া মনস্থ করিয়া বসে যে, শূন্য প্রশংসাবাদ করিব এবং যেখানে রচনা অর্থ-শূন্য মনে হয়, সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে বসিব, তাহা সমালোচনা নহে, তাহা স্তুতিবাদ। মহাকাবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন অবশ্য ধৃষ্টতা। কিন্তু নিজের যুক্তিকে ও বিবেচনাশক্তিকে সমালোচ্য গ্রন্থের দাস্যে নিয়োগ বিবেকের ব্যভিচার।

এই উভয় নাটকে দোষ আছে বলিয়া, তাহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেক্সপীয়রের

একখানিও নিম্নোক্ত নাটক নাই। মানুষের রচনা দোষ-বিবর্জিত হইবার কথা নহে। কিন্তু যে কাব্য বা নাটকে গুণের ভাগ অধিক, দুই একটি দোষ থাকিলেও তাহার উৎকর্ষের হানি হয় না।

“একো হি দোষো গুণসম্মিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেপিবাস্কঃ!”

কালিদাসের বিশ্বজনীন প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, যে নাটক তিনি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বে লিখিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন ও নতুন অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইয়া, আচার, নীতি ও ধারণার পরিবর্তন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে, পর্ব্বতের মত অটলভাবে, এই দীর্ঘকাল ‘মাথা উঁচু’ করিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে। এ রচনা উষার উদয়ের মত তখনও যেমন সুন্দর, এখনও তেমনিই সুন্দর। ভবভূতির এই মহারচনার মাহাত্ম্যও কালের অগ্রগতির সহিত বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, এই দুই নাটকের তুলনা ঠিক সম্ভবে না। কারণ, একখানি নাটক; আর একখানি কাব্য। নাটক হিসাবে উত্তররামচরিত সম্ভবতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের পদরেণুর সমতুল্য নহে। তবে কাব্য হিসাবে উত্তররামচরিতের আসন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বহু উর্ধ্ব। ধারণার মহিমায়, প্রেমের পবিত্রতায়, ভাবের তরঙ্গ-ক্রীড়ায়, ভাষার গাম্ভীর্যে, হৃদয়ের মাহাত্ম্যে উত্তররামচরিত শ্রেষ্ঠ। আবার ঘটনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার কোমলত্বে, মানব চরিত্রের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষার সারল্যে ও লালিত্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই নাটক প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গী। অভিজ্ঞানশকুন্তল শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না। উত্তররামচরিত নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। একটি উদ্যানের গোলাপ, আর একটি বনমালতী। একটি ব্যঙ্গন, অপরটি হবিষ্যাস। একটি বসন্ত, অপরটি বর্ষা। একটি নৃত্য, অপরটি অশ্রু। একটি উপভোগ, অপরটি পূজা।

মালতীমাধবের ভূমিকায় মহাকাবি ভবভূতি যে গর্ষ করিয়াছিলেন, উত্তররামচরিতে তাহা সার্থক হইয়াছে—

“যে নাম কেঁচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেহস্মিত মম কোহপি সমানধর্মণা
কালো হয়ং নিরবধির্বিপদলা চ পৃথ্বী॥”

[যে কেহ আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা কোথাও বিদ্যমান আছেন; কারণ, কালের অবধি নাই এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণ।]

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়া মহাকাবি গেটে যে উল্লাসোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক।
“Wouldst thou see spring’s blossoms and the fruits of its decline
Wouldst thou see by what the souls enraptured feasted fed
Wouldst thou have this earth and heaven in one sole name combine

I name thee Oh Sakuntala! and all at once is said.”

আমাদের জন্ম সার্থক যে, যে দেশে কালিদাস ও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে আমাদের জন্ম। যে ভাষায় এই দুই মহারচনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভাষা। বহু শতাব্দী পূর্বে কবিদ্বয় যে নারীচরিত্রের বর্ণনা বা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা, সেই সীতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপণী হইয়া, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া, আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা বুঝি, আমরা জানি, আমরা অনুভব করি, এ চরিত্রদ্বয় জগতে শুদ্ধ আমাদেরই সম্পত্তি, আর কাহারও নয়। একসঙ্গে এত ব্রীড়ানম্বা, এত সুন্দরী, এত পবিত্রা, এত মৃগ্ধা, এত কোমলহৃদয়া, এত অভিমানিনী, এত নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা, এত সর্হিষু—এ রমণীদ্বয় আমাদেরই, আর কাহারও নয়।
ধন্য কালিদাস! ধন্য ভবভূতি!

সমাপ্ত

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী

বাংমী ও সংবাদপত্র*

মহাশয়, এখন একদল লোক হইয়াছেন, যাঁহারা দেশীয় বক্তা ও লেখকদিগের প্রতি গালিবর্ষণ ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের এ প্রকৃতি সর্বতোভাবে দমনীয়। আমাদের আধুনিক সংবাদপত্র “বঙ্গবাসী” এ প্রকৃতির পরিপোষক। কিছুদিন গত হইল বঙ্গবাসীতে “কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। আরও কয়েকবার ঐরূপ অর্থশূন্য প্রবন্ধ বঙ্গবাসীকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। ইহাদের মতে সুরেন্দ্র ও কেশব, “আর্য্যগাথা” ও “ভারত সঙ্গীত” ভারতের ভাবী মঙ্গলের বাধা। যেন বর্ক ও ডিমস্থিনিস্ মহাপাতকী; মুর ও ভল্টেয়ার নরকেরও অযোগ্য পাপী। এই সকল কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ যদি বাঙালীকে শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলি যে, এরূপ শিক্ষা বঙ্গ হইতে শতযোজন দূরে পলায়ন করুক, অজ্ঞানের গাঢ়তম অন্ধকারকে সাদরে আলিঙ্গন করুক।

দেশে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা স্বদেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্য করিতেছেন। এই অপরাধে বঙ্গবাসী ও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি তাঁহাদিগের বিরোধী। এই অপরাধে তিনি তাঁহাদিগের উপর, বোধ হয়, উচ্চ নিঃস্বার্থ ক্রোধে বা গরীয়সী দেশ-হিতৈষিতার চালিত হইয়া, জ্বলিত হৃদয়ে তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী বাঙালীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, এই সম্প্রদায়ের লোক অতি ভয়ানক, দেশের কণ্টক, শান্তির হস্তারক। তিনি আজ নূতন শিক্ষা দিতেছেন যে, শূন্য বক্তৃতায় কার্য্য হইবে না, বাক্যে কার্য্য হইবে না। তবে বোধ হয়, সংবাদপত্রে অর্থশূন্য কুয়ুদ্বিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলে হইবে। কারণ ইহা ব্যতীত আমরা বঙ্গবাসীর অন্য কোন স্বদেশ-হিতৈষিতার নিদর্শন পাই নাই।

* আমরা এই পত্রখানির উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু লেখকের মতামত ও কলঙ্কিতের জন্য আমরা দায়ী নহি।

সঃ [“আর্য্যদর্শন”]

বঙ্গবাসীর সম্প্রদায়ের লোকেরা বক্তৃতার উপর বড় বিতৃষ্ণ। যেন বক্তৃতা শূন্য অনাবশ্যক নহে, নিতান্ত অনর্থকারক; কেবল অনর্স্বরা ভূমি নহে, উহা কণ্টকময় অরণ্য। ইহারা কি জ্ঞাত নহেন যে বক্তৃতায় জগতে কত মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে? বক্তৃতায় ও লেখায় ইটালী জাগিয়াছিল; বক্তৃতায় উইলবার্ফোর্স্ (Wilberforce) দাসজাতির উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন; বক্তৃতায় মিরাবো (Mirabeau) উন্মত্ত ফ্রান্সকে দমিয়া রাখিয়াছিলেন ও বাঁচিলে হয়ত ফ্রান্সের সে প্রজ্জ্বলিত সকল দাবানলস্বরূপ ললার্টালপি খণ্ডন করিতে পারিতেন; বক্তৃতায় ঈশা ঈশ্বরের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলদায়ী। যথার্থই দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত একটী জীবন শত বক্তৃতা অপেক্ষা ফলপ্রদ। অবশ্য, নিজে উপদেশ দিয়া নিজে পালন না করিলে উপদেশ অধিক ফলদায়ী হয় না। অবশ্য, শূন্য বক্তৃতায় সন্তুষ্ট নহি, কার্য্য চাই। কিন্তু সর্বদেশে সর্বসময়ে অগ্রে বাক্য, পরে কার্য্য হইয়া আসিয়াছে। আরবীয় মহম্মদ একবারেই জগতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একা তরবারি ধরেন নাই। ফ্রান্স বিনা বক্তৃতায় ও লেখায় জাগে নাই। অগ্রে হৃদয়োন্মাদী বাক্য, পরে জীবন্ত বিশ্বাস, পরে জ্বলন্ত অনুরাগ, পরিশেষে বিশ্ববিপ্লবী কার্য্য; ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম, ইহাই মনুষ্য-জীবনের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল। কার্য্যের সময় আসিয়াছে কি না ঘটনা বিচার করিবে। ভারতে কি বক্তৃতার আবশ্যিকতা নাই? যে সকল উন্নত ভাবে পূর্ণ হইয়া ইউরোপ এত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে কি সে সকল মহৎ ভাব জনসাধারণ বৃদ্ধিয়াছে? বোধ হয় কিছুই বৃদ্ধি নাই। যে সকল অনর্দষ্টানে সমগ্র জাতির চেম্টা ও যত্ন আবশ্যিক, সে সকল অনর্দষ্টান একাকী হইতে পারে না বলিয়া, তাহা অবলম্বিত হইতেছে না। দেখুন না কেন আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বিধবা বিবাহ” বিষয়ক সদনর্দষ্টান

কেন বিফল হইল? সমাজ-সংস্কার কি স্বদেশের অপরাপর হিতানুষ্ঠানে জাতীয় অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার পূর্বে জাতীয় সংস্কার ও বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজন। মন ফিরিলে হৃদয় ফিরিবে, হৃদয় ফিরিলে হস্ত কার্য করিতে উদ্যত হইবে। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের জাতি সাধারণের কি মন ফিরিয়াছে? জিজ্ঞাসা করি, এই জাতি সাধারণের মন ফিরাইবার জন্যে কি অগ্রে বক্তৃতা, শিক্ষা এবং উপদেশের প্রয়োজন নাই? অনেক বাক্যব্যয় না করিলে কি সহজে শিক্ষা লাভ হয়!

যাহা হউক কার্য না পাইলেও যাহারা শুদ্ধ বক্তৃতা করে, দেশকে শিক্ষা দেয়, তাহাদিগের গানি গাইব; স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিব, ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে শত হস্ত দূরে রাখুন।

বাম্পী বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন বলিয়া স্পষ্টতঃ বঙ্গবাসীর লেখকদের দারুণ আক্ৰোশ। অবশ্য সাধারণের শিক্ষা আবশ্যিক, দেশীয় ভাষায় বক্তৃতাও প্রয়োজনীয়। আমরা ভরসা করি যে দেশীয় ভাষার বক্তৃতাও আছেন, যাহারা সাধারণকে শিক্ষা দেন। কিন্তু ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা তিন কারণে আবশ্যিকীয়। প্রথমতঃ নিশ্চয়ই বঙ্গের ভাবী আশা অনেক পরিমাণে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ তাহারাই অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্রমে শিক্ষিত করিবে। প্রথমে তাহাদিগের শিক্ষা বস্তুতঃ সাধারণের শিক্ষা। তাহারা ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতার অধিক আকৃষ্ট হন। বৃটেনের পূর্বে ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিজেত-ভাষা-প্রিয়তা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজি ব্যতীত কোন ভাষা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। সমগ্র ভারতকে কোন কথা বুঝাইবার একমাত্র সহজ উপায় ইংরাজি ভাষা। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক বক্তৃতা ইংরাজের বিশেষ পাঠ্য। কারণ তাহাদিগের হইতে অনেক উপকারের প্রত্যাশা। আজ বাঙ্গালী বা ভারতবাসী যে বলপূর্বক স্বত্ব ইংরাজদিগের হস্ত হইতে লইবে, সে দিন আসে নাই। সে দিন আসে নাই যে, ভারতবাসী আইরিশদিগের ন্যায় সদর্পে বলিবে “ইংরাজ-গণ! তোমরা জেতা, আমরা বিজিত সত্য;

কিন্তু তাই বলিয়া স্বত্বচ্যুত করিও না; আমাদের স্বত্ব আছে, তোমাদের বাধ্যতা আছে। অন্যায় করিলে ফলভোগ করিবে।” বাঙ্গালী যাহা চায়, ইংরাজদিগের হৃদয়নিহিত মহৎ প্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার জন্যই ইংরাজী বক্তৃতার আবশ্যিকতা। লেখক যখন লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় দেশহিতৈষিতা-প্রবর্তনায় এত উষ্ণ হইয়াছিলেন, ভাবের স্রোত এতই লেখনী হইতে বহিয়াছিল যে, এ সকল ভাবিবার সময় পান নাই। অথবা ভাবিয়াছিলেন ভাষার অপূর্ষ ছটায় ভাবের বিচিত্র মধুরিমার নূতন প্রবর্তিত নীতির নবীনতায় ও উজ্জ্বলতায় পাঠক এ সকল ভুলিয়া যাইবে।

লেখক বলিতে চান যে, বাম্পীদিগের স্বার্থত্যাগ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি, লেখকের নিজের কোন স্বার্থত্যাগ আছে কিনা? ভাই, আগে আপনি কার্যকর অগ্রসর হও, তৎপরে অপরের আলস্য জন্য গালি দিতে অধিকারী হইতে পারিবে। বাম্বকর-ন্যস্ত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লেখনী চালান ব্যতীত তিনি নিজে কোন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি? দুর্ধ্বফেনধবল নবনীতকোমল শয্যায় শুইয়া চিন্তা ভিন্ন নিজে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনা?

“Let us be serious should
such trials come,
Are they themselves
prepared for martyrdom.”

বাম্পীর নিজ কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া দেশের শিক্ষার নিমিত্ত স্থান হইতে স্থানান্তর গমনে শীতরাত্রের হিমভোগে ও জাগরণে ও অনাহারে, গ্রীষ্মের তাপে ও ধূলায় ভ্রমণে কি তিনি কিছুই প্রশংসনীয় দেখিতে পান না? অবশ্য, ম্যাট্‌সিনির স্বার্থত্যাগের সহিত তুলনায় ইহা বলিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু ভারত কি ইটালী? মনুষ্য সময়ের অধীন,— বাহ্য ঘটনাবলীর অধীন। ম্যাট্‌সিনির সময়ে ইটালীর ও আধুনিক ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি সমান? বিনা মহৎ উদ্দেশ্যে অনাহারে ও শীত-জঞ্জীরিত দেহে মরিলেই কি স্বার্থত্যাগী হওয়া যায়? আর জগতে কয় জন ম্যাট্‌সিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

উঁহারা মানব জীবনের আদর্শ—দুরোচ্চ-স্থাপিত বাত্যা-অন্ধুস্থ স্থির দীপালোক—যে যতদূর নিকটে যাইতে পারে সেই ততদূর মহৎ—ততদূর উদ্দেশ্য পূর্ণমনোরথ। ঠিক ম্যাট্‌সিনির ন্যায় অত দূর স্বার্থত্যাগ নাই বলিয়া লোকে নিন্দা, হেয়, গালিবর্ষণের যোগ্য পাত্র? সময় আসিলে ভারতেও আবার ম্যাট্‌সিনি জন্মবে। সময় আসিলে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগী এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিবে। আজ একজন বক্তা ভ্রমে পতিত হইয়াও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য—মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কারাগারকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। কাল এক জন আবার দেশের জন্য, জাতির জন্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। বঙ্গবাসী! ক্ষুধ হইও না, নিন্দা করিও না, সে দিন আসিবে, আসিবে। তুমি নিশ্চল থাক। প্রকৃতি—জাতীয় জীবন—নিশ্চল থাকিবে না, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

লেখক বলিতে পারেন যে বাগ্মী হইতে দেশের কি কার্য সাধিত হইতেছে? কিন্তু দেশ পরাজিত, কালচক্রে ঘূর্ণমান ভারতের দক্ষ ভাগ্য আজ পরের হস্তে। ইহাতে কি অধিক আশা করা যাইতে পারে? সেই বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ, যে কেবল কি বাগ্মনীয় বিবেচনা করে না, কিন্তু কি আশনীয়, তাহাও দেখে।* বিদেশীয়গণ রাজ্য শাসনে পিতৃতুল্য হইলেও, তাঁহারা বিজাতীয়। এ রাজ্য রামরাজ্য হইলেও ইহা পরের হস্তে। যেখানে তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের সংঘাত হইবে, সেখানে কি আমাদের স্বার্থ বিচূর্ণ হইবার কথা নহে? তথাপি বক্তৃতায় অনেক কার্য হয়। নূতন অত্যাচারী বিধি বিলুপ্ত না হউক, কতক পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবার আশা আছে। বর্ক (Burke) অতি অল্প সময় উদ্দেশ্যে পূর্ণ মনোরথ হইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার বক্তৃতায় কিছু ফল দর্শে নাই? যখন বসওয়েল (Boswell) তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন যে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় নিষ্ফল হইবে জানিয়াও তিনি বক্তৃতায় এত পরিশ্রম স্বীকার করেন যে, ইহা লোকে আশ্চর্য

বিবেচনা করে। তিনি উত্তর করিলেন যে, “যদি কোন পাণ্ডুলিপি বাধা সত্ত্বেও বিধিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাধানিবন্ধন বিধি কতক পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে। আমরা জয়লাভ না করি, তর্কে পরাস্ত করিব।” বর্ক হেষ্টিংসের বিচারে আপাততঃ অপূর্ণমনোরথ হইলেও তাহার ফল কি পরে দৃষ্ট হয় নাই? তাই বলি বক্তৃতায় আপাততঃ ফল না দেখিতে পাইলেও, ফল পবে লক্ষিত হইবে। সত্য, আশা বিফল হইলে ক্ষোভ হয়; তাহার জন্য দোষী কি বক্তাগণ? হতভাগ্য আসামীর, বিচারে হারিলে, উকীলকে গালি দেওয়া যেদ্রুপ অসংগত, বক্তাগণকে গালি দেওয়া কি তদ্রুপ নহে? বঙ্গবাসী! দোষী বক্তাগণ নহে, দোষী আমাদের অভিশপ্ত দক্ষ ললাটলিপি।

লেখক বলিবেন, বাগ্মীরা অনেক সময় অপব্যয় করেন। কিন্তু যাঁহারা সুখে আহার করিয়া নিদ্রা যান, আপন গোরবে নিজগৃহে বসিয়া নিজগোরব ধ্যান করেন, যাঁহারা মদ্যপানে ও পাপাচারে জীবনের অধিক সময় যাপন করেন, যাঁহারা নিজ আবাসস্থল অশ্লীল আলাপনে ও কুৎসাচর্চায় বারবিলাসিনীগৃহবৎ ঘণিত করিয়া তুলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বাগ্মগণ সময় অধিক অপব্যয় করেন; যাঁহারা অর্থের লোভে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে অর্থহীন, গ্লানিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ নহে? আর যাঁহারা বিবাহরহস্য, গহনারহস্য ও মেমসাহেব লিখিয়া, সংবাদপত্রকে কলঙ্কিত করেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাগণ প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত নহেন? লোকরঞ্জন মহাব্রত, এই রঘুকুলগুরু-প্রদিস্ট মহাবাক্য বৃষ্টি আজ সার্থক হইল। রাম লোকরঞ্জনার্থে নিজের প্রার্থনিকা প্রিয়তমাকে যখন বনবাস দিয়া-ছিলেন, বঙ্গবাসী যদি সেই লোকরঞ্জনার্থে সত্য, ন্যায় ও ভদ্রতাকে বিসর্জন করিতে না পারিলেন তাহা হইলে আর মহত্ব কি?

ইঁহারা বলেন যে বক্তাগণ সাধারণের অর্থ লইয়া অপব্যয় করেন, ইহা অসহনীয়। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র মহোদয়েরা

* See Burke on American taxation.

বেশ্যানুত্যাগানে ও অন্যান্য সহস্র নীচামোদে যে ব্যয় করেন, তাহা অপেক্ষা কি এই ব্যয় দুষণীয়? বিড়াল কুকুরের বিবাহার্থ অকাতরে রাশীকৃত অর্থব্যয় অপেক্ষাও কি ইহা অপব্যয়? চাঁদা আদায় করিয়া লোকে যে বারমারিতে যাত্রা অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতেও কি ইহা নিন্দনীয়? আর বক্তাদিগের কর্তৃক ব্যয় এত অসহনীয়? হা ঈশ্বর! সেই উদ্দেশ্যে যে এত অল্প মদ্রা সংগৃহীত হয়, ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়।

ইহারা বলেন যে যশোলিপ্সায় বক্তাগণ এই আন্দোলন করেন। আচ্ছা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যশোলিপ্সা কি এতই হেয়—অর্থলোভ হইতেও ঘৃণ্য? অবশ্য, যাঁহারা যশের নিমিত্ত উৎসুক নহেন, দেশের প্রতি আপনার কর্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইব, ইহাই যাঁহাদিগের বাসনা, তাঁহারা মহৎ, প্রকৃত দেশানুরাগী; তাঁহারা দেবোপম। অন্তরে তাঁহাদিগকে পূজা করি। কিন্তু যাঁহারা যশোলিপ্সাতেও দেশকে উন্নত করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিদ্রিত, নিষ্কর্মা, জড়পদার্থ দেশবাসী হইতে সমাধিক প্রশংসনীয়। যশ প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কয়জন সে যশোলাভে যত্নবান্ বা সমর্থ; যশ সুলভ নহে; প্রতি পণ্যবীথিকায়ই ইহা প্রাপ্য নহে।

যশোলিপ্সা এক মহতী বিশ্বব্যাপিনী শক্তি। ইহা যেখানেই যায়, সেই স্থানেই অনিষ্ট উৎপাদন করে না। ইহা মনুষ্যকে যেমন নিকৃষ্টতম পশু করে, তেমনই ইহা মনুষ্যকে পূজ্য দেবতা করে; যেমন মনুষ্যকে দেশের অনিষ্ট প্রয়াসী দূর্ম্মদ কুচক্রী করে; সেইরূপ ইহা মনুষ্যকে দেশের নিমিত্ত প্রাণোৎসর্গী হিতৈষী করে।* ইহা দেশকে কষ্টকময় অরণ্য করে বটে, কখন আবার দেশকে সুবাসস্থ্যুর্দিত কুসুমালঙ্কৃত সুন্দর উদ্যানে পরিণত করে। তবে উন্নত মানব যশোমাত্রকেই নিন্দা করিও না "Chatter not, sublime

* The same ambition can destroy
or save
It makes a martyr as it makes a
knave.

—Pope, Essay on Man.

reader, common places of scoundrel moralists against ambition. In some cases ambition is a hopeful virtue; in others ambition was the virtue by which any others could flourish"† যখন দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, নিদ্রা ও অলসতা বিশ্বব্যাপী ধূমে সমাচ্ছন্ন, তখন কখন কখন যশোলিপ্সাই দেশহিতৈষী নাবিকের অটল, স্থির ধ্রুব-নক্ষত্র; ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নাবিক তরণী চালাইয়া যায়। তবে যশোলিপ্সা মাত্রই দুষণীয় নহে। যে যশোলিপ্সায় স্বদেশকে জগতের অলঙ্কার করিতে প্রয়াসী হয়, প্রতি সহৃদয় দেশবাসীই তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, সন্দেহ নাই।

মহাশয়! এই কুৎসা-প্রিয় লোকদিগের এরূপ আচরণের কারণ কি এই নহে যে, তাহারা নিজে অকর্ম্মণ্য, নিষ্কর্মা ও যশোলাভে অসমর্থ? কিন্তু পরে পরিশ্রম করিয়া যশোলাভ করিবে, ইহাও তাহাদিগের অসহনীয়। এই পরশ্রীকাতরতাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য পরের অবনয়ন। ঘৃণিত কীটসমূহ যেমন গলিত শব আহাৰ করিয়া জীবনধারণ করে, এই সমস্ত লোক পরনিন্দা আহাৰ করিয়া পরিপুষ্ট হয়।

বাগ্মীর বহির্চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ইহারা ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া অন্তর্ঘাটীর পবিত্র যবনিকা উন্মোচন করিতে লজ্জা বোধ করে না। জর্দানিয়সের ঈর্ষ্যাহলাহল আছে, সামর্থ্য নাই; উইলকক্সের কুপ্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রকাশক্ষমতা নাই। শ্লেষে সত্যের আভাসও চাই। ইহাদিগের ক্ষিপ্ত কল্পনা অস্বাভাবিক বিষয় চিত্রিত করিতে অভিলাষী। ইহাদিগের ব্যাধিজর্বারিত মস্তিস্কোদ্ভূত সৃষ্টি যথার্থ জীবনের সহিত মিলে কিনা চিন্তা করে না। পরিবারের অভ্যন্তরে বাগ্মী বিধবা মাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন, শয়ন-মন্দিরে পত্নীর সহিত কিরূপ আলাপ করিলেন ইহাই

† The Caesard by De Quincey.

ইহারা কলুষিত কল্পনার রচনা করিবে ও লঙ্কাহীন লেখনীতে প্রকাশ করিবে। এ দৃশ্য সত্য হইলেও অন্তর্স্বাটীতে আমার আচরণ সাধারণের বিবেচ্য ও আলোচ্য নহে।

মহাশয়! এ প্রকার লোকের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। যাহারা অন্তর্স্বাটীর দ্বার উন্মোচন করিতে সাহসী ও তাহা অপরিজিত করিতে কাতর নহে; যাহারা নিজের স্বার্থের নিমিত্ত পরের প্রিয়তম স্বার্থ বিনাশ করিতে, শত্রু যশ কলঙ্কিত করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে অন্য সকলেই অতি হেয় ও ঘৃণ্য মনে করেন।

মহাশয় ভাবি নাই, কোন বঙ্গীয় লেখক অন্তঃপুরের পবিত্র আবরণ উন্মোচনে সাহসী হইবে। ভাবি নাই, যখন বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইয়াছিল, এ প্রকার কুরূচি প্রবন্ধসকল বঙ্গবাসীতে স্থান পাইবে। ভাবি নাই চৌর্য্যভাবে অন্তঃপুরপ্রবেশ ও এই পরশ্রীকাতর মস্তিষ্ক-জাত কাল্পনিক দৃশ্য। বঙ্গবাসীর স্তম্ভকে কলঙ্কিত করিবে। কিন্তু দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

বঙ্গবাসীর অবতার আজ নতুন ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছেন; যে “দেশ-হিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই, হৃদয়ের শোণিত চাই; দেশ-হিতৈষিতা বড় শক্ত কথা।” বোধ হয় তিনি একথা না বলিলে আমাদের উপায় ছিল না। হা সুরেন্দ্র! মিছাই তুমি ম্যাট্‌সিনির স্বার্থ-ত্যাগের বিষয় বক্তৃতা করিয়া মরিয়াছ। দেশ হিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই; একথাও শিখাইতে পার নাই? নতুন অবতার আসিয়া সে ধর্ম প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। মিছাই তুমি পরিশ্রম করিলে। ভাবিয়াছিলে যে, তোমার নাম স্মরণীয় হইবে। কিন্তু এবার বদ্বি তোমার নাম লোপ হয়। আর তুমি বক্তৃতা করিলেও ত হৃদয়ের শোণিত দিতে পার নাই। বঙ্গবাসীর অবতার আজ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়ের শোণিত দিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গবাসী! যখন লিখিয়াছিলে, তখন “আমি নিজে কি” ইহা ভাবিতে কি বদন আরম্ভ হয় নাই? মস্তক অবনত হয় নাই? অহো বিড়ম্বনা!

ইহা নিতান্তই সত্য যে, প্রকৃত দেশানুরাগ জগতে অতি বিরল। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে অধিক লোক স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে ম্যাট্‌সিনি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে নিজের প্রিয় পরিবারের সুখ বিসর্জন চাই। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে স্বার্থত্যাগ চাই, প্রাণোৎসর্গ চাই। কিন্তু হা জগৎ! তোমাতে ইহা বিরল না হইলে, কি তুমি স্বর্গ হইতে না?

শ্লেটো তাহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিগণকে বহিস্কৃত করিয়াছেন। আজ নতুন শ্লেটো কল্পিত রাজ্য হইতে বক্তাগণকে দূর করিতে চান। হা কেশব! হে সুরেন্দ্র! হা কালীচরণ! তোমাদের দশা কি হইবে? আজ বঙ্গবাসী পোপের ক্ষমতা হস্তে লইয়া তোমাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিতে চান। তোমরা নীরবে রোদন কর।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে বাঙালীর— ভারতবাসীর একতা কখন হইল না। আমরা একা বঙ্গবাসীর বিরোধী নহি। শত্রু তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইল না। এই সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। কেহ কার্য করিলে অন্যে কেন সহিতে অক্ষম? গৃহ-বিচ্ছেদে ভারতের পরাধীনতা ঘটাইয়াছে। গৃহবিচ্ছেদে ভারত পরাধীন আছে ও থাকিবে। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদে কেন উন্নতির পথ রোধ করি?

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ও লেখকগণ! তোমাদিগের ত বক্তাগণ নিন্দাবাদ করেন না। তোমরা বক্তাদিগের সহকারী, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, উৎসাহ দিবে না—না, তাহাদিগের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা নিক্ষেপ করিতেছে!! সম্পাদকগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ; তোমরা দেশের পরিচালক, কেন না, সংবাদপত্র দেশের জীবন্ত ক্ষমতা। নেপোলিয়ন তিনখানি সংবাদপত্রকে যত ভয় করিতেন, সমস্ত শত্রুকে তত ভয় করিতেন না। আমরা দীন-হীন মূর্খ পরাধীন বাঙালী। কত দিন গৃহবিবাদে এ দুরবস্থায় রহিয়াছি, আর কত দিন থাকিব?

স্বর্গীকৃত জীবনী

ইংরেজি ১৮৬৩ সালে জুলাই মাসে আমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করি। নবম বর্ষ বয়সে যক্ষ্ম প্লেথিহাদি বহুব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্থান পরিবর্তনার্থে আমি শান্তিপুর্বে প্রেরিত হই। সঙ্গ সমব্যক্তিগ্ৰস্তা আমার স্বর্গীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। শান্তিপুর্বের ডাক্তারেরা আমাদের উপর বহুবিধ ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে আমাদের জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলেন, এবং আমার স্বজনদিগকে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে অনুর্তিত করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার অবসর গ্রহণ করিলেন। আমার স্বজনেরা অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বেচ্ছামত খাদ্য খাইতে দিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ক্ষীর দধি ও আমি ক্ষীর দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাই। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে আমরা উভয়ে আশ্চর্যরূপে দ্রুত আরোগ্য লাভ করিলাম ও উক্ত ডাক্তারদিগের প্রভূত বিস্ময়ের কারণ হইয়া রহিলাম।

এই সময়ে (বোধ হয় ১৮৭৩ সালে) একটি প্রবল বৃষ্টি হয়। তাহাতে শান্তিপুর্বে যে বাড়িতে ছিলাম, সে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়। আমরা সেই অধ্বনিশীথে গৃহ ভূমিসাৎ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সন্নিবর্তস্থ একটি ডাকঘরে আশ্রয় লই। আমি এক ভূতের ক্রোড়ে বসিয়া একটি গোক্ষুরা সপের প্রতিবাসিস্বরূপ হইয়া বারান্দায় রক্ষিত একটি পান্ধীতে বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাই। এক রাত্রির মধ্যে দুই সপ্তকট। যাহা হউক, এই উভয় সপ্তকটে পরিচরণ পাইয়া পরদিন প্রভাতে হিম্ম্যান্তরে যাই ও তাহার পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন করি।

আমার বিদ্যাভ্যাসের বৃত্তান্ত এইরূপ :

ইং ১৮৭৮ সালে আমি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় ও ১৮৮০ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ১৮৮২ সালে হুগলী কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় ও ১৮৮৪ সালের আরম্ভে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হই। তাহার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ঐ বৎসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষিশিক্ষার্থে স্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ইংলন্ডে যাই এবং সেখানে এম. আর. এ. এম. ই. এবং এম. আর. এ. সি. এই দুইটী ডিপ্লোমা পাইয়া ১৮৮৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাগমন করি।

বিলাত হইতে ফিরিয়াই সেটেল্‌মেন্ট কার্যা শিখিবার জন্য বেঙ্গল গবর্নমেন্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্যা ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে আমি শ্রীনগর ও বনোল স্টেটের আসিস্ট্যান্ট সেটেল্‌মেন্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুন্ডের ও তথা হইতে পূর্ণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে আমি বর্ধমান স্টেটে সূজামুটা পরগণায় সেটেল্‌মেন্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি। উক্ত সেটেল্‌মেন্ট সংক্রান্ত একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটী উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্বেবর্তী সেটেল্‌মেন্ট অফিসারেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য করিয়া দিতেন। আমি সূজামুটা সেটেল্‌মেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্বে জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হস্তবুদে লেখা হয়। এমন কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমী এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা যদি বেশী জমীর জন্য বেশী খাজনা দাবী করেন, ত তাহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন বেশী জমিটুকু অধিকার করিয়াছে। আরও ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমীর বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই। ঐ রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয় এবং তাহাতে

জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্যার চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিদ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে স্বয়ং মোদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটলমেন্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাট ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পূর্বে ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটলমেন্ট অফিসারদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখনই তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন; এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্ট রুলিং অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটলমেন্ট কার্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমী বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যার চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নিন্দ্যভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগর্দিল সেটলমেন্ট ম্যানুয়াল হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহমিকা প্রকাশ হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অন্যায় কর-বৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্য আর যে করিতে পারিব, তাহার আশা নাই।

সেটলমেন্টের পরে আমি সেটলমেন্ট কার্য হইতে অব্যাহতি পাই ও ডিপার্টী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক

(Inspector) নিযুক্ত হইয়া আসি। সেই কার্য অদ্যাবধি করিতেছি।

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনমধ্যে আমার সর্বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহারা আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা করেন। এবং তাঁহাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পনের বৎসর বয়ঃক্রমে আমি মেহেরপুর ইন্স্কুল গৃহে তিনমাসে তিনটি বক্তৃতা করি (২টি বাঙালায় ও একটি সংস্কৃতে)। এবং কৃষ্ণনগরে ফিরিয়াই এগুলো ভার্ণাকুলার স্কুলের হলে একটি তিনঘণ্টাব্যাপী বাঙালা ভাষায় বক্তৃতা করি। তাহাতে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকিল শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। পরে আমাদের কলেজের ক্লাবে আমিই প্রধান ছাত্র-বক্তা ছিলাম। তাহাতে একবার ডাক্তার ওয়াটস্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগলী কলেজে গিয়া কলেজ ক্লাসের ছাত্র-দিগের ক্লাবে আমি সহকারী সভাপতিরূপে বহুদিন ছিলাম। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি যখন ভৈরোঁ, আশোয়ার ইত্যাদির সুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতাম। শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। আর্ষ্যগাথায় প্রকাশিত নক্ষত্র বিষয়ক গীতটী আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি। ১৮৮২ সালে আমি আর্ষ্যগাথা প্রথম ভাগ রচনা করি। তাহা প্রায় তখনকার সকল সাময়িক পত্রিকায় প্রভূত পরিমাণে প্রশংসিত হয়। পরে ১৮৮৩ সালে বিলাতে প্রবাসকালে আমি Lyrics of Ind নামক ইংরাজি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করি। তাহা দুই একখানি বিখ্যাত বিলাতি কাগজে (যেমন Westminster Review, Scotsman ইত্যাদি) অলপাধিক প্রশংসিত হয় এবং কবি স্যার এড্‌উইন আর্গল্ড অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। বিলাত-প্রত্যগত হইয়া ১৮৮৭ সালে আমি 'একঘরে' নামক একখানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও তাহার জন্য শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি খাই। ১৮৯৩ সালে আর্ষ্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। তাহার বিশেষ প্রশংসাবাদ বা

নিন্দাবাদ কিছুই হয় নাই। কেবল 'সাধনায়' 'আর্যগাথা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবোক্ষ সমালোচনা ও ভারতীতে 'আর্যগাথার গদ্যটকতক গান' নামক প্রশংসাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ১৮৯৫ সালে আমার 'কল্ক অবতার' নামক প্রহসন বাহির হয়। ইংলিশম্যান পত্রে তাহার উপর একদিন একটি প্রশংসাপূর্ণ 'প্যারা' ও পরে আর একদিন একটি 'লিডারে' তাহার প্রশংসাবাদ বাহির হয় এবং বঙ্গবাসীতে একটী তীর মধুর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিলাতে ষাইবার পূর্বে আর্যদর্শন, নব্যভারত ইত্যাদিতে লিখিতাম। বিলাতপ্রবাস কালে আমার মাননীয় ভ্রাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'পতাকা' নাম্নী পত্রিকায় নিয়মিতরূপে বিলাতের চিঠি লিখি। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি প্রায়ই 'ভারতী', 'সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকায় লিখিয়া থাকি। সে লেখাগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

আমার পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমার পিতার নাম 'কার্তিকেশ্বরচন্দ্র রায়, মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী। পিতা কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন, ও মাতা শান্তিপুত্রের অম্বৈত ঠাকুরের বংশধর শ্রীকালচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমার বিলাতপ্রবাস কালে, সাত পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। সন্ত ভ্রাতার মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। আমার কনিষ্ঠ ভগিনীটী ১৮৯৬ সালে নিউ-মোনিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৮৭ সালে আমি কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করি।

['জন্মভূমি', কার্তিক ১৩০৪]

কীর্তন

বাহির করছি খবর-কাগজ

এবার একখান নতুন রকম দাদা!

তার, একটি পাতা রইবে লেখা,

আর একটি পাতা রইবে সাদা!

অন্য রকম খবর-কাগজ পড়েই ফেলে দিতে হয়, কোনও কাজেই লাগে না। কিন্তু এ কাগজ সে রকম নয়। এর সাদা পাতায় চিঠি লেখা, বাজারের হিসাব রাখা, ধোপার হিসাব রাখা, পদ্য লেখা—সব চলবে। চাই কি,—

এর, জড় করে' সাদা পাতায়

যদি ইচ্ছা হয় ত বাঁধো খাতায়,

ইচ্ছা হয় ত বিক্রয় করো, কেহ দিবেনাক বাধা!

আবার যে পাতাটা লেখা, তাতে অন্য কোনও উপকার না হোক, তা গৃহস্থের অনেক কাজে লাগবে। কাগজ অনেকখানি দেবো, ভাঁজ করে' কিংবা ভাঁজ না করেও অনেক কাজ চলবে। যেমন, উনোনে আগুন জ্বালা, আবজ্জনা সাফ করা, ডুগডুগি তৈরী করা, ওজোন হিসাবে বিক্রয় করা,—সব চলবে। উপরন্তু—

তা, নাড়লে গ্রীষ্ম হবে হাওয়া,

তা, পাতলে, হবে লুচি খাওয়া,

মাথায় দিলে হবে টুপী,

মুড়লে হবে জুতো বাঁধা।

তবে সে কাগজটা সাহিত্যিক হিসাবেও যে বড় কম যাবে, তা নয়। কি ধর্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি থিয়েটারনীতি, কি সুনীতি, কি কুনীতি, সব বিষয়েরই চর্চা তাতে থাকবে। আমরা বিপুল ব্যয়ে বহু পরিশ্রমে এই পত্রিকার জন্য অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে এর লেখকপদে অভিষিক্ত করেছি। সকলের নাম দিতে গেলে আমাদের Handbill-এ কুলোয় না। তবে গদ্যটকতকের নাম করি—

হনুমানের সঙে সত্ত

লিখিবেন ভাগবতের অর্থ,

মকট লিখিবেন কৃষিতত্ত্ব,

অর্থনীতি লিখিবেন গাঞ্চ।

তার উপর আবার ভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কাগজে রীতিমত সংবাদ পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। আমেরিকা, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা (উত্তর ও

দক্ষিণ), নিউজীল্যান্ড, সুমাত্রা ও দক্ষিণ 'পোল'-এ যে দেশের আবিষ্কার হব-হব হয়েছে—সে দেশ, এক কথায় স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব জায়গায় special correspondent যোগাড় করেছি। কত নাম করব? তবে দু' এক জনের নাম করি,—

শুনুন, সে কাগজে লিখবে কে কে—

লুলু কামস্কট্কা থেকে,

সিংহল থেকে মন্দোদরী,

বৃন্দাবন থেকে রাধা!

['সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩১০]

বিষম সমস্যা

চন্দ্রবংশীয় মহাত্মা পঞ্চপান্ডবের পবিত্র প্রেম পূজীভূত হইয়া পাণ্ডালীর জন্য কুরুক্ষেত্রে যখন একটা কুরুক্ষেত্র উৎপন্ন করে, তখনও মৌর্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় নাই; এবং লক্ষ্মণ সেন যখন গোড়ের রাজা, সে সময়ে পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি যদিও জন্মান নাই, তথাপি

পাত্তবিৎরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক না কেন, মৌর্য বংশীয় কেহ কখনও পঞ্চাননের পূজা করিয়া গোড়ীয় নামক কোনও সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, পদ্মপুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, নরব সিরাজন্দোলার রাজত্বকালে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা বিম্বাবতীর সহিত ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীগোবর্ধন সরকারের বিবাহ হওয়ার কথা আদৌ কোনও মূল নাই। সিরাজন্দোলা অতি দয়ালু ছিলেন, সে কথা প্রবাদ আছে। এমন কি, আমি তাঁহার সাময়িক ইতিহাস পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সিরাজন্দোলার অন্য নাম ছিল রাজকুমার পরমহংস। এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি না থাকিলেও, এটি নিশ্চিত যে, পৌণ্ড্রবর্ধনের কোনও নৃপতি সে সময়ে মীর-গঞ্জ যান নাই।

ঠিক কোন বৎসর শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়

বর্ধমানে সেতার বাজাইতেছিলেন, তাহার নিব্বারণ করা দুরূহ। তবে সে সময়ে নবম্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে কোনও নরপতি যে ছিলেন না, তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ ঘোষের একটি অশ্ব ছিল, তাহার নাম 'শৈবাৎ'। এ শৈবাৎ শব্দ শৈব শব্দের পঞ্চমীর এক বচন, কিংবা দৈবাৎ শব্দের অপ-ভ্রংশ, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা নিপাতনে সিদ্ধ। যাহা হউক, সবাসাচী সেই অশ্বের একটি তত্ত্ব দিল্লী নগরীতে আবিষ্কার করেন। দিল্লী নগরীই পুরাতন হস্তিনাপুর, একথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অজ্জুনের অপর নাম সবাসাচী। অতএব, হরেকৃষ্ণ ঘোষ অজ্জুনের সমসাময়িক, বা পূর্ববর্তী? তিনি যদি অজ্জুনের পরবর্তী হইতেন, তাহা হইলে অজ্জুনের তাঁহার অশ্বের তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? অতএব সম্ভব, "হরে," শব্দ "শ্রী" শব্দের অপভ্রংশ। কিংবা ইহাও অসম্ভব নহে যে, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে "হরেকৃষ্ণ" বলিয়াও ডাকিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব ছিল, এ কথা কোনও পুরাণেই লেখে না। অতএব, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তই হয় না।

এ সকল অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। পুরাকালে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ছিল না বলিলেই হয়। তাহার উপর সে সময়ে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহাই হউক, আমি বোধ হয় মহাশয়দিগের কাছে প্রমাণিত করিয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্ত একজন ক্ষমতামূলী রাজা ছিলেন।

জটিল পুরাতত্ত্ব ছাড়িয়া বর্তমান সময়ে আসা যাউক। কারণ, প্রত্নতত্ত্বের সহিত আমার বর্তমান প্রবন্ধের কোনও সংস্রব নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ যত দূর করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সুধী-বৃন্দের সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইব।

ভদ্রগণ! এই ভারতবর্ষ পুঙ্কানুপুঙ্ক অনুসন্ধান করিলে, সেটা যে একটা দেশ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না। ইহার জনসংখ্যা সম্বন্ধে ইহা সাহসের সহিত বলা যায় যে, এখানে পুরুষ ও নারী দুইই আছে। এ দেশের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারত সমুদ্র। জাপান হইতে তাতারে একটি রেখা

টানিলে, তাহার উত্তরে থাকে গ্রীস্। স্যালা-
মিসের নীচেও সমুদ্র। পৃথিবীর চতুর্দিকে
চন্দ্র ঘুরে, একথা সকল জ্যোতির্বেত্তাই
স্বীকার করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে,
জ্ঞানের একটা সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব।

লোহের সহিত দ্রাক্ষারসের কোনও মূল্যবান
সংস্রব না থাকিলেও, ইহা একরূপ সিদ্ধান্ত
হইয়া গিয়াছে যে, উত্তাপ যত বাড়ে, শীত তত
কমে। বিদ্যুৎ আলোক প্রদান করে বটে, কিন্তু
শব্দের গতি তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরিমিত
হয় না। যবক্ষারজান বায়ব পদার্থ। বৃক্ষ তাহা
বহুদূর হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। সেই-
জন্য নীচের কাব্যার্থী গীতার টীকা
লিখিত উদ্ভিদ হইতে যবক্ষারজান বাহির
করিতে পারেন নাই। ভূতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ
করিলেও বোঝা যায় যে, বঙ্গদেশ এক সময়ে
সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। জীবানু মনুষ্য
শরীরেও আছে। পক্ষিজাতীয় সমস্ত জীবেরই
পক্ষ আছে। সেই জন্য মানুষ যে বানর জাতি
হইতে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব,
অর্থনীতি কখন কি আকার ধারণ করিয়াছে,
তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা আর্ষাজাতি। সম্রাট্ আকবর যে
পুর্ষবংশের সেন-বংশীয় কেহ ছিলেন না,
তাহা সপ্রমাণ করা আমার বর্তমান প্রবন্ধের
জন্য প্রয়োজন হইতেছে না।

অতএব হে বন্ধুগণ! আমাদের বর্তমান
নৈরাশ্যের এক ক্ষণিকের আশ্রয় গ্রামের
পুর্কারিণী। আমাদের উপনিষদে জীবনের
সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা আছে। মহাশয়েরা
তাহা পাঠ করুন। আমি স্বয়ং তাহা পাঠ
করিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমি কোনও
মতামত প্রকাশ করিতে চাই না।

আজ যাঁহারা ভীতচকিতনেত্র বর্তমানের
দিকে চাহিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বসৌন্দর্যের
অখণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করুন, এবং কৃকলাসের
সহিত অলাবু ভক্ষণ করুন, এবং নবীন উদ্যমে
ব্যর্থতাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রবৃত্তিকে
আত্মাভিমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করুন।
আমাদের পিতৃপিতামহদিগের তিতিক্ষার পরম
বেদনার সুগম্ভীর আত্মগৌরব আমাদের মধ্যে
সমাবিষ্ট হইয়া যেন মনুষ্যত্বের সঞ্চার করে;

এবং বিনাশকে স্বীকার করিয়াও ঐক্যের
প্রতাপকে ক্ষুণ্ণ না করে। যাহা বিচিত্র, তাহা
ধৈর্য্যকে বিচ্ছেদবহুল না করিয়া ক্ষুদ্রকে যেন
সমগ্রের মধ্যে অবিচলিত সংঘাতে পরাস্ত করে।
আমরা এই অশুভ যোগে স্নিয়মাণ শক্তিপুঞ্জকে
প্রমত্ত অভিব্যক্তির মধ্যে অব্যাহত রাখিয়া
নিন্দাকে ঔদাসীন্য দ্বারা সংহত করিব এবং
এই কৃত্রিমতার চাকচিক্য দ্বারা আপাতবুদ্ধির
উর্গনাভজালে পড়িব না। অধৈর্য্য কোনও
কালে ধীরভাবে বিচার করিতে পারে না। এবং
নিষ্ঠুরতা ধর্মবুদ্ধিকে সংক্ষিপ্ত করে। অতএব,
অনিষ্টকে শ্রদ্ধার আবরণে ঢাকিয়া ভাষার
ইন্দ্রজালে তাহার অসংযমকে যেন আমরা বড়
করিয়া না দেখি। সহিষ্ণুতার দুর্মূল্যতা
উত্তেজনার ভৈরব হৃৎকারে অধ্যবসায়কে
ডিঙাইয়া যায়। অতএব হে বন্ধুগণ! আমি
এই গাঢ় অন্ধকারের কৃষ্ণতাকে উদ্যত উন্মাদনার
বিপ্লব হইতে বাঁচাইয়া লইয়া দেশের সমগ্র
হিতকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইব। কারণ,
ঈশ্বরের নাম পরব্রহ্ম।

মহাশয়গণ! সূর্যের গতির সঙ্গে প্রেমের
বীর্ষের একটু অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য সেই চন্দ্র-
বংশীয় গৌরবকে হিমালয় হইতে কুমারিকা
পর্যন্ত উত্তপ্ত লোহখণ্ডবৎ সংশ্লিষ্ট করিয়া,
যবক্ষারজানের সার্থকতা—ভূতত্ত্বের মধ্যে
জাগাইয়া তুলুক, এবং জীবানুর সহিত অর্থ-
নীতির অদ্ভূত সন্মিলন করিয়া পুর্কারিণীজাত
উদ্ভিদকে সঞ্জীবিত করুক। এবং লক্ষ্মণ
সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও
সিরাজদ্দৌলার মহিমায় মহিমাম্বিত ভাগী-
রথীর বিশাল বক্ষের উপর বজরা ভাড়া করিয়া
উজান দাঁড় টানিয়া ভূমার দিকে লইয়া যাউক,
আমাদের তন্মিলন আর উপায় নাই। আমরা
আজ সংকল্পকে বিকল্পে কণ্টকলিপিত করিয়া
হৃৎস্বর মধ্য দিয়া দীর্ঘ করিয়া তুলিব। কারণ
গোবর্ধন সরকার যাহাই বলুন না কেন
সব্যসাচী এবং বস্ত্রিয়ার খিলিজি যে
সমকালীন ছিলেন না সে বিষয়ে ঐতিহাসিক-
দিগের মধ্যে মতভেদ নাই। বিশেষতঃ, যখন
সত্য এক। স্বয়ং বিষ্ণু শর্ম্মাই বলিয়াছেন,—
অস্তিত্ব গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ।

মহাশয়গণ! আমার বক্তব্যটা আপনারা

ঠিক বুদ্ধিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। সত্য কথাটা কি, আমি নিজেই সেটা ঠিক বুদ্ধিতে পারি নাই। আর সে বিষয়ে যতই ভাবিতোছি, ততই তাহা খুব শক্ত বোধ হইতেছে। তবে বক্তৃতা একটা করিতে হইবে, তাই করিলাম। আপনারা করতালি দিউন।*

[‘সাহিত্য’, আষাঢ় ১৩১৫]

কাব্যে নীতি

দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বলিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক আর নায়িকা। বিষ্ণুমবাবুর অনুরোধে একটি নায়ক আর দুইটি নায়িকা হইলেই ভালো হয়। নায়িকা ততোধিক হইলেও ক্ষতি নাই।

আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ, নয় ত টম্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। এখন, আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম। কারণ, সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক ভদ্র-ঘরের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর ১২ বৎসরের পুরুষ প্রেম হয় না। ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যিক।

ইংরাজিতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে। কিন্তু ‘দাম্পত্য প্রেম’র গানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে ‘দাম্পত্য প্রেম’ ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে ‘দাম্পত্য প্রেম’র গান নাই বলিলেই হয়! হা অদৃষ্ট!

* পূর্ণিমা মিলনে পঠিত

উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। ‘সে আসে ধীরে’, ‘সে কেন চুরি করে চায়’, ‘দুর্জনে দেখা হলে’ ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাঁহার ‘তুমি যেও না এখনই’, ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’ ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। তাঁহার যে কয়টি গানকে ‘দাম্পত্য প্রেমের গান’ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবীবাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবীবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসারটুকু বেশ আছে।

রবীবাবুর খন্ডকবিতায়ও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃস্বের স্বস্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার ‘মরমে গুঁড়ির মরিছে কামনা কত।’

দোষ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি। তাহাদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর এই ভক্তদের এই লালসা, সম্ভাগটুকু যেমন মধুর লাগে, নারীর সেবা, করুণা, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে না। কিন্তু বড় কবিদের উচিত নয়—পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।

এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না।

রবীন্দ্রবাবুর ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না!—তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম।

মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই;—

অর্জুন মণিপুত্র রাজ্যে প্রাপ্যমানা

চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মৃগ হন, এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এ গল্পটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল; কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্রবাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাসদেবের ধাপে তাঁহাকে নামিয়া ষাইতে হইবে। রবীন্দ্রবাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নতুন রকম ত হইল। “ডুববে না হয় ডুববে—একটা নতুন হবে সুর।” কোর্টশিপ নহিলে কখনও প্রেম হয়!

রবীন্দ্রবাবুর “কাব্যের” গল্পাংশ এই;— বনমধ্যে অর্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জুন তখন সম্মত হইলেন। অর্জুন সেই অনুঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

অশুভ কোর্টশিপ! এ কোর্টশিপে একজন সামান্য ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা একজন হিন্দু রাজকন্যা যাঁচিয়া লইলেন! চমৎকার!

রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র শ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে-সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন—রাজপুত্র, পঞ্চপাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ ষাঁহার সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে, উর্ধ্বশরীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন; তিনি রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনারাসে একটি রাজকন্যার ধর্মনাশ করিলেন!

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বণের

কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে-সে হিন্দু কুলবধু যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে! আর বলিব কি—বর্ষকাল—শ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ; আর নিলজ্জভাবে তাহার বর্ণনা, আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি! দুঃখ তাহা নহে যে, “কল্যা রাত্রিকালে কি করিলাম।” দুঃখ এই মাত্র—“হায় আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।” বর্ষকালের ভিতর, কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না!

তাহাই বৃষ্টি যে, এই কাব্য দুর্নীতিমূলক হউক। ইহা মনুষ্য-স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, সব দেশেই নারী জাতির সম্পত্তি। একজন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নিলজ্জা কুলটা করিতে হইলে এতটা আয়োজন চাই! অর্থাৎ, কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখানো চাই। যদি একজন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইংগিতেও কাব্যে বোঝানো চাই। নহিলে এরূপ চিত্র কাব্যে অস্বাভাবিক। রবীন্দ্রবাবু এরূপ অশুভ ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবীন্দ্রবাবুকে ‘chaste’ কবি বলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ষাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent, কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মৃগ দেখাইতে পারিত না।

“অশ্লীলতা” ঘৃণাহ বটে। কিন্তু “অধর্ম” ভয়ানক। ঘরে ঘরে “বিদ্যা” হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উছল যায়। সুরূচি

বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্দনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি “চিত্রাঙ্গদা”র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার স্দন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পদ্যতৎখানি দংশ করা উচিত।

কোনও কোনও “ভক্ত” বলিবেন (একজন সেদিন বলিয়াছিলেন) যে, এ দ্দনীতি হউক, কিন্তু এ চমৎকার কাব্য। তাঁহারা যেন রাস্কিনের বাণী মনে রাখেন যে, যাহার মূলে দ্দনীতি, তাহা কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। দ্দনীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। স্দর্ষ্য না হইলে দ্বিবা হয় না।

এই দ্দনীতি বঙ্গ সাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙালা কাব্য খুলিলেই “দুজনে দেখা হোল”, “প্রতি অঙ্গ কাঁদে”, “সে চারু বদন”, “রচিছি শয়ন”—এই-ই পাওয়া যায়। বাঙালা কাব্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার অভাব, অন্যদিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। বাইরণ, শেলি, কীট্, ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ। তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাহির হইতেছে। আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্বাতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নিঝরে, সৌরভে, ঝঞ্কারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহাঁদের সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; আর, ধূমাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন ইংলন্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু সৌন্দর্য লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখবার স্থান আছে!

তাহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননার স্নেহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার সেবা, বন্ধুর সৌহান্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা,—এই সকল মহিমময়ী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, “সে কেন চুরি করে চায়” আর “জাগি পোহাল বিভাবরী”, এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবু ত সহস্রাধিক খন্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম,—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, “তাহা” না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব!” তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। সে রবীবাবু minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু। শূন্য পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু দ্দনীতি plus শক্তি বড় ভয়ঙ্কর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজীরাও পেশোয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন,—“বৃক্ষকাণ্ড কর্তন কর, শাখাগুলি আপনিই শুকাইয়া যাইবে।”

রবীবাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিকপত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। সেদিন “প্রবাসী”র সম্পাদক এই প্রেমের পদ্য-রচয়িতাদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ কি? তাঁহারা ভাবেন যে, যেই “জলভরে”র সঙ্গে “ছলভরে” মিলাইতে শিখিলেন, অমনিই কবি হইলেন! তাঁহাদের যেমন শেখাও, তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন। রবীবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন। এমন কি, অনেক সময়ে they have out-Heroded Herod!

[“সাহিত্য”, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬]

মোহিনী

১

সেদিন বসন্তের বায়ু বহিতোছিল। কোকিল ডাকিতোছিল। চন্দ্র হাসিতোছিল।

পদ্মকরিণীর ধারে মোহিনী একাকিনী বসিয়া পদ্মকরিণীর জলে প্রতিবিস্মিত চন্দ্রকিরণ দেখিতোছিলেন।

মোহিনীর স্বামী থাকিতেও তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী বহুদিন হইতে ইংলণ্ডে অবস্থিত করিতোছিলেন। তিনি অদ্য অতি বিশুদ্ধ প্রাজল ইংরাজীতে তাঁহার শব্দরকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। কি উপায়ে বিলাতে তাঁহার সংসার চলবে, বিলাতে তিনি কি করিবেন, কেন তিনি গৃহে ফিরিবেন না, এ সকল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার নিজের পিতার বিশেষ সঙ্গীত কিছুই ছিল না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থের জন্য, স্ত্রীর জন্য নহে। তিনি শব্দরের অর্থে বিলাত গিয়াছিলেন। এরূপ জামাতা সুশীলচন্দ্র শব্দর মহাশয়কে কি প্রকারে ধীর, শান্ত এবং সংযতভাবে এরূপ পত্র লিখিলেন, মোহিনীর পিতা রমেশচন্দ্র নানা দিক্ হইতে প্রশ্নটি পর্যবেক্ষণ করিয়াও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তখন তিনি একটি মাঝারি রকমের দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া তাঁহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের গৃহে প্রয়াণ করিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি। বহুতর কন্ঠের তন্ত বালককার মধ্য দিয়া তিনি হাঁটিয়া গিয়াছেন। পায়ে ফোস্কা হইয়াছে, কিন্তু বসিয়া পড়েন নাই। দৈন্যের অগ্নিপরীক্ষায় তিনি ‘অনরে’র সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে পড়াইয়া তাঁহার চরিত্র-স্বর্ণ কেবল বিশুদ্ধতর হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণ যখন তথাকথিত ব্যাপার শুনিলেন, তখন তিনি শিষ্ দিলেন; পরে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িলেন; পরে ভাবিলেন; পরিশেষে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন “হা।”

প্রাণকৃষ্ণ যখন অত্যন্ত করুণভাবে “হা”

উচ্চারণ করিলেন, তখন রমেশ সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন।

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ তাহা করিলেন না। তিনি সহসা উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন; রমেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে (অনধিক পাঁচ মিনিট কাল হইবে) প্রাণকৃষ্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “রমেশ বাড়ি যাও।”

রমেশ কহিলেন “বাড়ি যাইব কি! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।”

প্রাণকৃষ্ণ কহিলেন “চাও নাকি!—পাবে না।”

রমেশ। কেন!

প্রাণকৃষ্ণ। পরামর্শ দিবার কিছু নাই।

রমেশ। এখন মেয়ের কি হবে?

প্রাণকৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্য শিখুক। মনে কর সে বিধবা।

রমেশ প্রাণকৃষ্ণের উত্তরটিকে অত্যন্ত সন্তোষকর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, “মোটো ষোল বৎসরের মেয়ে।”

প্রাণকৃষ্ণ। ১০ বছর বয়সেও কি মেয়ে বিধবা হয় না? এই ছয় বৎসরকাল সে যে সধবা ছিল তার জন্য সমাজকে ধন্যবাদ দাও।

রমেশ। তোমার কি আর কিছু বলবার নাই?

প্রাণকৃষ্ণ। আছে। তোমার আর তিনটি মেয়ে আছে ত?

রমেশ। আছেই ত।

প্রাণকৃষ্ণ। তোমার কন্যার চেয়ে রৌপ্যের দিকে যার বেশী লক্ষ্য, তার সঙ্গে কদাপি কোন কন্যার বিবাহ দিও না। আর দেবী করো না। আমার আহার প্রস্তুত।

রমেশ। আমিও না হয় আমি এখানে খেলাম।

প্রাণকৃষ্ণ। ও! খাবে! বেশ। এই কথা বলিয়াই প্রাণকৃষ্ণ ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনিট পনের পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন— “ওঠো আহার প্রস্তুত।”

রমেশ সে রাত্রিকালে সেখানে ভোজন করিলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্নবাদ করিয়াও প্রাণ

কৃষ্ণের কাছে স্বীয় কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত আদায় করিতে পারিলেন না।

ইংলণ্ডের একটি পরিবারের “ড্রয়িংরুম” আলোকিত। সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী একত্র সমবেত। তাহাদের ভূষার পারিপাট্যে, উজ্জ্বল আলোকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলিয়া দর্শকের ভ্রম হইতে পারিত— যদি ইন্দ্রালয় তিনি চক্ষে পূর্বে দেখিতেন।

তাহার পরে নৃত্য, তাহার পরে বিশ্রাম ও সুরা, তাহার পরে আবার নৃত্য। রাত্র শেষে নৃত্য ভঙ্গ হইলে সুশীলচন্দ্র কম্পিত কলেবরে গৃহে চলিয়া আসিলেন।

সুশীলচন্দ্রের সহিত মার্গারেটের বিবাহের সব ঠিক, নিয়তির খড়া সুশীলচন্দ্রের স্বন্ধের উপর উঠিয়াছে, পড়িতে উদ্যত, এমন সময়ে প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নীলাম্বর তাহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুশীলচন্দ্র দিবান্বিতপ্রহরে সোফায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কল্যাকার রাত্র জাগরণের পর দুপেয়ালা কাফি এবং পাউন্ডখানেক ষ্টেক নিঃশেষ করিয়া তিনি রেনল্ডের মিস্টারিস্ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রেনল্ড-খানি ভূতলে পড়িয়া গেল।

যখন সুশীলচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত স্বর্গ ও মার্গারেটের অঙ্গীকৃত আলিঙ্গন একসঙ্গে অনুভব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নীলাম্বর দরোজায় টোকা দিয়া উত্তর না পাইয়াও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন “হ্যালো সুশীল! নিদ্রিত!”

সুশীল। (উঠিয়া) শয়তানের দোহাই! কে তুমি? (সুশীল ষেরূপ ইংরাজি বলিলেন আমি তাহা যথাসম্ভব বাঙালায় ভাষান্তরিত করিলাম) নীলাম্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, “আমি নীলাম্বর।”

সুশীল। নীলাম্বর! হ্যালো! তুমি এখানে!

নীলাম্বর। আশ্চর্য্য হচ্ছে! এবার ছুটিটা ব্রাইটনে কাটাৰো ঠিক করছি।

সুশীল। তা যেন করেছে! কিন্তু—এই মাত্র বলিয়া সুশীল মাথা চুলকাইলেন; তাহার পরে দ্রষ্ট কলার তুলিয়া লইয়া গলায় পরিলেন; পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া fireplace-এর উপরিস্থিত আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেকটাই ঠিক করিয়া লইলেন; পরে আসিয়া নীলাম্বরকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন— “চাটাজ্জি, আমার সুখে সুখী হও।”

(সুশীল ইংরাজীতে যাহা কহিলেন, congratulate me, তাহা বাঙালায় ভাষান্তর হয় না। যতদূর সম্ভব তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।)

নীলাম্বর তাহার হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন “ব্যাপারখানা কি, ব্যানাজ্জি?”

সুশীল। তবে শোন। এই বলিয়া সুশীল পুনর্বার fireplace-এর কাছে গিয়া তদুপরিস্থিত তাক হইতে একটি সিগারেট কেস লইয়া নীলাম্বরকে দিলেন। নীলাম্বর তাহা হইতে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইলেন। সুশীল সিগারেট কেসটি নীলাম্বরের হস্ত হইতে গম্ভীরভাবে লইয়া তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। উভয়ে এইরূপে ভাবী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইলে সুশীল অতি কাতরভাবে কহিলেন “জানো, চাটাজ্জি, তুমি এসে আমার কি ভেঙ্গেছো”, বলিয়া দ্বারের দিকে অতীব মর্মভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইলেন। দ্বার যদি ভাঙিয়া থাকিত তবে ত একটা শব্দ নিশ্চয়ই হইত। তিনি দ্বারের নিকটে গিয়া দ্বার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “কৈ দরজা ত ভাঙেনি।”

সুশীল! শয়তান তোমায় গ্রহণ করুক। কে বলেছে যে, তুমি আমার ঘরের দ্বার ভেঙ্গেছো! তুমি যা ভেঙ্গেছো—সর্বনাশ করেছে—ওহো জানো না—তুমি জানো না—সুখী তুমি যে, জানো না যে তুমি আমার কি ভেঙ্গেছো! কারণ তুমি আমার বন্ধু। আমার কি ভেঙ্গেছো তা যদি জান্তে, যদি বদ্বতে পার্তে, যদি ধারণা কর্তে পার্তে—তাহ'লে—তাহ'লে—এক কথায় দুঃখিত হতে। যাক, জানো না। সে ভালই হয়েছে! আমি কিছু মনে কর্বো না। ভুলে যাবো, যদি ভোলা সম্ভব হয়।

নীলাম্বর। বল না আমি তোমার কি ভেঙেছি। আমি তার দাম দিতে প্রস্তুত আছি।

সুশীল। দাম!—চাটাজ্জি! দাম দেবে, তার দাম তুমি দেবে! তোমার বাপের বিষয় বিক্রয় করেও তার দাম দিতে পারো না।

নীলাম্বর উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। আবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। কিছুই ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। শেষে অতি করুণ সুরে কতক স্বগত কহিলেন “ভাঙ্গলাম কি!” তাঁহার সেই কাতরোক্তিটি মৃতবৎসা ছাগীর অক্ষুট ক্রন্দনের মত শুনাইল। তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে সুশীল বিচলিত হইলেন। তিনি কহিলেন, “চাটাজ্জি, তবে শোন, তুমি কি ভেঙেছো। আমি ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম জানো?”

নীলাম্বর। না।

সুশীল। আমি মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তুমি সেই স্বপ্ন ভগ্ন করেছো।

নীলাম্বর আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বাপের বিষয় বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি মার্গারেটের প্রতি সুশীলের অনুরাগের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে তাহা ঘূর্ণাক্ষরেও জানিতেন না।

সুশীল আবার কহিলেন “আমি মার্গারেটকে— এ্যাঁ— বিবাহ কর্তে যাচ্ছি। বিবাহ এই তেসরা মার্চ। সব স্থির। তাই বলছিলাম বন্ধু আমার সুরে সুখী হও।”

যদি ঠিক সেই সময়ে গৃহকর্তী স্বয়ং চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেন নীলাম্বর তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল চারি বৎসর পূর্বে শ্যামপুকুরের গলির ১৫।১ নং ভবনস্থ রমেশচন্দ্রের কন্যা মোহিনীকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন; কারণ তিনি জানিতেন যে সুশীল শ্বশুরের অথেই বিলাতে আইন পড়িতে আসিয়া প্রতি ছুটিতে ব্রাইটনে সাম্মুদ্রিক বাতাস সেবন করিয়া থাকেন; কারণ তিনি জানিতেন যে আইনে দ্বিবিবাহের (bigamy) শাস্তি বেশ একটু গুরুতর। তিনি জানিতেন না কেবল মানব-চরিত্র। মানুষ যে এতদূর হেয় কৃতঘ্ন হইতে

পারে, তাহা কদাপি তিনি সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

নীলাম্বর কহিলেন “সে কি? এ যে দ্বিতীয় বার বিবাহ।”

সুশীল ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন, কহিলেন— “হ্যাঁ তা জানি।”

নীলাম্বর। জেলে যাবে?

সুশীল। মার্গারেটকে নিয়ে জেলে কেন, হলে অর্থাৎ নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি। তুমি জানো না। তাকে দেখনি।

নীলাম্বর। নাই বা দেখলাম!

সুশীল। তার গায়ের রং তুহিনের চেয়ে শূন্য।

নীলাম্বর। অনেক সাদা চামড়ার নীচে—

সুশীল। তার কেশদামও—ওঃ ঠিক যেন গোধূলি।

নীলাম্বর। হলেই বা—

সুশীল। তুমি দেখোনি, সে চুল নয়, উল।

নীলাম্বর। তার না হোক তোমার ত বটে। তার চুল উল হোক আর যাই হোক তুমি ‘ফুল’ হোয়ো না। শোন।

সুশীল। তার বন্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত।

নীলাম্বর। বন্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত হলেই যে তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র সম্বন্ধ হতেই হবে, এ কথা কেউ বলেছে কি!

সুশীল। কেন শেলি!

নীলাম্বর। ঐ কথা বলেছে? নিয়ে এসো শেলি।

সুশীল। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা।

নীলাম্বর। ঐ কথা বলেছে? নিয়ে এসো সুন্দর পুরুষ সুন্দরী নারীর মধ্যে সম্বন্ধ ঐ একটি মাত্র। তাহলেও, একমাত্র বিবাহই এই পশুর প্রবৃত্তিকে মানুষের ধাপে তুলতে পারে। বিবাহে এক কর্তব্যজ্ঞানই এই সম্বন্ধকে পবিত্র করে দেয়।

সুশীল। আমি ত তাকে বিবাহ কর্তে যাচ্ছি।

নীলাম্বর। এ বিবাহ নয়, এ স্বেচ্ছাচার। এ বিবাহ হয় না—ঈশ্বরের আইনেও হয় না, মানুষের আইনেও হয় না। একজনকে বিবাহ করে’ এসে—

সুশীল। হিন্দুসমাজে কি দুই স্ত্রী হয় না? কুন্দনন্দিনী—

নীলাম্বর। উচ্ছন্ন যাক্ কুন্দনন্দিনী। কুন্দনন্দিনীও যা রোহিণীও তাই।

সুদূর বিলাতে ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে 'সোফা' শোভিত গৃহকক্ষে এরূপ কথোপকথন অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাঙালা উপন্যাস যে অনেক নব্যযুগের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যকার দিনে এ অসংযত প্রবৃত্তির মাত্রা চড়িয়াছে। এ প্রবৃত্তি নব্যযুগের কাছে বড় মনোরম, বড় প্রীতিপ্রদ। রেনল্ডের উপন্যাস এই প্রবৃত্তিতে আহুতি দিতেছে। এ কর্তব্যজ্ঞানহীন প্রবৃত্তি নিস্বর্ণণ করিতেই হইবে। কারণ এ ব্যাধি বড় সংক্রামক।

বলা বাহুল্য যে নীলাম্বরের যুক্তি সুশীলের প্রবৃত্তির গতিরোধ করিতে পারিল না। সুশীলের বিবাহ হইয়া গেল।

"আমার পুত্রের বিপক্ষে মোকদ্দমা আন্তে আমি নীলাম্বরকে লিখেছি।"—কাঁপিতে কাঁপিতে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন।

রমেশ কহিলেন "সে কি ভাচার্য্য মহাশয়! সে আপনার পুত্র।"

সিদ্ধেশ্বর। আমার ত্যজ্যপুত্র।

"আমার" বলিতে সিদ্ধেশ্বরের স্বর এরূপ উচ্চে উঠিয়াছিল যে রমেশ ভাবিয়াছিলেন যে সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় তৎপরেই একটা অশ্রুতপূর্বে ভীষণ অভিশাপ উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু যখন সে চীৎকার—"ত্যজ্যপুত্রে" মাত্র পর্য্যবসিত হইল তখন রমেশ কতৃক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন—"আর সে আমার জামাই—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন "জামাই বটে।" কিন্তু এ ঝাল নিজের উপর ঝাড়িলেন, কিং বৈবাহিকের উপর ঝাড়িলেন, তাহা বস্তা কি শ্রোতা কাহারও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইল না। বন্ধুর স্বর কাঁপিতেছিল। রমেশ ইহার উত্তরে কি কহিবেন তাহা তাহার কোনরূপ মনে আসিল না। তিনি উত্তর খুঁজিতেছিলেন, এমন সময়ে স্টেশনে যাত্রীর কাছে প্রত্যাশিত

ট্রেনের মত প্রিয় প্রাণকৃষ্ণ সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

রমেশ আশা করিয়াছিলেন যে প্রাণকৃষ্ণ বৃদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বরকে তাহার ভীষণ সংকল্প হইতে বিরত করিবেন। প্রাণকৃষ্ণের ধীশক্তির প্রতি রমেশের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পুত্রকে নির্যাতন করার অস্বাভাবিকতা রমেশ বৃদ্ধিতেছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধাইতে পারিতোছিলেন না। নৌকা ডুবু-ডুবু এমন সময়ে উপযুক্ত নাবিক উপযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিল। তিন উৎসুকভাবে প্রাণকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। ক্রমে প্রাণকৃষ্ণ সিদ্ধেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন। শুনিয়াই চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন "সাবাস।"

ইহা শুনিয়া রমেশ ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রাণকৃষ্ণের গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন—"কিন্তু শোন প্রাণকৃষ্ণ"—

প্রাণকৃষ্ণ সেদিকে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত না করিয়া সাগ্রহে সিদ্ধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আবার কহিলেন "সাবাস সিদ্ধেশ্বর! আজ মানুষের মত একটা মানুষ দেখলাম।"

রমেশ। কেন?

প্রাণকৃষ্ণ। রোমে ব্রুটস্ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন তাই তিনি জগন্মিথ্যাত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের দ্বিগুণ স্নেহ বন্ধে ধরে, এই বঙ্গদেশে কত ব্রাহ্মণ ব্রুটস্ আছে কে জানে! তাদের মধ্যে তুমি একজন। এসো আবার আলিঙ্গন করি।

রমেশ উঠিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন যে তর্কের এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে তিনি না দাঁড়াইলে আর উপায় নাই। নহিলে তাহার উঠিয়া দাঁড়াইবার অন্য কোন কারণ লক্ষিত হইল না।

সিদ্ধেশ্বর। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। তোমার ছেলে আমায় চিরকাল গুরুর মত ভক্তি করে। আমার কথা অমান্য করবে না।

প্রাণকৃষ্ণ। সাধ্য কি? আমি তার উপর একটা 'তারে' খবর পাঠাচ্ছি। বাপের কথা ত সে কখনই অবহেলা কর্তে পারবে না। এমন ছেলেই তৈর্যেব করি নি, রমেশ।

এই প্রথম সে দিন প্রাণকৃষ্ণ রমেশের সহিত কথা কহিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ। আমি 'তার' পাঠাচ্ছি এখনই।
এই বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া দ্বারের কাছে
যাইলে রমেশ অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে
সিন্ধেশ্বরের দিকে চাহিলেন। সিন্ধেশ্বরের কন্যার
ব্যথা বৃদ্ধিলেন। নানারূপ বিপরীত অনুভূতি
আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি
কহিলেন "প্রাণকৃষ্ণ, দাঁড়াও।"

প্রাণকৃষ্ণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমেশ। ক্ষমা কর।

সিন্ধেশ্বরের রমেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন

"কিন্তু সে ক্ষমার যোগ্য নয়—পাষণ্ড।"

প্রাণকৃষ্ণ। ব্যাভিচারী—

সিন্ধেশ্বরের। নরাধম।

প্রাণকৃষ্ণ। মহাপাপী—

এই সময়ে মোহিনী কক্ষ আসিয়া
সিন্ধেশ্বরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন,
"যাই হোন, তিনি আমার স্বামী।"

৬

এরূপ ঘটিবে রমেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন
নাই। ষোড়শী কন্যা এরূপ নিলজ্জ ব্যবহার
করিবে, তাহার বৈবাহিকের সমক্ষে আসিয়া
বিশেষতঃ তাহার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণের সমক্ষে
আসিয়া পড়িবে। এরূপ তিনি কখন প্রত্যাশা
করেন নাই। নাটকে এরূপ ঘটিয়া থাকে।
কিন্তু বাস্তব জীবনে—সত্য কথাটা কি—তিনি
এরূপ দেখেন নি। আমরাও স্বীকার
করিতোঁছি যে আমরাও দেখি নাই। কিন্তু নারী
হৃদয়ের ব্যথা, চাঞ্চল্য, নারী হৃদয়ের বল, আমরা
অধম পুরুষ কতটুকু জানি।—নারী!—নারী!
ঈশ্বর কি দিয়া তোমায় ঐ শূদ্র নিষ্কলঙ্ক
চরিত্রে গড়িয়াছেন তিনিই জানেন। স্বর্গে
দেবীরা কি এর চেয়েও সুন্দরী!

ফলকথা দাঁড়াইল এই যে সে টেলিগ্রাম গেল
না। অন্য টেলিগ্রাম গেল। তাহার মর্ম
"নালিশ করাইও না। পত্রকে বলিও যে
তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীই তাহাকে রক্ষা
করিয়াছে।"

সুশীলের বিবাহের পর এক বৎসব
গিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মের সখ তাহার ইতিপূর্বেই

মিটিয়াছিল। তৎপরে তাহার ইংরাজ স্ত্রী
তাহাকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি
পাইলেন। একদিন পরিত্যক্ত সুশীল আবার
সেই ব্রাইটনে সমুদ্রধারে একা বসিয়া
ভাবিতোঁছিলেন। স্ত্রীর অর্থ নিঃশেষ করিয়া
নিজের রিক্ত পকেটে হস্ত দিয়া ভাবিতোঁ-
ছিলেন। এমন সময় আবার তাহার বন্ধু
নীলাম্বর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন; পূর্বেকথিত পত্র ও টেলিগ্রাম
দেখাইলেন। সুশীলের চক্ষে জল আসিল।
দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অন্যমনে
পত্র ও টেলিগ্রাম বক্ষের পকেটে রাখিলেন।

মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিতোঁছিলেন। দূরে
সানাই বাজিতোঁছিল। সানাইয়ের তান কাঁপিতে
কাঁপিতে উঠিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।
এমন সময়ে মোহিনীর মা আসিয়া
ডাকিলেন "মোহিনী!"

মোহিনী। মা! এই যে যাচ্ছি। রাত্রি হয়ে
গিয়েছে, জান্তে পারিনি।

যেন কত সঙ্কোচ। যেন অপরাধ তাহারই।
মোহিনীর মা কহিলেন "এসো মা, জামাই
এসেছে।" মোহিনী উঠিতে মূর্ছিত হইয়া
পড়িয়া গেলেন।

["বঙ্গদর্শন", মাঘ ১৩১৬]

আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ

বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার
আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাস-
কালে বাইরণের Manfred ও Childe
Harold-এর দুই Canto এবং মেঘদূত ও
উত্তরচরিতের কাব্যংশ আমি মুখস্থ করিয়া-
ছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley
পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যগত হইয়া
ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare
বারবার পড়িতাম; ও শেষোক্ত কবির নাটকের
যে যে অংশ কাব্যংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ
করিতাম।

বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা'
নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়

দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ-দল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গ-মঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাতে হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।

বার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। বার বৎসর হইতে সতের বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্য্য-গাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্য-ভারতে' প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া Sir Edwin Arnoldকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন ও সে কবিতা-গুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।

বিলাতে হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙালা কবিতা লিখিয়া "আঁষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া "আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ"

নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্য্যাপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।

আমি উপরে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি; কারণ উপরি লিখিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরূচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে "কল্কি অবতার" একমাত্র প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পদ্বর্ষিচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি এবং ক্রমে সে নাটক স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ "দ্র্যহস্পর্শ" রচনা করি এবং উহাও স্টারে অভিনীত হয়। পরে "প্রায়শ্চিত্ত" রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। মৎ-প্রণীত "সীতা" নাট্য-কাব্য নব্য-প্রভায় প্রকাশিত হয়। পরে "পাষণী" নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি "তারাবাই" নাটক প্রকাশ করি।

যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিষ্ণের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীর কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরনের অমিত্রাকর

—মাইকেলের ছন্দোমাদুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে—অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক্। Of Man's Disobedience ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে কিন্তু To be or not be that is the question—

ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত? কিন্তু তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of time কিংবা For in that sleep of death what dreams may come ইহা দস্তুর মত কবিতা। দেখিলাম যে Shakespeare-এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙালাতে “তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাবো” ইহাব পরে “নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী” এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একটু উভয়েই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyle-এর মতে সামান্য হইতে গম্ভীর-তম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপে প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।

বিক্রমবাবু গদ্য অনেক স্থলে পদ্য। Schiller, Lessing, Ibsen, Moliere ইত্যাদি মহা-নাট্যকারগণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schiller-এর গদ্যের ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌন্দপ্ৰসূষ।

তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেই জন্য উক্তগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্ষ্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবাস্তী পদ্যে করে না, গদ্যে

করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্ত-গুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্য আমি আমার তারা বাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি (রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতে-ছিলাম, তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তাম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। কারণ ‘অপেরা’র কথাবাস্তী স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি অনেকস্থলে Shelleyর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

[“নাট্য-মন্দির”, শ্রাবণ ১৩১৭]

অভিনেতার কর্তব্য

অভিনয়ের উদ্দেশ্য—নাটকে বর্ণিত ঘটনা-গুলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানো। কোন কোন পাঠকের কল্পনাশক্তি এরূপ প্রবল যে নাটক পাঠেই ঘটনাগুলি প্রায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। কিন্তু সে শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা কম। অধিকাংশ ব্যক্তিই নাটকে অপেক্ষা অভিনয়ে নাটকটি হৃদয়ঙ্গম করেন। অতএব অভিনেতার প্রধান কর্তব্য এরূপ অভিনয় করা—যাহাতে নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়।

নাটকের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষবৎ দেখানোর একটা উপায় দৃশ্যপট, দ্বিতীয় উপায় পরিচ্ছদ, তৃতীয় উপায় অভিনয়। প্রথম দুইটি

উপকরণের জন্য অভিনেতা দায়ী নহেন। তিনি অভিনয়ের জন্য দায়ী।

কিরূপে উত্তম অভিনয় করিতে হয়, তাহা আমার মত দর্শকের জানিবার সম্ভাবনা কম। তবে বিলাতে অনেক অভিনয় দর্শন করিয়া যাহা আমার মনে হইতেছে, আমি আজ সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

অভিনয়ের তিনটি অংশ;—(১) আবৃত্তি, (২) মূখভঙ্গী ও (৩) অঙ্গভঙ্গী।

প্রথমতঃ—আবৃত্তি। অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করিতে হইবে, যাহাতে স্বর অন্ততঃ এরূপ হইবে যাহাতে সমস্ত দর্শক-মণ্ডলী তাহা শুনিতে পায়। সেই উচ্চতার উপরে ভাব অনুসারে স্বর খেলিবে, তাহার নীচে কখন নামিবে না। সেরূপ উচ্চস্বর নিকটস্থ দর্শক-মণ্ডলীর নিকটে একটু অধিক উচ্চ বোধ হইবে নিশ্চয়। কিন্তু তাহার উপায় নাই। কোন কোন অভিনেতার স্বাভাবিক স্বরই এত গাঢ়—যে সেই স্বরই সমস্ত দর্শক-মণ্ডলী সাধারণতঃ শুনিতে পায়। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বর এইরূপ। এ একটা ভয়ানক রকম সুরবিধা। মিষ্ট স্বর যেরূপ গায়কের প্রধান স্বাভাবিক গুণ, গাঢ় প্রবল স্বরও অভিনেতার পক্ষে প্রায় সেইরূপ। তবে মিষ্টস্বর না থাকিলে কাহারও গায়ক হইতে যাওয়া যেরূপ বিড়ম্বনা, এরূপ স্বর না থাকিলে কাহারও অভিনেতা হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা নহে। অভিনেতা স্বর উচ্চ করিয়া এ অভাব অনেকটা পূর্ণ করিতে পারেন। বিলাতে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত অভিনেতা-দিগের hiss দূরতম শ্রোতা শুনিতে পান। বোধ হয় অভ্যাস দ্বারা এ শক্তি অনেকটা আয়ত্ত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—স্বর উঠাইতে বা নামাইতে জানা মহা বিদ্যা। আমাদের দেশে চীৎকার করিলে করতালি পাওয়া যায় দেখিয়া অনেক অভিনেতা স্থানে স্থানে স্বর অতিশয় তীব্র করিয়া ফেলেন। কিন্তু দোষ সম্পূর্ণ দর্শকের নহে। নিম্নস্বরে উত্তম অভিনয়ও আমাদের দেশে দর্শকবর্গকে মোহিত করে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস যে

চীৎকার করিলে বীররস দেখানো হয়। বস্তুতঃ অনেক সময়ে তাহা হয় না। লোকে ক্রুদ্ধ হইলে উচ্চস্বরে কথা হয়। বীর সর্ষদাই যে ক্রুদ্ধ হইয়াই আছে তাহা নহে। পরন্তু প্রকৃত বীর কদাচিৎ সেরূপ উত্তেজিত হয়। কিন্তু বীররসে চীৎকার করিলেও তত যায় আসিত না। অনেকে করুণ রসেও চীৎকার করেন। যেখানে কোন রসই নাই, সেখানেও চীৎকার শুনিয়াছি। এ দোষটি আমাদের অভিনেতার মধ্যে অধিকাংশের আছে। অভিনয়ের স্বর খেলাইতে জানা বিদ্যাটি—গীত শিক্ষারই মত অভ্যাস করা চাই। এ বিদ্যা পূর্ব জন্মের সংস্কার দ্বারা লাভ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ—কোন স্থানে ধীরে ও কোন স্থানে দ্রুত আবৃত্তি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান এ দেশের অতি অল্প অভিনেতারই আছে। চিন্তা করিয়া কথা কহিতে হইলে, কথাটি ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইলে, ভাবে অভিভূত হইলে লোকে ধীরে কথা কহে। আবার সময়ভাব বা ব্যস্ততা বৃদ্ধাইতে হইলে, উত্তেজিতভাবে অনুন্নয় করিতে হইলে, লোকে দ্রুত কথা কহে। এ সব মনস্তত্ত্বের কথা। অভিনেতৃগণ প্রায়ই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

চতুর্থতঃ—স্বর ক্রমে ক্রমে উঠানো ও ক্রমে ক্রমে নামানোও অভিনয়ে প্রয়োজন হয়। একটি শব্দ দুই তিনবার পুনরুক্ত হইলে তিনটি এক স্বরে হইতে পারে না। হয় স্বর ক্রমে ক্রমে উঠিবে বা ক্রমে ক্রমে নামিবে। যেমন “আমি এ কথা বল্‌বো বল্‌বো বল্‌বো যতক্ষণ” ইত্যাদি; এখানে স্বর ক্রমে উঠিবে, নামিবে না। আবার ভাবে গদগদ হইয়া যদি কেহ বলে, “কি দেখলাম! কি দেখলাম! কি দেখলাম!”—সেখানে স্বর ক্রমে ক্রমে নামিবে, উঠিবে না। এতদ্বন্দ্বিতাও অভিনয়ে ‘একঘেয়ে’ ভাব যাহাতে না আসে, তাহার জন্যও স্বর খেলানো দরকার। এটি কখন কখন ঠিক স্বাভাবিক না হইতে পারে—কিন্তু অভিনয়ে তাহার প্রয়োজন হয়। নহিলে শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমে হাই তুলিবে।

তদুপরি আবৃত্তিতে কোথায় যতি (emphasis) পড়িবে—তাহাও একটি শিক্ষণীয়

ব্যাপার। বস্তুতঃ আবৃত্তির প্রধান অঙ্গ এই যতি। উত্তম অভিনেতা সর্বাপেক্ষা এই যতি-স্বারা অর্থ পরিষ্ফুট করেন। যতি অনুসারে একটি বাক্যের ভিন্ন অর্থ হয়। যেমন “তুমি মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে।” ইহার তিন রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমে “তুমি”র উপর জোর দিয়া বলিলে বোঝায়, আর কেহ পদাঘাত করে নাই—তুমি পদাঘাত করিয়াছিলে। “মহেন্দ্র”র উপরে জোর দিলে অর্থ হয়, আর কাহাকেও পদাঘাত কর নাই, মহেন্দ্রকে পদাঘাত করিয়াছিলে। “পদাঘাতের” উপর জোর দিলে মনে হয় “চপেটাঘাত কর নাই, মৃশ্চ্যাঘাত কর নাই, পদাঘাত করিয়াছিলে।” Antony-র বক্তৃতায়—I come to bury Caesar not to praise him এখানে যতি পড়িবে “burry”র উপরে ও praise-এর উপরে তবে অর্থ পরিষ্ফুট হইবে। এই বিষয়ে স্বর্গীয় অশ্বিন্দু মনস্তাত্ত্বী ওস্তাদ ছিলেন। উপযুক্ত যতি ভিন্ন আবৃত্তিই হয় না।

আরও এক কথা। ভাব অনুসারে স্বর কাঁপানো, স্বর গাঢ় করা ইত্যাদিও আবৃত্তির অঙ্গ। আমাদের দেশে অভিনেতৃগণের মধ্যে এ গুণের অত্যন্ত অভাব। ইহাও অভ্যাস করিতে হয়। Hamlet-এর বিখ্যাত Soliloquy “To be or not to be” ইহার দুই প্রকার আবৃত্তি শুনিয়াছি। একরূপ আবৃত্তিতে বোঝায় যে হামলেট ভাবিতেছিলেন, যে তিনি আত্মহত্যা করিবেন কিনা। অপর এক আবৃত্তিতে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে হামলেট “আত্মহত্যা” জিনিষটাই একটি অপ্ৰাসংগিক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিতেছিলেন।

আবৃত্তি কিরূপ করিতে হইবে তাহা প্রবন্ধে ঠিক বোঝানো যায় না, আবৃত্তি করিয়া দেখানো যায়। বিলাতে আবৃত্তি শেখাইবার অধ্যাপক আছে। উত্তম অভিনেতার তাহাদের কাছে আবৃত্তি শিক্ষা করেন। এখানে ঐরূপ বিদ্যালয়ের অভাব আছে।

মুখভঙ্গী অভিনয়ের আর একটি অঙ্গ। অনুভূতি অনুসারে মুখের নানারূপ বিকার হয়। উল্লাসে মুখ দীপ্তবৎ হয়, দুঃখে ম্লান হয়,—আকস্মিক বিপদে অস্থিরবৎ হয়।

নির্বোধ দ্রুত চোখ পিট্ পিট্ করে, কুচক্রীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, হতাশের দৃষ্টি নিম্প্রভ হয়। অভিনয়ে এগুলি দেখাইতে হইলে মুখের পেশীর উপরে বিশেষ প্রভুত্ব থাকা চাই। এ বিদ্যা বহু প্রয়াস ও শিক্ষার ফল। তাহার উপর রঙ মাখার একরূপ কৌশল আছে, যাহাতে মুখ সহসা আরক্তিম বা পান্ডুর দেখায়। এখানে সে কৌশল খাটে না, তবে তাহার অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দেশে এ বিদ্যার একেবারে অভাব বলিলেও অতুক্তি হয় না।

পরিশেষে অঙ্গভঙ্গী। মানুস কথা কহিবার সময় হাত পা নাড়েন। ভাষাতত্ত্ববিদ্রা বলেন যে, মানুস অনেক সময়ে ভাব-প্রকাশক ভাষার অভাব অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করে। কিন্তু এ কথা সব সময়ে খাটে না। মানুস অনেক সময়ে ভাষার দ্বারা মনের ভাব সম্যক্ প্রকাশ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করে। উদ্দেশ্য বোধ হয় অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবটি বেশী জোরের সহিত প্রকাশ করা। অনেক সময়েই কিন্তু মনের ভাবের গতি অনুসারে অঙ্গভঙ্গী আপনিই আসিয়া পড়ে। কাহার কাছে কিছু প্রকাশ না করিতে হইলেও, একাকী থাকিলেও চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গী আসিয়া পড়ে। মন উত্তেজিত হইলে লোকে দ্রুত পাদচারণ করে, মনে একটা সংকল্প আঁটিতে হইলে তর্জনী-দ্বারা তাহা নির্দেশ করে। ভাবের সহিত তাহার উপযোগী অঙ্গভঙ্গী দেখানোও অভিনয়ের একটি অঙ্গ। এ বিষয়ে আমাদের দেশে অভিনেতার উদাসীন নহেন। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী সময়ে সময়ে ঠিক স্বাভাবিক হয় না।

অভিনেতার প্রধান কর্তব্য স্বাভাবিকরূপে অভিনয় করা। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার বিলাতে অনেক সময়ে টীকাকারের করেন। অর্থাৎ কোন উক্তি বা ঘটনা সাধারণে একরূপ বোঝে; কিন্তু সেই অভিনেতার অভিনয় ভঙ্গী দ্বারা তাহার অপরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ঐরূপ কর্তব্য পালনের এ দেশে এখনও প্রয়োজন হয় নাই। কারণ সের্বিস নাটক এ দেশে অভিনীত হয় না।

[“নাট্য-শিল্প”, ভাগ ১০১৭]

